বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার

খুলনা

প্রধান সম্পাদক
ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার, খুলনা

বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার

খুলনা

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
প্রধান সম্পাদক
জেলা গেজেটিয়ার প্রণয়ন কর্মসূচি
প্রাক্তন মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
প্রাক্তন সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
প্রাক্তন সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রাক্তন সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়
কবি ও নৃবিজ্ঞানী

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
২০১৭

বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার খুলনা

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০১৭/পৌষ ২০২৪
প্রকাশক: পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

মুদ্রক:
এফএ অ্যান্ড এমআইএস (প্রকাশনা শাখা)
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
আগারগাঁও, ঢাকা।

পাণ্ডুলিপি:
জেলা গেজেটিয়ার প্রণয়ন কর্মসূচি
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
ঢাকা।

মূল্য: টাকা ৪০০.০০
ইউএস ডলার : ২০

ISBN: 978-984-34-5288-7

Bangladesh Zila Gazetteers Khulna
(Physical and Socio-economic History of Khulna District):
Edited by Dr. Kamal Abdul Naser Chowdhury
Published by Statistics and Informatics Division
Agargaon, Dhaka-1207

Price: Taka 400.00
USD: 20

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ পৌষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

বাণী

হযরত খাজা খানজাহান আলী (রহ.) স্মৃতিবিজড়িত খুলনা জেলার গেজেটিয়ার বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

ভৈরব-রূপসা-কয়রা নদীবিধৌত দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী বৃহৎ জনপদ খুলনা। বাংলাদেশের প্রাচীন নদীবন্দরগুলোর মধ্যে খুলনা অন্যতম। এক সময় খুলনা শিল্প-সমৃদ্ধ নগরী হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিল যার ঐতিহ্য এখনও বিদ্যমান। বিশ্ব ঐতিহ্য পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনভূমি সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার খুলনা। বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে গড়ে ওঠা এই সমতল জনপদ অপূর্ব জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ জেলার মুক্তিকামী জনগণ দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতায় অসামান্য অবদান রাখেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে এ জেলার জনগণের আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেম বাঙালি জাতির ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

গেজেটিয়ার প্রতিটি জেলার আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক অবস্থান, ভূপ্রাকৃতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান, ভাষা, ধর্ম, বর্ণ, সংস্কৃতি, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, ঐতিহাসিক স্থান, পরিবেশ, জলবায়ু, জীববৈচিত্র্য, নদনদী, ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধসহ সার্বিক ইতিহাসকে কালের ধারাবাহিকতায় ধারণ করে রাখে। গেজেটিয়ারের প্রতিটি অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সভ্যতা, রাজনীতি, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের মেলবন্ধন রচনা করে।

এ গেজেটিয়ার প্রকাশে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আশা করি এ গেজেটিয়ার সর্বস্তরের পাঠকের উপকারে আসবে এবং সর্বমহলে প্রশংসিত হবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ পৌষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

বাণী

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ লীলাভূমি, বিশ্ব ঐতিহ্যের নৈসর্গিক বিস্ময় বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনভূমি সুন্দরবনসংলগ্ন ও জীববৈচিত্র্যেসমৃদ্ধ খুলনা জেলার গেজেটিয়ার বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। সাধারণ জনগণের বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহ থাকার কারণে ইংরেজি ভাষায় রচিত বৃহত্তর জেলাসমূহের গেজেটিয়ার অনুসন্ধিৎসু পাঠকের মনের পিপাসা মিটাতে সক্ষম হয়নি। তাই বাংলা ভাষায় লিখিত এই গেজেটিয়ার জ্ঞানপিপাসু পাঠকের মনকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে বলে আমি মনে করি।

গেজেটিয়ার হচ্ছে মূলত ভৌগোলিক অভিধান। কোনো স্থানের আর্থসামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ভৌগোলিক অবস্থান, ভূপ্রাকৃতিক গঠন ও বিবরণ, সংস্কৃতি, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, ঐতিহাসিক স্থান, পরিবেশ, জলবায়ু, জীববৈচিত্র্য প্রভৃতির বিন্যাসই হলো গেজেটিয়ার। সর্বোপরি, গেজেটিয়ার আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসকেও কালান্তক্রমে ধারণ করে।

হযরত পীর খাজা খানজাহান আলী (রহ.) স্মৃতিবিজড়িত ও ভৈরব-রূপসাবিধৌত খুলনার ইতিহাস-ঐতিহ্য, গৌরবময় এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে এ জেলার রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল অবিস্মরণীয় অবদান। ইতিহাস, ঐতিহ্য, রাজনীতি, শিক্ষা-সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প-বাণিজ্য ও খেলাধুলাসহ সব ক্ষেত্রেই রয়েছে খুলনা জেলার অসামান্য অবদান। খুলনা দেশের তৃতীয় বৃহত্তম শিল্প শহর ও দ্বিতীয় বৃহত্তমসামুদ্রিক বন্দর। দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম খাত সাদা সোনা, চিংড়ির জলাভূমি খুলনা। এক সময়ের সোনালি আঁশ খ্যাত পাটের সবচেয়ে বড় মোকামও এই জেলায়।

বাংলা ভাষায় খুলনা জেলার গেজেটিয়ার প্রস্তুতে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন বিশেষত প্রধান সম্পাদক, উপদেষ্টামন্ডলী, প্রণেতাবৃন্দ, বিভিন্ন পর্যায়ে গঠিত কমিটির সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারী, তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমি আন্তরিকভাবে আশা করি এ গেজেটিয়ার জ্ঞানপিপাসু ও গবেষণায় আগ্রহী সর্বস্তরের পাঠকের কাছে সাদরে গৃহীত হবে।

আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, *এম. পি*

সচিব
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

১২ পৌষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

উপক্রমণিকা

একটি জেলার ভূপ্রকৃতি ও পরিবেশ, আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য-পুষ্টি, ভাষা সাহিত্য এবং সংস্কৃতি, ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান, ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ইতিহাসের আলোকে কালানুক্রমিক বিবরণই হলো জেলা গেজেটিয়ার।

ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতে জেলা গেজেটিয়ার প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু হয়। এর ধারাবাহিকতায় পাকিস্তান আমলে দেশের ১৬টি জেলার গেজেটিয়ার প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৩টি জেলা গেজেটিয়ার ইংরেজি ভাষায় এবং ১২টি জেলা গেজেটিয়ার বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করা হয়। ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের ফলে দেশে ৬৪টি জেলার সৃষ্টি হয়।

সংস্থাপন (বর্তমানে জনপ্রশাসন) মন্ত্রণালয়ের ২১ এপ্রিল ১৯৯৮ তারিখের সম (জেএ-২)-২৩/৯০-১৭০ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মোতাবেক জেলা গেজেটিয়ার কার্যালয়ের কার্যকারিতা ১ জুলাই, ১৯৯৮ তারিখ থেকে বিলুপ্ত করে জেলা গেজেটিয়ার প্রণয়নের দায়িত্ব পরিসংখ্যান বিভাগের (বর্তমানে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ) ওপর ন্যস্ত করা হয়। এ লক্ষ্যে এ বিভাগ হতে ৬৪টি জেলার জেলা গেজেটিয়ার প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পাইলট হিসেবে বর্তমানে ৭টি জেলার গেজেটিয়ার প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বাকি ৫৭টি জেলার গেজেটিয়ার প্রণয়নের ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন আছে।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীনে জেলা গেজেটিয়ার প্রণয়ন কর্মসূচির আওতায় বর্তমানে জেলাসহ ৭টি জেলার গেজেটিয়ার প্রণয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সম্পাদনা পরিষদ, উপদেষ্টা পরিষদ এবং জেলা পর্যায়ে জেলা সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়। প্রখ্যাত কবি ও নৃবিজ্ঞানী এবং মুখ্য সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীকে প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। জেলা পর্যায়ে প্রণীত কমিটিসমূহ জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে লেখক নির্বাচন করে অধ্যায়সমূহ রচনা করেন এবং প্রধান সম্পাদক মহোদয়ের নেতৃত্বে সম্পাদনা পরিষদ প্রণীত অধ্যায়সমূহ বিশদ পর্যালোচনা ও সম্পাদনা করে জেলা গেজেটিয়ারসমূহ প্রণয়ন করেছেন। এ কর্মসূচিতে পরামর্শক হিসেবে সাবেক অতিরিক্ত সচিব জনাব ড. মো. হাফিজুর রহমান ভূঞা দায়িত্ব পালন করেছেন।

দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সভ্যতা, আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসহ বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জনগণকে পরিচিত করণে জেলা গেজেটিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তা ছাড়া জেলা গেজেটিয়ার প্রণয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসাধারণ, গবেষক, সমাজকর্মী ও অন্যান্য তথ্য ব্যবহারকারীগণের জন্য জেলার বস্তুনিষ্ঠ তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা। বাংলা ভাষায় লিখিত এই গেজেটিয়ার জ্ঞানপিপাসু পাঠকের মনকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

এ জেলা গেজেটিয়ার প্রস্তুতে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন প্রধান সম্পাদক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, উপদেষ্টামন্ডলী, সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, পরামর্শক ও অধ্যায় প্রণেতাগণ, কর্মসূচি পরিচালক, সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আশা করি এ জেলা গেজেটিয়ার পাঠে সর্বস্তরের পাঠকবৃন্দ উপকৃত হবেন।

কে এম মোজাম্মেল হক

ভূমিকা

কোনো জেলার ভূ-প্রকৃতি (Topography) ও পরিবেশ, সমাজ-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, প্রাকৃতিক সম্পদ, অর্থনীতি, ভাষা ও সাহিত্য, কৃষি, স্বাস্থ্য, ভূমি ব্যবস্থাপনা, খাদ্য নিরাপত্তা, জীবন-জীবিকা, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, জনপ্রশাসন ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের নানা বিষয়ে পূর্বাপর ঘটনাপ্রবাহের ধারাবাহিকতায় লিখিত কোনো ঘটনাবলির বিবরণ হলো জেলা গেজেটিয়ার। প্রসঙ্গত, *বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ* কর্তৃক ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত *ভারতকোষ* (তৃতীয় খণ্ড: ১৭৪)-এর বিজ্ঞ সম্পাদকমণ্ডলী গেজেটিয়ারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন: ''যে গ্রন্থে বিভিন্ন জায়গা সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত থাকে তাহাকে গেজেটিয়ার বা ভৌগোলিক অভিধান বলে। ইহাতে নানা দেশ, অঞ্চল, জেলা, নদনদী, পাহাড়, গ্রাম, শহর ইত্যাদি সম্পর্কে বহুবিধ প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবিষ্ট থাকে। এতদ্‌ব্যতীত দেশের বা অঞ্চলের প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবরণও লিপিবদ্ধ থাকে।'' জেলা গেজেটিয়ারে একটি নির্দিষ্ট জেলার উপরিক্ত বিষয় ও তথ্যাদি থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত।

প্রাচীন ও মধ্যযুগেও স্থানিক বিবরণসম্বলিত এ-ধরনের গ্রন্থের সন্ধান পৃথিবীর অনেক দেশেই পাওয়া যায়। ভারতীয় উপমহাদেশে গেজেটিয়ার জাতীয় প্রথম গ্রন্থ হলো *বাবুরনামা* বা তুজুক-ই-বাবুরি (*Babur-Nama* or Memoirs of Babur, Trans. Annette Susannah)। নাম থেকেই বোঝা যায়, এটি ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবর (১৫২৬-৩০)-এর স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ, যা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে তিনি প্রণয়ন করেন। *বাবুরনামায়* এ-উপমহাদেশের প্রাকৃতিক বিবরণ, ভূমিগঠন, মৃত্তিকা, জীবজন্তু, জলবায়ু, স্থাপত্য, সমাজ, সংস্কৃতি ও অধিবাসীদের জীবনপ্রণালি ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। শুধু মোগলযুগেই নয়, বরং সমগ্র মধ্যকালীন ভারতে *বাবুরনামার* চেয়েও সুবিপুল ও তথ্যবহুল, প্রথম প্রকৃত গেজেটিয়ার জাতীয়গ্রন্থ, যেটি ক্ষমতাসীন সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল, সেটি হলো সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫)-এর রাজত্বকালে, তাঁর রাজস্বমন্ত্রী ও ঐতিহাসিক আল্লামা আবুল ফজলের *আইন-ই-আকবরি* (*The Ain-I-Akbari*, Vols I & II, Trans. Colonel H. S. Jarrett & annotated by Sir Jadunath Sarkar)। গ্রন্থটিতে তৎকালীন শাসনকার্য সম্পর্কিত বিষয়াবলি বর্ণিত হলেও সমসাময়িক ভারতীয় সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজস্বনীতি ও ব্যবস্থা, মোগল সুবা বা প্রদেশগুলো ভূ-প্রকৃতি, অধিবাসীদের জীবন জীবিকার উল্লেখযোগ্য তথ্য-পরিসংখ্যানও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

বাংলা ভূখণ্ডে গেজেটিয়ার প্রণয়নের প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে গেলে ইতিহাসের দিকে একটু না তাকালেই নয়। বস্তুত ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের পর বাংলা, বিহার ও ওড়িশা এ-তিন মোগল সুবার শাসনক্ষমতা পরোক্ষভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে চলে যায়। ১৭৬৫ সালে তৎকালীন মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহআলমের কাছ থেকে বার্ষিক ৫৬ লাখ টাকা সেলামির বিনিময়ে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ দিওয়ানি অধিগ্রহণ তথা রাজস্বসংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা পায়। ফলে শাসন ও রাজস্ব আদায়সংক্রান্ত উভয় ক্ষমতার তারা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণকারী হয়ে পড়ে। শুরু হয় মুর্শিদাবাদের তখনকার নবাবকে শিখণ্ডী রেখে ক্লাইভের নেতৃত্বে কোম্পানির দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা। এরই সূত্রে তারা দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনা ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনার নামে শুরু করে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তবে চরম অনভিজ্ঞতা, সীমাহীন দুর্নীতি এবং অর্থ লুটপাট ও স্বদেশে পাচার ইত্যাদি নানা কারণে এ-সব ব্যবস্থা উপর্যুপরি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে ইংরেজরা এদেশে আজকের যুগের বহুলপরিচিত ‘জেলা প্রশাসন’ ব্যবস্থার প্রবর্তন করে, ‘কালেক্টর’ ছিল যার প্রশাসনিক প্রধান, বলা যায় সর্বেসর্বা। প্রসঙ্গত, হ্যারি ভেরেলস্ট (১৭৬৭-৬৯)-এর যুগে জেলায় জেলায় নিযুক্ত ‘সুপ্রাভাইজর (Supravisor)’ বা ‘সুপারভাইজর’ (Supervisor) পদবির পরিবর্তন করে হেস্টিংসের শাসনকালে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মে ‘কালেক্টর’ (Collector) পদবি প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে কালেক্টরশিপ (Collectorship) চালু হয়েছিল; যার বিবর্তিত রূপ আজকের জেলা প্রশাসকের অফিস। এ-সময় জেলার (তখন জেলাগুলোর আয়তন ছিল সুবিশাল) অধিক্ষেত্রের ভূ-প্রকৃতি, ইতিহাস, স্থানীয়দের জীবন জীবিকা, সমাজব্যবস্থা, প্রচলিত শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, জনস্বাস্থ্য এবং সর্বোপরি ভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি সম্পর্কে তাদের বিশেষ কোনো জ্ঞান ছিল না। কাজেই সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে প্রশাসন পরিচালনার স্বার্থে তারা উল্লিখিত বিষয়ে বিশদ অনুসন্ধানক্রমে অর্থাৎ প্রতিটি জেলার সুবিপুল তথ্যপঞ্জি সংকলিত করে গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ‘সুপ্রাভাইজর’ বা ‘সুপারভাইজর’দের নিয়োগের অন্যতম উদ্দেশ্যও ছিল তাদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (‘summary history of the ‘province’ assigned to his charge’), বড়ো বড়ো তথা অভিজাত পরিবারগুলোর বংশীয় বিবরণ, তাদের অধিকার-সুবিধাদি, প্রথা, ভূমির উৎপন্ন শস্য ও সক্ষমতা, রাজস্ব, সেস, আবওয়াব, এককথায় রায়ত কর্তৃক রাষ্ট্র, জমিদার ও কালেক্টরকে দেয় কর প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তৈরি করে কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করা। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, প্রায় প্রথম থেকেই ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্থানীয় নীতিনির্ধারকগণ গেজেটিয়ারের ন্যায় এক ধরনের ‘exhaustive report’ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। পরবর্তীকালে সে-অনুযায়ী কোম্পানির স্বদেশীয় (মূলত ইংল্যান্ড ও ইউরোপের অপরাপর দেশের) কর্মকর্তাগণ এ-

জাতীয় জেলা গেজেটিয়ার রচনা শুরু করেছিলেন। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যেটি তা হলো, এ-সব গেজেটিয়ার-প্রণেতা বা রচয়িতাগণের প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন ভারতীয় সিভিল সার্ভিস (আইসিএস) ক্যাডারভুক্ত জেলাস্তরের কর্মকর্তা, যথা- কালেক্টর, সুপারিনটেন্ডেন্ট ইত্যাদি পদবিধারী।

অবিভক্ত বা বৃহত্তর বাংলার (আসামসহ) প্রতিটি একক (কখনও কখনও দ্বৈত) জেলার নামোল্লেখ করে মোট ৩টি সিরিজে বা ক্যাটিগরিতে এ-সব জেলা গেজেটিয়ার বিগত শতকের গোড়া থেকে নিয়ে দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের মধ্যেই প্রণীত ও প্রকাশিত হয়েছিল। সিরিজগুলো হলো: ১. Bengal District Gazetteers; ২. Eastern Bengal District Gazetteers এবং ৩. Assam District Gazetteers (১০ খণ্ড)। এ-সময় Imperial Gazetteers of India নামেও মোট ২৬-খণ্ডে (আঞ্চলিক বা স্থানীয় মিলিয়ে সর্বমোট ১২৮টি) গেজেটিয়ার প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেইসঙ্গে ছিল এর Provincial Series (বাংলার ক্ষেত্রে ৩-খণ্ডে)। তবে এগুলোরও বহু আগে থেকে গেজেটিয়ারের অনুরূপ একাধিক জেলার সুবিস্তৃত তথ্যবহুল গ্রন্থ বিভিন্ন ইংরেজ বা ইউরোপীয় সিভিলিয়ানদের দ্বারা রচিত হয়, যার কোনো কোনোটির ছিল একাধিক খণ্ড এবং এগুলোর অধিকাংশই সরকারি মুদ্রণালয়ে (কিছু খোদ গ্রেট ব্রিটেনে ও বেসরকারি মুদ্রণালয়ে) মুদ্রিত হয়েছিল। এর মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো ১৮৩৩ সালে Calcutta: Bapist Mission Press থেকে প্রকাশিত ফ্রান্সিস বুকানন-হ্যামিলটন (Francis-Buchanan Hamilton-এঁর নামটি অন্যভাবেও লেখা হয়)-এর A *Geographical,Statistical and Historical Description of the District, or Zila of Dinajpur in the Province, or Soubah of Bengal (পরে* Robert Montogomery Martin-এর সম্পাদনায় ১৮৩৮ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত *The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India শীর্ষক* সিরিজে বা খণ্ডগুলোতে অন্তর্ভুক্ত); ঢাকার এককালীন সিভিল সার্জন James Taylor-এর ১৮৪০ সালে প্রকাশিত *A Sketch of theTopography & Statistics of Dacca*; ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টর A. L. (Arthur Llyod) Clay-এর *Principal Heads of the History and Statistics of the Dacca Division* (১৮৬৭), রংপুরের ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টর E. G. Glazier-এর *A Report on the District of Rungpore* (১৮৭৩, ১৮৭৬), যশোহরের ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টর James Westland-এর *A Report on the District of Jessore: Its Antiquities, Its History, and Its Commerce* (১৮৭১, ১৮৭৪; এতে অবশ্য বর্তমান খুলনা জেলার তথ্য অতি সামান্য), H (Henry) Beveridge-এর *The District of Bakarganj: Its History and Statistics* (১৮৭৬) প্রভৃতি অন্যতম। এছাড়া উনিশ শতকের শেষদিকে (১৮৭৫-৭৭) স্বনামধন্য উইলিয়ম উইলসন হান্টার (William Wilson Hunter, 1840-1900)-এর

সম্পাদনায় প্রকাশিত *A Statistical Account of Bengal* (২০ খণ্ড) সিরিজগ্রন্থ তো গবেষক ও সুধীমহলের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। আজও এগুলো আকরগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত ও ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

ভারত তথা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে জেলা গেজেটিয়ার নির্ভরযোগ্য ও মুখ্য সূত্র হিসেবে বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। আইসিএস বা ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের স্কলার সদস্যদের হাতেই শুরুতে এগুলো রচিত হয়েছিল। স্মর্তব্য, জেলাভিত্তিক পূর্বোক্ত তিন সিরিজের গেজেটিয়ার প্রণয়নের কাজ শুরু হলে যে-সব বিশিষ্ট ইংরেজ ও ইউরোপীয় সিভিলিয়ান গেজেটিয়ার রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হলেন L. S. S. (Lewis Sidney Steward) O'Malley, যিনি একাই বাংলা ও বিহার মিলিয়ে কমবেশি ৮টি গেজেটিয়ার রচনার কৃতিত্বের অধিকারী। অন্যদের মধ্যে রয়েছেন, যেমন-B. C. (Basil Copleston) Allen (ঢাকা, ১৯১২), F. A. (Frederick Alexander) Sachse (ময়মনসিংহ, ১৯১৭), J. E. (John Edward) Webster (ত্রিপুরা বা বর্তমান কুমিল্লা, ১৯১০ এবং নোয়াখালী, ১৯১১), R. H. Sneyd Hutchinson (পার্বত্য চট্টগ্রাম, ১৯০৯), J. C. Jack (বাকেরগঞ্জ, ১৯১৮), J. N. Gupta (বগুড়া, ১৯১০) প্রমুখ।

বাংলাদেশে সাবেক পূর্বপাকিস্তান আমলে ১৯৬১ সালে বিদ্যমান গেজেটিয়ারগুলো হাল-নাগাদকরণ, সংশোধন ও পুনর্লিখনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ-সময় মোট ১৬টি জেলার গেজেটিয়ার প্রকাশিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত, ১৯৬৩ সালে গেজেটিয়ার রচনা ও প্রকাশনার জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানরূপে জেলা গেজেটিয়ার অফিস বা কার্যালয় স্থাপিত হয়। গেজেটিয়ারের চূড়ান্ত খসড়া (Final Draft) অনুমোদনের জন্য তখন একটি উপদেষ্টা পরিষদও গঠিত হয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম 'জেলা গেজেটিয়ার অফিস বা কার্যালয়' তৎকালীন সংস্থাপন মন্ত্রণালয় (বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়)-এর অধীন ন্যস্ত করা হয়। কার্যালয়টি ১ জুলাই ১৯৯৮ তারিখ থেকে অবলুপ্ত ঘোষিত হয় এবং জেলার গেজেটিয়ার প্রণয়ন-প্রকাশনার সব দায়িত্ব পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। অবলুপ্তির পূর্বে জেলা গেজেটিয়ার কার্যালয় ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় নব কলেবরে বেশ কয়েকটি সংশোধিত ও বর্ধিত আকারে গেজেটিয়ার প্রকাশ করে, যার শেষটি ছিল খুলনা জেলা গেজেটিয়ার (প্রকাশকাল ১৯৯৬)।

আগেই বলা হয়েছে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ১ জুলাই ১৯৯৮ থেকে জেলা গেজেটিয়ার প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করছে। এই বিভাগের প্রাক্তন সচিব ও বর্তমান মুখ্য সচিব জনাব মো. নজিবুর রহমান-এর উদ্যোগে পাইলট প্রকল্প হিসেবে ২০১৩ সালে দেশের তৎকালীন ৭টি বিভাগ (বর্তমানে দেশে বিভাগসংখ্যা ৮টি) থেকে একটি করে

জেলা নিয়ে অর্থাৎ ৭টি জেলা, যথা- ময়মনসিংহ, বগুড়া, দিনাজপুর, খুলনা, সিলেট, বরিশাল ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার গেজেটিয়ার প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। এ-জন্য 'জেলা গেজেটিয়ার প্রণয়ন কর্মসূচি' শীর্ষক কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়।

এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৯৮৩-৮৪ সালের প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস পরবর্তী খুলনা জেলাকে কেন্দ্র করে বর্তমান গেজেটিয়ারটি প্রণীত হয়েছে। আগের ন্যায় এতে বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার বিবরণ অন্তর্ভুক্ত নয়, কেননা সংশ্লিষ্ট দুটির জন্যও আলাদা গেজেটিয়ার প্রণয়ন করা হবে। তবে এটাও ঠিক বৃহত্তর জেলা হিসেবে খুলনার আলোচনায় উক্ত জেলাদ্বয়ের বিষয়ও চলে এসেছে। উল্লেখ্য, বৃহত্তর খুলনা জেলার আগের অর্থাৎ ইংরেজ আমলের গেজেটিয়ার এককভাবে রচনা করেছিলেন এলএসএস. ও মালি এবং প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৪ সালে, সরকারি মুদ্রণালয় Bengal Secretariat Book Depot থেকে। পরবর্তীকালে ১৯৫৬ সাল-ব্যাচের সিএসপি কে. জি. এম. লতিফুল বারীর সম্পাদনায় ১৯78 সালে খুলনা জেলা গেজেটিয়ার (Bangladesh District Gazetteers: Khulna) প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা ভাষায় খুলনা জেলা গেজেটিয়ার প্রকাশিত হয় সিএসপি কর্মকর্তা প্রাক্তন সচিব ও বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক আবদুশ শাকুরের সম্পাদনায় ১৯৯৬ সালে, এটির পূর্ণনাম- 'বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার: বৃহত্তর খুলনা (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা)'।

বিশ্বব্যাপী তথ্য-প্রযুক্তির বিপ্লব দিয়ে সূচনা একবিংশ শতাব্দীর। বাংলাদেশেও এর ঢেউ আছড়ে পড়েছে প্রবলভাবে। বিশেষভাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে। দেশের অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা, যোগাযোগ, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিক্ষা ও শিল্পসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের অভাবনীয় উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। তাছাড়া দেশের ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, পরিবেশ, জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও লক্ষণীয় অগ্রগতি ও পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনে বর্তমান সরকারের অর্জন অসামান্য। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। ২০২১ সালের বাংলাদেশ হবে মধ্যম আয়ের দেশ। বিশ্বায়নের সূত্রে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া, সহযোগিতা ও অংশীদারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে একটি সুনির্দিষ্ট কালপর্বে জেলাপর্যায়ে ঘটমান এ-সব বিষয় অতীতের ধারাবাহিকতায় গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হওয়া নিতান্তই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। জেলা গেজেটিয়ার এক্ষেত্রে তথ্য-ভাণ্ডার হিসেবে অনন্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

বৃহত্তর খুলনা জেলার যাত্রা শুরু ১ জুন, ১৮৮২ সালে (দ্র. *The Calcutta Gazette*, April 19 & 26, 1882)। তৎকালীন যশোহর জেলার বিদ্যমান

মহকুমা 'খুলনা' ও 'বাগেরহাট' এবং ভারতের বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যভুক্ত চব্বিশ পরগনা জেলার 'সাতক্ষীরা' মহকুমা নিয়ে গঠিত হয়েছিল জেলাটি। পাকিস্তান আমলে চালনা সমুদ্রবন্দর স্থাপিত হওয়ায় খুলনা অর্থনৈতিকভাবে গরুত্বপূর্ণ জেলায় পরিণত হয়েছিল। ১৯৮৪ সালে সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট মহকুমা স্বতন্ত্র জেলায় উন্নীত হলে বৃহত্তর খুলনার অবশিষ্ট অংশ নিয়ে বর্তমান খুলনা জেলা পুনর্বিন্যস্ত হয়। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন 'সুন্দরবন', ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব-ঐতিহ্য (World Heritage)। পশ্চিমবঙ্গেও এর সীমানা বিস্তৃত, তবে মূলত 'সুন্দরবনে'র বিশ্ব-ঐতিহ্যের অংশ বাংলাদেশেই এবং বৃহত্তর খুলনা জেলার অধিগত। এছাড়া অসংখ্য মৎস্যখামারে (এ-অঞ্চলে মূলত 'ঘের' নামে পরিচিত) দেশের অন্যতম রপ্তানিপণ্য চিংড়ি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্যও খুলনা বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর মংলার পণ্য পরিবহণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণেও খুলনার অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে। উনিশ শতকের ষাটের দশকে খুলনায় বেশ বড় বড় কতকগুলো শিল্পকারখানা স্থাপিত হওয়ায় দেশে খুলনা তৃতীয় শিল্পসমৃদ্ধ জেলায় পরিণত হয়েছিল। ব্রিটিশ যুগের বাংলায় খুলনা পশ্চাৎপদ জনপদ হিসেবে পরিচিতি পেলেও বিগত শতকের ছয়ের দশক থেকে খুলনা প্রশাসনিক 'বিভাগ' (Division)-এর মর্যাদায় উন্নীত (৩১/১০/১৯৬০) হওয়ার পর থেকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যে একটি অগ্রসরমান জনপদ রূপে বিবেচিত হয়ে আসছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারের উদ্যোগে পদ্মা নদীর উপরে নির্মিত দেশের সর্ববৃহৎ ৬.১৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের পদ্মা সেতু নির্মাণকাজ শেষ হলে তা খুলনার-ই শুধু নয়, বরং গোটা দক্ষিণবঙ্গের উন্নয়নের প্রবেশদ্বার হিসেবে যেমন বিবেচিত হবে, তেমনি একইসঙ্গে বাংলাদেশের অর্থায়নে প্রকল্পগ্রহণ ও উন্নয়ন-সক্ষমতার নবদিগন্তও উন্মোচিত করবে। বস্তুতপক্ষে খুলনার এ-সব বিষয়ে হালনাগাদ তথ্যাদি বিশদ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে এ গেজেটিয়ারে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছাস, 'আইলা', সুনামি ইত্যাদির মতো উপর্যুপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত বৃহত্তর খুলনা জনপদের সুরক্ষায় গৃহীত সরকারি নানা উদ্যোগ, কার্যক্রম ও ভবিষ্যত-করণীয় সম্পর্কেও প্রাসঙ্গিক আলোকপাত রয়েছে।

লক্ষণীয়, বর্তমান গেজেটিয়ারেই প্রথম নতুন কয়েকটি অধ্যায়, যথা- ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ, খাদ্য ও পুষ্টি, দুর্যোগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পুনর্বাসন, স্থানান্তর, অভিবাসন ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, বিশেষ পণ্য, জীবন ও জীবিকা, খেলাধুলা, গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা এবং সমস্যা ও সম্ভাবনা ইত্যাদি সংযোজন করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, এ সমস্ত বিষয় আগের গেজেটিয়ারগুলোতে অন্তর্ভুক্ত ছিল না বা হয়নি। বলতে গেলে একুশ শতকের চাহিদার আলোকে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রায় সবরকম তথ্যই এতে সন্নিবেশনের চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষ

করে ১৯৫২-র ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে খুলনাবাসীর অংশগ্রহণ এবং তাঁদের গৌরবময় ও বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অর্জনগুলো এ গেজেটিয়ারে বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এতে করে আগামী প্রজন্ম খুলনায় সংঘটিত মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলির প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করবে বলে আশা করা যায়।

আধুনিক উন্নয়ন প্রশাসনের মূলভিত্তি হলো সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও তার সফল বাস্তবায়ন। সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়নে জেলা গেজেটিয়ার অতীত অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধ তথ্যভাণ্ডার হিসেবে কাজ করবে।

নতুন কলেবরে জেলা গেজেটিয়ার প্রণয়নের উদ্যোগ পুনঃগ্রহণ, এই কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন ও বাস্তবায়নে এবং সার্বিক দিকনির্দেশনা ও সমন্বয় প্রভৃতি কাজে বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন প্রাক্তন সচিব ও বর্তমান মুখ্য সচিব জনাব মো. নজিবুর রহমান, প্রাক্তন সচিব বেগম কানিজ ফাতেমা এনডিসি এবং কর্মসূচির যুগ্ম সম্পাদক, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব জনাব কে এম মোজাম্মেল হক। তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

গেজেটিয়ার প্রণয়ন-প্রকাশনা সংক্রান্ত কর্মসূচির পরামর্শক ছিলেন সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব ড. মো. হাফিজুর রহমান ভূঞা। গেজেটিয়ারের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার জন্য তিনি নিরলস পরিশ্রম করেছেন। এ-জন্য তাঁকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ। এই কর্মসূচির পরিচালক, যুগ্মসচিব মো. তরিকুল আলম, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিচালক ও যুগ্মসচিব জনাব জাফর আহাম্মদ খান এবং পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, যারা গেজেটিয়ার প্রকাশনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন, তাদেরও জানাই ধন্যবাদ। মাঠপর্যায়ে খুলনা জেলার প্রাক্তন জেলা প্রশাসক জনাব মো. আনিস মাহমুদ এবং তাঁর পূর্বসূরী যারা একাজে অকুণ্ঠ সহায়তা করেছেন, জেলার এ-সংক্রান্ত সম্পাদনা পরিষদের সদস্য এবং অধ্যায় লেখকগণ ও পাণ্ডুলিপির সৌকর্যবৃদ্ধিতে সহায়তাকারী সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ।

বলাবাহুল্য, গেজেটিয়ার প্রণয়ন সব সময়ই একটি দুরূহ ও পরিশ্রমসাধ্য কাজ। এ কাজে কেন্দ্রীয় সম্পাদনা পরিষদের সদস্যগণ সম্পাদনা কাজে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ গেজেটিয়ারের পান্ডুলিপি পর্যালোচনা করে তাঁদের সুচিন্তিত মতামতসহ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশোধনের প্রস্তাব করেছেন। এ-জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সচিবসহ এসব কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এছাড়া সম্পাদনা উপকমিটির সদস্য তথা বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ বিশেষ করে বীর মুক্তিযোদ্ধা লে. কর্নেল কাজী সাজ্জাদ আলী জহির এবং সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও গবেষক কাবেদুল ইসলাম পাণ্ডুলিপির তথ্য-উপাত্ত যাচাই ও

সম্পাদনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন। জনাব সিরাজুল এহসান পান্ডুলিপির প্রুফ দেখা ও পরিমার্জন করেছেন। এ-জন্য তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

মাঠপর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত, পূর্বতন প্রকাশনা ও গ্রন্থাদি, সরকারি দলিলপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক গেজেটিয়ার প্রণয়ন করা হয়েছে। আমরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছি গেজেটিয়ারকে সর্বাঙ্গ সুন্দর ও পরিস্রুত অবয়ব দেওয়ার জন্য। তারপরও এ ধরনের কাজের প্রকৃতিগত কারণে অপূর্ণতা থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কোনো ত্রুটি বা ভুল দৃষ্টিগোচর হলে প্রিয় পাঠক সদয় হয়ে আমাদের জানাবেন।

পরিশেষে উল্লেখ্য, মূলত দেশের অতীত ও পরিবর্তমান আঞ্চলিক ইতিহাসের তথা একটি নির্দিষ্ট জেলার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জনসাধারণ ও সচেতন নাগরিকবৃন্দ ও নতুন প্রজন্মকে অবহিত করা গেজেটিয়ার রচনার মূল উদ্দেশ্য। এটি ইতিহাস গ্রন্থ নয় কিন্তু ইতিহাসের অনেক তথ্য-উপাত্ত এখানে রয়েছে। রয়েছে একটি জেলার অতীত ও বর্তমান ঘটনাবলি ও সার্বিক অবস্থার বিবরণ। আমি প্রত্যাশা করি এ গেজেটিয়ার লেখক, গবেষক, রাজনীতিবিদ, নীতিনির্ধারক এবং সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র হিসেবে বিবেচিত হবে। পাঠক, সুধী জনসাধারণ ও সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাগণ এটি পাঠে তাঁরা যদি সামান্যও উপকৃত হন, তবে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের এ প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
প্রধান সম্পাদক

অধ্যায় সূচি

	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়-১	ভূপ্রকৃতি ও পরিবেশ	১
অধ্যায়-২	ইতিহাস	৩১
অধ্যায়-৩	অধিবাসী, সমাজ ও সংস্কৃতি	৫১
অধ্যায়-৪	জনপ্রশাসন	৭৩
অধ্যায়-৫	ভূমিরাজস্ব ও ব্যবস্থাপনা	৯৩
অধ্যায়-৬	কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	১১৭
অধ্যায়-৭	অর্থনৈতিক অবস্থা	১৪৫
অধ্যায়-৮	যোগাযোগ ব্যবস্থা	১৭৫
অধ্যায়-৯	শিল্প ও ব্যাবসাবাণিজ্য	১৮৯
অধ্যায়-১০	স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ও জনস্বাস্থ্য	২২৭
অধ্যায়-১১	শিক্ষা	২৫৫
অধ্যায়-১২	ভাষা ও সাহিত্য	২৮১
অধ্যায়-১৩	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	৩১৭
অধ্যায়-১৪	ঐতিহাসিক স্থান ও এলাকা এবং স্থাপত্য	৩৩১
অধ্যায়-১৫	ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ	৩৪৫
অধ্যায়-১৬	খাদ্য ও পুষ্টি	৩৭৩
অধ্যায়-১৭	দুর্যোগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পুনর্বাসন	৩৮৩
অধ্যায়-১৮	অভিবাসন ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান	৪০৩
অধ্যায়-১৯	বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৪০৯
অধ্যায়-২০	বিশেষ পণ্য	৪১৫
অধ্যায়-২১	প্রাকৃতিক সম্পদ	৪১৯
অধ্যায়-২২	জীবন ও জীবিকা	৪৪১
অধ্যায়-২৩	খেলাধুলা	৪৫৯
অধ্যায়-২৪	গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা	৪৬৯
অধ্যায়-২৫	সমস্যা ও সম্ভাবনা	৪৮৯

সূচিপত্র

অধ্যায়-১: ভূপ্রকৃতি ও পরিবেশ পৃষ্ঠা ১-৩০

অবস্থান-১, সীমা-১, আয়তন-১, নামকরণ-১, জনসংখ্যা-২, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য-৪, ভূপ্রকৃতি-৮, মৃত্তিকা-১১, নদনদী-১১, আঠারবাঁকী-১২, আর্পানগাসিয়া-১২, কপোতাক্ষ-১২, কয়রা-১২, খোলপেটুয়া-১২, পুরাতন পশুর-১২, ভদ্রা-১৩, ভৈরব-১৩, রূপসা-১৪, শিবসা-১৪, বিল ও জলাভূমি-১৪, আবহাওয়া ও জলবায়ু-১৫, বৃষ্টিপাত-১৫, তাপমাত্রা-১৬, আর্দ্রতা-১৭, বায়ুপ্রবাহ-১৮, ঋতুকাল-১৮, পরিবেশ-২০, সুন্দরবন-২০, ইকোলজিক্যাল ক্রিটিক্যাল এলাকা-২১, জীববৈচিত্র্য-২২, সুন্দরবনের উদ্ভিদ-২২, জীবজন্তু-২৩, সরীসৃপ-২৪, কচ্ছপ ও ব্যাঙ-২৪, পাখি ও কীটপতঙ্গ-২৪, রয়েল বেঙ্গল টাইগার-২৪, হরিণ-২৭, কুমির-২৮, বানর-২৯, বন্য শূকর-২৯, হাঙর-২৯, জলবায়ু পরিবর্তন-২৯।

অধ্যায়-২: ইতিহাস পৃষ্ঠা ৩১-৫০

নন্দ, মৌর্য ও গুপ্তযুগ-৩১, খড়গ রাজবংশ-৩২, যশোবর্মা, পাল ও চন্দ্র বংশ-৩৩, বর্ম বংশ-৩৪, সেনযুগ-৩৫, বখতিয়ার খিলজির নদীয়া জয়-৩৫, বারো ভূঁইয়া, মোগল আমল-৩৭, ইংরেজ আমল-৪০, নীল চাষ-৪২, ফরায়েজি আন্দোলন-৪৩, সিপাহী বিদ্রোহ-৪৪, বঙ্গভঙ্গ-৪৪, মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা-৪৫, বঙ্গভঙ্গ রদ-৪৬, খেলাফত আন্দোলন-৪৬, খুলনা মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন-৪৭, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা-৪৭, পাকিস্তান আমল-৪৮।

অধ্যায়-৩: অধিবাসী, সমাজ ও নারীর ক্ষমতায়ন পৃষ্ঠা ৫১-৭২

নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য-৫১, জনসংখ্যা-৫৩, জনসংখ্যার গঠন-৫৫, ধর্ম ও সম্প্রদায়-৫৫, মেলা-৫৬, যৌথ পরিবার প্রথা-৫৮, বাসগৃহ-৫৮, বস্তিবাসী-৫৮, বিবাহ-৬০, পোশাক-৬১, খাদ্যাভ্যাস-৬১, পুরাকীর্তি-৬১, শেখ হাসিনা জাদুঘর-৬২, সাধারণ পাঠাগার-৬২, বিনোদন-৬১, খেলাধুলা-৬৩, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-৬৩, আকাশ সংস্কৃতি-৬৩, বিনোদনের অন্যান্য মাধ্যম-৬৪, নারীর ক্ষমতায়ন-৬৫, জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ শীর্ষক কর্মসূচি-৭০, কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল-৭১, মহিলা সহায়তা কর্মসূচি-৭১।

অধ্যায়-৪: জনপ্রশাসন পৃষ্ঠা ৭৩-৯২

প্রাচীন ও মধ্যযুগ-৭৩, ব্রিটিশ শাসন-৭৩, জেলা প্রশাসন-৭৪, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়-৭৫, ডি.আই.জি, খুলনা রেঞ্জ কার্যালয়-৭৬, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ-৭৭, পুলিশ সুপার কার্যালয়-৭৭, খুলনা জেলা কারাগার-৭৮, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয়-৭৯, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড-৮০, সমবায় অধিদপ্তর-৮০, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-৮১, প্রাণিসম্পদ বিভাগ-৮১, জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, খুলনা-৮১, হাঁস প্রজনন খামার-৮২,

পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ-৮২, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা-৮৩, জেলা শিক্ষা অফিস-৮৪, খুলনা সমাজসেবা অধিদপ্তর-৮৪, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ-৮৯, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, আঞ্চলিক কার্যালয়-৯০, সিভিল সার্জন, খুলনা অফিস-৯০, সুন্দরবন পশ্চিম বনবিভাগ-৯১, আঞ্চলিক কার্যালয়, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর-৯১, জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস-৯২।

অধ্যায়-৫: ভুমি রাজস্ব ও ব্যবস্থাপনা পৃষ্ঠা ৯৩-১১৬

মোগল ভুমি বন্দোবস্ত-৯৩, মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্ত-৯৪, ব্রিটিশ রাজস্ব ব্যবস্থা-৯৫, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-৯৬, সুন্দরবনের রাজস্ব ইতিহাস-৯৭, সুন্দরবনের সীমারেখা-৯৭, ১৮৫৩ সালের আইন-১০১, বৃহৎ পুঁজিপতি আইন-১০১, ক্ষুদ্র পুঁজিপতি আইন-১০২, খুলনা জেলার জমিদারি-১০৩, চাঁচড়া জমিদারি-১০৪, সৈয়দপুর জমিদারি-১০৫, তালুক, পত্তনি, ইজারা ও গাঁতি-১০৫, ওসাত তালুক-১০৬, পত্তনি তালুক-১০৭, দর-পত্তনি ও সে-পত্তনি-১০৭, নিস্করভোগী, পাইকান ও ইনাম-১০৮, অন্যান্য নিস্কর মধ্যস্বত্ব-১০৮, খোদকাস্ত ও পাইকাস্ত রায়ত বা প্রজা-১০৮, থাক ও রাজস্ব জরিপ-১০৯, রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০-১০৯, ভূমি উন্নয়ন কর-১১০, খুলনা জেলার খাসজমি ব্যবস্থাপনা-১১৩, অর্পিত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা-১১৫।

অধ্যায়-৬, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ পৃষ্ঠা-১১৭-১৪৪

জেলায় ফসলাদি-১১৮, (ক) শস্য বিন্যাস-১১৮, (খ) সেচ ব্যবস্থা-১২০, (গ) ফসলের উৎপাদন -১২১, (ঘ) মাঠ ফসল: দানা ফসল-১২১, অন্যান্য ফসল-১২১, রবি মৌসুম-১২১, খরিপ ১ -১২১, খরিপ ২ -১২১, (ঙ) উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল আম-১২২, কলা ও পেঁপে-১২২, তরমুজ-১২২, সফেদা-১২২, নারিকেল ও সুপারি-১২২, উদ্ভিদ সংরক্ষণ বা পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা-১২৩, সমস্যা ও সম্ভাবনা-১২৩, খুলনা জেলার পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা-১৩৬, (ক) জমির জলাবদ্ধতা-১৩৬, জলাবদ্ধতার কারণ-১৩৬, সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ-১৩৬, ২০০৯-১৪ সালে কৃষি ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যসমূহ-১৩৭, মৎস্যসম্পদ-১৩৭, খুলনা জেলার মাছের উৎস-১৩৮, খুলনার প্রাকৃতিক মাছ-১৩৮, বিএসকেবি বিল-১৩৯, খুলনার বাণিজ্যিক মাছচাষ-১৪০, জেলা কৃত্রিম প্রজননকেন্দ্র-১৪১, আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার-১৪২, প্রাণিসম্পদ দপ্তরসমূহ-১৪২, প্রাণিসম্পদ বিভাগ কর্তৃক মাঠপর্যায় পর্যন্ত পরিচালিত কার্যক্রম-১৪৩।

অধ্যায়-৭: অর্থনৈতিক অবস্থা পৃষ্ঠা ১৪৫-১৭৪

জনসংখ্যা-১৫১, কৃষিখাত-১৫৩, সেচের আওতায় জমির পরিমাণ-১৫৪, পশুপালন খাত-১৫৮, খনিজ সম্পদ-১৫৮, শিল্প খাত-১৫৯, মৎস্যসম্পদ-১৬১, বনজসম্পদ-১৬৫, ব্যাবসাবাণিজ্য-১৬৬, বিভিন্ন সময়ে চালের বাজারমূল্য-১৬৭, ১০ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রি-১৬৯, যোগাযোগ ও ব্যবসা

কেন্দ্র-১৬৯, সেবা ও গণযোগাযোগ-১৭০, নির্মাণ সামগ্রী-১৭০, বিভিন্ন শ্রমের মজুরি-১৭১, স্বাস্থ্যসেবা-১৭১, কমিউনিটি ক্লিনিক-১৭২, শিক্ষা-১৭২।

অধ্যায়-৮: যোগাযোগ ব্যবস্থা পৃষ্ঠা ১৭৫-১৮৮

সড়ক যোগাযোগ-১৭৫, সড়ক বিভাগ-১৭৬, এলজিইডি-১৭৯, পদ্মা সেতু প্রকল্প ও চার লেন রাস্তা-১৮৪, নৌ যোগাযোগ-১৮৫, রেল যোগাযোগ-১৮৬, আকাশপথ-১৮৭।

অধ্যায়-৯: শিল্প ও ব্যাবসাবাণিজ্য পৃষ্ঠা ১৮৯-২২৬

শিল্প-১৮৯, লবণশিল্প-১৮৯, খেজুর গুড় উৎপাদন-১৯২, নীল অন্যান্য শিল্প-১৯২, বৃহদায়তন শিল্প-১৯২, পাটশিল্প: রাষ্ট্রায়ত্ত পাটশিল্প-পিপলস জুট মিলস্ লি.-১৯২, ক্রিসেন্ট জুট মিলস্ কো. লি.-১৯৩, দৌলতপুর জুট মিলস্ লি.-১৯৪, প্লাটিনাম জুবিলি জুট মিলস্ লি.-১৯৫, স্টার জুট মিলস্ লি.-১৯৫, আলীম জুট মিলস লি.-১৯৫, ইস্টার্ন জুট মিলস্ লি.-১৯৬, ব্যক্তি মালিকানাধীন পাটকল: অ্যাজাক্স জুট মিলস্ লি.-১৯৬, আফিল জুট মিলস্ লি.-১৯৭, সোনালী জুট মিলস্ লি.-১৯৭, মহসিন জুট মিলস্ লি.-১৯৭, জুট ইয়ার্ন অ্যান্ড টোয়াইন মিলস্ লি.-১৯৭, জুট টেক্সটাইল মিলস্ লি.-১৯৮, শাহনেওয়াজ জুট মিলস্ লি.-১৯৮, খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি.-১৯৯, খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস্ লি.-২০০, খুলনা শিপইয়ার্ড লি.-২০১, বাংলাদেশ কেবল শিল্প লি.-২০২, দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরি লি.-২০২, কোরেশি স্টিল মিল লি.-২০৩, খুলনা টেক্সটাইল মিলস্ লি.-২০৩, ওষুধ শিল্প-২০৪, অন্যান্য মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প-২০৪, কুটিরশিল্প-২০৭, মৃৎশিল্প-২০৯, নকশিকাঁথা শিল্প-২০৯, অন্যান্য লোকশিল্প-২১০, খুলনা শিল্প নগরী-২১০, খুলনা জেলার ব্যাবসাবাণিজ্য-২১২, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়-২১২, বিভিন্ন ব্যবসা-২১৩, ব্যবসায়ীদের পুঁজির জোগান-২১৪, প্রাতিষ্ঠানিক উৎস-২১৪, অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস-২১৫, রিয়েল স্টেট ও টেন্টি ব্যবসা-২১৫ আমদানি রফতানি পণ্য-২১৬, সিনেমা হল-২১৬, হাটবাজার-২১৭, জেলার প্রধান প্রধান হাটবাজার-২১৮, হাটবাজারের যেসব পণ্য বেচাকেনা হয়-২২৩, মেলা-২২৪, গুদামঘর-২২৫।

অধ্যায়-১০: স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ও জনস্বাস্থ্য পৃষ্ঠা ২২৭-২৫৪

স্বাস্থ্য-২২৭, খুলনা জেনারেল হাসপাতাল-২২৮, বক্ষব্যাধি হাসপাতাল-২২৮, সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল-২২৯, পুলিশ হাসপাতাল-২২৯, কেন্দ্রীয় জেল হাসপাতাল-২৩০, কপিলমণি জেসি হাসপাতাল-২৩০, রেলওয়ে হাসপাতাল-২৩০, খুলনা শিশু হাসপাতাল-২৩০, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-২৩১, শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল-২৩১, বেসরকারি হাসপাতাল-২৩২, ডিসপেনসারি-২৩২, যৌনব্যাধি সংক্রান্ত ক্লিনিক-২৩৩, পল্লি স্বাস্থ্যকেন্দ্র-২৩৩, কমিউনিটি ক্লিনিক পরিসংখ্যান-২৩৪, পরিবার কল্যাণ-২৩৪, সামাজিক

উন্নয়ন কর্মসূচি-২৩৬, মেরী স্টোপস ক্লিনিকের কার্যক্রম-২৩৬, বিএভিএস-২৩৭, সূর্যের হাসি ক্লিনিক-পি কে এস-২৩৭, আরএইচ স্টেপ-২৩৮, এফপিএবি-২৩৯, খুলনা জেলার টিএফআর-২৪০, জনস্বাস্থ্য-২৪০, জন্ম-মৃত্যু পরিসংখ্যান-২৪১, ম্যালেরিয়া-২৪৪, কলেরা-২৪৫, গুটিবসন্ত-২৪৫, আমাশয় ও উদরাময়-২৪৫, কালাজ্বর-২৪৫, যক্ষ্মা-২৪৬, কুষ্ঠরোগ-২৪৬, ক্যানসার-২৪৬, চিকিৎসা ব্যবস্থা-২৪৭, মা ও শিশু স্বাস্থ্য চিত্র-২৪৮, আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ও অপারেশন-২৫০, স্বাস্থ্য শিক্ষা-২৫০, বিদ্যালয় স্বাস্থ্য প্রকল্প-২৫০, পয়ঃনিষ্কাশন-২৫১, নগর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা-২৫১, পল্লি এলাকায় পানি সরবরাহ-২৫২, খুলনা ওয়াসা-২৫৩।

অধ্যায়-১১: শিক্ষা পৃষ্ঠা ২৫৫-২৮০

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শিক্ষা ব্যবস্থা-২৫৫, ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা-২৫৫, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থী সংখ্যা-২৫৭, শিক্ষা সহায়ক কর্মসূচি-২৫৮, প্রাথমিক শিক্ষা-২৫৯, মিডল ইংলিশ এবং জুনিয়র হাইস্কুল-২৬৩, মহাবিদ্যালয়/ কলেজ-২৬৯, সরকারি বিএল কলেজ-২৭০, সরকারি মহিলা কলেজ-২৭১, আযম খান সরকারি বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়-২৭১, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-২৭৩, খুলনা সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট-২৭৩, খুলনা মেডিকেল কলেজ-২৭৪, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়-২৭৪, মাদরাসা শিক্ষা-২৭৪, শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়-২৭৭, প্রাইমারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-২৭৮, সিটি আইন মহাবিদ্যালয়-২৭৮, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-২৭৮, শারীরিক বিকলাঙ্গ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-২৭৯, ইংরেজি মাধ্যম স্কুল-২৭৯।

অধ্যায়-১২: ভাষা ও সাহিত্য পৃষ্ঠা ২৮১-৩১৬

খুলনার উপভাষা-২৮১, খুলনার লেখক-২৮৩, খুলনায় বসবাসরত অন্য জেলার লেখক-২৯২, ফোকলোর (লোক সাহিত্য)-৩০৮, দেশজ খেলার ছড়া-৩০৯, ধাঁধা ও হেঁয়ালি -৩১০, প্রবাদ ও প্রবচন-৩১২, শিশু ভুলানো ছড়া-৩১৫, শাশুড়ি-পুত্রবধূ সম্পর্ক বিষয়ক ছড়া-৩১৫, ঘুমপাড়ানি ছড়া-৩১৬।

অধ্যায়-১৩: স্থানীয় সরকার, পল্লিউন্নয়ন ও সমবায় পৃষ্ঠা ৩১৭-৩৩০

ব্রিটিশ আমল-৩১৭, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড গঠন-৩১৮, বুনিয়াদি গণতন্ত্র-৩১৮, ব্রিটিশ আমলের লোকাল বোর্ড-৩১৮, বুনিয়াদি গণতন্ত্র-৩১৯, খুলনা মিউনিসিপ্যালিটি-৩২২, খুলনা জেলা বোর্ড, ১৯৭২-৩২০, খুলনা মিউনিসিপ্যাল কমিটি-৩২২, খুলনা পৌরসভা-৩২২, খুলনা সিটি করপোরেশন-৩২২, থানা কাউন্সিল-৩২৩, থানা উন্নয়ন কমিটি-৩২৩, থানা পরিষদ-৩২৩, উপজেলা পরিষদ-৩২৪, ইউনিয়ন বোর্ড অ্যাক্ট, ১৯১৯-৩২৪, ইউনিয়ন কাউন্সিল-৩২৪, ইউনিয়ন পঞ্চায়েত-৩২৪, ইউনিয়ন পরিষদ-৩২৪, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়

কার্যক্রম-৩২৫, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প-৩২৫, প্রকল্পের বিশেষত্ব-৩২৭, সমবায় কার্যক্রম-৩২৮, সবার জন্য বিদ্যুৎ-৩৩০।

অধ্যায়-১৪: ঐতিহাসিকস্থান ও এলাকা এবং স্থাপত্য পৃষ্ঠা ৩৩১-৩৪৪

কয়রা উপজেলা-৩৩১, কাটানীপাড়া-৩৩১, খানজাহান আলী সেতু-৩৩১, খুলনা-৩৩১, খুলনা জাদুঘর-৩৩৩, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়-৩৩৩, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-৩৩০, গল্লামারী-৩৩৪, চাঁদখালী-৩৩৪, চালনা (মংলা)-৩৩৪, চুকনগর-৩৩৫, জেলা প্রশাসকের বাংলো-৩৩৫, জোড়া শিব মন্দির-৩৩৫, ডুমুরিয়া উপজেলা-৩৩৬, তেরখাদা উপজেলা-৩৩৬, দাকোপ উপজেলা-৩৩৬, দিঘলিয়া উপজেলা-৩৩৭, দক্ষিণ ডিহি-৩৩৭, দৌলতপুর-৩৩৭, নেহাল উদ্দিন ফকিরের মাজার-৩৩৮, পাইকগাছা উপজেলা-৩৫০, পায়গ্রাম-কসবা মসজিদের ধ্বংসাবশেষ-৩৩৮, পিসি রায়ের বাড়ি-৩৩৯, পিঠাভোগ-৩৩৯, প্রতাপাদিত্যের গড়-৩৪০, ফুলতলা উপজেলা-৩৪১, বটিয়াঘাটা উপজেলা-৩৪১, বাজুয়া-৩৪১, বাসুমঠ-৩৪১, বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিনের সমাধিসৌধ-৩৪২, ভবনাথ মল্লিক জোড়া বাংলা মন্দির-৩৪২, মসজিদকুর মসজিদ-৩৪২, রূপসা উপজেলা-৩৪২, শেখ আফজালের মাজার ও ঢিবি-৩৪৩, শিরোমণি-৩৪৩, সেনহাটি-৩৪৩।

অধ্যায়-১৫: ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পৃষ্ঠা ৩৪৫-৩৭২

বাংলা ভাষা আন্দোলন (১৯৪৮-১৯৫২)-৩৪৫, জিন্নাহ ও বাংলা ভাষা-৩৪৫, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও অমর একুশে-৩৪৫, ভাষা আন্দোলনে খুলনা-৩৪৭, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন থেকে ১৯৬৬ সালের ৬ দফা-৩৫০, ৬৯-এর গণআন্দোলন ও ৭০-এর নির্বাচন-৩৫০, মুক্তিযুদ্ধে খুলনা-৩৫৭।

অধ্যায়-১৬: খাদ্য ও পুষ্টি পৃষ্ঠা ৩৭৩-৩৮২

খাদ্যের উৎস-৩৭৩, খাদ্যাভ্যাস-৩৭৪, খুলনায় উৎপাদিত বন্য উদ্ভিদ ও শাকসবজি-৩৭৫, খুলনায় প্রাপ্ত খাদ্যের ধরন-৩৭৫, বিশেষ খাদ্য-৩৭৫, উৎসব অনুষ্ঠানের খাদ্যরীতি-৩৭৭, ঈদুলফিতর-৩৭৭, ঈদুজজোহা-৩৭৭, বাংলা নববর্ষ-৩৭৮, দুর্গাপূজা-৩৭৮, বড়দিন ও বৌদ্ধ পূর্ণিমা উৎসব-৩৭৮, ডালসমূহ-৩৭৮, রান্নায় মসলার ব্যবহার-৩৭৮, খুলনায় পুষ্টির বর্তমান অবস্থা-৩৭৯, শিশুকে খাদ্য খাওয়ানো এবং শিশুর যত্ন-৩৮০, পুষ্টি শিক্ষা ও পুষ্টি জ্ঞান-৩৮০, খুলনা শহরে পানি সরবরাহের চিত্র-৩৮১।

অধ্যায়-১৭: দুর্যোগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পুনর্বাসন পৃষ্ঠা ৩৮৩-৪০২

দুর্যোগ-৩৮৩, দুর্ভিক্ষ-৩৮৩, দুর্ভিক্ষ (১৭৬৯-৭০)-৩৮৩, দুর্ভিক্ষ (১৯৯৭)-৩৮৩, দুর্ভিক্ষ (১৯২১)-৩৮৩, দুর্ভিক্ষ (১৯৪৩)-৩৮৪, বন্যা-৩৮৪, বন্যা(১৮৭১)-৩৮৪, বন্যা(১৯৭০)-৩৮৪, বন্যা (১৯৭৮)-৩৮৪, বন্যা (১৯৮১)-

৩৮৪, বন্যা (১৯৮৭-৮৮)-৩৮৫, বন্যা (১৯৯৮)-৩৮৫, ঘূর্ণিঝড়: ঘূর্ণিঝড় (১৮৬৯)-৩৮৫, ঘূর্ণিঝড় (১৮৭৬)-৩৮৫, ঘূর্ণিঝড় (১৯০৯)-৩৮৫, ঘূর্ণিঝড় (১৯১৯)-৩৮৫, ঘূর্ণিঝড় (১৯৬১)-৩৮৬, ঘূর্ণিঝড় (১৯৬৫)-৩৮৬, ঘূর্ণিঝড় (১৯৬৬)-৩৮৬, ঘূর্ণিঝড় (১৯৭০)-৩৮৬, ঘূর্ণিঝড় (১৯৮৮)-৩৮৬, ঘূর্ণিঝড় (১৯৯১)-৩৮৭, ঘূর্ণিঝড় সিডর (২০০৭)-৩৮৭, সিডর পরবর্তী ত্রাণ তৎপরতা-৩৮৭, ঘূর্ণিঝড় 'আইলা' -৩৮৮, আইলা পরবর্তী ত্রাণ তৎপরতা-৩৮৯, ঘূর্ণিঝড়ের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব-৩৮৯, লবণের প্রভাব হ্রাসে করণীয়-৩৯০, খুলনা জেলার আপদসমূহ-৩৯০, বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ভবিষ্যৎ চিত্র বর্ণনা: ঘূর্ণিঝড়-৩৯১, নদীভাঙন-৩৯১, লবণাক্ততা বৃদ্ধি-৩৯১, জলোচ্ছাস-৩৯১, অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি-৩৯১, শিলাবৃষ্টি-৩৯২, জলাবদ্ধতা-৩৯২, কালবৈশাখি ঝড়-৩৯২, ফসলে পোকার আক্রমণ-৩৯২, চিংড়ি ভাইরাস-৩৯২, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-৩৯৩, স্ট্রাকচারাল দুর্যোগ প্রস্তুতি: ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ-৩৯৪, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে ওয়াশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম-৩৯৫, ল্যাট্রিন-৩৯৯, পিএসএফ-৪০০, বৃষ্টির পানি ধারক-৪০০, জরুরি ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রম-৪০০, সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম ভিজিডি-৪০০, ভিজিএফ-৪০০, জিআর-৪০০, টিআর-৪০০, কাবিখা-৪০১, কাবিটা-৪০১।

অধ্যায়-১৮: স্থানান্তর, অভিবাসন ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান পৃষ্ঠা ৪০৩-৪০৮

খুলনা জেলায় অভিবাসন-৪০৩, খুলনাঞ্চলের অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের পটভূমি-৪০৪, সাইক্লোন আইলা উত্তর অভিবাসন-৪০৪, অভিবাসনের কারণসমূহ Humanity Watch-এর জরিপ-৪০৫, বৈদেশিক কর্মসংস্থান-৪০৫, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিটেন্স প্রবাহ-৪০৫।

অধ্যায়-১৯: বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পৃষ্ঠা ৪০৯-৪১৪

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া-৪০৯, ন্যাশনাল, জেলা ও উপজেলা ওয়েব পোর্টাল-৪০৯, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার-৪১০, ভূমি ব্যবস্থাপনায় ডিজিটালাইজেশন-৪১১, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ-৪১১, সফটওয়্যার ফার্মসমূহ-৪১২, হার্ডওয়্যার মার্কেট-৪১২, অনলাইন সেবা সুবিধা-৪১২, বিটিসিএল-৪১৩, ইন্টারনেট সুবিধা-৪১৩।

অধ্যায়-২০: বিশেষ পণ্য পৃষ্ঠা ৪১৫-৪১৮

ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পজাত বিশেষ পণ্য: লবণ-৪১৫, তাঁত শিল্প-৪১৬, বাঁশ ও বেত শিল্প-৪১৭, অন্যান্য কুটিরশিল্প পণ্য-৪১৭।

অধ্যায়-২১: প্রাকৃতিক সম্পদ পৃষ্ঠা ৪১৯-৪৪০

খনিজ সম্পদ-৪১৯, বনজ সম্পদ-৪২০, পারিবারিক ও সামাজিক বন-৪২০, সুন্দরবনের অতীত ইতিহাস-৪২১, সুন্দরবনের বনজ সম্পদ-৪২২,

সুন্দরবনের বৃক্ষ-৪২৩, সুন্দরবনের প্রাণিসম্পদ-৪২৪, সুন্দরবনের বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা-৪৩২, বন্যপ্রাণী অভয়াশ্রম-৪৩২, সুন্দরবনের বাঘ-৪৩৩, বাঘের গুরুত্ব-৪৩৪, বাঘ সংরক্ষণে গুরুত্ব-৪৩৪, বাঘের বর্তমান অবস্থা-৪৩৪, বাঘ সংরক্ষণের গৃহীত পদক্ষেপ-৪৩৫, সুন্দরবনের প্রশাসনিক এলাকা-৪৩৬, বিশ্ব ঐতিহ্য-৪৩৬, সুন্দরবনের অর্থনীতি-৪৩৬, সুন্দরবনের ইকোট্যুরিজম-৪৩৮, সুন্দরবনে কর্মসংস্থান-৪৩৯।

অধ্যায়-২২: জীবন ও জীবিকা পৃষ্ঠা ৪৪১-৪৫৮

কৃষি-৪৪২, মৎস্য আহরণ ও মৎস্য চাষ-৪৪৩, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মৎস্য রপ্তানি-৪৪৩, মধু ও অন্যান্য দ্রব্য সংগ্রহ-৪৪৪, অকৃষি পেশা-৪৪৪, শিল্প উৎপাদন-৪৪৫, মাঝারি শিল্প-৪৪৬, কুটিরশিল্প-৪৪৬, লবণ উৎপাদন-৪৪৯, গুড় উৎপাদন-৪৪৯, মাছ সংরক্ষণ-৪৪৯, অন্যান্য পেশা-৪৫০, বিভিন্ন প্রকার শ্রমিকের মজুরি-৪৫২, চাকরি-৪৫৪।

অধ্যায়-২৩: খেলাধুলা পৃষ্ঠা ৪৮৯-৪৯৮

ফুটবল-৪৫৯, ক্রিকেট-৪৬০, ভলিবল-৪৬১, কাবাডি, হ্যান্ডবল ও বাস্কেটবল-৪৬২, অ্যাথলেটিকস-৪৬২, অন্যান্য খেলাধুলা-৪৬২, গ্রামীণ ও ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা-৪৬২, ঢালী খেলা-৪৬২, জাতীয় পুরষ্কারে ভূষিত ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব-৪৬০, খেলার মাঠ-৪৬৩, খুলনা জেলা স্টেডিয়াম-৪৬৩, শহীদ আবু নাসের স্টেডিয়াম-৪৬৩, ব্যায়ামাগার-৪৬৩, খুলনা বিকেএসপি-৪৬৩, মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স, সোনাডাঙ্গা-৪৬৪, খুলনার ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়া সংগঠনসমূহ-৪৬৪, ইউনিয়ন স্পোর্টিং ক্লাব-৪৬৫, খুলনা টাউন ক্লাব-৪৬৫, মোহামেডান ক্লাব-৪৬৫, অ্যাথলেটিক ক্লাব-৪৬৫, মুসলিম স্পোর্টিং ক্লাব-৪৬৬, আবাহনী ক্রীড়াচক্র-৪৬৬, উল্লেখযোগ্য ক্রীড়া সংগঠক-৪৬৬।

অধ্যায়-২৪: গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা পৃষ্ঠা ৪৬৯-৪৮৮

দৈনিক পত্রিকা-৪৭০, সাপ্তাহিক পত্রিকা-৪৭৪, পাক্ষিক পত্রিকা-৪৮১, মাসিক পত্রিকা-৪৮২, ত্রৈমাসিক পত্রিকা-৪৮৩, অনলাইন পত্রিকা-৪৮৩, কম্যুউনিটি রেডিও-৪৮৪, সুন্দরবন রেডিয়ো-৪৮৪, বাংলাদেশ বেতার, খুলনা-৪৮৪, বাংলাদেশ টেলিভিশন, খুলনা-৪৮৫, সরকারি কার্যালয়/ প্রতিষ্ঠান-৪৮৫, জেলা তথ্য অফিস-৪৮৬, গণসংযোগ অধিদপ্তর-৪৮৬, খুলনা প্রেসক্লাব-৪৮৬, উপজেলা প্রেসক্লাব-৪৮৭, সাময়িকপত্র-৪৮৭।

অধ্যায়-২৫: সমস্যা ও সম্ভাবনা পৃষ্ঠা ৪৮৯-৫০০

অপরিকল্পিত নগারয়ন-৪৮৯, শহরের আবাসন সমস্যা-৪৯১, শহরের ড্রেনেজ ব্যবস্থা-৪৯২, সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অভাব-৪৯২, বস্তি সমস্যা-৪৯২, নদীভাঙন-৪৯৩, নদনদীর নাব্যতা হ্রাস-৪৯৩, রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল-৪৯৩, সুপেয় পানির অভাব-৪৯৪, পর্যটন সমস্যা-৪৯৪, বিবিধ সমস্যা-

৪৯৪, সম্ভাবনা-৪৯৪, চিংড়ি চাষ ও চিংড়ি রপ্তানি-৪৯৫, মংলা বন্দরের সম্ভাবনা-৪৯৬, পর্যটনের সম্ভাবনা-৪৯৮, শিল্পে পুনরুত্থান-৪৯৯।

নির্ঘণ্ট	পৃষ্ঠা ৫১১-৫২০
পরিশিষ্ট ১-১৪	পৃষ্ঠা ৫২১-৫৮০
ছবি	পৃষ্ঠা ৫৮১-৬০২

সারণি সূচি

সারণি-১	খুলনার জেলার প্রশাসনিক ইউনিট	২
সারণি-২	উপজেলাভিত্তিক আয়তন	৩
সারণি-৩	উপজেলাভিত্তিক জনসংখ্যা ও শিক্ষার তথ্য	৩
সারণি-৪	খুলনা অঞ্চলের উপজেলাওয়ারি ভূমির লেভেল	১০
সারণি-৫	খুলনা জেলার মৃত্তিকার শ্রেণিবিভাগ	১০
সারণি-৬	খুলনা জেলার বেড়িবাঁধ ও খালের সংখ্যা	১১
সারণি-৭	খুলনা জেলার বিল / জলাভূমির পরিসংখ্যান	১৫
সারণি-৮	বছরওয়ারি গড় তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতা	১৫
সারণি-৯	খুলনা জেলার মাসিক মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ	১৬
সারণি-১০	খুলনা জেলার মাসিক তাপমাত্রা (ডিগ্রি-সেলসিয়াস)	১৭
সারণি-১১	খুলনা জেলার বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা(শতাংশ)	১৮
সারণি-১২	খুলনা অঞ্চলের আবহাওয়া: প্রকার ও সময়কাল	১৯
সারণি-১৩	খুলনা জেলার অন্তর্গত ECA এলাকার বিবরণ	২২
সারণি-১৪	বৃক্ষাদির আয়তনভিত্তিক পরিমাণ	২৩
সারণি-১৫	খুলনার আয়তন, জনসংখ্যা ও ঘনত্ব	৫৩
সারণি-১৬	খুলনার জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি	৫৪
সারণি-১৭	সর্বশেষ (২০১১) তথ্য অনুযায়ী জেলার জনসংখ্যার চিত্র	৫৪
সারণি-১৮	ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা	৫৬
সারণি-১৯	উপজেলাভিত্তিক ধর্মীয় উপসনালয়ের সংখ্যা	৫৬
সারণি-২০	খুলনায় আয়োজিত মেলার সংখ্যা	৫৭
সারণি-২১	খুলনা জেলার অধিবাসীদের (১০ এবং তদূর্ধ্ব বয়সের) বৈবাহিক তথ্য (শতকরা)-২০১১	৬০
সারণি-২২	উপজেলাওয়ারী লাইব্রেরির সংখ্যা	৬২
সারণি-২৩	সিনেমা হল, নিবন্ধিত ক্লাব ও মিলনায়তনের সংখ্যা, ২০১১	৬৪
সারণি-২৪	বিভিন্ন ধরনের ক্লাবের সংখ্যা ২০১১	৬৫
সারণি-২৫	গুরুত্বপূর্ণ অথবা ঐতিহাসিক স্থান ও পর্যটন কেন্দ্র	৬৫
সারণি-২৬	খুলনা জেলার ভিজিডি কার্যক্রম	৬৮
সারণি-২৭	খুলনা জেলার নিবন্ধিত সমিতি সংখ্যা	৬৮
সারণি-২৮	খুলনা জেলার স্বেচ্ছাসেবী নারী সমিতি ও সংগঠনের সংখ্যা	৬৯
সারণি-২৯	স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি কার্যক্রমের অগ্রগতি	৬৯
সারণি-৩০	খুলনা জেলার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	৭০
সারণি-৩১	খুলনা রেঞ্জাধীন জেলা পুলিশ ইউনিটসমূহ	৭৬
সারণি-৩২	খুলনা জেলা কারাগারে বন্দিদের বিবরণ	৭৮

সারণি-৩৩	খুলনার বন্দোবস্তকৃত এস্টেটের খাজনা বিবরণী	১০৩
সারণি-৩৪	খুলনা জেলার ভূমিরাজস্ব ভূমি উন্নয়ন কর আদায় বিবরণী	১১০
সারণি-৩৫	ভূমি উন্নয়ন কর আদায় বিবরণী (২০০৯ হতে ২০১৩-২০১৪)	১১০
সারণি-৩৬	ভূমি উন্নয়ন করের দাবি ও আদায় (২০১৭-২০১৮ অর্থবছর)	১১১
সারণি-৩৭	উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের তথ্য	১১২
সারণি-৩৮	বন্দোবস্তকৃত খাসজমির তথ্য	১১৪
সারণি-৩৯	খুলনা জেলার ৫ বছরের (২০০৯-২০১০) হতে (২০১৩-২০১৪) খাদ্য পরিস্থিতি	১১৭
সারণি-৪০	খুলনা জেলার বিগত ৩ বছরের বিভিন্ন ফসলের আবাদ (হেক্টরে) ও উৎপাদন (মে. টনে)	১১৮
সারণি-৪১	২০১৭ সালে খুলনা জেলায় ভূমির ব্যবহার (হেক্টরে)	১২০
সারণি-৪২	সেচ যন্ত্রের সংখ্যা ও সেচকৃত জমি (হেক্টরে)	১২০
সারণি-৪৩	খুলনা জেলায় শস্য বিন্যাসভিত্তিক ৫ বছরে আবাদি জমির পরিমাণ	১২২
সারণি-৪৪	খুলনার কৃষিতে সারের ব্যবহার	১২৩
সারণি-৪৫	খুলনা জেলার চাষকৃত বোরো ধানের জাত	১২৪
সারণি-৪৬	২০১৬-২০১৭ সালে আবাদকৃত বোরো ফসলের জাতভিত্তিক উৎপাদনের চূড়ান্ত প্রতিবেদন	১২৫
সারণি-৪৭	খুলনা জেলার চাষকৃত আউশ ধানের জাত	১২৬
সারণি-৪৮	২০১৪-২০১৫ সালে খরিপ-১ মৌসুমে জেলাওয়ারি আউশ ফসলের জাত ভিত্তিক আবাদ ও উৎপাদন	১২৭
সারণি-৪৯	২০১৫-২০১৬ ক খরিপ-১ মৌসুমে জেলাওয়ারি আউশ ফসলের জাতভিত্তিক আবাদ ও উৎপাদন	১২৭
সারণি-৫০	খুলনা জেলার চাষকৃত রোপা আমন ধানের জাত	১২৮
সারণি-৫১	খুলনা জেলার ২০১৬-২০১৭ সালে আবাদকৃত রোপা আমন ও বোনা আমন ফসলের জাতভিত্তিক আবাদ ও উৎপাদন	১৩০
সারণি-৫২	২০১৬-২০১৭ সালে খরিপ-১ মৌসুমে ফসলওয়ারি শাক-সবজির আবাদ ও উৎপাদন	১৩২
সারণি-৫৩	২০১৬-২০১৭ সালে রবি মৌসুমে শাক-সবজির আবাদ ও উৎপাদন	১৩৩
সারিণি-৫৪	জেলার কৃষি খাতে বর্তমানে গৃহীত প্রকল্পসমূহ	১৩৪
সারণি-৫৫	লবণাক্ত এলাকায় নতুন ফসলের নাম ও এলাকা	১৩৬
সারণি-৫৬	খুলনা জেলার গবাদি পশুর সংখ্যা (২০১৫-১৬ অর্থবছর)	১৪১
সারণি-৫৭	একটি দরিদ্র কৃষক পরিবারের (২০১৭ সালের) বার্ষিক বাজেট	১৫০
সারণি-৫৮	একটি সচ্ছল কৃষক পরিবারের বার্ষিক বাজেট	১৫০
সারণি-৫৯	খুলনার কৃষিজ পণ্য উৎপাদন পরিসংখ্যান-(২০০৯-২০১০-২০১১)	১৫৫

সারণি-৬০	খুলনা জেলার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজার মূল্য	১৫৭
সারণি-৬১	খুলনা জেলার চিংড়ি ও হিমায়িত মাছ রপ্তানি(২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭)	১৬৪
সারণি-৬২	খুলনা জেলার হিমায়িত চিংড়ি উৎপাদনসংক্রান্ত তথ্য	১৬৫
সারণি-৬৩	খুলনা জেলায় বিভিন্ন বছরে চালের বাজারদর	১৬৮
সারণি-৬৪	খুলনা জেলার গৃহসামগ্রীর বাজার মূল্য (২০১৬)	১৭১
সারণি-৬৫	খুলনা জেলার সড়ক বিভাগের তথ্য	১৭৬
সারণি-৬৬	খুলনা জেলার সড়ক বিভাগের গৃহীত প্রকল্পসমূহ	১৭৬
সারণি-৬৭	খুলনা জেলার সড়ক বিভাগের মহাসড়ক, আঞ্চলিক ও জেলা সড়ক	১৭৭
সারণি-৬৮	খুলনা জেলার সেতু তথ্য	১৭৮
সারণি-৬৯	খুলনা জেলার ফেরি ঘাটের তথ্য	১৭৮
সারণি-৭০	খুলনা জেলার এলজিইডির আওতায় সড়কসমূহের তথ্যাবলি (২০১৬)	১৮২
সারণি-৭১	রুটের দূরত্বসহ বিস্তারিত তথ্য	১৮৬
সারণি-৭২	আন্তঃনগর ও মেইল ট্রেনগুলোর তালিকা	১৮৬
সারণি-৭৩	পাটকলের স্থাপিত তাঁত	১৯৮
সারণি-৭৪	পাটকল উৎপাদন, বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন, খুলনা জোন	১৯৯
সারণি-৭৫	খুলনা জেলার চাল কলসমূহে নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যা	২০৫
সারণি-৭৬	খুলনা জেলার চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার তথ্য	২০৬
সারণি-৭৭	কুটির শিল্পের খাতভিত্তিক সংখ্যা	২০৭
সারণি-৭৮	বিসিক শিল্প নগরী, শিরোমণি, খুলনার শিল্প তথ্য	২১০
সারণি-৭৯	উপজেলাওয়ারি হাটবাজারের তালিকা	২১৮
সারণি-৮০	খাদ্য গুদামসমূহের তালিকা	২২৫
সারণি-৮১	খুলনার জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর পরিসংখ্যান	২২৮
সারণি-৮২	বক্ষব্যাধি হাসাপাতালে ভর্তিকৃত রোগীর পরিসংখ্যান (২০১২-২০১৬)	২২৯
সারণি-৮৩	সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালে ভর্তিকৃত ও মৃত রোগীর পরিসংখ্যান (১৯৯৮-২০১৭)	২২৯
সারণি-৮৪	শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতালে ভর্তিকৃত রোগীর পরিসংখ্যান	২৩২
সারণি-৮৫	পল্লি স্বাস্থ্যকেন্দ্র বিষয়ক তথ্য	২৩৩
সারণি-৮৬	খুলনা জেলায় হাসপাতাল ও বেড সংখ্যা	২৩৩
সারণি-৮৭	খুলনা মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের সেবা কার্যক্রম	২৩৫
সারণি-৮৮	দি সালভেশন আর্মি, ডুমুরিয়া, খুলনা কার্যক্রম	২৩৬
সারণি-৮৯	মেরী স্টোপস ক্লিনিক, খুলনা কার্যক্রম	২৩৭
সারণি-৯০	বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফর ভলান্টারি স্টেরিলাইজেশন	

	(বিএভিএস), খুলনা কার্যক্রম	২৩৭
সারণি-৯১	পিকেএস-এর কার্যক্রম	২৩৮
সারণি-৯২	এফপিএবি-এর কার্যক্রম	২৩৯
সারণি-৯৩	খুলনা জেলার জনসংখ্যা	২৩৯
সারণি-৯৪	পরিবার পরিকল্পনা সেবা ব্যবহার পরিসংখ্যান	২৪০
সারণি-৯৫	খুলনা জেলার প্রতি হাজারে জন্ম ও মৃত্যুর হার (২০০৮-২০১৭)	২৪১
সারণি-৯৬	হাসপাতালে বিভিন্ন রোগের ভর্তি হার	২৪২
সারণি-৯৭	হাসপাতালে বিভিন্ন রোগে মৃত্যুর হার (১৯০৪)	২৪৩
সারণি-৯৮	হাসপাতালের বিভিন্ন রোগের ভর্তি হার (বছরভিত্তিক)	২৪৩
সারণি-৯৯	হাসপাতালের বিভিন্ন রোগের মৃত্যুর হার (বছরভিত্তিক)	২৪৩
সারণি-১০০	হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারির পরিসংখ্যান (১৯৩০)	২৪৭
সারণি-১০১	২০১৭ সালে খুলনা জেলার সরকারি স্বাস্থ্য ক্লিনিক ও স্বাস্থ্যকর্মী বিষয়ক পরিসংখ্যান	২৪৮
সারণি-১০২	উপজেলাওয়ারি পানির উৎসের পরিসংখ্যান	২৫২
সারণি-১০৩	১৯২১ হতে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত বৃহত্তর খুলনার প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ছাত্রসংখ্যা	২৫৯
সারণি-১০৪	১৯৭১-৭২ থেকে ১৯৭৯-৮০ সাল পর্যন্ত এক বছর অন্তর প্রাথমিক শিক্ষার তথ্য	২৬০
সারণি-১০৫	২০১২ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার তথ্য	২৬০
সারণি-১০৬	২০১২ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত খুলনা জেলার প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য	২৬১
সারণি-১০৭	২০১৭ সালে খুলনা জেলার উপজেলাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর তথ্য	২৬১
সারণি-১০৮	২০১৭ সালে খুলনা জেলার নন-রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উপজেলাভিত্তিক সংখ্যা	২৬১
সারণি-১০৯	২০১৭ সালে খুলনা জেলার উপজেলাভিত্তিক কিন্ডারগার্টেন স্কুল, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা	২৬২
সারণি-১১০	খুলনা জেলার উপজেলাভিত্তিক এনজিও স্কুল, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর তথ্য	২৬৩
সারণি-১১১	মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ক তথ্য	২৬৩
সারণি-১১২	১৯৬০-৬১ সালের জুনিয়র হাইস্কুল এবং মিডল ইংলিশ (এম.ই) স্কুলের তথ্য	২৬৪
সারণি-১১৩	১৯৬৬ হতে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত খুলনা জেলার জুনিয়র হাইস্কুলের তথ্য	২৬৪
সারণি-১১৪	জুনিয়র হাইস্কুলের শিক্ষার্থীর সংখ্যা	২৬৫
সারণি-১১৫	২০০৮ হতে ২০১৭ পর্যন্ত খুলনা জেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের	

	তথ্য	২৬৬
সারণি-১১৬	১৯৫৭ থেকে ৬৭ পর্যন্ত জেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তথ্য	২৬৬
সারণি-১১৭	১৯৭৩ হতে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে খুলনা জেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তথ্য	২৬৭
সারণি-১১৮	খুলনা জেলার উপজেলা / থানাভিত্তিক স্কুল, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী তথ্য ২০১৬ সাল পর্যন্ত	২৬৭
সারণি-১১৯	খুলনা জেলার উপজেলা বা থানাভিত্তিক স্কুল, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী তথ্য ২০১৬ সাল পর্যন্ত	২৬৮
সারণি-১২০	খুলনা জেলার উপজেলা বা থানাভিত্তিক স্কুল, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী তথ্য ১০১৬ সাল পর্যন্ত	২৬৮
সারণি-১২১	১৯২১ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত খুলনা জেলার কলেজ ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা	২৬৯
সারণি-১২২	২০১১ সাল পর্যন্ত খুলনা জেলার উপজেলাভিত্তিক বেসরকারি কলেজের তথ্য	২৭০
সারণি-১২৩	২০১১ সাল পর্যন্ত খুলনা জেলার উপজেলাভিত্তিক টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর তথ্য	২৭২
সারণি-১২৪	১৯৬০-৬১ সাল থেকে ১৯৭১-৭২ সাল পর্যন্ত ৩-৪ বছর অন্তর খুলনা জেলার সর্বপ্রকার মাদরাসার সংখ্যা এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা	২৭৫
সারণি-১২৫	১৯৮২ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বৃহত্তর খুলনা জেলায় বিভিন্ন প্রকার মাদরাসার সংখ্যা	২৭৬
সারণি-১২৬	২০১১ সালে খুলনা জেলার উপজেলাভিত্তিক মাদরাসা শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা	২৭৬
সারণি-১২৭	২০১১ সাল পর্যন্ত খুলনা জেলার উপজেলাভিত্তিক কওমি মাদরাসা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা	২৭৭
সারণি-১২৮	২০১১ সাল পর্যন্ত খুলনা জেলার উপজেলাভিত্তিক এবতেদায়ি মাদরাসা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর তথ্য	২৭৭
সারণি-১২৯	১৯২১ সালে ও পরবর্তী আদমশুমারিসমূহে প্রাপ্ত খুলনা জেলার সাক্ষরতার তথ্যাবলি	২৭৯
সারণি-১৩০	২০০১ ও ২০১১ সালের খুলনা জেলার উপজেলাভিত্তিক সাক্ষরতার হার	২৮০
সারণি-১৩১	প্রকল্পের এক নজরে সার্বিক কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্য	৩২৬
সারণি-১৩২	শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা	৩৬৯
সারণি-১৩৩	খাদ্যের প্রকার ও গ্রহণ মাত্রা	৩৭৪
সারণি-১৩৪	খুলনায় উৎপাদিত বন্য উদ্ভিদ ও সবজি	৩৭৫
সারণি-১৩৫	দুর্যোগ আইলা কবলিত উপজেলা, সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন	৩৮৮
সারণি-১৩৬	ঘূর্ণিঝড় আইলা পরবর্তী ত্রাণ বিতরণ	৩৮৯
সারণি-১৩৭	খুলনা জেলার আশ্রয়ণ প্রকল্পের তথ্যাদি	৩৯৬
সারণি-১৩৮	এক নজরে খুলনা জেলার জনশক্তি রপ্তানির চিত্র	৪০৬

সারণি-১৩৯	উপজেলা ও ইউনিয়ন পোটাল তথ্য	৪১০
সারণি-১৪০	ডিজিটাল সেন্টারের আয়	৪১১
সারণি-১৪১	মাল্টিমিডিয়া ক্লাস নেওয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৪১১
সারণি-১৪২	গুড় প্রসেসিং ইউনিটের সংখ্যা	৪১৬
সারণি-১৪৩	তাঁত শিল্পের সংখ্যা	৪১৬
সারণি-১৪৪	খুলনা জেলার তাঁত শিল্পে কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা	৪১৬
সারণি-১৪৫	খুলনা জেলার বাঁশ ও বেত শিল্পে কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা	৪১৭
সারণি-১৪৬	খুলনা জেলার খনিজ তথ্য	৪১৯
সারণি-১৪৭	সুন্দরবনের রাজস্ব আয় (২০০৬ হতে ২০১০-১১)	৪৩৭
সারণি-১৪৮	বছরভিত্তিক সুন্দরবনে পর্যটকদের আগমন (২০০৬ - ২০১১)	৪৩৮
সারণি-১৪৯	ইকোট্যুরিজম হতে সুন্দরবনের আয়	৪৩৯
সারণি-১৫০	উপজেলাভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংখ্যা	৪৪৭
সারণি-১৫১	উপজেলাভিত্তিক বিক্রয়, উৎপাদন ও সেবাকেন্দ্র	৪৫১
সারণি-১৫২	কৃষি শ্রমিকের গড় মজুরি (২০১১)	৪৫২
সারণি-১৫৩	অকৃষি শ্রমিকের গড় দৈনিক মজুরি ২০১১	৪৫২
সারণি-১৫৪	নির্মাণ শ্রমিকের গড় মজুরি (২০১১)	৪৫৩
সারণি-১৫৫	গ্রাম ও শহরে নারী পুরুষের পেশাভিত্তিক কর্মসংখ্যা ও হার (১৯৭৪)	৪৫৫
সারণি-১৫৬	বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত মানুষের সংখ্যা ও হার (১৯৭৪)	৪৫৫
সারণি-১৫৭	খুলনা জেলাবাসীর পেশাভিত্তিক বিন্যাস (২০০১)	৪৫৬

অধ্যায়-১

ভূপ্রকৃতি ও পরিবেশ

অবস্থান

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে খুলনা জেলা অবস্থিত। এ জেলা ২২°১২′ থেকে ২৩°৫৯′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°১৫′ থেকে ৮৯°৪৫′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

সীমা

এ জেলার উত্তরে যশোর ও নড়াইল জেলা, আগে বাগেরহাট জেলা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে সাতক্ষীরা জেলা।

আয়তন

খুলনা জেলার মোট আয়তন ৪৩৮৯.১০ বর্গকিলোমিটার। এরমধ্যে ৬০৭.৮০ বর্গকিলোমিটার নদীবিধৌত পলিভূমি এবং ২০২৮.২২ বর্গকি.মি. বনভূমি রয়েছে। খুলনা জেলা দেশের মোট আয়তনের ২.৯৭%। আয়তন বিবেচনায় এই জেলা খুলনা বিভাগের বৃহত্তম এবং দেশের ৬৪ জেলার মধ্যে চতুর্থ জেলা। এ জেলা মোট ৯টি উপজেলা নিয়ে গঠিত।

নামকরণ

খুলনা নামটির উৎপত্তি সম্পর্কে নানা কিংবদন্তি প্রচলিত। প্রাচীন কবি কঙ্কন রচিত চন্ডীকাব্য কাহিনির নায়ক ধনপতির ‘লহনা’ ও ‘খুল্লনা’ নামে দুই স্ত্রী ছিলেন। খুল্লনা ছিলেন পতিব্রতা আদর্শ নারী। তাঁর নামানুসারে এ স্থানের নাম হয়েছে খুলনা।[1] অন্য অভিমত অনুযায়ী খুলনা শহরের পূর্বপাড়ে প্রতিষ্ঠিত ‘খুলনেশ্বরী’ কালীবাড়ির নাম থেকে খুলনা নামকরণ হয়েছে। কিন্তু এ অভিমত সঠিক নয় বলে প্রতীয়মান। কেননা ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত বলে মন্দিরের নাম ঢাকেশ্বরী, যশোরে প্রতিষ্ঠিত বিধায় যশোরেশ্বরী, তেমনি খুলনায় প্রতিষ্ঠিত বলে মন্দিরের নামকরণ হয়েছে খুলনেশ্বরী। স্থানের নামানুসারে মন্দিরের নামকরণ হয়েছে, মন্দিরের নাম হতে স্থানের নাম হয়নি এমন ধারণাই যুক্তিযুক্ত।

অনেক আগে থেকে খুলনা শহরের পূর্বতীরে ‘কিসমত খুলনা’ নামে একটি ছোটো গ্রাম ছিল। বর্তমানেও ওই নামের একটি মৌজার অস্তিত্ব আছে। এই কিসমত খুলনা গ্রামের নাম হতেই জেলা ও জেলা সদরের নাম খুলনা হয়েছে বলে অনুমান করা যায়। তবে খুলনা সম্পর্কে প্রথম লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় ব্রিটিশ আমলের সরকারি কাগজপত্রে। ১৭৬৬ সালে পশুর নদীর দক্ষিণভাগে নিমজ্জিত ‘Falmouth’ জাহাজের নাবিকদের উদ্ধার অভিযানের বর্ণনায় খুলনাকে ‘culnea’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অতীতের মানচিত্রগুলোর কোথাও কোথাও খুলনাকে ‘Jessore-Culna’ নামেও দেখানো হয়েছে।[2]

ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় ইংরেজ আমলের শুরুর দিকে নীল কুঠিয়ালদের সঙ্গে স্থানীয় জমিদারদের দাঙ্গানিরোধের উদ্দেশ্যে খুলনায় ১৮৩৬ সালে প্রথমে ‘নয়াবাদ’ নামে একটি থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪২ সালে যশোর জেলার অধীনে খুলনা মহকুমার সৃষ্টি হয়। এটি তদানীন্তন অবিভক্ত

---

[1] এ.এফ.এম. জলিল, সুন্দরবনের ইতিহাস, ঢাকা ১৯৮৬, পৃ. ৬৫৫।

[2] মো. নূরুল ইসলাম, খুলনা জেলার ইতিহাস, জেলা পরিষদ, খুলনা, ১৯৮২, পৃ. ৩৬১।

বাংলার প্রথম মহকুমা। জন শোর ছিলেন প্রথম মহকুমা প্রশাসক। ১৮৮১ সালের মে মাসে খুলনা জেলায় উন্নীত হয়। কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় (২ মে, ১৮৮১ সালে) এ সম্পর্কে যে খবর প্রকাশিত হয় তা ছিল নিম্নরূপ:[৩]

'New District: From the first instant the much talked new district of Khulna formed of the sub-divisions of Satkhira, Narail, Khulna and part of Bagerhat has been organized at Head Quarters of the sub-division bearing the name of the district. The district is a third class one having a District Magistrate and Collector at its head of affairs.'

১৯৬০ সালে রাজশাহী বিভাগ থেকে পৃথক হয়ে খুলনা বিভাগ গঠিত হয়। তৎকালীন যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা ও বরিশাল এই ৪টি জেলা নিয়ে খুলনা বিভাগ গঠিত হলে খুলনা শহর বিভাগীয় সদরে উন্নীত হয়। ১৯৮৪ সালে বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা মহকুমা জেলায় উন্নীত হলে বৃহত্তর খুলনা জেলা সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট এ তিনটি জেলায় বিভক্ত হয়।

জনসংখ্যা ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে এ জেলার জনসংখ্যা ২৩,২০,০০০ জন।

নিম্নে ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে খুলনা জেলার প্রশাসনিক ইউনিট, আয়তন ও জনসংখ্যার পরিসংখ্যান প্রদত্ত হলো:

সারণি-১

খুলনা জেলার প্রশাসনিক ইউনিট

উপজেলা	পৌরসভার সংখ্যা	সিটি করপোরেশন ওয়ার্ড	মহল্লা	ইউনিয়ন	মৌজা	গ্রামের সংখ্যা	জনসংখ্যাবিহীন মৌজা
বটিয়াঘাটা	০	০	০	৭	১২৭	১৭২	৫
দাকোপ	১	৯	১৫	১০	২৬	৯৭	০
দিঘলিয়া	০	০	০	৪	২৯	৪৩	০
ডুমুরিয়া	০	০	০	১৪	১৮৯	২৪০	১৪
খুলনা সিটি করপোরেশন	১	৩১	১৮৪	০	০	০	০
কয়রা	০	০	০	৭	৭১	১৩৩	০
পাইকগাছা	১	৯	৫	১০	১৪৯	২১২	১
ফুলতলা	০	০	০	৩	১৮	২৯	০
রূপসা	০	০	০	৫	৬৪	৭৮	০
তেরখাদা	০	০	০	৬	৩২	৯৯	১
মোট	৩	৪৯	২০৪	৬৬	৭০৫	১১০৩	২১

তথ্যসূত্র: Population and Housing Census-2011, Community Report:Khulna.

[৩] এ.এফ.এম. জলিল, পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৫৪।

সারণি-২
উপজেলাভিত্তিক আয়তন
(উপজেলাসমূহের শ্রেণিভিত্তিক আয়তন)

(একক: বর্গ কিলোমিটার)

উপজেলা	মোট এলাকা	স্থল এলাকা	বনভূমি	নদী অঞ্চল
বটিয়াঘাটা	২৪৮.৩১	২১১.১৯	০	২৪.০৩
দাকোপ	৯৯১.৫৬	২৮৬.০১	৪৯৪.৬৮	২১০.৮৭
দিঘলিয়া	৭৭.১৬	৭৩.৬৯	০	৩.৪৭
ডুমুরিয়া	৪৫৪.২৩	৪৪০.৪	০	৪.৬৯
খুলনা সিটি করপোরেশন	৬৪.৭৮	৬৪.৭৬	০	০.০২৪
কয়রা	১,৭৭৫.৪০	২৬০.৫৬	১,৫১২.৩৬	২.৪৭
পাইকগাছা	৪১১.১৯	৩০৪.০৮	২১.১৮	৭৯.৭৮
ফুলতলা	৫৬.৮৩	৫৬.৮৩	০	০
রূপসা	১২০.১৫	১১৭.৭৩	০	২.৪৭
তেরখাদা	১৮৯.৪৯	a১৮৫.১১	০	২৮০
মোট	৪,৩৮৯.১০	২,০০০.৩৬	২,০২৮.২২	৬০৭.৮০৪

তথ্যসূত্র: Population and Housing Census-2011, Community Report:Khulna.

জনসংখ্যা
সারণি-৩
উপজেলাভিত্তিক জনসংখ্যা ও শিক্ষার তথ্য

(হাজারে)

উপজেলা	জনসংখ্যা				শিক্ষার হার				ভোটার সংখ্যা		
	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১	পুরুষ	মহিলা	মোট
বটিয়াঘাটা	১১৪	১২৮	১৪১	১৭২	২৯.৮	৩৭.৭	৫৩.০	৫৪.৯	৫৫	৫৬	১১১
দাকোপ	১১১	১৪৩	১৫৭	১৫২	৩০.৮	৩৭.৭	৪৯.৩	৫৬.০	৫২	৫২	১০৫
দিঘলিয়া	১০৭	১০৮	১২১	১১৬	৩২.৯	৩৯.৪	৫৫.২	৫৪.৩	৪৬	৪৬	৯১
ডুমুরিয়া	২২৬	২৫৬	২৮০	৩০৬	২৫.২	৩৬.১	৪৮.৭	৫২.৬	১০২	১০৪	২০৭
খুলনা সিটি করপোরেশন	৫১৫	৬১৫	৮৮৪	৭৫১	৪৯.৮	৫৯.৬	৫৯.৯	৭২.৭	২১৭	২০৭	৪২৪
কয়রা	১২৫	১৬৬	১৯৩	১৯৪	২৭.১	৩২.৪	৪৪.৫	৫০.৪	৬৫	৬৬	১৩১
পাইকগাছা	১৭৬	২২৫	২৪৮	২৪৮	২৪.৩	৩২.৬	৪৫.৮	৫২.৮	৮৮	৮৯	১৭৭
ফুলতলা	৯০	৬৭৯	৭৭	৮৪	৪১.১	৪১.১	৫৮.০	৫৯.০	৪৩	৪৩	৮৭
রূপসা	১২৪	১৫০	১৬৮	১৮০	৩২.০	৪০.৪	৫৪.৭	৫৮.২	৫৭	৫৮	১১৬
তেরখাদা	১০০	১০৩	১১১	১১৭	২৩.৫	৩১.৬	৪৫.১	৪৮.৫	৩৫	৩৬	৭১
মোট	১৬৮৮	২৫৭৩	২৩৮০	২৩২০	২৬.৩	৪৩.৯	৫৭.৮	৬০.১	৭৬০	৭৫৭	১৫২০

উৎস: District Statistics 2011, Bangladesh Bureau of Statistics, Dhaka, 2011

খুলনা সিটি করপোরেশনের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি (৭,৫১,০০০জন) এবং ফুলতলার জনসংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম (৮৪,০০০জন)। সিটি করপোরেশন বাদে উপজেলা হিসেবে ডুমুরিয়ার জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি (৩,০৬,০০০জন)

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য খুলনা জেলা ভারতের হুগলি ও বাংলাদেশের মেঘনা নদীর মোহনার মধ্যবর্তী গাঙ্গেয় বদ্বীপের অংশ। অসংখ্য নদনদী ও খাড়ি এই জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। সমগ্র জেলা প্রায় সমতল এবং তেমন কোনো চড়াই- উতরাই নেই বললেই চলে। তবে নদনদীর দুপাশের প্রাকৃতিক বাঁধ উঁচু হয়ে মধ্যবর্তী অংশে নিম্নভূমি সৃষ্টি করেছে। খুলনা জেলাকে বাংলাদেশের ভূপ্রাকৃতিক মানচিত্রে (Physiographic Map) গাঙ্গেয় বদ্বীপের জোয়ারভাটার প্রভাবিত অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। শুধু উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বাংশের কিছু অংশ পুরাতন বদ্বীপ ও নতুন বদ্বীপের অংশবিশেষ। জেলার ভূপৃষ্ঠের ঢাল (Slope) দক্ষিণ-পূর্বদিকে। জেলার নিম্নাংশ সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ০.০৫ মিটারেরও কম এবং উত্তরাংশ প্রায় ১০ মিটার উঁচু।

জেলার ভূপৃষ্ঠ প্রধানত চার ধরনের নবযুগীয় ('Holocene'-১০ হাজার বছর হতে বর্তমান পর্যন্ত) পলল দ্বারা আবৃত। এগুলো হলো:-

(ক) গরান বিলুয়া অবক্ষেপ (Mangrove swamp deposit)

(খ) জোয়ারভাটা দ্বারা সৃষ্ট বদ্বীপীয় স্রোতজ অবক্ষেপ (Tidal deltaic deposit)

(গ) বদ্বীপীয় পলল (Deltaic Silt) ও

(ঘ) অনুপ কর্দম এবং পিট (Marsh clay and peat)

পললসমূহের বর্ণনা দেওয়া হলো-

(ক) গরান বিলুয়া অবক্ষেপ (Mangrove swamp deposit):

খুলনা জেলার অর্ধেক এলাকা গরান বিলুয়া অবক্ষেপ দিয়ে ঢাকা। ভূপৃষ্ঠের এই অংশ অসংখ্য তটিনী (Channel) ও খাড়ি (Creek) দিয়ে সমুদ্রের সাথে যুক্ত। দিনে এখানে দুবার জোয়ারভাটা হয়। এই জোয়ারভাটার মাধ্যমে এখানে নিয়ত অবক্ষেপণ (Deposition) হয়। বাংলাদেশের বৃহত্তম বনভূমি সুন্দরবন এখানে অবস্থিত। গরান বিলুয়া অবক্ষেপ প্রধানত কর্দমাময় পলল (Clayee slit) থেকে বালুযুক্ত পলল (Sandy silt) দিয়ে গঠিত। এ অবক্ষেপ প্রধানত হালকা ধূসর বর্ণ থেকে গাঢ় ধূসর বর্ণের হয়ে থাকে। এখানে অবক্ষেপের সাথে অসম্পূর্ণভাবে গলিত উদ্ভিজ্জ পদার্থ (Partially decomposed vegetal materials) ও শামুকের খোলস দেখতে পাওয়া যায়। এসব অবক্ষেপ ছাড়াও এখানকার খাড়িতে (Creek) নরম কাদা ও প্রাকৃতিক বাঁধে (Natural levee) বালু পাওয়া যায়। বালু সূক্ষ্ম দানা এবং হালকা ধূসর রঙের। বালু প্রধানত কোয়ার্টজ (Quartz) দ্বারা গঠিত। এ ছাড়া বালুতে ফেলস্পার (Feldsper), অভ্র (Mica), ক্লোরাইড (Cloride) এবং কালো মানিক (Black minerals) পাওয়া যায়। সমুদ্রের নিকটবর্তী বলে এখানকার মাটি ও পানিতে লবণাক্ততা বেশি। এখানকার সমুদ্রসৈকত প্রধানত কাদা (Clay) দ্বারা গঠিত, তবে মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্তভাবে বালুও দেখা যায়। প্রবাহিত

অধিকাংশ নদীই সক্রিয় এবং এগুলোতে দিনে দুবার জোয়ারভাটা হয়। এই ভূখণ্ড বন সৃষ্টি ও মাছ চাষের জন্য উপযোগী। খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় এই ধরনের অবক্ষেপ দেখা যায়।

(খ) জোয়ারভাটা দ্বারা বদ্বীপীয় স্রোতজ অবক্ষেপ (Tidal deltaic deposit)

খুলনা জেলার এক-তৃতীয়াংশ এলাকা বদ্বীপীয় স্রোতজ অবক্ষেপ দ্বারা আবৃত। এ ভূখণ্ডকে দুভাগে ভাগ করা যায় (১) জোয়ারভাটা দ্বারা সৃষ্ট স্রোতজ নিম্ন সমতল (upper tidal flat) ও (২) জোয়ারভাটা দ্বারা সৃষ্ট সমভূমির নিম্নাংশ (lower tidal flat)। উচ্চাংশ সমুদ্রপৃষ্ঠ (sea level) থেকে ২.০৩ মিটারেরও বেশি এবং নিম্নাংশ ০.২ থেকে ২.৫ মিটার উঁচু। স্রোতজ উচ্চ সমতল এলাকায় শুধু বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ও প্রবল ঝড়ের সময় সমুদ্রের পানি প্রবেশ করে এবং স্রোতজ নিম্ন সমতল নিম্নভূমি এলাকায় সাধারণত ভরা কাটালের সময় (spring tide) জোয়ারভাটা পরিলক্ষিত হয়। এলাকায় জলোচ্ছ্বাস ও প্রবল ঝড়ের সময় এবং স্রোতজ সমতল এলাকায় ভরা কাটালের সময় অবক্ষেপ হয়।

উঁচু অংশ প্রধানত পললময় কর্দম (silty clay) আবৃত এবং বর্ণ সাধারণত জলপাই ধূসর (olive grey) হয়। তবে নদী ও খাড়ির কাছে লেন্স আকারের সূক্ষ্ম দানাবিশিষ্ট বালুস্তর দেখা যায়। এ এলাকার অবক্ষেপ নিচু এলাকার অবক্ষেপণের চেয়ে কিছুটা সংহত (massive) এবং এ অংশের অবক্ষেপে সামান্য জৈব সংযুক্তি (organic structure) ছাড়া কোনো পাললিক সংযুক্তি (sedimentary structure) নেই। এখানে বিক্ষিপ্তভাবে কিছুটা জারিত (oxidized) অবক্ষেপও দেখা যায়। গরান এলাকার মতো এখানেও প্রচুর শামুকের খোলস ও মাটির ১ থেকে ১.৫ মিটার নিচে পুরাতন আমলের গাছ দেখা যায়। এসব গাছ থেকে বোঝা যায় যে, আগে সুন্দরবনের বিস্তৃতি এই অংশেও ছিল এবং এলাকাটি ক্রমনিম্নমুখী। নিম্নভূমি এলাকা প্রধানত পললময় কর্দম (silty clay) এবং কর্দম (mud) দ্বারা আবৃত। এর রং জলপাই ধূসর থেকে হালকা নীলাভ ধূসর বর্ণের। এখানেও মাটির নিচে মরা গাছের গুড়ি দেখতে পাওয়া যায়। এখানে খাড়ি ও খাড়িসংলগ্ন সমতল ভূমিতে কোমল কর্দম এবং প্রাকৃতিক বাঁধে (natural levee) সূক্ষ্ম দানার বালু দেখা যায়। নিম্ন এলাকায় প্রতিমাসে দুবার অবক্ষেপণ হয়। এখানকার অবক্ষেপ তুলনামূলক বেশি। এখানকার নদীগুলোতে যেমন মাঝে মাঝে জোয়ারভাটা পরিলক্ষিত হয় তেমনি উত্তরদিক হতেও পানি এসে পরিপুষ্ট হয়। এখানকার পানির লবণাক্ততা গরান এলাকা থেকে কম এবং খাড়িতে স্বাদু পানি পাওয়া যায়। জোয়ারভাটা দ্বারা সৃষ্ট বদ্বীপীয় এলাকা চাষাবাদের জন্য খুবই উপযোগী। এখানকার উচ্চভূমি (যেমন প্রাকৃতিক বাঁধ) বসবাসের জন্য উপযোগী। এখানে উত্তরাংশ অপেক্ষা দক্ষিণাংশে লবণাক্ততা বেশি। খুলনা জেলার ডুমুরিয়া, বটিয়াঘাটা, দৌলতপুর,

কয়রা, পাইকগাছা, খুলনা সদর ও রূপসা উপজেলায় এই ধরনের অবক্ষেপ দেখা যায়।

(গ) বদ্বীপীয় পলল (Deltaic silt)

খুলনা জেলার উত্তরাংশ বদ্বীপীয় পলল দ্বারা আবৃত। বদ্বীপীয় পলল হালকা থেকে হলুদাভ বর্ণের এবং কিছুটা বালুকাময়। একে 'পুরাতন পদ্মা প্লাবন ভূমি' পললও বলা হয়। অতীতকালে এ এলাকা দিয়ে প্রবাহিত পদ্মার শাখা নদীগুলো প্রচুর পরিমাণ পলি বহন করে এখানে অবক্ষেপ করেছে। পরবর্তীকালে এ নদীগুলো আগের মতো সক্রিয় না থাকায় এখানে অবক্ষেপণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। সময়ের সঙ্গে বিভিন্নভাবে এ এলাকার পলল পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানে হলুদাভ বর্ণ ধারণ করেছে।

বদ্বীপীয় পলি প্রধানত পলল (Silt) দ্বারা গঠিত হলেও এখানে যথেষ্ট পরিমাণে বালু ও কাদা পাওয়া যায়। নদীগর্ভে (River bed) বালুচর (sands bars) এবং প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট বাঁধে (Natural levee) যথেষ্ট পরিমাণে বালু পাওয়া যায়। বালু সবুজ ধূসর থেকে হলুদাভ বর্ণের এবং অতি সূক্ষ্ম থেকে মাঝারি দানাবিশিষ্ট। দানাগুলো প্রায় গোলাকার। বালু সাধারণত কোয়ার্টজ (Quartz) মানিক দ্বারা গঠিত। এতে সামান্য পরিমাণে অভ্র (Mica) ও কালো মানিক (Black minerals) পাওয়া যায়। প্লাবন অববাহিকা (Flood basin) ও অবভূমি (Depression) এলাকায় কর্দম ও পিটময় কর্দম (peaty clay) পাওয়া যায়। এই কর্দম হরিৎ ধূসর থেকে পীতাভ বর্ণের। এ এলাকার নদীগুলো বর্তমানে মৃতপ্রায়। এখানে জোয়ারভাটা পরিলক্ষিত হয় না। শুধু বর্ষার সময় উত্তরদিক থেকে সামান্য পানি দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয়। বদ্বীপীয় পলল চাষাবাদের জন্য খুবই উপযোগী। অন্য সব ভূখণ্ড থেকে এ ভূখণ্ডের মৃত্তিকা অধিক পরিমাণে সংহত (massive) এবং জারিত (oxidized), এখানে নদীগুলো সক্রিয় থাকায় সাধারণত বন্যা হয় না। খুলনা জেলার ফুলতলা ও দৌলতপুর উপজেলায় এ ধরনের অবক্ষেপ দেখা যায়।

ঘ) অনুপ কর্দম এবং পিট (Marsh clay and peat)

খুলনা জেলার প্রধানত উত্তর-পূর্বাংশে বিক্ষিপ্তভাবে অনুপ কর্দম ও পিট অবক্ষেপ দেখা যায়। কর্দম ধূসর থেকে নীলাভ ধূসর বর্ণের এবং পিট বাদামি থেকে কৃষ্ণাঙ্গ বাদামি বর্ণের। এ অবভূমি এলাকা সাধারণভাবে 'বিল' নামে পরিচিত। এই ভূখণ্ডসমূহ বর্ষাকালে জলমগ্ন হয়ে পড়ে কিন্তু শীত মৌসুমে পানি শুকিয়ে যায়, তবে কিছু কিছু অংশে সারা বছরই পানি থাকে। উত্তরাংশের বিলুয়া এলাকা সাধারণত বর্ষার পানিতে প্লাবিত হয়ে বন্যার সৃষ্টি করে। এসব ভূখণ্ডে বিক্ষিপ্তভাবে বদ্বীপীয় পলল ও জোয়ারভাটা দ্বারা সৃষ্ট অবক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়। এ সকল বিল এলাকা অবক্ষেপ (Deposition) জনিত অথবা ভূ-গাঠনিক (Tectonic) কারণে সৃষ্টি হয়েছে।

বিলুয়া এলাকা কর্দম, পিট কর্দম ও পিট দ্বারা গঠিত। বিল এলাকায় সূক্ষ্ম দানার অবক্ষেপ ছাড়াও মাঝারি দানার অবক্ষেপ দেখা যায়। পরিত্যক্ত নদীখাত (Abandoned Channel) এবং প্রাকৃতিক বাঁধে (Natural levee) বালু ও পলল পাওয়া যায়। এ অবভূমি এলাকায় সাধারণত শুষ্ক মৌসুমে একটি ফসল হয় এবং বর্ষার সময় ফসল তেমন হয় না। বিল এলাকায় যেসব অংশে সারা বছর পানি থাকে সেখানে হাঁসপালন ও মাছের চাষ করা সম্ভব। খুলনা জেলার ডুমুরিয়া ও তেরখাদা এলাকায় এ ধরনের অবক্ষেপণ দেখা যায়।

বাংলাদেশের ভূমিকম্প তীব্রতা (Earthquake intensity) মানচিত্রে খুলনা জেলাকে III নম্বর তীব্রতা অংশে দেখান হয়েছে। এখানকার ভূমিকম্প তীব্রতার মূল ভূকম্পন সূচক (Basic Seismic co-efficient) হচ্ছে ০.০৪। এখানে ভূমিকম্পের মাত্রা রিখটার (Richter) স্কেলে ৬.০ থেকে ৬.৫ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। বৃহত্তর খুলনা জেলায় ভূগর্ভস্থ পানি নিম্নভূমি এলাকায় ০.৫ মিটার নিচে এবং উচ্চভূমি (যেমন-প্রাকৃতিক বাঁধ) এলাকায় ২ হতে ৫ মিটার নিচে পাওয়া যায়। উত্তরাংশ হতে দক্ষিণাংশে ভূগর্ভস্থ পানি ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি কিন্তু দক্ষিণাংশের পানির লবণাক্ততা খুব বেশি। খাওয়ার উপযোগী পানির স্তর জেলার সর্ব উত্তরাংশে ৫০ থেকে ১০০ মিটার, খুলনা সদর এলাকায় ২৫০ থেকে ৩০০ মিটার এবং দক্ষিণাংশে ৩০০ মিটার বা আরও নিচে পাওয়া যায়।[৪] এ ভূগর্ভস্থ শিলাস্তর মোটা হতে মাঝারি দানার বালি দ্বারা গঠিত। এ জেলায় অনেক বড়ো বড়ো হাওর, বাঁওড়, বিল ও পুকুর আছে।

বাংলাদেশের ভূ-গাঠনিক মানচিত্রে (Tectonic map) এ এলাকাকে ফরিদপুর খাদের (Faridpur trough) অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে। এ এলাকার বিশেষত্ব হচ্ছে এলাকাটি ক্রমনিম্নগামী (subsided) বিক্ষিপ্ত অবভূমি এলাকা এবং মৃত্তিকা স্তরের নিচে বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষাদির উপস্থিতি এ নিম্নগামিতার ইঙ্গিত বহন করে।

এ অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস থেকে জানা যায় অতীতে এক সময় বঙ্গোপসাগরের সমুদ্রসৈকত (Beach) ভারতের রাজমহল পাহাড়ের কাছে ছিল। ধীরে ধীরে পলি জমে ভূভাগ তৈরি হতে থাকে এবং সমুদ্রসৈকতও ধীরে ধীরে দক্ষিণদিকে সরে আসতে আসতে বর্তমান অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। খুলনা জেলা গঙ্গা এবং এর শাখা নদীসমূহ দ্বারা বাহিত পলল জমে সৃষ্টি হয়েছে। গঙ্গানদী এবং এর শাখা নদীগুলো কীভাবে পলল বহন করে ভূভাগ সৃষ্টি করেছে এ সম্পর্কে প্রধানত দুধরনের মতামত প্রচলিত আছে। প্রথম মতামত হলো, পদ্মা নদী আগে ভাগীরথী দিয়ে প্রবাহিত হতো। ক্রমে ক্রমে নদী পূর্বদিকে সরে নতুন ভূভাগ সৃষ্টি করতে থাকে। ফলে পদ্মা নদী ধীরে ধীরে পুবদিকে সরে বর্তমান

---

[৪] আবদুশ শাকুর (সম্পাদিত) বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার, বৃহত্তর খুলনা, ঢাকা, ১৯৯৬. পৃ: ০৬।

অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় মতামত হলো, বহু পূর্ব থেকেই নদীর দুটি ধারা ছিল। একটি ধারা ভাগীরথী দিয়ে অন্যটি পদ্মা দিয়ে প্রবাহিত হতো। পদ্মার অনেক শাখা নদী ছিল। এ সকল শাখা নদী দ্বারা পলি জমে পদ্মা নদীর দক্ষিণের ভূখণ্ড সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে দ্বিতীয় ধারণাটিই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তবসম্মত বলে মনে করা হয়। জেলার উত্তরাংশে বদ্বীপীয় সিল্ট, পদ্মার শাখা নদীর মাধ্যমে বাহিত পলি দ্বারা গঠিত। এখানকার অবক্ষেপণে জোয়ারভাটার কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু দক্ষিণাংশের অবক্ষেপণে জোয়ারভাটার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গঙ্গা এবং এর শাখা নদী দ্বারা বাহিত পলির বৃহদাংশ প্রথমে সাগরে পড়ে। এই পলির একটি বিশেষ অংশ গভীর সাগরের তলদেশে যায় কিন্তু বাকি অংশ জোয়ারভাটা দ্বারা আবার ভূভাগে পুনঃপ্রবেশ করে এবং বিস্তৃত এলাকায় বিশেষ করে অবভূমি এলাকায় অবক্ষেপণ হয়।[৫] জেলার একেবারে নিম্নাংশে প্রতিবছর পলি জমে নতুন ভূভাগ সৃষ্টিতে সাহায্য করে কিন্তু বিভিন্ন কারণে আবার অনেক পুরাতন ভূখণ্ড ও নদী এবং সাগরেরগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। তবে এ ভাঙাগড়ায় একটা সমতা আছে বলে বিগত ৩ হাজার বছরে সৈকত রেখার তেমন কোনো বড়ো পরিবর্তন সাধিত হয়নি।

ভূপ্রকৃতি ভূপ্রকৃতি অনুসারে খুলনা জেলার প্রায় সমগ্র এলাকা নিম্নপলিজ সমভূমি। এ জেলা হুগলি ও মেঘনা নদীর মোহনার মধ্যবর্তী গঙ্গা বদ্বীপের কেন্দ্রভাগে অবস্থিত। সমগ্র জেলা অসংখ্য নদনদী ও মোহনায় পরিপূর্ণ। এর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বদ্বীপ অঞ্চলের অন্যান্য জেলার অনুরূপ। জেলার ভূমি সাধারণভাবে সমতল। নদীসমূহের তীর পার্শ্ববর্তী নিম্নাঞ্চল অপেক্ষা সামান্য উঁচু ও নিম্নাঞ্চলের দিকে ঢালু। নদীর উঁচু পাড়গুলোকে প্রাকৃতিক বাঁধ বলা যায়। নদীগুলোর গতিপথের মধ্যভাগে পিরিচাকার নিম্নখাত বিদ্যমান। নদীর গতিপথের পার্শ্বে বা কাছাকাছি অনেক জলাভূমিও রয়েছে। যেসব কৃষক জলাভূমি চাষাবাদ করে তাদের সকলকেই দূরবর্তী উঁচু এলাকায় বসবাস করতে হয়। যে সকল জলাভূমি সারা বছর জলমগ্ন থাকে সেগুলোয় কোনো চাষাবাদ হয় না। ভূপ্রকৃতি অনুসারে সাধারণভাবে জেলাকে ৪টি পৃথক এলাকায় বিভক্ত করা হয়। উত্তর-পশ্চিমাংশের ভূমি স্বাভাবিক প্লাবন সীমারেখা থেকে বেশ উঁচু। এখানে জনবসতি খুব ঘন ও সর্বত্র খেজুর, তাল, আম ও অন্যান্য গাছপালায় পরিপূর্ণ।

উত্তর-পূর্বাংশে খুলনা ও যশোর জেলার সীমানা থেকে বাগেরহাট পর্যন্ত নিম্ন ভূমি এবং ছোটো-বড়ো অসংখ্য জলাশয় রয়েছে। এখানে জনবসতির ঘনত্ব অন্যান্য স্থানের তুলনায় কম। কারণ, এ অংশে কেবল নদী তীরবর্তী উঁচুস্থান বা নদীর প্রাকৃতিক বাঁধগুলো বসবাসের উপযোগী। কিন্তু এতদঞ্চলে সাধারণত ডিসেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত নদীর পানি লোনা থাকে। কিন্তু বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত ও

---

[৫] আবদুশ শাকুর (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ: ৬।

নদীগুলোর মাধ্যমে অধিক পানি প্রবাহের ফলে এই লবণাক্ততা নিম্নদিকে অনেক দূর পর্যন্ত সরে যায়।

জেলার মধ্যবর্তী এলাকার ভূমিও নিচু। বর্তমানে এ অঞ্চলে জনবসতি ও কৃষিকাজ বৃদ্ধি পেয়েছে। জেলার মধ্যবর্তী অঞ্চলে পুকুরের সংখ্যা অনেক। এখানে প্রচুর পান উৎপন্ন হয়। জেলার দক্ষিণাংশ সুন্দরবনের পাশে অবস্থিত। এ অংশে কিছু এলাকাকে কৃষিক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখানে গ্রামের সংখ্যা কম। গ্রাম হিসেবে চিহ্নিত স্থানসমূহ প্রকৃতপক্ষে উর্বর আবাদি জমি। এসব জমির ওপর এখানে সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে কৃষকদের সামান্যসংখ্যক ঘরবাড়ি দেখা যায়। উর্বর আবাদি এলাকার চতুর্দিকে বিস্তর খাল ও নদী রয়েছে। প্রায় সব খাল ও নদী তীর বরাবর ছোটো ছোটো ঝোপঝাড় জন্মাতে দেখা যায়।

জেলার সর্বদক্ষিণে সমুদ্রতীরে বহু জলাভূমি ও ঝিল রয়েছে। সুন্দরবন এই এলাকায় অবস্থিত। এ অঞ্চলের সর্বত্র নদনদীর শাখাপ্রশাখা জালের ন্যায় ছড়ানো। জেলার দক্ষিণাংশের প্রায় অর্ধেক এলাকাজুড়ে কর্দমাক্ত লোনা পানির জোয়ারভাটা এলাকায় সুন্দরবনের অবস্থান। জেলার মূল ভূখণ্ড থেকে বন এলাকা আলাদা। এখানে ভূমি গঠনপ্রক্রিয়া এখনও অব্যাহত আছে। সমগ্র এলাকা জালের ন্যায় নদনদী দ্বারা বেষ্টিত।[৬] সমগ্র এলাকা নানা আকারের দ্বীপমালাবেষ্টিত অসংখ্য জলপথের সমষ্টি বলে প্রতীয়মান হয়। এ জন্য এখানকার ভূমি গঠন প্রক্রিয়া জোয়ারভাটা দ্বারা প্রভাবিত। সুন্দরবন এলাকা গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলের নিম্নভাগ। শিবসা, পশুর ও খোলপেটুয়া -এ এলাকার প্রধান প্রধান নদী। নদীগুলো পলিজ সমতল ভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত এবং এদের গতিপথে সব সময় জলাভূমি ভরাট হয়ে নতুন ভূমি গঠিত হয়ে থাকে।

সুন্দরবন এলাকা গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলের নিম্নভাগ। এটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বন। এ বন সুদৃশ্যময় এবং মনোরম। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রবাহের সময়ে বিশেষ করে মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বঙ্গোপসাগরের জলোচ্ছ্বাসের ফলে এলাকার কয়েক মাইল এলাকা প্লাবিত হওয়ার দরুন ভূমির ওপর পলিজ অবক্ষেপণ হয়। বদ্বীপ এলাকায় যে পরিবেশে কয়লা পাওয়া যায় সেই পরিবেশ সুন্দরবন এলাকায় বিদ্যমান। এখানে পাক-ভারত, বাংলাদেশ ও মালয়েশীয় বহু প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদ দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া এ ভূমিতে বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন রয়েছে।[৭]

---

[6] L.R. Fawcus, I.C.S Final Report on the Survey and Settlement Operation in the District of Khulna, 1920-26, Calcutta, 1927.

[৭] KGM Latiful Bari (edited), Bangladesh District Gazetteers, Khulna, Government of Bangladesh, Dhaka, 1978. পৃ.-০৪।

সারণি-৪
খুলনা জেলার উপজেলাওয়ারি ভূমির লেভেল

(আয়তন হেক্টরে)

ক্র.নং.	উপজেলা	আবাদীভুমি						অন্যান্য	সর্বমোট
		উঁচু জমি	মাঝারি উঁচু জমি	মাঝারি নিচু জমি	নিচু জমি	অতিনিচু জমি	মোট		
১	ফুলতলা	৯৩৮	২৪৪৬	১৭৬৩	০	০	৫১৪৭	২২৯১	৭৪৩৮
২	বটিয়াঘাটা	৬১৩	১৬৭২৭	০	০	০	১৭৩৪০	৬২৮২	২৩৬২২
৩	দিঘলিয়া	৮৩৯	১৭৫৩	১৯১৫	০	০	৪৫০৭	২৩৬৫	৬৮৭২
৪	মেট্রো	৪৩৪	১১৮২	৭১৮	০	০	২৩৩৪	৪৬৭৯	৭০১৩
৫	তেরখাদা	১৮৯	৪৫৩৩	৮০৫৫	৩৩৬৭	০	১৬১৪৪	২৬২৫	১৮৭৬৯
৬	ডুমুরিয়া	২৪৯০	২৭৪৫৯	৪৯২৯	০	০	৩৪৮৭৮	৯৯১৯	৪৪৭৯৭
৭	পাইকগাছা	২৪২৩	৩০০২০	০	০	০	৩২৪৪৩	৫৯৬১	৩৮৪০৪
৮	দাকোপ	২১৩	২২৫৪৪	০	০	০	২২৭৫৭	৫৮০০	২৮৫৫৭
৯	রূপসা	১১৪৫	৪৯৫০	২৭৩১	০	০	৮৮২৬	৩১৯৯	১২০২৫
১০	কয়রা	২৬৮	২১১৪৫	০	০	০	২১৪১৩	৪৯১০	২৬৩২৩
মোট		**৯৫৫২**	**১৩২৭৫৯**	**২০১১১**	**৩৩৬৭**	**০**	**১৬৫৭৮৯**	**৪৮০৩১**	**২১৩৮২০**

সূত্র: মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কার্যালয়, খুলনা।

সারণি-৫
খুলনা জেলার মৃত্তিকার শ্রেণিবিভাগ

(আয়তন হেক্টরে)

ক্র:নং	উপজেলা	মৃত্তিকাবুনট শ্রেণি					জৈব মাটি	অন্যান্য	সর্বমোট
		বেলে	বেলে দোআঁশ	দোআঁশ	এটেল দোআঁশ	এটেল			
১	ফুলতলা	০	০	৪৫৮	৩০৮	২৭৮৪	১৫৯৭	২২৯১	৭৪৩৮
২	বটিয়াঘাটা	০	০	০	২৭১৭	১৪৬২৩	০	৬২৮২	২৩৬২২
৩	দিঘলিয়া	০	০	১৮৫	৭১৮	২৯৫০	৬৫৪	২৩৬৫	৬৮৭২
৪	মেট্রো	০	০	২১৪	৭৭৭	১৩৪৩	০	৪৬৭৯	৭০১৩
৫	তেরখাদা	০	০	২৭৮৬	১৬৮৩	৮৬২৫	৩০৫০	২৬২৫	১৮৭৬৯
৬	ডুমুরিয়া	০	০	১১৯	৫৭২২	১৭৫০৯	১১৫২৮	৯৯১৯	৪৪৭৯৭
৭	পাইকগাছা	০	০	৮২৬	৪২৪৯	২৭৩৬৮	০	৫৯৬১	৩৮৪০৪
৮	দাকোপ	০	০	৪৪৩৪	৫৯৬২	১২৩৬১	০	৫৮০০	২৮৫৫৭
৯	রূপসা	০	০	৪৬৭	২২৬৭	৫৭৬৯	৩২৩	৩১৯৯	১২০২৫
১০	কয়রা	০	০	১৯১৮	১৬৪৮	১৭৮৪৭	০	৪৯১০	২৬৩২৩
মোট		**০**	**০**	**১১৪০৭**	**২৬০৫১**	**১১১১৭৯**	**১৭১৫২**	**৪৮০৩১**	**২১৩৮২০**

সূত্র: মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কার্যালয়, খুলনা।

সারণি-৬
খুলনা জেলার বেড়িবাঁধ ও খালের সংখ্যা

(কি.মি.)

উপজেলা/সিটি করপোরেশন	বেড়িবাঁধের সংখ্যা	খালের সংখ্যা	অন্যান্য
বটিয়াঘাটা	০	০	০
দাকোপ	৫৪৭	৫০	৮০৮
দিঘলিয়া	৫০	২০	০
ডুমুরিয়া	০	০	৪০
খুলনা সিটি করপোরেশন	০	৩৫	৪৫০
কয়রা	৩৪২	২৭	০
পাইকগাছা	১৪৪	৯২	০
ফুলতলা	০	০	০
রূপসা	৩৮	২৯	২১
তেরখাদা	২৮	২৪৪	০
মোট	**১,১৪৯**	**৪৯৭**	**১,৩১৯**

উৎস: District Statistics 2011, Bangladesh Bureau of Statistics, Dhaka, 2011

মৃত্তিকা

বদ্বীপ এলাকা গঠনপ্রক্রিয়া থেকে এ জেলার ভূমি গঠিত হয় এবং জেলার সর্বত্রই মৃত্তিকা প্রায় একই রকম দেখায়। বিভিন্ন এলাকার মধ্যে কেবল বালি এবং জৈব পদার্থের পরিমাণের তারতম্য দেখা যায়। এ এলাকার ওপর দিয়ে প্রবাহিত নদীনালা গঙ্গা নদীর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। তাই নদীসমূহ থেকে সকল সময়ই এখানকার ভূভাগের ওপর বালির আস্তরণ পড়তে দেখা যায়। নদীবাহিত পলিজ বালি হালকা ধরনের বলে এগুলো ডাল, তেলবীজ, তরমুজ ইত্যাদি উৎপাদনের উপযোগী। তৃণাদির পচা আস্তরণ মিলে এ মাটি ফল ও পান উৎপাদনের উপযোগী হয়ে ওঠে। এরকম মাটি জেলার উত্তরাংশে ও গঙ্গা থেকে নির্গত স্রোতধারা নিয়ে প্রবাহিত ইছামতি এবং মধুমতি-বালেশ্বর নদীর তীরবর্তী উঁচু এলাকায় দৃষ্ট হয়।

নদনদী

বাংলাদেশ নদীবাহিত পলিমাটি দ্বারা সৃষ্ট পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ। দেশের প্রধান প্রধান নদনদী দেশের বাইরের অববাহিকা থেকে প্রচুর পরিমাণ পলি পানির সঙ্গে বয়ে আনে। এই বিশাল পরিমাণ পলি অসংখ্য শাখানদী দিয়ে দেশের সর্বত্র বিস্তৃত হয়। বিপুল পলিমাটির কারণে পলল ভূমি দিয়ে বয়ে চলা আগের অতিমাত্রায় সচল ও সক্রিয় নদীগুলোর বর্তমানে মরে যাওয়া বা দিক পরিবর্তনের মতো ঘটনা ঘটছে। পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, নদীভাঙন প্রভৃতি ঘটনা নদনদীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দক্ষিণাঞ্চলের নদনদীর ঐতিহাসিক পরিবর্তন খুলনা জেলার নদনদীগুলোর উপরে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছে। খুলনা জেলার প্রধান প্রধান নদনদীগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো:

আঠারবাঁকী আঠারবাঁকী নদীটি নড়াইল জেলার কালীয়া উপজেলার পাহারভাঙ্গা ইউনিয়নে মধুমতী নদী থেকে উৎপত্তি হয়েছে। নদীটি মোল্লাহাট উপজেলার গাংনী ও রূপসা উপজেলার ঘাটভোগ ও নৈহাটি ইউনিয়নের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়ে খুলনা সদর উপজেলার ২১ নং ওয়ার্ডে রূপসা নদীতে পতিত হয়েছে। আগে এটি অনেক বড়ো নদী হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু গত কয়েক দশক ধরে নদীটির উৎসমুখ শুকিয়ে গেছে। বর্তমানে মধুমতীর সঙ্গে নদীটির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বর্ষাকালে দুকূল উপচিয়ে প্লাবনভূমিতে পানি প্রবাহিত হয়। সারা বছর নদীতে ছোটো ছোটো নৌকা চলাচল করে। নদীতে জোয়ারভাটার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

আর্পানগাসিয়া এ নদী কয়রা উপজেলার দক্ষিণ বেদকাশি ইউনিয়নে কপোতাক্ষ নদ হতে উৎপন্ন হয়ে একই উপজেলার নলিয়ান রেঞ্জ ইউনিয়ন দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। নদীটিতে সারা বছরই পানি থাকে ও বর্ষাকালে দুকূল প্লাবিত হয়। জোয়ারভাটা দ্বারা নদীটি প্রভাবিত হয়। এ সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

কপোতাক্ষ কপোতাক্ষ নদ যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলার চৌগাছা পৌরসভা/ ইউনিয়নের ভৈরব নদ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। নদটি যশোরের ঝিকরগাছা, সাতক্ষীরার কলারোয়া ও তালা উপজেলা এবং খুলনার পাইকগাছা উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার দক্ষিণ বেদকাশি ইউনিয়নে খোলপেটুয়া নদীতে পতিত হয়েছে। নদটির সঙ্গে আগে গঙ্গা নদীর সংযোগ ছিল যা অনেক আগে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। ফলে নদটি বর্তমানে শুকিয়ে যাচ্ছে ও প্লাবনভূমিতে কোথাও কোথাও জলাবদ্ধতা দেখা যায়। সারাবছর নদটিতে ছোটো নৌকা চলাচল করে। ভাটির অংশে নদটিতে জোয়ারভাটার প্রভাব রয়েছে।

কয়রা কয়রা নদী জেলার কয়রা উপজেলার আমাদি ইউনিয়নে কপোতাক্ষ নদ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। নদীটি মহারাজপুর ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে খুলনার কয়রা উপজেলার নলিয়ান রেঞ্জ ইউনিয়নের আউরা শিবসা নদীতে পতিত হয়েছে। সারাবছর নদীতে পানি প্রবাহ থাকে এবং বর্ষাকালে দুকূল উপচিয়ে প্লাবনভূমিতে পানি প্রবাহিত হয়। সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় নদীতে পূর্ণ জোয়ারভাটার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

খোলপেটুয়া খোলপেটুয়া নদীটি সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলার বুদ্ধহাটা ইউনিয়নে বেতনা নদী থেকে উৎপন্ন হয়ে খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার দক্ষিণ বেদকাশি ইউনিয়নে আর্পানগাসিয়া নদীতে পতিত হয়েছে। নদীটি বারোমাসি। বর্ষাকালে দুকূল উপচিয়ে প্লাবনভূমিতে পানি প্রবাহিত হয়। সারাবছর নদীটিতে নৌকা চলাচল করে। নদীটিতে জোয়ারভাটার প্রভাব বিদ্যমান।

পুরাতন পশুর নদীটি খুলনা জেলার সদর উপজেলার ৩১নং ওয়ার্ডে রূপসা নদী থেকে উৎপন্ন হয়ে জেলার দাকোপ উপজেলার পানখালি ইউনিয়নে কাজিবাছা নদীতে পতিত

হয়েছে। উজানের তুলনায় ভাটিতে নদীটির প্রস্থ অনেক বেশি। সারাবছর নদীটিতে পানি থাকে এবং বর্ষাকালে দুকূল উপচিয়ে প্লাবনভূমিতে পানি প্রবাহিত হয়। নদীটিতে জোয়ারভাটার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে যে সব নদী বড়ো বড়ো মোহনা তৈরি করেছে পশুর তাদের একটি। নদীটি কাজিবাছা নদীর ভাটির অংশ থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। পশুর নদীটি খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার বাজুয়া ইউনিয়নে কাজিবাছা নদী থেকে উৎপন্ন হয়েছে। নদীটি খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার নলিয়ান রেঞ্জ ইউনিয়নে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। সারাবছর নদীটিতে পানির প্রবাহ থাকে ও বর্ষাকালে দুকূল উপচিয়ে প্লাবনভূমিতে পানি প্রবাহিত হয়। সারাবছর নদীটিতে ছোটো বড়ো নৌকা চলাচল করে। নদীটিতে জোয়ারভাটার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ নদীর তীরে মোংলা বন্দর অবস্থিত। গঙ্গার একটি বড়ো শাখা নদী গড়াইয়ের মিষ্টি পানির প্রবাহ নবগঙ্গা, আতাই, রূপসা, কাজিবাছা হয়ে পশুর নদী দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। এ নদীর বড়ো অংশ সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এবং নদীটি বঙ্গোপসাগরে পতিত হওয়ার আগে শিবসা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে গড়াইয়ের মিষ্টি পানির প্রবাহ হ্রাস পাওয়াতে পানির লবণাক্ততা রূপসা ও নবগঙ্গা হয়ে বড়োদিয়ার উজানে মধুমতিতে চলে যায়।

ভদ্রা

নদীটি খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার খর্ণিয়া ইউনিয়নে হাপরখালী নদী থেকে উৎপন্ন হয়ে একই জেলার পাইকগাছা উপজেলার দেলুটি ইউনিয়নে হাবরখালী নদীতে পতিত হয়েছে। নদীতে সারাবছর পানিপ্রবাহ থাকে না। নদীতে কিছুটা জোয়ারভাটার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ভদ্রা নদীর একটি শাখানদী ডুমুরিয়া উপজেলার দক্ষিণ-পূর্বদিকে শোভনা ইউনিয়নের পূর্বপাশ দিয়ে প্রবাহিত এটি খরস্রোতা নদী ছিল যা ১৯৯৩ সাল থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে হঠাৎ করে মৃত নদীতে পরিণত হয়েছে।

ভৈরব

ধারণা করা হয় যে ভৈরব গঙ্গার একটি অন্যতম শাখানদ ছিল। প্রায় ২৫০ বছর আগে রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায় যে, ভৈরব নদ মাথাভাঙ্গা নদীর মাধ্যমে গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে গঙ্গার সঙ্গে এর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বর্তমান মানচিত্র হতে দেখা যায় নদটি চুয়াডাঙ্গা জেলার সদর উপজেলার দর্শনা ইউনিয়নে ইছামতি- কালিন্দী নদী থেকে উৎপন্ন হয়ে খুলনা জেলার সদর উপজেলার ২১ নং ওয়ার্ডে রূপসা নদীতে পতিত হয়েছে। নদটির ভাটিতে জোয়ারভাটার প্রভাব রয়েছে। ভাটির অংশে নদটির নাব্যতা বেশি তাই শুকনো মৌসুমেও বড়ো নৌকা বা জাহাজ চলাচল করতে পারে। যশোরের নয়াপাড়া বন্দর নদটির তীরে অবস্থিত।

রূপসা রূপসা নদী প্রথমে খাল ছিল। জনৈক রূপলাল সাহা এ খালটি খনন করেন।[৮] আঠারভাঙ্গা নদীর পানির প্রবল স্রোতের আঘাতে এ খালের বিশালতা বেড়ে যাওয়ায় এটাকে এখন নদী ধরা হয়। নদীটি খুলনা জেলার সদর উপজেলার ২১ নং ওয়ার্ডে ভৈরব নদ থেকে উৎপন্ন হয়ে একই জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার জলমা ইউনিয়নে কাজিবাছা নদীতে পতিত হয়েছে। নদীটিতে সারাবছরই পানি থাকে এবং ছোটো বড়ো নৌকা ও জাহাজ চলাচল করে। নদীটিতে জোয়ারভাটার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

শিবসা নদীটি খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার লস্কর ইউনিয়নে কপোতাক্ষ নদ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। পরবর্তীকালে নদীটি একই জেলার দাকোপ উপজেলার নলিয়ান রেঞ্জ ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত পশুর নদীতে গিয়ে পড়েছে। নদীটির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপনদী হলো ঢাকী, দেলুটি, বাদুরগাছা, মিনহাজ, হাড়িয়া ও হাবরখালি। তিলডাঙ্গা ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে মিনহাজ ও ঢাকী নদী, লতা ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে দেলুটি নদী, দেলুটি ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে হাবরখালী ও বাদুরগাছা নদী, গদাইপুর ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে হাড়িয়া নদী শিবসা নদীতে পতিত হয়েছে। এছাড়াও নদীটির ছোটো ছোটো শাখাপ্রশাখা আছে। উজান অপেক্ষা ভাটিতে নদীটির প্রশস্ততা অনেক বেশি। উপকূলীয় অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় এ নদীতে পূর্ণ জোয়ারভাটার প্রভাব দেখা যায়। সারাবছর নদীটিতে ছোটো-বড়ো নৌকা চলাচল করতে পারে। নদীটির বড়ো অংশ সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। নদীটির কিছু অংশ বাংলাদেশ-ভারত প্রটোকল রুটের অন্তর্গত। নদীটির উজানের অংশে মিষ্টি পানির প্রবাহ নেই, ফলে এ নদীর পানি দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে লবণাক্ততার বিস্তৃতি ঘটায়।

প্রধান এ নদনদীগুলো ছাড়াও জেলায় আতাই, কুরুলিয়া, কাজিবাছা, কাটাখালী, গুনাখালী, চুনকুড়ি, ঝপঝপিয়া, তেলীগঙ্গা-ঘেংরাইল, ঢাকী, দেলুটি, বাদুরগাছা, শাকবাড়িয়া, সালেতা, হামকুড়া, হাড়িয়া ইত্যাদি নামে আরও অনেক নদনদী রয়েছে।

বিল ও জলাভূমি খুলনা জেলায় অতীতে অসংখ্য বিল ও জলাভূমি থাকলেও বর্তমানে অধিকাংশেরই অস্তিত্ব নেই। খুলনার উল্লেখযোগ্য বিলগুলো হলো ডুমুরিয়া উপজেলার বিল ডাকাতিয়া, মাধবকাঠি ও জলমা এবং তেরখাদা উপজেলার বর্ণাল বিল। তবে অতীতের বিলগুলোর অধিকাংশই বর্তমানে গলদা চিংড়ির ঘেরে রূপান্তরিত হয়েছে। জেলা মৎস্যদপ্তরের তথ্যনুযায়ী খুলনায় বিলের সংখ্যা, আয়তন ও মৎস্য উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য দেওয়া হলো:

---

[৮] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত. পৃ: ১২।

সারণি-৭

খুলনা জেলার বিল/জলাভূমির পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	উপজেলা	বিলের সংখ্যা	বিলের আয়তন(হেক্টর)	মৎস্য উৎপাদন ২০১৬ সাল (মেট্রিক টন)	হেক্টর মৎস্য প্রতি উৎপাদন (কেজি)
১	তেরখাদা	১০	৯০১৪.১৪	৩০৭৫.০	৩৪১.০০
২	দিঘলিয়া	৪	২১.২৩	৬.১৫	২৯০.০০
৩	রূপসা	২	২০৩.২৮	৪০.০	১৯৭.০০
৪	দাকোপ	৭	৮০.৭০	৩৩.২৮	৪১২.০০
মোট		২৩	৯৩১৯.২১	৩১৫.৪৩	

সূত্র: জেলা মৎস্য কার্যালয়, খুলনা।

আবহাওয়া ও জলবায়ু

বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মতো এ জেলাও গ্রীষ্মমণ্ডলীয় মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত। এ জেলার জলবায়ুর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো সমুদ্র উপকূলবর্তী হওয়ায় এখানে সর্বদা সামুদ্রিক বায়ুর প্রভাব বিদ্যমান এবং বাতাসে প্রচুর লবণাক্ততা থাকে, বিশেষ করে যে সময় এ জেলার ওপর দিয়ে সামুদ্রিক বায়ু প্রবাহিত হয় সেসময় বাতাসে প্রচুর লবণাক্ততা থাকে। জেলার দক্ষিণাংশের বাতাস অধিকতর ভারী এবং অস্বাস্থ্যকর। বিভিন্ন সময়ে জেলার তাপমাত্রার পরিমাণ দেওয়া হলো:

সারণি-৮

বছরওয়ারি গড় তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতা

সাল	তাপমাত্রা(সেন্টিগ্রেড)		বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	আর্দ্রতা %
	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন		
২০১৪	৩১.৮	২১.৯	১২২	৭৯
২০১৫	৩১.৬	২২.৩	১৯৫	৮১
২০১৬	৩২.১	২২.৮	১৮৫	৮১

সূত্র: আঞ্চলিক পরিদর্শন কেন্দ্র, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, গল্লামারী, খুলনা।

বৃষ্টিপাত

খুলনা জেলায় সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় জুলাই-আগস্টে এবং সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত হয় জানুয়ারিতে। ২০১৩ সালে খুলনা জেলার বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২০৭.০০ সেন্টিমিটার।[৯] কোনো কোনো বছর বৃষ্টিপাত কম অথবা এর বেশিও হয়ে থাকে। ১৯৪৯ সালে এ জেলার গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ছিল ১৬১.৬৭ সেন্টিমিটার। অপরপক্ষে ১৯৮১-৮৫ সালে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ছিল ১৫৬.৫০ সেন্টিমিটার। শীত শেষে মার্চ থেকে কিছুটা বৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং মে পর্যন্ত ধীরে

[৯] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত. পৃ: ১২।

ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। মে মাসের পরেই জেলায় কালবৈশাখি ঝড়ের আর্বিভাব হয়। কালবৈশাখির কারণে জুন, জুলাই ও আগস্টে জেলায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এই সময়কে এ জেলার বর্ষাকাল হিসেবে গণ্য করা হয়। বর্ষাকালের পরে সেপটেম্বর হতে বৃষ্টিপাত দ্রুত কমতে থাকে এবং তা ডিসেম্বরে সর্বনিম্নে পৌঁছায়। জেলার বিগত তিন বছরের মাসিক বৃষ্টিপাতের তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

সারণি-৯

খুলনা জেলার মাসিক মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ

(মিলিমিটারে)

মাসের নাম	২০১৪ সাল	২০১৫ সাল	২০১৬ সাল
জানুয়ারি	০	০৪১	০
ফেব্রুয়ারি	০২৪	০৩৫	০৯৭
মার্চ	০০৫	০২৮	০০৫
এপ্রিল	০	১০৭	০৫৪
মে	১১৮	১২৮	৩৫০
জুন	৪৪৭	৩১৮	৩৫৩
জুলাই	৩৯৪	৯২৪	৪১৩
আগস্ট	২৫৮	৩৭১	৬৪৬
সেপটেম্বর	২০৫	২৯৩	১৪৭
অক্টোবর	০১০	০৮৩	০৮১
নভেম্বর	০	০০৩	০৭৫
ডিসেম্বর	০	০০৬	০
বার্ষিক গড়	১২২	১৯৫	১৮৫

সূত্র: আঞ্চলিক পরিদর্শন কেন্দ্র, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, গল্লামারী, খুলনা।

সুন্দরবন এ জেলার বৃষ্টিপাতের পরিমাণের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। সুন্দরবনের কারণে এ জেলার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি। জেলার দক্ষিণের উপকূলীয় অংশে প্রায় প্রতিবছর এপ্রিল-মের দিকে এবং সেপটেম্বর ও অক্টোবরে এ দুঃসময়ে সামুদ্রিক ঝড় আঘাত হানে। এ ঝড়ে জেলার প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়।

তাপমাত্রা খুলনা জেলার ২০১৩ সালের বার্ষিক গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩১.৪৯^{o} সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২১.৮১^{o} সেলসিয়াস।[১০] এ জেলায় সবচেয়ে কম তাপমাত্রা থাকে ডিসেম্বর ও জানুয়ারিতে। এ সময় বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মতো এ জেলায়ও শীতকাল। তবে নভেম্বর হতে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই চার মাস এ জেলায় শীত অনুভূত হয়। এ সময় আবহাওয়া মনোরম থাকে। জেলার ওপর দিয়ে এ সময় উত্তর-পশ্চিম শীতল মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয়।

---

[১০] আবহাওয়া অধিদপ্তর, খুলনা।

শীতকালে খুলনা জেলার গড় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ২৪.৮° ডিগ্রি সেলসিয়াস ও ১১.৭° ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং এপ্রিলে তা সর্বোচ্চে পৌঁছায়। এই উচ্চ তাপমাত্রা জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিরাজ করে। জুনের মাঝামাঝি অবস্থায় যখন দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয় সেসময় তাপমাত্রা কিছুটা কমে যায়। গ্রীষ্মকালে এ জেলার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ৩৫.৪° ডিগ্রি সেলসিয়াস ও ২৪.১° ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে। শীতের শেষে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হওয়ার আগে ফেব্রুয়ারি মাসে জেলার ওপর দিয়ে যে সামুদ্রিক বায়ু প্রবাহিত হয় তাতে লবণাক্ততা থাকে।

সারণি-১০

খুলনা জেলার মাসিক গড় তাপমাত্রা (ডিগ্রি-সেলসিয়াস)

মাসের নাম	২০১৪ সাল		২০১৫ সাল		২০১৬ সাল	
	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
জানুয়ারি	২৪.০	১২.৬	২৫.৩	১৩.৮	২৫.৮	১৩.৫
ফেব্রুয়ারি	২৭.৭	১৫.২	২৯.৩	১৬.৬	৩০.৩	১৯.৪
মার্চ	৩২.৯	২০.১	৩২.৮	১৯.৭	৩৩.৯	২২.৬
এপ্রিল	৩৭.৭	২৫.১	৩৪.২	২৩.৯	৩৬.৩	২৬.৭
মে	৩৬.৮	২৬.৬	৩৬.০	২৬.৭	৩৫.১	২৫.৩
জুন	৩৩.৮	২৬.৪	৩৩.৫	২৬.৮	৩৩.৮	২৬.৫
জুলাই	৩২.৮	২৬.৯	৩১.৬	২৫.৯	৩২.২	২৬.৫
আগস্ট	৩৩.০	২৬.৭	৩২.৬	২৬.৭	৩৩.০	২৬.৫
সেপটেম্বর	৩৩.৩	২৬.২	৩৩.৩	২৬.২	৩৪.০	২৬.৪
অক্টোবর	৩৩.১	২৪.০	৩৩.১	২৪.৩	৩৩.৪	২৪.৮
নভেম্বর	৩১.০	১৮.৪	৩০.৮	২০.৩	২৯.৯	১৯.৪
ডিসেম্বর	২৫.৬	১৪.২	২৬.৩	১৬.৬	২৭.১	১৫.৫
বার্ষিক গড়	৩১.৮	২১.৯	৩১.৬	২২.৩	৩২.১	২২.৮

সূত্র: আঞ্চলিক পরিদর্শন কেন্দ্র, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, গল্লামারী, খুলনা।

আর্দ্রতা

এ জেলায় বায়ুর আর্দ্রতা সাধারণত প্রায় সারা বছরই শতকরা ৭০ ভাগের উপরে থাকে। জেলার বাৎসরিক গড় আর্দ্রতা শতকরা ৮০ ভাগ। জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে আর্দ্রতা সবচেয়ে কম থাকে। এ সময়ে আর্দ্রতা শতকরা ৭০ ভাগের কাছাকাছি নেমে আসে। জুলাই থেকে আগস্ট মাসে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রবাহকালে আর্দ্রতার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৯০ ভাগ পর্যন্ত পৌঁছায়।

নিম্নের তালিকায় খুলনা জেলার বিগত তিন বছরের আপেক্ষিক আর্দ্রতা প্রদর্শিত হলো:

সারণি-১১

খুলনা জেলার বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা(শতাংশ)

মাসের নাম	২০১৪ সাল	২০১৫ সাল	২০১৬ সাল
জানুয়ারি	৮২	৮১	৮০
ফেব্রুয়ারি	৭৫	৭৬	৭৮
মার্চ	৬৯	৭০	৭৫
এপ্রিল	৬৫	৭৭	৭৫
মে	৭৪	৭৭	৭৮
জুন	৮৪	৮৪	৮৫
জুলাই	৮৬	৯১	৮৮
আগস্ট	৮৬	৮৭	৮৬
সেপটেম্বর	৮৫	৮৬	৮৪
অক্টোবর	৮০	৮২	৮২
নভেম্বর	৭৮	৮১	৮১
ডিসেম্বর	৮২	৮৫	৮৩
বার্ষিক গড়	৭৯	৮১	৮১

সূত্র: আঞ্চলিক পরিদর্শন কেন্দ্র, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, গল্লামারী, খুলনা।

বায়ুপ্রবাহ নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত খুলনা জেলায় সাধারণত উত্তর-পশ্চিম দিক হতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়। মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বইতে শুরু করে এবং তা সেপটেম্বর পর্যন্ত চলে। বঙ্গোপসাগর এ জেলার দক্ষিণে অবস্থিত বিধায় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এ সময় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। সারা বছর বায়ু একদিক থেকে প্রবাহিত হয় না। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বায়ু-প্রবাহের দিকও পরিবর্তিত হয়।

ঋতুকাল মৌসুমি অঞ্চলের দেশগুলোর মতো বাংলাদেশও ষড়ঋতুর দেশ। দেশের অন্য জেলাগুলোর মতো খুলনা জেলায়ও নিজস্ব ফসল, তরিতরকারি, ফুল-ফল, লতাপাতার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ইত্যাদি ঋতু বৈচিত্র্যের বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রতিবছর গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত আবির্ভূত হয়। তবে ছয়টি ঋতুই সমভাবে অনুভূত হয় না। গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীতের প্রকোপ বেশি পাওয়া যায়। কিন্তু আবহাওয়াবিদগণ বায়ুপ্রবাহ, বায়ুর চাপ, বায়ুর আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও তাপমাত্রার তারতম্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশে বছরে চারটি ঋতু বা কাল চিহ্নিত করেছেন, যা সারণি-তে দেখানো হলো:

সারণি-১২

খুলনা অঞ্চলের আবহাওয়া: প্রকার ও সময়[১১]

আবহাওয়ার ধরন	বাংলা মাস	ইংরেজি মাস	ঋতু (প্রচলিত ধারণায়)
ক) মৌসুমিকাল:	জ্যৈষ্ঠ-আশ্বিন	জুন-সেপটেম্বর	গ্রীষ্মের অংশ এবং সমগ্র বর্ষা
খ) মৌসুমি উত্তরকাল:	আশ্বিন-অগ্রহায়ণ	অক্টোবর-নভেম্বর	আংশিক শরৎ এবং আংশিক হেমন্ত
গ) শীতকাল:	অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন	ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি	শীত ও আংশিক বসন্ত
ঘ) প্রাক মৌসুমিকাল:	ফাল্গুন-জ্যৈষ্ঠ	মার্চ-মে	আংশিক বসন্ত ও আংশিক গ্রীষ্ম

উৎস: আবহাওয়া অধিদপ্তর, খুলনা।

(ক) মৌসুমিকাল: (জুন - সেপটেম্বর/জ্যৈষ্ঠ-আশ্বিন)

এ সময়ে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয় বলে এ ঋতু ‘বর্ষাকাল’ নামে অভিহিত। ঋতুতে প্রধানত দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব, কখনো দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হতে মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয়ে থাকে। এ সময় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকে সাধারণত ৩০° হতে ৩২° সেলসিয়াসের মধ্যে এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকে সাধারণত ২৫° হতে ২৭° সেলসিয়াস এর মধ্যে।

(খ) মৌসুমি উত্তরকাল: (অক্টোবর-নভেম্বর/আশ্বিন-অগ্রহায়ণ)

বছরের এ সময়ে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় বলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক কমে যায়। এ সময় আকাশ পরিষ্কার থাকে। নভেম্বর মাসে সাধারণত ৮ সেন্টিমিটারের কম বৃষ্টিপাত হয়। এ ঋতুতে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা কমতে থাকে বলে শেষের দিকে শীত অনুভূত হয়। এ সময় প্রাতঃকালে প্রায়ই শিশির পড়ে এবং মাঝে মাঝে সকাল-সন্ধ্যায় কুয়াশা দেখা যায়। এ ঋতুতে প্রধানত উত্তর-পশ্চিম, উত্তর দিক হতে হিমায়িত বায়ু প্রবাহিত হয়ে থাকে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সাধারণত ২৮° থেকে ৩২° সেলসিয়াস এর মধ্যে এবং সর্বনিম্ন তাপ ১৮° হতে ২৪° সেলসিয়াস এর মধ্যে ওঠানামা করে।

(গ) শীতকাল : (ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি/অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন)

বছরের এ সময়টিতে জেলার আবহাওয়া প্রধানত শীতল ও শুষ্ক থাকে। শীতকালে বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মতো এ জেলাতেও সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে (সাধারণত ২ সে.মি. এর নিচে), তবে শীতের শেষে কিছুটা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকে। মাঝে মাঝে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সাইবেরিয়ান বায়ুপ্রবাহের ফলে তাপমাত্রা অনেক নেমে যায়। এ ধরনের আকস্মিক শৈত্যপ্রবাহে সাধারণ মানুষের অনেক কষ্ট হয়। তবু বলতে হবে খুলনায় শীতের

[১১] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮।

তীব্রতা দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহের চেয়ে অনেক কম। এ সময় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৫^{o} হতে ৩০^{o} সেলসিয়াস হতে দেখা যায় এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১^{o} হতে ১৫^{o} সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে।

(ঘ) প্রাক মৌসুমিকাল: (মার্চ-মে/ফাল্গুন-জ্যৈষ্ঠ)

এ সময় জেলার তাপমাত্রা সর্বাধিক হয়ে থাকে। এ সময়টাকে গ্রীষ্মকাল বলা হয়ে থাকে। গ্রীষ্মকালে প্রায়ই ধূলিঝড়, বজ্রপাতসহ কালবৈশাখির আবির্ভাব হয়। কালবৈশাখির সময় উত্তর-পশ্চিম দিক হতে সাধারণত ঘণ্টায় ৭০ হতে ১৪০ কি.মি. পর্যন্ত বেগে বায়ু প্রবাহিত হতে দেখা যায়। কখনো কখনো কালবৈশাখির সঙ্গে টর্নেডো প্রবাহিত হতে দেখা যায়। এ সব ঝড়ে গ্রামাঞ্চলের ঘরবাড়ি এবং বনাঞ্চলের গাছপালার প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। কখনো কখনো মানুষ, জীবজন্তুর প্রাণহানিও ঘটে থাকে।

পরিবেশ খুলনা জেলা বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ। জেলার উত্তর-পূর্বাংশ সরকারিভাবে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সৃজিত বন এবং জনগণের নিজস্ব উদ্যোগে সৃজিত গ্রামীণ বন সমৃদ্ধ। সামাজিক বন ও গ্রামীণ বন দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। খুলনা জেলায় ১৬১৪.০ সিডলিং কিলোমিটার সামাজিক বন রয়েছে। জেলার প্রতিটি বসতবাড়ি গাছগাছড়ায় পরিপূর্ণ। পারিবারিক প্রয়োজনে এ সমস্ত ফলদ ও বনজ বৃক্ষাদি রোপণ করা হয়ে থাকে। তবে বৃহত্তর খুলনা জেলায় বন বলতে জেলার দক্ষিণাংশজুড়ে অবস্থিত সুন্দরবনকেই বোঝায়।

সুন্দরবন সুন্দরবন পৃথিবীর একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন। এটি লবণাক্ত জলাভূমির একটি বিরল প্রজাতির বন। জীববৈচিত্র্যের আধার সুন্দরবনে প্রাণী ও বৃক্ষের বৈচিত্র্যময় সমাহার ঘটেছে। এখানে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণী রয়েছে। এই বন বিশ্বখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাসভূমি। সুন্দরবন বৃহত্তর খুলনা জেলাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হতে নিরাপদ রেখে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে আসছে তেমনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ জনপদের লাখ লাখ মানুষের জীবিকা নির্বাহের অবলম্বন হিসেবে কাজ করছে।

সুন্দরবনের মোট আয়তন প্রায় ১০,০০০ বর্গকিলোমিটার। তন্মধ্যে প্রায় ৬০% বাংলাদেশে অবস্থিত। ২০০৭ সাল হতে গাছ আহরণ বন্ধ রেখে সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুন্দরবনকে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ১৯৯২ সালে সুন্দরবনকে 'রামসার সাইট' এবং ১৯৯৭ সালে সুন্দরবনকে ইউনেস্কো কর্তৃক ‘বিশ্ব ঐতিহ্য’ (World heritage) ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া ১৯৯৬ সালে গেজেটের মাধ্যমে সুন্দরবনের ০৩টি অঞ্চলকে বন্যপ্রাণীর অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে।[১২]

সুন্দরবনের ভূমিভাগ সমুদ্রপৃষ্ঠের প্রায় সমান বলে এ এলাকায় জোয়ারভাটা সমূদ্রের মতোই প্রায় সমভাবে প্রবাহিত হয়। বনের পশ্চিমভাগে সারাবছর জোয়ারভাটা সমানভাবে দেখা যায়। পূর্বভাগে গ্রীষ্মকালে জোয়ারের প্রভাব বেশি

[১২] Integrated Resources Management Plans for the Sundarban (2010-2020) Vol. I.

দেখা যায়। জোয়ারের পানি ঘণ্টায় প্রায় ২৪ থেকে ৪৮ কিলোমিটার বেগে বনে প্রবেশ করে এবং বনের ভেতরে এর বেগ বৃদ্ধি পায়। জোয়ারের পানি সুন্দরবনের বাস্তুসংস্থান ও জীবনযাত্রার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। বাতাস, সমুদ্রের জোয়ারভাটা, সমুদ্রের ঢেউ এ অঞ্চলে নৌকা ও যন্ত্রচালিত লঞ্চ চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে। স্থলভাগে বাধার পরিমাণ উপকূল থেকে বেশি।

চিত্র: সুন্দরবনের জোয়ার ও ভূমিক্ষয়

সুন্দরবন অঞ্চলের বড়ো নদীগুলোতে ভূমিক্ষয় ও অবক্ষেপণ এ দুটি প্রক্রিয়াই সক্রিয়। তবে এ অঞ্চলের নদীগুলিতে ক্ষয় অপেক্ষা অবক্ষেপণ বেশি পরিলক্ষিত হয়। নদীর মোহনা, লোনা পানি ও মিষ্টি পানির মিশ্রণ এবং বনাঞ্চলের গাছপালার শিকড় বনাঞ্চলে অবক্ষেপণে সাহায্য করে। বনাঞ্চলের যে-সব স্থানে জোয়ারভাটার তীব্রতা বেশি সে-সব স্থানে ভূমিক্ষয় এবং নদী মোহনার যে-সব স্থানে জোয়ারভাটার তীব্রতা কম সে-সব স্থানে বদ্বীপ গঠিত হয়।

ইকোলজিক্যাল ক্রিটিক্যাল এলাকা

সুন্দরবনের মোট আয়তন ৬,০১৭.০ বর্গকিলোমিটার। তন্মধ্যে বনভূমি ৪,১৪,২৫৯.০ হেক্টর। এ ছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ অনুযায়ী সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য বনের উত্তর ও পূর্ব সীমানায় বনের বাইরে ১০.০ কিলোমিটার ইকোলজিক্যাল ক্রিটিক্যাল এলাকা (ECA) ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানে জমির পরিমাণ ১,৭৫,০০০.০ হেক্টর। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে মোট বনভূমির পরিমাণ ১৯,৩০৫.০ বর্গকিলোমিটার। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ভারসাম্য রক্ষার জন্য এ আয়তন নিতান্তই কম। খুলনা জেলায় সুন্দরবনের পরিমাণ ১,৮৪,২৯৭.০ হেক্টর যা কম্পার্টমেন্ট নং ১৬ হতে ২০, ২৯ হতে ৪০, ৪৩ এবং ৪৪-এ বিভক্ত। খুলনা রেঞ্জে সুন্দরবনের মোট ভূমির পরিমাণ ১,৭০,৬১০.০ হেক্টর।

বিগত ৩০/০৮/১৯৯৯ তারিখে সুন্দরবনের কিছু এলাকাকে Ecologically Critical Area ঘোষণা করা হয়েছে। ০৫টি জেলার ১০টি উপজেলার ৪৭টি ইউনিয়ন (২৬টি ইউনিয়ন সম্পূর্ণ, ২১টি ইউনিয়ন আংশিক) ECA-এর অন্তর্ভুক্ত।[১৩]

সারণি-১৩

---

[১৩] বাংলাদেশ গেজেট বিজ্ঞপ্তি: তারিখ. ৩০.৮.১৯৯৯, পরিবেশ অদিধপ্তর, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়।

খুলনা জেলার অন্তর্গত ECA এলাকার বিবরণ

জেলা: খুলনা	উপজেলা	ইউনিয়ন (সম্পূর্ণ)	ইউনিয়ন (আংশিক)
	দাকোপ	লাউডোব, বাণীশান্তা, বাজুয়া, কৈলাশগঞ্জ ও সুতারখালী	কামারখোলা
	কয়রা	দক্ষিণ বেদকাশী, উত্তর বেদকাশী, মহারাজপুর ও মহেশ্বরীপুর	বাগালী ও আমাদী
	পাইকগাছা		গড়ইখালী ও ষোলদানা

জীববৈচিত্র্য খুলনা জেলায় জীববৈচিত্র্য মূলত সুন্দরবনভিত্তিক। কৃষির প্রয়োজনে ধান, পাট, রবিশস্য ইত্যাদি নানাজাতীয় কৃষিজ শস্য ও উদ্ভিদের চাষাবাদ হয়। তা ছাড়া পারিবারিকভাবে প্রতি বাড়িতেই ফলদ ও বনজ উদ্ভিদ রোপণ করা হয়। গোরু, ছাগল, মহিষ, মুরগি, হাঁস, কবুতর, ভেড়া, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি পশুপাখি পালন করা হয় এবং পুকুর, ঘের ইত্যাদিতে নানা প্রজাতির মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া ইত্যাদি চাষ করা হয়। মানববসতিকে ঘিরে জীববৈচিত্র্য সারা দেশেরই অনুরূপ এ জেলায়। তবে সুন্দরবনই অপূর্ব জীববৈচিত্রের সমাহারের জন্য সারা বিশ্বে বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

সুন্দরবনের উদ্ভিদ সুন্দরবন পৃথিবীর বৃহত্তম সমুদ্র তীরবর্তী ম্যানগ্রোভ বন। ম্যানগ্রোভ বনের প্রকৃতিগত সব বৈশিষ্ট্যই এ বনে রয়েছে। সুন্দরবনের পশুপাখি তার বর্তমান পরিচয়ের ধারক হলেও বৃক্ষাদি এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। লোনাঞ্চলের জোয়ারভাটাবিধৌত এই বনের গাছের শেকড়েও এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কোনো গাছের শেকড়গুচ্ছ ধরনের আবার কোনোটির মূল থেকে অসংখ্য শ্বাসমূল বা শুলা বের হয়। কোনো কোনো প্রজাতির ফল গাছে থাকতেই অংকুরিত হয়। এই অংকুরিত ফল মাটিতে পড়ে গেলে তা থেকেই নতুন গাছের জন্ম হয়। এভাবেই প্রাকৃতিক উপায়ে এ বনের সৃষ্টি হয়েছে। সুন্দরবনের বৃক্ষাদি লবণাক্ত জোয়ারে ভেজা স্যাঁতসেঁতে মাটিতে জন্মায়। গাছের ফল মাটিতে পড়ে, জোয়ারের পানিতে সেই ফল বনের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে যায়। যেখানে স্থায়ীভাবে আটকে যায় সেখানেই নতুন চারা জন্মায়। সমস্ত সুন্দরবনেই প্রকৃতির এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বনায়ন হচ্ছে। উপকূলে বা নদীর পাড়ে কোথাও চর জাগলে সেখানেই সর্বপ্রথম ঘাস, লতাপাতা ও কেওড়া গাছ জন্মায়। প্রকৃতির নিয়মে কয়েক বছরের মধ্যে কেওড়া গাছ সেখান থেকে বিলীন হয়ে যায়। আর তার জায়গা দখল করে নেয় সুন্দরী, কাকড়া, বাইন ইত্যাদি গাছ। এভাবেই সুন্দরবনে বৃক্ষাদি জন্মায়। সুন্দরবন অঞ্চলের পূর্বদিকের চাঁদপাই, শরণখোলা ও খুলনা রেঞ্জে লবণাক্ততার পরিমাণ কম থাকায় সেখানে বনের প্রধান গাছ ‘সুন্দরী গাছ’ সবচেয়ে ভালো জন্মে। সুন্দরবনে শতাধিক প্রজাতির গাছ রয়েছে।

সুন্দরবনে ৩৩৪ প্রজাতির উদ্ভিদ, ১৬৫ প্রজাতির শেওলা এবং ১৩ প্রকারের অর্কিড রয়েছে।[১৪] এগুলোর মধ্যে সুন্দরী, কেওড়া, বাইন, পশুত, কাঁকড়া, গরান, গোলপাতা, সিংগ্রা, হেতাল, ভোলা, খুলশী ও গেওয়া অন্যতম।

সারণি-১৪

সুন্দরবনের বৃক্ষাদির আয়তনভিত্তিক পরিমাণ

বনের ধরন	পরিমাণ (হেক্টর)
সুন্দরী	৭৪,৯৯২
সুন্দরী-গেওয়া	১,০৫,৯৭৩
সুন্দরী-পশুর-কাঁকড়া	৯,৫৫৬
গেওয়া	২১,৫২০
গেওয়া-সুন্দরী	৭৫,৭০৩
গরান/গরান-গেওয়া	৩৪,৬০৪
পশুর-কাঁকড়া-বাইন	৬৪,৮০৭
কেওরা	৪,০৩০
অন্যান্য	৮,২৮৬
মোট	৩,৯৯,৪৭১

সূত্র: আইএফএমপি ১৯৯৮

সুন্দরবনে ৫৯ প্রকারের সরীসৃপ, ৩১৫ প্রজাতির পাখি, ৪৯ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, **জীবজন্তু** ৮ প্রজাতির উভচর, ২১০ প্রজাতির মাছ, ২৪ প্রজাতির চিংড়ি, ১৪ প্রজাতির কাঁকড়া এবং ৪৩ প্রজাতির মলাস্কসহ মোট ৬৯৩ প্রকারের জীবজন্তুর আবাস রয়েছে।[১৫] জীবজন্তুর মধ্যে রয়েছে ডোরাকাটা বাঘ, চিতাবাঘ, বন্যমহিষ, বন্য শূকর, বনবিড়াল, সজারু, বানর প্রভৃতি। ১৯৫৯ সালের দিকেও মালঞ্চ ও রায়মঙ্গল নদীর মোহনায় গন্ডার ও অসংখ্য হরিণ বিচরণ করত। শিকারিদের দায়িত্বহীন কর্মকান্ডে জেলার বনাঞ্চলে গন্ডার ও মহিষ এখন আর নেই। খুলনা জেলার বনাঞ্চলে এখনও বাঘ আছে। এখানকার ডোরাকাটা বাঘ রয়েল বেঙ্গল টাইগার পৃথিবী বিখ্যাত। পৃথিবীর অন্য কোথাও এ জাতীয় বাঘ পাওয়া যায় না। সুন্দরবনাঞ্চলে চিতাবাঘও আছে। চিতাবাঘ বসতি এলাকার নিকটে ঝোপঝাড়ে বাস করে এবং গবাদিপশু শিকার করে। এছাড়া বন্য শূকর রয়েছে। এগুলো ফসলের ক্ষতি করে থাকে। সুন্দরবন হরিণের জন্য বিখ্যাত। এখানে চিত্রা হরিণ, মায়া হরিণ, মায়া মৃগ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় হরিণ আছে। এদের মধ্যে চিত্রা বা চিতল হরিণের সংখ্যা বেশি। নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে এসব হরিণ আধা পাকা

[১৪] The Sunderbans-UNESCO World Heritage Centre Vide http:/whe. UNESCO.org/ en/ust/798.

[১৫] The Sunderbans-UNESCO World Heritage Centre Vide http:/whe. UNESCO.org/ en/ust/798.

ধানের বেশ ক্ষতিসাধন করে। চাঁদনি রাতে হরিণের পাল বনে বিচরণ করে বেড়ায় এবং বানর কর্তৃক গাছ থেকে ফেলে দেওয়া কেওড়া ফল কুড়িয়ে খায়। স্থানীয় শিকারিদের হরিণ শিকারের ফলে সুন্দরবনে হরিণের সংখ্যা কমে গিয়েছে। খুলনা জেলার বনাঞ্চলে অন্যান্য যে-সব বন্যজন্তু রয়েছে এগুলোর মধ্যে বনবিড়াল, কাঠবিড়াল, সজারু, বেজি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত জেলার সর্বত্র গৃহপালিত পশুদের মধ্যে গোরু, মহিষ, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, শূকর প্রভৃতি রয়েছে।

সরীসৃপ খুলনা জেলায় বিভিন্ন প্রকার সরীসৃপ দেখা যায়। এদের মধ্যে রয়েছে সাপ, কুমির, ব্যাঙ, টিকটিকি, কেঁচো, কচ্ছপ প্রভৃতি। এগুলো বন এবং পার্শ্ববর্তী আবাসিক এলাকায় দেখা যায়। জেলায় নানা জাতের সাপ আছে। এসব সাপের মধ্যে দাঁড়াশ বা গোরা সাপ, গুঁইসাপ, গোখরা, কাল কেউটে, পদ্মগোখরা, চন্দ্রবোড়া ও কালাস রয়েছে। এগুলো বন এলাকা, জলাশয় এবং উঁচু স্থানে দেখা যায়। কুমির দেখা যায় উপকূলে ও নদনদীর মোহনায়। মধুমতী ও ভৈরব নদের মোহনায় এখনও কুমির দেখা যায়। সুন্দরবন এলাকায় নদনদী বা খালে গোসল করা নিরাপদ নয়। আজকাল কুমিরের সংখ্যা অনেক কম। টিকটিকি খুবই সুপরিচিত সরীসৃপ। জেলার সকল এলাকায় এগুলো দেখা যায়।

কচ্ছপ ও ব্যাঙ কচ্ছপ রয়েছে দু’রকমের। এক শ্রেণির কচ্ছপ জলে এবং ন্যায় শ্রেণির কচ্ছপ স্থলভাগে বাস করে। এ জেলায় যে সকল ব্যাঙ দেখা যায় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে জলচর, উভচর এবং স্থলচর ব্যাঙ।

পাখি ও কীটপতঙ্গ খুলনা জেলায় প্রচুর পাখি দেখা যায়। এসব পাখি নানা প্রজাতির। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গেড়ী হাঁস, পাতিহাঁস, বেলে হাঁস, বনমোরগ, কুড়া, সারস, সি-গাল বা বদর কবুতর। এসব পাখি বনে এবং জলজ এলাকায় দেখা যায়। ‘মৌসুমি পাখি’ নামে পরিচিত। এরা শীতের প্রাক্কালে আগমন করে। অন্যান্য পাখির মধ্যে সচরাচর সর্বত্র দৃষ্ট কিছু পাখি রয়েছে, যেমন এগুলোর মধ্যে কাক, চিল, শকুন, চড়ুই, কোকিল, মাছরাঙা, বুলবুল, কবুতর, ঘুঘু, কাঠঠোকরা, পেঁচা, বক ধানিবক প্রভৃতি।

সুন্দরবনে বন্য প্রাণিসমূহের মধ্যে বাঘ, হরিণ, কুমির, বানর, শূকর, হাঙর উল্লেখযোগ্য। সুন্দরবনের কয়েকটি বিখ্যাত বন্যপ্রাণির জীবন বৃত্তান্তসহ বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দেওয়া হলো-

রয়েল বেঙ্গাল টাইগার ভারত ও বাংলাদেশের সুন্দরবন এলাকায় যে সুদর্শন বাঘ দেখা যায় তা পৃথিবীব্যাপী রয়েল বেঙ্গাল টাইগার নামে পরিচিত। এই পরাক্রমশালী ভয়ংকর প্রাণীর সৌন্দর্য ও মহিমা কীর্তনের জন্য ইংরেজ আমলে এর নাম দেওয়া হয়েছিল ‘রয়েল বেঙ্গাল টাইগার’ (বাংলার রাজকীয় বাঘ)। বাংলাদেশে রয়েল বেঙ্গাল টাইগারকে জাতীয় শৌর্যের প্রতীক ও জাতীয় পশু ঘোষণা করা হয়েছে। রয়েল বেঙ্গাল টাইগার একটি স্তন্যপায়ী শ্রেণির মাংসাশী প্রাণীবর্গের Felidas পরিবারভুক্ত প্রাণী। এর বৈজ্ঞানিক নাম Panthera tigris। পৃথিবীতে

বর্তমানে এই পরিবারভুক্ত ৬ (ছয়) উপপ্রজাতির বাঘ আছে।[১৬] তন্মধ্যে সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গাল টাইগার বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। কয়েক দশক আগেও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েল বেঙ্গাল টাইগারের বিচরণ ছিল। পঞ্চাশের দশকেও বর্তমান মধুপুর এবং ঢাকার গাজীপুর এলাকায় এই বাঘ দেখা যেত। মধুপুরে সর্বশেষ দেখা গেছে ১৯৬২ সালে এবং গাজীপুরে ১৯৬৬ সালে। বর্তমানে তা কেবল সুন্দরবনেই দেখা যায়। রয়েল বেঙ্গাল টাইগারের সুন্দর রূপ সুন্দরবনকে আরও মোহনীয় করেছে। রয়েল বেঙ্গাল টাইগারের গায়ের রং উজ্জ্বল বাদামি হলুদ বর্ণের এবং তার ওপর কালো ডোরা কাটা দাগের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। ডোরা দাগগুলো শরীরের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে সাজানো। কোনো কোনো বাঘের গায়ে ডোরা দাগের পরিবর্তে ফোঁটাযুক্ত দাগও দেখা যায়। এদেরকে অনেকে গুলবাঘও বলে। শরীরের নিচের দিকের এবং গায়ের ভিতরের দিকের চামড়ার বর্ণ কিছুটা সাদাটে। সাধারণত সেপটেম্বর হতে মার্চ পর্যন্ত রয়েল বেঙ্গাল টাইগারের চামড়ার বর্ণ উজ্জ্বল থাকে। পুরুষ রয়েল বেঙ্গাল টাইগার সাধারণত ২.১০ মিটার থেকে ৩.১০ মিটার লম্বা, ০.৯ মিটার থেকে ১.০ মিটার উঁচু এবং এদের গড় ওজন ২২১.২ কেজি হয়ে থাকে। বাঘিনী সাধারণত ২.৪০ মিটার থেকে ২.৬৫ মিটার লম্বা, ০.৬১ মিটার থেকে ০.৭৬ মিটার উঁচু এবং ওদের গড় ওজন ১৩৯.৭ কেজি হয়ে থাকে। শিকারের সময় বাঘ বিকট রূপ ধারণ করে। একটি পূর্ণ বয়স্ক বাঘ আস্ত গোরু বা মহিষকে অতি সহজেই কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যেতে পারে। বনের সব প্রাণীই এ জীবকে সমীহ করে চলে। বাঘের যে-কোনো পরিবেশে নিজেকে লুকিয়ে রাখার বিশেষ পারদর্শিতা বহু ঝানু শিকারিকেও নাজেহাল করে দিতে সমর্থ।

রয়েল বেঙ্গাল টাইগার নিশাচর প্রাণী হলেও সাধারণত দিনের বেলায় শিকার ধরতে বেশি পছন্দ করে। তবে অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা আবহাওয়া ও মেঘলা দিনে শিকারে বেশি বের হয়। বাঘ সাধারণত হরিণ, বন্য শূকর, বানর ইত্যাদি জীবজন্তুকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। হরিণ ও বন্য শূকর এদের প্রিয় খাদ্য। ক্ষুধার্ত বাঘ শিকার না পেলে নদী থেকে মাছ ধরে খায়। ভাটার সময় এক অভিনব পদ্ধতিতে সামনের পা দিয়ে মাছ ধরে থাকে। পরিবেশ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে এরা শিকার করে থাকে। এরা নির্জনে একাকী আহার করতে ভালোবাসে। শিকার ধরে এরা পেট ভরে খেতে পারলে দু'তিন দিন ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। বাঘ কখনও সামনাসামনি আক্রমণ করে না। অতর্কিত ভাবে পেছন থেকে কিংবা পাশ থেকে আক্রমণ করে। আক্রমণের চরম মুহূর্তে তাক নষ্ট হলে ফিরে এসে পুনরায় আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। অনেক দূর থেকে ছুটে গিয়ে শিকার ধরে না। সে আত্মগোপন করে থাকে। শিকার নাগালের ভিতর এলে তবেই আক্রমণ করে। বাঘ সব সময় বাতাসের বিপরীতে থেকে আক্রমণ

[১৬] এগুলো হলো, (Panthera tigris tigris (বাংলাদেশ-ভারত), p.t. corbetti (ইন্দো চায়না), p.t. jacksorie (মালয়েশিয়া), p.t. altaica (সাইবেরিয়া, রাশিয়া), p.t. amoyensis (চীন), p.t. Sumatrae (সুমাত্র)। উইকিপিডিয়া, ২০১৫।

করে বলে কেউই বাঘের গন্ধ টের পায় না। রয়েল বেঙ্গাল টাইগার এমন দ্রুতগতিতে এবং অতর্কিতে আক্রমণ করে যে মানুষ কিংবা পশু আত্মরক্ষার সুযোগ পায় না। বাঘ যে স্থানে শিকার করে সে স্থানে ভক্ষণ করে না। শিকারের পর বাঘ শিকারকে কাঁধের ওপর চাপিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে।

বাঘ হিংস্র প্রাণী হলেও সব বাঘ মানুষ খায় না। যে সমস্ত কারণে বাঘ মানুষ আক্রমণ করে থাকে তার কারণসমূহ নিম্নে দেওয়া হলো:

১) বৃদ্ধ বয়সে বাঘ অসুস্থ হলে বা কোনো কারণে দেহের কোথাও ক্ষতের সৃষ্টি হলে বাঘ অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রাণী শিকারের উদ্দ্যেশ্যে মানুষকে আক্রমণ করে থাকে।

২) অনেক সময় খাবারের অভাবে অথবা আত্মরক্ষার্থে মানুষকে আক্রমণ করে।

৩) কোনো কোনো সময় বাচ্চা রক্ষার্থে মানুষকে আক্রমণ করে।

৪) যে বাঘ কোনো কারণে একবার মানুষ খেয়েছে, সেটিই মানুষকে বেশি আক্রমণ করে।

বাঘ গরমের দিনে ছায়াযুক্ত ঝোপঝাড়ের নিচে এবং মাঝে মাঝে পানিতে থাকতে ও সাঁতার কাটতে ভালোবাসে। বাঘ সাধারণত এক স্থানেই বসবাস করতে ভালোবাসে। এরা ঝোপঝাড়ের নিচে নির্জন স্থান পছন্দ করে।

চিত্র : রয়েল বেঙ্গাল টাইগার

বাঘ সাধারণত এক ভার্যা প্রাণী। তবে একটি পুরুষ বাঘের সঙ্গে একাধিক বাঘিনীকেও বিচরণ করতে দেখা যায়। আশ্বিন ও কার্তিক মাস (শরৎকাল) বাঘের প্রজনন ঋতু। কোনো কোনো সময় অন্য ঋতুতেও বাঘের প্রজনন ঘটতে দেখা যায়। সাধারণত প্রজনন ঋতুতেই পুরুষ বাঘের ডাক শোনা যায়। যেই ডাকে (হুংকার) সমস্ত বনভূমি কেঁপে ওঠে। অন্যান্য প্রাণী তখন প্রাণের ভয়ে এলোপাতাড়ি ছোটাছুটি করে। বছরের বাকি সময়টি তারা নীরবে থাকে। নিঃশব্দে চলে। অন্যান্য সময় বাঘের যে ডাক শোনা যায় সেটি শিকার ধরার

গর্জন মাত্র। প্রজনন ঋতুতে পুরুষ বাঘের প্রচণ্ড ডাকে বাঘিনী কাছে আসে এবং মিলন হয়। গর্ভাবস্থা থেকে বাচ্চা প্রসব করতে সময় লাগে ১৪-১৬ সপ্তাহ। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বাঘিনী বাচ্চা দেয়। প্রসবের সময় বাচ্চাগুলোর চোখ ফোটে না। চোখ ফুটতে সময় লাগে দুই সপ্তাহের মতো। বাঘের বাচ্চা আকারে প্রায় কুকুরের বাচ্চার মতোই। বাঘ বাচ্চাদের খেয়ে ফেলার ভয়ে বাঘিনী নির্জন নিরাপদ স্থানে বাচ্চা প্রসব করে। বাচ্চা জন্ম দেওয়ার পর থেকে পরবর্তী দেড় বছর পর্যন্ত বাঘিনী তার বাচ্চাদের রেখে দূরে কোথাও যায় না। বাঘিনীর এত সতর্কতা অবলম্বনের পরও পুরুষ বাঘের হাত থেকে একটা অথবা দুটোর বেশি বাচ্চা বাঁচাতে পারে না। বাকিগুলো বাঘ খেয়ে ফেলে। অনেক সময় সব বাচ্চা বাঘের ভক্ষণে চলে যায়। বাচ্চাওয়ালা বাঘিনী সব থেকে বিপদজনক জন্তু। বাঘের বাচ্চারা ছয় মাসের মতো মায়ের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকে। আড়াই থেকে তিন বছর পর বাঘের বাচ্চাদের স্থায়ী দাঁত ওঠার পর শাবক বাঘ মায়ের বন্ধন থেকে ক্রমশ সরে গিয়ে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে।

বাঘের আয়ু ৩০ বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে। ২০১৫ সালে বাঘ জরিপ প্রতিবেদন মতে সুন্দরবনে প্রায় ১০৬টি বাঘ রয়েছে।[১৭] রয়েল বেঙ্গল টাইগার সুন্দরবনে চুরি করে গাছকাটা, হরিণ শিকার, পাখি শিকার ইত্যাদির বিরুদ্ধে অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে কাজ করে। জাতীয় ঐতিহ্যের কারণে এবং পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার্থে এই বাঘ সুন্দরবন তথা বাংলাদেশের এক অমূল্য সম্পদ।

হরিণ

সুন্দরবনে যে হরিণ দেখা যায় তাকে 'চিত্রা হরিণ' বা চিতল হরিণ বলে। ইংরেজিতে এদের Spotted Deer বলে। এর বৈজ্ঞানিক নাম Axis axis। অতীতে বাংলাদেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলে এগুলো দেখা যেত। বর্তমানে কেবলমাত্র সুন্দরবনেই পাওয়া যায়। চিত্রা হরিণ ছাড়া সুন্দরবনে মায়া হরিণও দেখা যায়। তবে চিত্রা হরিণের সংখ্যাই বেশি। সুন্দরবনের সৌন্দর্য হরিণকে বাদ দিয়ে কল্পনা করা যায় না। বর্তমানে সুন্দরবনে প্রায় ১,০০,০০০ হতে ১,৫০,০০০টি হরিণ আছে।[১৮] প্রাপ্তবয়স্ক চিত্রা হরিণ উচ্চতায় ৯০ সে. মি. থেকে ১০০ সে. মি. এবং লম্বায় ১.২ মিটার থেকে ১.৫ মিটার হয়ে থাকে। চিত্রা হরিণের গা লালচে বা বাদামি এবং এর উপরে সাদা ফোঁটার সমাহার। গলা ধবধবে সাদা, বুক ও পেট সাদাটে। পুরুষ হরিণের শিং গজায়। এদের স্থানীয় ভাষায় 'শিংগেল' বলে। বয়স এবং খাদ্যের রকমফেরের জন্য শিং ওঠা বা ছোটো-বড়ো হওয়া নির্ভর করে। প্রতিটি শিং-এর তিনটি শাখা থাকে।

হরিণ তৃণভোজী প্রাণী। নদীর তীরে নতুন ধানশি ঘাসের কচিপাতা, লতা, গুল্ম, ফলমূল খেয়ে এরা জীবনধারণ করে থাকে। কেওড়া গাছের পাতা ও ফল এদের প্রিয় খাদ্য। দুপুরে এরা ছায়াঘেরা নিভৃত অঞ্চলে আশ্রয় নিয়ে নিঃশব্দে বিশ্রাম নেয় ও জাবর কাটে। গোধূলিলগ্নে নদীর তীরে খোলামেলা স্থানে বিচরণ ও আহার করে।

---

[১৭] বন বিভাগ, খুলনা।

[১৮] ওই।

চিত্র: দলবদ্ধ হরিণ

এরা সমাজবদ্ধ প্রাণী। প্রতি দলে একজন দলপতি থাকে। বড়ো ও শক্তিশালী পুরুষ হরিণটি দলপতি হয়। সুন্দরবনের দক্ষিণাঞ্চলে কটকা, কচিখালী, দুবলা প্রভৃতি স্থানে প্রতি দলে শতাধিক হরিণ দেখা যায়। সুন্দরবনের বানর এদের বন্ধু। বাঘের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বানর এদের সাহায্য করে।
চিত্রা হরিণ বহুভার্যা প্রাণী। সারা বছরই এদের প্রজনন সময়। তাই সারা বছরই বাচ্চা জন্মাতে দেখা যায়। এদের গর্ভধারণ কাল ছয় মাস। প্রতিবারে সাধারণত ১টি করে বাচ্চা জন্মাতে দেখা যায়। ২ বছর বয়সে শিশু চিত্রল বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। একটি চিত্রল হরিণ গড়ে ১২-১৫ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। হরিণের মাংস, চামড়া ও শিং-এর চাহিদা প্রচুর। বর্তমানে সুন্দরবনে হরিণের সংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে।

কুমির সুন্দরবনের জলজ প্রাণীদের মধ্যে কুমির অন্যতম। এখানে লোনাপানি প্রজাতির কুমির পাওয়া যায়। এরা Crocodylidae পরিবারভুক্ত। বৈজ্ঞানিক নাম Crocodylus porosus। সুন্দরবনের নদীগুলোতে মাঝে মধ্যে মিঠা পানির কুমির ও ঘড়িয়াল প্রজাতির কুমির দুই-একটি দেখা যায়। সুন্দরবনের সর্বত্র লোনা পানির কুমিরের দেখা পাওয়া যায়। সুন্দরবনে বর্তমানে অনুমান ১৫০ হতে ২০০টি কুমির রয়েছে।[১৯] সুন্দরবনের শাপলা খাল, মরাভোলা, ভদ্রা নদী, শেলা নদী, শিবসা ও পশুর নদীতে তুলনামূলকভাবে অধিক সংখ্যায় কুমির দেখা যায়।

বানর অসংখ্য বানরে সুন্দরবন ছেয়ে আছে। কখনো গাছে, কখনো হরিণের পিঠে আবার কখনও ব্যঞ্জভরে বিচিত্র ভঙ্গিতে বনাঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়। এরা অধিকাংশ সময় গাছেই বিচরণ করে। এদের শরীর প্রায় ৬০-৬৫ সেন্টিমিটার দীর্ঘ হয়। বর্তমানে সুন্দরবনে ৪০,০০০ হতে ৫০,০০০টি[২০] বানর আছে। বনের অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে হরিণের সঙ্গে এদের বন্ধুত্ব খুব বেশি। স্বভাবে এরা অত্যন্ত

[১৯] বন বিভাগ, খুলনা।
[২০] বন বিভাগ, খুলনা।

কৌতুকপ্রিয়। মাঝে মাঝে হরিণের পিঠে চড়ে বসে এদের আনন্দ উপভোগ করতে দেখা যায়। সুকৌশলে বনের হরিণকে এরা বাঘের আগমন বার্তা জানিয়ে দেয়। বাঘের আগমন সম্পর্কে এরা শুধু হরিণকেই বিপৎসংকেত দ্বারা সতর্ক করে না, বনে কর্মরত মানুষকেও তারা সাবধান করে দেয়। বাঘের সঙ্গে তারা নানা প্রকার কৌতুক করে থাকে।

বন্য শূকর

সুন্দরবনে প্রায় ২০,০০০ হতে ২৫,০০০টি[২১] বন্যশূকর আছে। শূকর প্রায় তিন হাত লম্বা হয়। উচ্চতা আনুমানিক এক হাত। এদের শরীরের রং রক্তাভ কৃষ্ণবর্ণ। ঘাড়, বুক ও পেটের লোম গোড়ার দিকে কালো হলেও অগ্রভাগ শ্বেত বর্ণের হয়। বনের সর্বত্র এদের বাস। হরিণের মতো প্রায়শই এরা বাঘের শিকারে পরিণত হয়। এদেরকে শিকার করতে হলে বাঘকে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করতে হয়। কেননা এরাও যথেষ্ট শক্তিশালী। বনে মাঝে মধ্যে বাঘের সঙ্গে শূকরের লড়াই হয়ে থাকে। কিন্তু বাঘ অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী বলে শেষপর্যন্ত শূকরকে হার মানতে হয়। এদের মাথা প্রকান্ড। দৈর্ঘ্যে ৫০ সেন্টিমিটার থেকে ৬০ সেন্টিমিটারের কম হয় না। এদের দাঁতগুলো খুব বড়ো এবং প্রখর। একটি বন্যশূকরের দাত ১৫ সে. মি. থেকে ২০ সে.মি. পর্যন্ত দীর্ঘ হয়ে থাকে।

হাঙর

কুমিরের মতো হাঙরও সুন্দরবনের একটি ভয়ংকর জলজ প্রাণী। সুন্দরবনের লোকেরা একে বলে 'কামট'। কুমির অপেক্ষা হাঙর পানিতে আরও বেশি ক্ষিপ্র। সুন্দরবনের নদী, খাল ও সমুদ্রের সর্বত্র এদের বিচরণ। হাঙরের দাঁত এত তীক্ষ্ণ যে শরীরের কোনো অংশ কেটে নিয়ে গেলে শব্দ হয় না। দ্রুতগতিতে হাঙর পানিতে অবস্থানরত মানুষকে বা অন্য কোনো প্রাণীকে আক্রমণ করে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে শরীরের অংশবিশেষ কেটে নিয়ে যায়। সুন্দরবন এলাকায় প্রায়ই এ ধরনের ঘটনা ঘটে। তবে কখনো গোটা মানুষকে নিয়ে যেতে দেখা যায় না।

জলবায়ু পরিবর্তন

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে জলবায়ু পরিবর্তন এখন একটি বহুল আলোচিত বিষয়। যদিও বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অতি অল্প পরিমাণ (মাত্র ০.১৫%) কার্বন নিঃসরণ করে তবু বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য চরম ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম। এ দেশে উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসরত প্রায় দেড় কোটি অধিবাসী এই ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলে সমুদ্রের উচ্চতা আগামী ২১০০ সাল নাগাদ প্রায় ১ মিটার বাড়তে পারে যার ফলে তলিয়ে যেতে পারে এ দেশের শতকরা প্রায় ১৭.৫ ভাগ ভুমি (The World Bank Book 2000), উদ্বাস্তু হতে পারে ৪ কোটি মানুষ (Earth Policy Institute 2004)। মূলত উন্নত দেশগুলোর কার্বন নিঃসরণের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশই হবে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ। যদিও সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুন্দরবন সবুজ কার্বন এবং নীল কার্বন সংরক্ষণ করে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে তবুও বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশেও তাপমাত্রা বৃদ্ধি, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি,

[২১] ওই।

লবণাক্ততা ও সর্বোপরি ঝড়-ঝঞ্ঝা জলোচ্ছ্বাসের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বাতাসের কার্বন-ডাই অক্সাইড শোষণ করে পরিবেশের বিরূপ প্রতিক্রিয়াকে মন্থর করার সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

সুন্দরবন তার ইকোসিস্টেমের মাধ্যমে এদেশের মানুষেরও জীবন জীবিকার সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। বনের ওপর নির্ভরশীল বনের পার্শ্ববর্তী এলাকার জনগণ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় অবস্থান করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে সুন্দরবনের সম্পদ আহরণে স্থানীয় জনগোষ্ঠী জীবন জীবিকার তাগিদে তাদের কর্মপরিকল্পনা, কার্যপদ্ধতি এবং বেঁচে থাকার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। এ জন্যই কোনো কোনো সময় তারা জীবন-জীবিকার তাগিদেই পরিবেশগত শরণার্থী (Climate Refugee)তে রূপান্তরিত হয়। এ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার ও বন বিভাগ Climate Change Mitigation and Adaptation পরিকল্পনা মোতাবেক স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা উন্নয়নে কাজ করছে।

অধ্যায়-২

ইতিহাস

ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক তথ্যাবলির অপ্রতুলতার জন্য খুলনা অঞ্চলের প্রাচীনকালের ইতিহাস লিখন দুরূহ। গ্রিক ইতিহাসবিদ্ ও পরিব্রাজকগণের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, আজকের খুলনা অঞ্চলটি ছিল বঙ্গীয় বদ্বীপের একটি অংশ। এ জেলা গঙ্গার প্রধান দুটি শাখানদী পদ্মা ও ভাগীরথীর সর্বদক্ষিণে অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গের অজয় দামোদর উপত্যকা, বর্ধমান, উত্তরবঙ্গ কিংবা চট্টগ্রাম অঞ্চলে নব্য প্রস্তর বা তাম্রযুগে লোকবসতির প্রমাণ পাওয়া গেলেও এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায় না যে, সে সমসাময়িক যুগে খুলনার সৃষ্টি হয়েছিল বা লোকবসতি গড়ে উঠেছিল। জেলার ভূমিগঠন থেকে বোঝা যায় ওই সমস্ত এলাকার তুলনায় খুলনা অপেক্ষাকৃত নবীন। এখানে গঙ্গা থেকে শত শত বছর ধরে বয়ে আসা পলি জমে জমেই আজকের খুলনা জেলার ভূমি গঠিত হয়েছে।

নন্দ, মৌর্য ও গুপ্তযুগ

নন্দযুগে (৩৪৫-৩২১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) খুলনা অঞ্চলের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। নন্দ বংশের শাসনামলের শেষভাগে সম্রাট আলেকজান্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন। তার পরপরই চন্দ্রগুপ্তের হাতে নন্দ বংশের পতন হয়। নন্দযুগে বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলের নাম ‘উপবঙ্গ’ ছিল বলে অনুমিত হয়। এই উপবঙ্গ ছিল ‘গঙ্গারিডি’ নামক বিস্তৃত একটি রাজ্যের অংশ, যার প্রধান শহর ছিল গঙ্গে বা গঙ্গারাডিয়া। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে গ্রিক ভাষায় লিখিত ‘পেরিপ্লাসে’ও গঙ্গেবন্দর থেকে প্রবাল, উৎকৃষ্ট মসলিন জাতীয় দ্রব্য বিদেশে রফতানি হতো বলে উল্লেখ আছে। বাংলায় মৌর্যযুগে উপবঙ্গ অঞ্চলটির নাম হয় সমতট। সমতট অঞ্চলটি সমুদ্র থেকে পদ্মা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং পূর্ব দিকে এর বিস্তার ছিল কমলাঙ্গ (কুমিল্লা) ও চট্টল (চট্টগ্রাম) পর্যন্ত। সে সময়ের খুলনার প্রাচীন ইতিহাসের লিখিত বিবরণী পাওয়া যায় চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাংয়ের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে। তাঁর বর্ণনা থেকে জানা যায় মৌর্যযুগেই বুদ্ধদেব কর্ণসুবর্ণ, সমতট প্রভৃতি স্থানে আগমন করেন এবং সমতটে যেখানে তিনি ধর্মপ্রচার করেন সেখানে মগধরাজ অশোকের সময় এক স্তূপ নির্মিত হয়।[১] এ থেকে অনুমিত হয় মৌর্যযুগে সমতট এবং তার অন্তর্গত খুলনা অঞ্চলটি মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। গুপ্তযুগে বিশেষ করে সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে, বর্তমান খুলনার অংশবিশেষ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। এলাহাবাদ শিলালিপিতে দেখা যায় সমুদ্রগুপ্ত (৩৪০-৩৮০ সাল) সমতট পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের (৩৮০-৪১২ সাল) সময়ও এই অঞ্চল গুপ্তদের দ্বারা বিজিত হয়। দিল্লিতে অবস্থিত কুতুব মিনারের সন্নিকটে একটি লৌহস্তম্ভে এটি

[১] আবদুশ শাকুর (সম্পা.), বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার বৃহত্তর খুলনা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, ১৯৯৬, পৃ.৩৭।

উৎকীর্ণ আছে। ধারণা করা যায় কুমার গুপ্ত (৪১৩-৪৫৫ সাল), স্কন্দগুপ্ত (৪৫৫-৪৮৬ সাল) এবং অন্যান্য গুপ্ত সম্রাটদের সময়ও এই এলাকা গুপ্তদের অধীনে ছিল।[২]

গুপ্তযুগের শেষদিকের সম্রাটগণ দুর্বল ছিলেন এবং এ সময় পশ্চিম দিকে হুনদের আক্রমণ প্রবলতর হয়। মালব রাজা যশোধর্ম হুনদের পরাজিত করে উপমহাদেশের সবচেয়ে শক্তিশালী সম্রাটে পরিণত হন। তিনিও তাঁর রাজ্য সমতট পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। যশোধর্মের পর কান্যকুবেজ শাসকগণ উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেন। কিন্তু ওই সময়ে বর্তমান খুলনার অবস্থা কীরূপ ছিল তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে অনুমিত হয় এই সময় থেকে উপমহাদেশের এ অঞ্চলের ওপর পশ্চিমা প্রভাব খর্ব হতে শুরু করে।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য এবং সমাচার দেব নামক তিনজন শাসকের নাম পাওয়া যায়। ফরিদপুরের কোটালিপাড়ায় আবিষ্কৃত পাঁচটি শিলালিপিতে উল্লেখ আছে এই তিনজন শাসক 'মহারাজা' উপাধি ধারণ করেন এবং স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। তাঁরা এ এলাকার ওপরও (দক্ষিণ বঙ্গ) আধিপত্য বিস্তার করেন। এদের মধ্যে গোপচন্দ্রই সর্বপ্রথম ক্ষমতায় আসীন হন। কিন্তু তিনজনের পারস্পরিক সম্বন্ধ সঠিক করে নিরূপণ সম্ভব নয়। তাঁদের শিলালিপি, তাম্রশাসন বা মুদ্রায় বংশ পরিচয় পাওয়া যায় না। এসব তাম্রশাসন থেকে বঙ্গ রাজ্যের প্রভাব, প্রতিপত্তি এবং সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।[৩] খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক (৬০৬-৬৩৭ সালে) গৌড় জয় করেন। সমতট এবং সমতটের অংশ হিসেবে খুলনা অঞ্চলটিও তখন শশাঙ্কের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। শশাঙ্ক শৈব ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর সময়েই বৌদ্ধগয়ার শিবমূর্তি প্রাচীরে সমাবৃত করে স্থাপন করা হয়। কিন্তু শশাঙ্কের আমলে বৌদ্ধনিগ্রহ বা বৌদ্ধমূর্তি ধ্বংসের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। শশাঙ্কের সময় থেকেই বৌদ্ধমূর্তি শিব প্রতিকৃতির সঙ্গে মিশে যেতে শুরু করে।[৪] অনুমিত হয় সে সময় থেকেই সমতটে শৈবধর্ম প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর খুলনা জেলা উত্তর ভারতের শেষ হিন্দু (পরে বৌদ্ধ) নৃপতি হর্ষবর্ধনের (৬০৬-৬৪৭ সাল) শাসনাধীন ছিল।

খড়গ রাজবংশ

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে গোলযোগ শুরু হয়। ৬৪৭ সালে হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হলে দেশ শাসনে অনিশ্চয়তা লেগেই থাকে। সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গের এ অঞ্চলে (দক্ষিণ পূর্ববঙ্গ) খড়গ বংশের আবির্ভাব ঘটে। সম্ভবত খুলনা জেলা এই খড়গ বংশের শাসনাধীনে ছিল। নারায়ণগঞ্জ জেলার অন্তর্গত আশরাফপুরে প্রাপ্ত দু'টি তাম্রশাসন এবং কুমিল্লা জেলার দেউলবাড়িতে প্রাপ্ত অপর একটি মূর্তিলেখ এবং চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং-চির

---

[২] আবদুশ শাকুর (সম্পা), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭।

[৩] ওই পৃ. ৩৮।

[৪] সতীশ চন্দ্র মিত্র, যশোর খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কলকাতা, পৃ. ১৮৮।

বিবরণী থেকে এ বংশের ইতিহাস জানা যায়। এসব পুরাকীর্তি এবং চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, এ বংশের খড়্গোদ্যম, জাতখড়্গ ও দেবখড়্গ নামে তিনজন রাজা ছিলেন। খড়্গ বংশীয় রানি প্রভাবতী ও শেষ রাজা রাজভট্টের নামও এসব প্রত্নবস্তুতে উল্লেখ আছে।[৫]

যশোবর্মা, পাল ও চন্দ্র বংশ

সপ্তম শতাব্দীর শেষাংশ থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলাদেশ বার বার বৈদেশিক আক্রমণের শিকার হয়। সম্ভবত বঙ্গ ও মগধের শাসকের মতো বঙ্গের খড়্গ নৃপতিগণ উত্তর ভারতীয় আক্রমণের কবলে পড়ে এবং বঙ্গে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়। সম্রাট হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর যশোবর্মা (৭২৫-৭৫২ সাল) কান্যকুব্জের সিংহাসন দখল করেন এবং রাজ্য জয়ে বের হন। তিনি গৌড় ও বঙ্গ জয় করেন। বঙ্গ বিজয়ের ফলে খুলনা অঞ্চলেও তাঁর আধিপত্য বিস্তৃত হয়। কিন্তু বাংলায় তাঁর শাসন ক্ষণস্থায়ী ছিল এবং তাঁর শাসনামল সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। তারপর পঞ্চগৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করেন রাজা জয়ন্ত। জয়ন্ত পঞ্চগৌড়েশ্বর ছিলেন নামমাত্র। ওই সময় গৌড়রাজ্য গুর্জ্জর, রাষ্ট্রকূট প্রভৃতি রাজ্য দ্বারা আক্রান্ত হতে থাকে। বহিঃশত্রুর আক্রমণে গৌড়ে তখন 'মাৎস্যন্যায়' শুরু হয়। তখন জনসাধারণ দৈশিক শান্তির জন্য পালবংশীয় রাজা গোপালের হাতে পাটলিপুত্রের ক্ষমতা সমর্পণ করে। তখন পাল ও শূর বংশীয় রাজারা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল শাসন করতেন। গোপাল সমুদ্র পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। সেই হিসেবে সমতট এবং তৎসংশ্লিষ্ট খুলনা অঞ্চলও গোপালের অধীনে ছিল বলে অনুমিত হয়।[৬] পাল বংশের রাজত্বকালে প্রাদেশিক রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে চন্দ্র বংশের উত্থান ঘটেছিল।[৭] কিন্তু সমতট এবং তৎসংশ্লিষ্ট খুলনা অঞ্চল তখন তাদের অধীনে ছিল কীনা সে বিষয়ে ইতিহাসে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। রাজেন্দ্র চোল ও কলচুরী রাজা কর্ণের বঙ্গ আক্রমণের সময় প্রথম মহীপালের (৯৯৫-১০৪৩ সাল) রাজত্বকালেও সমতটসহ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা স্বল্পকালের জন্য পাল রাজাদের শাসনাধীন ছিল। তৃতীয় বিগ্রহপালের (১০৫৮-১০৭৫ সাল) সঙ্গে কলচুরী রাজা কর্ণের সুসম্পর্ক থাকায় তিনি দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা পাল রাজ্যভুক্ত করেন। তৃতীয় বিগ্রহপাল (১০৫৮-১০৭৫ সাল), দ্বিতীয় মহীপাল (১০৭৫-১০৮০ সাল) এবং রামপাল (১০৮২-১১২৪ সাল) সমতটসহ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় রাজত্ব করেন। কুমার পালের মন্ত্রী বৈদ্যদেবের কমৌলি তাম্রশাসন থেকে জানা যায় তাঁর শাসনকালে দক্ষিণবঙ্গে এক প্রচন্ড বিদ্রোহ দেখা দেয়। নৌবাহিনীর সহায়তায় এই বিদ্রোহ দমন করা হয়। তখন এলাকার লোকেরা নৌযুদ্ধে পারদর্শী ছিল। এ ঘটনা থেকে অনুমিত হয় তৎকালীন খুলনা কুমার পালের অধীন ছিল। পাল রাজত্বকালে কখনও খুলনায় নিরবচ্ছিন্ন শান্তি স্থাপিত হয়নি। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজশক্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এ কারণে এ এলাকায় অনেক রাজার সন্ধান পাওয়া যায়। কলারোয়া

---

[৫] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮।

[৬] সতীশচন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, ২০১১, পৃ. ১৫০।

[৭] দীনেশ চন্দ্র সেন, বহৎ বঙ্গ(প্রথম খন্ড), তৃতীয় মুদ্রণ, দে'জ প্রকাশনা, মার্চ, ২০০৬, পৃ. ২৭৩।

থানার ধানদিয়ার সন্নিকটে মানিঘরে তিয়র রাজা, যশোর-খুলনা সীমান্তে ভরত ভায়নার ভরত রাজা, সাতক্ষীরার সন্নিকটে গণরাজা এসব রাজাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।[৮]

খুলনা জেলার বিভিন্ন স্থানে পালযুগের স্থাপত্যশিল্পের প্রচুর নিদর্শন সাম্প্রতিককালেও দেখা গেছে। 'কপিলমুনি' জেলার একটা প্রাচীন স্থান। এখানে এককালে বর্ধিষ্ণু বৌদ্ধ এলাকা গড়ে ওঠার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। মাটি খনন, বিশেষ করে পুকুর খননের সময় ভাঙ্গা দেওয়ালের ইট, মূর্তি ইত্যাদি সাম্প্রতিককালেও আবিষ্কৃত হয়েছে। বুড়ি ভদ্রার তীরে ভরত ডায়নার ভরত রাজার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানকার প্রাচীন ইটের স্থাপনা দেখে বোঝা যায়- এখানেও একটা বৌদ্ধ সংঘা রাম অবস্থিত ছিল এবং উল্লিখিত রাজা ভরত এ সমস্ত সংঘরামের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

বর্ম বংশ একাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে রামপালের রাজত্বকালে (১০৮২ -১১২৪ সাল) উত্তরবঙ্গে সংঘটিত কৈবর্ত বিদ্রোহের ফলে বাংলায় পাল রাজশক্তি যখন ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে তখন খুলনাসহ দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে 'বর্ম' উপাধিধারী এক রাজবংশের আবির্ভাব ঘটে। বেলাব তাম্রশাসনই (ঢাকা জেলার অন্তর্গত বেলাব গ্রামে প্রাপ্ত) এই বংশের ইতিহাসের একমাত্র উৎস। বর্মবংশের আদিপুরুষ বজ্রবর্ম প্রথমে সামন্ত রাজা ছিলেন এবং পরে তাঁর পুত্র জাতবর্ম বহু যুদ্ধে জয়লাভ করে সার্বভৌমত্ব অর্জন করেন। জাতবর্ম কেবলমাত্র নিজের বাহুবলে বঙ্গ, কামরূপ ও বরেন্দ্রে স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করেন। খুলনা জেলাসহ দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে তিনি একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। জাতবর্ম তৃতীয় বিগ্রহ পালের (১০৫৮- ১০৭৫ সাল) সমসাময়িক ছিলেন। সুতরাং দেখা যায় জাতবর্ম একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করেন। তাঁর পুত্র হরিবর্ম ও সামলবর্ম একাদশ শতাব্দীর শেষাংশ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশ পর্যন্ত রাজত্ব করেন বলে অনুমান করা হয়। তার রাজধানী সম্ভবত বিক্রমপুরে ছিল। সামলবর্ম রামপালের মিত্র ছিলেন। কিন্তু তাঁর রাজত্বকালের বিশেষ কোনো বিবরণী পাওয়া যায়নি।[৯]

সামল বর্মের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ভোজবর্ম বর্ম রাজ্যের অধীশ্বর হন। বিক্রমপুর থেকে তাঁর রাজত্বের পঞ্চম বৎসরে উৎকীর্ণ তাম্রশাসন অনুযায়ী পরমবৈষ্ণব, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধিধারী ভোজবর্ম যে একজন স্বাধীন ও পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন এমন অনুমান করা সংগত। তাঁর পর এ বংশের আর কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সেন রাজা বিজয় সেন (১০৯৭-১১৩০ সাল) সম্ভবত বর্ম বংশীয় ভোজবর্ম অথবা তাঁর উত্তরাধিকারীকে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ থেকে উচ্ছেদ করেছিলেন।[১০]

---

[৮] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯।
[৯] ওই পৃ. ৪০।
[১০] ওই পৃ. ৪০।

সেনযুগ

মহারাজা মহীপালের রাজত্বকালে সামন্ত সেন কর্ণাট থেকে এসে সুবর্ণরেখা নদীর তীরে একটি ছোটো রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। সিরাজগঞ্জের তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, তিনি কর্ণাটের ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁর পুত্র হেমন্ত সেন ছিলেন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা। তিনি বরেন্দ্র রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। হেমন্ত সেন বা বিজয় সেনের সঙ্গে শূরবংশীয় রাজাদের বিবাহসূত্রে আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল। বিজয় সেন গৌড় জয় করেছিলেন। তার হাতে মদনপালের পতন হয়। তারপর বিজয় সেন কলিঙ্গ ও কামরূপ জয় করেন। তিনি মিথিলাধিপতি নান্যদেবকে পরাজিত ও কারারুদ্ধ করেন। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিজয় সেন ভোজবর্ম অথবা তাঁর উত্তরাধিকারীকে পরাজিত করে খুলনা জেলাসহ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার এ অঞ্চল নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। বরেন্দ্র অঞ্চলের বিজয়পুরে ছিল বিজয় সেনের রাজধানী।[১১] বিজয় সেন প্রাচীন ইতিহাসে বাংলার একটি বড়ো অংশকে একটি কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি ‘পরমেশ্বর’, ‘পরমভট্টারক’ ও ‘মহারাজাধিরাজ’ উপাধি গ্রহণ করেন। এ ছাড়াও তিনি নিজেকে ‘অবিরাজ বৃষভশঙ্কর’ নামক গৌরবসূচক উপাধিগ্রহণ করেছিলেন।

বিজয় সেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বল্লাল সেন (১১৬০-১১৭৮ সাল) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর শাসনামলে ‘বাগড়ী’ নামক প্রশাসনিক এলাকা সেন রাজ্যের অন্যতম প্রধান প্রশাসনিক বিভাগ ছিল। বর্তমানকালের খুলনা জেলা তৎকালীন বাগড়ীর (সুন্দরবন-মেদিনীপুর অঞ্চল) অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ অঞ্চল তৎকালে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত ছিল। বল্লাল সেন একজন নিষ্ঠাবান শৈব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সে পুত্র লক্ষ্মণ সেনের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ এবং তাঁকে সাম্রাজ্য রক্ষারূপ মহাদীক্ষায় দীক্ষিত করে সস্ত্রীক ত্রিবেণীর নিকট (বর্তমান এলাহাবাদ) গঙ্গা তীরে বাণপ্রস্থ অবলম্বনপূর্বক শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। ‘অদ্ভুতসাগর’-এর একটি শ্লোকে এই বিবরণ পাওয়া যায়। এর অন্য অর্থও করা যায় যে, বৃদ্ধ রাজা ও রানি স্বেচ্ছায় গঙ্গাগর্ভে দেহত্যাগ করেছিলেন।[১২]

বখতিয়ার খিলজির নদীয়া জয়

লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের শেষদিকে সেন রাজ্যের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং পতনের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করার মতো কোনো ক্ষমতা ও প্রস্তুতি লক্ষ্মণ সেনের ছিল না। ফলে ১২০৪-০৫ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি আকস্মিকভাবে বাংলা আক্রমণ করলে তিনি নৌপথে নদীয়া ত্যাগ করে বিক্রমপুরে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। তিনি বিক্রমপুর থেকে সেন রাজ্য শাসন করেন এবং ১২০৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। স্থানীয় প্রভাবশালী কোমলপাল নামক একজন নৃপতি লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে খুব সম্ভবত খুলনা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অধিকার করেন

[১১] সতীশচন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৫।
[১২] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১।

বলে অনুমিত হয়। পরবর্তীকালে সেন রাজাদের মধ্যে বিশ্ব সেন (১২০৬ - ১২২৫ সাল) ও কেশব সেনের (১২২৫-১২৩০ সাল) নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যুর পর স্বাধীন সেনবংশের রাজত্ব অর্ধ শতাব্দীকালেরও বেশি সময় অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল।

১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির নদীয়া বিজয়ের মাধ্যমে বাংলায় মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন হয়। নদীয়া বিজয়ের মধ্য দিয়ে বখতিয়ার খিলজী বাংলার একটি অংশকে হস্তগত করতে পেরেছিলেন। তার রাজ্যসীমা আগে তিস্তা ও করতোয়া নদী, উত্তরে পদ্মা নদীর অপর পারে দিনাজপুর হয়ে রংপুর পর্যন্ত এবং পশ্চিমে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে জানা যায়। খুলনা অঞ্চলটি তখন কোনো রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল সে বিষয়ে সঠিক সূত্র পাওয়া যায় না, এমনকি বঙ্গে মুসলিম বিজয়ের শতাধিক বছরের মধ্যেও এ অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কি না সে বিষয়ে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। সম্ভবত গৌড় সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৩১০-১৩২৫ সাল) প্রথম খুলনা দখল করেন এবং শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের (১৩৪২-১৩৫৮ সাল) সময় খুলনায় মুসলিম বসতি গড়ে উঠতে শুরু করে।[১৩] ১৩৩৩ সালের দিকে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ সাতগাঁও-এ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে একত্র করে একচ্ছত্র আধিপত্যবিস্তার করে বাংলায় স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন। ইলিয়াস শাহের সময়ও দক্ষিণ পশ্চিম বাংলা ইলিয়াসশাহি বংশের অধীন ছিল। ১৪১১ সালে এই বংশের পতনের পর বাংলার ইতিহাস বিভিন্ন অন্তর্দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ হয়। ১৪৪২ সালে ইলিয়াসশাহি বংশের নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করলে পুনরায় রাজ্য বিস্তারের শুভ যুগের সূচনা হয়।

মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে (১৪৪২ সাল) খান জাহান আলী নামক একজন ধর্মপ্রচারক এবং যোদ্ধা দক্ষিণ বঙ্গ (যশোর -খুলনা) জয় করেন এবং এ অঞ্চলে মুসলমান কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। কথিত আছে যে, তিনি বাংলার সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের নিকট থেকে একটি সনদে সুন্দরবন থেকে ভূমি পুনরুদ্ধার করে জনপদ সৃষ্টি করার অধিকার লাভ করেন। ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রথমে তিনি যশোরের বারোবাজারে গমন করেন। পরে পায়গাম কসবায় গমন করেন এবং তিনি তাঁর ৬৩ হাজার মুরিদসহ এ স্থান থেকে বাগেরহাট গমন করেন। এসব স্থানে তিনি অনেক অট্টালিকা নির্মাণ ও জলাশয় খনন করেন। এই বিখ্যাত দরবেশের নিকট হিন্দু, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য ধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এসব অঞ্চলে তাঁর আগমনের ফলে বহু সমৃদ্ধ জনপদের সৃষ্টি হয়। তিনি তাঁর দুজন বিশিষ্ট মুরিদ বাহারাম শাহ এবং গরিব

---

[১৩] আবুল কালাম সামসুদ্দিন, শহর খুলনার আদি-পর্ব, খুলনা সাহিত্য মজলিশ, ডিসেম্বর, ১৯৯৬, পৃ. ৩।

শাহকে যশোরে রেখে বাগেরহাটে যান। বাগেরহাটে সমাধি গাত্রের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, ১৪৫৯ সালের ২৫ অক্টোবরে খান-জাহান আলি পরলোকগমন করেন।[১৪]

খান জাহান আলির সময় তাঁর নব বিজিত অঞ্চল মাহমুদাবাদ এবং খলিফাতাবাদ নামক দুটি প্রশাসনিক এলাকায় বিভক্ত ছিল। বর্তমানকালের খুলনা জেলা খলিফাতাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি তাঁর প্রশাসনিক কেন্দ্র বাগেরহাটে (খলিফাতাবাদ) স্থাপন করেন। তিনি বাংলার সুলতান মাহমুদ শাহের প্রতি পুরোপুরি অনুগত ছিলেন না। তবে এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, খুলনা জেলাও মাহমুদ শাহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরপর হোসেনশাহি আমলে দেখা যায় হোসেনশাহি সুলতান নসরত শাহের সময়ও খুলনা (খলিফাতাবাদ) তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৫৪৫ সালে শেরশাহের মৃত্যুর অব্যবহিত আগে সুলেমান খাঁ কররাণি ও মগধের মহম্মদ খাঁ সুর বঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তারা এসব অঞ্চল একরকম স্বাধীনভাবেই শাসন করতেন। লোদি, কররাণি, সূর বংশীয়গণ আফগানদেরই বিভিন্ন শাখা। পাঠান রাজ্যের শেষ রাজা দাউদ কররাণী। ১৫৭৬ সালে দাউদ খান কররাণী মোগল বাহিনীর নিকট পরাজিত ও নিহত হলে বাংলা মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।[১৫]

বারো ভূঁইয়া, মোগল আমল

বাংলা মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও সেখানে পূর্ণ শাসন-ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা মোগলদের জন্য সহজ হয়নি। দাউদ খান কররাণির পরাজয়ের পর বিজিত পাঠান সেনাপতিরা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। পাঠান আমলের প্রতাপশালী জমিদাররাও সহজে মোগল শাসন মেনে নেয়নি। ফলে সুবে বাংলাকে মোগল আমলের প্রথম পর্বে বেশ কয়েকটি বড়ো বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বিজিত পাঠান সেনাপতি ও জমিদারদের সম্পূর্ণভাবে দমন বা বশে আনতে মোগল শক্তির অনেক সময় লেগেছিল। মোগল শক্তির বিরুদ্ধে বাংলার বিদ্রোহী জমিদারগণ ‘বারো ভূঁইয়া’ নামে পরিচিত ছিল।

বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে কররাণি রাজশক্তি পতনের পর দাউদ কররাণির প্রধান কর্মচারী ও পরামর্শদাতা শ্রীহরি সরকারি ধন সম্পদ নিয়ে পালিয়ে সুদূর দক্ষিণে সুন্দরবনে আশ্রয় নেন। শ্রী হরি সুন্দরবন ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জমিদারদের পরাজিত করে একটি রাজ্য স্থাপন করতে সমর্থ হন এবং ‘বিক্রমাদিত্য’ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি সাতক্ষীরার নিকট ডামব্রেলি পরগনার মোস্তফাপুর গ্রামে নবরত্ন নামক একটি মন্দির নির্মাণ করেন। এ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র প্রতাপাদিত্য রায় এ রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে রাজ্যের সম্প্রসারণ ও শ্রীবৃদ্ধিতে সচেষ্ট হন। প্রতাপাদিত্য গড়াই নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত

[১৪] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২।
[১৫] ওই পৃ. ৪৩।

কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা ও চব্বিশ পরগনা (ভারত) নিয়ে একটি রাজ্য গড়ে তোলেন। তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং নিজনামে মুদ্রা চালু করেন বলে জনশ্রুতি আছে। জানা যায় যে, বারো ভূঁইয়াদের মধ্যে যশোরাধিপতিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী ও ক্ষমতাশালী। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কমল নয়ন, তর্ক পঞ্চানন, আবিলম্ব সরস্বতী প্রভৃতি প্রখ্যাত বিদ্বান ব্যক্তি তাঁর রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মোগল রাজশক্তি জল ও স্থলপথে সুপরিকল্পিত সমরাভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। মোগল স্থল ও নৌবাহিনী প্রথমে প্রতাপাদিত্যের জামাতা বাকলা চন্দ্রদ্বীপের (বর্তমান বরিশাল জেলা) রাজা রামচন্দ্রকে পরাজিত ও বন্দি করে প্রতাপাদিত্যকে দমন করার উদ্দেশ্যে যশোরের দিকে অগ্রসর হয়। শালক (ইছামতী নদীর কাছে বুরানহাটির ২২ মাইল উত্তরে) দুর্গ (ধুমঘাট) বুরহান (কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের ৩৮ মাইল পূর্বদিক দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে) কেয়া, ভাগীরথীর কাগারঘাটের খাল (যশোরের ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত) ইত্যাদি স্থানের যুদ্ধে মোগল স্থল ও নৌবাহিনীর নিকট রাজা প্রতাপাদিত্য পরাজিত হন।[১৬] প্রতাপাদিত্যের শেষ যুদ্ধটি ইতিহাসে 'ধুমঘাটের নৌযুদ্ধ' নামে পরিচিত। ১৬১০ সালে সংঘটিত সেই যুদ্ধে পরাজয়ের পরই মোগল বাহিনী প্রতাপাদিত্যকে বন্দি করে ঢাকায় নিয়ে আসে। এর কিছুদিন পর প্রতাপকে বন্দি অবস্থায় আগ্রায় প্রেরণ করা হয়। আগ্রায় যাত্রামধ্যে বারাণসীতে পঞ্চাশ বছর বয়সে প্রতাপের মৃত্যু হয়। ১৬১২ সালে যশোর ফৌজদারির শাসনভার মোগল সেনানায়ক গিয়াস খানের ওপর এবং বিজিত অঞ্চলের শাসন ও রাজ্য পুনর্গঠনের দায়িত্ব খাজা মুহম্মদ তোহির বকশির ওপর ন্যস্ত করা হয়।[১৭]

প্রতাপাদিত্যের পতনের পর মোগল সেনাপতি ইনায়েত খাঁ যশোর এবং তৎসংশ্লিষ্ট খুলনা অঞ্চলের ফৌজদার নিযুক্ত হন। ইনায়েত খাঁর মৃত্যু হয় ১৬১৮ সালে। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ফৌজদার হয়েছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে কিছুদিন পর ফৌজদার হয়ে আসেন সরফরাজ খাঁ (মির্জা আবদুল্লা)। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথমভাগে তিনি গুজরাটের শাসনকর্তা ছিলেন। সেই কাজে সুনামের জন্য তিনি হাজারি মনসব ও সরফরাজ খাঁ উপাধি লাভ করেছিলেন। ১৬২২ সালে তিনি বঙ্গে আসেন। আনুমানিক ১৬২৫ সালে তিনি যশোরের ফৌজদার নিযুক্ত হন। অর্থলোলুপ শাসক হিসেবে এ অঞ্চলে সরফরাজ খাঁর দুর্নাম ছিল। সরফরাজের পর এ অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন মির্জা সাফসিকান। শাহসুজার রাজ্যসংক্রান্ত দ্বিতীয় হিসাব মির্জা সাফসিকানের সময় প্রবর্তিত হয় যার ফলে পরগনাগুলোতে অনেক পরিবর্তন ও সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। ১৬৬৩ সালে এ অঞ্চলেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর নবাব শায়েস্তা খাঁ

---

[১৬] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত,

[১৭] সতীশচন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭১।

চট্টগ্রামে ফিরিঙ্গি ও মগদের দমন করে পূর্ববঙ্গের সর্বত্র কঠোর শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।[১৮]

মোগল যুগে মগ ও ফিরিঙ্গি জলদস্যুরা খুলনার সামুদ্রিক উপকূল নদী মোহনায় খুবই তৎপর ছিল এবং নদী মোহনাস্থ গ্রামে লুণ্ঠন করত। এসব জলদস্যুদের লুণ্ঠনের ফলে সুন্দরবন অঞ্চল জনশূন্য হয়ে পড়েছিল; রেনেলের মানচিত্রে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৭৮৮ সালে হুগলি সম্পূর্ণরূপে পর্তুগিজদের দখলে চলে যায়। শাহাব উদ্দিন তালিশ নামক একজন মুসলমান ইতিহাসবিদ উল্লেখ করেছেন যে, মগ ও ফিরিঙ্গি জলদস্যুরাও হুগলিতে (ভারত) অবাধে লুণ্ঠন করত। অনুমান করা যায় যে, পর্তুগিজ জলদস্যুরা খুলনা জেলায়ও সক্রিয় ছিল। ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬-১৬০৫ সাল) মোগলদের বাংলা বিজয়ের সময় থেকে চট্টগ্রামে মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত মগ ও ফিরিঙ্গি জলদস্যুরা বাংলার এ অঞ্চল থেকে অসংখ্য নরনারী অপহরণ করত। তারা এসব নরনারীর ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালাত। কোনো কোনোও সময় এ অঞ্চলের মানুষকে দাসদাসী হিসেবে ইংরেজ, ওলন্দাজ ও ফরাসি ব্যাবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করত এবং জলদস্যু অপহরণকারীদের নিজ নিজ দাস হিসেবে কৃষিকাজে নিয়োজিত করত।[১৯]

শায়েস্তা খাঁর চট্টগ্রাম অভিযানের পর পর্তুগিজ ও মগ দস্যুদের অত্যাচার কমে আসে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে নূরউল্যা খাঁ যশোর, মেদিনীপুর, হিজলি, হুগলি ও বর্ধমানের ফৌজদার নিযুক্ত হন। নূরউল্যা খাঁ কৌশলী শাসক এবং বৈষয়িক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তাঁর শাসনামলে ব্যাবসায় ও কৃষিতে এ অঞ্চলের উন্নতি হয়েছিল। চেতুয়া সর্দার তালুকদার শোভা সিংহ বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরামের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে উড়িষ্যার পাঠান সরদার রহিম খাঁর সহায়তায় মোগলদের বাংলা থেকে উৎখাত করার জন্য বিদ্রোহ শুরু করেছিলেন। ঢাকার নবাব এই বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন নূরউল্যা খাঁর হাতে। নূরউল্যা খাঁ যুদ্ধে বিদ্রোহীদের কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যশোরে আশ্রয় নেন। এই সংবাদ সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছে পৌঁছলে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে নূরউল্যাকে হুগলি, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের ফৌজদারির পদ থেকে সরিয়ে দেন। এই ঘটনায় ইব্রাহিম খাঁও সুবেদারি হারিয়েছিলেন। বাংলার নতুন সুবেদার নিযুক্ত হন বাদশার পৌত্র আজিমউস-শান। সম্ভবত সেই সময় নূরউল্যা শুধু যশোরের ফৌজদার পদে ছিলেন। ১৭১০ সাল থেকে হুগলির ফৌজদারি সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। নূরউল্যার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মির খলিল কিছুকাল এ অঞ্চলের ফৌজদার ছিলেন।

---

[১৮] সতীশচন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৭-৩০৮।

[১৯] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫।

ইংরেজ কোম্পানির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে সম্ভবত পুরো সময়জুড়েই যশোরে ফৌজদারের পদটি বলবৎ ছিল। কারণ মির কাশেমের রাজত্বকালেও যশোরের ফৌজদার মুহাম্মদ আসফ খাঁর জায়গির ৪,১৬৬ টাকা ছিল বলে জানা যায়।[২০]

১৭৪০ সালে আলিবর্দি খাঁ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান ও নাজিম নিযুক্ত হন। ১৭৪২ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে ব্যাবসা শুরু করে। ইতিহাসের এই যুগ সন্ধিক্ষণে মারাঠা বর্গিরা বার বার এদেশে হামলা চালায়। এ সময় মোগল শক্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সুযোগে একদল মারাঠা বর্গি ১৭৪৮ সালে বাখেরগঞ্জ পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং বাখেরগঞ্জবাসীদের সঙ্গে তাদের কয়েকটা খণ্ডযুদ্ধ হয়। খুলনা জেলাও মারাঠা বর্গিদের আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি।[২১]

আলীবর্দীর মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র সিরাজ-উদ দৌলা বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব হন। তরুণ নবাবকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করার জন্য ইংরেজদের ব্যাপক ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতে ১৭৫৭ সালে সংগঠিত পলাশীর যুদ্ধে নবাবি শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। এ যুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়। সিরাজ নিজ সৈনাধ্যক্ষ মির জাফর আলি খানের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্লাইভের নেতৃত্বে পরিচালিত ইংরেজ বাহিনীর নিকট পরাজিত হন। সিরাজ ধৃত হয়ে নির্মমভাবে নিহত হন।[২২]

ইংরেজ আমল

১৭৬৫ সালে মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট থেকে বাৎসরিক ২৬ লাখ টাকা রাজস্ব প্রদানের শর্তে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে। শাসনক্ষমতা নামমাত্র নবাবের হাতে থাকলেও দেশের রাজস্ব আদায়ের ভার কোম্পানির হাতে চলে যায়। ইতিহাসে এই শাসন ব্যবস্থা ‘দ্বৈত শাসন’ নামে পরিচিত।

ক্লাইভ দ্বিতীয়বার কোম্পানির গভর্নর হয়ে এসে ব্রিটিশ শাসন সুদৃঢ় করেন। তারপর ভেরেলিস্ট এবং আরও পরে কার্টিয়ার (১৭৬৯ সালে) কোম্পানির গভর্নর নিযুক্ত হন। এ সময় কোম্পানির কর্মচারীরা শাসনকাজে শৈথিল্য প্রদর্শনসহ অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে ওঠে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও কর্তৃপক্ষের শৈথিল্যে অচিরেই দেশের জন্য টেনে আনে ইতিহাসের ভয়াবহতম দুর্ভিক্ষ। ১৭৬৯-৭০ সালের (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) এই দুর্ভিক্ষ বাংলার ‘ছিয়াত্তরের মন্বন্তর’ নামে পরিচিত। দুর্ভিক্ষের ফলে দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা যায় এবং দুই-তৃতীয়াংশ জমি জঙ্গলে পরিণত হয়। খুলনায়ও এ দুর্ভিক্ষের ফলে বহু লোক মারা যায়।

[২০] সতীশচন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১০-৩১৩।
[২১] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫।
[২২] সতীশচন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৭-৩০৮।

দুর্ভিক্ষের দুবছর পর ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭২ সাল) বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হয়ে আসেন। এসময়ই এদেশে ব্রিটিশ প্রশাসন ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়। শাসন এবং রাজস্ব সংস্কারের মাধ্যমে তিনি একাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। প্রত্যেক জেলায় একটি দেওয়ানি এবং একটি ফৌজদারি আদালত স্থাপন করা হয়। রাজস্ব আদায়ের জন্য নিযুক্ত কালেক্টর দেওয়ানি বিচারের কাজ চালাতেন। নায়েব নাজিমের অধীনে এদেশীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও বিচারকের ওপর জেলার ফৌজদারি বিচারের ভার অর্পিত হয়।

যশোরের মুড়লিতে ১৭৮১ সালে প্রথম আদালত স্থাপিত হয়। আদালত স্থাপনের পর ম্যাজিস্ট্রেসি এবং পুলিশি ক্ষমতা মুসলমান ম্যাজিস্ট্রেটের হাত থেকে জজ আদালতের জজের হাতে ন্যস্ত হয়। বর্তমান জেলা, খুলনা জেলার অধিকাংশ এলাকা এবং ফরিদপুর জেলা জজের এখতিয়ারভুক্ত ছিল। ১৭৮১ সালে টিলম্যান হেংকেল প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট এবং জজ নিযুক্ত হন। স্যার জেমস ওয়েস্টল্যান্ড রচিত ‘রিপোর্ট অন দি ডিসট্রিক্ট অব যশোর’ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ জেলার প্রশাসনে হেংকেলের গভীর আগ্রহ ছিল। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের মাধ্যমে কোম্পানির বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা করার জন্য তিনি জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরকারি নিয়ন্ত্রণবিধি কার্যকর করেন।

হেংকেল বিস্তীর্ণ সুন্দরবন এলাকা থেকে জমি পুনরুদ্ধারের জন্য সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার জমি পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ বিভিন্ন বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে সুন্দরবনের এক বিশাল অংশকে আবাদযোগ্য জমিতে রূপান্তরিত করতে সমর্থ হয়। সুন্দরবনের অনুৎপাদিত বনাঞ্চলকে চাষযোগ্য জমিতে পরিণত করে তিনি সরকারি রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করেন। এ অঞ্চলের উৎপাদিত খাদ্যশস্য দুর্ভিক্ষের জন্য গুদামজাত করে রাখা হতো।

সুন্দরবন ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জমিদারদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে জমি পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। কারণ জমিদারগণ স্বাধীন স্বত্বাধিকারী রায়ত কর্তৃক পুনরুদ্ধারকৃত জমি এবং সুন্দরবন থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাদের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করেন। কিন্তু জমিদারগণ তাদের দাবির সমর্থনে কোনো দলিল হেংকেলের সামনে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হন। এর ফলে হেংকেলের পক্ষে এ বিষয়ের নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়নি। ১৭৮৬ সালে তিনি সুন্দরবনের উত্তর ও দক্ষিণ সীমা খুঁটি দ্বারা চিহ্নিত করে রায়তদের জমির মালিকানার ভিত্তি শক্তিশালী করেন। কিন্তু স্বাধীন স্বত্বাধিকারী রায়তদের তুলনায় জমিদারগণ খুবই শক্তিশালী ছিলেন।। ১৭৯২ সালে নির্ধারিত ১৬টি জমির মালিকানা ছাড়া বাকিগুলোর কোনো চিহ্ন ছিল না এবং পরবর্তীকালে পরিবর্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পুনরুদ্ধারকৃত স্বাধীন স্বত্বাধিকারীদেরকে তালুকদারে রূপান্তর করা হয় এবং এসব তালুক ‘হেংকেলের তালুক’ বলে পরিচিতি লাভ করে।

১৭৮৬ সালে যশোর পৃথক জেলায় পরিণত হলে হেংকেলকে এ জেলার প্রথম কালেক্টর নিযুক্ত করা হয়। হেংকেলের উত্তরসূরি রক হেংকেলের সহকারী কালেক্টর ছিলেন। হেংকেলের বিদায়ের পর তিনিই যশোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তাঁর সময় ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রণয়ন করা হয়। তিনি জেলা সদর মুড়লী থেকে বর্তমান স্থানে স্থানান্তর করেন। পরবর্তীকালে জেলার সীমান্ত বেশ কয়েকবার পরিবর্তন করা হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে বাংলায় নীল চাষের বিস্তার ঘটে। নীল চাষ মুনাফাজনক হওয়ায় অনেকেই এর সুযোগ গ্রহণ করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা এ সুযোগ গ্রহণ করার জন্য খুলনা জেলায় আসে। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন সময় আইন প্রণয়ন করে ব্রিটিশদেরকে এদেশে জমি ক্রয় ও বিক্রয় শিল্প প্রতিষ্ঠার অধিকার প্রদান করে।

নীলচাষ ১৭৯১ সালে এক ফরমান দ্বারা এদেশে প্রথম নীল চাষের সরকারি ঘোষণা দেওয়া হয়। ১৭৯৫ সালে বন্ড নামে একজন ইংরেজ যশোরের রূপদিয়াতে প্রথম নীল কারখানা স্থাপন করেন। কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টরের অনুমতি ছাড়া কোনো বিদেশি এদেশে নীল চাষ করতে পারত না। খুলনার দৌলতপুরে ১৮০১ সালে সর্বপ্রথম নীলকুঠি স্থাপন করেন অ্যান্ডারসন সাহেব। এরপর চার্লস নীলকুঠি স্থাপন করেন খুলনা শহরের পাশে। ইংরেজ নীলকররা খুলনা জেলায় বিরাট ভূমিমালিকে পরিণত হয় এবং ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তারা প্রজার সুবিধা অসুবিধা ভুলে গিয়ে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য পূর্ণমাত্রায় আত্মনিয়োগ করে।

১৭৮১ সালে বাণিজ্যিক জাহাজের নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক কাজের জন্য খুলনায় প্রথম থানা স্থাপিত হয়। প্রশাসনিক ব্যয় বৃদ্ধিসহ অন্যান্য অসুবিধার কারণে ১৭৮২ সালে টিলম্যান হেংকেল থানাটি বন্ধ করে দেন। এ সময় মির্জাপুর, ভূষণা, ধর্মপুর ও নয়াবাদে চারটি থানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। লবণ বোঝাই জাহাজের সহজ চলাচলের জন্য নড়াইলের জনৈক লবণ ব্যাবসায়ী রূপলাল সাহা ভৈরব থেকে মাথাভাঙ্গা পর্যন্ত একটি সরু খাল কেটে দিয়েছিলেন। কথিত আছে, সেই খাল রূপলাল সাহার খাল নামে পরিচিত ছিল। কালক্রমে প্রবল স্রোতে বড়ো হয়ে খালটি নদীতে রূপান্তরিত হয় এবং রূপসা নামধারণ করে।[২৩] তবে রূপসা নদীর উৎপত্তি নিয়ে ভিন্নমতও আছে।

সে সময়ের খুলনা নীল ও লবণের পাশাপাশি চিনির জন্যও প্রসিদ্ধ ছিল। ভূ কৈলাসের রাজা কালীশঙ্কর ঘোষালের কাছ থেকে বরিশালের গুরুধামের কাছারির ম্যানেজার কেমেরুন সাহেবের স্ত্রী মার্গারেট হোগলা পরগণার চার আনা অংশ কবলামূলে প্রাপ্ত হন। মার্গারেটের একমাত্র কন্যা ও উত্তরাধিকারী বারবারার সাথে বৈবাহিকসূত্রে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ভাগ্যান্বেষী সেনা উইলিয়াম

[২৩] আবুল কালাম সামসুদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৭।

হেনরি সেনিড রেইনে আনুমানিক ১৮৩০ সালের দিকে উক্ত সম্পত্তির ট্রাস্টি নিযুক্ত হয়ে বর্তমান খুলনা শহরের উত্তরপূর্ব দিকে ভৈরবনদের তীরে কুঠি স্থাপন করেন। রেইনে সরকারের কাছ থেকে রূপসার চর ও লখপুরের জমিদারের কাছ থেকে খুলনার এলাইপুর গ্রামের বন্দোবস্ত নিয়ে নীল ও চিনির ব্যাবসা শুরু করেন। অল্পদিনের মধ্যে রেইনে অনেকগুলো নীল ও চিনির কুঠি স্থাপন, নীলের দাদন দেওয়া, নীল চাষে বাধ্য করা, বেগার খাটানো ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে অতিষ্ঠ করে তোলে। এমতাবস্থায় শ্রীরামপুরের প্রভাবশালী তালুকদার ও নীল ব্যাবসায়ী শিবনাথ ঘোষের সঙ্গে রেইনের বিবাদ শুরু হয়। দু'পক্ষকে সংঘাত থেকে নিবৃত্ত করতে ইংরেজ সরকার ১৮৩৬ সালে পুরনো খুলনা থানা পুনর্সংগঠিত করে উভয় এলাকার মাঝামাঝি কিসমত খুলনা মৌজায় খুলনা গ্রামসংলগ্ন নয়াবাদ নামে নতুন থানা স্থাপন করেন। রেইনে ও শিবনাথ ঘোষের মধ্যে সংঘাত ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলে থানাটি অকার্যকর হয়ে পড়ে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৪২ সালে নয়াবাদ থানাকে মহকুমায় উন্নীত করা হয় এবং রেইনের তালিমপুর (নিকলাপুর) এবং শিবনাথ ঘোষের শ্রীরামপুরের মধ্যবর্তী 'কিসমত খুলনা' নামক স্থানে মহকুমা সদর স্থাপন করা হয়। বস্তুত খালিশপুর পরগনার হেলাতলা, বেনেখামার ও টুটপাড়া-এ তিনটি মৌজা নিয়ে তখনকার খুলনা শহর গড়ে ওঠে। পরে খালিশপুর সদরকেও শহরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[২৪] পরবর্তীকালে মহকুমা অফিস (তদানীন্তন মির্জাপুর মাঠের উত্তর প্রান্তে) বর্তমান জেলা প্রশাসকের বাংলোতে স্থানান্তরিত হয়। তখন খুলনা মহকুমার অন্তর্গত ছিল খুলনা জেলা এবং কচুয়া ব্যতীত সম্পূর্ণ বাগেরহাট জেলা। খুলনা বাংলাদেশের প্রথম মহকুমা।

১৯৬০ সালে রাজশাহী বিভাগ থেকে পৃথক হয়ে খুলনা বিভাগ গঠিত হয়। খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, যশোর, কুষ্টিয়া, মাগুরা, ঝিনাইদহ, নড়াইল, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা এই দশটি জেলা নিয়ে বর্তমান খুলনা বিভাগ গঠিত।

খুলনা জেলার নীল বিদ্রোহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক রহিমউল্লাহ বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। বর্তমান বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা ইংরেজ নীলকর মরেল ও তার অনুচরদের অত্যাচার, উৎপীড়ন শোষণের বিরুদ্ধে রহিমউল্লাহর নেতৃত্বে বারুইখালির গ্রামবাসীরা রুখে দাঁড়ায় এবং নীলকরদের লাঠিয়াল বাহিনীর আকস্মিক আক্রমণ প্রতিহত করতে রহিমউল্লাহসহ আরও অনেকে মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তীকালে প্রহসনমূলক বিচারে কুখ্যাত নীলকররা মামলা থেকে বেকসুর খালাস পায়।

ফরায়েজি আন্দোলন

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে 'ফরায়েজি আন্দোলন' খুলনায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ফরিদপুরনিবাসী হাজী শরীয়তউল্লাহ এবং তাঁর পুত্র মহসীন উদ্দিন

[২৪] মীর আমীর আলী, খুলনা শহরের ইতিকথা, ব্যক্তি উদ্যোগে প্রকাশিত, ডিসেম্বর ৩১, ১৯৮০, পৃ. ১৮।

ওরফে দুদু মিয়া এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ফরায়েজি আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান সমাজকে অনৈসলামিক রীতিনীতি থেকে মুক্ত করা এবং নীলকরদের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করে বিদ্রোহ গড়ে তোলা। প্রায় একই সময়ে ভারতের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে 'তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া' নামে আরও একটি আন্দোলন জোরালো হয়ে উঠেছিল। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন উত্তর ভারতের সৈয়দ আহমদ বেরেলভী। খুলনায় তাঁর অসংখ্য অনুসারী ছিল। মৌলভি বেলায়েত আলী ও জৌনপুরের কেরামত আলী খুলনায় তাঁর মতের মুখ্য প্রচারক ছিলেন।

সিপাহি বিদ্রোহ উপমহাদেশের ব্রিটিশ শাসনামলে 'সিপাহি বিদ্রোহ' একটি প্রলয়ংকরী ঘটনা। ১৮৫৭ সালে ভারত উপমহাদেশব্যাপী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। সে সময় বর্তমান বৃহত্তর ভূখণ্ড খুলনা ও যশোর চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সিপাহি বিদ্রোহ যশোরের ব্রিটিশ প্রশাসনকেও ভীত সন্ত্রস্ত করেছিল। এ প্রসঙ্গে যতদূর জানা যায়, যশোরের ম্যাজিস্ট্রেট ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেটকে এ অঞ্চলে সিপাহিদের বিলিকৃত একটি উস্কানিমূলক প্রচারপত্র পাঠিয়েছিলেন যা থেকে অনুমিত হয় খুলনা অঞ্চলে সিপাহিদের গোপন তৎপরতা ছিল।

বঙ্গভঙ্গ ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ আইন কার্যকর করা হয়। এর ফলে বাংলা প্রদেশের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করে পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ নামে দুটি নতুন প্রদেশের সৃষ্টি করা হয়। খুলনা জেলা পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। বাংলার ইতিহাসে এবং স্বাভাবিকভাবে খুলনা জেলার ইতিহাসে এটি ছিল একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বঙ্গভঙ্গের ফলে শিক্ষা, চাকরি, ব্যাবসাবাণিজ্য, অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্ববাংলার মুসলমানরা পশ্চাৎপদ স্থান থেকে ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ফলে বঙ্গভঙ্গ মুসলমানদের সমর্থন পেলেও হিন্দুদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। বঙ্গভঙ্গ রদে ব্রিটিশ সরকারকে বাধ্য করার জন্য কংগ্রেসের নেতৃত্বে হিন্দু স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়। ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতা টাউন হলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আয়োজিত সভায় ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে স্বদেশী আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের বিরুদ্ধে খুলনা জেলার হিন্দুরা এক প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে। এ আন্দোলনের ফলে জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। হিন্দুরা স্বদেশী আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কৌশল প্রয়োগ করে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে এ জেলার মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া ছিল ভিন্নরূপ। মুসলমানরা ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা যেন বহাল রাখে সেজন্য ব্যাপক তৎপরতা শুরু করে। ব্রিটিশ পণ্য বর্জন ও স্বদেশী পণ্যের পৃষ্ঠপোষকতাকে কেন্দ্র করে স্বদেশী আন্দোলন চলাকালে খুলনা জেলায় হিন্দু-মুসলিম এই

দু’সম্প্রদায়ের মধ্যে এক পর্যায়ে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। বাংলার জনগণের ভবিষ্যৎ নির্ধারণকারী এই আন্দোলন নানা কারণে দু’সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করে। এর ফলে বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদেরও উন্মেষ ঘটে। সর্বভারতীয় ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের মধ্যে পৃথক পন্থা অন্বেষণের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে স্বদেশী, স্বরাজ ও গোপন সশস্ত্র আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠে এবং খুলনা জেলাতেও এসব আন্দোলনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ব্রিটিশ দমননীতির ফলে স্বদেশী ও স্বরাজ আন্দোলন ধীরে ধীরে সশস্ত্র গুপ্ত আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। এ সময় খুলনায় আন্দোলনের অন্যতম গুপ্তদল ‘অনুশীলন সমিতি’ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়। অনুশীলন সমিতির উদ্দেশ্যে ছিল স্বদেশ মন্ত্র প্রচার, সমাজসেবা, স্কুল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন। খুলনায় ফুলতলার অলকা গ্রামের সুধীর চন্দ্র দে যশোর-খুলনায় অনুশীলন নামক প্রথম গোপনী সংগঠন স্থাপন করেন। তিনি কলকাতা অনুশীলন সমিতির প্রধান সদস্য ছিলেন। পরে এ শাখা যুগান্তরের অনুগামী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল, তবে ঢাকা অনুশীলনের নির্দেশে যশোর-খুলনা শাখা কাজ করত।

খুলনার ডুমুরিয়া এলাকা, খুলনা থানার উত্তরপূর্বাঞ্চল, ফকিরহাট থানার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আন্দোলনকারীরা সক্রিয় ছিল। তারা জেলার বিভিন্ন স্থানে ধ্বংসাত্মক কাজে তৎপর হয় এবং তাদের সক্রিয় ভূমিকায় এটি ক্রমে একটি ধ্বংসাত্বক রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। বঙ্গভঙ্গ বিলুপ্তির পরবর্তীকালে নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি পেলে ধ্বংসাত্মক রাজনৈতিক তৎপরতা কমে যায়।

মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা

বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার পর মুসলমান সমাজ কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্বরূপ স্পষ্ট দেখতে পেয়ে সংগঠিত হতে থাকে। বঙ্গভঙ্গ রদের নেশায় মত্ত বিশেষ শ্রেণির বিদ্বেষমূলক ব্যবহার, আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য, নিজেদের অসহায় অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে সম্যক অবগত হয়ে মুসলমান নেতৃবৃন্দ একটি পৃথক সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। এভাবে একটি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঐকমত্য সৃষ্টি হয়। নবাব স্যার সলিমুল্লাহর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯০৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর ঢাকার শাহবাগে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলমান শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশনে মুসলিম লীগ নামক একটি সর্বভারতীয় মুসলমান রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। ১৯০৭ সাল থেকে মুসলিম লীগ ভারতীয় কংগ্রেসের সমান্তরাল সংগঠন হিসেবে কাজ শুরু করে।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় ১৯০৫ সালের ২০ সেপটেম্বর খুলনায় এক জনসভায় বক্তব্য রাখেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এ সভার প্রতিক্রিয়া ছিল সুদূরপ্রসারী। ১৯০৫ সালের ১৩ নভেম্বর দৌলতপুর হিন্দু একাডেমি ও সেনহাটি স্কুলের ছাত্ররা দৌলতপুর বাজারে হানা দেয় এবং বিলেতি কাপড়, চিনি ও লবণ নষ্ট করে। ১৯০৭ সালে খুলনায় ‘খুলনা জেলা রাজনৈতিক সম্মেলন’ অনুষ্ঠিত হয়। ১৯০৮

সালে সংঘটিত হয় আলিপুর বোমা হামলা। আলিপুর বোমা হামলার ৩৮ জন আসামির মধ্যে তিনজন ছিলেন খুলনার।

বঙ্গভঙ্গ রদ ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী কিংসফোর্ডের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করেন। এতে দুজন শ্বেতাঙ্গ নিহত হন। বিচারে দুজনের ফাঁসি হয়। এই ঘটনায় চারদিকে বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। বাংলায় গোপন সশস্ত্র আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন শ্রী অরবিন্দ। ছোটোবেলার স্মৃতিবিজড়িত খুলনায় অরবিন্দ বিপ্লবের বাণী প্রচারে আসেন ১৯০৭ সালে। ১৯০৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি আলিপুর চৌহদ্দির মধ্যে পাবলিক প্রসিকিউটরকে গুলি করে হত্যা করেন খুলনার বিপ্লবী চারুচন্দ্র বসু। ১৯০৯ সালে তাঁর ফাঁসি কার্যকর করা হয়। দীর্ঘ ছয় বছর ধরে চলা আন্দোলনের মুখে অবশেষে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ দিল্লির দরবারে বঙ্গভঙ্গ আদেশ রদ ঘোষণা করেন। ১৯১২ সালে ভগ্নস্বাস্থ্য এবং বঙ্গভঙ্গ রদের কারণে বাংলার মুসলমানদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা নবাব স্যার সলিমুল্লাহ প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

খেলাফত আন্দোলন ১৯২০ সাল থেকে ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিজয়ী মিত্র শক্তিগুলো সেভার্স চুক্তিতে তুর্কি খেলাফতকে (সাম্রাজ্যকে) নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে চাইলে সারা ভারতের মুসলমানরা তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলীর নেতৃত্বে সারা ভারতে তুর্কি খেলাফত রক্ষার্থে সংগঠিত হতে শুরু করে খেলাফত আন্দোলন। এসময় খুলনায় খেলাফত আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন ডুমুরিয়ার মাওলানা আহমদ আলী ও তালার সৈয়দ জালাল উদ্দিন হাসেমী। তখন সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা মহাত্মা গান্ধীও এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। ইতোমধ্যে কংগ্রেস নাগপুর সম্মেলনে গান্ধী প্রদর্শিত অহিংস আন্দোলন শুরু করে। এ আন্দোলন পরবর্তীকালে অসহযোগ আন্দোলনের রূপ নেয়। মহাত্মা গান্ধী মূলত খেলাফত ও অসহযোগ এই দুই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশকে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। এ সময় তিনি বাংলায় প্রধান সহযোগী হিসেবে পান দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে। ১৯২১ সালে খুলনায় জেলা কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়। ১৯২৪ সালে খুলনার মুলঘর গ্রামে জেলা কংগ্রেস সম্মেলনে যোগ দেন সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯২৫ সালে খুলনায় আসেন মহাত্মা গান্ধী। ১৯২৮ সালে সারা বাংলায় ছাত্র আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। 'সাইমন কমিশন' বয়কট করা হয়। ১৯২৭ সালে ভারতে গড়ে ওঠে সর্বহারা দল। খুলনায় এ দলের প্রধান নেতা ছিলেন প্রমথনাথ ভৌমিক, ডা. জ্ঞানেন্দ্র কাঞ্জিলাল, চারুলতা সেন প্রমুখ। ১৯৩০ সালে মাস্টার দা সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করা হয়। ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি এই মহান বিপ্লবীকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ১৯৩০ সালে বিপ্লবীরা খুলনার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পয়েন্টে বোমা হামলার পরিকল্পনা করেছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু বিপ্লবীদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় এবং অনেকেই ধরা পড়েন। ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস ত্যাগ করে ফরোয়ার্ড

ব্লক গঠন করেন। ওই বছরই তিনি দলের প্রচারাভিযানে খুলনা এসেছিলেন বলে অনুমিত হয়। ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি আহমেদাবাদ অধিবেশনে ব্রিটিশ সরকারকে অবিলম্বে ভারত ত্যাগ করার আহ্বান জানায়। এই আহ্বানই 'কুইট ইন্ডিয়া' নামে খ্যাত। এর পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসকে বেআইনি ঘোষণা করে। গ্রেফতার করা হয় মহাত্মা গান্ধীকে।[২৫]

খুলনা মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন

এদিকে ১৯১২-১৩ সালে খুলনায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর অভাব অভিযোগ সরকারের গোচরে আনার লক্ষ্যে গঠিত হয় খান সাহেব শামসুর রহমানের নেতৃত্বে 'খুলনা জেলা মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন'। ১৯৩৪ সালে খুলনায় মুসলিম লীগের শাখা গড়ে ওঠে। তার আগেই মুসলিম লীগ ভারতে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পরের বছর (১৯৪০ সাল) খুলনা মুসলিম লীগের আহ্বানে খুলনায় আসেন হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী। সে সময় তিনি প্রাদেশিক সরকারের সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী ছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনতার লক্ষ্যে আন্দোলনের পাশাপাশি মুসলিম লীগও স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার হতে শুরু করে। ১৯১৫ সালে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে বাংলায় গড়ে ওঠে 'কৃষক প্রজা পার্টি' নামে আরেকটি রাজনৈতিক সংগঠন। ভারতীয়দের স্বায়ত্তশাসনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১৯ সালে মন্টেগু চেমসফোর্ড ভারত শাসন আইন প্রবর্তন করেন। এ আইন বলে প্রদেশে মন্ত্রী নিয়োগ ও আইনসভায় সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। ১৯২০ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের কারণে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন।

১৯২২ সালে গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক খুলনা থেকে উপনির্বাচনে জয়লাভ করেন। ১৯২৪ সালে তিনি বাংলার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টির মধ্যে ভোটযুদ্ধ সংঘটিত হয়। ওই নির্বাচনে ২৫০টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ পায় ১১৯টি আসন। হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী তখন মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ডের সভাপতি ছিলেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা

১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে বাংলার বিধানসভায় মুসলিম লীগ বিশাল জয় পায়। এই জয়কে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র গঠনে মুসলিম লীগের দাবির পক্ষে জোরালো সমর্থন হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। ১৯৪৭ সালে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের গভর্নর জেনারেল বা ভাইসরয় হয়ে আসেন। ১৯৪৭ সালেই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতীয় স্বাধীনতা আইন (Indian Independence Act 1947) নামে একটি আইন পাস করে। এই আইন অনুসারে উপমহাদেশে ভারত ও পাকিস্তানের দাবিতে দুটি আলাদা রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন এগিয়ে আসতে থাকে। দেশভাগের প্রাক্কালে সোহরাওয়ার্দী ও তাঁর সহযোগীরা মুসলিম লীগে কোণঠাসা হয়ে পড়েন। সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের সমর্থক হলেও তিনি ছিলেন বৃহত্তর বাংলার প্রস্তাবক। তাঁর প্রধান উচ্চকণ্ঠ

[২৫] ড. শেখ গাউস মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১-২২৫।

সমর্থক ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু। কিন্তু কোনো মহলেই সোহরাওয়ার্দীর বৃহত্তর বাংলার প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। মুসলিম লীগ ভারত ও বাংলার বিভাগকে মেনে নিলে বৃহত্তর বাংলার দাবিতে আন্দোলন থেমে যায়। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। কিন্তু ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের জন্ম হলেও খুলনা পাকিস্তানের আওতায় আসে ১৮ আগস্ট।[২৬] এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৪৪ সালের বড়োলাট লর্ড ব্যাটনের ঐতিহাসিক জুন ঘোষণায় খুলনা জেলাকে ভারতের অংশ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ১৯৪৭ সালে ১৪ আগস্ট থেকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত খুলনা ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঐতিহাসিক জুন ঘোষণার পর পরই খুলনাকে পাকিস্তানভুক্তির জন্য বাউন্ডারি কমিশনে আপিল করা হয়। এর ওপর ভিত্তি করে ১৯৪৭ সালের ১৮ আগস্ট র‌্যাডক্লিফ মিশনের রোয়েদাদ অনুযায়ী খুলনা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হয়।

পাকিস্তান আমল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সামাজিক নিরাপত্তার ন্যায়সংগত অধিকার লাভের জন্য বাংলার মুসলমানরা স্বতন্ত্র আবাসভূমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করেছিল। পাকিস্তান আন্দোলনে বাংলার সাধারণ মানুষকে শোষণ, নির্যাতন ও ত্যাগ তিতিক্ষার শিকার হতে হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতি শ্রেণি, স্বার্থান্বেষী নেতা, সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের শাসন ও শোষণের যাঁতাকলে পড়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ, উদীয়মান মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির স্বপ্ন ক্রমান্বয়ে ভেঙে যেতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তান ব্রিটিশ উপনিবেশের স্থলে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্রের অব্যাহত বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পাকিস্তান রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর সকল বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটায়। পরিশেষে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় ঘুমন্ত জনগণের ওপর পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর আকস্মিক আক্রমণ, নিষ্ঠুর গণহত্যা ও হামলার মুখে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার গণতান্ত্রিক আন্দোলন এক সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়। দীর্ঘ নয়মাস মুক্তিকামী জনগণের সর্বাত্মক প্রতিরোধ ও মরণপণ লড়াই অব্যাহত থাকে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে খুলনা জেলার ভূমিকা ছিল গৌরবময়। ৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় সমগ্র খুলনা জেলায় সুষ্ঠুভাবে হরতাল পালন করা হয়। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ঢাকার রাস্তায় শহিদ হন আসাদুজ্জামান, যার নামে বর্তমানে মোহাম্মদপুরে আসাদগেট ও আসাদ এভিনিউ নামে একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে। খুলনার বাগেরহাটেও উত্তপ্ত আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ফলে ১ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন এডিসি সৈয়দ আফজাল কাহুতের আদেশে

---

[২৬] ড. শেখ গাউস মিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২-২৪৩।

বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র কলেজে গুলি বর্ষিত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি জনতা প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে কাহুত সাহেবের বাড়িতে ঢুকে পড়লে পুলিশ গুলি চালায়।

ঊনসত্তরের মার্চের শেষ সপ্তাহে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ালে সেনাবাহিনী প্রধান ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি সংবিধান এবং গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি দেন। 'এক ব্যক্তি এক ভোট' এই নীতিতে আইনগত কাঠামোর মাধ্যমে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন ৭০-এ অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে মোট ৩১৩টি আসনের মধ্যে (পূর্বপাকিস্তানের ১৬৯টি) আওয়ামী লীগ ১৬৭ আসনে জয়লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু আওয়ামী লীগকে সাংবিধানিক বৈধ ক্ষমতা লাভ থেকে বঞ্চিত করার জন্য ইতিহাসের ঘৃণ্যতম ষড়যন্ত্র শুরু হয়।

১৯৭০ সালে খুলনা জেলায় দুটো মারাত্মক ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। ২৩ অক্টোবর ঘূর্ণিঝড়ের বেগ ছিল ঘণ্টায় ৬০-১০০ মাইল। এই ঝড় কোনো বড়ো ক্ষতিসাধন করতে পারেনি। পরবর্তী ঝড় হয় ১২ এবং ১৩ নভেম্বর। এই ঝড়ের সঙ্গে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস এসে চট্টগ্রাম থেকে চালনা পর্যন্ত এলাকাজুড়ে ব্যাপক ধ্বংসলীলা সাধন করে। সাতক্ষীরা জেলার শরণখোলা থানার অংশবিশেষ এই তাণ্ডবে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তৎকালীন পটুয়াখালী এবং বরিশালে ক্ষতির পরিমাণ ছিল অবর্ণনীয়। প্রায় ১৬ ফুট জলোচ্ছ্বাস হয় এবং প্রায় ৫ লাখ লোক মারা যায়। জেনারেল ইয়াহিয়া তখন ছিলেন চীনে। তিনি প্রথমে বড়ো এই তাণ্ডবের ব্যাপকতা দেখতে আসেননি। পরে যখন দেশ-বিদেশের খবরে এ নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটতে থাকে তখন অবশ্য তিনি পরিণাম চিন্তা করে এ অঞ্চলে এসেছিলেন। তখনই এদেশবাসী বুঝেছিল পশ্চিম পাকিস্তানিরা তাদের কতটুকু আপন।[২৭]

আগেই বলা হয়েছে নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। স্থির হয় শাসন পরিষদের প্রথম সভা বসবে ঢাকায় ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ। সে অনুযায়ী প্রস্তুতি চলতে থাকে। কিন্তু এ ব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থবাদীরা মেনে নিতে পারেনি, ফলে শুরু হয় ষড়যন্ত্র। ২ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঘোষণা দেন ৩ মার্চে অনুষ্ঠিতব্য সংসদ অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত করা হলো। এতো সব বুঝতে পেরে ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দেন যা পূর্ব বাংলার সকল মানুষকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য উজ্জীবিত করে তোলে। পাকিস্তানি হানাদারদের ষড়যন্ত্রের ঘৃণ্য বাস্তবায়ন দেখা যায় ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের রাতে। ঢাকার নিরীহ ও নিরস্ত্র জনগণের ওপর আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রসহ ঝাঁপিয়ে পড়ে পাক হানাদার বাহিনী। সংঘটিত হয় বিশ্বের ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা।

---

[২৭] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকায় নিরস্ত্র জনগণের ওপর হামলা চালায়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ২৬ মার্চ সকালে প্রথম আক্রমণ শুরু করে খালিশপুর শিল্প এলাকায়, নিউজপ্রিন্ট মিলে। তাঁরা মিলে ঢুকে বেপরোয়া হত্যাযজ্ঞ চালায়। উল্লেখ্য যে, এখানেও তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয় হানাদারদের, এরপর খুলনা শহরের অন্যত্রও তারা হামলা চালায় এবং নির্বিচারে গণহত্যা করে, সম্পদ ধ্বংস করে।

এভাবে পাকিস্তানি বাহিনী খুলনা শহরের আনাচেকানাচে নিষ্ঠুর গণহত্যা, লুণ্ঠন এবং ধ্বংসলীলার মাধ্যমে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনালগ্নে খুলনার কিছু অংশ এবং সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট প্রায় শত্রুমুক্ত ছিল। জনসাধারণ ও মুক্তিযোদ্ধারা জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আত্মরক্ষামূলক গেরিলা যুদ্ধের সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করে।[২৮]

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলা গ্রামে (বর্তমানে মুজিবনগর) অস্থায়ী সরকার গঠিত হয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি। কিন্তু তিনি পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থাকায় সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সাতক্ষীরা এপ্রিলের প্রথম দিকে হানাদারদের করায়ত্ত হলেও বাগেরহাট এপ্রিলের ২৪ তারিখ সকাল পর্যন্ত মুক্ত ছিল। এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে একরাতে বাগেরহাটের মুক্তিযোদ্ধারা গল্লামারীতে রেডিয়ো পাকিস্তানের খুলনা কেন্দ্র আক্রমণ করে কেন্দ্রটিকে শহরের হানাদার বাহিনীর মূল অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। হানাদার বাহিনী পাল্টা আক্রমণ করলে দুপক্ষে তুমুল সংঘর্ষ হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন খুলনার বিভিন্ন বনাঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধারা জনসাধারণের সহায়তায় পাকিস্তানি বাহিনীকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করে। মুক্তিযোদ্ধারা খুলনার তেরখাদা, ডুমুরিয়া, পাইকগাছা; সাতক্ষীরার আশাশুনি, শরণখোলা, শ্যামনগর এবং শ্যামনগরের দক্ষিণাংশ; বাগেরহাটের উত্তরাংশ, মোল্লারহাট থেকে পাকবাহিনীকে বিতাড়িত করতে সমর্থ হয়। ৩ ডিসেম্বর ইয়াহিয়া খান ভারতের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করে। ভারতীয় বাহিনীর সহায়তায় মুক্তিবাহিনী দেশের সবদিক দিয়ে ভেতরের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে যশোরের পতনের পর হানাদার বাহিনীর একটি দল খুলনার দিকে সরে এসে শিরোমণি, সলুয়া ইত্যাদি এলাকায় ব্যূহ রচনা করে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। সম্মিলিত বাহিনী স্থল, নৌ এবং আকাশপথে আক্রমণ চালায়। ১৬ ডিসেম্বর সমগ্র বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। ১৭ ডিসেম্বর সকালে স্থল এবং নৌপথে সম্মিলিত বাহিনী খুলনা শহরে প্রবেশ করে। ওইদিন দুপুরে হানাদার বাহিনী খুলনা সার্কিট হাউস ময়দানে আত্মসমর্পণ করে।

---

[২৮] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭।

অধ্যায়-৩

অধিবাসী, সমাজ ও সংস্কৃতি

খুলনা অঞ্চলে মানববসতি স্থাপনের ইতিহাস খুব স্পষ্ট নয়। আধুনিক মতানুযায়ী, বাদাবন আবাদ করেই এখানে জনবসতি শুরু। তবে এমন মতও প্রচলিত আছে, সুন্দরবনে দীর্ঘকালব্যাপী জনবসতি ছিল। সুন্দরবনের মধ্যে সে বসতির বিক্ষিপ্ত চিত্র এখনও আছে। তবে ইতিহাস থেকে যতটুকু ধারণা করা যায়, তা হলো পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়রা খুলনা অঞ্চলের সবচেয়ে প্রাচীন অধিবাসী। একসময় তারা উত্তরবঙ্গের অধিবাসী ছিল।[১] পোদদের একটি অংশ সম্ভবত দাক্ষিণাত্য হতে এসেছিল। এরা ছিল মৎস্যজীবী। সতীশচন্দ্র মিত্র মনে করেন, 'অনার্য্য পৌণ্ড্রেরা দক্ষিণ ভারত হইতে দক্ষিণবঙ্গে সমুদ্রকূলে আসিয়া বাস করেন এবং পূর্বাভ্যাসবশত মৎস্য ব্যাবসায়ী হন।' তিনি পোদদের আর্য ও অনার্য দুই শ্রেণিতে ভাগ করে মৎস্যজীবী পোদদের অনার্য এবং চাষি পোদদের আর্য-উৎসজাত বলে উল্লেখ করেছেন[২] 'এখনও সমুদ্রকূল হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরে পদ্মা পর্যন্ত প্রদেশে বহুসংখ্যক পুঁড়া বা পোদদের বাস আছে। পুঁড়া বা পোদ পুন্ড্র শব্দের অপভাষা। চাষি পোদগণ এক্ষণে পৌন্ড্র ক্ষত্রিয় বলিয়া আত্মপরিচয় দেন।'[৩] 'খুলনার দক্ষিণাংশে পোদ, চন্ডাল, বাগদি প্রভৃতি বহু জাতি বাস করেন। এঁরাই এ মন্ডলের আদিম অধিবাসী।'[৪]

পরবর্তীকালে ত্রয়োদশ শতকে মুসলিম বিজয়ের পর এ অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে। প্রাচীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদির বিবরণ, সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে টোডরমলের খাজনা বইয়ের উল্লেখ, বৌদ্ধ আমলের বিভিন্ন নিদর্শন, রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজ্য স্থাপন, পির খান জাহান আলীর বিজয়াভিযান এবং শাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয় যে, প্রাকৃতিক বৈরিতা, পর্তুগিজ, মগসহ অন্যান্য জলদস্যুদের অত্যাচার প্রভৃতি মোকাবিলা করে সুদূর অতীত হতেই এ অঞ্চলে জনবসতি স্থাপিত হয়েছিল।

নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

নিগ্রীয় (Negroid), মঙ্গোলীয় (Mongoloid) ও ককেশীয় (Caucasoid)- নৃতাত্ত্বিকেরা সমগ্র মানবজাতিকে এই তিনটি বৃহৎ মানবগোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছেন। এই বৃহৎ মানবগোষ্ঠীকে আবার ভাগ করা হয়েছে কয়েকটি নরগোষ্ঠীতে। নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাঙালি জাতির মধ্যে তিনটি বৃহৎ নরগোষ্ঠীর প্রত্যেকটিরই কোনো না কোনো শাখার প্রভাব রয়েছে। নৃতাত্ত্বিকদের মতে, ভারত উপমহাদেশের প্রথম স্তর গঠিত হয়েছিল সম্ভবত নিগ্রীয় (Negroid) বৃহৎ মানবগোষ্ঠীর মানুষের দ্বারা। এখনও খুলনার সুন্দরবন অঞ্চল ও যশোর জেলাসহ নিম্নবঙ্গের কিছু এলাকায় খর্বাকৃতি, ঘনকালো গাত্রবর্ণের,

---

[১] পৌন্ড্ররা খুলনা অঞ্চলে 'পোদ' নামে পরিচিত। 'পোদ' শব্দটি 'পন্ড্র' শব্দের অপভ্রংশ।
[২] সতীশ চন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, দ্বিতীয় খন্ড পৃ. ৫৩৭।
[৩] ওই।
[৪] সতীশ চন্দ্রমিত্র, পূর্বোক্ত, প্রথম খন্ড পৃ. ১১৫।

চ্যাপ্টা নাক, পুরু ওল্টানো ঠোঁটবিশিষ্ট নিগ্রীয় মানবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানুষের সন্ধান মেলে। তবে বাঙালি জনসাধারণের মধ্যে যে জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক প্রভাব সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায়, নৃতত্ত্বের পরিভাষায় তাদের বলা হয় আদি-অস্ট্রেলীয় (Proto-Austroloids)। অস্ট্রিকভাষী বিধায় তাদেরকে অস্ট্রিক বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এরা খর্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘমুন্ড, প্রশস্তনাক ও তাম্রকেশবিশিষ্ট। নৃতাত্ত্বিকদের মতে কোল, ভীল, মুন্ডা, সাঁওতাল, বাঁশফোড়, রাজবংশী প্রভৃতি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর দৈহিক বৈশিষ্ট্যে আদি অস্ট্রেলীয় প্রভাব অনেক বেশি। এ ছাড়া 'অ্যালপাইন' নামে অভিহিত গোলমুন্ড একটি জনগোষ্ঠীর প্রভাবও বাঙালি জনপ্রবাহে লক্ষ করা যায়। বাঙালি জাতি তাই মূলত অ্যালপাইন-আদি-অস্ট্রেলীয় অস্ট্রিকভাষী নরগোষ্ঠীর অন্তর্গত। পণ্ডিতদের ধারণা, বাঙালি জাতির গঠনে 'শতকরা ষাটভাগ অস্ট্রেলীয়, বিশ ভাগ মঙ্গোলীয়, পনেরো ভাগ নেগ্রিটো এবং পাঁচভাগ অন্যান্য নরগোষ্ঠীর রক্ত মিশেছে বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়।[৫]

হারবার্ট রিজলি সাতটি মূল শ্রেণিতে বিভক্ত করে ভারতীয় উপমহাদেশের জনগোষ্ঠীকে সেই সাত শ্রেণির সৃষ্টি বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, সাতটি শ্রেণি হলো- ১) তুর্কি-ইরানীয় ২) ইন্দো-আর্য ৩) শক-দ্রাবিড়ীয় ৪) আর্য-দ্রাবিড়ীয় ৫) মঙ্গোলীয়-দ্রাবিড়ীয় ৬) মঙ্গোলীয় ও ৭) দ্রাবিড়ীয়।[৬]

রিজলির মতে, বাঙালি জাতি মঙ্গোলীয় দ্রাবিড়ীয় উপাদানের আনুপাতিক অন্তর্মিলনের ফল[৭]। অধ্যাপক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বাঙালি জাতির নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে গিয়ে চারটি জনগোষ্ঠীর সংকরায়নের কথা বলেছেন। এগুলো হলো -১) ভারতীয় আর্য জাতি (যারা বাইরে থেকে আগত আর্যদের বংশধর)। ২) দ্রাবিড় মুন্ডা নরগোষ্ঠী (বাঙলার তথাকথিত নিম্নজাতির নরগোষ্ঠীর মধ্যে বর্তমানেও এর অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়)। ৩) গোল মাথাওয়ালা অ্যালপাইনী নরগোষ্ঠী (বাঙলার ভদ্র সমাজে এ জাতীয় লোকের সংখ্যা বেশি)। ৪) মোঙ্গলীয় নরগোষ্ঠী (চাকমা, গারো, হাজং, মুরং, খাসিয়া, মগ প্রভৃতি গোত্রীয় নামে এরা পরিচিত)।[৮]

এর বাইরে বাঙালি জাতির গঠনে নিগ্রোবটু রক্তের প্রভাবও রয়েছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, পরবর্তীকালে তুর্কি, আরব, পাঠান, মোগল, মগ, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসি প্রভৃতি রক্তও মিশ্রিত হয়েছে বাঙালির দেহে। 'এই বিচিত্র সংকর জন লইয়াই বাঙলার ও বাঙালির ইতিহাসের সূত্রপাত।'[৯]

---

[৫] ড. মতিউর রহমান, বাঙালির দর্শন, মানুষ ও সমাজ, উনিশ শতক, পৃ. ১৭৯।

[৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০-১৮১।

[৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১।

[৮] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, পৃ. ২।

[৯] ড. নীহার রঞ্জন রায়, বাঙ্গালির ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪৫।

খুলনা জেলার মানুষের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সাধারণভাবে বাঙালি জাতির সাধারণ সংকরায়িত নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যেরই অনুরূপ। বঙ্গোপসাগরের মধ্য থেকে জেগে ওঠা এই মূলভূমিতে সুদূর অতীতে একসময় ভারতীয় জনসৌধের প্রথম স্তর 'নেগ্রিটো' বা নিগ্রোবটুজন সম্ভবত বসতি স্থাপন করেছিল। 'এই কৃষ্ণাভ ঘন শ্যামবর্ণ, প্রায় উর্ণাবৎ কেশ, পুরু উল্টানো ঠোঁট, খর্বকায়, অতি চ্যাপ্টা নাকের'[১০] জনগোষ্ঠীই সম্ভবত খুলনা অঞ্চলের প্রাচীনতম অধিবাসী। খুলনার সেই আদিম জনগোষ্ঠীর অধীনস্থরা বর্তমানে পোদ নামে পরিচিত। এরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দান করে থাকে। শুরুতে মৎস্য ব্যাবসায় এদের জীবিকা নির্বাহ হলেও পরবর্তী সময়ে কৃষিকেই এরা জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করে। সংকরায়নের মধ্য দিয়ে এদের আদি নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বর্তমানে প্রায় বিলুপ্ত।

খুলনা জেলায় ১৮০২, ১৮৫৬-১৮৬৩, ১৮৬৯, ১৮৭২, ১৮৮১, ১৮৯১, ১৯০১, ১৯১১, ১৯২১, ১৯৩১, ১৯৪১, ১৯৫১, ১৯৬১, ১৯৭৪, ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১ ও ২০১১ সালে আদমশুমারি পরিচালিত হয়েছে। এসব শুমারি হতে প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে দেখা যায় ১৮৬৯ সালে খুলনা মহকুমার (বর্তমানে খুলনা জেলা) জনসংখ্যা ছিল ২,১৩,০৭১ জন। ১৮৮১ সালে এই জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১০,৭৯,৯৪৮ জনে, অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩.১%। ১৮৯১ এ ৯% হারে বৃদ্ধি পেয়ে জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১১,৭৭,৬৫২ জন। ১৯০১ এ জনসংখ্যা ছিল ১২,৫৩,০৪৩ জন। **জনসংখ্যা**

১৯০১ সালে তৎকালীন খুলনা মহকুমা (বর্তমান খুলনা জেলা) জনসংখ্যা ছকটি নিম্নরূপ

সারণি-১৫

খুলনার আয়তন, জনসংখ্যা ও ঘনত্ব

মহকুমার নাম	আয়তন বর্গমিটার	শহরের সংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা	জনসংখ্যা	প্রতি ব.কি. মিটারে জনসংখ্যার পরিমাণ	১৮৯১ থেকে ১৯০১ পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার
খুলনা	১,৬৮৯.৯১	১	৯২৯	৪,০১,৭৮৫	২৩৮.৯৯	+১৭.৭

তথ্যসূত্র : Bangladesh District Gazetteer Khulna, 1978

উপর্যুক্ত তথ্যাবলি থেকে লক্ষ করা যায়, খুলনা জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ঘনত্বে বিভিন্ন সময়ে তারতম্য ঘটেছে। এর কারণ সুন্দরবনের উত্থান-পতন, সমুদ্রসংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন সময়ে ভূমির অবনমন, বিশাল এলাকা জুড়ে জলাভূমি, ম্যালেরিয়াসহ বিবিধ রোগের প্রাদুর্ভাব, বনাঞ্চল, চাষযোগ্য জমি বাড়ানোর সুযোগের অভাব প্রভৃতি। কিন্তু ধীরে ধীরে সুন্দরবন কেটে কৃষিযোগ্য জমি সৃষ্টি, জলাভূমি ভরাট, পলিমাটি দ্বারা নতুন স্থলভাগ সৃষ্টি প্রভৃতির মধ্য

[১০] ড. নীহার রঞ্জন রায়, বাঙ্গালির ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪৫।

দিয়ে জনবসতি ক্রমাগত বেড়েছে। বৃহত্তর খুলনার ১৯০১ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যার নিচের সারণিটি এর পরিচয় বহন করে।

সারণি-১৬

খুলনার জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি

বছর/সাল	জনসংখ্যা (হাজার)
১৯০১	১,২৬৮
১৯১১	১,৩৮০
১৯২১	১,৪৭২
১৯৩১	১,৬২৯
১৯৪১	১,৯৪৪
১৯৫১	২,০৭৬
১৯৬১	২,৪৪৯
১৯৭৪	৩,৫৫৭
১৯৮১	৪,৩২৯
১৯৯১	৫,০১৪
২০০১	৩৬৮
২০১১	(-) ৬০

তথ্যসূত্র: Statistical year book, 2012

সারণি-১৭

সর্বশেষ (২০১১) তথ্য অনুযায়ী জেলার জনসংখ্যার চিত্র নিম্নরূপ:

উপজেলা/ সিটি করপোরেশন	গৃহস্থালি	জনসংখ্যা (হাজার)		সর্বমোট	পুরুষ/মহিলা অনুপাত	পরিবার প্রতি জনসংখ্যা	প্রতি কি.মি. জনসংখ্যার ঘনত্ব
		পুরুষ	মহিলা				
বটিয়াঘাটা	৪০,৭৭৯	৮৭	৮৫	১৭২	১০২	৪.১৬	৬৯১
দাকোপ	৩৬,৫৯৭	৭৬	৭৬	১৫২	১০০	৪.১৩	১৫৪
দিঘলিয়া	২৬,৭৯৭	৫৯	৫৬	১১৫	১০৫	৪.৩১	১৪৯৮
ডুমুরিয়া	৭১,৯০৯	১৫৩	১৫৩	৩০৬	১০০	৪.২৪	৬৭৩
খুলনা সিটি করপোরেশন	১,৭৭,৮৫২	৩৯১	৩৬০	৭৫১	১০৮	৪.২২	১৬২৬৮
কয়রা	৪৫,৭৫০	৯৫	৯৯	১৯৪	৯৭	৪.২৪	১০৯
পাইকগাছা	৫৯,৮৭৩	১২৪	১২৪	২৪৮	১০০	৪.১৪	৬০৩
ফুলতলা	১৯,৫৫৫	৪১	৪২	৮৩	১০০	৪.২৬	১৪৭৬
রূপসা	৪১,৮৯৫	৯০	৮৯	১৭৯	১০১	৪.২৭	১৪৯৪
তেরখাদা	২৬,৩৪০	৫৯	৫৮	১১৭	১০০	৪.৪১	৬১৬
সর্বমোট	৫,৪৭,৩৪৭	১১৭৫	১১৪২	২৩১৭	১০১৩	৪.২২ (গড়	৫২৮

তথ্যসূত্র: জেলা পরিসংখ্যান, ২০১১, খুলনা; প্রকাশ জুন’ ২০১৩

জনসংখ্যার গঠন

খুলনা জেলার জনসংখ্যার একটা বড়ো অংশ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত অভিবাসী। আন্তঃজেলা অভিবাসী আগমনের কারণে খুলনা জেলার জনসংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি এখানকার জনসংস্কৃতিতে এক ধরনের মিশ্রণও ঘটেছে। এমনটা ধারণা করা যেতে পারে যে, সুদূর অতীতকাল থেকেই এই আগমন ও মিশ্রণের প্রক্রিয়া চলে আসছে। জমির সহজলভ্যতা, ব্যাবসাকেন্দ্র এবং শিল্পনগরী হওয়ার কারণে বিভিন্ন এলাকার মানুষ চাকরি, ব্যাবসা ও ছোটোখাটো বিভিন্ন কাজ করে জীবিকা অর্জনের জন্য খুলনায় বসতি স্থাপন করেছে এবং খুলনা জেলার অধিবাসীতে পরিণত হয়েছে। একটি তথ্য থেকে দেখা যায় ১৯৬১ সালের আদমশুমারিতে অন্যান্য জেলা থেকে আগত ১,২৫,৫০৮ জন মানুষ খুলনা জেলায় গণনাভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে পুরুষ ও মহিলা যথাক্রমে ৮২,০৭৪ ও ৪৩,৪৩৪ জন।[১১]

১৯৪৭ সালে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে ভারত, পাকিস্তান ২টি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র সৃষ্টির পর, ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে বেশকিছু মোহাজের তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের বিভিন্ন অংশে বসতি স্থাপন করেছিল। খুলনা জেলা ভারতীয় সীমান্তের খুব কাছাকাছি হওয়ায় সহজেই মোহাজেররা এই জেলায় বসতি স্থাপন করেছে। ১৯৬১ সালের শুমারিতে বৃহত্তর খুলনায় এই মোহাজেরের সংখ্যা ছিল ৩৮,৫২০ জন।[১২] এই মোহাজেরদের মধ্যে একটি বড়ো অংশ ছিল অবাঙালি এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরেও এদের অনেকেই পাকিস্তানের নাগরিক হবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। খুলনা মহানগরীতে এসব মোহাজেরদের জন্য একটি আশ্রয় শিবির রয়েছে। সেখানে ৪৮০ জন মোহাজের বসবাস করছে।[১৩] পাশাপাশি ১৯৪৭ সালে খুলনা জেলার বিশেষত হিন্দু সম্প্রদায়ের একটা অংশ ভারতে চলে যায়।

ধর্ম ও সম্প্রদায়

মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সময় গ্রিক দূত মেগাস্তিনিস এদেশে এসেছিলেন। তিনি তার বিবরণীতে 'গঙ্গারিডি' নামক একটি বিস্তৃত রাজ্যের উল্লেখ করেছেন। মনে করা হয়ে থাকে যে, খুলনা অঞ্চল এই গঙ্গারাষ্ট্র বা গঙ্গারিডি দেশের অংশ। এই এলাকার অধিবাসীরা একসময় ছিলেন হিন্দুধর্মাবলম্বী। পরবর্তীকালে জৈন এবং বৌদ্ধধর্মের ঢেউ এ এলাকাকেও স্পর্শ করেছিল। তুর্কি বিজয়ের পর বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো এ এলাকায়ও ইসলামধর্ম ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে।

বর্তমানে খুলনা জেলায় মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী মানুষ বসবাস করে। ১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত এই জেলায় ব্যাবসাবাণিজ্য এবং জমিদারি মূলত হিন্দু সম্প্রদায়ের হাতে ছিল। বেশিরভাগ মুসলমান যুক্ত ছিলেন চাষাবাদের সঙ্গে। কালের বিবর্তনে এই সামাজিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে এই জেলার মুসলমানগণ ব্যাবসাবাণিজ্য, শিক্ষা সংস্কৃতিতে

[১১] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯।

[১২] ওই।

[১৩] জেলা পরিসংখ্যান, খুলনা ২০১১, প্রকাশ ২০১৩।

অন্য সম্প্রদায়ের তুলনায় অনেক অগ্রবর্তী। একটি সারণি থেকে আমরা খুলনা জেলার বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের তথ্য অবগত হতে পারি:

সারণি-১৮

ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা

উপজেলা/সিটি করপোরেশন	মুসলিম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	অন্যান্য	সর্বমোট
বটিয়াঘাটা	১,০৯,৫৯১	৬১,৭০৮	৬	৩৮৬	০	১,৭১,৬৯১
দাকোপ	৬৩,৩৩৪	৮৬,১১৩	০	২,৮৬৯	০	১,৫২,৩১৬
দিঘলিয়া	৯৭,৮৬০	১৭,২১০	০	৫০৮	৭	১,১৫,৫৮৫
ডুমুরিয়া	১,৮৮,৬১৯	১,১৬,৪৫১	৯	৩৩৯	২৫৭	৩,০৫,৬৭৫
সিটি করপোরেশন	৬,৭৬,৪১২	৭৪,০৪৭	৮২	৯,২০৪	১৩২	৭,৫৯,৮৭৭
কয়রা	১,৫২,৯৮০	৪০,১৯৭	০	৪৭৬	২৭৮	১,৯৩,৯৩১
পাইকগাছা	১,৬৬,৫৬৪	৮০,৩৩২	০	১,০৮৭	০	২,৪৭,৯৮৩
ফুলতলা	৭৪,২৭১	৯৫৫	০	১৩	২	৭৫,২৪১
রূপসা	১,৫২,৬৪১	২৬,৪৯৪	০	৩৪৫	৩৯	১,৭৯,৫১৯
তেরখাদা	৯৪,৪৭৭	২২,২২০	০	১২	০	১,১৬,৭০৯
সর্বমোট	১৭,৭৬,৭৪৯	৫,২৫,৭২৭	৯৭	১৫,২৩৯	৭১৫	২৩,১৮,৫২৭

তথ্যসূত্র: Population and Housing Census-2011, Community Report:Khulna, P-477

বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের উপাসনার জন্য খুলনা জেলার বিভিন্ন উপজেলায় যে-সব উপাসনালয় রয়েছে নিম্নের সারণি থেকে আমরা এর পরিচয় পেতে পারি।

সারণি-১৯

উপজেলাভিত্তিক ধর্মীয় উপসনালয়ের সংখ্যা

উপজেলা/সিটি করপোরেশন	মসজিদ	ঈদগাহ	মন্দির	চার্চ (গির্জা)	প্যাগোডা	অন্যান্য
বটিয়াঘাটা	১৮৫	১১৫	১৩১	৩	০	০
দাকোপ	১১৯	৪২	২৩৭	২	০	০
দিঘলিয়া	২০৩	৩১	৪৫	৪	০	০
ডুমুরিয়া	২৬৩	১১২	১৪৩	৫	০	০
খুলনা সিটি করপোরেশন	৪৮৬	৩৪	৫১	২২	০	০
কয়রা	১৬৬	৬৫	১৪১	০	০	০
পাইকগাছা	১৬৬	১৪০	৬১	৩	০	০
ফুলতলা	১১৪	৫৬	২৯	০	০	০
রূপসা	১৭৫	৬৯	৫৬	২	০	০
তেরখাদা	২০৩	৮৫	৮৩	০	০	০
সর্বমোট	২,০৪৭	৭৪৯	৯৬৬	৩২	০	০

তথ্যসূত্র: Population and Housing Census-2011, Community Report: Khulna.

মেলা ‘বারো মাসে তেরো পার্বণ’-এর দেশ বাংলাদেশে বিভিন্ন উৎসবকে উপলক্ষ করে মেলা আয়োজনের ঐতিহ্য সুদূর অতীতের। ‘মেলা’ শব্দটির মূলে রয়েছে সংস্কৃত

'মিল্' ধাতু যার অর্থ 'মিলিত হওয়া'। এ মিলন বিভিন্ন শ্রেণি পেশার, বিভিন্ন বর্ণ ও বর্গের মানুষের বিভেদহীন মিলন। উৎসজাত যে অর্থকে 'মেলা' শব্দটি ধারণ করে আছে, চরিত্র বিচারেও মেলার মধ্যে সেই সম্মিলন এবং সর্বজনীনতা লক্ষ করা যায়। বাঙালি সংস্কৃতির পরিচয়বাহী যতগুলো চিহ্ন বহুযুগ পেরিয়ে আজও আপন মহিমায় উজ্জ্বল, 'মেলা' নিঃসন্দেহে এগুলোর মধ্যে অন্যতম। একসময় মেলা বলতে মূলত লোকমেলাকেই বোঝাতো এবং মেলার উপলক্ষও ছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠান। কিন্তু কালের বিবর্তনে মেলা গ্রাম পেরিয়ে শহরে পৌঁছেছে, ধর্মীয় উপলক্ষের সীমানা ছাড়িয়ে বিস্তৃত হয়েছে আর্থ-সামাজিক এমনকি রাজনৈতিক বিভিন্ন উপলক্ষের মধ্যে। এখন ঈদ বা পূজাকে কেন্দ্র করে যেমন মেলা বসে, তেমনি বসে নতুন বছরে 'বৈশাখিমেলা', ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিকে ধারণ করে 'একুশে বইমেলা' বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে 'বিজ্ঞানমেলা', 'বৃক্ষমেলা', 'শিল্পমেলা', 'কৃষিমেলা' এমনকি 'আবাসনমেলা'ও। এভাবে এক কালের লোকমেলা লাভ করেছে বহুমাত্রিক চরিত্র। কিন্তু যেটা সত্যি তা হলো, বাঙালি সংস্কৃতির সাথে যে মেলার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তা লোকমেলা। এর একটি আলাদা চরিত্র আছে, আলাদা গড়ন আছে, শহরে এসেও যা হারিয়ে যায় না। কিন্তু শহুরে সংস্কৃতির দাপট, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রভাব, যত্নের অভাব প্রভৃতি কারণে অনেক মেলা বিলুপ্ত হতে বসেছে। খুলনা জেলার মেলার অতীত ও বর্তমান চিত্রে সেটাই প্রতিভাত হয়। খুলনা জেলায় প্রায় প্রতি মাসেই কোনো না কোনো উপলক্ষে কোথাও না কোথাও মেলা বসে। ড. শেখ গাউস মিয়া 'বাংলাদেশের উৎসব ও মেলা, বৃহত্তর খুলনা জেলা' গ্রন্থে 'বৃহত্তর খুলনা জেলায় বসা মেলার সংখ্যা প্রায় ১৫০-এর অধিক' বলে মন্তব্য করেছেন। দুর্গাপূজা উপলক্ষে আয়োজিত মেলাকে এ হিসেবের বাইরে রাখা হয়েছে। উল্লিখিত গ্রন্থে মাসওয়ারি যে মেলাচিত্র দেওয়া হয়েছে তাতে খুলনা জেলায় মেলার সংখ্যা নিম্নরূপ:

সারণি-২০

খুলনায় আয়োজিত মেলার সংখ্যা

মাসের নাম	মেলার সংখ্যা
বৈশাখ	০৭
জ্যৈষ্ঠ	০২
আষাঢ়	০৩
শ্রাবণ	-
ভাদ্র	০৫
আশ্বিন	-
কার্তিক	০৮
অগ্রহায়ণ	০৩
পৌষ	০৫
মাঘ	০৪
ফাল্গুন	০৫
চৈত্র	০৯

- ঈদমেলা: কেবল মুজগুন্নী ও দিঘলিয়ার ঈদ মেলা হিসেবে আনা হয়েছে।
- দুর্গোৎসবের মেলাকে হিসেবের বাইরে রাখায় আশ্বিন মাসে কোনো মেলার উল্লেখ করা হয়নি। ক্ষেত্র জরিপের মাধ্যমে আহরিত তথ্যের ভিত্তিতে প্রদত্ত উপর্যুক্ত সংখ্যা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

খুলনা জেলার উল্লেখযোগ্য মেলাগুলো হলো- শান্তিধামের বৈশাখিমেলা, মতিয়াখালী বারুণীমেলা, কুদি মা বটতলার মেলা, মুজগুন্নী ঈদমেলা, ঈদ উপলক্ষে আয়োজিত দিঘলিয়া জামাইমেলা, খালিশপুরে মহররম মেলা, কপিলমুনি বারুণীমেলা, চুনকুড়ি বড়োদিনের মেলা, চরমুখো বনবিবিরমেলা, মহেশ্বরপাশা কালীপূজার মেলা প্রভৃতি। এসব মেলার সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো সর্বজনীনতা। কোনো বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়ের উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত মেলায় অংশগ্রহণ করে সব ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষ। এর মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ভুলে গিয়ে রচিত হয় সম্প্রীতি আর মৈত্রীর বন্ধন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য বাঙালি সংস্কৃতির মূল উপাদান। মেলা সেই ঐক্যকে আরও দৃঢ় করার ক্ষেত্রে পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

যৌথ পরিবার প্রথা খুলনা জেলার অধিকাংশ পরিবারই পৃথকান্ন পরিবার। গ্রামাঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু কিছু একান্নবর্তী বা যৌথ পরিবার লক্ষ করা যায়। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যৌথ পরিবারপ্রথা নেই বললেই চলে। জীবিকার তাগিদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রাবল্য, চাহিদা ও রুচির পার্থক্য প্রভৃতি কারণে অন্যান্য জেলার মতো খুলনা জেলায়ও যৌথ পরিবারপ্রথা ভেঙে পড়ছে।

বাসগৃহ খুলনা জেলার গ্রামের অধিবাসীরা অধিকাংশই নিম্নবিত্ত কিংবা নিম্নমধ্যবিত্ত। তাঁদের বাসগৃহ সাধারণত নির্মিত হয় বাঁশ অথবা বাঁশের ওপর কাদামাটি লেপা দেওয়াল এবং টিন, উলুখড় বা গোলপাতার তৈরি চালা দিয়ে। সুন্দরবন অঞ্চলে কাঠের দেওয়াল এবং গোলপাতার ছাউনির ঘরও দেখা যায়। জেলার গ্রামগুলোর উঁচু এলাকাগুলো ঘন বসতিপূর্ণ। কিন্তু নিচু এলাকায় জনবসতি হালকা ও অবিন্যস্ত। সাধারণত সম্পন্ন গৃহস্থের বাসগৃহ আধা-পাকা কিংবা টিন-কাঠ দ্বারা নির্মিত হয়। দোতলা টিনের ঘরও প্রচুর দেখা যায়। অবশ্য বিগত কয়েক বছরে খুলনা জেলার গ্রামাঞ্চলে বাসগৃহ হিসেবে দালান তৈরির প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে প্রায় প্রতিটি সম্পন্ন গৃহস্থ বাড়িতে ধান ও অন্যান্য কৃষিপণ্য রাখার জন্য গোলাকৃতি ‘গোলাঘর’ দেখা যায়।

সাম্প্রতিক সময়ে উপজেলা এবং জেলা সদরে অধিকাংশ বাসগৃহই দালান। অর্থনৈতিক সামর্থ্য বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, নির্মাণসামগ্রীর সহজলভ্যতা প্রভৃতি কারণে খুলনা জেলার গ্রাম-গঞ্জ-শহর সর্বত্রই বাসগৃহের রূপান্তর অত্যন্ত লক্ষণীয়। খুলনা জেলা সদরে এখন প্রচুর বহুতলবিশিষ্ট ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি হয়েছে। খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা সিটি করপোরেশন এলাকায় গড়ে তুলেছে বেশ কয়েকটি আবাসিক এলাকা। এসব এলাকায় তৈরি হয়েছে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্বলিত দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্য।

বস্তিবাসী ‘বস্তি শুমারি ও ভাসমান লোকগণনা ২০১৪’ অনুযায়ী খুলনা সিটি কর্পোরেশনে বস্তির সংখ্যা ১১৩৭টি। খুলনা সিটি করপোরেশন এলাকার গণনাকৃত বস্তিখানার সংখ্যা ২০,৬৫৮টি যেখানে পুরুষের সংখ্যা ৪০৪৮২ জন, মহিলা ৩৯২৬২ জন এবং হিজড়া ৬৯জন।

২০১৪ সালের বস্তি শুমারি অনুযায়ী উল্লিখিত বস্তিবাসীর (৭ বছরে ও তদূর্ধ্ব বয়সী) সাক্ষরতার হার ৪২.৫৯% যার মধ্যে পুরুষ ৪৪.৬৪%, মহিলা ৪০.৭১%এবং হিজড়া ৩৩.৯০%।

খানা এবং খানার বৈশিষ্ট্য জনগণের আর্থ সামাজিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আবাসন ব্যবস্থা এবং খানায় বিদ্যমান সুবিধাদির সাথে একটি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান। খুলনা সিটি কর্পোরেশনে প্রায় ৫৪.১৮%, বস্তিবাসী টিন/কাঁচাঘরে, ২৬.৩০% বস্তিবাসী আধা-পাকা ঘরে, ১৬.৪১% ঝুপড়িতে, ২.৩৮% পাকা ঘরে এবং মাত্র ০.৬৭% বস্তিবাসী অন্যান্য ধরনের গৃহে, ৪২.৫৫% বস্তিবাসী নিজস্ব বাসায়, ৪৪.৫০% ভাড়া বাসায়, ১২.৪৯% বিনা ভাড়ায় এবং মাত্র ০.৪৬% বস্তিবাসী অন্যান্য ধরনের মালিকানার গৃহে বসবাস করে।

খুলনা সিটি কর্পোরেশনে প্রায় ৯৮.১১% বস্তিবাসী নলকূপ হতে খাবার পানি সংগ্রহ করে, ১.২২% ট্যাপের পানি পান করে, ০.১২% কুয়ার পানি, ০.০৭% পুকুর/ডোবা হতে এবং ০.৫% বস্তিবাসী অন্যান্য উৎস হতে খাবার পানি সংগ্রহ করে।

বস্তিবাসীদের জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ উন্নত জীবনের নির্দেশক। যেহেতু প্রায় সব বস্তিবাসীই শহর এলাকায় বসবাস করে তাই আলোর উৎস হিসাবে তারা বিদ্যুৎ ব্যবহার করার সুযোগ পায়। খুলনা সিটি কর্পোরেশনে প্রায় ৯২.৮২% বস্তিবাসী আলোর উৎস হিসাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে, ৬.৫৪% বস্তিবাসী কেরোসিন আলোর উৎসের জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করে, ০.৩২% সৌর বিদ্যুৎ এবং ০.৩৩% অন্যান্য উৎস হতে আলো পেয়ে থাকে।

বস্তিবাসীদের স্বাস্থ্যকর পরিবেশের একটি ভালো নির্দেশক হিসাবে বিবেচিত হয় পায়খানার সুবিধা। অধিকাংশ বস্তিবাসী পয়ঃবর্জ্য নিস্কাশনের জন্য পিট ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। খুলনা সিটি কর্পোরেশনে প্রায় ৫২.৩৮% স্যানিটারি, ৩৯.০২% পিট ল্যাট্রিন, ৪.২৬% ব্যবহার করে টিননির্মিত ল্যাট্রিন, ৩.৯৫% ব্যবহার করে ঝুলন্ত/কাঁচা ল্যাট্রিন এবং ০.২২% খোলা জায়গা ব্যবহার করে।

অধিকাংশ বস্তিবাসী কাঠ/বাঁশ রান্নায় জ্বালানির উৎস হিসেবে ব্যবহার করে। খুলনা সিটি কর্পোরেশনে প্রায় ৯১.২৩% বস্তিখানা কাঠ/বাঁশ ব্যবহার করে, ১.১০% গ্যাস, ৪.০০% কড়/পাতা/কাগজ, ০.৭৭% বিদ্যুৎ, ১.৩৯% কেরোসিন এবং ১.৫১% অন্যান্য দ্রব্যাদি রান্নায় জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে।

জনসংখ্যা এবং সম্পদের বিভাজন এবং প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে অভিবাসন একটি পুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিছু অনিবার্য কারণে জনসাধারণ গ্রাম থেকে শহরের বস্তিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। কাজের সন্ধানে খুলনা সিটি কর্পোরেশনে প্রায়

৫০.৯৯% বস্তিবাসী বস্তি এলাকায় এসেছে, ৩৫.৫৫% দারিদ্র্যের কারণে এবং ২.১৮% নদীভাঙনের কারণে বস্তিতে এসেছে।[১৪]

বিবাহ বিবাহ সামাজিক বন্ধনের একটি প্রাচীন রীতি এবং প্রত্যেক ধর্মেই বিবাহ অনুষ্ঠানের কিছু নির্দেশনা রয়েছে। তাই কিছু লোকাচারের ভিন্নতা ছাড়া বাংলাদেশের সর্বত্র প্রত্যেক ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ-অনুষ্ঠান নিজ নিজ ধর্মমতে একইভাবে অনুষ্ঠিত হয়। খুলনা জেলাও এর ব্যতিক্রম নয়।

বাল্য বিবাহের ব্যাপক প্রচলন এক সময় সমগ্র ভারত উপমহাদেশেই ছিল। বিশ শতকের তিরিশের দশকে 'সারদা আইনে'র পরে এ প্রবণতা অনেক কমেছে। কিন্তু খুলনা জেলায় বিশেষত দক্ষিণাঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও বাল্য বিবাহের রীতি প্রচলিত রয়েছে।

মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথার ধর্মীয় স্বীকৃতি আছে এবং খুলনা জেলায় তার স্বল্পমাত্রায় প্রচলনও রয়েছে। তবে ১৯৬১ সালে মুসলিম পরিবারিক আইন পাস হওয়ার পর কেবল বিশেষ ক্ষেত্রে বহুবিবাহের অনুমতি দেওয়া হয়। ধর্মীয়ভাবে স্বীকৃত না হলেও হিন্দুদের মধ্যেও বহুবিবাহের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। খ্রিস্টানরা ইচ্ছে করলে বিবাহ বিচ্ছেদের পর নতুন বিয়ে করতে পারে।

মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মতো হিন্দু সমাজেও বর্তমানে বিধবা বিবাহের স্বীকৃতি আছে। সময়ের সাথে সাথে হিন্দু সম্প্রদায়েও বিধবা বিবাহের ঘটনা ঘটছে।

বিবাহে যৌতুক প্রদান ও গ্রহণ আইনত নিষিদ্ধ হলেও বিশেষত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যৌতুকপ্রথা প্রচলিত রয়েছে। এর প্রভাব এখন মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের ওপরও পড়েছে। যৌতুকপ্রথার কুফল অনেক সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যার সৃষ্টি করছে।

নিচের দুটি সারণি থেকে খুলনা জেলার বিবাহিত ও অবিবাহিত অধিবাসীদের তথ্য স্পষ্ট হবে -

সারণি-২১

খুলনা জেলার অধিবাসীদের (১০ এবং তদূর্ধ্ব বয়সের) বৈবাহিক তথ্য (শতকরা)-২০১১

উপজেলা/সিটি করপোরেশন	মোট		বিধবা বিপত্নীক		তালাকপ্রাপ্ত/ বিচ্ছিন্ন	
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
বটিয়াঘাটা	৭০,১৬৯	৬৯,১৫৭	১.০	৯.৮	০.১	১.৩
দাকোপ	৬৩,১০৭	৬৩,১১৭	১.১	১১.১	০.১	১.৯
দিঘলিয়া	৪৭,৩৪৭	৪৪,৮৮৬	০.৮	৮.৭	০.১	০.৯
ডুমুরিয়া	১,২৩,৪৩৮	১,২৪,১১৪	০.৮	১০.৪	০.১	১.৫
সিটি করপোরেশন	৩,৮৬,৪২৩	৩,৬৩,৩০২	০.৭	৮.৭	০.২	১.৩
কয়রা	৭৪৩১৪	৭৮৫৯১	০.৬	৮.৭	০.১	১.৬
পাইকগাছা	১,০০,৪২৩	১,০১,৫৮৪	০.৭	৮.৬	০.১	১.৩

[১৪] Census of Slam Areas and Floating Population 2014, BBS, SID, Ministry of Planning.

উপজেলা/সিটি করপোরেশন	মোট		বিধবা বিপত্নীক		তালাকপ্রাপ্ত/ বিচ্ছিন্ন	
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
ফুলতলা	৩৩,৫৭৮	৩৪,১০৩	০.৭	৮.৫	০.২	১.৭
রূপসা	৭২,১২৩	৭১,৮১৩	০.৮	৮.৯	০.৩	১.৫
তেরখাদা	৪৩,১৬১	৪৩,৮০৩	০.৮	৯.৪	০.২	০.৯
সর্বমোট	৯,৫২,৬১৫	৯,২৯,৩৪৬	০.৭	৯.২	০.১৫	১.৬

তথ্যসূত্র: Population and Housing Census-2011, Community Report:Khulna, P-229

পোশাক

এক সময় সম্প্রদায় নির্বিশেষে ধুতি, কোর্তা-শার্ট ছিল বাঙালির পোশাক। মুসলমানরা বর্তমানে কেউই ধুতি পরেন না। হিন্দুদের মধ্যেও ধুতির প্রচলন অনেক কমে গেছে। গ্রামাঞ্চলের সব সম্প্রদায়ের সাধারণ পোশাক লুঙ্গি ও গেঞ্জি কখনও কখনও লুঙ্গি, শার্ট বা পাঞ্জাবি। শহরাঞ্চলে পোশাকের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। পুরুষরা ট্রাউজার ও শার্ট বা গেঞ্জি এবং মেয়েরা সালোয়ার-কামিজ পরে থাকেন। শহরের মহিলাদের মধ্যে শাড়ি ও সালোয়ার-কামিজ দুয়েরই প্রচলন রয়েছে। তবে গ্রামাঞ্চলের মহিলারা অধিকাংশই শাড়ি ব্যবহার করে থাকেন।

খাদ্যাভ্যাস

খুলনা জেলার অধিবাসীদের খাদ্যাভ্যাস বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মানুষের মতোই। ভাতই এলাকার মানুষদের প্রধান খাদ্য। তবে পুরুষানুক্রমে খুলনার স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে সিদ্ধ চালের চাইতে ‘ভাইটাল’ বা ‘রানী স্যালুট’ নামে পরিচিত আতপ চালের ভাত খাওয়া অধিক প্রচলিত। সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রচুর জলাশয় এবং নদনদী থাকার কারণে এখানে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। সাম্প্রতিক কালে ‘ঘের’ তৈরি করে প্রচুর চিংড়ি এবং অন্যান্য বিভিন্ন জাতের মাছের চাষ হয়। খুলনা জেলায় উৎপাদিত চিংড়ি প্রক্রিয়াজাত করে বিদেশে রফতানি হয়, যা বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের একটি বড়ো মাধ্যম। খুলনা জেলা সমুদ্র উপকূলবর্তী হওয়ায় সামুদ্রিক মাছ এবং লোনা পানির মাছ এখানে অনেক সহজলভ্য। এ জেলার চিংড়ি, পারশে প্রভৃতি মাছ সারা দেশে বেশ জনপ্রিয়। সুন্দরবনসংলগ্ন এলাকাসহ জেলার দক্ষিণ অঞ্চলে কেওড়া ফলের টক বহুল প্রচলিত খাদ্য। আমিষ জাতীয় খাদ্য হিসেবে মাছ ছাড়াও গোরু, খাসি এবং মুরগির মাংসের প্রচলন রয়েছে। খুলনা জেলার গ্রামাঞ্চলে এবং সন্নিহিত যশোর জেলায় প্রচুর শাকসবজি উৎপাদিত হয়। ফলে খুলনার মানুষের খাদ্য তালিকায় সবসময়ই টাটকা শাকসবজি অন্তর্ভুক্ত থাকে। বিশেষ ধর্মীয় কারণে অল্পসংখ্যক মানুষ নিরামিষভোজী; অধিকাংশ মানুষই আমিষভোজী।

পুরাকীর্তি

খুলনা জেলা বাংলাদেশের একটি পুরাকীর্তিসমৃদ্ধ এলাকা। ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া অধ্যায়ের অনেক নিদর্শন এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ‘ভরত ভায়নার স্তূপ’, ‘আলাইপুরের ফতেপুরের গড়’, ‘মসজিদ কুড়ের মসজিদ’, ‘আরশ নগরের মসজিদ’, ‘ফুলতলার দক্ষিণ ডিহিতে রবীন্দ্রনাথের শ্বশুর বাড়ি’, ‘রূপসার পিঠাভোগে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পুরুষের বাসস্থান’, ‘রাড়ুলিতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বাড়ি’ প্রভৃতি এর উদাহরণ।

শেখ হাসিনা জাদুঘর খুলনাতে ১৯৯৮ সালের ১২ অক্টোবর তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভাগীয় জাদুঘর, খুলনা উদ্বোধন করেন। খুলনা শহরের কেন্দ্রস্থল শিববাড়ির মোড়ে এটি অবস্থিত। এ জাদুঘরের সংগ্রহশালায় পাহাড়পুর, ময়নামতি, খানজাহান আলীর সমাধিসৌধ, করবাজার এবং ভরত ভায়নার স্তূপ থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন পুরাকীর্তি রয়েছে।

খুলনায় বিভাগীয় জাদুঘর স্থাপনের বহু পূর্ব থেকেই শশিভূষণ পাল, সতীশচন্দ্র মিত্র, চুনিলাল মেহতা, ডা. আবুল কাসেম প্রমুখ ব্যক্তিগত উদ্যোগে বেশ কিছু পুরাকীর্তি সংগ্রহ করেছিলেন।

সাধারণ পাঠাগার সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনে খুলনা জেলায় একটিমাত্র সরকার পরিচালিত সাধারণ পাঠাগার আছে। এটি খুলনা মহানগরীর বয়রাতে অবস্থিত বিভাগীয় গণগ্রন্থাগার। কিন্তু এ জেলার সর্বপ্রাচীন সাধারণ পাঠাগার 'উমেশচন্দ্র লাইব্রেরি'। ১৮৯৭ সালের ০১ মে এ লাইব্রেরির যাত্রা শুরু হয় খুলনা পৌরসভার একটি কক্ষে। ১৯৭৪ সালে এটি 'জাহিদ স্মৃতিভবন' নামে বর্তমান ভবনে স্থানান্তরিত হয়। নড়াইলের জমিদার কিরণ রায়চৌধুরীর অর্থানুকূল্যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁর পিতা উমেশ চন্দ্রের নামানুসারে এ লাইব্রেরির নামকরণ হয়। খুলনা মহানগরীর অন্যান্য সাধারণ পাঠাগারগুলো হলো 'রতন সেন পাবলিক লাইব্রেরি', দুর্বার সংঘ গ্রন্থাগার', 'শেখ তৈয়বুর রহমান পাবলিক লাইব্রেরি', 'বীরশ্রেষ্ঠ মো. রুহুল আমীন পাবলিক লাইব্রেরি', 'অবকাশ গণগ্রন্থাগার', 'মহিয়সী বেগম রোকেয়া পাবলিক লাইব্রেরি'। এসব সাধারণ পাঠাগারের বাইরে উপজেলাপর্যায়ে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের স্বীকৃতি ও অনুদানপ্রাপ্ত নিম্নোক্ত সংখ্যক সাধারণ পাঠাগার রয়েছে -

সারণি-২২
উপজেলাওয়ারি লাইব্রেরির সংখ্যা

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	লাইব্রেরির সংখ্যা
১	খুলনা সদর	০৯ টি
২	তেরখাদা	০১ টি
৩	বটিয়াঘাটা	০২ টি
৪	পাইকগাছা	০৬ টি
৫	ফুলতলা	০৩ টি
৬	দাকোপ	০২ টি
৭	দিঘলিয়া	০৩ টি
৮	কয়রা	০২ টি
৯	ডুমুরিয়া	০২ টি
১০	রূপসা	০ টি
মোট		৩০ টি

তথ্যসূত্র: বিভাগীয় গণগ্রন্থাগার, খুলনা।

বিনোদন বিনোদনের সাথে জাতীয় সংস্কৃতির যোগ অবিচ্ছেদ্য। সংস্কৃতির রূপান্তরের সাথে সাথে বিনোদনের মাধ্যম ও প্রকৃতিতেও পরিবর্তন আসে। বাংলাদেশের অন্যান্য

অঞ্চলের মতো খুলনা জেলার মানুষের বিনোদন সম্পর্কেও একথা সত্য। সাধারণত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মেলা, দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন, আকাশ-সংস্কৃতি প্রভৃতিকে বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

খেলাধুলা

সুদূর অতীত থেকে হাডুডু, দাঁড়িয়াবান্ধা, সাঁতার, কানামাছি, লুডু, বাগবন্দি প্রভৃতি খেলা বাঙালির বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে প্রচলিত। এসব খেলা বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছদ্য অংশ। খুলনা জেলার গ্রামাঞ্চলে এই দেশি খেলাগুলো সীমিতভাবে হলেও এখনও বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে প্রচলিত। রুচির পরিবর্তন, পাশ্চাত্য ও শহুরে সংস্কৃতির প্রভাব প্রভৃতি কারণে বিনোদন-প্রকৃতি পাল্টে যাবার সাথে সাথে দেশি খেলাগুলো লুপ্ত হবার পথে। তবে হাডুডু বা কাবাডি খেলার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি খেলাটিকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। এর বাইরে ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, হ্যান্ডবল, ব্যাডমিন্টন প্রভৃতি খেলা এখন শহর ছাড়িয়ে খুলনার গ্রামীণ মানুষেরও বিনোদনের মাধ্যম হয়ে উঠেছে। খুলনা জেলার শহর-গ্রাম নির্বিশেষে অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে খেলার মাঠের ব্যবস্থা রয়েছে। খুলনা শহরে রয়েছে দুটি স্টেডিয়াম। এর মধ্যে শহিদ আবু নাসের স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার আসর বসে।

ধর্মীয় কিংবা সামাজিক কোনো উৎসব উপলক্ষে নৌকাবাইচ, ঘোড়দৌড়, ষাঁড়ের লড়াই প্রভৃতি ঐতিহ্যবাহী খেলা এখনও খুলনা জেলার মানুষের বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে প্রচলিত।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বাংলাদেশে বিনোদন-মাধ্যম হিসেবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এক সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলতে যাত্রাগান, কবিগান, জারিগান, গাজীরগীত, অষ্টকগান; লোকসংস্কৃতির এসব অনুষঙ্গকেই বোঝাতো এবং খুলনা জেলায় এগুলোর ব্যাপক প্রচলন ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে গ্রামাঞ্চলে অত্যন্ত সীমিত আকারে এসব অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়ে থাকে। বাঙালি লোকসংস্কৃতির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এসব গানের দর্শক-শ্রোতা যেমন কমেছে তেমনি অভাব ঘটেছে পরিবেশনকারী দল-গোষ্ঠীরও। তবে পটগান খুলনা জেলার সর্বত্র বেশ জনপ্রিয়। এই গানের মাধ্যমে বিনোদনের অভাব যেমন পূরণ হয়, তেমনি সচেতনতা তৈরিতেও এগুলো বিরাট ভূমিকা পালন করে।

আকাশসংস্কৃতি

বিশ্বজুড়েই সাম্প্রতিক সময়ে বিনোদনের সবচেয়ে বড়ো মাধ্যম আকাশ সংস্কৃতি। জীবনযাত্রার আধুনিকায়নের মধ্য দিয়ে আকাশ-সংস্কৃতি এখন পৌঁছে গেছে প্রত্যন্ত গ্রামেও। টেলিভিশন, ভিসিপি ডিশ অ্যান্টেনার ব্যাপক ব্যবহারের ফলে শহর-নগর-গ্রাম-গঞ্জের মানুষের বিনোদন এখন বসত ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যেই সহজলভ্য হয়ে উঠেছে। এসব ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া সারা বিশ্বের অনুষ্ঠানকে দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে মানুষের বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে। এ চিত্র সারা বাংলাদেশের। খুলনা জেলাও এর ব্যতিক্রম নয়।

খুলনা জেলায় একটি পূর্ণাঙ্গ বেতার কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের একটি সম্প্রচার কেন্দ্র রয়েছে। এই সম্প্রচার কেন্দ্রটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ টেলিভিশন কেন্দ্রে রূপান্তরের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে।

বিনোদনের অন্যান্য মাধ্যম

সিনেমা নিঃসন্দেহে বিনোদনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। খুলনা শহরে এবং খুলনা জেলার কয়েকটি উপজেলায় বেশ কয়েকটি সিনেমা হল রয়েছে। এক সময়ে ভ্রাম্যমাণ সিনেমা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে জনপ্রিয় ছিল। আকাশ-সংস্কৃতির প্রভাবে ভ্রাম্যমাণ সিনেমা এখন প্রায় হারিয়ে গেছে।

নাট্যাভিনয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক শিল্প মাধ্যম। শহরের পাশাপাশি খুলনা জেলার বিভিন্ন উপজেলা এমনকি গ্রামেও নাট্যদল রয়েছে। নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে এসব নাট্যদল বিনোদনের আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

দুদশক আগেও সার্কাস গ্রামীণ ও শহুরে মানুষের বিনোদনের একটা বড়ো মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হতো। কিন্তু দিন বদলের সাথে সাথে সার্কাসের দল যেমন কমেছে, তেমনি কমে গেছে এর দর্শকপ্রিয়তা। তবে বিভিন্ন উপলক্ষে বিশেষত খুলনা জেলার গ্রামাঞ্চলে এখনও সার্কাস গ্রামীণ মানুষকে বিনোদন দিয়ে থাকে।

এ ছাড়া বিভিন্ন উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, (রবীন্দ্রজয়ন্তী, নজরুলজয়ন্তী, পহেলা বৈশাখ, বসন্ত উৎসব, বর্ষবরণ, শহিদ দিবস, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস প্রভৃতি), ক্লাব/ক্রীড়া সংগঠন/ সাংস্কৃতিক সংগঠন, পার্ক, সাধারণ গ্রন্থাগার, দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমেও খুলনা জেলার মানুষ তাদের বিনোদনের চাহিদা পূরণ করে থাকে। ৩টি সারণির মধ্য দিয়ে খুলনা জেলার সিনেমা হল, ক্লাব, সাধারণ গ্রন্থাগার, মিলনায়তন, দর্শনীয় স্থান প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

সারণি-২৩

সিনেমা হল, নিবন্ধিত ক্লাব ও মিলনায়তনের সংখ্যা, ২০১১

উপজেলা/সিটি করপোরেশন	সিনেমা হল	নিবন্ধিত ক্লাব	মিলনায়তন
বটিয়াঘাটা	০	৪৬	০
দাকোপ	১	১৩৫	১
দিঘলিয়া	০	২৬	৫
ডুমুরিয়া	১	১৪৯	১
খুলনা সিটি করপোরেশন	৭	২৮	২৪
কয়রা	০	৬৫	১
পাইকগাছা	২	৭৩	১
ফুলতলা	১	৭	৪
রূপসা	১	৪২	১
তেরখাদা	০	৩১	১
মোট	১৩	৬০২	৩৯

তথ্য সূত্র: জেলা পরিসংখ্যান, খুলনা ২০১১, প্রকাশ-২০১৩।

সারণি-২৪

বিভিন্ন ধরনের ক্লাবের সংখ্যা, ২০১১

উপজেলা/সিটি করপোরেশন	ক্রীড়া সংগঠন/ক্লাব	সাংস্কৃতিক ক্লাব সংগঠন/ক্লাব	বিজ্ঞান ক্লাব	অন্যান্য সামাজিক ক্লাব, অফিসার্স ক্লাব, রাইফেলস ক্লাব প্রভৃতি
বটিয়াঘাটা	৪৬	১৫	০	১
দাকোপ	২০	১২	০	১০৩
দিঘলিয়া	২৬	২৬	০	১
ডুমুরিয়া	১০২	৩৯	০	৮
খুলনা সিটি করপোরেশন	২১	১৬	০	৩৫
কয়রা	৬৫	১	০	১
পাইকগাছা	০	০	০	০
ফুলতলা	১	১	১	২
রূপসা	৪২	০	০	১
তেরখাদা	০	০	০	১
মোট	৩২৩	১১০	১	১৫৩

তথ্য সূত্র: জেলা পরিসংখ্যান, খুলনা ২০১১, প্রকাশ ২০১৩

সারণি-২৫

গুরুত্বপূর্ণ অথবা ঐতিহাসিক স্থান/পর্যটন কেন্দ্র

উপজেলা/ সিটি করপোরেশন	গুরুত্বপূর্ণ অথবা ঐতিহাসিক স্থান/ পর্যটন কেন্দ্র / বিষয়
বটিয়াঘাটা	শহিদমিনার
দাকোপ	সুন্দরবন
দিঘলিয়া	কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের বাসগৃহ
ডুমুরিয়া	বিল ডাকাতিয়া
খুলনা সিটি করপোরেশন	রূপসা সেতু
কয়রা	বড়োবাড়ি
পাইকগাছা	কাটিপাড়া
ফুলতলা	দক্ষিণডিহি (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুরালয়)
রূপসা	পিঠাভোগ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ব পুরুষের আবাসস্থল, বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমীনের মাজার)
তেরখাদা	-

তথ্যসূত্র : জেলা পরিসংখ্যান ২০১১, খুলনা।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। তাই জাতীয় উন্নয়নের একটি **নারীর ক্ষমতায়ন** প্রধান শর্ত নারীর উন্নয়ন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুরুষের তুলনায় নারীরা অনেক

পিছিয়ে আছে। ১৯৭২-এ বাংলাদেশের যে সংবিধান রচিত হয়, সেখানে নারীর সমঅধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানের ২৭, ২৮(১), ২৮(২), ২৮(৩), ২৮(৪), ২৯(১), ২৯(২) অনুচ্ছেদসমূহে নারীর প্রতি বৈষম্যলোপ এবং প্রজাতন্ত্রের নাগরিক হিসেবে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। ২৮(২) অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন'। ৬৫(৩) অনুচ্ছেদে নারীর জন্য জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসন রাখা হয়েছে এবং ৫৯ অনুচ্ছেদের অধীনে স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।

নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সংবিধানের উল্লিখিত বিধানসমূহ বাস্তবায়নের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার স্বাধীনতার পর থেকেই বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৯৭২ সালে নারী পুনর্বাসন বোর্ড, ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন কল্যাণ ফাউন্ডেশন, ১৯৭৬ সালে জাতীয় মহিলা সংস্থা ও ১৯৭৮ সালে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। ১৯৮৪ সালে গঠিত হয় মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর। ১৯৯০-এ পরিদপ্তর উন্নীত হয় অধিদপ্তরে। ১৯৯৪ সালে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নামকরণ হয় মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর দেশজুড়ে জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমি, কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, নারী কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বেগম রোকেয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রভৃতি পরিচালনার মাধ্যমে নারীর উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এ ছাড়া এ অধিদপ্তরের অধীনে সকল জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম সফলতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে।

জাতীয় মহিলা সংস্থা ৬৪টি জেলা ও ৫০টি উপজেলায় নারী উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে ৫০ সদস্যবিশিষ্ট 'জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ (NCWCD)' গঠন করা হয়েছে, গঠিত হয়েছে আন্তঃমন্ত্রণালয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি। নারী ও কন্যা শিশুর ওপর নির্যাতন প্রতিরোধের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থায় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল তৈরি করা হয়েছে এবং জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে গঠন করা হয়েছে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি। নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার এবং বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সার্বিক সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

এসব কার্যক্রমের পাশাপাশি বাংলাদেশে নারী নির্যাতন রোধে বেশ কিছু প্রচলিত আইন সংশোধন ও নতুন আইন প্রণীত হয়েছে। এসব আইনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, যৌতুক নিরোধ আইন, বাল্য বিবাহ রোধ আইন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা)

আইন ২০১০, নাগরিকত্ব আইন (সংশোধিত)-২০০৯, ভ্রাম্যমাণ আদালত আইন-২০০৯ প্রভৃতি।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও প্রায় সকল ফোরামে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে নারী উন্নয়নে বৈশ্বিক উদ্যোগ ও ভাবনার সাথে একাত্মতা দেখিয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women (CEDAW), Nation Forward looking strategy, Platform for Action (PFA), Optional Protocol on CEDAW প্রভৃতি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার ২০২১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ক্ষমতায়ন এবং সম-অধিকারের মাধ্যমে নারীকে জাতীয় উন্নয়নের মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য প্রণয়ন করেছে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১। এ নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে বিভিন্ন কর্মসূচি। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে নারী-দারিদ্র্য বিমোচন, নারী নির্যাতন বন্ধ, নারী পাচার রোধ, আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীর পূর্ণ ও সম অংশগ্রহণ, হতদরিদ্র নারীদের জন্য ভাতা, ভিজিডি কর্মসূচি, আয়কেন্দ্রিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শ্রমবাজারে ব্যাপক অংশগ্রহণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ও বিনা জামানতে ঋণ প্রদান প্রভৃতি।

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। নারীর উন্নয়ন, সম-অধিকার এবং ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই কেবল সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য অনেক। মন্ত্রিসভা, জাতীয় সংসদ, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদে নারী নেতৃত্ব, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে দৃশ্যমান করে তুলেছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেত্রী নারী। জাতীয় সংসদ এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিটি স্তরে সংরক্ষিত আসনের বাইরে সরাসরি নির্বাচনে পুরুষের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে নারী, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতিসহ বিভিন্ন উচ্চপদে নারীর অধিষ্ঠান নারীর সামাজিক ক্ষমতায়নকে নিশ্চিত করছে।

নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের এই চিত্র খুলনা জেলাতেও লক্ষণীয়। এ জেলায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীনে খুলনা জেলা ও ৯টি উপজেলায় নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচি, মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (WTC), মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঋণ তহবিল, ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল, কর্মজীবী নিম্নবিত্ত মায়ের শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র, দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকালীন

ভাতা প্রদান কার্যক্রম, মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম প্রভৃতি। এছাড়া জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের অধীন স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি/ সংগঠনসমূহের নিবন্ধন প্রদান, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মাধ্যমে Onestop crisis centre (OCC) পরিচালনা, আদালত কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে নারী নির্যাতন বিষয়ক মামলার তদন্ত প্রভৃতি কার্যক্রম খুলনা জেলা ও ৯টি উপজেলার মহিলা বিষয়ক কার্যালয়গুলো সম্পাদন করে থাকে। সারণির মাধ্যমে খুলনা জেলার বিভিন্ন উপজেলার ভিজিডি কার্যক্রমের চিত্র তুলে ধরা হলো।

সারণি-২৬

খুলনা জেলার ভিজিডি কার্যক্রম

ক্রমিক নং	উপজেলা	ইউনিয়নের সংখ্যা	উপকারভোগীর সংখ্যা			মন্তব্য	
			(২০১৩-১৪) চক্র	(২০১৫-১৬) চক্র	(২০১৭-১৮) চক্র		
০১	ফুলতলা	৪	২০৫৫	২০৫৫	২৩০৫	মাসিক মাথাপিছু খাদ্য শস্যের পরিমাণ ৩০ কেজি চাল/গম	নির্বাচিত এনজিও ভিজিডি উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
০২	দিঘলিয়া	৬	২৩৪৬	২৩৪৬	২৭৪৬		
০৩	তেরখাদা	৬	১৪৯৫	১৪৯৫	১৯৯৫		
০৪	রূপসা	৫	২৩০১	২৩০১	২৬৫১		
০৫	ডুমুরিয়া	১৪	১১৭৬	১১৭৬	১৮৭৬		
০৬	বটিয়াঘাটা	৭	২৭২৭	২৭২৭	৩১২৭		
০৭	দাকোপ	৯	২৭৬১	২৭৬১	৩১৬১		
০৮	পাইকগাছা	১০	২০৮০	২০৮০	২৫৮০		
০৯	কয়রা	৭	২৫০২	২৫০২	৩০০২		
মোট-		৬৮	১৯,৪৪৩	১৯,৪৪৩	২৩,৪৪৩		

তথ্যসূত্র: জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, খুলনা।

স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতিসমূহ নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এসব সমিতি/সংগঠনের কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে প্রতিবছর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে বিভিন্ন অঙ্কের সরকারি অনুদান প্রদান করা হয়। খুলনা সিটি করপোরেশন এবং ৯টি উপজেলার নিবন্ধিত মহিলা সমিতি ও সংগঠনের চিত্র:

সারণি-২৭

খুলনা জেলার নিবন্ধিত সমিতি সংখ্যা

নিবন্ধনকৃত মোট সমিতির সংখ্যা জুন/১৪ পর্যন্ত	সক্রিয় সমিতির সংখ্যা	নিষ্ক্রিয় সমিতির সংখ্যা	২০১৪ সালে নিবন্ধনকৃত সমিতির সংখ্যা
২০১	১৪১	৬০	৯টি

তথ্যসূত্র: পূর্বোক্ত

সারণি-২৮
খুলনা জেলার স্বেচ্ছাসেবী নারী সমিতি ও সংগঠনের সংখ্যা

জুন- ২০১৪

ক্রমিক নং	উপজেলা	মোট সমিতির সংখ্যা	সক্রিয় সমিতির সংখ্যা	নিষ্ক্রিয় সমিতির সংখ্যা
১.	ফুলতলা	১২	১০	০২
২.	দিঘলিয়া	১০	১০	০০
৩.	তেরখাদা	০৮	০৬	০২
৪.	রূপসা	২৩	১০	১৩
৫.	ডুমুরিয়া	৩৫	৩৩	০২
৬.	বটিয়াঘাটা	১৫	১৫	০০
৭.	দাকোপ	৩৪	৩০	০৪
৮.	পাইকগাছা	৩০	২১	০৯
৯.	কয়রা	১৭	১২	০৫
	মোট-	১৮৪	১৪৭	৩৭

তথ্যসুত্র: এক নজরে সার্বিক কার্যক্রমের তথ্যাদি, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, খুলনা।

স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি নিবন্ধনসংক্রান্ত: (জুন ২০১৬ পর্যন্ত)

এ কার্যক্রমের আওতায় স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি ও সংগঠনসমূহের কার্যক্রমের ভিত্তিতে নীতিমালা অনুযায়ী সরকারি নিবন্ধন প্রদান করা হয়। সংগঠনের কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর হতে প্রতিবছর বিভিন্ন অংকের সরকারি অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে।

সারণি-২৯
স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রমিক নং	জেলা/উপজেলা	মোট সমিতির সংখ্যা	সক্রিয় সমিতির সংখ্যা	নিষ্ক্রিয় সমিতির সংখ্যা
১।	খুলনা জেলা কার্যালয়	২১৩	১৫৩	৬০
২।	বটিয়াঘাটা	১৬	১৬	০
৩।	ডুমুরিয়া	৪০	৩৭	৩
৪।	রূপসা	২৭	১৪	১৩
৫।	ফুলতলা	১৪	১২	২
৬।	দিঘলিয়া	১০	১০	০
৭।	তেরখাদা	৯	৭	২
৮।	পাইকগাছা	৩১	২২	৯
৯।	দাকোপ	৩৫	৩০	৫
১০।	কয়রা	১৮	১৩	৫
	মোট	৪১৩	৩১৪	৯৯

দারিদ্র্য বিমোচন, আত্মকর্মসংস্থান এবং আর্থিক স্বাবলম্বন নারীর ক্ষমতায়নের উৎসমুখ। এজন্য অসচ্ছল ও স্বল্প আয়ের মহিলাদের জন্য মহিলা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে চালু করা হয়েছে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম। এক থেকে দুই বছর মেয়াদি সর্বোচ্চ ১৫,০০০/- টাকার এই ঋণ প্রদান করা হয় ৫% সার্ভিস চার্জে। খুলনা জেলার বিভিন্ন উপজেলায় এই ঋণ প্রদানের চিত্র হলো: (জুন, ২০১৪ পর্যন্ত)

সারণি-৩০

খুলনা জেলার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

ক্রমিক নং	জেলা/উপজেলা	ঋণ তহবিল	মোট বিতরণ	মোট আদায়	উপকৃত মহিলা সংখ্যা (জন)
১।	ফুলতলা	৯,০৯,৯৬৬/৫৮	৩১,৮৯,০০০	২৩,৩৬,৭৬০	৩২৮
২।	দিঘলিয়া	৭,৩০,৯৬৬/৫২	৪৫,৪৭,০০০	৩৮,৬৭,০৩২	৪৩৮
৩।	তেরখাদা	৬,৬১,৪৬৬/৫৮	৪৫,৫২,৫০০	৪৩,২৬,৪২০	৩৩৫
৪।	রূপসা	৮,৬১,৪৬৬/৫৮	২১,৬৪,০০০	১৩,৪৩,৬১৩	২৫৬
৫।	ডুমুরিয়া	১১,৬১,৪৬৬/৫৮	৫৯,২৭,৫০০	৫৩,৬৪,৫৫৫	৮৬৫
৬।	বটিয়াঘাটা	৮,৬১,৪৬৬/৫৮	৩৮,১৯,০০০	৩,২৭,২৮,৫০৮	৪৩৭
৭।	দাকোপ	১১,৩০,৯৬৬/৫৮	২৩,৮৫,০০০	১৪,৩৯,৩৭৪	৩৪২
৮।	পাইকগাছা	৮,৬১,৪৬৫/৫৮	২০,০৮,০০০	১১,৪৮,৪৩১	৩০২
৯।	কয়রা	৫,৬১,৪৬৬/৫৮	৮,৬১,০০০	৭,৭৪,৮৯০	১৩৬

তথ্যসূত্র: এক নজরে সার্বিক কার্যক্রমের তথ্যাদি, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, খুলনা।

এছাড়াও খুলনা জেলায় মহিলাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

ক্র: নং	অর্থ বছর	কার্যক্রমের বিবরণ			ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	জনপ্রতি দৈনিক ভাতা
		প্রশিক্ষণের ধরন	ট্রেডের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	৯,৪০,২৯৫/-	৬০/- (ষাট) টাকা
১।	২০১৭-১৮	বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	বিউটিফিকেশন	২৫০ জন		
			দর্জি বিজ্ঞান			
			ব্লক-বাটিক			
			সূচিশিল্প			
			খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ			
			কাপড় ও চটের ব্যাগ তৈরি			

তথ্যসূত্র: জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, খুলনা।

জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ শীর্ষক কর্মসূচি

'জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ' শীর্ষক কার্যক্রমের আওতায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংগ্রামী, আত্মপ্রত্যয়ী ও প্রতিভাবান নারীদের উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করার জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে জয়িতা অনুসন্ধান করে পর্যায়ক্রমে উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে তাদের স্বীকৃতি ও

সম্মাননা প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় ৫টি ক্যাটাগরিতে জয়িতাদের সম্মাননা প্রদান করা হয় (১. অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জনকারী নারী ২. শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী নারী ৩. সফল জননী নারী ৪. নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করেছেন যে নারী এবং ৫. সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখেছেন যে নারী)।

১) ২০১৩-১৪ অর্থবছরে খুলনা জেলার ৯টি উপজেলা থেকে ৫ ক্যাটাগরিতে ৪৫জন জয়িতার মধ্য থেকে খুলনা জেলা পর্যায়ে ৫ ক্যাটাগরিতে ৫ জনকে শ্রেষ্ঠ জয়িতা হিসেবে নির্বাচন করে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

২) ২০১৪-১৫ অর্থবছরে খুলনা জেলার ৯টি উপজেলা থেকে ৫ ক্যাটাগরিতে ৪৫ জন ও খুলনা সিটি করপোরেশন পর্যায়ে ৫ ক্যাটাগরিতে ৫ জন সহ মোট ৫০ জন জয়িতার মধ্য থেকে খুলনা জেলা পর্যায়ে ৫ ক্যাটাগরীতে ৫ জনকে শ্রেষ্ঠ জয়িতা হিসেবে নির্বাচন করে সম্মাননা প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে খুলনা বিভাগীয় পর্যায়ে ১০ জেলার শ্রেষ্ঠ ৫০ জন জয়িতার মধ্য থেকে ৫ ক্যাটাগরিতে ৫ জনকে শ্রেষ্ঠ জয়িতা হিসেবে নির্বাচন করে সম্মাননা প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, এটা একটি চলমান কর্মসূচি।

কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল

কর্মজীবী মহিলা ও চাকরি অনুসন্ধিৎসু মহিলাদের স্বল্প খরচে ও নিরাপদ আবাসনের জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীনে খুলনাস্থ বয়রায় ‘কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল’ পরিচালিত হচ্ছে। এ হোস্টেলের আসন সংখ্যা ১৫০টি।

মহিলা সহায়তা কর্মসূচি

নির্যাতিত মহিলাদের বিনা খরচে আইনগত সহযোগিতা প্রদান, ২টি শিশু সন্তানসহ ৬ মাস পর্যন্ত আশ্রয়দান, বিনা খরচে খাওয়া এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ কেন্দ্রে মোট আসন সংখ্যা: মা-২৮ জন, শিশু-৫৬ জন।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের পাশাপাশি জাতীয় মহিলা সংস্থাও খুলনায় নারীর আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মসূচির বাস্তবায়ন করছে। খুলনাতে মহিলা সংস্থার কার্যক্রম মূলত প্রশিক্ষণকেন্দ্রিক। বর্তমানে খুলনা মহিলা সংস্থার ৮টি প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এগুলো হলো- (ক) সেলাই ও এমব্রয়ডারি (খ) ফ্যাশন ডিজাইন (গ) বিউটিফিকেশন (ঘ) রান্না প্রশিক্ষণ (ঙ) বিজনেস ম্যানেজমেন্ট (চ) নকশিকাঁথা কাটিং (ছ) বাইন্ডিং-প্যাকেজিং (জ) কম্পিউটার প্রশিক্ষণ। এছাড়া নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে ‘স্ব-কর্ম সহায়ক ঋণদান’ কর্মসূচি চালু রয়েছে। এর আওতায় গরিব ও বিত্তহীন নারীদের ১০% সুদে ৫,০০০/- থেকে ১০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণদান করা হয়।

নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সরকারি সংস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাও খুলনায় তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বেসরকারি সংস্থাগুলোর কার্যক্রম বহুমাত্রিক। যেমন- নারীর দারিদ্র্য বিমোচন, তেমনি আবার রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন এবং সচেতনতাবৃদ্ধির লক্ষ্যেও পরিচালিত।

যে কয়েকটি বেসামরিক সংস্থা খুলনায় নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রূপান্তর, এডোবি, মানবসেবা উন্নয়ন সংস্থা। Bangladesh Women Chamber of Commerce and Industries, Bangladesh Business and Professional Women Association (BWCCI), We can Step Towards Development প্রভৃতি।

অধ্যায়-৪

জনপ্রশাসন

প্রাচীন ও মধ্যযুগ

খুলনাসহ দক্ষিণ বাংলার বহু অঞ্চল সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এ অঞ্চলে গুপ্ত রাজাগণের প্রভুত্ব বজায় ছিল। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে খুলনা রাজা শশাংকের শাসনাধীনে আসে। রাজা শশাংকের মৃত্যুর পর খুলনা হর্ষবর্ধণের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। পরবর্তীকালে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার চন্দ্রবংশীয় রাজাগণ দীর্ঘকাল (দশম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত) খুলনার ওপর তাঁদের প্রভুত্ব বজায় রেখেছিলেন। পালবংশীয় বৌদ্ধ রাজাগণ ১০৫৮ সাল থেকে ১১২৪ সাল পর্যন্ত এবং সেনবংশীয় হিন্দু রাজাগণ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত বাংলার এ অঞ্চল শাসন করেন।[১] তুর্কী সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি ১২০৪ সালে বাংলা দখল করে সর্বপ্রথম বাংলায় মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করলেও খুলনা অঞ্চল মুসলিম শাসনের অধীনে আসে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে।[২] তদানীন্তন দিল্লির সম্রাটের কাছ থেকে সনদ নিয়ে এ অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্যে সর্বপ্রথম খান জাহান আলী নামক এক বিরল ব্যক্তিত্ব এখানে আসেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত খলিফাতাবাদের (বর্তমানে বাগেরহাট জেলার অন্তর্গত) বহু দিঘি, মসজিদ এবং সড়ক আজও বর্তমান।

ব্রিটিশ শাসন

১৭৮১ সালে কোম্পানি কর্তৃক প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট ও জজ নিযুক্ত হন টিলম্যান হেংকেল। প্রধান সহকারী নিবন্ধক রিচার্ড রোকে ছিলেন তাঁর উত্তরসূরি। একই বছর খুলনায় প্রথম থানা স্থাপিত হয় এলাকার নয়াবাদে।[৩] ইতোআগে মুড়লী থেকে থানার কাজ পরিচালিত হতো। অন্যদিকে হেংকেলের শাসনকে স্বয়ং কোম্পানির কর্মচারীরাও অমান্য করত এবং তারা যথেচ্ছভাবে নিরীহ মানুষের ওপর অত্যাচার করত। এসব অব্যবস্থা দূর করে এদেশে কোম্পানির শাসন সুষ্ঠু ও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে কোম্পানির বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্-এর কাছে হেংকেল এক প্রতিবেদন পেশ করেন। ১৭৮৬ সালে তাঁরই প্রস্তাব অনুসারে যশোর জেলা স্থাপনের মাধ্যমে এদেশে আধুনিক জেলা প্রশাসনের যাত্রা শুরু হয়।[৪] তখন বৃহত্তর খুলনা ভূখন্ড যশোর ও ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রায় অর্ধশতাব্দী পর বর্তমান খুলনা জেলার সম্পূর্ণ অঞ্চল এবং বাগেরহাট জেলার অধিকাংশ এলাকা নিয়ে যশোর জেলার অধীনে বাংলার প্রথম মহকুমা হিসেবে ১৮৪২ সালে 'খুলনা মহকুমার' আত্মপ্রকাশ ঘটে।[৫]

---

[১] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৭।

[২] ওই।

[৩] ওই পৃ. ৪৪৮।

[৪] ওই।

[৫] ওই।

যশোর জেলার ওপর ১৮৭০ সালে প্রণীত জেমস ওয়েস্টল্যান্ডের প্রতিবেদনে জানা যায় জনৈক উইলিয়াম রেইনে খুলনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে একটি জমিদারি খরিদ করে বর্তমান রূপসা উপজেলাধীন নিহালপুরে বসবাস করতে থাকেন। তিনি আইনের শাসনকে অবজ্ঞা করে চলতেন।[৬] উদ্ধত প্রকৃতির এই উইলিয়াম রেইনেকে আইনি এবং প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন রাখাই ছিল খুলনায় মহকুমা স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথম মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন জন শোর। এ ব্যাপারে অবশ্য সতীশচন্দ্র মিত্র ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে এস.এ.জি. শ্যা প্রথম জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে খুলনা মহকুমার প্রথম প্রশাসক। ১৮৬১ সালে একজন জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট শাসিত বারাসাত (বর্তমানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত) অঞ্চল নিয়ে তদানীন্তন ২৪ পরগনা জেলার অধীনে সাতক্ষীরা মহকুমা সৃষ্টি হয়। বাগেরহাটকে ১৮৬৩ সালে যশোর জেলার অধীনে একটি পূর্ণাঙ্গ মহকুমায় পরিণত করা হয়।

উনবিংশ শতকের শেষ দিকে দক্ষিণাঞ্চলের বিস্তৃত এলাকার গুরুত্ব বিভিন্ন কারণে বৃদ্ধি পায়। একদিকে আবাদি ভূমির বিস্তৃতি অন্যদিকে বহিরাগতদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং আবাদকৃত জমির স্বত্ব নিয়ে ক্রমবর্ধমান কলহ দক্ষিণাঞ্চলে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। সরকার ২৪ পরগনা এবং যশোর জেলার ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রশাসনিক দায়িত্বভার লাঘব করার উদ্দেশ্যে এবং এই প্রত্যন্ত দক্ষিণাঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খুলনা শহরকে প্রশাসনিক কেন্দ্র করে দক্ষিণাঞ্চলের জন্যে আলাদা একটি জেলা গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তদুপরি খুলনাতে নিউ বেঙ্গাল সেন্ট্রাল রেলওয়ের (যা পরবর্তীকালে ইস্টার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে নামে পরিচিত হয়) কেন্দ্রীয় দপ্তর ও প্রান্তিক স্টেশন স্থাপন এবং সুন্দরবন অঞ্চল ও কলকাতার মধ্যে রেল যোগাযোগ স্থাপনের বহুবিধ সুবিধার কথাও বিবেচনা করা হয়। উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খুলনা শহরকে প্রশাসনিক কেন্দ্র করে সুন্দরবন অঞ্চলের জন্যে খুলনা জেলা গঠনের একটি প্রস্তাব তদানীন্তন ভারত সরকার এবং ব্রিটিশ সরকারের ভারত সচিব কর্তৃক অনুমোদিত হলে ২৫ এপ্রিল, ১৮৮২ সালে খুলনা জেলা গঠনের একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। একই বছর ১ জুন তারিখ থেকে উক্ত আদেশ কার্যকর করা হয় এবং তদানুযায়ী প্রাক্তন খুলনা মহকুমা, যশোর জেলার বাগেরহাট মহকুমা এবং ২৪ পরগনা জেলার (ভারত) সাতক্ষীরা মহকুমাকে নবগঠিত খুলনা জেলার প্রশাসনিক অধিক্ষেত্রে আনা হয়।

জেলা প্রশাসন খুলনা জেলা প্রশাসনের এর প্রধান ছিলেন জেলা প্রশাসক বা ডেপুটি কমিশনার। জেলা প্রশাসকের পদবি ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ছিল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর। জেলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব তাঁর ওপরই ন্যস্ত থাকত। তিনি উন্নয়নমূলক সকল কর্মকাণ্ডের সমন্বয় করতেন। তাঁকে সহায়তা করার জন্যে তিনজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক/অ্যাডিশনাল ডেপুটি কমিশনার ছিলেন।

[৬] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৮।

তাঁদের মধ্যে একজন সাধারণ প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা, একজন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও আরেকজন রাজস্ব প্রশাসনের দায়িত্বে ছিলেন। এ ছাড়া বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্যে ডেপুটি কমিশনারের অধীনে ২৯ জন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর নিয়োজিত ছিল।

১৯৮৪ সালের আগে খুলনা জেলায় তিনটি মহকুমা ছিল- খুলনা সদর, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা। প্রতি মহকুমার জন্যে একজন মহকুমা প্রশাসক ছিলেন। মহকুমা পর্যায়ে তিনিই ছিলেন মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি অপরাধ দমনে আইন প্রয়োগ ও রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। কয়েকজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর তাঁকে সহায়তাদানের জন্যে নিয়োজিত থাকতেন। প্রতি মহকুমার সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তদারকির দায়িত্ব মহকুমা প্রশাসকের ওপর ন্যস্ত ছিল।

বৃহত্তর খুলনায় ২২টি থানা ছিল। থানা পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প ও অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড দেখাশুনার জন্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত একমাত্র কর্মকর্তা ছিলেন সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন)। প্রতিটি থানা কয়েকটি ইউনিয়নে বিভক্ত ছিল। ইউনিয়ন পরিষদ ছিল স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রাথমিক স্তর। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি। বৃহত্তর খুলনায় ২১৬টি ইউনিয়ন পরিষদ ছিল।

সাম্প্রতিককালে দেশের প্রশাসনিক কাঠামোতে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিগত ১৯৮৪ সালে মহকুমাগুলোকে জেলায় উন্নীত করা হয়। ফলে ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ বাগেরহাট মহকুমা এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ খুলনা সদর মহকুমা ও সাতক্ষীরা মহকুমা পূর্ণাঙ্গ জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ফলে তৎকালীন খুলনা জেলা বর্তমানে খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা এই তিনটি আলাদা জেলায় পরিণত হয়েছে।

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়

১৮২৯ সালে জেলা কালেক্টরগণের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও সুষ্ঠু রাজস্ব ব্যবস্থা পরিচালনার লক্ষ্যে বিভাগীয় প্রশাসন ব্যবস্থা চালু হয়। বিভাগীয় প্রশাসনের প্রধানের পদবি হয় বিভাগীয় কমিশনার।

১ অক্টোবর ১৯৬০ খুলনা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রথম বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে জনাব এম মঞ্জুর-ই-ইলাহী যোগদান করেন। বিভাগীয় কমিশনার বিভাগীয় আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভাপতি, বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভাপতি, বিভাগের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, চোরাচালান প্রতিরোধসংক্রান্ত আঞ্চলিক টাস্কফোর্সের সভাপতি, বিভাগীয় বাছাই কমিটির সভাপতি, বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সভাপতিসহ বিভাগীয় পর্যায়ে গঠিত আরও অনেক কমিটির প্রধান হিসেবে সরকারের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকেন।

খুলনা শহরের নূরনগরে বিভাগীয় কমিশনার, খুলনার কার্যালয় অবস্থিত। ষাটের দশকের শুরুতে সৃষ্ট খুলনা বিভাগ প্রতিষ্ঠার জন্য বয়রা মৌজার মোট ৯৯ একর

জমি অধিগ্রহণ করা হয়। অধিগ্রহণকৃত জমিতে বিভাগীয় পর্যায়ের সকল অফিস স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। বর্তমানে উপমহাপরিদর্শক পুলিশ, পরিচালক স্বাস্থ্য, উপপরিচালক মৎস্য বিভাগ, আঞ্চলিক পরিচালক খাদ্য বিভাগ, যুগ্ম নিবন্ধক সমবায়, উপ-পরিচালক বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, উপপরিচালক কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসারের কার্যালয়, উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনারের কার্যালয়, যুগ্ম পরিচালক শ্রম অধিদপ্তর, আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পরিচালক পরিবেশ অধিদপ্তর, বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক, পরিচালক দুর্নীতি দমন কমিশন, উপ-পরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা, উপ-পরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর প্রভৃতি বিভাগীয় পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ খুলনার বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ে অবস্থিত। বর্তমান বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে জনাব মো. আবদুস সামাদ গত ২৯ আগস্ট, ২০১৪ হতে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

ডিআইজি, খুলনা রেঞ্জ কার্যালয়

খুলনা শহরের নূরনগরে উপমহাপরিদর্শক, খুলনা রেঞ্জ কার্যালয় অবস্থিত। ১৯৬১ সালে ১৬টি জেলা নিয়ে খুলনা রেঞ্জ, বাংলাদেশ পুলিশ গঠিত হয়। ১৯৯৩ সালে খুলনা বিভাগের ৬টি জেলা (বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, ভোলা, পটুয়াখালী) নিয়ে বরিশাল বিভাগ গঠিত হয়। ১৯৮৬ সালে খুলনা রেঞ্জ হতে পৃথক হয়ে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ আলাদা ইউনিট হিসেবে কাজ শুরু করে এবং খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, যশোর, নড়াইল, ঝিনাইদহ, মাগুরা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর এই ১০ জেলার সমন্বয়ে খুলনা রেঞ্জ ইউনিটের কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।

খুলনা রেঞ্জের সাধারণ তথ্য দেওয়া হলো:

সারণি-৩১

খুলনা রেঞ্জাধীন জেলা পুলিশ ইউনিটসমূহ:

জেলার নাম	সার্কেল	থানা	ফাঁড়ী	তদন্ত কেন্দ্র	ক্যাম্প	
					স্থায়ী	অস্থায়ী
খুলনা	৩	৯	৪	১	২৭	৮
বাগেরহাট	২	৯	৫	০	১৫	৭
সাতক্ষীরা	২	৮	৫	০	৮	১
যশোর	২	৯	৩	৪	২৫	৩
নড়াইল	১	৪	৪	২	৫	০
ঝিনাইদহ	২	৬	৩	০	২৩	৭
মাগুরা	১	৪	১	১	২৩	১২
কুষ্টিয়া	২	৭	৩	১	২৩	১২
মেহেরপুর	১	৩	১	০	৮	৯
মোট	১৭	৬৩	৩০	১২	১৫৪	৬৭

খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ

খুলনা শহরের খান জাহান আলী রোডে মেট্রোপলিটন পুলিশ কার্যালয় অবস্থিত। খুলনা সিটি করপোরেশন এলাকার ৩১টি ওয়ার্ড ও তিনটি ইউনিয়ন পরিষদ, যার মোট আয়তন ৭০ ব.কি.মি. এলাকা, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের অন্তর্ভুক্ত। খুলনা সিটি করপোরেশন সৃষ্টির প্রাক্কালে ১ জুলাই, ১৯৮৬ সালে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের কার্যক্রম শুরু হয়। এর অধীনে মোট ০৮ টি থানা আছে। এগুলো হচ্ছে খুলনা সদর, সোনাডাঙ্গা, খালিশপুর, দৌলতপুর, খানজাহান আলী, লবণচরা, হরিণটানা ও আড়ংঘাটা।

পুলিশ সুপার কার্যালয়

মোগল শাসনব্যবস্থায় ফৌজদার ছিল তার অধিক্ষেত্রের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধান পুলিশ কর্মকর্তা। তাঁর অধীনে থানা পর্যায়ে থানাদার নিয়োজিত ছিল। তখন জেলা নামক কোনো ফৌজদারি অধিক্ষেত্র ছিল না ফৌজদারগণ এক বা একাধিক পরগনার সমন্বয়ে সরকার ইউনিটের দায়িত্বে থাকতেন। ব্রিটিশ শাসনের শুরুর দিকে ফৌজদার ও থানা ব্যবস্থা বলবৎ রাখা হয়। তখন যশোর (খুলনা) জেলাধীন এলাকায় ৪টি থানা ছিল ভূষণা, ধরমপুর, নয়াবাদ এবং নয়াবাদ।

নীলচাষিদের বিদ্রোহ, নীলকুঠিয়ালদের অত্যাচার এবং এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে স্থানীয়ভাবে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ১৭৮১ সালে রূপসা নদীর ওপারে নয়াবাদ নামক স্থানে একটি থানা স্থাপিত হয়। তখন একটি থানার কার্যক্রম দেশি বরকন্দাজের মাধ্যমে পরিচালিত হতো। নয়াবাদ থানা পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় কয়লাঘাটায় স্থাপিত লবণচৌকিকে। এ থানা স্থাপন করার পরও সমস্যা সমাধান না হওয়ায় সরকার ১৮৪২ সালে নয়াবাদ থানাকে মহকুমায় (খুলনা মহকুমা) উন্নীত করেন। খুলনা বাংলাদেশের প্রথম মহকুমা। ১৯০৮ সালে খুলনা জেলায় ১৩টি থানা ছিল। এ ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে ১২ পুলিশ ফাঁড়ি ছিল। খুলনা জেলার পুলিশ দপ্তরের কার্যক্রম শুরু হয় ১৯২৮ সালে। ভারত ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ২৪/৮/৪৭ তারিখে এ জেলার প্রথম পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন জনাব এম এ আব্দুল্লাহ।

বর্তমান জেলা পুলিশের জনবল (পুলিশ সুপার পদমর্যাদা হতে কনস্টেবল পর্যন্ত) ১৭৯৮ জন। পুলিশ সুপার জেলা পুলিশের প্রধান। অতঃপর পর্যায়ক্রমে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (উত্তর/দক্ষিণ/ডিএসবি), সহকারী পুলিশ সুপার (সদর), সহকারী পুলিশ সুপার (ক/খ/দাকোপ সার্কেল), অফিসার ইনচার্জ (সকল থানা) এবং যানবাহন নিয়ন্ত্রণে ট্রাফিক ইন্সপেক্টরসহ সার্জেন্টগণ, জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) এর নেতৃত্বে পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ মামলা তদন্ত ও জেলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাসহ যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও খুলনাতে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের একটি ইউনিট বিদ্যমান আছে।

জেলা পুলিশের মাঠপর্যায়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে স্তরানুযায়ী ০৯টি থানা, কপিলমুনি পুলিশ ফাঁড়ি, বিশ্ববিদ্যালয় পুলিশ ফাঁড়ি ও রঘুনাথপুর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র এবং রায়মঙ্গল চেক পোস্ট স্থাপন করা হয়েছে।

খুলনায় মেট্রোপলিটনসহ মোট থানা ১৭টি। ক্যাম্প: স্থায়ী ২৭টি, অস্থায়ী ০৭টি ফাঁড়ি ০৩টি। তবে নৌ-পুলিশ ফাঁড়ি হিসেবে আংটিহারা, তিলডাংগা ও নলিয়াল জেলা পুলিশের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও অতি সম্প্রতি প্রশাসনিক দায়িত্ব বণ্টনের ফলে নৌ-পুলিশ বিভাগ ০৩টি নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে।

অতীতে ঘোড়ার গাড়ি, নৌকাযোগে এবং পদব্রজে প্রত্যন্ত অঞ্চলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে গমন করতে হতো। বর্তমান পুলিশের কাজে মোটরযান, জলযান এবং অন্যান্য বাহন ব্যবহৃত হচ্ছে।

খুলনা জেলা কারাগার ১৯১২ সালে ৫.৩৩ একর জমির ওপর খুলনা জেলা কারাগারটি স্থাপিত হয়। শুরুতে মাত্র ০২ (দুই) টি পুরুষ ওয়ার্ড ও ০১ (এক) টি মহিলা ওয়ার্ড নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয় এবং সময়ের বিবর্তনে পর্যায়ক্রমে এটি সম্প্রসারিত হয়।

কারাগারের ধারণ ক্ষমতা

(ক) পুরুষ- ৫৯০ জন
(খ) মহিলা- ১৮ জন
মোট= ৬০৮ জন

বন্দির আবাসন ব্যবস্থা

ক) মহিলা বন্দিদের আবাসন ভবন- ০১টি (কক্ষ ৪টি)
খ) পুরুষ বন্দিদের আবাসন ভবন- ০৮টি (কক্ষ ১৬টি)
গ) বন্দিদের সেল ভবন- ০২টি (কক্ষ সংখ্যা ৩৫টি)

কর্মচারীদের আবাসন ব্যবস্থা

ক) সরকারি গণপূর্ত বাসা - ০৩টি
খ) সরকারি পিসিআর-এর বাসা- ৫০টি
গ) কারারক্ষী ব্যারাক- ০৩টি

জেল হাসপাতাল ব্যবস্থা

(ক) হাসপাতাল ভবন - ০১টি (দুই কক্ষবিশিষ্ট একতলা)
বেড সংখ্যা - ২৫ (পঁচিশ)টি

সারণি-৩২

খুলনা জেলা কারাগারে বন্দিদের বিবরণ (১৪-০৩-২০১৭ ইং তারিখ পর্যন্ত)

নং	বিবরণ		
		পুরুষ	মহিলা
১	ডিটেন্যু	-	-
২	সিভিল বন্দি	-	-
৩	হাজত সাধারণ	৮২৭	২৯
৪	হাজত দায়রা	২৫১	১৩

নং	বিবরণ		
		পুরুষ	মহিলা
৫	বিনাশ্রম কয়েদি	৫৮	০৫
৬	সশ্রম কয়েদি	২২১	০৫
৭	মৃত্যুদণ্ড দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত	০৬	০
৮	মোট	১৩৬৩	৫২
৯	মায়ের সাথে শিশু	০৬	০৬
১০	আর/পি বন্দি	-	-
১১	মোট	১৩৬৩	৫২
১২	সর্বমোট	১৪১৫	

পরিবেশ অধিদপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয়

১৯৭৮ সালে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে 'পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের' আওতায় মাঠপর্যায়ে কার্যক্রম শুরু হয় এবং প্রথম পর্যায়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, বগুড়া ও খুলনায় গবেষণাগারসহ ০৪টি বিভাগীয় অফিস স্থাপন করা হয়। ১৯৮৫ সালে গঠিত হয় 'পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর' যা পরবর্তীকালে ১৯৮৯ সালে গঠিত পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'পরিবেশ অধিদপ্তরে' রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ০৬টি বিভাগীয় অফিস (ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম, সিলেট, বগুড়া ও বরিশাল) ও ২১টি জেলা অফিস রয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনার মূল কার্যক্রম নিম্নরূপ:[৭]

- বিভিন্ন প্রকল্প/শিল্প প্রতিষ্ঠান/কারখানার পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন:
- পরিবেশ দূষণসংক্রান্ত অভিযোগের তদন্ত ও নিষ্পত্তি;
- শিল্প প্রতিষ্ঠান জরিপ এবং ডাটাবেস প্রস্তুত;
- পানি,বায়ু, শব্দ ও তরল বর্জ্যের নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ;
- ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা;
- পরিবেশ দূষণকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের;
- পরিবেশ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণমূলক প্রচার ও প্রকাশনা;
- পরিবেশ সচেতনতায় জনমত সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন।

পরিবেশ অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়টি বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা চত্বরে ০.৬৮ একর জমির ওপরে অবস্থিত। আঞ্চলিক গবেষণাগারসমূহের উন্নয়ন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের বিকেন্দ্রীকৃত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৬.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি দ্বিতল ভবন নির্মিত হয়। ২০০৫ সালের ১৫ জুলাই হতে নতুন ভবনে বিভাগীয় কার্যক্রম শুরু হয়। এর আগে জুন ২০০৫ পর্যন্ত খুলনা শহরের খালিশপুর এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে

[৭] পরিবেশ অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়, পরিবেশ ভবন, খুলনা।

অফিস পরিচালিত হতো। বর্তমানে ০৩টি জেলা অফিসসহ সর্বমোট ৩৯ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগীয় কার্যালয় পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণরোধে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে নিয়োজিত দেশের অন্যতম একটি বৃহৎ সরকারি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ১০৯, খানজাহান আলী রোড, খুলনায় অবস্থিত। পল্লির ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলা জনগোষ্ঠীকে সমবায় সমিতি ও অনানুষ্ঠানিক দলে সংগঠিত করে প্রয়োজনীয় সেবা ও উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে বিআরডিবি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে পল্লি উন্নয়ন, দারিদ্র্য নিরসন এবং নারীর ক্ষমতায়নে নিরলসভাবে কাজ করছে। এখানে ৯টি উপজেলা অফিসের মাধ্যমে বিআরডিবি নিজের দারিদ্র্য বিমোচনের কাজ সুন্দরভাবে পরিচালনা করছে। খুলনা জেলায় বর্তমানে বিআরডিবির ১১টি প্রকল্প চালু আছে। তবে সকল উপজেলায় ৫টি প্রকল্প ও কর্মসূচি একযোগে পরিচালিত হচ্ছে।

বিআরডিবির উল্লেখযোগ্য কাজসমূহ হচ্ছে:

১) সমবায় সমিতি গঠন, ২) অনানুষ্ঠানিক দল গঠন, ৩) সমিতি ও দলের সদস্যদেরকে আইজি এভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান, ৪) ঋণ সহায়তা প্রদান, ৫) সঞ্চয় বা পুঁজি গঠন, ৬) বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, ৭) নারীর ক্ষমতায়ন, ৮) যৌতুক ও বাল্য বিবাহরোধে সচেতনতা সৃষ্টি, ৯) উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ, ১০) আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

সমবায় অধিদপ্তর

খুলনা জেলা সমবায় কার্যালয়ের অধীনে ৯টি উপজেলা সমবায় কার্যালয় ও ১টি মেট্রোপলিটন থানা সমবায় কার্যালয় রয়েছে। এ ছাড়া বিভাগীয় সমবায় কার্যালয় ও ১টি আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট খুলনা শহরে অবস্থিত। খুলনা জেলা সমবায় কার্যালয়ের অধীন বর্তমান জনবল কাঠামো এরকম: ০১ জন জেলা সমবায় অফিসার, ০১ জন উপ-সহকারী নিবন্ধক, ০১ জন জেলা অডিটর ও ১০ জন থানা বা উপজেলা সমবায় অফিসারসহ মোট ৮১ কর্মকর্তা কর্মচারী আছেন।

আইসিটি ও ই-সিটিজেন সার্ভিস উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় খুলনা জেলার প্রতিটি উপজেলায় কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি প্রদান করা হয়েছে এবং প্রতিটি সমবায় সমিতির তথ্য অনলাইনে ডাটাবেইজ সফটওয়্যারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এছাড়া সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণ প্রকল্প ও ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার প্রকল্পের মাধ্যমে সমবায়ীদের আইজিএ প্রশিক্ষণ প্রদান ও ২,৪৫,০০০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। খুলনা জেলার সমবায় সমিতির মাধ্যমে ১,০৪০ ব্যক্তির নিয়োগের মাধ্যমে প্রায় ৮,৯২৫ লোকের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং

সমবায় সমিতির কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ১৮৫১.২৩ লাখ টাকা।[৮] সমবায় অফিসের একটি অন্যতম কার্যক্রম হলো- একটি বাড়ি একটি খামার।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স

অগ্নিকাণ্ড, সড়ক দুর্ঘটনা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রতিবছর আমাদের দেশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। এসব অগ্নিকাণ্ড দুর্ঘটনা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে দেশের আপামর জনগণকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে মূলত বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স গড়ে উঠেছে। সহকারী পরিচালকের দপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স খুলনা, জেলার নিয়ন্ত্রণকারী দপ্তর হিসেবে ভূমিকা পালন করে। এ দপ্তরের আওতাধীন সর্বমোট ০৯টি ফায়ার স্টেশন ও ০১টি অ্যাম্বুলেন্স শাখা রয়েছে। যার মধ্যে ১ম শ্রেণি, ২য় শ্রেণি, ৩য় শ্রেণি, ও নদী ফায়ার স্টেশন আছে। দপ্তর ও ফায়ার স্টেশনসমূহে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এখানে ১ জন সহকারী পরিচালকের নেতৃত্বে মোট ৩৫৬ জন কর্মকর্তা কর্মচারী কর্মরত আছেন।

খুলনা বিভাগে ১জন উপ-পরিচালকের অধীন ৩ জন সহকারী পরিচালকসহ ১০টি জেলায় ১০জন উপ-সহকারী পরিচালকের অধীন ১০টি দপ্তর রয়েছে। এ বিভাগে ৬টি প্রথম শ্রেণি, ২য় শ্রেণি ২৩টি, ৩য় শ্রেণির ৮টি, ১টি নদী শ্রেণির ও ১টি স্থল কাম নদী স্টেশনসহ মোট ৩৯টি চালু ফায়ার স্টেশন রয়েছে। এছাড়া প্রকল্পাধীনে ২৬টি ফায়ার স্টেশনের নির্মানকাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দপ্তর ও ফায়ার স্টেশনে বিভিন্ন পদে কর্মরত সর্বমোট জনবলের সংখ্যা ১০২১জন।

প্রাণিসম্পদ বিভাগ

খুলনায় ভেটেরিনারি সার্ভিসের কার্যক্রম কখন থেকে শুরু হয়েছিল সঠিকভাবে তা জানা না গেলেও দাপ্তরিক নথিপত্র এবং স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী যতদূর ধারণা করা যায় আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ের দিকে এ কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। সময়ের পরিক্রমায় উক্ত পশুচিকিৎসা কার্যক্রমই বর্তমানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাণিসম্পদ বিভাগ হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, খুলনা

বর্তমানে হলিস্টান, ফ্রিজিয়ান, জার্সি, শাহিওয়াল, হরিয়ানা, সিন্ধি ইত্যাদি ষাঁড় গোরুর সাথে দেশি জাতের গাভীর সংকরায়ন করা হচ্ছে। জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রটি অত্যন্ত সফলতার সাথে এ কার্যক্রমটি পরিচালনা করে যাচ্ছে। ১৯৬৮ সালে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ প্রকল্পের অধীনে দৌলতপুর এলাকার গাইকুড় নামক স্থানে ১.০৯ একর জমির ওপর কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র নামে বর্তমান জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়। পরবর্তী সময়ে আশির দশকে এটি জাতীয়করণ করা হয়। বর্তমানে এই কেন্দ্র উন্নত জাতের ষাঁড় থেকে সিমেন সংগ্রহ করে যা বৃহত্তর খুলনা জেলার বিভিন্ন এলাকায় ইউনিয়ন এমনকি গ্রামপর্যায় পর্যন্ত কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমে ব্যবহৃত হচ্ছে। কয়েক দশক আগে থেকেই উক্ত কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের সুফল জনগণ পেতে শুরু করেছে। একটি

---

[৮] জেলা সমবায় কার্যালয়, খুলনা।

দেশি গাভী যেখানে দিনে মাত্র এক থেকে দেড় লিটার দুধ দেয় সেখানে সংকর জাতের একটি গাভী থেকে ২৮ লিটার পর্যন্ত দুধ পাওয়া যাচ্ছে। অনুরূপ সংকর জাতের একটি ষাঁড় থেকে যেখানে প্রায় ৪০০ কেজি পর্যন্ত মাংস পাওয়া যায় সেখানে একটি দেশি ষাঁড় থেকে সর্বোচ্চ ১০০ কেজি মাংস পাওয়া যায়।

খুলনাঞ্চলে বর্তমানে গোরুর ছোটো-বড়ো অনেক খামার গড়ে উঠেছে। এর থেকে উৎপাদিত মাংস ও দুধ মানব শরীরের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি এলাকার বেকার যুবসম্প্রদায় এই খামার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হচ্ছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এ কাজে সকল প্রকার সহযোগিতা করে যাচ্ছে। গোরু-ছাগলের খাবারের জন্য এলাকার লোকজন জমিতে, রাস্তার পাশে প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন ঘাসের ওপরই মূলত নির্ভর করে থাকে।

হাঁস প্রজনন খামার খুলনা শহরের দৌলতপুর এলাকার পাবলা নামক স্থানে ১৯৫৮ সালে কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের অধীনে ৮.৭৫ একর জমির ওপর একটি পোল্ট্রি খামার স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ১৯৭৩ সালের এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে দায়সহ এটি তৎকালীন পশুসম্পদ বিভাগে হস্তান্তরিত হয়। পশুসম্পদ বিভাগে হস্তান্তর হওয়ার পর ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত এটি মুরগির খামার হিসেবে পরিচালিত হয়। ১৯৮৬ সালে FAO এবং UNDP-এর আর্থিক সহায়তায় স্থানীয় চাহিদার কথা বিবেচনা করে মুরগির খামারটিকে হাঁস প্রজনন খামারে রূপান্তর করা হয়। ১৯৮৭ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত খামারটিতে অবকাঠামোসহ নানাবিধ উন্নয়নকাজ করা হয়। এ খামারে উন্নত জাতের হাঁসের বাচ্চা উৎপাদন করা হয়। আগ্রহী হাঁস পালনকারীদের চাহিদা পূরণে এ খামার অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে।

পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ খুলনা জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের প্রধান হচ্ছেন উপ-পরিচালক। এ ছাড়া কয়েকজন সহকারী পরিচালক রয়েছেন। উপজেলাপর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম দুভাগে বিভক্ত; ক্লিনিক্যাল ও নন-ক্লিনিক্যাল কার্যক্রম। ক্লিনিক্যাল শাখার দায়িত্বে থাকেন মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি) এবং নন-ক্লিনিক্যাল শাখার দায়িত্বে থাকেন উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা। নন-ক্লিনিক্যাল শাখার দায়িত্ব সার্বিক ও সাধারণ বিষয় এবং ক্লিনিক্যাল শাখার দায়িত্ব কারিগরি বিষয়। মাঠকর্মী (পরিবার কল্যাণ সহকারী ও পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক) নন-ক্লিনিক্যাল শাখার অন্তর্ভুক্ত এবং প্যারামেডিক্সগণ (উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার এবং পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক) ক্লিনিক শাখার অন্তর্ভুক্ত।

খুলনা মা ও শিশু কল্যাণকেন্দ্র খুলনা শহরের ছোটো মির্জাপুরে অবস্থিত। এ কেন্দ্রে পরিবার পরিকল্পনাসহ মা ও শিশুদের সেবা দেওয়া হয়। বর্তমানে এখান থেকে জরুরি প্রসূতিসেবা দেওয়া হয়। কিশোরকিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্যশিক্ষা, ক্যানসার অনুবীক্ষণ VIA (Visual Inspection of Cervix with

Acitic Acid-জরায়ু ক্যানসার) এবং CBE (Clinical Breast Examination-স্তন ক্যানসার) কার্যক্রমও চলছে।

এ ছাড়াও খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার দেবদুয়ারে আরও একটি মা ও শিশু কল্যাণকেন্দ্র অবস্থিত। তবে জনবলের অভাবে কেন্দ্রটি বর্তমানে চালু নেই। ইউনিয়ন পর্যায়ে খুলনা জেলাতে ৪৭টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র (ইউএইচএন্ডএফডব্লিউসি) আছে, যার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা ডেলিভারি কেন্দ্র (ইউএইচএন্ডএফডব্লিউসি) এর সংখ্যা ২৭টি। এসব কেন্দ্রে একজন সাব-অ্যাসিসটেন্ট কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (এসএসিএমও) ও একজন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (এফডব্লিউভি); মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করেন। ইউনিয়নের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র স্থাপিত ওয়ার্ড বাদে, অবশিষ্ট ওয়ার্ডে মাসে পূর্ব নির্ধারিত একটি বাড়িতে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রতি মাসে প্রতি ওয়ার্ডে একটি স্যাটেলাইট ক্লিনিক স্থাপন করেন। অর্থ্যাৎ প্রতি ইউনিয়নে ৮টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিচালিত হয়। খুলনা জেলায় এরূপ স্যাটেলাইটের সংখ্যা প্রতি মাসে ৩৬১টি। স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও স্বাস্থ্য বিভাগের ইপিআই কার্যক্রম একই সঙ্গে সম্পাদিত হয়।

খুলনা জেলার পরিবার পরিকল্পনা মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবায় সরকারি কাজের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলো বিশেষ অবদান রাখছে। এ সংস্থাগুলো পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর থেকে অনুমোদন সাপেক্ষে মা, শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা দিয়ে যাচ্ছে। এগুলো হলো- দি স্যালভেশন আর্মি, মেরি স্টোপস ক্লিনিক, বিএভিএ (বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফর ভলান্টারি স্টেরিলাইজেশন, পিকেএস (সূর্যের হাসি ক্লিনিক), খুলনা মুক্তি সেবা সংস্থা, আর এইচ স্টেপ ইত্যাদি।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয় খুলনার বর্তমান অবস্থান ছোটো বয়রা, মেইন রোড, সোনাডাঙ্গা, খুলনা। তিনতলা অফিস ভবনটি ১৯৯২ সালে স্থাপিত হয়।

কার্যক্রম:

- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষাদান কার্যক্রম তত্ত্বাবধান।
- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রম।
- শিক্ষকগণের পেনশন, ছুটি, দক্ষতা সীমা অতিক্রম, টাইমস্কেল অনুমোদন, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হতে ঋণ মঞ্জুর ইত্যাদি।
- বিনামূল্যের পাঠ্যবই বিতরণ।
- সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণে সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং জেলা কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন।
- বিদ্যালয়ে ১০০% ভর্তি, উপস্থিতি ও ঝরে পড়া রোধকরণ।

জেলা শিক্ষা অফিস ব্রিটিশ আমলে জনশিক্ষা পরিচালকের দপ্তর সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষা বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। ওই সময়ে ফিল্ড পর্যায়ে শিক্ষা রেঞ্জ অফিস সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৬০ সালে জেলা পর্যায়ে জেলা শিক্ষা অফিসে রূপান্তরিত হয়। জেলা শিক্ষা অফিসের প্রধান জেলা শিক্ষা অফিসার।

(১) জেলা শিক্ষা অফিসার-১, (২) সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার-১, (৩) হিসাব রক্ষক-১, (৪) ডাটা এন্ট্রি অপারেটর-১, (৫) অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর-৪, (৬) স্টোরকিপার কাম ক্যাশিয়ার-১, (৭) গাড়ি চালক-১, (৮) অফিস সহায়ক-৪।

মাধ্যমিক স্তরের স্কুল ও মাদরাসা পরিদর্শন এবং মনিটরিং, মাধ্যমিক স্তরের বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, উপবৃত্তি বাস্তবায়ন, উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যক্রম তদারকি এবং স্কুল ও মাদরাসার শিক্ষক/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির প্রাপ্যতা অনুযায়ী সঠিকতা নির্ণয় ও সরকারি অন্যান্য আদেশ পালন।

খুলনা সমাজসেবা অধিদপ্তর ভারত ও পাকিস্তান দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কারণে তৎকালিন সময়ে ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে ভারত হতে বিপুলসংখ্যক মোহাজের এদেশে অভিবাসিত হয়। এর ফলে বেশকিছু সামাজিক সমস্যা দেখা দেয়। এ সমস্যা মোকাবেলার জন্য জাতিসংঘ থেকে প্রেরিত বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী সরকার ১৯৫৫ সালে Dhaka Urban Development Board গঠন করেন। এ বোর্ডের কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে ঢাকার কায়েতটুলিতে ওই বছরেই পরীক্ষামূলকভাবে Urban Community Development Project (UCDP) চালু করা হয়। এ সময়ে ১৯৫৬ সালে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্মকে অনুপ্রাণিত ও প্রাতিষ্ঠানিকনীকরণের জন্য গঠিত হয় জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ। এ পরিষদ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক সংগঠন সৃষ্টির পাশাপাশি ১৯৫৭ সালে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম প্রবর্তন করে। ১৯৬১ সালে স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর ১৯৭৪ সালে সমাজকল্যাণ বিভাগ হিসেবে উন্নীত হয় এবং ১৯৭৮ সালে সরকারের একটি স্থায়ী জাতিগঠনমূলক বিভাগ (Department) হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। ১৯৮৪ সালে সরকারের বিভাগ পুনর্গঠন সম্পর্কিত প্রশাসনিক কমিটির সুপারিশক্রমে সমাজকল্যাণ বিভাগকে সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ‘সমাজসেবা বিভাগ’ নামে নামকরণ করা হয়।

০১। **সমাজসেবা আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খুলনা।**

	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	এযাবত সমাপ্ত মোট কোর্স	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মন্তব্য
মোট =	পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি	২৩৯টি	৪৫৬১ জন	

০২। **সরকারী শিশু পরিবার (বালিকা), খুলনা।**

১) প্রতিষ্ঠানের নাম : সরকারী শিশু সদন (বালিকা), তাম্বি হাউস, খুলনা।
২) প্রতিষ্ঠাকাল : ১৮/০৭/১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ।
৩) জমির পরিমাণ : ০.৪৪ শতক (ভবনসহ ক্রয়)।
৪) অনুমোদিত আসন সংখ্যা : ১০০ (একশত) টি।
৫) এ পর্যন্ত পুনর্বাসিত নিবাসীর সংখ্যা : ৫৪৮ জন।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: ০৬ থেকে ১৮ বছরের শিশুদের সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা ও আবাসিক সুবিধাসহ সরকারি খরচে লালন পালন করা হয়।

০৩। **সরকারী শিশু পরিবার (বালক), মহেশ্বরপাশা, খুলনা।**

১) প্রতিষ্ঠানের নাম :সরকারী শিশু পরিবার (বালক), মহেশ্বরপাশা, খুলনা।
২) প্রতিষ্ঠা কাল : ২২/০৮/১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ।
৩) জমির পরিমাণ : ৩.৪৯ একর।
৪) অনুমোদিত আসন সংখ্যা : ১০০ টি (বালক)।
৫) এ পর্যন্ত পুনর্বাসিত নিবাসীর সংখ্যা : ৮০৪ জন।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: ০৬ থেকে ১৮ বছরের শিশুদের সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা ও আবাসিক সুবিধাসহ সরকারি খরচে লালন-পালন করা হয়।

০৪। **ছোটোমণি নিবাস, মহেশ্বরপাশা, খুলনা।**

১) প্রতিষ্ঠানের নাম : ছোটোমণি- নিবাস, মহেশ্বরপাশা, খুলনা।
২) প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ, কার্যক্রম শুরু ১০মে/২০০৩ খ্রিস্টাব্দ।
৩) জমির পরিমাণ : সরকারী শিশু পরিবার (বালক), মহেশ্বরপাশা ও খুলনা জমির ওপর অবস্থিত (৩.৪৯ একর)
৪) এ পর্যন্ত পুনর্বাসিত নিবাসীর সংখ্যা : ১৬৬জন।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: ০-৭ বছরের অনাথ, দুঃস্থ ও দরিদ্র শিশুদের সরকারি খরচে আবাসিক সুবিধাসহ লালনপালন করা হয়। বর্তমানে ৩৭টি শিশু রয়েছে।

০৫। **পিএইচটি সেন্টার, গোয়ালখালী, খুলনা।**

১.	পিএইচটি সেন্টার, খুলনার কার্যক্রম শুরুর তারিখ	৪ মে, ১৯৬২।
২.	জমির পরিমাণ	৪.৪০৩১ একর।
৩.	অনুমোদিত আসন সংখ্যা	আবাসিক-১৩০, অনাবাসিক-৫০।
৪.	বর্তমান ভর্তিকৃত আবাসিক নিবাসীর সংখ্যা	১১৯ জন।
৫.	এ পর্যন্ত পুনর্বাসিত নিবাসীর সংখ্যা	৮৭৬ জন।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: অন্ধ ও বধির ৫০টি ছেলে ও ৪৫ জন মেয়েকে সাধারণ ও ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয় ও আবাসিক সুবিধাসহ সরকারি খরচে লালনপালন করা হয়।

০৬। **শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র।**

১) প্রতিষ্ঠান স্থাপনের তারিখ : ০১/০১/২০১২ খ্রিস্টাব্দ।
২) প্রতিষ্ঠানের জমির পরিমাণ : ২ একর।
৩) অনুমোদিত আসন সংখ্যা : ১০০ বালক ও ১০০ বালিকা। মোট ২০০টি।
৪) বর্তমানে নিবাসী : ৬৯ জন বালক ও ১৩১ জন বালিকা। মোট ২০০ জন।
৫) এ পর্যন্ত পুনর্বাসিত নিবাসীর সংখ্যা : ৫৫০ জন।

০৭। **হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়, খুলনা সদর হাসপাতাল, খুলনা।**

১) হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের নাম ও ঠিকানা : হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম, সদর হাসপাতাল, খুলনা।
২) কার্যক্রম শুরুর তারিখ : ২১/০৪/১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ।
৩) মোট সাধারণ সদস্য সংখ্যা : ১২৬ জন।
৪) কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা : ২৫ জন।
৫) শুরু হতে ডিসেম্বর/২১৬ পর্যন্ত উপকৃতের সংখ্যা : ৭০৭১৪ জন। (আর্থিক ও সামাজিক)

০৮। **হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা।**

০১। কার্যক্রম আরম্ভের তারিখ : ২৪/০৮/১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ।
০২। রোগী কল্যাণ সমিতি
ক) মোট সাধারণ সদস্য সংখ্যা- : ১৪৮ জন।
খ) কার্যনির্বাহী সদস্য সংখ্যা- : ৪৫ জন।
গ) উদ্বৃত্ত তহবিল (নভেম্বর/১৬ পর্যন্ত)- : ২০,২৪,৪৬৪/৭৯
ঘ) শুরু হতে ডিসেম্বর/১৬ পর্যন্ত উপকৃতের সংখ্যা- : ৫৭,৮২৮ জন।

০৯। হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়, বক্ষব্যাধি হাসপাতাল, খুলনা।

১। কার্যক্রম আরম্ভের তারিখ : ০১/০৫/১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ।
২। রোগী কল্যাণ সমিতি
ক) মোট সাধারণ সদস্য সংখ্যা- : ৬৬ জন।
খ) কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা- : ১৭ জন।
গ) উদ্বৃত্ত তহবিল (নভেম্বর/১৬ পর্যন্ত) - : ৬,২২,০৮৮/-
৩। এ পর্যন্ত উপকৃতের সংখ্যা ক) সামাজিকভাবে- : ১৭,৫৫৩ জন।
খ) আর্থিকভাবে - : ১১,৫৭৯ জন।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: অসহায় দুঃস্থ রোগীদের আর্থিক, ওষুধ ক্রয়, বিভিন্ন পরীক্ষা করানো, মৃত ব্যক্তিদের দাফনের ব্যবস্থা করা, রোগীদের বাড়িতে যোগাযোগ করাসহ বিভিন্ন চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়।

১০। প্রবেশন ও আফটার কেয়ার সার্ভিস কার্যক্রম, সমাজসেবা অধিদফতর, খুলনা:

২০১৫-১৬ অর্থ বছর
১) প্রবেশন কেসের সংখ্যা : ০২টি।
২) শিশু আইন ২০১৩ অনুযায়ী বিকল্প পন্থায় আপস মীমাংসার মাধ্যমে পরিবারে পুনর্বাসন করা হয়েছে।
জেলা শিশু আদালত থেকে : ০৪ জন।
৩) আদালতে প্রতিবেদন প্রদান : ০৫ টি।

১১। প্রবেশন ও আফটার কেয়ার সার্ভিস কার্যক্রম, সিএমএম কোর্ট, খুলনা:

প্রতিষ্ঠা কাল : ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ।।
শুরু হতে নভেম্বর/১৬ পর্যন্ত প্রবেশন কেসের সংখ্যা: ০৫টি।
শিশু আইন ২০১৩-এর ৪৮ ধারা মোতাবেক বিকল্প পন্থায় মহানগর শিশু আদালত হতে ১০ জন এবং জেলা শিশু আদালত হতে ১০ জন সর্বমোট ২০ জন শিশুকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।
জেলা শিশু আদালত হতে মোট-১০ জন। কেএমপি, খুলনা মহানগরের ৮টি থানা হতে বিকল্প পন্থায় মুক্ত করে পরিবারে পুনর্বাসন করা হয়েছে মোট -১১০জন।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: আইনের আওতায় আসা শিশুদের মুক্তি, কারাবন্দিদের কারিগরি প্রশিক্ষণসহ সহায়তা প্রদান ও পুনর্বাসিত করা।

১২। দৃষ্টি প্রতিবন্ধিদের সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম: হোস্টেল নির্মাণাধীন। বর্তমানে কোনো নিবাসী নেই।

১৩। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি: (সমগ্র খুলনা জেলা)

		কর্মসূচির নাম					
		বয়স্কভাতা ভোগীর সংখ্যা ও ভাতার পরিমাণ-৫০০ টাকা	প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ও ভাতার পরিমাণ-৫০০ টাকা	শিক্ষা উপ-বৃত্তি	হিজড়া ভাতা ভোগীর সংখ্যা ও ভাতার পরিমাণ-৫০০ টাকা	বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা ভাতাভোগীর সংখ্যা ও ভাতার পরিমাণ-৫০০ টাকা	মুক্তিযোদ্ধা ভাতাভোগীর সংখ্যা ভাতার পরিমাণ-১০,০০০ টাকা
সর্বমোট=		৫৪০৩৫ জন	১২৮৫৬ জন	১০১২ জন	১৩ জন	১৯৫৯৪ জন	১৭০৮ জন

১৪। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি:

এ কর্মসূচির মাধ্যমে খুলনা জেলায় ২০১৭ সালে নিম্নের কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হয়।

ক্র: নং	ভাতা কর্মসূচির নাম	ভাতাভোগীর সংখ্যা (জন)	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ (টাকা)	বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ (টাকা)	ভাতা গ্রহিতার সংখ্যা (জন)	বিতরণের হার
১	বয়স্ক ভাতা	৫৯৮৩৩	৩৫৮৯৯৮০০০	৩৫৮৯৯৮০০০	৫৯৮৩৩	১০০%
২	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা	১৪০৩৭	১০১০৬৬৪০০	১০১০৬৬৪০০	১৪০৩৭	১০০%
৩	স্বামী পরিত্যক্তা ও বিধবা ভাতা প্রদান কার্যক্রম	২১৫০৭	১২৯০৪২০০০	১২৯০৪২০০০	২১৫০৭	১০০%
৪	প্রতিবন্ধী ছাত্র/ ছাত্রীদের শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম	১২৮৪	৯০২৭৬০০	৯০২৭৬০০	১২৮৪	১০০%
৫	হিজড়া বিশেষ ভাতা	১৩	১২৪৮০০	১২৪৮০০	১৩	১০০%
৬	দলিত, হরিজন ও বেদে বিশেষ ভাতা কার্যক্রম	২৮৪	১১৩৬০০০	১১৩৬০০০	২৮৪	১০০%
৭	দলিত,হরিজন ও বেদেদের শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম	২৮২	৮৬৮০০০	৮৬৮০০০	২৮২	১০০%

১৫। নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন:

ক) নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সংখ্যা : ১২২৪টি।

খ) নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী বেসরকারি এতিমখানার সংখ্যা : ৭৪ টি।

গ) ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ক্যাপিটেশন গ্রান্টসপ্রাপ্ত এতিমখানা: ৬৭টি।

ঘ) ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ক্যাপিটেশন গ্রান্টসপ্রাপ্ত নিবাসীর সংখ্যা: ১০১০ জন।

ঙ) ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ক্যাপিটেশন গ্রান্টস হিসাবে অনুদানের পরিমাণ: ১,২১,২০,০০০/-

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

ক্র.নং	কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণী	মন্তব্য
১.	শহর সমাজসেবা কার্যালয় - ৩টি	শহরস্থ যুবক-যুবতীদের কম্পিউটারসহ বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ, ঋণ কার্যক্রম, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ও প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
২.	উপজেলা সমাজসেবা কার্যক্রম - ৯টি	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, বয়স্কভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা ও প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি, স্বামী পরিত্যক্তা, হিজড়া ভাতা প্রদান, প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ, দলিত, হরিজন, বেদে ও হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, ক্যানসার কিডনি ও লিভার সিরোসিস রোগীর আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
৩.	সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম - ১টি	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের সরকারি খরচে আবাসিক সুবিধাসহ লালনপালন করা এবং সাধারণ স্কুলে লেখাপড়ার সুযোগ করে দেওয়া।
৪.	প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র - ২টি	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিনামূল্যে সেবা ও প্রতিবন্ধী সংক্রান্ত বিভিন্ন উপকরণ বিনামূল্যে বিতরণ।
৫.	স্কার প্রকল্প - ১টি।	দুঃস্থ, পিতৃমাতৃহীন ও দরিদ্র শিশুদের সরকারি খরচে আবাসিক সুবিধাসহ লালনপালন করা হয়। বর্তমানে ১৩০টি শিশু রয়েছে।
৬.	সমাজসেবা আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-১টি।	খুলনা বিভাগের সমাজসেবা অধিদফতরে কর্মরত কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান

১। নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সংখ্যা ১,২২৭টি।
২। নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী বেসরকারি এতিমখানার সংখ্যা ৭৩টি।
৩। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ক্যাপিটেশন গ্রান্টসপ্রাপ্ত এতিমখানা ৬৫টি।
৪।২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ক্যাপিটেশন গ্রান্টসপ্রাপ্ত নিবাসীর সংখ্যা ৯৮৯জন।
৫।২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ক্যাপিটেশন গ্রান্টস হিসাবে অনুদানের পরিমাণ ১,১৮,৬৮,০০০/-

‘আবাদি জমি রক্ষা করি, পরিকল্পিত আবাস গড়ি’ এই স্লোগান সামনে রেখে **জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ** সমগ্র বাংলাদেশ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পরিকল্পিত আবাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে আবাসন সমস্যার সমাধা করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের খুলনা ডিভিশনের অধীন বরিশাল ডিভিশন, ঢাকা ডিভিশনের বৃহত্তর ফরিদপুর জেলাসহ সর্বমোট ১৯টি জেলা রয়েছে।

আগামী ২০২১ সালের মধ্যে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন উপর্যুক্ত জেলাসমূহের উপজেলা পর্যায়সহ পরিকল্পিত আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলাই এ কর্তৃপক্ষের মুখ্য উদ্দেশ্য।

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের খুলনা বিভাগাধীন ১৯৬০ সাল হতে ২০০৯ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ০৬টি আবাসিক প্রকল্প ছিল যা নিম্নরূপ:

ক্র. নং	হাউজিং এস্টেটের নাম	বরাদ্দকৃত প্লটের সংখ্যা
১	খালিশপুর হাউজিং এস্টেট, খুলনা	১,২৫০টি
২	বয়রা হাউজিং এস্টেট, খুলনা	৪৫৮টি
৩	যশোর হাউজিং এস্টেট	১,০৫৫টি
৪	ফরিদপুর হাউজিং এস্টেট	৪২১টি
৫	বরিশাল হাউজিং এস্টেট	৪৭২টি
৬	পটুয়াখালী হাউজিং এস্টেট	৫০৭টি

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, আঞ্চলিক কার্যালয়

এ কার্যালয়টি খুলনার রূপসায় খানজাহান আলী রোডে অবস্থিত।

এ কার্যালয়ের উল্লেখযোগ্য কাজগুলো হলো ১) মাদকদ্রব্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ লাইসেন্স, ২) মাদকদ্রব্য আমদানি/মাদকদ্রব্য জাতীয় ওষুধ রফতানির লাইসেন্স, ৩) মাদকদ্রব্য আমদানি/ মাদকদ্রব্য জাতীয় ওষুধ রফতানির ছাড়পত্র, ৪) মাদকদ্রব্য খুচরা বিক্রয়ের লাইসেন্স, ৫) মাদকদ্রব্য ব্যবহারের পারমিট, ৬) মাদকদ্রব্য বহন-পরিবহন পাস, ৭) মদ বিক্রয়/ মদ্যপানের বার লাইসেন্স, ৮) খুচরা মদ বিক্রয়ের লাইসেন্স, ৯) প্রিকারসর কেমিক্যালস আমদানি/ খুচরা বিক্রয়/ ব্যবহারের পারমিট, ১০) অ্যালকোহল উৎপাদন (ডিস্টিলারি/ ব্রিউয়ারি) লাইসেন্স, ১১) মদ্যপানের পারমিট, ১২) বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের লাইসেন্স ইস্যু করা।

এ ছাড়া এ সমস্ত লাইসেন্স / ছাড়পত্রের আওতায় লাইসেন্স গ্রহীতাগণের কার্যক্রম তত্ত্বাবধানসহ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধ করা এ কার্যালয়ে অন্যতম দায়িত্ব।

সিভিল সার্জনের কার্যালয়

খুলনার ভৈরব স্ট্র্যান্ড রোডে জেনারেল হাসপাতাল ক্যাম্পাসে সিভিল সার্জন অফিস অবস্থিত। সিভিল সার্জনের অধীনে জেলা ও উপজেলায় স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কর্মরত চিকিৎসক ও কর্মচারীদের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান এ কার্যালয়ের অন্যতম দায়িত্ব। সিভিল সার্জন কার্যালয়ের প্রদত্ত সেবাগুলো হলো-

১। জেলা স্বাস্থ্যসেবাসংক্রান্ত যাবতীয় প্রশাসনিক বিষয়- যথা: চাকরিরত ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসনদ, জেলা স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্মচারীদের বদলি, পদায়ন, ছুটি মঞ্জুর ও অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যাবলি

২। জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের আর্থিক বিষয়াদি পরিচালনা।

৩। জাতীয় দূর্যোগ ও সংক্রামক রোগ প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

৪। জেলা স্বাস্থ্য বিভাগীয় বিবিধ তথ্যপ্রাপ্তি, সংকলন, পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ ও সংরক্ষণ এবং কমিউনিটি ক্লিনিক-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

৫। যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা।

৬। স্বাস্থ্য শিক্ষার উন্নয়ন, বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন (যথা-বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস, যক্ষ্মা দিবস, এইচআইভি/এইডস), স্বাস্থ্যসম্মত আদর্শ গ্রামের যাবতীয় কার্যক্রমসহ সরকার কর্তৃক গৃহীত স্বাস্থ্য শিক্ষার কার্যক্রম পরিচালনা।

৭। জেলার সকল শিশুকে বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধক টিকাসহ মহিলাদের টিটেনাস টিকা কার্যক্রম পরিচালনা।

৮। ভেজাল খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয়ের প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ।

৯। নার্সিং সেবার মান উন্নয়ন ও সেবার মান উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ।

১০। জেলার হাসপাতালসসমূহের চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম তত্ত্বাবধান।

সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগ

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে বঙ্গোপসাগরের তীরে সুন্দরবন অবস্থিত। বৃহত্তর খুলনা জেলার দক্ষিণাংশজুড়ে বনটি বিস্তৃত। বঙ্গোপসাগরের উপকূল রেখা থেকে উত্তরে প্রায় ৮০.০ কিলোমিটার পর্যন্ত এর বিস্তার। মোগল আমল (১২০৩-১৫৩৮) থেকেই সুন্দরবন ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে। বেঙ্গল বন বিভাগ স্থাপনের পর ১৮৬০ সাল হতে সুন্দরবনকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হয়। ১৮৬৯ সালে সুন্দরবনকে বন ব্যবস্থাপনা বিভাগ, খুলনার নিকট ন্যস্ত করা হয়। ০৯ মে ১৮৮৪ সাল হতে সুন্দরবন বন বিভাগ, খুলনা নামে অভিহিত করা হয়। মি. এম ইউ গ্রীন প্রথম বিভাগীয় বন কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত হন। ২০০১ সাল খুলনাকে সদর দপ্তর করে সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগ ও বাগেরহাটকে সদর দপ্তর করে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগ নামে এ কার্যালয় বিভক্ত হয়। বর্তমানে সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগ সাতক্ষীরা ও খুলনা রেঞ্জ নিয়ে এ কার্যালয়টি পরিচালিত হচ্ছে। বন কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ নিয়মিত টহলের মাধ্যমে বন সংরক্ষণ এবং মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ অফিসটি খুলনার কে ডি ঘোষ রোডে অবস্থিত।

আঞ্চলিক কার্যালয়, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর,

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর উপমহাদেশের একটি অন্যতম প্রাচীন অধিদপ্তর। ১৮৬১ সালে ভারত উপমহাদেশের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া বা Archaeological Survey of India (ASI) নামে এ অধিদপ্তরের যাত্রা শুরু হয়। স্বাধীনতার পর ঢাকায় বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯৮৩ সালে বিভাগীয় পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে ঢাকায় প্রধান দপ্তরসহ ৪টি বিভাগে আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীনে খুলনা ও বরিশাল বিভাগে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

কর্তৃক সংরক্ষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা মোট ৯২টি (বিরানব্বইটি)। এছাড়া ২টি বিভাগীয় জাদুঘরসহ মোট ৭টি জাদুঘর প্রদর্শনীর মা্ধ্যমে দর্শনার্থীদের দেখার ব্যবস্থা রয়েছে। উক্ত জাদুঘর ও প্রত্নস্থানসমূহের মাধ্যমে দর্শক, পর্যটক ও গবেষকগণকে সেবা প্রদান করা হয়। খুলনার মজিদ সরণিতে এ কার্যালয়টি অবস্থিত।

জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস খুলনা শহরের বয়রাস্থ বিভাগীয় কমিশনার ভবনে এ অফিসটি অবস্থিত। খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার মোট ২৫টি উপজেলার সমন্বয়ে খুলনা জোনাল সেটেলমেন্ট গঠিত। এ অফিসের মূল কাজ অত্র জোনাল সেটেলমেন্টের আওতাধীন মাঠপর্যায়ের সার্বিক ভূমি জরিপ কার্যক্রম তদারকি ও পরিচালনা। নিকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিগত ১৯৮৬-৮৭ সালে খুলনা জোনের আওতায় আরএস জরিপকাজ আরম্ভ হয়। এ জোনাল সেটেলমেন্টের আওতাভুক্ত সর্বমোট মৌজার সংখ্যা ২৪৫১টি। কার্যবিধি মোতাবেক জরিপ সম্পন্ন করে মুদ্রিত খতিয়ান ও নকশা জনগণের ব্যবহারের জন্য প্রণয়ন করা জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসের মূল দায়িত্ব।

অধ্যায়-৫

ভূমিরাজস্ব ও ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার প্রধান অবলম্বন কৃষি যার মূলভিত্তি হলো ভূমি। প্রাচীন যুগে মানুষ জঙ্গল পরিষ্কার করে ভূমি চাষাবাদের উপযোগী করে ফসল ফলাতো এবং জীবিকা নির্বাহ করতো। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বাড়তি চাহিদার জোগান দিতে গিয়ে ভূমির ওপর মানুষের নির্ভরতা আরও বেড়ে যায়।

অতীতে বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির মূলভিত্তি ছিল ভূমিরাজস্ব (Land Revenue)। খাজনা আদায়ই ছিল তখন রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের অন্যতম মুখ্য বিষয়। প্রজাদের কাজ ছিল ফসল উৎপাদন করা আর রাজার কাজ ছিল প্রজাদের নিকট থেকে ভূমিরাজস্ব আদায় করা। রাজা ছিল ভূমির মালিক আর প্রজা ভূমির ভোগদখলকারী। ইংরেজ আমলে ভূমিরাজস্ব আদায় কার্যক্রম সহজীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্তরে মধ্যস্বত্বভোগীর সৃষ্টি করা হয়। তবে এতে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা জটিল আকার ধারণ করে।

বাংলাদেশের দক্ষিণের একটি জেলা খুলনা। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের আগে এ অঞ্চলের জমি ছিল একফসলি। তখন আগে বাঁধ দিয়ে বর্ষা মৌসুমে শুধু আমন ধানের চাষ করা হতো। কিন্তু ১৯৬৫ সালের দিকে পানি উন্নয়ন বোর্ড বাঁধ নির্মাণ করে শুষ্ক মৌসুমে লবণাক্ততা রোধ করায় সকল একফসলি জমি দোফসলি জমিতে পরিণত হয়।

প্রাচীন আমলে খুলনার অধিকাংশ এলাকা গভীর বনে আচ্ছাদিত ছিল। মৎস্য ও বনজ সম্পদ আহরণের ওপর জীবিকা নির্বাহ করতো কিছু আদিম জনগোষ্ঠী। প্রাচীন আমল হতেই খুলনায় ক্রমশ জনবসতি শুরু হয়। তবে মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে (১৪৪২ খ্রিস্টাব্দ) খান জাহান আলী (র.) খুলনায় আগমনের পর ব্যাপক ভূমি উদ্ধার কার্যক্রম শুরু হয় এবং পাশাপাশি জনবসতিও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময় খুলনা 'খলিফাতাবাদ' নামক প্রশাসনিক ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত হয়।

মোগল ভূমি বন্দোবস্ত

শেরশাহের আগে খুলনা জেলার ভূমিরাজস্ব ইতিহাসের তেমন কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে মোগল আমলের ভূমিরাজস্বের ওপর লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায়। মোগল আমলে ১৫৮২ সালে সম্রাট আকবরের মন্ত্রী রাজা টোডরমল সমগ্র বাংলার রাজস্ব বন্দোবস্তের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। তখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সমগ্র ভূভাগকে ১৯টি সরকার বা রাজস্ব বিভাগে ভাগ করা হয়। বিভাগগুলোকে আবার ৬৮২টি উপ-বিভাগ বা মহলে বিভক্ত করা হয়। এই তালিকাকে 'আসলি জমা' বা 'আসল তুমার জমা' হিসেবে অভিহিত করা হয়। টোডরমলের রাজস্ব তালিকায় উল্লিখিত সরকারগুলো হলো:-

(১) আরদবুজ ওরফে টান্ডা, (২) জান্নাতাবাদ অর্থাৎ লাখনৌতি, (৩) ফতেহাবাদ, (৪) মাহমুদাবাদ, (৫) খলিফাতাবাদ, (৬) বগলা অর্থাৎ বাকলা, (৭) পূর্ণিয়া, (৮) তাজপুর, (৯) ঘোড়াঘাট, (১০) পাঞ্জরা, (১১) বারবকাবাদ, (১২) বাজুহা/বাজুয়া, (১৩) সোন্নারগাঁও অর্থাৎ সোনারগাঁও, (১৪) সিলহেট অর্থাৎ সিলেট, (১৫) চাঁটগাঁও, (১৬) শরিফাবাদ, (১৭) সোলায়মানাবাদ, (১৮) সাতগাঁও এবং (১৯) মদারণ অর্থাৎ মন্দারণ। পরবর্তীকালে ত্রিপুরা রাজ্য বিজয় হলে 'উদয়পুর' নামে আরও একটি সরকার বা রাজস্ব বিভাগ গঠিত হয়।[১] খলিফাতাবাদ, সাতগাঁও এবং ফতেহাবাদ সরকারের অংশ নিয়ে বর্তমান খুলনা জেলা গঠিত হয়।

টোডরমলের রাজস্ব ব্যবস্থায় কানুনগো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। কানুনগো পরগনার রাজস্ব হিসাবরক্ষণের দায়িত্ব পালন করতেন এবং তার কাছে পরগনার অধিবাসীদের খাজনার হাল রেকর্ড থাকতো। কানুনগোর মতো পাটোয়ারি পদবির আর একজন কর্মকর্তা ছিলেন, যিনি গ্রামের রাজস্ব ধার্য, আদায় ও রাজস্ব মূল্যায়ন করে তালিকা প্রণয়ন করতেন। এটি খুব প্রাচীন পদ। বাংলার ১৯টি সরকারের আওতাভুক্ত জমি 'খালসা' নামে পরিচিত ছিল। খালসা ভূমির রাজস্ব সরাসরি রাজকোষে জমা হতো।

পুরো বাংলায় মোগল সাম্রাজ্য বিস্তার লাভের পর বাংলার সুবাদার শাহজাদা সুজা ১৬৫৮ সালে নতুন করে রাজস্ব তালিকা ('জমা তুমারি') প্রণয়ন করেন। এই সময়ে রাজস্ব তালিকায় সরকারের সংখ্যা ১৯ থেকে ৩২টিতে উন্নীত হয়। এই তালিকার ৩২তম সরকার 'মুরাদখানা' বা 'জেরাদখানা'র অধীনে সুন্দরবনের দক্ষিণ অংশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। সরকারগুলো ১৩৫০টি উপ-বিভাগে বা মহালে বিভক্ত ছিল। সুন্দরবন থেকে ৮,৪৫৪ টাকা আদায় হতো। এই রাজস্ব তালিকা ১৭৭২ সাল পর্যন্ত বহাল ছিল। নবাব মুর্শিদকুলি খানের আমলে প্রথমদিকে এই ব্যবস্থা চালু থাকলেও পরে তিনি নতুন রাজস্ব তালিকা প্রণয়ন করেন।

মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্ত

সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে (১৬৫৮-১৭০৭ সাল) মুর্শিদকুলি খানকে সুবে বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়। মুর্শিদকুলি খান (১৭০৪-১৭২৭ সাল) বাংলার রাজস্ব তালিকা ('জমা কামিল তুমারি') পুনর্সংশোধন করেন (১৭২২ সালে)। সংশোধিত নতুন রাজস্ব তালিকার নাম দেওয়া হয় 'জমা-ই-কামিল তুমারি'। নতুন রাজস্ব তালিকায় সুবাহ-ই-বাংলাকে ১৩টি চাকলা এবং ১,৬৬০টি পরগনায় বিভক্ত করা হয়। চাকলাগুলো হলো:- (১) বন্দর বালাশোর (২) হিজলি (৩) মুর্শিদাবাদ (৪) বর্ধমান (৫) হুগলি বা সাতগাঁও (৬) ভূষণা (৭) যশোর (৮) আকবরনগর (৯) ঘোড়াঘাট (১০) বাড়িবাড়ি (১১) জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা) (১২)

[১] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৪।

শ্রীহট্ট ও (১৩) ইসলামাবাদ (চট্রগ্রাম)।[২] নতুন এই পদ্ধতিতে বৃহত্তর খুলনা জেলা যশোর চাকলার অধীনে ছিল।

ব্রিটিশ রাজস্ব ব্যবস্থা

১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজ উদ-দৌলার ভাগ্য বিপর্যয়ের পর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ধীরে ধীরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে চলে যায়। বক্সারের যুদ্ধে মির কাশিমকে পরাজিত করার মাধ্যমে কোম্পানি নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অর্জন করে এবং ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বার্ষিক ২৬ লাখ টাকায় মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের নিকট থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করলে খুলনা জেলার রাজস্ব প্রশাসনও কোম্পানির অধীনে চলে যায়। কোম্পানি ১৭৬৫ থেকে ১৭৬৯ সাল পর্যন্ত মোগলদের অনুসৃত রাজস্বনীতি অনুসরণ করে এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য সৈয়দ মুহাম্মদ রেজা খানকে বাংলার নায়েব দেওয়ান নিযুক্ত করে।

১৭৬৯-১৭৭০ সালে (বঙ্গাব্দ ১১৭৬) বাংলাদেশে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, ইতিহাসে যা 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' বলে অভিহিত। এ দুর্ভিক্ষে দুর্গত এলাকার এক তৃতীয়াংশ মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করে। ১৭৬৯ সালে রেজা খানকে অপসারণ করা হয় এবং ভূমিরাজস্ব আদায় ও ব্যবস্থাপনার জন্য ইংরেজ রেভিনিউ সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়।

১৭৭২-১৭৭৭ পর্যন্ত পাঁচসালা বন্দোবস্ত (Quinquennial Settlement) ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ১৭৭২ সালে নিলাম ডাকের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ডাককারীর নিকট পাঁচ বছরের জন্য ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। ফলে আগে যারা জমিদার ছিল তাদের অধিকাংশই জমিদারি বন্দোবস্তে ব্যর্থ হন এবং জমিদারি হারান। তবে এতে বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং পুরাতন জমিদারদের স্থলে এক দল নতুন জমিদারের সৃষ্টি হয়। নতুন জমিদারগণ আগের তুলনায় অধিক হারে রাজস্ব আদায় করতে থাকে, ফলে প্রজাগণ কপর্দকশূন্য হয়ে পড়ে।

খুলনা জেলার উত্তরাংশ বাংলার অন্যান্য জেলার মতো পাঁচসালা বন্দোবস্তের অধীনে আসে। এ সময় খুলনার জমিদারদের সম্পত্তির বিষয়ে তদন্ত করে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য Lane নামক একজন ইংরেজ কর্মকর্তাকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।[৩] তিনি খসড়া গণনার মাধ্যমে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের জন্য রিপোর্ট প্রদান করেন। এতে প্রজা ও জমিদারগণ সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে এবং প্রজাগণ নিজ এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে থাকে। ১৭৭৩-১৭৭৬ সালের রাজস্ব প্রতিবেদনে জমিদারদের অধিক পরিমাণ রাজস্ব বকেয়া থাকছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। পাঁচসালা বন্দোবস্ত কাঙ্খিত লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় তা বাতিল হয়ে যায়। ১৭৭৮ সালে বোর্ড অব রেভিনিউ ১ বছরের জন্য ভূমি

[২] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৫।
[৩] ওই. পৃ. ৪২০।

বন্দোবস্ত প্রদানের ব্যবস্থা প্রচলন করে। এ পদ্ধতি ১৭৯০ সাল পর্যন্ত চলে। এ পদ্ধতির মূল্যায়ন হয় অসম্পূর্ণ উপাত্তের ভিত্তিতে। ফলে জমিদারদের ওপর রাজস্বের চাপ অত্যধিক বেড়ে যায়। এ সময় অনেকেই সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন। এ বিষয়ে স্যার জেমস ওয়েস্টল্যান্ড তাঁর Report on the District of Jessore শীর্ষক গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, এ সময় ভূমির উন্নয়নে কোনো কাজ হয়নি, কারণ ভূমির উন্নয়ন করা হলে এবং ভূমির উৎপাদনক্ষমতা বেড়ে গেলে তার ওপর নতুন করে কর আরোপ করা হতো। এতে প্রজা, জমিদার ও কোম্পানির মধ্যে অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়।[৪]

১৭৮৬ সালে মারকুইস কর্নওয়ালিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। তিনি বন্দোবস্ত বিষয়ে সার্বিক মূল্যায়ন করে দশসালা বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৭৯০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি তিনি দশসালা বন্দোবস্ত পদ্ধতি প্রবর্তন করেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

দশসালা বন্দোবস্ত পদ্ধতিই কোম্পানির ইংল্যান্ডস্থ পরিচালকগণ অনুমোদন করায় পূর্বঘোষণা সূত্রে কর্নওয়ালিশ ১৭৯৩ সালে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন' (Permanent settlement regulations) প্রবর্তন করেন। এতে ভূমির মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে চাষিরা জমির মালিকানা হারায়। এ সময়ে জমিদার ছাড়াও অনেক মধ্যস্বত্বভোগী অভিজাত শ্রেণি তৈরি হয়। যশোর জেলায় দশসালা বন্দোবস্ত চালুর সময়ে ১৭৯০ সালে রিচার্ড রক (Richard Rocke) কালেক্টর ছিলেন। এর আগের বছরই তিনি টিলম্যান হেংকেলের স্থলাভিষিক্ত হন। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় পর্যন্ত তিনি যশোর জেলায় কালেক্টর পদে বহাল থাকেন।

১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভিত্তি ছিল বিগত বছরগুলোতে কালেক্টর কর্তৃক দাখিলকৃত রাজস্ব আদায়ের হিসাব। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে খুলনা অঞ্চলের বড়ো দুই জমিদারির (ইউসুফপুর জমিদারি ও সৈয়দপুর জমিদারি) সরকারকে দেয় রাজস্বের পরিমাণ বিগত বছরগুলোর তুলনায় বেড়ে যায়। ইউসুফপুর জমিদারিকে পরিশোধ করতে হয় ৩,০২,৩৭২/ টাকা, যা ছিল বিগত বছরের তুলনায় ৫,০০০ টাকা বেশি। অপর দিকে সৈয়দপুর ট্রাস্টকে পরিশোধ করতে হয় ৯৩,৫৮৩/ টাকা, যা বিগত বছরের তুলনায় ২,০০০ টাকা বেশি। জমিদারগণ তাদের অতিরিক্ত অর্থ প্রজাদের নিকট থেকে আদায়ের চেষ্টা করে অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পদ্ধতিতে জমিদারকে জমির মালিকানা প্রদান করা হয় এবং জমিদারি বিক্রয় করার অধিকার দেওয়া হয়। এসময় সরকারের রাজস্ব পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে খুলনা জেলায় প্রায় ১ হাজার ছোটো-বড়ো জমিদারি বিক্রি হয়ে যায়। ইউসুফপুরের জমিদার রাজা শ্রীকান্ত

---

[৪] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২০।

রায় তার অধীনের সকল পরগনা ধীরে ধীরে হারাতে থাকেন এবং এক সময় নিঃস্ব হয়ে পড়েন। খুলনা অঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ১০ বছর পর্যন্ত মাত্র দুটি জমিদারি টিকে ছিল, সৈয়দপুর ও সুলতানপুর ‘খারোরিয়ান’ জমিদারি। ভারতের গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় কাশীনাথ দত্ত সুলতানপুর জমিদারি ক্রয় করেন।[৫]

সুন্দরবনের রাজস্ব ইতিহাস

খুলনা জেলার সুন্দরবনের রাজস্ব প্রশাসনের ইতিহাস জেলার অন্য অঞ্চলের প্রশাসন ব্যবস্থা হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনাসংলগ্ন সুন্দরবন থেকে ভূমি পুনরুদ্ধারের কাজটি ১৭৭০ সালে তৎকালীন কালেক্টর জেনারেল ক্লড রাসেল (Claude Russel) সম্পন্ন করেন। ১৭৮৩ সালে হরিণঘাটা কিংবা বলেশ্বর নদীর মোহনা থেকে পশ্চিমে রায়মঙ্গাল নদীর তীর পর্যন্ত সুন্দরবন এলাকা পুনরুদ্ধারের কাজটি করেন তৎকালীন যশোরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জজ টিলম্যান হেংকেল (Tilman Henckell)। ক্লড রাসেল যে সমস্ত ভূমি ইজারা দিয়েছিলেন তা ছিল ২৪ পরগনার পাতাবদি (Patabdi) তালুক। যশোর ও খুলনায় তালুকগুলো ‘হেঙ্কেলের তালুক’ হিসেবে পরিচিত ছিল।

সুন্দরবনের সীমারেখা

টিলম্যান হেংকেল সুন্দরবনের উত্তরাংশে তিনটি সীমান্ত এলাকা নির্ধারণ করেন। এগুলোর মধ্যে হেংকেলের নাম অনুসারে প্রথমটির নামকরণ করা হয় হেংকেলগঞ্জ (হিংগালগঞ্জ)। এ অংশ যমুনা এবং কালিন্দী নদীর সংযোগস্থলে অবস্থিত। দ্বিতীয় এলাকাটি ছিল কপোতাক্ষ নদের তীরবর্তী চাঁদখালি গ্রাম। তৃতীয়টি ছিল বলেশ্বর নদীর তীরের কচুয়া গ্রাম। এই এলাকাগুলো খাস আবাদ এলাকা হিসেবে পরিচিত ছিল। হেংকেলগঞ্জ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত। কিন্তু চাঁদখালি এলাকা বর্তমান খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলায় অবস্থিত। কচুয়া বর্তমানে বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত। কচুয়া ছিল খাস জমিদারি। ১৭৯০ সালে দশসালা বন্দোবস্তের সময় এই জমিদারি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। চাঁদখালি ১৮১৫ সাল পর্যন্ত কৃষিকাজের জন্য ইজারা দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী বন্দোবস্তগুলো এ অঞ্চল সুন্দরবন তালুকদারি অধিকার আইন (Sundarban Talukdari Right) এর আওতায় সম্পন্ন করা হয়। ১৮৭৭ সালে খাজনা বকেয়া পড়ার কারণে জমিদারি নিলাম হয় এবং সরকার জমিদারি খরিদ করে নেয়। সরকার এ ভূমি ক্রয়ের পর অবৈধ দখলদার বেড়ে যায়। পরে এই জমিদারি রায়তওয়ারি প্রথার অধীনে ১৮৭৮ সাল থেকে বন্দোবস্ত দেওয়া হয় এবং সরকারের খাসজমি ব্যবস্থাপনার অধীনে চলে যায়।

১৭৯০ সালে দশসালা বন্দোবস্তের সময়ে যে সকল চাষযোগ্য জমি জমিদারেরা তাদের দখলে রেখেছিল সেগুলোর মূল্যায়ন করে, ‘খারিজা তালুক’ হলে তা ১৭৯০ সালের দশসালা বন্দোবস্তের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ সকল জমির খাজনা বেঁধে না দিয়ে ক্রমবর্ধমান হারে খাজনা ধার্য করা হয়। ১৭৯০ সালের দশসালা

[৫] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২২।

বন্দোবস্ত ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রূপান্তরিত হয়। তবে এ সময়ে তালুকদারদের অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি।

খুলনা অঞ্চলের বহু জমিদারি ও তালুক দায়েমি (Daimi) বন্দোবস্তের মাধ্যমে স্থায়ী করা হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এই তালুকের সংখ্যা ছিল ১৬, যার মধ্যে তৎকালীন সাতক্ষীরা মহকুমায় ছিল ৭টি তালুক, যথা- পরানপুর, রমজানপুর, ভৈরবনগর, বংশীপুর, গুটলাকাঠি, ইসমাইলপুর ও গোবিন্দপুর, খুলনা মহকুমায় ছিল মাত্র ৫টি তালুক, যথা- বড়োচানগর, বশারাতপুর, বাবুপুর, মামুদাবাদ এবং কালিদাসপুর, অন্যদিকে বাগেরহাট মহকুমায় ছিল ৩টি তালুক, যথা- আসমতপুর, গোকুলনগর ও বল্লভপুর। ১৬তম তালুকটির নাম ছিল চান্দিপুর/চাঁদপুর। এটি বর্তমানে বরিশাল জেলায় অবস্থিত।

লেফটেন্যান্ট ডব্লিউ. ই. মরিসন ১৮১১-১৪ সালে হুগলি নদীর তীর থেকে পশুর নদীর তীর পর্যন্ত সুন্দরবন এলাকার বিস্তৃত ভূমি জরিপ করেন। এটি সুন্দরবন অঞ্চলের রাজস্ব ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৮১৮ সালে ডব্লিউ. ই. মরিসনের ভাই ক্যাপ্টেন হাগ মরিসন ওই জরিপের ভুলত্রুটিগুলো সংশোধন করেন। খুলনা জেলায় তাদের জরিপ কপোতাক্ষ ও পশুর নদীর মধ্যবর্তী এলাকা এবং মোংলা ও বলেশ্বর নদীর মধ্যকার এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল।[৬]

১৮১৫ সালের বোর্ড অব রেভিনিউ সুন্দরবন এলাকায় ভূমির পরিমাপ কাজ সম্পাদনের জন্য স্মেল্ট (Smelt) নামক এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন। টিলম্যান হেংকেলের বন্দোবস্তকৃত তালুকগুলো কখন চাষাবাদের আওতায় এসেছিল এবং এগুলোর খাজনা মূল্যায়ন ও বন্দোবস্তের শর্ত ইত্যাদি জানার উদ্দেশ্যেই বোর্ড অব রেভিনিউ স্মেল্টকে এ পদে নিয়োগ দেন। তখন এটাও আশা করা হয়েছিল যে, এ প্রক্রিয়ায় অনাবাদি জমিও চাষের আওতায় আসবে। এ লক্ষ্য সামনে রেখে স্মেল্ট ১৮১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ভূমি পরিমাপের কাজ শুরু করেন এবং ১৮১৬ সালে এপ্রিল মাসে পরিমাপের কাজ শেষ করেন। তিনি ৩,২৩,২৫২ বিঘার এক বিরাট পরিমাণ ভূমি পরিমাপ করেন, যার মধ্যে ২,১২,০২৫ বিঘা জমি চাষের আওতাভুক্ত ছিল। টিলম্যান হেংকেল প্রদত্ত পাট্টাভুক্ত জমি এবং সরকার কখনও বন্দোবস্ত দেয়নি এমন জমিও এই পরিমাপের অন্তর্ভুক্ত হয়। যে জমি আগে উদ্ধার বা চিহ্নিত হয়নি অথচ জমিটি বহুদিন ধরে চাষাবাদের আওতায় আছে তার ওপর বিঘায় ৮ আনা হারে খাজনা ধার্য করা হয় এবং বোর্ড অব রেভিনিউ খুলনা জেলা কালেক্টরেটকে ১৮১৫ সালের মধ্যে জেলার সমস্ত ভূমি বন্দোবস্তের নির্দেশ দেন। ১৮১৬ সাল নাগাদ জেলার জমিদার এবং তালুকদারেরা তাদের জমিদারি বা তালুকদারির ওপর ধার্য খাজনা প্রদানে স্বীকৃত হয়। ১৮১৬ সালের ৩০ আগস্ট জমিদার ও তালুকদারদের সাথে সরকারের বন্দোবস্তের শর্তাদি সংশোধন করা হয় এবং ৫

[৬] L.R. Fawcas, Final Report on Survey and Settelement Operations in the Khulna District 1920-26, P. 91.

বছর অন্তর অন্তর ভূমিরাজস্ব পুনর্মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত হয়। সরকারের ঢালাওভাবে বিঘা প্রতি ৮ আনা হারে খাজনা ধার্যের নীতি পরিহার করা হয় এবং কালেক্টর কর্তৃক সুন্দরবন এলাকার দায়িত্বগ্রহণের আগেই সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতীত অবৈধ দখলদারদের চাষকৃত জমির মূল্যায়নও সমাপ্ত করা হয়।

১৮১৬ সালের ৫ জুলাই সুন্দরবন এলাকার রাজস্ব আদায়ের জন্য ডি স্কটকে কালেক্টরের পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশনার নিয়োগ করা হয়। দায়িত্বগ্রহণের পর ডি স্কট ২৪ পরগনার দক্ষিণ সীমানা এবং নদিয়া, যশোর, ঢাকা, জামালপুর ও বাখেরগঞ্জের সীমানা নির্ধারণ করেন। দশসালা বন্দোবস্তের সময় সুন্দরবনের যে অংশের খাজনা নির্ধারণ করা হয়নি তাও এ সময়ে নির্ধারণ করা হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকরিতে নিয়োজিত জেমস গ্রান্ট (James Grant) সুন্দরবনে সরকারের খাসজমিতে ফসলের নির্দিষ্ট অংশপ্রদানের বিনিময়ে জমিদারি মালিকানার অধিকার পান। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় সুন্দরবন অঞ্চলের জমি পুরোটাই সরকারের। এসব ভূমির দখলকারীরা সবাই অবৈধ। কিন্তু এলাকার জমিদারগণ দাবি তোলেন যে, ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় যেহেতু জমিদারদের জমির সীমানা ও খাজনা চিরদিনের জন্য বেঁধে দেওয়া হয়েছে সেহেতু সুন্দরবন এলাকা পুনর্মূল্যায়নের অধিকার আর সরকারের নেই। ১৮১৬ সালে দেওয়ানি আদালতে এই বিষয়ে বিস্তর শুনানি হয় এবং সুন্দরবন এলাকায় সরকারি মালিকানা স্বীকৃত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮১৭ সালে ১৩নং আইন পাস হয়। এই আইনের মুখবন্ধে বলা হয়:

“এটা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, দেশের যে বিস্তীর্ণ এলাকা ‘সুন্দরবন’ নামে পরিচিত সে এলাকা সম্পূর্ণভাবে খাসজমি ছিল এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এই এলাকা কোনো পরগনা, মৌজা বা জমিদারির অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তাই উৎসাহী ব্যক্তিরা এ সমস্ত এলাকা সুবিধামতো চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসে। ফলে বিস্তীর্ণ এলাকা ব্যক্তিগত ভোগদখলে চলে যায়। এরা প্রতি বিঘা ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ সরকারকে প্রদানের শর্তে উত্তরাধিকারসূত্রে দখল করে সুন্দরবনের সরকারি খাসজমি ভোগ করত। এ বিষয় সরকারের সঙ্গে ভোগ-দখলকারীদের কোনো চুক্তিপত্র ছিল না। তাই উপরিউক্ত ভূমি নতুন করে বন্দোবস্ত দেওয়া প্রয়োজন। এখানে আরও উল্লেখ ছিল যে, “সম্পত্তির অধিকার এবং ভূমিতে রাজস্ব মূল্যায়নের অধিকার - এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য হলো ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের মূল বিষয়, কিন্তু মনে হয় এই পার্থক্যটুকু সেই আমলে স্বীকৃত ছিল না। ব্যক্তিগত হিসেবে রূপান্তরিত পলিময় ভূমি এবং নাব্য নদীতে সৃষ্ট চরের পার্থক্য বোঝাতে তাই এর ওপর জোর দেওয়া হতো। তাই সুন্দরবন

পুনরুদ্ধার সম্বন্ধীয় আইনে (রেগুলেশন অব ১৮২৮) ভূমিতে সরকারের অধিকার প্রশ্নাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।”[৭]

১৮২৮ সালে ৩নং রেগুলেশন সুন্দরবনের রাজস্ব ইতিহাসে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এই রেগুলেশনের ১৩নং ধারা নিম্নরূপ:

“জনবসতিহীন সুন্দরবন জঙ্গল এলাকা পূর্ব থেকে এখন পর্যন্ত সরকারি সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত। এই এলাকা জমিদারদের নিকট ইজারা দেওয়া হয়নি এবং কোনো বন্দোবস্তেই এই এলাকা অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তাই ‘গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল’কে সুন্দরবন এলাকার যে, কোনো অংশ ইজারা দেওয়ার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। কমিশনার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এলাকা জরিপের মাধ্যমে সুন্দরবনের সীমানা নির্ধারণ করেন এবং সার্ভে ম্যাপের কপি আগ্রহী জমিদার ও তালুকদারদের মধ্যে বিতরণ করেন।”[৮]

১৮২৮ সালের রেগুলেশন নং ৩ আইন পাসের মাধ্যমে সুন্দরবনের সীমানা নির্ধারণের পথ সুগম হয়। ১৮২৯ সালে তৎকালীন সুন্দরবনের কমিশনার উইলিয়াম ডেমপেয়ার এবং লেফটেন্যান্ট আলেকজান্ডার হজেস সুন্দরবনের সীমানা নির্ধারণের জন্য জরিপ সম্পন্ন করেন। খুলনা জেলার পুরোটাই (কালিন্দী নদীর তীরবর্তী প্রাণপুর থেকে বলেশ্বর ও পানগুছি নদী সংযোগস্থল) পর্যন্ত এই জরিপের আওতাভুক্ত হয়। এই জরিপ পরবর্তী সময়ে লেফটেন্যান্ট জেনারেল হজেসকে সুন্দরবনের মানচিত্র তৈরিতে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। হজেসের মানচিত্রের ওপর ভিত্তি করে ১৮৩১ সালে হুগলি (ভারত) নদীর থেকে মেঘনা নদীর তীর পর্যন্ত সুন্দরবন এলাকার পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র প্রণীত হয়। পরবর্তী সময়ে লেফটেন্যান্ট হজেস পশুর নদীর তীর থেকে হুগলি নদীর তীর পর্যন্ত সুন্দরবনের সীমানা নির্ধারণ করেন। তখন সুন্দরবনের মোট আয়তন ছিল ১৭,০২,৪২৩ একর বা ২,৬৬০ বর্গমাইল বা ৬৮৮৯.৩৭ বর্গকিলোমিটার।

সরকার ১৮২৮ সালে সুন্দরবন এলাকার নিরঙ্কুশ অধিকার লাভ করে। পরবর্তী সময়ে খাজনামুক্ত জমি পুনরুদ্ধারপূর্বক বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৩০ সালে বনাঞ্চল বন্দোবস্ত দেওয়ার আইন প্রণীত হয়। এ সময় বনাঞ্চল অনুদান গ্রহণের জন্য অনেকে দরখাস্ত করে। ১৮৩০-৩১ সালে দরখাস্তকারীদের মধ্যে কোনোরূপ সেলামি ছাড়াই ৯৮টি জমির অনুদান (Grant) দেওয়া হয় এবং পরবর্তী পাঁচবছর আরও ১২টি অনুদান দেওয়া হয়। একর প্রতি ১ টাকা ৮ আনা হারে খাজনা নির্ধারণ করে চিরস্থায়ীস্বত্বে এই অনুদান দেওয়া হয়। এই অনুদান প্রদানের উদ্দেশ্য ছিল যে, এ সকল ব্যক্তি সরকারি জমি পুনরুদ্ধারে সহায়তা করবে। জমি অনুদানের শর্তও এটাই ছিল। এভাবে সুন্দরবনের খাস

---

[৭] L.R. Fawcas, Final Report on Survey and Settlement Openations in the Khulna District 1920-26, P. 91-93.

[৮] ওই, পৃ. ৯৮।

এলাকার এক বিরাট অংশ বন্দোবস্ত দেওয়া হয় কিন্তু এতে তেমন ফল হয়নি। বন্দোবস্তপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা জমি উদ্ধারের চাইতে তাদের লাভের বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দেয়। তারা জমি আবাদ না করে অন্যের নিকট জমি বিক্রি করে দেয়। অনেকে ফসল উৎপাদন না করে বনের গাছপালা বিক্রি করে লাভবান হয়। কিন্তু যারা জমি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছিল তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাই অন্যরা জমি উদ্ধারে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। ফলে অনুদানের শর্তাদি পূরণ না হওয়ায় সরকারও অনুদান প্রত্যাহার করে নেয়।

১৮৫৩ সালের আইন

এ অবস্থায় ১৮৩০ সালে প্রণীত ভূমি অনুদান আইন সফলতা লাভ করতে পারেনি। এই ব্যর্থতার কারণে ১৮৫৩ সালে ভূমি অনুদান আইন সংশোধন করা হয়। এ আইনে ৯৯ বছরের জন্য প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে ভূমি অনুদান দেওয়া হতো। জমির খাজনা কমিয়ে একর প্রতি ছয় আনা করা হয়। কিন্তু ৫১ বছর পর্যন্ত এই নিম্নহারের খাজনাও আদায় হয়নি। তাই নতুন আইনে ভূমি পুনরুদ্ধারের কাজটি খুবই সতর্কতার সঙ্গে সম্পন্ন করার জন্য চেষ্টা করা হয় এবং আগ্রহী ব্যক্তিদেরকে শর্ত দেওয়া হয় যে, অনুদানপ্রাপ্ত জমির ১/৮ অংশ ৫ বছরের মধ্যে, $\frac{১}{৪}$ অংশ দশ বছরের মধ্যে, $\frac{১}{২}$ অংশ ২০ বছরের মধ্যে এবং মোট ৩০ বছরের মধ্যে পুরো জমিই চাষাবাদের আওতায় আনতে হবে। ইজারা নবায়নের ক্ষেত্রে পুরাতন অনুদানপ্রাপ্তদের সময় শেষ না হতেই তাদের ইজারা নবায়নের শর্ত দেওয়া হয়। এই বিধান অনুদানপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে এবং প্রায় ৭০ জন পুরাতন অনুদানপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাদের ইজারা বাতিল করে নতুন ইজারা গ্রহণ করে। নতুন আইন সুন্দরবনের জমি পুনরুদ্ধারের কাজটিকে ত্বরান্বিত করে। ১৮৪০ সাল থেকে জরিপকারীরা বন্দোবস্তযোগ্য জমি জরিপ করতে থাকে। এছাড়াও খুলনা এবং বাকেরগঞ্জ জেলার অনুরূপ ভূমিও জরিপ করা হয়। এই জরিপের ওপর ভিত্তি করেই ১৮৫৭ থেকে ১৮৬৩ সালের মধ্যে এই শতাব্দীর ২য় ভাগে প্রায় ১,৫৭,৯৯০ একর জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়।

১৮৬২ সালে বিক্রয় আইন প্রণয়নের ফলে ১৮৫৩ সালের আইনটি রহিত হয়ে যায়। কিন্তু শেষোক্ত আইনটি অকার্যকর প্রমাণিত হওয়ায় ১৮৭৯ সালে সংশোধিত ইজারানীতি প্রণীত হয়। এই নীতি অনুসারে অনুদানপ্রাপ্তদেরকে দুভাগে ভাগ করা হয়। যথা: (১) বড়ো পুঁজিপতি যাদের জমির পরিমাণ ২০০ একরের বেশি ছিল এবং যারা জমির উন্নয়নে অর্থ ও সময় ব্যয় করতে সক্ষম ছিল, এবং (২) ক্ষুদ্র পুঁজিপতি যাদের জমির পরিমাণ ২০০ একরের কম ছিল এবং যারা কৃষকদের দ্বারা জমির উন্নয়নে সচেষ্ট হতো।

বৃহৎ পুঁজিপতি আইন

১৮৬২ সালের বৃহৎ পুঁজিপতি আইন ১৮৫৩ সালের আইনের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন ছিল। ১৮৫৩ সালের আইনে খাজনামুক্ত অনুদানের শর্ত ছিল ইজারাপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রথম পাঁচ বছরে তার ইজারাকৃত মোট জমির ১/৮ অংশের জঙ্গল পরিষ্কার করে আবাদের আওতায় নিয়ে আসবে। ব্যর্থতায় খাজনামুক্ত জমির ইজারা

বাজেয়াপ্ত হবে অথবা উচ্চহারে খাজনা আরো করে নতুন চুক্তি করা হবে। এই আইনে আরও উল্লেখ করা হয় যে, খাজনামুক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ইজারাকৃত জমির খাজনার হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং উর্বরাশক্তির ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন জমির খাজনা বিভিন্ন হারে নির্ধারিত হবে। পুনর্বন্দোবস্তের মাধ্যমে নতুন ইজারা প্রদানের বিষয়টি অব্যাহত থাকবে। মূল ইজারা ছিল ৪০ বছর মেয়াদি এবং এই সময়ে প্রথম ৩০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরই শুধু পুনঃইজারার বিষয়টি বিবেচিত হবে। বৃহৎ পুঁজিপতিদের ইজারার সর্বোচ্চ জমির পরিমাপ ছিল ৫,০০০ একর এবং সর্বনিম্ন ২০০ একর। ইজারাকৃত জমিতে চাষাবাদ বিচ্ছিন্নভাবে হতে পারত। বৃহৎ পুঁজিপতিগণ তাদের অনুকূলে ইজারাকৃত জমি পুনরায় অন্যের নিকট একই হারে ইজারা প্রদানের সুযোগ পেত। এই ইজারাগুলো ছিল দখলিস্বত্বসম্বলিত এবং উত্তরাধিকারও হস্তান্তরযোগ্য। রাস্তা, পানি ও পয়ঃপ্রণালির অধিকার বৃহৎ পুঁজিপতিদের নিকট সংরক্ষিত ছিল। ইজারাপ্রদত্ত জমি হলেও নৌচলাচল উপযোগী নদীপথ এবং দুইপাশের ২৫ ফুটের অধিক প্রশস্ত রাস্তা ব্যবহারের অধিকার জনগণের জন্য সংরক্ষিত ছিল। এ ছাড়া খনিজ সম্পদের অধিকার সরকারের অনুকূলে সংরক্ষিত ছিল। ইজারাপ্রদত্ত জমির গাছপালার কোনো মূল্য ধরা হতো না। উৎপাদিত দ্রব্য অন্যত্র রফতানি করা হলে তার ওপর কর আরোপ করা হতো।

ক্ষুদ্র পুজিঁপতি আইন

ক্ষুদ্র পুঁজিপতি আইন অনুসারে ২০০ একরের কম আয়তনবিশিষ্ট জমি ক্ষুদ্র পুঁজিপতিদের নিকট ৩০ বছরের জন্য ইজারা দেওয়া হতো। ক্ষুদ্র পুজিঁপতিদের অনুকূলে ইজারার শর্ত ছিল ২ বছর পর পতিত জমি চাষাবাদের আওতায় আনতে হবে এবং দুই বছর জমি খাজনামুক্ত থাকবে। জমি চাষাবাদ শুরু হলে চাষকৃত অন্য জমির মতো খাজনা আরোপ করা হতো। ইজারালব্ধ জমির পার্শ্ববর্তী অ-ইজারাকৃত জমি চাষের অন্তর্ভুক্ত করা যেত। সাধারণত পাঁচ বছর পর জমির সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা হতো। এ সময়ে ইজারাকৃত জমির অতিরিক্ত জমি পাওয়া গেলে তার জন্য কর দিতে হতো। এই ইজারা উত্তরাধিকার ও হস্তান্তরযোগ্য ছিল। তবে হস্তান্তরের ১ মাস আগে সরকারকে নোটিশ দেওয়ার বিধান ছিল। সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতীত কোনো জমিই হস্তান্তর বা বিভক্ত করা যেত না। বৃহৎ পুঁজিপতির ইজারার মতই ক্ষুদ্র পুঁজিপতির ওপর গাছ-গাছালির জন্য কোনো কর ধার্য ছিল না বা ভূমি চাষাবাদ করার স্বার্থে গাছকাটা বা পোড়ান হলে তার জন্য তাকে কোনো মূল্য দিতে হতো না। তবে জমিতে উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য পাঠানো হলে তার ওপর কর ধার্যের বিধান ছিল। তবে এই ব্যবস্থা বিশেষ সফলতা আনতে পারেনি। এজন্য একদিকে যেমন সরকারের রাজস্ব আয় কমে যাচ্ছিল অন্যদিকে তেমনি জমিদারদের ওপর থেকে সরকারের নিয়ন্ত্রণ কমে যাচ্ছিল। কেননা সুচতুর জমিদারেরা সরকারের নিকট থেকে ইজারা নিয়ে মুনাফা লাভের জন্য অধিক মূল্যে অন্যের নিকট ইজারালব্ধ জমির একাংশ বিক্রি করে দিত। শেষ

পর্যন্ত জমি পুনরুদ্ধারের ও চাষাবাদের দায়িত্ব কৃষকের ওপর পড়তো এবং কৃষকেরাই সরকারকে প্রদেয় করের সিংহভাগ পরিশোধ করত। এ অবস্থায় ১৯০৪ সালে এ পদ্ধতি বাতিল করা হয়।

নিম্নের সারণিতে খুলনা অঞ্চলে উনিশ শতকে বন্দোবস্তকৃত জমি, এর রাজস্ব আদায় এবং বিশ শতকে খুলনা এলাকার বন্দোবস্তযোগ্য জমির রাজস্বের বিবরণ দেওয়া হলো:

সারণি-৩৩

খুলনার বন্দোবস্তকৃত এস্টেটের খাজনা বিবরণী

ক্র. নং	বর্ণনা	আয়তন (একরে)	খাজনা					
			বর্তমান			সম্ভাব্য		
			টাকা	আনা	পয়সা/ পাই	টাকা	আনা	পয়সা/ পাই
১।	চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকৃত জমিদারি	৬১০৮১২৭	৩৮৯৫২	৭	৯	৪৬০৫০	৭	৯
২।	১৮৫৩ সালের আইন অনুযায়ী বন্দোবস্তকৃত জমিদারি	১২১১৫৯	৩১১০৭	০	০	৩৫৭৮০	০	০
৩।	১৮৭৯ সালের বৃহৎ পুঁজিপতি আইনের অধীনে বন্দোবস্তকৃত	৩৬৬৯৬	৯৫৩২	০	০	২২২০৯	০	০
৪।	১৮৭৯ সালের ক্ষুদ্র পুঁজিপতি আইনের অধীনে বন্দোবস্ত	১১৮৪২	১৪৭২৯	০	০	১৪৯১৬	০	০
৫।	রেগুলেশন বা অন্যান্য আইনের অধীনে বন্দোবস্ত	৮২১৫৩.২৫	৯০০০৭	৭	৪	৯০১৪৪	৭	৪
৬।	পুনরুদ্ধারকৃত জমিদারি	১২৮০১.৯৮	-			-		
৭।	বন্দোবস্তের অপেক্ষায় অব্যবহৃত জমি	৩৮৫২.৫৪	-			-		
৮।	সংরক্ষিত বন	১০৯০৭২৭.৫৪	-			-		

উৎস: O'Malley, L.S.S, Bengal District Gazetteers : Khulna, 1908

খুলনা জেলার জমিদারি

তদানীন্তন যশোরের খুলনা ও বাগেরহাট মহকুমা এবং পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমা নিয়ে ১৮৮২ সালে খুলনা জেলা গঠিত হয়। তখন বৃহত্তর খুলনায় ৯৭১টি জমিদারি ছিল। এর মধ্যে ৭৭০টি চিরস্থায়ী আর ১৭৯টি অস্থায়ী বন্দোবস্তকৃত ছিল। অবশিষ্ট ২২টির ব্যবস্থাপনা প্রত্যক্ষভাবে সরকার নিয়ন্ত্রণ করত। জেলায় খাজনামুক্ত জমিদারি ছিল ৩১টি। লর্ড কর্নওয়ালিশ ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তপ্রথা চালুর পর জেলায় জমিদারির সংখ্যা বেড়ে যায়। কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে বড়ো জমিদারিগুলোর খাজনা বকেয়া পড়ে যায় এবং বকেয়া মেটানোর জন্য বড়ো জমিদারগণ জমিদারির অংশবিশেষ বিক্রি করতেন। ফলে বড়ো জমিদারিগুলো ভেঙে অনেক ছোটো

ছোটো জমিদারির সৃষ্টি হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৭৯৬ সালের মধ্যে রাজা শ্রীকান্ত রায়ের ইউসুফপুরের জমিদারি ১০০টি বড়ো এবং ৩৯টি ছোটো জমিদারিতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল।

চাঁচড়া জমিদারি

খুলনা জেলার ভূমিরাজস্বের ইতিহাস চাঁচড়ার জমিদার পরিবারের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে খুলনা জেলার আবাদি জমি চাঁচড়ার জমিদারির অধীনে চলে আসে। এই জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জনৈক মাধব সিং। মাধব সিং ষোড়শ শতাব্দীতে মুর্শিদাবাদের ফতেসিং পরগনার বৃহদাংশের মালিক ছিলেন। মাধব সিংয়োর অধস্তন তৃতীয় পুরুষের দুই ভ্রাতা যজ্ঞেশ্বর ও ভুবনেশ্বর- জমিদারি হারিয়ে ভাগ্যান্বেষণে অন্যত্র চলে যান। ভুবনেশ্বর মোগল সম্রাটের সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। সেখানে তার অসামান্য কৃতিত্ব দেখে মোগল সম্রাটের পক্ষ থেকে তাকে পুরস্কারস্বরূপ যশোর-খুলনা অঞ্চলের সৈয়দপুর, ইমামপুর, মুড়াগাছা এবং মল্লিকপুর নামক চারটি পরগনার জায়গির দেওয়া হয়। ভুবনেশ্বর সিংয়োর মৃত্যুর পর তার পুত্র মাহতাব রামকে জমিদারির উত্তরাধিকারী হিসেবে মোগল সম্রাট সনদ দান করেন। মাহতাব রাম জমির কর পুনর্নির্ধারণ করেন। জমিদার মাহতাব রাম ১৬১৯ সালে লোকান্তরিত হলে তার পুত্র কন্দর্প রায় জমিদারি লাভ করেন। তার সময়ে বড়ো জমিদারের মাধ্যমে ছোটো জমিদারের খাজনা আদায় করা হতো। কন্দর্প রায়ের সময় খুলনা-বেনাপোল সড়কের কাছে তাদের রাজবাড়ি নির্মাণ করা হয়। কন্দর্প রায়ের নির্মিত বাড়ির ধ্বংসাবশেষ আজও কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাজা কন্দর্প রায়ের মৃত্যুর পর তার পুত্র মনোহর রায় ১৬৪৯ সালে চাঁচড়ার জমিদার হন। তিনি জমিদারিতে প্রভূত উন্নতি ঘটান এবং বকেয়া করের দায়ে নিলামকৃত বেশ কিছু জমিদারের জমিদারি কিনে নিয়ে তার জমিদারি ২৪ পরগনায় বিস্তৃত করেন। ফলে তার আয় অনেক বৃদ্ধি পায়। ১৬৪৯ সাল থেকে ১৭২৯ সাল পর্যন্ত চাঁচড়া জমিদার পরিবার অনেকগুলো পরগনা কিনে নেয়। এগুলো ছিল রামচন্দ্রপুর, চেঙ্গুটিয়া, ইউসুফপুর, মালাই, তালা, ভাট্রা, শোভনা, ফালুয়া, শ্রীপতি, কবিরাজ, কলিকাতা, পাইকান, মালপুর, সেলিমপুর, পানোয়ান, বুরান, বংদিয়া, রহিমাবাদ, সৈয়দ মাহমুদপুর, মাগুরা ঘোড়া, বেরাচি, রায়মঙ্গল, বন্ডার, মুকন্দপুর, শ্রীপদগহ, হোসাইনপুর, নুরনগর, সাহস, শোভনালি, বাজিতপুর, রহিমপুর, ইসলামাবাদ, বেকরা রাজা, ধুলিয়াপুর, সাহাপুর এবং মহেশ্বরপাশা।[৯]

১৭২৯ সাল থেকে এই পরিবারের পতন শুরু হয়। এদের তৃতীয় পুরুষের সময় থেকে এই পতনের গতি ত্বরান্বিত হয়। মনোহর রায়ের পুত্র ছিলেন কৃষ্ণরাম এবং কৃষ্ণরামের পুত্র শুকদেব রায়। শুকদেব রায় পিতামাতার আদেশে ১৭৩১

---

[৯] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪২৮।

সালে ছোটো ভাই শ্যামসুন্দরকে জমিদারির চার আনা অংশ সমর্পণ করে পৃথক করে দেন। শ্যামসুন্দরের জমিদারির মধ্যে সৈয়দপুর পরগনা অন্তর্ভুক্ত ছিল। সৈয়দপুর পরগনা 'সৈয়দপুর এস্টেট' নামে পরিচিত। শুকদেবের অংশে ছিল ইউসুফপুর পরগনা। বৃহত্তর খুলনা জেলা সৈয়দপুর ও ইউসুফপুর জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৬৫ সালে ইউসুফপুরের জমিদারি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজস্ব প্রশাসনের অধীনে চলে যায়।

সৈয়দপুর জমিদারি

শ্যামসুন্দর রায় ১৭৫০ সালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সৈয়দপুর এস্টেটের জমিদার ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রামগোপাল রায় জমিদার হন। কিন্তু রাম গোপাল রায় ১৭৫৭ সালে অপুত্রক অবস্থায় মারা যান। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পতনের পর মিরজাফর আলি খান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাহায্যে বাংলার নবাব হন। কোম্পানির সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক তিনি কলকাতার পার্শ্ববর্তী ২৪টি পরগনার (পশ্চিমবঙ্গ) জমিদারি কোম্পানিকে দান করেন। এসব সম্পত্তির মধ্যে দুগালির ফৌজদার মির্জা মুহম্মদ সালাউদ্দিনের জায়গিরও ছিল। এদিকে রামগোপাল রায় অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করায় তাঁর মালিকানাধীন সৈয়দপুর এস্টেট বাজেয়াপ্ত করে মির্জা মুহাম্মদ সালাউদ্দিনকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে বরাদ্দ করা হয়। ফৌজদার মুহাম্মদ সালাউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নী মন্নুজান জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সমস্ত সম্পত্তির মালিক হন। সন্তানহীনা মন্নুজান ১৮০৩ সালে মৃত্যুর আগে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বৈপিত্রেয় ভাই মহসীনের নামে দানপত্র করে দেন। এই মহসীনই 'দানবীর' হাজী মুহাম্মদ মহসীন নামে পরিচিত। মহসীন ইহলৌকিক সুখের প্রতি আসক্ত ছিলেন না। তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি জনহিতকর কাজে ব্যবহারের জন্য ট্রাস্ট করে সরকারের নিকট সমর্পণ করেন।

বর্তমানে সৈয়দপুর ট্রাস্টের খুলনা অংশের ট্রাস্টি খুলনার জেলা প্রশাসক সম্পত্তির আয় থেকে প্রতিবছর দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিক্ষাবৃত্তি দিয়ে থাকেন। এছাড়া খুলনা অঞ্চলে মুহাম্মদ মহসীনের সম্পত্তির ওপর গড়ে উঠেছে একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ১৯৭৭-৭৮ সালে সৈয়দপুর এস্টেটের জটিলতামুক্ত সম্পত্তি ২৫.৭৮ একর জমি এবং ১০ লাখ টাকার নগদ তহবিল ছিল। বর্তমানে (২০১৫ সাল) ইজারিকৃত জমির পরিমাণ ৫৬২.৩৯৬৮ একর এবং মূলধন স্থায়ী আমানত ১ কোটি টাকা, সঞ্চয়ী হিসাবে ৩৯,৩১,১৭৩.৭৭ টাকা।[১০]

তালুক, পত্তনি, ইজারা ও গাঁতি

অপেক্ষাকৃত ছোটো ছোটো ভূসম্পত্তি বা তালুকের অধিকারীদের তালুকদার বলা হতো। তারা সাধারণত তাদের তালুকে বাস করত। তালুকগুলো বিক্রি, দান বা অন্যভাবে বড়ো জমিদারি থেকে আলাদা হতো। হুজুরি (স্বাধীন) তালুকদারগণ

[১০] জেলা প্রশাসন, খুলনা।

তাদের তালুকের খাজনা সরাসরিভাবে সরকারি কোষাগারে জমা করত। হুজুরি তালুকদারগণ বড়ো জমিদারদের মতো স্থায়ী, হস্তান্তরযোগ্য, উত্তরাধিকারযোগ্য এবং একই ধরনের অন্যান্য সুবিধা লাভ করতো। তাদের দায়-দায়িত্বও বড়ো জমিদারদের মতো ছিল। জমিদার বা তালুকদারগণ স্বাধীনভাবে তাদের জমি হস্তান্তরের ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। ফলে পত্তনি (Patni), ইজারা (Ijara) ও গাঁতি (Gantis) ইত্যাদি উপমধ্যস্বত্বের সৃষ্টি হয়। জমিদারগণ বকেয়া রাজস্ব আদায় বা জমিদারির অংশবিশেষ সরাসরি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করার উদ্দেশ্যে বা এককালীন অর্থপ্রাপ্তির বিনিময়ে জমিদারির অংশবিশেষ পত্তনি দিতেন। বংশানুক্রমে পত্তনিকৃত জমি খাজনার বিনিময়ে ভোগ-দখল করা যেত। তবে মূল জমিদারি বিক্রি বা বাতিল হয়ে গেলে পত্তন গ্রহণকারীর তালুকও বাতিল হয়ে যেত। পত্তনিদার তার অধিকারভুক্ত জমির অংশবিশেষ নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে অন্যের কাছে ইজারা দিতে পারতেন। এ ব্যবস্থাকে দরপত্তনি আখ্যায়িত করা হতো। দরপত্তনিদের তালুকগুলো সেপত্তনি (Sepatni) এবং দরগাঁতিদের ইজারাকে সেগাঁতি (Saganthis) নামে আখ্যায়িত করা হতো। উপ-মধ্যস্বত্বগুলো ছোটো আকারের ছিল এবং তারা রায়তিস্বত্ব ভোগ করত। সময়ের আবর্তে উপ-মধ্যস্বত্বভোগীরা ভূস্বামীর মর্যাদা লাভ করে এবং রায়তদের প্রতি ভূস্বামী হিসেবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়। তারা মধ্যস্বত্বাধিকারী হিসেবে রায়তদের কাছ থেকে খাজনা গ্রহণ করে নিজের অংশ রেখে বাকিটা খাজনা হিসেবে বড়ো জমিদারদের দিত। 'Gantis' শব্দের অর্থ হলো বায়নাপ্রাপ্ত বা হস্তান্তরিত। এ ধরনের মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি হতো যখন জমিদারেরা অব্যবহৃত জমি পুনরুদ্ধার করতেন। সময়ের ব্যবধানে 'গাঁতি' শব্দটি দ্বারা শুধু মূল স্বত্বাধিকারী জমিদার বা তালুকদারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ইজারাকে বোঝাত। গাঁতিগুলো হস্তান্তরও উত্তরাধিকারযোগ্য ছিল। গাঁতিদাররাও উপ-মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি করতে পারত। তখন এগুলোকে বলা হতো 'দরগাঁতি' ও 'সেগাঁতি' ইত্যাদি। এসব মধ্য ও উপ-মধ্যস্বত্বসমূহের 'মুকাররারি' বা নির্দিষ্ট হারে রাজস্বের বিনিময়ে স্বত্ব বা মৌরসি অর্থ বা উত্তরাধিকারযোগ্য ছিল।

ওসাত তালুক বৃহত্তর খুলনা জেলার পূর্ব ও পশ্চিম অংশে তালুকদারি ব্যবস্থা চালু ছিল। বিশেষত বাগেরহাট মহকুমার সেলিমাবাদ পরগনায় উপ-মধ্যস্বত্বসমূহের ব্যাপকতা ছিল। জমিদার/তালুকদারগণ প্রকৃত চাষিদের সঙ্গে কয়েক ধরনের উপ-মধ্যস্বত্ব যেমন- ওসাত তালুক, হাওলা বা ওসাত হাওলা (Ausat Howla), নিম হাওলা বা নিম ওসাত হাওলা (Nim Ausat Howla) সৃষ্টি করত। 'ওসাত' অর্থ অধীনস্ত। এটা নির্ভরশীল স্বত্ব হিসেবে পরিচিত ছিল। অন্যদিকে 'নিম' শব্দটির মাধ্যমে মূল তালুকের খণ্ডীকরণ বুঝানো হতো।

'হাওলা' অর্থ দায়িত্বপ্রাপ্ত-(Charge) এবং 'হাওলাদার' অর্থ হাওলার অধিকারী; তবে বাস্তবে মূলত প্রত্যক্ষভাবে জমিদার ও তালুকদারদের নিকট থেকে তাদের জমিদারি বা তালুকদারির অংশবিশেষের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বোঝানো হতো। খুলনা জেলায় সুন্দরবন পরিষ্কার করে জমি চাষযোগ্য করার সময় হাওলা স্বত্বের সৃষ্টি হয়। জমিদার বা তালুকদারগণ তাদের এলাকার বড়ো বড়ো জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য অন্যকে যে দায়িত্ব ও ভোগ-দখলাধিকার দিতেন তাকে হাওলা বলা হতো। যাকে দিতেন তাকে 'হাওলাদার' বলা হতো। 'হাওলাদার' আবার 'নিম হাওলাদার' সৃষ্টি করতে পারত। 'হাওলাদার' ও নিম হাওলাদারদের মধ্যে আরেক ধরনের উপ-মধ্যস্বত্ব ছিল, যেটা 'ওসাত হাওলাদার' নামে পরিচিত। 'হাওলা' সরাসরি জমিদারি বা তালুকদারির অধীনে কিংবা 'ওসাত' বা 'নিম ওসাতের' অধীন ছিল।

পত্তনি তালুক

পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জমিদারিতে সর্বপ্রথম পত্তনি তালুকের সৃষ্টি হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বর্ধমান জমিদারির ওপর উচ্চ রাজস্ব ধার্য করা হয়েছিল। বর্ধিত এ রাজস্ব আদায় ও পরিশোধের লক্ষ্যে মধ্যস্বত্বভোগীদের নিকট নির্দিষ্ট হারে রাজস্বের বিনিময়ে স্থায়ীভাবে কিছু তালুক ইজারা দেওয়া হয়। এগুলো 'পত্তনি তালুক' নামে পরিচিত। বড়ো বড়ো জমিদার সরকারের নিকট হতে জমিদারি লাভের বিনিময়ে যেসব দায়িত্ব ও শর্ত পালন করতেন ইজারাদারেরাও অনুরূপ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতেন। ১৭৯৩ সালের ৪৪নং রেগুলেশন (XLIV of 1793) অনুসারে এগুলো অনধিক দশ বছরের জন্য ইজারা দেওয়া যেত। ১৯১২ সালের ৫নং রেগুলেশনের ২নং ধারা অনুসারে ইজারা দানের এ ব্যবস্থা বাতিল হয়। তবে একই বছরের ১৮নং রেগুলেশন দ্বারা ৫নং রেগুলেশনের ২নং ধারা বাতিল হয়। ১৮৯১ সালের ৮নং রেগুলেশন, 'পত্তনি বিক্রয় আইন' (Patni Sale Law) অনুসারে বৃহত্তর খুলনা জেলায় অনেকগুলো 'পত্তনি তালুকের' ইজারা ঘোষিত হয়। 'পত্তনি বিক্রয় আইন'-তে জমিদার ও তার অধীন পত্তনি তালুকদারদের পারস্পরিক অধিকার ও করণীয় বর্ণিত হয় এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য পত্তনি বিক্রির ব্যবস্থা ছিল। উপ-মধ্যস্বত্বভোগীরা একই শর্তসাপেক্ষে তাদের তালুক ইজারা দিতে পারতেন। এ ব্যবস্থা জমিদারদের (যারা প্রত্যক্ষভাবে জমিদারির কাজে অংশগ্রহণ করতে চাইত না বা এককালীন মুনাফা লাভ করতে চাইত) মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

দর-পত্তনি ও সে-পত্তনি

পত্তনগ্রহণকারী বা তার উত্তরাধিকারিগণ বা তাদের নিকট থেকে পত্তনলাভকারী অন্য ব্যক্তিবর্গ নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব প্রদানের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে পত্তনি ভোগ করতে পারতেন। তবে সরকারি রাজস্ব প্রদানে ব্যর্থতার কারণে মূল জমিদারি বিক্রি বা বন্দোবস্ত বাতিল হয়ে গেলে পত্তনিও বাতিল হয়ে যেত। পত্তনিদার 'দর পত্তনি' (DarPatni) এবং দর পত্তনিদার 'সে-পত্তনি' (Se Patni) সৃষ্টি করতে পারতেন। এগুলোও স্থায়ী, উওরাধিকার ও হস্তান্তরযোগ্য ছিল। দর

পত্তনিদার ও সে-পত্তনিদারেরা একই ধরনের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করত। এর ফলে এক ধরনের মধ্যস্বত্বাধিকারীর সৃষ্টি হয়, যারা রায়তদের শোষণ করত।

নিষ্করভোগী, পাইকান ও ইনাম যারা কর বা খাজনামুক্ত জমিগুলো ভোগ করত তাদের 'নিষ্করভোগী' বলা হতো। নির্দিষ্ট পেশা বা শ্রমের বিনিময়ে এসব জমি তালুকদারদের কাছ থেকে তারা ইজারা পেতেন। বৃহত্তর খুলনা জেলার প্রায় সব জমিদার সেবামূলক কাজের জন্য নিষ্কর জমি দান করতেন। নিষ্কর জমির আরেক নাম ছিল 'নানকর' জমি। তবে সেবার কাজ বন্ধ করলে জমিদার জমি ফেরত নিতে পারতেন। এই জমি হস্তান্তরযোগ্য ছিল না। সেবার বিনিময়ে নাপিত, ধোপা, ঝাড়ুদার, গ্রাম পাহারাদার ইত্যাদি পেশাধারী ব্যক্তিদেরকে এসব জমি প্রদান করা হতো। চাকরদের দেওয়া চাকরান জমিও নানকর জমির মতোই ছিল। বিশেষ কোনো কাজের জন্য খুশি হয়ে জমিদার কাউকে নিষ্কর জমি প্রদান করলে তাকে 'ইনাম' বলা হতো। পাইক ও লাঠিয়ালদেরও জমিদারগণ নিষ্কর জমি প্রদান করতেন, একে বলা হতো 'পাইকান'।

অন্যান্য নিষ্কর মধ্যস্বত্ব এ জেলায় নিষ্কর মধ্যস্বত্ব নয় ধরনের ছিল। সেগুলো হলো :- (১) দেবোত্তর, (২) ব্রহ্মোত্তর, (৩) বৃত্তি, (৪) বৃত্তিভিক্ষা, (৫) মহত্তরণ, (৬) চেরাগি, (৭) খানাবাড়ি, (৮) যৌতুক ও (৯) আয়মা। মন্দির ও মূর্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে নিষ্কর জমি প্রদান করা হতো তাকে 'ব্রহ্মোত্তর' বলা হতো। এটি উত্তরাধিকার ও হস্তান্তরযোগ্য ছিল। ব্রাহ্মণদের যে নিষ্কর জমি প্রদান করা হতো তাকে 'বৃত্তি' বলা হতো। ব্রাহ্মণদের পৈতা পরার সময় যে নিষ্কর জমি প্রদান করা হতো তাকে 'বৃত্তিভিক্ষা' বলা হতো। ব্রাহ্মণ ব্যতীত নিম্নবর্ণের কোনো হিন্দুকে তার সুকর্মের স্বীকৃতি হিসেবে তাকে নিষ্কর জমি দেওয়া হতো। এগুলোও উত্তরাধিকার ও হস্তান্তরযোগ্য ছিল। এই ধরনের নিষ্কর সম্পত্তি সেলিমাবাদে বেশি ছিল। দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তির মতোই মসজিদ ও কবরস্থানের বাতি দেওয়ার জন্য মুসলমানদের যে নিষ্কর জমি দান করা হতো, তাকে 'চেরাগি' বলা হতো। জমিদার কোনো প্রজাকে ঘরবাড়িসংলগ্ন স্থানে শাকসবজি জন্মানোর জন্য যে জমি দান করতেন তাকে 'খানাবাড়ি' বলা হতো। বিয়ের সময় মহিলাদের যে জমি দেওয়া হতো তাকে 'যৌতুক' বলা হতো। বিদ্বান ও ধার্মিক ব্যক্তিকে দাতব্য কাজের জন্য যে নিষ্কর জমি দেওয়া হতো, তা 'আয়মা' নামে পরিচিত ছিল।

খোদকাস্ত ও পাইকাস্ত রায়ত বা প্রজা আবাদি জমি এলাকায় অবস্থানকারী বা বসবাসকারী আবাসিক কৃষকদের বলা হতো 'খোদকাস্ত' রায়ত এবং আবাদি জমি এলাকায় বসবাসকারী নয় এমন অস্থায়ী প্রজাকে বলা হতো 'পাইকাস্ত' রায়ত। বাসস্থান সংলগ্ন জমির অধিকারী প্রজাকে 'ভিটাবাড়ি' প্রজা বলা হতো। অধীন রায়তদের 'কোরফা' প্রজা বলা হতো।

থাক ও রাজস্ব জরিপ

থাকবাস্ত (Thak bast) বা সংক্ষেপে থাক ও রাজস্ব জরিপ খুলনা জেলায় রাজস্ব প্রশাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এগুলো ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সমগ্র বাংলায় শুরু হয়। থাকবাস্ত জরিপের মাধ্যমে জেলার সীমানা ও জমিদারিসমূহের সীমানা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হয়। থাক জরিপের এক বছর পরে রাজস্ব জরিপ সম্পন্ন করা হয়। উল্লেখ্য, এ জেলায় ১৮৫৮-১৮৬০ সালে থাক জরিপ ও ১৮৫৯-১৮৬০ সালে রাজস্ব জরিপ করা হয়েছিল। রাজস্ব জরিপের মাধ্যমে জেলার যথাযথ মানচিত্র তৈরি করা হয়েছিল। বৃহত্তর খুলনা জেলায় রাজস্ব জরিপের প্রধান ছিলেন জে. ই. গ্যাস্ট্রেল (Colonel J. E. Gastrel)। তাঁর অধীনে কপোতাক্ষ নদীর পশ্চিমে অবস্থিত যশোরভুক্ত এলাকা এবং খুলনা জেলার অন্যান্য অংশ, ফরিদপুর ও বাকেরগঞ্জের কিছু অংশের জরিপের কাজ শুরু হয়। কপোতাক্ষ নদীর পশ্চিমতীরের অঞ্চলও (আগে ২৪ পরগনার অন্তর্ভুক্ত ছিল, বর্তমানে সাতক্ষীরা জেলায় অবস্থিত) তখন বৃহত্তর খুলনা জেলায় অবস্থিত ছিল। এই জরিপ হয়েছিল ক্যাপ্টেন স্মিথ (Captain Smith) এর নেতৃত্বে। ১৯০৬-০৮ সালে সুন্দরবনের বিশদ বিবরণীসহ পরবর্তী জরিপ করা হয়। এই জরিপ পরিচালনা করেন মেজর এফ. সি. হার্স্ট (Major F.C. Hirst)। খুলনা জেলায় পুনরায় জরিপ করা হয়েছিল ১৯১৭-১৮ সালে। তীব্র শীতের কারণে যশোর জেলার জরিপ ও বন্দোবস্ত কাজ সম্পন্ন করতে অনেক সময় ব্যয় হয়। তাই খুলনা জেলার জরিপকাজ আরম্ভ হয় ১৯২০ সালে। মূলত এই জেলাকে সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও খুলনা সদর এই তিনটি ভাগে ভাগ করে কাজ আরম্ভ করার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু ১৯২১ সালে সিদ্ধান্ত হয় জরিপের কাজ ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী অর্থাৎ সাতক্ষীরা, খুলনা সদর ও বাগেরহাট পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা হবে। সাতক্ষীরা মহকুমার জরিপকাজ ১৯২০-২১ সালে প্রচণ্ড শীতের মধ্যেই সম্পন্ন হয় এবং খুলনা জেলায় জরিপকাজ ১৯২৬ সালে শুরু হয়।[১১]

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০

১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রবর্তনের ফলে জমিদারিসহ সকল মধ্যস্বত্ব বিলুপ্ত হয়। ভূম্যধিকারী চাষিরাই সরাসরি সরকারের অধীনে ভূমি মালিকে পরিণত হয়। হাটবাজার, বন, মৎস্যখামার, ফেরি সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী মালিকদের নগদ অর্থে ক্রমান্বয়ে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৬৩ সালের ক্ষতিপূরণ পরিকল্পনা অনুযায়ী খুলনা জেলায় ক্ষতিপূরণ প্রাপকের সংখ্যা ছিল ২,৪৬,১৭৯ ও ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ছিল ২,৩৫,৪৩,৪১০ টাকা। ১৯৭৩ সালের জুলাই পর্যন্ত ক্যাশ ও বন্ডে ১,৭০,৩৪৯ জন মধ্যস্বত্বাধিকারী ও উপ-মধ্যস্বত্বাধিকারীর মধ্যে ক্ষতিপূরণ প্রদানের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১,৩০,৪০,৫৭৩ টাকা এবং ৫,৯৬,৫০০ টাকা।

---

[১১] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৮।

ভূমি উন্নয়ন কর বৃহত্তর খুলনা জেলার (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা) বিভিন্ন খাতে ভূমিরাজস্ব ও কর আদায়ের বিবরণী ছকে দেওয়া হলো।

সারণি-৩৪

খুলনা জেলার ভূমি উন্নয়ন কর আদায় বিবরণী

খুলনা জেলা (১৯৮৫-৮৬ হতে ১৯৯০-৯১ অর্থবছর)

বছর	বকেয়া প্রাপ্য	চলতি প্রাপ্য	মোট আদায়	মন্তব্য
১৯৮৫-৮৬	৩৭,৩৫,৭৪২	১,৩৯,৭৯,২১৪	১,৫৭,০৮,৭৭৯	
১৯৮৬-৮৭	৮১,৮৬,৮১৪	২,২০,৭২,০৪৬	২,৮৮,৯৮,২৬৫	
১৯৮৭-৮৮	১,০৮,১৫,০৩৯	৩,৬৭,৮০,৮৬২	৩,৬২,৮৮,৮২০	
১৯৮৮-৮৯	২,৫০,২৫,২৮৫	৩,৩৭,৮৬,৩৩০	৩,৫৭,৩৬,৫৫৫	
১৯৮৯-৯০	৪,৩২,১০,০৭২	৪,৫৫,০৮,২৭১	৫,০৪,৪৯,৩০৬	
১৯৯০-৯১	৪,৭০,১৮,৮৭৬	৪,৭১,০১,৯৩৭	৪,২০,৬৯,৯৪৫	

১৯৯০-৯১ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ভূমি উন্নয়ন করের দাবি (সাধারণ) ৮,১৯,৮৯,৬৭০/- টাকার বিপরীতে আদায় হয়েছে ৮,২৫,২০,২৯৩ টাকা। খুলনা জেলায় বর্তমানে ১০টি সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর পদ রয়েছে। তন্মধ্যে সিটি করপোরেশন এলাকায় রয়েছে মাত্র ১টি, যদিও করপোরেশন এলাকায় হোল্ডিং -এর সংখ্যা বেশি। খুলনা সদর ভূমি অফিসের অধীন একটি মাত্র ইউনিয়ন ভূমি অফিস রয়েছে।

সারণি-৩৫

ভূমি উন্নয়ন কর আদায় বিবরণী (২০০৯ হতে ২০১৩-১৪)

ভূমি উন্নয়ন করের দাবি ও আদায় (সাধারণ) ২০০৯-১০ থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছর)

উপজেলা	২০০৯-১০		২০১০-১১		২০১১-১২		২০১২-১৩		২০১৩-১৪	
	দাবি	আদায়	দাবি	আদায়	দাবি	আদায়	দাবি	আদায়	দাবি	আদায়
খুলনা সদর	১০৭৭১৪৩৬	১০৭৯৬৫৮২	১০৮৫০১৫১	১০৮৭০১৫১	১১৯৫০১৫১	১১৯৬৩১৫৬	১৬৩৪০১৮১	১৬৩৪১৫১৫	১৯৬০৮২১৮	১৯৭০২৩৫৪
রূপসা	১২২১৮০১	১২৩৬৩৫৯	১২৪৩০০	১২৫৫৫৯৯	১৩২৫৪৭০	১৬০৮১৮২	২০০৪৩৭২	২৫৮৬৬৭৪	২৫০৬৫৩১	২৬৩৯৫০৬
তেরখাদা	৯০৭৭৫৫	৯০৭৮৯৫	১১৬৯২৫৯	১১৮৬৫৯৫	১৬৪৬১২৮	১৭৬৪৬৬৬	১৮১০৭১৮	১৯০৩২৫২	২২৬৩৩৯৮	২১৩৬০৯৮
দিঘলিয়া	১০৮৬০৩০৩	১১০৩৬৯১৮	১০৯০২৭৮৬	১১২০৫৯১৩	১১৯৮২১৬৫	১২৪৫৭৪৬৬	১৬৩৭৮৫৯৯	১৬৫৭৮৩০০	১৯৬৫৪৩১৯	১৯৬৭৮৭৩৪
ফুলতলা	৫০৯২৫৮৯	৫১৯৬৪৬৫	৫২৪৫২০০	৫২৪৬৬২৫	৫৭৭৪৮৮২	৫৮৩৩৪০১	৭১২৯৮৫৮	৭২৩২০৮৮	৮৯৩৩২১৩	৯০৩৭৫৪৫
ডুমুরিয়া	৪৯৫১৮৬৯	৪৯৭৫৫৪৪	৪৯৫১৯২৭	৪৭৬৬৪৬৩	৫৪৪৭৫৮৩	৫৪৮১০৬৯	৭০৬৪৭২০	৭০৬৫৪৭১	৮৪৭৭৭৬৫	৮৬১৬৮০৪
বটিয়াঘাটা	৩৫৬৭২৬৯	৩৫১৬০৬৯	৩৭২৪৫৯০	৩৭৪২৯৬৪	৩৫৬৩৭১২	৪০৬৬৯৫৯	৪৮৯৮২৬৮	৪৯০৩০৭২	৫৮৭৭৯২২	৫৩৬২১৬৯
দাকোপ	২৬৫৮৫২২	২৫৯৫১২০	২৪৬৩৮	২৬৫৭০৭৯	২৬৪০৬৩১	২৭৫৬৬৪১	৩০৩১৩৫৯	৩০৭৬৬৭৭	৩৭৮৯৩৭৯	৪০২৮২১০
পাইকগাছা	৪৫৪৬৪৬৫	৪৫৭৩৪৮২	৪৫৪৬৬৬৫	৪৫৫৭৭৮৪	৪৪৮৪০১৩	৪৫৬০২২৩	৪৯৩২৪৬৭	৪৯৭৯৯৪০	৬১৬৫৫৮৩	৬৩২৪৬৫৩
কয়রা	৩১২৯২০১	৬৫২১৬৮	৪১৬৬৮২০	১০৬৯৩৭৪	৪১৬৮২৪৮	৩২৩৬৫৪২	৪০৯৮৫৫৯	৩২৫০৪৪৩	৪৭১৩৩৪২	৪৯৯৪২২০
মোট =	৪৭৭০৭২১০	৪৫৪৮৬৬০২	৪৯২৪১৩৩৬	৪৬৫৫৮৫৪৭	৫২৫৮২৯৮৩	৫৩৭২৮৩০৫	৬৭৬৮৯১০১	৬৭৯১৭৮৩২	৮১৯৮৯৬৭০	৮২৫২০২৯৩

তথ্যসূত্র: জেলা প্রশাসন খুলনার সংশ্লিষ্ট দাপ্তরিক নথি।

সারণি-৩৬

ভূমি উন্নয়ন করের দাবি ও আদায় (২০১৭-২০১৮ অর্থবছর)

উপজেলা	সাধারণ						সংস্থা						(সাধারণ+ সংস্থা)	চলতি মাসে আদায় (সাধারণ+ সংস্থা)	সর্বমোট পুঞ্জিভূত আদায় (সাধারণ সংস্থা)	পুঞ্জিভূত আদায়ের হার (সাধারণ সংস্থা)	মন্তব্য
	দাবী			আদায়			দাবি			আদায়							
	বকেয়া	হাল	মোট	চলতি মাসে	চলতি অর্থবছরে	পুঞ্জিভূত আদায়ের হার	বকেয়া	হাল	মোট	চলতি মাসে	চলতি অর্থ বছরে	পুঞ্জিভূত আদায়ের হার					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪ (৪+১০)	১৫ (৫+১১)	১৬ (৬+১২)	১৭	১৮
খুলনা সদর	৩৯২৭৫১০	৩০৭২৭৬৫০	৩৪৬৫৫১৬০	৫৬৭৯৮৬৫	৩০১৩১৬০৫	৮৬.৯৫%	৩২৯৬০৯৯৫	৩৪৮৮০৫০	৩৬৪৪৯০৪৫	২৮৯৩৭০	৪৩৯৬৫০	১.২১%	৭১১০৪২০৫	৫৯৬৯২৩৫	৩০৫৭১২৫৫	৪৩.০০%	
রূপসা	২৮৯১৭১০	১৬৫৯৭৪৭	৪৫৫১৪৫৭	৮৮৫২৯৩	৪৬৫২৫৯৩	১০২.২২%	১১২৯০৮৯৮৮	৩৯৬৫০৯৮	১১৬৮৭৪০৮৬	০	৬০০০	০.০১%	১২১৪২৫৫৪৩	৮৮৫২৯৩	৪৬৫৮৫৯৩	৩.৮৪%	
তেরখাদা	১৮৬১০৪৩	৯৫১৪২৭	২৮১২৪৭০	৪৪১৫৪০	২৮৩৮৭০০	১০০.৯৩%	৬২৫২৪১	১৫৫৪১৯	৭৮০৬৬০	১২৪১১৭	২৩৭৭৯৩	৩০.৪৬%	৩৫৯৩১৩০	৫৬৫৬৫৭	৩০৭৬৪৯৩	৮৫.৬২%	
দিঘলিয়া	৭২৫২৬২৬	২০১৯৫৮৮০	২৭৪৪৮৫০৬	৪০০৪৮৯৩	২৮০৬৮১১৭	১০২.২৬%	২৭৫১৩১৩৪৩	১৫৩২৫১৪১	২৯০৪৫৬৪৮৪	২৫৫৮৫০৯	৯৫১৩৬৪৩	৩.২৮%	৩১৭৯০৪৯৯০	৬৫৬৩৪০২	৩৭৫৮১৭৬০	১১.৮২%	
ফুলতলা	৬৭৫১৫৬১	৭৪৪২৫৮০	১৪১৯৪১৪১	১০৭৮৬৩৯	১৪৩৭৪৩৯৯	১০১.২৭%	১৪৭৬৭৩৩২৮	৪৫৩৩২৮৮	১৫২২০৬৬১৬	১৮১৬৮৭৪	১৫৭৪৬৩০৫	১০.৩৫%	১৬৬৪০০৭৫৭	২৮৯৫৫১৩	৩০১২০৭০৪	১৮.১০%	
ডুমুরিয়া	৬৪৯১৯৪৩	১১৮৩৩১৮৮	১৮৩২৫১৩১	১৯১৭৯৫৫	১৮২৫৫০৫৭	৯৯.৬২%	৪৯৭৪৪৯৬	২৩৩৯৬০৯	৭৩১৪১০৫	১০৩৮২২৭	১২৪৪৪৪০	১৭.০১%	২৫৬৩৯২৩৬	২৯৫৬১৮২	১৯৪৯৯৪৯৭	৭৬.০৫%	
বটিয়াঘাটা	২১৮১৮০০	১১৫৩৯০০১	১৩৭২০৮০১	১৫৯৩৮৬৯	১৪১৪৭৫৯৪	১০৩.১১%	২০৪৪৫৮৯	১২৭৬০৭৮	৩৩২০৬৬৭	২৭৫০৮৮	৫৫১৯৫৮	১৬.৬২%	১৭০৪১৪৬৮	১৮৬৮৯৫৭	১৪৬৯৯৫৫২	৮৬.২৬%	
দাকোপ	২১৬৮৩৮৩	৪১৫৫৪২০	৬৩২৩৮০৩	১০৬৪৩৯০	৭২৭১৩৫৯	১১৪.৯৮%	৮৬২১৯	১৮৩৪৪৭	২৬৯৬৬৬	৩৯৯৯১	১৫৭৩৩৯	৫৮.৩৫%	৬৫৯৩৪৬৯	১১০৪৩৮১	৭৪২৮৬৯৮	১১২.৬৭%	
পাইকগাছা	২৬৯৩৬৪১	৯১৭৩৫৬৭	১১৮৬৭২০৮	১২১৯৮০৯	১২৩৩৬৩১০	১০৩.৯৫%	২৩৪৪০৮৯	১৫৯২৩৭৬	৩৯৩৬৪৬৫	৩৮৮৬৫	৫৩২৪১৪	১৩.৫৩%	১৫৮০৩৬৭৩	১২৫৮৬৭৪	১২৮৬৮৭২৪	৮১.৪৩%	
কয়রা	৪০০৭৪৬৭	৩৫৫৫১৩৬	৭৫৬২৬০৩	১০৯৭০০৪	৮৬৪৬১০৩	১১৪.৩৩%	২৬৮৪৩০	৪৭৯৮৩৮	৭৪৮২৬৮	১৩৬০০৪	৫১৮০৪৮	৬৯.২৩%	৮৩১০৮৭১	১২৩৩০০৮	৯১৬৪১৫১	১১০.২৭%	
মোট=	**৪০২২৭৬৮৪**	**১০১২৩৩৫৯৬**	**১৪১৪৬১২৮০**	**১৮৯৮৩২৫৭**	**১৪০৭২১৮৩৭**	**৯৯.৪৮%**	**৫৭৯০১৭৭১৮**	**৩৩৩৩৮৩৪৪**	**৬১২৩৫৬০৬২**	**৬৩১৭০৪৫**	**২৮৯৪৭৫৯০**	**৪.৭৩%**	**৭৫৩৮১৭৩৪২**	**২৫৩০০৩০২**	**১৬৯৬৬৯৪২৭**	**২২.৫১%**	

তথ্যসূত্র: রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, খুলনা।

সারণি-৩৭

উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের তথ্য

ক্র. নম্বর	উপজেলা সার্কেলের নাম ও অবস্থান	বিদ্যমান পৌর/ ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নাম	অফিসের অবস্থান ও ঠিকানা	বাজেটের আওতাবহির্ভূত কিন্তু প্রস্তাবিত ভূমি অফিসের নাম	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	খুলনা সদর (নিজস্ব ভবনে)	১)খুলনা সদর মহানগর পৌর ইউ: ভূমি অফিস	রাজস্ব ভবনে	১)সোনাডাঙ্গা পৌর ২)বয়রা পৌর	
২.	রূপসা (নিজস্ব ভবন নেই) উপজেলা পরিত্যক্ত কোর্টে	২) নৈহাটী ৩)ঘাটভোগ	রূপসা ঘাট পার হয়ে পুরাতন রেল লাইনের পাশে প্রায় ১কি. মি. দূরত্বে রূপসা উপজেলা থেকে উত্তরে প্রায় ২কি.মি. দূরত্বে আলাইপুর বাজারে।	৩) আইচগাতি ৪) শ্রীফলতলা ৫) টি. এস. বাহিরদিয়া	ঘাটভোগ ইউনিয়নে PWD কর্তৃক নতুন ভবন নির্মিত হয়েছে।
৩.	তেরখাদা (নিজস্ব ভবন নেই) উপজেলা পরিষদে	৪) তেরখাদা ৫) বারাসাত	তেরখাদা ইউনিয়নে এবং বাজারে তেরখাদা ইউনিয়নে এবং বাজারে	৬)সাচিয়াদাহ ৭) ছাগলাদাহ ৮)আজগড়া ৯) মধুপুর	
৪.	দিঘলিয়া (নিজস্ব ভবনে)	৬) সেনহাটি ৭) বারাকপুর ৮)দৌলতপুর পৌর	সেনহাটি বাজারে। বারাকপুর বাজারে(মহেশ্বরপাশা কালীবাড়ি বাজারে ক্যাম্প অফিসে মূল অফিস পরিচালিত হচ্ছে। দৌলতপুর মহসিন স্কুলের দক্ষিণ পাশে নিজস্ব ভবনে।	১০)দিঘলিয়া ১১) গাজীরহাট ১২)যোগিপোল ১৩)আড়ংঘাটা ১৪)খানজাহান আলী ১৫) খালিশপুর পৌর	
৫.	ফুলতলা (নিজস্ব ভবন নেই) উপজেলা পরিত্যক্ত কোর্টে	৯)ফুলতলা ১০) দামোদর	ফুলতলা বাজারে তাঁজপুর মৌজায়। ফুলতলা উপজেলা থেকে দক্ষিণে প্রায় ১কি.মি. আগে।	১৬) জামিরা ১৭)আটরা গিলাতলা	
৬.	ডুমুরিয়া (নিজস্ব ভবনে)	১১)ডুমুরিয়া ১২) শোভনা ১৩) শরাফপুর ১৪) বয়ারসিং ১৫)রুদাঘরা ১৬)থুকড়া	ডুমুরিয়া উপজেলা ভূমি অফিসের একই চত্বরে। খুলনা- সাতক্ষীরা সড়কের পাশে খর্ণিয়ায়। বানিয়াখালী বাজারে ইউনিয়ন পরিষদসংলগ্ন। খুলনা- সাতক্ষীরা সড়কের পাশে চুকনগর বাজারে (২৫কি.মিটারে। মিক্সিমিল মৌজায় রুদাঘরা ইউনিয়ন পরিষদের দক্ষিণ পাশে (দৌলতপুর- চুকনগর সড়কে)। দৌলতপুর- চুকনগর সড়কে থুকড়া বাজারে।	১৮)ভান্ডারপাড়া ১৯)খর্ণিয়া ২০)সাহস ২১) মাগুরখালী ২২) মাগুরাঘোনা ২৩)ধামালিয়া ২৪)রংপুর ২৫)গুটুদিয়া	শোভনা ও শরাফপুরে PWD কর্তৃক নতুন ভবন নির্মিত হচ্ছে।
৭.	বটিয়াঘাটা (নিজস্ব ভবনে)	১৭)বটিয়াঘাটা ১৮)সুরখালী	জলমা ইউনিয়নে নিজস্ব ভবনে। সুরখালী ইউনিয়নে নিজস্ব	২৬) জলমা ২৭) গঙ্গারামপুর ২৮) আমিরপুর	জলমা ইউনিয়নে PWD

		১৯)বালিয়াডাঙ্গা	ভবনে। আমিরপুর ইউনিয়নে নিজস্ব ভবনে। খাড়াবাদ বাইনতলা বাজারের পশ্চিমে।	২৯) ভান্ডারকোট	কর্তৃক নতুন ভবন নির্মিত হয়েছে।
৮.	দাকোপ (নিজস্ব ভবনে)	২০) পানখালী ২১) তিলডাঙ্গা ২২) কৈলাশগঞ্জ ২৩) বাণীশান্তা ২৪) সুতারখালী	চালনা পৌরসভার মধ্যে নিজস্ব ভবনে। তিলডাঙ্গা ইউনিয়নে নিজস্ব ভবনে। কৈলাশগঞ্জ ইউনিয়নে নিজস্ব ভবনে। লাউডোব ইউনিয়নে নিজস্ব ভবনে। সুতারখালী ইউনিয়নে নিজস্ব ভবনে।	৩০) বাজুয়া ৩১) কামারখোলা ৩২) লাউডোব ৩৩) শ্রীনগরও কালীনগর ৩৪) চালনা পৌর ৩৫) দাকোপ	তিলডাঙ্গা ও সুতারখালীতে PWD কর্তৃক নতুন ভবন নির্মিত হচ্ছে।
৯.	পাইকগাছা (নিজস্ব ভবন নেই) উপজেলা পরিষদের মিলনাতায়নে।	২৫)রাড়ুলী ২৬) দেলুটি ২৭) লস্কর ২৮) সোলাদানা ২৯) গড়ইখালী ৩০)কপিলমুনি	রাড়ুলী ইউনিয়নে নিজস্ব ভবনে(পি.সি. রায়ের বাড়ি)। দেলুটি ইউনিয়নে নিজস্ব ভবনে (সোলাদানার পূর্ব তীরে)। লস্কর ইউনিয়নে নিজস্ব ভবনে। সোলাদানা ইউনিয়নে নিজস্ব ভবনে। গড়ইখালী ইউনিয়নে নিজস্ব ভবনে (বাজারে) হরিঢালী ইউনিয়নে নিজস্ব ভবনে (কপিলমুনি বাজারে)।	৩৬)_পাইকগাছা পৌর ৩৭)গদাইপুর ৩৮) লতা ৩৯)চাঁদখালী ৪০)হরিঢালী	সোলাদানা ও কপিলমুনিতে PWD কর্তৃক নতুন ভবন নির্মিত হচ্ছে।
১০.	কয়রা (নিজস্ব ভবন নেই) উপজেলা পরিষদে	৩১) মদিনাবাদ* ৩২) আমাদী ৩৩) উত্তর বেদকাশী ৩৪) মহেশ্বরীপুর*	কয়রা ইউনিয়নে নিজস্ব ভবনে নদীর তীরে। পাইকগাছা-কয়রা রোড-সংলগ্ন আমাদী বাজারের কাছাকাছি। উত্তর বেদকাশী ইউনিয়নে নিজস্ব ভবনে। মহেশ্বরীপুর ইউনিয়নে নিজস্ব ভবনে।	৪১)মহারাজপুর** ৪২)বাগালী ৪৩)দ: বেদকাশী	**নিজস্ব ভবনরয়েছে কিন্তু ক্যাম্প অফিস। *মদিনাবাদ ও মহেশ্বরীপুর PWD কর্তৃক নতুন ভবন নির্মিত হচ্ছে।

খুলনা জেলার খাসজমি ব্যবস্থাপনা

খুলনা জেলায় মোট খাসজমির পরিমাণ ২২,১৪১.৬০৫ একর। এর মধ্যে কৃষি খাসজমি ২০,৮৩৮.৮৪৫ একর, অকৃষি খাসজমি ১,৩০২.৭৬ একর এবং বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমি ১,২৭৪.৩১৭৫ একর। খুলনা জেলায় একসময় অসংখ্য ছোটো-বড়ো নদী ছিল। তবে কালের বিবর্তনে তথা জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হওয়ায় বর্তমানে অনেক নদী নাব্যতা হারিয়ে ও নদীপয়স্তি হয়ে দুকূলে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ খাসজমি সৃষ্টি হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত জি. ই. ম্যানুয়াল ১৯৫৮-(The Government Estate Manual, 1958)-এর বিধান অনুসারে সেলামির মাধ্যমে খাসজমি (কৃষি ও অকৃষি) দীর্ঘমেয়াদি (স্থায়ী) বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৮৭ সালে কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত নীতিমালা জারির পর

ভূমিহীনদের মধ্যে বিনা সেলামিতে (নামে মাত্র এক টাকা সেলামি) খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়। এ নীতিমালা অনুসারে ভূমি মালিকের জমির পরিমাণ ১.৫ একর পর্যন্ত এবং কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল হলে তাকে ‘ভূমিহীন’ বলা হতো। পরে এ নীতিমালা পরিবর্তিত হয়ে ০.৫০ একর এবং বর্তমানে ১৯৯৫ সালের নীতিমালা অনুসারে ভিটা-বাড়িসহ মোট জমির পরিমাণ ০.১০ একর পর্যন্ত ভূমির মালিক এবং কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল হলে তাকে ‘ভূমিহীন’ বলে গণ্য করা হয়। এছাড়া ১৯৮৭ সাল থেকে আশ্রয়হীন ভূমিহীনদেরকে 'গুচ্ছগ্রাম', 'আদর্শগ্রাম', 'আবাসন' ও 'আশ্রয়ণ' নামের প্রকল্পে আবাসসহ খাসজমি বন্দোবস্তের মাধ্যমে পুনর্বাসিত করা হচ্ছে।

সারণি-৩৮

বন্দোবস্তকৃত খাসজমির তথ্য:

খুলনা জেলার স্বাধীনতা পরবর্তী সময় হতে এখন পর্যন্ত বন্দোবস্তপ্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা ও বন্দোবস্তকৃত খাসজমির তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	সাল	বন্দোবস্তপ্রাপ্ত ভূমিহীনের সংখ্যা	বন্দোবস্তকৃত জমির পরিমাণ (একর)	মন্তব্য
১	১৯৭২-১৯৮৬	৫৪৩২	৬৯৬৯.২৭৯৩	
২	১৯৮৭-২০০১	৬৭৫০	৫৮২৬.৮২৯১	
৩	২০০২-২০১৪	৮০৬৮	৪৬৮৪.৭৩৯৪	
৪	২০১৪-২০১৫	৪১১	৩৬.৩৫	
৫	২০১৫-২০১৬	৩৩২	৯০.৮৪	

তথ্যসূত্র: এস. এ শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা।

খুলনা জেলায় খাসজমির প্রধান উৎস নদীর চর। নদীর উজানের পানির প্রবাহ কমে গিয়ে নদীতে চর পড়ে। এছাড়া ষাটের দশকে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড লবণাক্ত পানি আবাদি জমিতে প্রবেশ প্রতিরোধ করতে গিয়ে প্রতিটি বিলের চারদিকে বাঁধ নির্মাণ করে। এতে কৃষিতে বিপ্লব সূচিত হলেও বাঁধ নির্মাণের ফলে নদীর তলদেশ পলি পড়ে উঁচু হয়ে যায় এবং নদী শুকিয়ে গিয়ে তলদেশ জেগে ওঠে। এ জমি খাসজমি হিসেবে বন্দোবস্ত দেওয়ার কার্যক্রম চলমান। তবে নানা কারণে কাজটি খুব সহজে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না।

ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া ছাড়াও গুচ্ছগ্রাম, আবাসন, আশ্রয়ণ ইত্যাদির মাধ্যমেও ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। খুলনা জেলায় মোট গুচ্ছগ্রামের সংখ্যা ৯টি। এগুলো নির্মাণ করা হয় ২৭৭.৭৬১ একর জমির ওপর এবং এখানে মোট ৫২১টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়। আশ্রয়ণ প্রকল্পের অধীনে সৃষ্ট ১৮টি আশ্রয়ণে মোট ১,০৯২টি পরিবার পুনর্বাসিত হয়েছে। এছাড়া আবাসন প্রকল্পের সংখ্যা ২৩টি। ১০৬.৭৩ একর জমির ওপর নির্মিত আবাসন প্রকল্পে পুনর্বাসিত হয়েছে মোট ১,৫৫৮টি পরিবার।

অর্পিত সম্পত্তি

সারা দেশের মতো এই জেলায় অর্পিত সম্পত্তি (ভিপি) একটি দীর্ঘদিনের জটিল সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানে সরকার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ নামে একটি আইন পাস করে। আইন পাসের পূর্ব পর্যন্ত অর্পিত সম্পত্তি (ভিপি) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব জেলা প্রশাসকের ওপর ন্যস্ত ছিল। জেলা প্রশাসক এক বছর মেয়াদে এ সম্পত্তি ইজারা প্রদান করতেন এবং প্রাপ্ত ইজারা মূল্য ভিপির জন্য নির্ধারিত খাতে জমা করা হতো। 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১' অনুসারে ভিপি সম্পত্তি দুটি ভাগে নির্ধারণ করা হয়। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ সংশোধন করে ২০১১ সালে ভিপি তালিকাভুক্ত সম্পত্তিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। ভিপি তালিকাভুক্ত যে সম্পত্তি ইজারা দেওয়া হয়েছে সে সকল সম্পত্তিকে 'ক' তফসিলভুক্ত এবং ভিপি তালিকাভুক্ত যে সম্পত্তি কখনও ইজারা দেওয়া হয়নি তা 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। 'ক' ও 'খ' উভয় তফসিলভুক্ত সম্পত্তি সরকার ছেড়ে দেওয়ার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। 'ক' তফসিলভুক্ত সম্পত্তি ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে এবং 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তি সহকারী কমিশনার (ভূমি)র মাধ্যমে। 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তি ১০ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে প্রকাশিত গেজেট (অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ ও সংশোধন আইন ২০১৩) অনুসারে অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে কোনোদিন ছিল না বলে গণ্য হবে। জমির উপযুক্ত মালিকগণ উক্ত জমি প্রাপ্ত হবে। তবে এখনও 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তি অবমুক্তিতে তেমন সাফল্য আসেনি। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ (সংশোধিত ২০১১) অনুসারে খুলনা জেলায় মোট অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ ১৭৬৭.২ একর। এর মধ্যে 'ক' তফসিলভুক্ত ১৬৭৬.২ একর এবং 'খ' তফসিলভুক্ত ৯১ একর।

পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা

স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় অবাঙালিদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়। এ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্য অ্যাবানডন্ড প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট বোর্ড (এপিএমবি) নামের একটি বোর্ড রয়েছে। এ বোর্ডের প্রধান বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা। বোর্ড পরিত্যক্ত বাড়িগুলো এক বছর মেয়াদে ইজারা দিয়ে থাকে। তবে ফাঁকা জমি জেলা প্রশাসক, খুলনা ইজারা প্রদান করে আসছেন। খুলনা জেলায় মোট পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ ২৬.৯৯ একর।

অধ্যায়-৬

কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে খুলনা জেলার অবস্থান। জেলার দক্ষিণ সীমা বঙ্গোপসাগরসংলগ্ন পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই জেলার অধিকাংশ লোকের মূল পেশা কৃষি। তবে কৃষির পাশাপাশি অনেকে সুন্দরবন হতে কাঠ, মধু, মৎস্য ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করেও জীবিকা নির্বাহ করে। তা ছাড়া খুলনা শিল্পাঞ্চল এলাকা হওয়ায় পাট শিল্প ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পসহ এ জেলার প্রচুর লোক বিভিন্ন শিল্পের সাথে জড়িত রয়েছে।

এ জেলার ঘেরে একইসাথে ধান চাষ ও মৎস্য চাষ এবং এর আইলে সবজি ও ফল চাষ করা হয়। আবাদি জমি কম থাকায় আগে এ জেলায় খাদ্য ঘাটতি ছিল। তবে বর্তমান সরকারের বিশেষ উদ্যোগের ফলে এটি খাদ্যে উদ্বৃত্ত জেলায় পরিণত হতে যাচ্ছে।

সারণি-৩৯

খুলনা জেলার ৫ বছরের (২০০৯-২০১০ খ্রিস্টাব্দ হতে ২০১৩-২০১৪) খাদ্য পরিস্থিতি

(মে.টনে ও চাউলে)

উৎস: ডিডিএই, খুলনা

ক্র. নং	বিবরণ	২০০৯ - ২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩ (২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ০.৬০ হারে বৃদ্ধি)	২০১৩-২০১৪ (২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ০.৬০ হারে বৃদ্ধি)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	জেলায় মোট লোক সংখ্যা - (১.১৬ হারে বৃদ্ধি ২০০১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী)	২৫,৫৯,৯১০	২৫,৮৯,৬০৫	২৬,১৯,৬৪৪	২,৩৩,২২,৪৩৮	২৩,৪৬,৪৩২
২	জেলায় বার্ষিক খাদ্য চাহিদা - (৪৮৭ গ্রাম হিসেবে)	৪,৫৫,০৩৭	৪,৬০,৩১৫	৪,৬৫,৬৫৫	৪,১৪,৬০২	৪,১৭,০৯০
৩	বীজ গো-খাদ্য ইত্যাদি খাতে প্রয়োজন -(১১.৫৮% হারে)	৫২,৬৯৩	৫৩,৩০৫	৫৩,৯২৩	৪৮,০১১	৪৮,২৯৯
৪	মোট চাহিদা (২+৩)	৫,০৭,৭৩০	৫,১৩,৬২০	৫,১৯,৫৭৮	৪,৬২,৬১৩	৪,৬৫,৩৮৯
৫	বার্ষিক মোট খাদ্য উৎপাদন	৩,৭৭,৩৬৫	৪,২১,৩৫৩	৪,৫৬,৮৮৪	৪,৫০,০৩৬	৪,৭৯,৮৩৮
৬	খাদ্য উদ্বৃত্ত (+)/ঘাটতি (-)	(-) ১,৩০,৩৬৫	(-) ৯২,২৬৭	(-) ৬২,৬৯৪	(-)১২,৫৭৭	(+)১৪,৪৪৯

জেলার ফসলাদি আগে এই জেলার প্রধান ফসল ছিল স্থানীয় জাতের রোপা আমন ও বোনা আমন ধান। জেলার উত্তরাঞ্চলে রোপা আমনের উফশী জাত চাষ অনেক পূর্ব থেকে শুরু হয়েছে। ফলের মধ্যে নারকেল ও সুপারির ফলন ভালো হয়। তা ছাড়াও স্বাদুপানিযুক্ত অঞ্চলে পাট, আখ ও সবজি চাষ বেশ জনপ্রিয়।

বর্তমানে বোরো মৌসুমে উফশী জাতের বোরো চাষে কৃষকদের মধ্যে বেশি আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। স্থানীয় ও উফশী জাতের রোপা আমন ধানের চাষ হচ্ছে। পাশাপাশি তিল, সূর্যমুখী, বিভিন্ন প্রকার সবজি যেমন বেগুন, ফুলকপি, আলু, বাধাকপি, ওলকপি, লাল শাক, ডাটা, ওল ও কচুর চাষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তাছাড়াও তরমুজ, গম, মুগডাল, পেঁয়াজ, রসুন, হলুদ ও মরিচের চাষ হচ্ছে।

(ক) শস্য বিন্যাস অনেক পূর্ব থেকে এ জেলায় প্রধান শস্যবিন্যাস ছিল পতিত-রোপা আমন (স্থানীয়)। বর্তমানেও শস্যবিন্যাসটি প্রায় একই রকম। তবে রোপা আমনের স্থানীয় জাতের জায়গায় উফশী রোপা আমন স্থান পেয়েছে। তাছাড়া পতিত-পাট- রোপা আমন, পতিত-সবজি-রোপা আমন এই শস্য বিন্যাস ছিল। বর্তমানে শস্য বিন্যাসে নিম্নোক্ত পরিবর্তন এসেছে:

সারণি-৪০

খুলনা জেলার ৩ বছরের বিভিন্ন ফসলের আবাদ (হেক্টরে) ও উৎপাদন (মে.টনে)

ক্র. নং	ফসলের নাম	সাল					
		২০১৪-১৫		২০১৫-১৬		২০১৬-১৭	
		আবাদ	উৎপাদন	আবাদ	উৎপাদন	আবাদ	উৎপাদন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	আউশ: হাইব্রিড	৪৫	১৫৫	১০০	৩৭৭	৬৬	২৫১
২	উফশী	৫৫০	১৩৪৮	৪৮০	৮৯৭	৩৫০	৬৪৯
৩	স্থানীয়	২৫১৫	২৭৭০	২২৭৫	২৫২১	২৬৭০	৩৩২২
৪	মোট	৩১১০	৪২৭৩	২৮৬৫	৩৭৯৫	৩০৮৬	৪২২২
৫	বোনা আমন	৭১৭৫	৮৮৩১	৬৮০৫	২২৮২	৬১৬০	
৬	তিল	১১১৫০	৯১৭৩	৭২২৫	৬৩৫৮	১৯২০	১৯২০
৭	পাট: দেশি	২৫	১৮৯	২০	১৫৯	২৩	১৭৯
৮	তোষা	১৭৯৫	১৯৬২৫	২১২০	২৩৬৮০	২২৩৪	২৩৪৫৭
৯	মোট	২৩২৫৫	৪২০৯১	১৯০৩৫	৩৬২৭৪	২২৫৭	২৩৬৩৬
১০	চিনা বাদাম	৭৮	১৪৪	৭০	১২৯	৫৩	১০১
১১	মুগ	১২৫৫	১১৭৪	৭০৫	৬৭০	২০৫	২২৫
১২	মরিচ	১৭০	৩৩৫	১৯৫	৩৬৮	১৭৫	৩৫০
১৩	হলুদ	২১৬	৯৩০	১৬০	৬৪০		
১৪	আদা	১২	১৪৫	১২	১৩২		
১৫	তরমুজ	৫৮০	২৬৬৮০	৪০৭	১৭০৯৪		
১৬	ভুট্টা	১৮	৯০	৩৫	১৭৩	০৯	৫০
১৭	সূর্যমুখী	৫০	১১২	১২৫	২৭৭	১৪	৩০
১৮	শাক-সবজি	৪৪৩৫	৮৪৯৬৪	৪৯৫৫	৮৯২৯৬	৫৩৮০	৯৭২৫৫

ক্র. নং	ফসলের নাম	সাল					
		২০১৪-১৫		২০১৫-১৬		২০১৬-১৭	
		আবাদ	উৎপাদন	আবাদ	উৎপাদন	আবাদ	উৎপাদন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯	উপমোট	৩০০৬৯	১৫৬৬৬৫	২৫৬৯৯	১৪৫০৫৩		
২০	রোপা আমন						
২১	উফশী	৬৬১৪৫	২০৪২৫৬	৬৮৫৯০	২১৩৯১৫	৬৭০৫০	
২২	স্থানীয়	২৫৩৭৫	৪৯৫৬৭	২৫৩০০	৪৯৭৪১	২৪৫৭৫	
২৩	মোট	১৯৫২০	২৫৩৮২৩	৯৩৮৯০	২৬৩৬৫৬	৯১৬২৫	
২৪	শাক-সবজি	৮৫০	১৫৩০০	৯২০	১৬৫৬০		
২৫	উপমোট	৯২৩৭০	২৬৯১২৩	৯৪৮১০	২৮০২১৬		
২৬	বোরো ধান						
২৭	হাইব্রিড	১৬৫৮৫	৮০৩৮৪	১৬৯৮০	৮১৫০৫		
২৮	উফশী	৩৩৫৪৫	১৩৪৩৪৬	৩৩৯৭০	১৩৪১৮১		
২৯	স্থানীয়	২১৫	৪৩০	১৭০	৩৩১		
৩০	মোট	৫০৩৪৫	২১৫১৬০	৫১১২০	২১৬০১৪		
৩১	গম	৫১০	১৫৩০	৬৯০	২০৭০	৪০০	
৩২	আলু	৪৬০	৭৩৬০	৫৭০	৯৬৯০		
৩৩	মিষ্টি আলু	১০	১৮০	২৫	৪৫০		
৩৪	ভুট্টা	১১০	৭১৫	৬৩	৪০		
৩৫	সূর্যমুখী	২৪৪	৩৭৮	৩০	৬০		
৩৬	আখ	৯৬	৪৬০৮	১২৫	৬১২৫		
৩৭	সরিষা	৩৭০	৪০৭	৩৪৫	৩৮০		
৩৮	মসুর	১৪০	১৫৪	১৮৫	১৮৫		
৩৯	ছোলা	০	০	০	০		
৪০	খেসারী	১৭২	১৮৯	২২০	২৪২		
৪১	মাস কলাই	১০	১০	১০	১০		
৪২	মটর	০১	০১	০৬	০৬		
৪৩	অড়হর	০১	০১	০১	০১		
৪৪	পিঁয়াজ	১৫৫	১৫৫০	১৪৫	১৪৫০		
৪৫	রসুন	৭২	৪৬৮	৮০	৫২০		
৪৬	মরিচ	১৮০	৩৬০	২০০	৪০০		
৪৭	ধনিয়া	৩৫	৫৬	৬০	৯৬		
৪৮	শাক-সবজি	৫৮৫৫	১১১২৪৫	৬২৮৫	১২১৪৮৯		
৪৯	উপমোট	৫৮৭৬৬	৩৪৪৭৫৬	৬০১৬০	৩৫৯২৩১		
	মোট আবাদকৃত জমি	১৮১২০৫	৭৭০৫৪৪	১৮০৬৬৯	৭৮৪৫০০		

সূত্র: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, খুলনা।

সারণি-৪১

২০১৭ সালে খুলনা জেলায় ভূমির ব্যবহার (হেক্টরে):

ক্র. নং	বিষয়	নিট ফসলি জমি (হে.)	মোট ফসলি জমি (হে.)-	ফসলের নিবিড়তার শতকরা হার (%)	ভূমি ব্যবহারের শতকরা হার (%)
১।	একফসলি জমি	২৫,০৪৯	২৫,০৪৯	২০০%	৭৭%
২।	দোফসলি জমি	৬৬,৬৭৯	১৩,৩১০৮		
৩।।	তিন ফসলি জমি	২৫,৮৭৫	৭৭,৬৬৪		
	মোট:	১,১৭,৬০৩	২,৩৫,৮২১		

উৎস: ডিডিএই খুলনা

(খ) সেচ ব্যবস্থা শুষ্ক মৌসুমে জানুয়ারি মাস হতে খুলনা জেলায় প্রবাহিত নদীর পানি লোনা হয়। শুষ্ক মৌসুমে ওই পানি দিয়ে সেচ কাজ করা যায় না। জেলার উত্তর অঞ্চলে শুষ্ক মৌসুমেও কিছু এলাকায় মিষ্টি পানি থাকে এবং তা দিয়ে সেচ প্রদান করা যায়।

লোনা পানির হাত থেকে রক্ষার জন্য উঁচু বেড়ি বাঁধের ব্যবস্থা আছে। তবে সম্প্রতি সিডর, আইলা ও মহাসেনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাঁধগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তা দিয়ে লবণ পানি প্রবাহের ফলে ফসলের ক্ষতি হচ্ছে। শুষ্ক মৌসুমের কৃষি কাজ সেচের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় অগভীর নলকূপ দিয়েই সেচ কাজ চলে।

তা ছাড়াও ঘেরের মধ্যে সংরক্ষিত পানি দিয়ে বোরো ধান ও ঘেরের আইলে সেচ দিয়ে সবজি উৎপাদন হয়। লোনা এলাকায় বৃষ্টি ও উজানের পানিপ্রবাহ বাড়ার পর লোনা পানির পরিবর্তে মিষ্টি পানির প্রবাহ থাকে। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে পানিতে লবণাক্ততা দেখা যায়। তার আগেই ছোটো ছোটো খাল ও জলাধারের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয় যাতে লোনা পানি প্রবেশ না করে। ওই পানি দিয়েই কিছু ফসলের জমিতে সেচ প্রদান করে ভালো ফসল পাওয়া যায়। অনেকে অগভীর নলকূপ ছাড়াও স্থানীয় পদ্ধতি যেমন- ডোন, সেউতি দিয়ে সেচ দিয়ে থাকেন। ঘেরের মধ্যে সেচ দিয়ে বোরো ফসল উৎপাদন করলে একদিকে পানি সেচের খরচ কম পড়ে পাশাপাশি পানির অপচয় কম হয়। বোরো ধানের সেচকৃত চুয়ানো পানি ঘেরের ক্যানেলে জমা হয় এবং তা দিয়ে পুনরায় সেচ দেওয়া সম্ভব হয়।

সারণি-৪২

সেচ যন্ত্রের সংখ্যা ও সেচকৃত জমি (হে.)

সাল	সেচ যন্ত্রের সংখ্যা				সেচকৃত জমি (হে.)			
	গভীর	অগভীর	এলএলপি	মোট	গভীর	অগভীর	এলএলপি	মোট
২০০৯-১০	০০	১৪,৬৩৪	১৭,৩৯৪	৩২,০২৮	০০	২৬,৪০৩	২৬,৬৭৩	৫৩,০৭৬
২০১০-১১	০০	১৩,০৪২	১৫,০৬৮	২৮,১১০	০০	২৭,৬৫৫	২৫,০৩১	৫২,৬৮৬
২০১১-১২	০০	১৪,৩১৫	১৪,৫৮৭	২৮,৯০২	০০	২৮,০২৫	২৪,৭৫০	৫২,৭৭৫
২০১২-১৩	০৯	১৪,১৩৯	১৪,০৪২	২৮,১৯০	১০৫	২৭,৫২৫	২৪,৬৬৫	৫২,২৯৫
২০১৩-১৪	০৯	১৪,৪১১	১৪,৯৬৬	২৯,৩৮৬	২১৫	২৮,৫৯০	২৫,৪৮০	৫৪,২৮৫

উৎস: ডিডিএই, খুলনা।

এখানে উল্লেখ্য যে, খুলনা জেলার সেচ বহির্ভূত জমির পরিমাণ ৯১,৬৮৪ হেক্টর।

(গ) ফসলের উৎপাদন

ইতোআগে এ জেলায় স্থানীয় জাতের ফসল চাষ হওয়ায় হেক্টর প্রতি ফলন কম ছিল। বর্তমানে স্থানীয় জাতের পরিবর্তে উফশী জাতের এবং হাইব্রিড জাতের ধান, সবজি, সূর্যমুখী, ভুট্টা, তরমুজ ফসলের চাষ বৃদ্ধি হওয়ায় হেক্টর প্রতি ফলন বেশি হচ্ছে। বোরো উফশী এবং হাইব্রিড জাতের ফলন হেক্টর প্রতি ৫ থেকে ৭ টন, আমন মৌসুমে যেখানে স্থানীয় জাতের ফলন ছিল হেক্টর প্রতি মাত্র ২.৫-৩ টন। বর্তমানে আমন মৌসুমেও হাইব্রিড জাতের চাষ কম হয়, উফশী জাতের ধান চাষ বেশি হয়, যেখানে গড় ফলন প্রায় ৪-৫ টন/হেক্টর।

(ঘ) মাঠ ফসল: দানা ফসল

খুলনা জেলায় দানা জাতীয় শস্যের মধ্যে ধান তিন মৌসুমেই চাষ হয়। বর্তমানে আউশ মৌসুমে বোনা আউশ ও রোপা আউশ, আমন মৌসুমে বোনা আমন স্থানীয় জাতের ও রোপা আমন স্থানীয় জাত এবং উফশি জাতের। বোরো মৌসুমের সম্পূর্ণ ধানই রোপা। ধান ছাড়াও দানা শস্যের মধ্যে গম ও ভুট্টার চাষ হয়।

অন্যান্য ফসল

ডালের মধ্যে মুগই প্রধান। তা ছাড়া মুসুরি, খেসারি, অড়হর, মাস কলাইয়ের চাষ হয়। তেল উৎপাদনের ফসলের মধ্যে তিল, সরিষা ও সূর্যমুখীর চাষ হয়। অর্থকরী ফসলের মধ্যে পাট, আখ চাষই প্রধানত হয়ে থাকে। সবজি চাষ আগে মাত্র কয়েকটি উপজেলায় হতো। বর্তমানে জেলার প্রতিটি উপজেলায় সবজির চাষ হয়। সবজি সাধারণত তিন মৌসুমেই চাষ হয়ে থাকে। রবি ও খরিপ-১ মৌসুমে সবজি বসত বাড়ির পাশে ও মাঠে চাষ হয়।

রবি মৌসুম

রবি মৌসুমে আলু , ফুলকপি, ওলকপি, বাঁধাকপি , গাজর, লাউ, টমেটো, শিম, ইত্যাদি সবজি চাষ হয়।

খরিপ ১

খরিপ-১ মৌসুমে ঢ্যাঁড়স, মাঠে ও বসতবাড়ির আইলে প্রচুর চাষ হয়। এছাড়া উচ্ছে বা করলা, মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়া, লালশাক, ডাটা, ঘৃতকাঞ্চন শাকের চাষ হয়।

খরিপ ২

মৌসুমের সবজি অর্থাৎ বর্ষাকালের সবজি বসতবাড়ির পাশের উঁচু জমিতে ও ঘেরের আইলে চাষ হয়। আগে তিন মৌসুমে তেমন সবজি চাষ হতো না। এখন সারা বছরই প্রচুর সবজি চাষ হয়।

গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। পলিথিন দিয়ে ছাউনি তৈরি করে তার মধ্যে টমেটো চাষ হচ্ছে। সারা বছরই বেগুনের চাষ হয়। শাক সবজির বীজ কৃষক উৎপাদিত ফসল থেকে সংরক্ষণ করেন, তবে হাইব্রিড জাতের বীজগুলো বাজার থেকে ক্রয় করে থাকেন। ডুমুরিয়া অঞ্চলের কিছু সংখ্যক কৃষক ফুলকপির বীজ উৎপাদন করেন এবং ওই বীজ দিয়ে পরবর্তী বছরে উন্নত মানের ফুলকপি উৎপন্ন হয়।

সারণি-৪৩

খুলনা জেলায় শস্য বিন্যাসভিত্তিক ৫ বছরে আবাদি জমির পরিমাণ

বছর	নিট ফসলি জমি (হে.)	এক ফসলি জমি (হে.)	দোফসলি জমি (হে.)	তিনফসলি জমি (হে.)	মোট ফসলি জমি (হে.)	ফসলের নিবিড়তার শতকরা হার (%)
২০১২-১৩	১,১৩,৯৭২	২৪,৫০৭	৬৩,৮৪৬	২৫,৬১৯	২,২৯,০৫৬	২০১ %
২০১৩-১৪	১,১৮,৮৪২	২৫,০৫১	৬৬,৭১৫	২৫,৮৮৯	২,৩৬,১৪৮	২০১ %
২০১৪-১৫	১,১৮,৮৪০	২৫,০৪২	৬৬,৬১৮	২৫,৫৬০	-	১৯৮%
২০১৫-১৬	১,১৮,৮৪৫	২৫,০৩৭	৬৬,৬১০	২৫৫৫৭	-	২০০%
২০১৬-১৭	১,১৮,৯৭২	২৪,৫০৭	৬৬,৮৪৬	২৫,৬১৯	-	২০০%
২০১৭-১৮	১১,৭৬০৩	২৫,০৪৯	৬৬,৬৭৯	২৫,৮৭৫	-	২০১%

উৎস: ডিডিএই, খুলনা।

(ঙ) উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল

আম এই জেলায় শুষ্ক মৌসুমেও পানির স্তর উপরে থাকায় আমের চাষ তেমন হতো না, শুধু ডুমুরিয়া, ফুলতলা এলাকায় কিছু আমের চাষ হতো, বর্তমানে সমগ্র জেলাতেই আমের চাষ হচ্ছে। আম্রপালি জাতের আমগাছ ছোটো এবং গাছের মূল তেমন গভীরে না যাওয়ার কারণে খুবই ভালো ফলন হচ্ছে। তবে গোপালভোগ, হিমসাগর ও লতা আমের চাষ বেশি হয়। জেলার প্রায় সকল কৃষক আমের হপার পোকা ও ছত্রাক রোগ দমনের জন্য ফুটপাম্প দিয়ে আম গাছে স্প্রে করে থাকেন।

কলা ও পেঁপে বসতবাড়ির আশেপাশে প্রায় প্রতি বাড়িতেই কলা ও পেঁপে চাষ হয় মাঠ পর্যায়ে প্রচুর পরিমাণে কলা চাষ হয়। কলা ও পেঁপে যেমন সবজি হিসেবে ব্যবহার হয় তেমনি ফল হিসেবেও ব্যবহার হয়। কলা এ জেলাতে সাধারণত স্থানীয় জাতের চাষ হয়। স্থানীয় পাকা কলা বেশ সুস্বাদু ও জনপ্রিয়। কিছু জমিতে বাণিজ্যিকভাবে কলা ও পেঁপের চাষ হচ্ছে।

তরমুজ তরমুজের হাইব্রিড জাতসমূহ দাকোপ, কয়রা, বটিয়াঘাটা, পাইকগাছা ও ডুমুরিয়া উপজেলায় ব্যাপক চাষ হচ্ছে। তা ছাড়া অন্যান্য উপজেলাতেও তরমুজের চাষ শুরু হয়েছে।

সফেদা জেলার দক্ষিণ অঞ্চলে প্রায় বাড়িতেই সফেদা গাছ পাওয়া যায়। বর্তমানে বাগান আকারে সফেদা চাষ প্রচলন শুরু হয়েছে।

নারকেল ও সুপারি খুলনা জেলায় প্রচুর পরিমাণে নারকেল আবাদ হয়। প্রায় প্রতি বাড়িতেই নারকেল ও সুপারি গাছ আছে। গাছের বয়স ৫/৬ বছর হলে ফলন হয়। ডাব ও নারকেল এই দুই অবস্থায় এ ফল খাওয়া হয়।

জেলায় কাঁঠাল, লিচু, বেল, কদবেল, তেঁতুল, বাতাবি লেবুর চাষ হয়। ঘেরের আইলে উন্নতমানের কুল ও কাগজি লেবুর চাষ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

সারণি-৪৪
খুলনার কৃষিতে সারের ব্যবহার

অর্থ বছর	ইউরিয়া ও নন-ইউরিয়া সারের ব্যবহার (মেট্রিকটন)				মন্তব্য
	ইউরিয়া	টিএসপি	ডিএপি	এমওপি	
২০০৮-০৯	২৩,৬৫০	১,৮১২	২৭	৩১৯	
২০০৯-১০	১৬,৫৭১	৩,৪৪৬	১৬৯	৪৮৯	
২০১০-১১	১৮,২৯৯	৬,২৩৫	১,২৪০	২,১৬৬	
২০১১-১২	১৩,২৯৩	৩,৬৫১	১,০৫০	১,০৭৫	
২০১২-১৩	১৪,৫৭৭	৩,০৬৬	১,১৬৭	৭৩৮	
২০১৩-১৪	১৮,৯৭৭	৩,৫৬৮	৩,৭০৯	১,৫৮৭	
২০১৪-১৫	২২,৭৯৩	৪,৬৪৬	৩,৪০৩	২,৭৩২	
২০১৫-১৬	১৫,২৪৪	৩,৫০১	২,৩২২	৩,১১৪	

সূত্র: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী ,খুলনা

উদ্ভিদ সংরক্ষণ বা পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা

প্রায় প্রতি ফসলেই কিছু না কিছু পোকামাকড়ের আক্রমণ হয়ে থাকে। ধানের মাজরা পোকা, পামরি, বাদামি গাছফড়িং, গান্ধি উল্লেখযোগ্য। ধানের পোকা দমনের জন্য আগে শুধু কীটনাশকই ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হয়েছে। ধানের জমিতে ডালপালা পোতা যা পার্চিং নামে পরিচিত, আলোক ফাঁদ ব্যবহার ও হাতজালের সাহায্যে পোকা ধরা, সারিতে রোপণ ও ৮ সারি পর পর ফাঁকা রাখা, যা লোগো নামে পরিচিত এই পদ্ধতিগুলোই হলো সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা। সরাসরি প্রশিক্ষণ ও কৃষক মাঠ স্কুলের মাধ্যমে কৃষকের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এর সুফল পাওয়া যাচ্ছে। বেগুনের ডগা ও ফলের মাজরা পোকা দমনের জন্য ফেরোমোন ট্র্যাপ বা ফাঁদ ব্যবহার করা হচ্ছে। কুমড়া জাতীয় ফসলেও ফেরোমোন ট্র্যাপ ব্যবহার করে পোকা দমন করা হচ্ছে। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে জেলায় দিন দিন কীটনাশক ও ছত্রাক নাশকের ব্যবহার কম হচ্ছে।

সমস্যা ও সম্ভাবনা

কৃষি সমস্যার মধ্যে শুষ্ক মৌসুমে নদীর পানি লবণাক্ত হওয়ায় কৃষি কাজে নদীর পানি দ্বারা সেচ ব্যাহত হচ্ছে। বিল এলাকায় রবি মৌসুমে পানি বেশি থাকায় উফশী জাত সম্প্রসারণের অসুবিধা হচ্ছে। স্লুইস গেটে খাল ভরাট হওয়ায় পানি অপসারণে বাধার কারণে ঘেরের মধ্যে আমন মৌসুমে ধান চাষ হচ্ছে না।

জেলায় খরা ও লবণাক্ত সহনশীল ফসল যেমন সূর্যমুখী, তরমুজ, ভুট্টা, তিল ও মুগডালের চাষ সম্প্রসারণ হচ্ছে। ঘেরের আইলে সবজি চাষ বাড়ছে। হাইব্রিড জাতের প্রচলন, আইপিএম পদ্ধতি অবলম্বন এবং সুষম সার ও জৈব সারের ব্যবহার ক্রমাগত বাড়ছে।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে খাদ্য চাহিদা বেড়েছে। অতিরিক্ত খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য এবং সময়ের সাথে মিল রেখে কৃষি ক্ষেত্রে ফসল ও জাতের কিছু পরিবর্তন এসেছে। অতীতে খুলনা জেলার রোপা আমন ধানের যে

স্থানীয় জাতগুলো ছিল এর পাশাপাশি বি আর ১১ জাতের ধান খুবই জনপ্রিয় ছিল, বর্তমানে স্থানীয় জাতের ধানে রাসায়নিক সার প্রয়োগসহ আধুনিক জাত যেমন বি আর ২৩, ব্রিধান ৩৪, ৩৯ ও ৪৯, বিনা ধান-৭ চাষ হচ্ছে। পাশাপাশি লবণসহিষ্ণু ব্রিধান ৪১ ও ৫৪ জাতের চাষ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বোরো মৌসুমে ব্রিধান ২৮ জাত অনেক বছর যাবৎ খুবই জনপ্রিয় ছিল তা বর্তমানে ব্রিধান-২৮ এর পাশাপাশি লবণ সহিঞ্চু জাত, ব্রিধান ৪৭, ৫৫, বিনা ধান ৮ ও ১০ এবং হাইব্রিড জাতের ধানের চাষ বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি-৪৫

খুলনা জেলার চাষকৃত বোরো ধানের জাত

২০০৬ সালে বোরো ধানের জাত	২০১৪ সালে বোরো ধানের জাত	২০০৬ সালে বোরো ধানের জাত	২০১৪ সালে বোরো ধানের জাত
হাইব্রিড		উফশী	
হীরা	হীরা	বিআর-১৪	বি আর -২৬
জাগরণ	জাগরণ	বি আর -২৬	ব্রি ধান- ২৮
আলোড়ন	আলোড়ন	ব্রি ধান- ২৮	ব্রি ধান- ২৯
আফতাব	আফতাব	ব্রি ধান- ২৯	ব্রি ধান- ৪৭
সোনার বাংলা	রূপসী বাংলা	ব্রি ধান- ৩৩	ব্রি ধান- ৫০
রাইজার	সোনার বাংলা	ব্রি ধান- ৩৫	ব্রি ধান- ৫৫
ব্রি-হাইব্রিড-১	এসিআই	ব্রি ধান- ৩৬	বিনা-৮
লাল তীর	লাল তীর	রত্না	বিনা-১০
এসিআই	সুরমা	পূর্বাচী	জি এস-১
	শক্তি	মিনিকেট	
	ময়না	জামাইবাবু	
	টিয়া	জিএস-১	
	সাথী	আইটি	
	তেজ		
	গোল্ড		
	বিজলি		
	ঝলক		
	সেরা		
	এগ্রো-১৪		
	রাজকুমার		
	নবীন		
	এস এল ৮ এইচ		
	শংকর		
	সম্পদ		
	রূপালি		
	নাফকো		
	ফলন		

সূত্র: ডিডিএই, খুলনা

সারণি-৪৬

২০১৬-২০১৭ সনে আবাদকৃত বোরো ফসলের জাতভিত্তিক উৎপাদনের চূড়ান্ত প্রতিবেদন।

জমির পরিমাণ: হেক্টরে/উৎপাদন মে. টন/চাউলে

ক্রমিক নং	জাতের নাম	অর্জিত জমি (হেক্টর)	কর্তনকৃত জমি (হেক্টর)	হেক্টর প্রতি গড় ফলন (মে.টন/ চাউলে)	মোট উৎপাদন (মে.টন/ চাউলে)
	হাইব্রিড:				
১।	হীরা	৫৫৬০	৫৫৬০	৪.৭০	২৬১৭০
২।	জাগরণ	১৬০	১৬০	৪.৬০	৭৩৭
৩।	আলোড়ন	৩৫০	৩৫০	৪.৭৫	১৬৬২
৪।	আফতাব	৬৬০	৬৬০	৪.৯০	৩২২৮
৫।	রূপসী বাংলা	৪০	৪০	৪.৪০	১৭৬
৬।	সোনার বাংলা	৬৫	৬৫	৪.৮০	৩১২
৭।	এসিআই	৯৮০	৯৮০	৪.৭৭	৪৬৭৬
৮।	ফলন	৪২৭	৪২৭	৫.০৬	২১৬১
৯।	লাল তীর	১১২	১১২	৫.০৪	৫৬৫
১০।	আগমনী	১৪০	১৪০	৪.৭০	৬৫৮
১১।	শক্তি-২	৯২৭	৯২৭	৪.৮২	৪৪৭৩
১২।	ময়না	৩০	৩০	৪.৪০	১৩২
১৩।	টিয়া	১১৫	১১৫	৪.৫৪	৫২২
১৪।	সাথী	৩৫	৩৫	৪.৭১	১৬৫
১৫।	সিনজেন্টা ১২০/০৩	৪৯৯৩	৪৯৯৩	৪.৯১	২৪৫১৮
১৬।	তেজ	১০৬৫	১০৬৫	৪.৮৬	৫১৮০
১৭।	গোল্ড	২৫	২৫	৪.৮৮	১২২
১৮।	বিজলি	১৫	১৫	৪.৬৭	৭০
১৯।	ঝলক	৭০	৭০	৪.৮০	৩৩৬
২০।	ইস্পাহানি	৬৫	৬৫	৪.৩২	২৮১
২১।	সেরা	২২৬	২২৬	৪.৯০	১১০৯
২২।	এগ্রো-১৪	৫০	৫০	৫.০৮	২৫৪
২৩।	মদিনা	১৫	১৫	৪.৬৭	৭০
২৪।	নবীন	৮০	৮০	৪.৯০	৩৯২
২৫।	এস এল ৮ এইচ	২৭১০	২৭১০	৪.৮৫	১৩১৫৩
২৬।	শংকর	৩৫	৩৫	৪.৮০	১৬৮
২৭।	রূপালী	৪০	৪০	৪.২৭৫	১৭১
২৮।	ব্যাভিলন	৮০	৮০	৪.৫০	৩৬০
২৯।	পাইনিয়র	১০	১০	৪.৫০	৪৫
৩০।	পান্না	১০	১০	৪.৫০	৪৫
৩১।	কিরণমালা	৬০	৬০	৪.৬০	২৭৬
৩২।	সম্পদ	৩০	৩০	৪.২০	১২৬
	মোট	১৯১৮০	১৯১৮০	৪.৮১৩	৯২৩১৩
	উফশী				

ক্রমিক নং	জাতের নাম	অর্জিত জমি (হেক্টর)	কর্তনকৃত জমি (হেক্টর)	হেক্টর প্রতি গড় ফলন (মে.টন/ চাউলে)	মোট উৎপাদন (মে.টন/ চাউলে)
১।	বি আর-২৬	৩১৫	৩১৫	৩.৬০	১১৩২
২।	ব্রি ধান-২৮	৩১২৭৩	৩১২৭৩	৩.৮৫	১২০৬০১
৩।	ব্রি ধান-২৯	১২০	১২০	৪.৪৩	৫৩২
৪।	ব্রি ধান-৫০	২০৫	২০৫	৩.৬৫	৭৪৮
৫।	ব্রি ধান-৫৫	১৪১	১৪১	৩.৬৫	৫১৫
৬।	ব্রি ধান-৫৮	২৫	২৫	৪.১২	১০৩
৭।	ব্রি ধান-৬১	৩৫	৩৫	৩.৩৭	১১৮
৮।	ব্রি ধান-৬৩	১৩	১৩	৩.৩৮	৪৪
৯।	ব্রি ধান-৬৪	১৮	১৮	৩.৬৭	৬৬
১০।	ব্রি ধান-৬৭	১১৯	১১৯	৪.১৮	৪৯৮
১১।	বিনা-৮	২৮১	২৮১	৩.৯৬	১১১৩
১২।	বিনা-১০	৪৭৫	৪৭৫	৪.১৮	১৯৮৪
	মোট	৩৩০২০	৩৩০২০	৩.৮৬	১২৭৪৫৪
	স্থানীয়:				
১।	সিলেটি বোরো	৮০	৮০	২.০০	১৬০
২।	কৈজুর	২০	২০	২.০০	৪০
	মোট:	১০০	১০০	২.০০	২০০

সূত্র: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, খুলনা

সারণি-৪৭

খুলনা জেলার চাষকৃত আউশ ধানের জাত

২০১৪ সালে আউশ ধানের জাত	২০১৭ সালে আউশ ধানের জাত	২০১৪ সাল আউশ ধানের জাত	২০১৭ সাল আউশ ধানের জাত
উফশী		স্থানীয়	
বি আর -২৬	বি আর-২৬	বাহই	রাতুল
বি আর -২৭	ব্রি ধান -২৭	রাতুল	শ্রীবেলন
ব্রি ধান-২৮	ব্রি ধান -২৮	পরাঞ্জী	ষাটে
ব্রি ধান-২৯	ব্রি ধান -৪৩	শ্রী বেলন	ফুলকুমারী
ব্রি ধান-৩৩	ব্রি ধান -৪৮	সলোই	
রতনা	ব্রি ধান -৫৫	ষাটে	
পূর্বাচী	বিনা-৮	কটক তারা	
জয়া	বিনা-১১	ফুলকুমারী	
মিনিকেট	নেরিকা	বীরপালা	
আইটি			

সূত্র: ডিডিএই, খুলনা।

সারণি-৪৮

২০১৪-২০১৫ সনে খরিপ-১ মৌসুমে জেলাওয়ারি আউশ ফসলের জাতভিত্তিক আবাদ ও উৎপাদন।

ক্রমিক নং	জাতের নাম	আবাদকৃত জমি (হেক্টরে)	কর্তনকৃত জমি (হেক্টরে)	হেক্টর প্রতি গড় ফলন (মে.টনে)	মোট উৎপাদন (মে.টনে/ চাউলে)
ক)	হাইব্রিড				
১।	হীরা	২.০০	২.০০	৩.৫০	৭.০০
২।	আফতাব	৬.০০	৬.০০	৩.৫০	২১.০০
৩।	শক্তি-২	৩.০০	৩.০০	৩.৬৬৬	১১.০০
৪।	আগমনী	৫৪.০০	৫৪.০০	৩.৮৭০	২০৯.০০
৫।	এগ্রোধান-১২	১.০০	১.০০	৩.০০	৩.০০
	মোট:	৬৬.০০	৬৬.০০	৩.৮০৩	২৫১.০০
খ)	উফশী				
১।	বি আর-২৬	৪৭.০০	৪৭.০০	২.১৯১	১০৩.০০
২।	ব্রি ধান-২৮	৬৮.০০	৬৮.০০	২.২৫০	১৫৩.০০
৩।	ব্রি ধান-৪৮	৩২.০০	৩২.০০	২.২৫০	৭২.০০
৪।	ব্রি ধান-৫৫	৩.০০	৩.০০	২.০০	৬.০০
৫।	নেরিকো	২০০.০০	২০০.০০	১.৫৭৫	৩১৫.০০
	মোট:	৩৫০.০০	৩৫০.০০	১.৮৫৪	৬৪৯.০০
গ)	স্থানীয়				
১।	বাপই	৫১৭.০০	৫১৭.০০	১.৩৫৯	৭০৩.০০
২।	রাতুল	২১০৯.০০	২১০৯.০০	১.২১১	২৫৫৬.০০
৩।	ষাটে	৪৪.০০	৪৪.০০	১.৪৩১	৬৩.০০
	মোট:	২৬৭০.০০	২৬৭০.০০	১.২৪৪	৩৩২২.০০

সূত্র: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, খুলনা।

সারণি-৪৯

২০১৫-২০১৬ ক খরিপ-১ মৌসুমে জেলাওয়ারি আউশ ফসলের জাতভিত্তিক আবাদ ও উৎপাদন।

ক্রমিক নং	জাতের নাম	আবাদকৃত জমি (হেক্টরে)	কর্তনকৃত জমি (হেক্টরে)	হেক্টর প্রতি গড় ফলন (মে: টনে)	মোট উৎপাদন (মে: টনে)
ক)	হাইব্রিড				
১।	হীরা	৩.০০	৩.০০	৩.০০	৯.০০
২।	আফতাব	৮.০০	৮.০০	৩.০০	২৪.০০
৩।	তেজ	৪.০০	৪.০০	৩.০০	১২.০০
৪।	শক্তি-২	৭৯.০০	৭৯.০০	৩.৯৩	৩১১.০০
৫।	আগমনী	১.০০	১.০০	৩.০০	৩.০০
৬।	ইস্পাহানী	৩.০০	৩.০০	৩.৬৬	১১.০০
৭।	রাজলক্ষ্মী	২.০০	২.০০	৩.৫০	৭.০০
	মোট:	১০০.০০	১০০.০০	৩.৭৭০	৩৭৭.০০

খ)	উফশী				
১।	বি আর-১৬	৪২.০০	৪২.০০	২.৩৭৫	৯৯.০০
২।	বি আর-২৬	৯৫.০০	৯৫.০০	২.৫১৫	২৩৯.০০
৩।	ব্রি ধান-২৮	৭৬.০০	৭৬.০০	২.৫০	১৯০.০০
৪।	ব্রি ধান-৪৮	৬.০০	৬.০০	২.৩৩৩	১৪.০০
৫।	বিনা -৮	১.০০	১.০০	২.০০	২.০০
৬।	নেরিকা	২৬০.০০	২৬০.০০	১.৩৫৭	৩৫৩.০০
	মোট:	৪৮০.০০	৪৮০.০০	১.৮৬৮	৮৯৭.০০
গ)	স্থানীয়				
১।	বাপই	৩২৯.০০	৩২৯.০০	১.৩৩১	৪৩৮.০০
২।	রাতুল	১৫৯৩.০০	১৫৯৩.০০	১.০৬৪	১৬৯৬.০০
৩।	শ্রীবেলন	৩০২.০০	৩০২.০০	১.০০	৩০২.০০
৪।	ষাটে	৬১.০০	৬১.০০	১.৩৯৩	৮৫.০০
	মোট:	২২৮৫.০০	২২৮৫.০০	১.১০৩	২৫২১.০০

সূত্র: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, খুলনা।

সারণি-৫০

খুলনা জেলার চাষকৃত রোপা আমন ধানের জাত

২০০৬ সালে রোপা আমন ধানের জাত	২০১৩ সালে রোপা আমন ধানের জাত	২০০৬ সালে রোপা আমন ধানের জাত	২০১৩ সালে রোপা আমন ধানের জাত
উফশী		স্থানীয়	
বিআর-১০	বিআর-১০	ঘুনশি	আশফল
বিআর-১১	বিআর-১১	বজ্রমুড়ি	কলমিলতা
বিআর-২২	বিআর-২২	কেঝুরি	কাচড়া
বিআর-২৩	বিআর-২৩	কুমড়া গোড়	কাক শাইল
বিআর-২৫	ব্রিধান-২৮	হোগলাপাতা	কার্তিক শাইল
ব্রিধান-২৮	ব্রিধান-৩০	কাচড়া	কালজিরা
ব্রিধান-৩০	ব্রিধান-৩২	সাদা বালাম	কৈঝুরি
ব্রিধান-৩১	ব্রিধান-৩৩	চাপাইল	কুমড়া গোড়
ব্রিধান-৩২	ব্রিধান-৩৪	রানী স্যালুট	খিরকোনো
ব্রিধান-৩৩	ব্রিধান-৩৯	ডেপো	খেক শাইল
ব্রিধান-৩৪	ব্রিধান-৪০	কলমিলতা	খেজুর ছড়ি
ব্রিধান-৩৯	ব্রিধান-৪১	মরিচ শাইল	গেড়োমুটি
ব্রিধান-৪০	ব্রিধান-৪৬	জটাই বালাম	ঘুনশি
ব্রিধান-৪১	ব্রিধান-৪৯	পাটনাই	চিনি আতব
পুর্বাচী	ব্রিধান-৫১	বাঁশফুল বালাম	চিনি কানাই
পাজাম	ব্রিধান-৫২	চিনি কানাই	চাপাইল

২০০৬ সালে রোপা আমন ধানের জাত	২০১৩ সালে রোপা আমন ধানের জাত	২০০৬ সালে রোপা আমন ধানের জাত	২০১৩ সালে রোপা আমন ধানের জাত
রত্না	ব্রিধান-৫৩	বীরপালা	ছত্রাভোগ
আইটি	ব্রিধান-৫৪	ময়নামতি	জাবড়া
মিনিকেট	ব্রিধান-৫৬	বাঁশমতি	জটাই বালাম
স্বর্ণা	ব্রিধান-৫৭	ঝুমুর বালাম	ঝুমুর বালাম
জি এস	জিএস-১	হরকোচ	ঝুর
	বিনাধান-৭	রাজাশাইল	ডেপো
	বিনাধান-১১	দুর্গাভোগ	দুধ কলম
	বিনাধান-১২	লোনাকুচি	পাটনাই
	স্বর্ণা	ইশফল	বজ্রমুড়ি
		বেনাপোল	বাঁশমতি
		ছত্রা ভোগ	বাঁশফুল বালাম
		জাবড়া	বীরপালা
		ভজন	বেনাপোল
		কাক শাইল	ভুটে স্যালুট
		গাটাইল	ময়নামতি
		ভুটে স্যালুট	মরিচ শাইল
		সাহেব কচি	মনোহর
		জামাই নাড়ু	রানী স্যালুট
		গেড় মুঠি	লোনা কুচি
		গোছা	লাল বালাম
		চিনি আতপ	লাল মোটা
		পলবিড়া	সাদা মোটা
		ক্ষীর কোনো	সাদা বালাম
		বারবিরাশি	সিএম
			হোগলাপাতা
			হরকোচ

সূত্র: ডিডিএই, খুলনা।

সারণি-৫১
খুলনা জেলার ২০১৬-২০১৭ সালে আবাদকৃত রোপা আমন ফসলের জাতভিত্তিক আবাদ ও উৎপাদন

জাত: উফশী

ক্রমিক নং	রোপা আমন	জাতের নাম	আবাদকৃত জমির পরিমাণ(হে.)	কর্তনকৃত জমির পরিমাণ (হে.)	হেক্টর প্রতি গড় ফলন (চাউল/মে. টন)	মোট উৎপাদন (চাউল/মে. টন)
১।	রোপা আমন (উফশী)	বি আর-৫	৩.০০	৩.০০	২.৩৩৩	৭.০০
২।		বি আর-১০	১১৮৯৩.০০	১১৮৯৩.০০	৩.৩৬২	৩৯৯৯৩.০০
৩।		বি আর-১১	৬৭৮৫.০০	৬৭৮৫.০০	৩.২৬১	২২১২৮.০০
৪।		বি আর-২২	৯৬৩.০০	৯৬৩.০০	৩.১০২	২৯৮৮.০০
৫।		বিআর-২৩	২৯৫৩৬.০০	২৯৫৩৬.০০	৩.৩২০	৯৮০৭৪.০০
৬।		ব্রিধান-২৮	৩০৭.০০	৩০৭.০০	৩.১৮৫	৯৭৮.০০
৭।		ব্রিধান-৩০	১০০০৫.০০	১০০০৫.০০	৩.৩৩৭	৩৩৩৯৫.০০
৮।		ব্রিধান-৩৩	৪২০.০০	৪২০.০০	৩.২১৬	১৩৫১.০০
৯।		ব্রিধান-৩৪	১৭৫.০০	১৭৫.০০	২.৫২০	৪৪১.০০
১০।		ব্রিধান-৩৯	৭৯২.০০	৭৯২.০০	৩.০৮৩	২৪৪২.০০
১১।		ব্রিধান-৪০	১৩০.০০	১৩০.০০	২.৩৩৮	৩০৪.০০
১২।		ব্রিধান-৪১	৪৪৩.০০	৪৪৩.০০	২.৫৫৫	১১৩২.০০
১৩।		ব্রিধান-৪৯	৩৪৩৬.০০	৩৪৩৬.০০	৩.০২০	১০৩৭৯.০০
১৪।		ব্রিধান-৫১	৮.০০	৮.০০	২.৭৫০	২২.০০
১৫।		ব্রিধান-৫২	৬০৫.০০	৬০৫.০০	৩.০৭৭	১৮৬২.০০
১৬।		ব্রিধান-৫৩	৬৪.০০	৬৪.০০	৩.১৮৭	২০৪.০০
১৭।		ব্রিধান-৫৪	৮৮.০০	৮৮.০০	৩.১৪৭	২৭৭.০০
১৮।		ব্রিধান-৫৬	৮০.০০	৮০.০০	২.৭৬২	২২১.০০
১৯।		ব্রিধান-৫৭	৭.০০	৭.০০	৩.০০০	২১.০০
২০।		ব্রিধান-৬২	১৫৮.০০	১৫৮.০০	২.৪৮৬	৩৯০.০০
২১।		ব্রিধান-৭২	৩.০০	৩.০০	৩.৩৩৩	১০.০০
২২।		বিনাধান-৭	৭৯৯.০০	৭৯৯.০০	৩.১৬৮	২৫৩২.০০
২৩।		স্বর্ণা	৩৫০.০০	৩৫০.০০	৩.০৭১	১০৭৫.০০
		মোট	৬৭০৫০.০০	৬৭০৫০.০০	৩.২৮৪	২২০২২৬.০০
১।	রোপা আমন (স্থানীয়)	আশফল	৪৪৯.০০	৪৪৯.০০	২.৪২০	১০৮৭.০০
২।		উড়ি চ্যাডরা	৪৭.০০	৪৭.০০	১.৮৫১	৮৭.০০
৩।		কলমিলতা	১০.০০	১০.০০	১.৯০০	১৯.০০
৪।		কাচড়া	৩২০৭.০০	৩২০৭.০০	১.৯৮৯	৬৩৭৯.০০
৫।		কার্তিক শাইল	২০.০০	২০.০০	১.৮০০	৩৬.০০
৬।		কালোজিরা	৭৮.০০	৭৮.০০	১.৩৫৮	১০৬.০০
৭।		কৈঝুরি	২৮৫.০০	২৮৫.০০	২.০৯৪	৫৯৭.০০
৮।		কুমড়া গোড়	৮১২.০০	৮১২.০০	১.৮৩৮	১৪৯৩.০০
৯।		খিরকোনো	২৪.০০	২৪.০০	১.৫৮৩	৩৮.০০

ক্রমিক নং	রোপা আমন	জাতের নাম	আবাদকৃত জমির পরিমাণ(হে.)	কর্তনকৃত জমির পরিমাণ (হে.)	হেক্টর প্রতি গড় ফলন (চাউল/মে. টন)	মোট উৎপাদন (চাউল/মে. টন)
১০।		খেক শাইল	৪০.০০	৪০.০০	১.৮০০	৭২.০০
১১।		খেজুর ছড়ি	৩২০.০০	৩২০.০০	২.০৫৩	৬৫৭.০০
১২।		গেড়োমুটি	১২০.০০	১২০.০০	১.৯৫০	২৩৪.০০
১৩।		ঘুনশি	১০২৮.০০	১০২৮.০০	২.০৯৮	২১৫৭.০০
১৪।		চিনি কানাই	৬৩৬.০০	৬৩৬.০০	১.৫৮৬	১০০৯.০০
১৫।		চাপাইল	১২১২.০০	১২১২.০০	১.৮৪০	২২৩১.০০
১৬।		ছত্রাভোগ	১৫০.০০	১৫০.০০	১.৮৭৩	২৮১.০০
১৭।		জাবড়া	৬২.০০	৬২.০০	১.৯৫১	১২১.০০
১৮।		জামাইনাড়ু	২৭.০০	২৭.০০	২.০০০	৫৪.০০
১৯।		জটাই বালাম	৩৪৬১.০০	৩৪৬১.০০	২.০৪৩	৭০৭৩.০০
২০।		ঝুমুর বালাম	২০.০০	২০.০০	১.৪০০	২৮.০০
২১।		ঝুর	১৫.০০	১৫.০০	১.৩৩৩	২০.০০
২২।		ডেপো	১০.০০	১০.০০	১.৯০০	১৯.০০
২৩।		দুধকলম	২০৮.০০	২০৮.০০	১.৭৯৩	৩৭৩.০০
২৪।		বজ্রমুড়ি	১৭৫.০০	১৭৫.০০	১.৮০০	৩১৫.০০
২৫।		বাঁশমতি	১৫০.০০	১৫০.০০	১.৬৬৬	২৫০.০০
২৬।		বাঁশফুল বালাম	৬৮৮.০০	৬৮৮.০০	১.৯২৮	১৩২৭.০০
২৭।		বেনাপোল	১০০৫.০০	১০০৫.০০	২.০৭৮	২০৮৯.০০
২৮।		ভুটে স্যালুট	১৯০.০০	১৯০.০০	২.০৪৭	৩৮৯.০০
২৯।		ময়নামতি	৭২০.০০	৭২০.০০	১.৮৬৯	১৩৪৬.০০
৩০।		মরিচ শাইল	৩৩৯০.০০	৩৩৯০.০০	১.৯৫৪	৬৬২৬.০০
৩১।		রানী স্যালুট	১৫৩২.০০	১৫৩২.০০	১.৮৮৪	২৮৮৭.০০
৩২।		লোনা কুচি	১০১০.০০	১০১০.০০	২.১০০	২১২১.০০
৩৩।		লাল বালাম	২০৫.০০	২০৫.০০	১.৭৫১	৩৫৯.০০
৩৪।		লাল মোটা	২৪০.০০	২৪০.০০	২.০০০	৪৮০.০০
৩৫।		সাদা মোটা	১৩৯০.০০	১৩৯০.০০	২.১০০	২৯২০.০০
৩৬।		সাদা বালাম	৪৮৫.০০	৪৮৫.০০	১.৯৩৬	৯৩৯.০০
৩৭।		সি এম	৮৫.০০	৮৫.০০	১.৮৪৭	১৫৭.০০
৩৮।		হরকোচ	৬৫.০০	৬৫.০০	২.৬৩০	১৭১.০০
৩৯।		হোগলাপাতা	১০০৪.০০	১০০৪.০০	১.৯৭০	২০০০.০০
৪০।		মোট:	২৪৫৭৫.০০	২৪৫৭৫.০০	১.৯৭৫	৪৮৫৪৭.০০

জাত: বোনা আমন

ক্রমিক নং	বোনা আমন	জাতের নাম	আবাদকৃত জমির পরিমাণ(হে.)	কর্তনকৃত জমির পরিমাণ (হে.)	হেক্টর প্রতি গড় ফলন (চাউল/মে. টন)	মোট উৎপাদন (চাউল/মে. টন)
১।	বোনা আমন	উড়িচেদরা	১৯৫৫.০০	১৯৫৫.০০	১.০৭	২১০১.০০
২।		কালামোনা	১৯০.০০	১৯০.০০	১.০০	১৯০.০০
৩।		কুরমানি	৯০.০০	৯০.০০	০.৮০	৭২.০০
৪।		গৌরকাজল	৮৫.০০	৮৫.০০	১.০০	৮৫.০০
৫।		জয়না	৯৭৫.০০	৯৭৫.০০	১.০০	৯৮০.০০
৬।		জাবড়া	৯১৫.০০	৯১৫.০০	১.২০	১০৯৯.০০
৭।		ড্যাপো	১১৫.০০	১১৫.০০	১.৩৫	১৫৫.০০
৮।		দিঘা	৮০.০০	৮০.০০	০.৯০	৭২.০০
৯।		বীরপালা	১৩৬০.০০	১৩৬০.০০	১.০০	১৩৬০.০০
১০।		বান্দর জটা	১১০.০০	১১০.০০	১.১০	১২১.০০
১১।		ভেদড়	৯৫.০০	৯৫.০০	১.০০	৯৫.০০
১২।		রাজামোড়ল	১৯০.০০	১৯০.০০	১.৩০	২৪৭.০০
		মোট:	৬১৬০.০০	৬১৬০.০০	১.০৬৭	৬৫৭৭.০০

সূত্র: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, খুলনা

সারণি-৫২

২০১৬-২০১৭ সালে খরিপ-১ মৌসুমে ফসলওয়ারি শাক-সবজির আবাদ ও উৎপাদন

ক্র. নং	শাক-সবজির নাম	আবাদকৃত জমি (হেক্টরে)	কর্তনকৃত জমি (হেক্টরে)	হেক্টর প্রতি গড় ফলন	মোট উৎপাদন (মে.টন)
১।	করলা	৫০৪.০০	৫০৪.০০	১৫.৮৭৬	৮০০২.০০
২।	কাকরোল	১৯.০০	১৯.০০	১১.০০	২০৬.০০
৩।	চালকুমড়া	২৬৭.০০	২৬৭.০০	১৮.০০	৪৭২৯.০০
৪।	চিচিঙ্গা	২৫২.০০	২৫২.০০	১২.০০	২৯৫২.০০
৫।	ঝিঙ্গা	২৮৩.০০	২৮৩.০০	১২.০০	৩৪৮৮.০০
৬।	ডাঁটাশাক	৩৩৪.০০	৩৩৪.০০	১২.০০	৩৮৭০.০০
৭।	ঢ্যাঁড়শ	৪৮০.০০	৪৮০.০০	১৩.০০	৬০৮৮.০০
৮।	ধুন্দল	৯৯.০০	৯৯.০০	১২.০০	১১৭৮.০০
৯।	পটল	১৩১.০০	১৩১.০০	১৮.০০	২৩৬৫.০০
১০।	পুঁইশাক	৪২০.০০	৪২০.০০	৩১.১৯০	১৩১০০.০০
১১।	বেগুন	৫২৭.০০	৫২৭.০০	২৩.০০	১২০৫২.০০
১২।	বরবটি	২০৫.০০	২০৫.০০	১৩.০০	২৭৩২.০০
১৩।	মিষ্টিকুমড়া	৪৪০.০০	৪৪০.০০	২২.০০	৯৮৮৮.০০
১৪।	লালশাক	১৫৪.০০	১৫৪.০০	৬.০০	৯৩২.০০
১৫।	লাউ	২৭২.০০	২৭২.০০	২৪.০০	৬৫৯০.০০
১৬।	শশা	১৬২.০০	১৬২.০০	১৬.০০	২৬৫৯.০০
১৭।	পেঁপে	১৭৪.০০	১৭৪.০০	২৭.০০	৪৬৭৬.০০

ক্র. নং	শাক-সবজির নাম	আবাদকৃত জমি (হেক্টরে)	কর্তনকৃত জমি (হেক্টরে)	হেক্টর প্রতি গড় ফলন	মোট উৎপাদন (মে.টন)
১৮।	লতিরাজ	২৩.০০	২৩.০০	১৭.০০	৪০৩.০০
১৯।	ওলকচু	১৭৬.০০	১৭৬.০০	১৮.০০	৩১৬৯.০০
২০।	পানিকচু	৬২.০০	৬২.০০	২৩.০০	১৪২০.০০
২১।	মানকচু	১১৯.০০	১১৯.০০	২০.০০	২৩৪৩.০০
২২।	মুখীকচু	১৭৪.০০	১৭৪.০০	১৫.০০	২৬৩৭.০০
২৩।	গেমীকুমড়া	১৩.০০	১৩.০০	১১.০০	১৪০.০০
২৪।	কাঁচকলা	৮৩.০০	৮৩.০০	১৯.১৪৪	১৫৮৯.০০
২৫।	ঘিকাঞ্চন	৭.০০	৭.০০	৭.০০	৪৭.০০
	মোট:	৫৩৮০.০০	৫৩৮০.০০	১৮.০৭৭	৯৭২৫৫.০০

সূত্র: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, খুলনা।

সারণি-৫৩

২০১৬-২০১৭ সালে রবি মৌসুমে শাক-সবজির আবাদ ও উৎপাদন

ক্র. নং	শাক-সবজির নাম	আবাদকৃত জমি (হেক্টরে)	কর্তনকৃত জমি (হেক্টরে)	হেক্টর প্রতি গড় ফলন	মোট উৎপাদন (মে.টন)
১।	লালশাক	৫০৪.০০	৫০৪.০০	৭.০৩৭	৩৫৪৭.০০
২।	ঘৃতকাঞ্চন	২৪৮.০০	২৪৮.০০	৬.৭৪১	১৬৭২.০০
৩।	গিমা কলমি	১১.০০	১১.০০	১০.৬৩৬	১১৭.০০
৪।	পালংশাক	৪২৮.০০	৪২৮.০০	১১.৫৯৮	৪৯৬৪.০০
৫।	সীম	৪৮৯.০০	৪৮৯.০০	১১.৭২৮	৫৭৩৫.০০
৬।	মুলা	৩৫৪.০০	৩৫৪.০০	২৬.৩৯৮	৯৩৪৫.০০
৭।	টমেটো	৮৪৫.০০	৮৪৫.০০	২০.৮৩০	১৭৬০২.০০
৮।	বাঁধাকপি	২৯৪.০০	২৯৪.০০	৩৪.০২০	১০০০২.০০
৯।	ফুলকপি	৪১২.০০	৪১২.০০	২৩.৬৫৫	৯৭৪৬.০০
১০।	ওলকপি	৫২৭.০০	৫২৭.০০	২৪.৯৩৯	১৩১৪৩.০০
১১।	বেগুন	৭০৭.০০	৭০৭.০০	২৪.৭৩২	১৭৪৮৬.০০
১২।	লাউ	৩৫৬.০০	৩৫৬.০০	২৭.১৬২	৯৬৭০.০০
১৩।	লাউ ডগার শাক	১৩৬.০০	১৩৬.০০	১৬.৫৮৮	২২৫৬.০০
১৪।	গাজর	১৯.০০	১৯.০০	১৩.৫৭৮	২৫৮.০০
১৫।	শশা	৫৭.০০	৫৭.০০	১৩.০১৭	৭৪২.০০
১৬।	মিষ্টি কুমড়া	২৫৫.০০	২৫৫.০০	২৪.০৩১	৬১২৮.০০
১৭।	বরবটি	১৩১.০০	১৩১.০০	১০.১০৬	১৩২৪.০০
১৮।	কাঁচকলা	২০১.০০	২০১.০০	১৯.০৫৪	৩৮৩০.০০
১৯।	সাজনা	৪৫.০০	৪৫.০০	১০.০৪৪	৪৫২.০০
২০।	উচ্ছে	২২৮.০০	২২৮.০০	১০.৬৮৮	২৪৩৭.০০
২১।	পেঁপে	১৬৭.০০	১৬৭.০০	২৪.৫৬২	৪১০২.০০
২২।	ডাঁটা শাক	১৪৬.০০	১৪৬.০০	১২.৫৯০	১৮৩৯.০০
	মোট:	৬৫৬০.০০	৬৫৬০.০০	১৯.২৬৭	১২৬৩৯৭.০০

সূত্র: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, খুলনা।

ধানের ক্ষেত্রে এ জাতগুলোর পরিবর্তনের ফলে যেমন ফলন বাড়ছে তেমনি লবণ সহিষ্ণুতাও বাড়ছে। ফলমূল ও শাক সবজির ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন এসেছে। ফলের মধ্যে একসময় নারকেল ও সুপারি বিখ্যাত ছিল। তার পাশাপাশি আম, কুল, সফেদা, পেয়ারাসহ অন্যান্য ফলের চাষ হচ্ছে। শাক সবজিতে এক সময় খুবই ঘাটতি ছিল। বর্তমানে সবজিতে হাইব্রিড জাতের প্রচলন হওয়া এবং ঘেরের পাড়ে সবজি চাষ হওয়ায় ব্যাপক সবজির উৎপাদন বাড়ছে। খুলনার কৃষিতে বোরো মৌসুমে সেচের পানির কিছুটা সংকট থাকায় বোরো ধানের চাষ কিছুটা কমছে। আউশ ধান চাষাবাদের দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। সেচের জন্য মিষ্টি পানির আঁধার হিসেবে খাল ও পুকুর খনন করে তাতে সেচের পানি সংরক্ষণ করে সেচ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। খরা ও লবণ সহিষ্ণু ফসল যেমন তিল, সূর্যমুখী, তরমুজ, মুগডাল এই সকল ফসলের চাষাবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ আন্দোলনে সকল ক্ষেত্রে যে-সব পরিবর্তন এসেছে কৃষি ক্ষেত্রে তার ছোঁয়া লেগেছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরসহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের বেশ কয়েকটি ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে। যে কোনো কৃষক, আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ঘরে বসে ওয়েবসাইট ব্যবহার করে জমিতে সার ব্যবহারের সুপারিশ ও কৃষি প্রযুক্তিসহ যে-কোনো তথ্য পেতে পারেন।

কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য বেশ কয়েকটি প্রকল্প কাজ করছে। কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর ও কৃষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প দিঘলিয়া ও দাকোপ উপজেলায় কৃষকদের সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী দিয়ে যাচ্ছে। লবণাক্ত পতিত এলাকায় চাষ উপযোগী ফসল ও প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে সময়োপযোগী প্রকল্প বিদ্যমান আছে। পরিবেশ ঠিক রেখে ফসল উৎপাদনের জন্য আইপিএম ও আইএফএমসিসহ অন্যান্য প্রকল্পের কাজ চলছে। ভরা মৌসুমে কৃষি শ্রমিক ও হালের বলদের অভাব পূরণের জন্য খামার যান্ত্রিকীকরণের সাহায্যে ফসল উৎপাদন প্রকল্পের কাজ চলছে। বর্তমানে শতকরা ৯৮ ভাগ জমি পাওয়ার টিলার ও ট্রাক্টর দিয়ে চাষ হচ্ছে। ধান মাড়াই শতকরা ৯০ ভাগই পাওয়ার থ্রেসার ও প্যাডেল থ্রেসার দিয়ে চলছে। ফসল কর্তন ও ধান রোপণের কাজে কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার এরইমধ্যেই শুরু হয়েছে।

সারণি-৫৪

জেলার কৃষি খাতে বর্তমানে গৃহীত প্রকল্পসমূহ

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পভুক্ত উপজেলার নাম	ফসলের নাম	২০১৭-১৮	
				লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত
১	চাষি পর্যায়ে আধুনিক জাতের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প	মেট্রোথানা দৌলতপুর, মেট্রোথানা লবণচরা, রূপসা, বটিয়াঘাটা, দিঘলিয়া, ফুলতলা, ডুমুরিয়া, তেরখাদা, দাকোপ, পাইকগাছা ও কয়রা।	গম	২৭০	২৫০
			গম	৬০	৬০

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পভুক্ত উপজেলার নাম	ফসলের নাম	২০১৭-১৮	
				লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত
২	চাষি পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প	মেট্রোথানা দৌলতপুর, মেট্রোথানা লবণচরা, রূপসা, বটিয়াঘাটা, দিঘলিয়া, ফুলতলা, ডুমুরিয়া, তেরখাদা, দাকোপ, পাইকগাছা ও কয়রা।	সরিষা	৬০	৬০
			মসুর	১০	১০
			খেসারি	১০	১০
			ফেলন	১	১
৩	রাজস্ব	মেট্রোথানা দৌলতপুর, মেট্রোথানা লবণচরা, রূপসা, বটিয়াঘাটা, দিঘলিয়া, ফুলতলা, ডুমুরিয়া, তেরখাদা, দাকোপ, পাইকগাছা ও কয়রা।	বোরো	৮০	৮০
			ভুট্টা	১০০	১০০
			বাদাম	১০	১০
			বিটি বেগুন	৭০	৭০
			ভার্মি	১৬০	১৬০
			লাইট ট্রাপ	৩০	৫
৪	এন এ টি পি	বটিয়াঘাটা, ডুমুরিয়া, পাইকগাছা ও রূপসা	RYGM	৭	৬
			ভার্মি	২১	২১
			অন্যান্য	১৬২	১৫২
৫	বু-গোল্ড কর্মসূচির আওতায় কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প।	বটিয়াঘাটা, ডুমুরিয়া ও পাইকগাছা।	প্রশিক্ষণ, কৃষকমাঠ স্কুল	০	
৬	আইএফএমসি	বটিয়াঘাটা, দিঘলিয়া, ডুমুরিয়া, তেরখাদা, দাকোপ, পাইকগাছা ও কয়রা।	প্রশিক্ষণ, কৃষকমাঠ স্কুল	০	০
৭	খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	রূপসা ও ডুমুরিয়া		০	০
৮	খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প।	বটিয়াঘাটা, দিঘলিয়া, ডুমুরিয়া, তেরখাদা, দাকোপ, পাইকগাছা ও কয়রা		০	০
৯	উপজেলা পর্যায়ে কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর ও কৃষক প্রশিক্ষণ	দিঘলিয়া ও দাকোপ	প্রশিক্ষণ, কৃষকমাঠ স্কুল	০	০
১০	আইপিএম	রূপসা, বটিয়াঘাটা, দিঘলিয়া, ফুলতলা, ডুমুরিয়া, দাকোপ ও পাইকগাছা।	প্রশিক্ষণ, কৃষকমাঠ স্কুল	০	০
১১	আইসিএম	বটিয়াঘাটা ও দাকোপ	প্রশিক্ষণ, কৃষকমাঠ স্কুল	০	০
	মোট:			১০৫১	৯৯৫

উৎস: ডিডিএই, খুলনা।

খুলনা জেলার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা খুলনা জেলায় পানি নিষ্কাশনের জন্য ২৮৩টি স্লুইস গেট আছে। তন্মধ্যে ২১৫টি স্লুইস গেট পানি নিষ্কাশনের কার্যক্রমে ব্যবহার হচ্ছে এবং ৬৮টি অচল যা মেরামত প্রয়োজন।

(ক) জমির জলাবদ্ধতা

১) তেরখাদা উপজেলার ভূতিয়ার বিলে ৬১৭০ হেক্টর জমিতে জলাবদ্ধতা আছে।

জলাবদ্ধতার কারণ : চিত্রা নদী ও আঠারোবাকী নদী ও বিলের সাথে সংযোগ খালগুলো ভরাট হওয়ার ফলে বিলে পানি নিষ্কাশন না হওয়ায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে।

ক) লবণাক্ততা, খ) জলাবদ্ধতা, গ) সেচের পানি স্বল্পতা, ঘ) ফসলের আবাদযোগ্য জমিতে চিংড়ি চাষ করে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, ঙ) নদ-নদীর নাব্যতা হ্রাস পাওয়া ইত্যাদি।

সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ক) পরিকল্পনার মাধ্যমে রবি এবং খরিপ-১ এর আবাদি পতিত জমি চাষের আওতায় আনা, খ) ঘেরে ধানচাষ ও ঘেরের আইলে সবজি চাষের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা, গ) লবণাক্ত জমিতে লবণসহিষ্ণু ফসলের আবাদ বৃদ্ধি করা, ঘ) নদী খালে মিষ্টি পানি সংরক্ষণ করে শুষ্ক মৌসুমে সেচের পানি সংগ্রহ করে আবাদ বৃদ্ধি করা, ঙ) লবণাক্ত এলাকায় সেচের পানি সংরক্ষণের জন্য পুকুর, খাল, নদী খনন ও পুনর্খনন করা, চ) খুলনা জেলার সকল পোল্ডার এলাকার স্লুইস গেটগুলো মেরামতের মাধ্যমে কার্যকরী করে তোলা, ছ) জলাবদ্ধতা নিরসণের জন্য খাল ও নদী খনন করা, জ) মাছ চাষ ও ফসল চাষে মতদ্বৈততা নিষ্পত্তি করা, ঝ) ফসলের মূল্য সংযোজন প্রক্রিয়া উন্নত করা। (Value Chain Development)

সারণি-৫৫

লবণাক্ত এলাকায় নতুন ফসলের নাম ও এলাকা

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	আবাদকৃত জমি (হেক্টর)				
		২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	ব্রিধান-৪৭	১,১৯৭	১,১৩১	৩৯৪	২৪৭	২২৬
২	ব্রিধান-৫৫	০০	০০	০০	৮৩	১৮৮
৩	বিনাধান-৮	০০	৩৫	৩৩৫	২৮৫	৪১৯
৪	বিনাধান-১০	০০	০০	০০	১০	১৮১
৫	তিল	৩,৩৫১	৭,৫০০	১১,৯৬০	১১,২৮৫	১১,৭১০
৬	মুগ	৭৭০	১,২৪০	১,২৪৫	১,৩৫৫	১,২৮৫
৭	তরমুজ	৭৫৫	৮০৫	১,৫৬১	২,৬৩৬	৩,৪৬৮
৮	ভুট্টা	০০	২০	১২২	২১	৭২
৯	সূর্যমুখী	০০	০০	০০	০০	৪০৩

উৎস: ডিডিএই, খুলনা।

২০০৯ -১৪ সালে কৃষি ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যসমূহ

ক) খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ৭২৬৭১ মে.টন (১৯% বেশি)। খ) মানসম্মত বীজ ব্যবহার বৃদ্ধি ৩০০ মে.টন (৬০% বেশি)। গ) অধিক ফসল উৎপাদনের উদ্দেশ্যে নন-ইউরিয়া সার ব্যবহার বৃদ্ধি ২,৮৩১ মে.টন (১৩১ % বেশি)। ঘ) ১,৭৪,০৭১ কৃষকের মাঝে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ। ঙ) কৃষকপ্রতি মাত্র ১০/- টাকায় ১,০০,০২৬ জন কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা। চ) কৃষি পুনর্বাসন/ প্রণোদনা কর্মসূচিতে ৮০০১ জন কৃষককে ৮২,০৬,৬২৯ টাকার সহায়তা প্রদান। ছ) সেচ কাজে ডিজেলে ভর্তুকি হিসেবে ৯৯,৮৪৮ জন কৃষককে ৮,১৮,৫২,৪৮০ টাকা নগদ সহায়তা প্রদান। জ) খামার যান্ত্রিকীকরণে ২৫% ভর্তুকি মূল্যে মোট ৩২২টি কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ। ঝ) বিভিন্ন নতুন প্রযুক্তির ওপর ৯২,৮০০ জন কৃষক-কৃষানিকে প্রশিক্ষণ প্রদান। ঞ) ৩৯৩টি আইপিএম/আইসিএম ক্লাব, ৪৬০টি সিআইজি ক্লাব ও ৩৪টি ফিয়াক সেন্টার স্থাপন। ট) লবণাক্ত জমিতে তিলের চাষ সম্প্রসারণ ১১,২৮৫ হেক্টর (বৃদ্ধি ২২৭%)। ঠ) ঘেরের আইলে উন্নত জাতের কুল চাষ সম্প্রসারণ ৪২ হেক্টর (বৃদ্ধি ৪২৫%)। ড) লবণাক্ত জমিতে তরমুজের চাষ সম্প্রসারণ ৩,৪৬৮ হেক্টর (বৃদ্ধি ৩০৫%)। ঢ) লবণসহিষ্ণু উন্নত জাতের ধান (বিআর- ২৩, ব্রিধান-৪০, ব্রিধান-৪১, ব্রিধান-৪৭, ব্রিধান-৫৫ ও বিনা-৮, বিনা-১০) আবাদ ৩৪,৪০০ হেক্টর (বৃদ্ধি ২৫%)। ণ) গুটি ইউরিয়া সারের ব্যবহার বৃদ্ধি ৪৯,৬৭৫ হেক্টর। বিনামূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ ৩০০টি। ত) গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ সম্প্রসারণ ৬.৪৮ হেক্টর (বৃদ্ধি ৩৬০%)। থ) খুচরা সার বিক্রেতা নিয়োগ ৫০৮ জন।

মৎস্যসম্পদ

খুলনা জেলার অধিকাংশ জায়গাজুড়ে ছিল বিল আর প্লাবনভূমি। বিল ডাকাতিয়া, বিল পাবলা, বিল ভায়না, বিল বাসুখালি, কোলা, সিলিমপুর, সিংয়ের বিল, উত্তরের ও পশ্চিমের বিল ইত্যাদি নাম জেলায় বিলের প্রাচুর্যতার প্রমাণ বহন করে চলেছে। আর জোয়ারভাটাবিধৌত বিশাল প্লাবনভূমির কথা সবারই জানা। এসব বিল ও প্লাবনভূমিই ছিল মাছের অবাধ বিচরণ, লালন ও পালন ক্ষেত্র। তাই, খুলনা জেলা একসময় ছিল মাছে মাছে ঠাসা। কিন্তু জেলার নদনদী, খালবিল ও প্লাবনভূমির অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে জেলার প্রাকৃতিক মাছের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যের ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। প্রাকৃতিক জলাশয় যেমন হারিয়ে গেছে, হারিয়ে যাচ্ছে; তেমনি হারিয়ে গেছে ও যাচ্ছে মাছের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য। তবে, ইতোমধ্যে কৃত্রিমভাবে চাষের প্রচলন ও ধরন বেড়েছে। দিন দিন চাষ পদ্ধতির উন্নয়ন হচ্ছে। বাড়ছে মাছের উৎপাদন। স্থানীয় জেলা মৎস্য দপ্তরের বর্তমান পরিসংখ্যান অনুযায়ী খুলনা জেলা এখন মাছে উদ্বৃত্ত জেলা। জন প্রতি দৈনিক ৫০ গ্রাম হিসেবে খুলনা জেলায় বছরে মাছের প্রয়োজন হয় ৫২ হাজার মেট্রিক টন যার বিপরীতে উৎপাদন হয় প্রায় ৬২ হাজার মেট্রিক টন।

খুলনা জেলার মাছের উৎস

প্রাকৃতিক ও চাষ উভয় উৎস হতে খুলনা জেলায় মাছ পাওয়া যায়। তবে মাছের এই উৎসকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়।

১. প্রাকৃতিক উৎসের মাছ।

২. চাষের মাধ্যমে উৎপাদিত মাছ।

ষাটের দশক পর্যন্তও প্রাকৃতিক জলাশয় যেমন খালবিল, নদনদী ও প্লাবনভূমি ছিল মাছের প্রধান উৎস। ষাট দশকের শেষভাগ ও সত্তর দশকে উপকূলীয় বেড়িবাঁধ নির্মাণ শেষে প্রাকৃতিক উৎসের মাছ কমতে থাকে। বর্তমানে সিংহভাগ মাছ আসে চাষ থেকে। চিংড়ি ঘেরই এখন মাছের প্রধান উৎস। খুলনা জেলায় উৎপাদিত মোট মাছের প্রায় শতকরা ৫৯ ভাগ বা অর্ধেকেরও বেশি মাছ আসে চিংড়ি ঘের থেকে।

খুলনার প্রাকৃতিক মাছ

নদনদী, মোহনা ও সাগর খুলনা জেলায় মাছের অন্যতম প্রধান প্রাকৃতিক উৎস হিসেবে স্বীকৃত। একসময় খুলনা জেলা মাছের প্রাকৃতিক উৎস হিসেবে ছিল অতি সমৃদ্ধ। মাছে মাছে ভরা ছিল খুলনার নদনদী, খালবিল ও প্লাবনভূমি। নানা জাতের মাছের ভাণ্ডার ছিল খুলনা জেলা। খুলনার মাছের জাত বৈচিত্র্য ছিল বড়োই বৈচিত্র্যময়। এখানে যেমন পাওয়া যেত হালকা, মধ্যম ও কড়া নোনা পানির মাছ। এসব মাছকে আধালোনা পানির মাছ বলা হয়। বিওবিপির গবেষণায় প্রায় ১২০ প্রজাতির আধালোনা পানির মাছের সন্ধান মেলে। এ ছাড়াও খুলনা জেলায় মিষ্টি পানির মাছেরও কমতি ছিল না। খুলনা জেলায় প্রচুর বিল ছিল। আজকাল বাস্তবে এসব বিলের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া না গেলেও অধিকাংশ আবাদি এলাকার মাঠের নামের আগে এখনও বিল শব্দটি ব্যবহার হতে দেখা যায়। চৈত্র-বৈশাখ মাসেও এসব বিল শুকাত না। সে কারণে মাছ ছাড়া আর অন্য ফসল সম্ভব ছিল না। ক্রমান্বয়ে এসব বিলে ধান আবাদের সুযোগ তৈরি হয়। উজানের বেড়িবাঁধ ও উপকূলীয় বেড়িবাঁধের কারণে উপকূলীয় নদনদীর নাব্যতা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। ক্রমান্বয়ে উপকূলীয় বেড়িবাঁধের ভেতরের জমি জলাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। ১৯৮৮ সালের বন্যার পর খুলনার অধিকাংশ বিল জলাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এ অবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে চাষিরা গলদা চিংড়ি চাষের প্রবর্তন করে। এখন উত্তর খুলনায় প্রায় সর্বত্রই পর্যায়ক্রমিক ধান ও গলদা চিংড়ি চাষের প্রচলন হয়েছে। একসময় ভূতের বিল ও বিল বাসুখালিসহ অন্যান্য বিলে সারা বছর পানি থাকত। বিলে এ পানিতে মা মাছ বড়ো হওয়ার ও বংশ বিস্তারের সুযোগ পেত। ফলে এসব বিলে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। বেড়িবাঁধের পরে পরপর কয়েক বছর এসব বিলে ভালোভাবে ধানের আবাদ হয়েছে। বর্তমানে এসব বিলে বেড়িবাঁধের সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাবে আবার জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়।

বিলডাকাতিয়া এলাকার সবচেয়ে বড়ো বিল ছিল। বিলের সাথে খাল ও নদীর সংযোগ ছিল। ময়ূর নদী ও শোলমারি নদী বরাবর পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বেড়িবাঁধ দেওয়ায় কিছু দিন ফসল উৎপাদনের উপযোগী হলেও বেড়িবাঁধের নেতিবাচক প্রভাবে তা একসময় স্থায়ী জলাবদ্ধতায় রূপ নেয়। এলাকার সংগ্রামী মানুষ এ বিরূপ অবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে পেরেছে। তাঁরা গলদা চিংড়ির চাষ করে জলাবদ্ধতাকে জয় করেছে।

উত্তর খুলনার সর্বত্র এখন গলদা চিংড়ির চাষ হয়। এসব এলাকায় সর্বত্র এখন চলে এক জমিতেই ধান, সবজি, মাছ ও চিংড়ি চাষ।

খুলনার সকল অঞ্চলের জমি, জল ও জলবায়ু এক রকম নয়। কোনো কোনো এলাকায় কড়া নোনাপানি, কোনো কোনো এলাকায় মাঝারি নোনাপানি, কোনো কোনো এলাকায় হালকা নোনাপানি আবার কোনো কোনো এলাকায় একেবারেই মিষ্টি পানি। কোনো কোনো এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে নদনদীসহ সর্বত্র নোনাপানি; আবার বর্ষাকালে সেই পানি মিষ্টি হয়ে যায়। মূলত এসব কারণে ফসল বৈচিত্র্যে রয়েছে ভিন্নতা। ওই সমস্ত এলাকায় এই শুষ্ক মৌসুমে চারধারে এবং ভূগর্ভস্থ পানিতে লবণের মাত্রা এত বেশি যে কোনোক্রমেই এই মৌসুমে ধান চাষ সম্ভব নয়। তাই তারা এই মৌসুমে জমি ফেলে না রেখে বাগদা চিংড়ির চাষ করে। বর্ষার আগমনে জমি বর্ষার পানিতে বার বার ধুয়ে লবণমুক্ত হয়ে গেলে ধানচাষ করে। ওই এলাকার মানুষ হিসেবে তাদের অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে এই ফসল চক্র তারা রপ্ত করেছে। বলাবাহুল্য, উপকূলীয় অঞ্চলে ধান অথবা চিংড়ি চাষের জন্য আলাদা কোনো জমি বা জলাশয় নেই। চাষিরা প্রকৃতির স্বাভাবিক জোয়ারভাটাকে কাজে লাগিয়ে শুষ্ক মৌসুমে মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া ইত্যাদি ফসলের আবাদ করে। আবার একই জমিতে বর্ষাকালে ধানের আবাদ করে। গলদা চিংড়ি এলাকায় ঘেরের পাড়ে শাকসব্জির আবাদ চলে। উঁচু জমিতেই ফল ফলাদি ও সবজি আবাদ চলে।

প্রাকৃতিক উৎসের মাছ দিন দিন কমে আসছে। সত্তরের দশক থেকে ধীরে ধীরে বাগদা চিংড়ির চাষ বাড়তে থাকে। সনাতনী ধারার জোয়ারভাটার চিংড়ি চাষে চিংড়ির খামারে তখন পর্যাপ্ত সাদা মাছ পাওয়া যেত। বিশেষ করে বাগদা খামারে নোনা ট্যাংরা, পারশে, ভেটকি, ভাঙ্গান ও নানা জাতের চিংড়ি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। উত্তর খুলনার প্রায় সব মাঠেই এখন গলদা চিংড়ির খামার গড়ে উঠেছে। এসব খামার এখন এ জেলার রুই, কাতলা জাতীয় মাছের অন্যতম প্রধান উৎস। খর্ণিয়া, ডুমুরিয়া, শাহপুর এলাকার রুই ও কাতলা মাছ এখন খুলনার চাহিদা মিটিয়ে দেশের অন্যত্র চালান হয়ে থাকে।

বিএসকেবি বিল

বাসুখালী, সিলিমপুর, কোলা ও বোরনাল চারটি বড়ো বিল ও এর সংলগ্ন প্লাবনভূমির সংক্ষিপ্ত নাম বিএসকেবি বিল। খুলনা জেলার দিঘলিয়া, তেরখাদা

ও রূপসা উপজেলার প্রায় ২০ হাজার হেক্টর প্লাবনভূমি নিয়ে এর অধিক্ষেত্র। নব্বইয়ের দশকের প্রথমার্ধে বাস্তবায়িত তৃতীয় মৎস্য প্রকল্প এই বিশাল প্লাবনভূমির নামকরণ করে বিএসকেবি। আজও এই প্লাবনভূমিটি বিএসকেবি নামে পরিচত। এই বিল পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেড়িবাঁধের আগে এ বিলে অবাধ জোয়ারভাটা বইত। এ সময় নানা জাতের দেশি পুঁটি, ট্যাংরা, কাকিলা, চান্দা, চাপিলা, খলিশা, কৈ, শোল, টাকি, শিং, মাগুর, পাবদা, ফলি, রয়না, বোয়াল, সরপুঁটি, পাতারি, গোদা চিংড়ি, গলদা চিংড়ি, বেলে, চেলা, ঢেলা, ডিমওয়ালা চিংড়ি, ঘাড়ুয়া, বাচা ইত্যাদি নদীর মাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। বাসুখালি, পদ্মাগাড়ি, কাতলামারি, ঠ্যাঙ্গার নাল, সিলিমপুর, বোরনাল বেশ বড়ো। বড়ো বিলে শুষ্ক মৌসুমে পর্যাপ্ত পানি থাকত। সেসব বিলে প্রচুর পরিমাণ মা মাছ থাকত। এ কারণে বর্ষাকালে বিলে প্রচুর পরিমাণ মাছ হতো। বেড়িবাঁধ/পোল্ডার পরবর্তী সময়ে এ মাছের প্রাচুর্যতার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে চলেছে। এখন এসব বিলের অস্তিত্ব যেমন হারিয়ে যেতে বসেছে তেমনি হারিয়ে গেছে বা যাচ্ছে খুলনার মাছের ভাণ্ডার হিসেবে খ্যাত বিএসকেবি বিল। প্রাচুর্য কমেছে প্রায় সব মাছের। হারিয়ে গেছে সরপুঁটি ও নানাজাতের নদীর মাছ।

পোনা মাছ উৎপাদন: মাছ চাষের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো ভালো পোনা। পোনা আসে হ্যাচারি ও নার্সারি হতে। জেলায় কার্পজাতীয় মাছের হ্যাচারি ৪টি। এসব হ্যাচারি থেকে বছরে ৬,৭০৩ কেজি কার্পজাতীয় মাছের রেণু উৎপাদিত হয়। খুলনা জেলায় প্রায় ৫০০ কার্পজাতীয় মাছের নার্সারি রয়েছে, ৪০০ হেক্টর জলাশয়ে পোনার চাষ হয়। এসব খামারে বছরে প্রায় ২ হাজার মে.ট. পোনা উৎপাদিত হয়। বছরে ২-২.৫ কোটি টাকার আর্থিক লেনদেন হয়ে থাকে। খুলনার চাহিদা মিটিয়েও দেশের অন্যত্র বিশেষ করে বরিশাল ও বরগুনা অঞ্চলে এ পোনা চালান হয়। এছাড়াও এসব খামারে কয়েক হাজার মেট্রিক টন খাবার মাছও উৎপাদন হয়। এসব নার্সারি খামারে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান হয়। বিশেষ করে পোনা চাষ বা বাণিজ্যিক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকের আর্থিক সচ্ছলতা ফিরিয়ে এনেছে। বিশেষ করে দিঘলিয়া উপজেলার বারাকপুর, লাখোহাটি, নারানখালি ও ফুলতলা পোনা চাষের জন্য প্রসিদ্ধ এলাকা। এ এলাকার অর্থনীতি পোনা মাছনির্ভর।

খুলনায় বাণিজ্যিক মাছ চাষ

ইদানীংকালে খুলনায় বাণিজ্যিকভাবে মাছ চাষ শুরু হয়েছে। খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলায় জলমা গ্রামে পাঙ্গাশ, কই ও তেলাপিয়ার বাণিজ্যিক চাষ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ওই এলাকার মরা কাজীবাছা নদীতে এবং সুগন্ধা নদীর তীরজুড়ে এসব খামার গড়ে উঠেছে। এসব খামারে বছরে দুই ফসলে হেক্টর প্রতি প্রায় ৯০ মেট্রিক টন (পাঙ্গাশ) উৎপাদন হয়। ফুলতলা ও ডুমুরিয়ার কিছু খামারে বাণিজ্যিকভাবে তেলাপিয়ার চাষ হয়। খুলনার অনেক নদী ও খাল মরে পুরো বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হয়েছে। এসব জলাশয়ে আজকাল মাছ চাষ

হয়ে থাকে। জেলা মৎস্য দপ্তর খুলনার পরিসংখ্যান মতে, জেলার ৮১০টি খামারে (আয়তন ৮৭৭ হেক্টর) বর্তমানে বাণিজ্যক চাষ চলছে। এসব খামার থেকে বর্তমানে বছরে প্রায় ৫ হাজার মে.ট. মাছ উৎপাদিত হয়।

খুলনা জেলা ও তৎসংলগ্ন সুন্দরবন প্রাণিসম্পদে সমৃদ্ধ। ১৯৫৯ সালে প্রথম কৃত্রিম প্রজনন শুরু হয় পশ্চিম জার্মানির একটা প্রকল্প দিয়ে। তারপর থেকে এদেশে ক্রস ব্রিড গোরু পালন শুরু হয়। বাংলাদেশের পাবনা, সিরাজগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ ও চট্টগ্রামে লোকাল ব্রিড গোরু পাওয়া যায়। খুলনা এলাকাতে মোটামুটি দেশি ও পাবনা জাতীয় গোরুর সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। বর্তমানে খুলনাতে গবাদিপশুর সংখ্যা মোটামুটিভাবে নিম্নরূপ:

সারণি-৫৬

খুলনা জেলার গবাদি পশুর সংখ্যা (২০১৫-১৬ অর্থবছর)

গবাদিপশু (সংখ্যা)						হাঁস-মুরগি(সংখ্যা)		
গোরু	মহিষ	ছাগল	ভেড়া	ঘোড়া	মোট	হাঁস	মুরগি	মোট
৬,৫৪,৩৫২	৯১৫	৩,৪৯,৬৯৪	২১,৫৬৭	১,১৪১	১০,২৭,৬৬৯	১১,৬৫,৫৯৮	৩৯,২১,৪৬৫	৫০,৮৭,০৬৩

সূত্র: জেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

বাংলাদেশের গবাদিপশুর দুধ উৎপাদনক্ষমতা খুবই কম। একটি দেশি গাভী একবার বাচ্চা জন্মদানের পর পরবর্তী বাচ্চা জন্মদান পর্যন্ত মধ্যবর্তী দুগ্ধ প্রদানকালে এ থেকে গড়ে ২০৫ কেজির মতো পাওয়া যায়। এ অঞ্চলের গোরু অপেক্ষা দেশের উত্তরাঞ্চলের গোরু থেকে তুলনামূলকভাবে বেশি দুধ পাওয়া যায়। তবে প্রাণিসম্পদ বিভাগীয় প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কারণে এ অবস্থার দিন দিন পরিবর্তন হচ্ছে। বর্তমান দেশি গোরুর সাথে উন্নত জাতের বিদেশি গোরুর সংকরায়ণের মাধ্যমে দেশি গোরুর উৎপাদনক্ষমতা বাড়ানোর প্রচেষ্টা বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই শুরু হয়েছে; ইতোমধ্যে এর থেকে আশাপ্রদ ফলও পাওয়া যাচ্ছে।

জেলা কৃত্রিম প্রজননকেন্দ্র

বর্তমানে হলিস্টান, ফ্রিজিয়ান, জার্সি, শাহিওয়াল, হরিয়ানা, সিন্ধি ইত্যাদি গোরুর সাথে দেশি জাতের গাভীর সংকরায়ণ করা হচ্ছে। জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, খুলনা অত্যন্ত সফলতার সাথে খুলনা জেলায় এ কার্যক্রমটি পরিচালনা করে যাচ্ছে। ১৯৬৮ সালে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ প্রকল্পের অধীনে দৌলতপুর এলাকার গাইকুড় নামক স্থানে ১.০৯ একর জমির ওপর কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র নামে বর্তমান জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়। পরবর্তী সময়ে আশি'র দশকে এটি জাতীয়করণ করা হয়। বর্তমানে এই কেন্দ্রের উন্নত জাতের ষাঁড় থেকে সিমেন কালেকশন করে বৃহত্তর খুলনা জেলার বিভিন্ন এলাকায় ইউনিয়ন এমনকি গ্রামপর্যায় পর্যন্ত কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমে ব্যবহৃত হচ্ছে। কয়েক দশক

আগে থেকেই উক্ত কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের সুফল জনগণ পেতে শুরু করেছে। একটি দেশি গোরু যেখানে দিনে মাত্র এক থেকে দেড় লিটার দুধ দেয় সেখানে সংকর জাতের একটি গাভী থেকে ২৮ লিটার পর্যন্ত দুধ পাওয়া যচ্ছে। অনুরূপ ভাবে সংকর জাতের একটি ষাঁড় থেকে যেখানে প্রায় ৪০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত মাংস পাওয়া যায় সেখানে একটি দেশি গোরু থেকে সর্বোচ্চ ১০০ কিলোগ্রাম মাংস পাওয়া যায়।

খুলনাঞ্চলে বর্তমানে গোরুর ছোটোবড়ো অনেক খামার গড়ে উঠেছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এ কাজে সর্বোতভাবে সম্ভব সকল প্রকার সহযোগিতা করে যাচ্ছে। গোরু-ছাগলের খাবারের জন্য এলাকার লোকজন প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন ঘাসের ওপরই মূলত নির্ভর করে থাকে। জমিতে, রাস্তার পাশে, পুকুর, মাছের ঘের এর পাড়ে এবং ক্ষেতের আইলে প্রচুর পরিমাণ ঘাস জন্মে থাকে যা গোরু-ছাগলের খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার

হাঁস-মুরগি পালন খুলনা অঞ্চলের মানুষের ঐতিহ্যের সাথে জড়িয়ে আছে। এ কার্যক্রমকে সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে খুলনা শহরের দৌলতপুর এলাকার পাবলা নামক স্থানে ১৯৫৮ সালে কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের অধীনে ৮.৭৫ একর জমির ওপর একটি পোল্ট্রি খামার স্থাপিত হয়। পরবর্তী সময়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ২০/১২/১৯৭৩ সালের এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে দায়সহ এটি তৎকালীন পশুসম্পদ বিভাগে হস্তান্তরিত হয়। পশুসম্পদ বিভাগে হস্তান্তর হওয়ার পর ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত এটি মুরগির খামার হিসেবে পরিচালিত হয়। ১৯৮৬ সালে FAO এবং UNDP এর আর্থিক সহায়তায় স্থানীয় চাহিদার কথা বিবেচনা করে মুরগির খামারটিকে হাঁস প্রজনন খামারে রূপান্তর করা হয়। ১৯৮৭ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত খামারটিতে অবকাঠামোসহ নানাবিধ উন্নয়নকাজ করা হয়।

এ খামারে উন্নত জাতের হাঁসের বাচ্চা উৎপাদন করা হয় এবং স্থানীয় ছাড়াও বৃহত্তর খুলনা জেলায় আগ্রহী হাঁস পালনকারীদের চাহিদা পূরণে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। যার ফলে খুলনাঞ্চলে এক বছরে একটি দেশি জাতের হাঁস যেখানে ৮০-১০০ টি ডিম দেয় সেখানে উন্নত জাতের হাঁস ডিম দেয় ২০০-২৫০টি।

প্রাণিসম্পদ দপ্তরসমূহ

খুলনা জেলায় জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরসহ অধীন সকল উপজেলা দপ্তরই নিজস্ব সরকারি জায়গায় স্থাপিত। এসব দপ্তর হতে প্রাণিসম্পদ সেক্টরের চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপত্র প্রদান, কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমসহ যাবতীয় সেবা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

প্রাণিসম্পদ বিভাগের উক্ত কার্যক্রমের ফলেই বর্তমানে গড়ে উঠেছে সংকর জাতের লেয়ার, ব্রয়লার, ক্রয়লার ও ককের বড়ো বড়ো বাণিজ্যিক খামার যা খুলনার চাহিদাপূরণ করে দেশের বিভিন্ন বাজারে বিক্রয়ের জন্য প্রেরিত হচ্ছে।

বর্তমানে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো খুলনাঞ্চলেও ব্যাপকহারে ব্রয়লার মুরগির খামার গড়ে উঠছে। প্রায় সমসংখ্যায় গড়ে উঠেছে কক্ ও লেয়ার মুরগির খামার। মূলত এলাকার যুবসমাজ এ সব খামারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছে। ফলে একদিকে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে অন্যদিকে এলাকার জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের ঘাটতিপূরণের পাশাপাশি এ সকল খামার থেকে উৎপাদিত ডিম, মাংস দেশের অন্য অঞ্চলে রফতানি হচ্ছে; যা এ এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আত্মকর্মসংস্থান ও প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য দারিদ্র্য বিমোচন, নারী-পুরুষের সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন প্রাণিসম্পদ খাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক বিষয় হলো সরকার বিষয়টি এ খাতের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বআরোপ করেছেন এবং 'ভিশন ২০২১' বাস্তবায়নে এ খাতটিকে বিভিন্ন সহায়তা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

প্রাণিসম্পদ বিভাগ কর্তৃক মাঠপর্যায় পরিচালিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১. অসুস্থ গবাদি-পশু ও হাঁস-মুরগির চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপত্র প্রদান।
২. গবাদি-পশু ও হাঁস-মুরগির টিকাবীজ সরবরাহ/বিক্রয়।
৩. উন্নতজাতের ঘাসের কাটিং/বীজ সরবরাহ।
৪. প্রযুক্তি হস্তান্তরের নিমিত্তে কৃষক প্রশিক্ষণ এবং গবাদি-পশু ও হাঁস-মুরগি পালনসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান।
৫. ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের নিমিত্তে সুফলভোগী নির্বাচন এবং ঋণ বিতরণ ও আদায়।
৬. ব্যক্তি মালিকানাধীন গবাদি-পশু ও হাঁস-মুরগির খামার স্থাপনে উদ্বুদ্ধকরণ ও রেজিস্ট্রেশনকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৭. উন্নত জাতের গবাদি-পশু ও হাঁস-মুরগির খামারি বা কৃষককে অনুদান প্রদান।
৮. কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র/পয়েন্টে আনিত গাভী প্রজননের ব্যবস্থা গ্রহণ, গর্ভবতী গাভীর গর্ভ পরীক্ষাকরণ।
৯. দুধ, ডিম, মাংস উৎপাদন, রফতানি এবং বাজারজাতকরণে রেগুলেটরি অথোরিটি হিসেবে খামারিদের আইনগত সহায়তা প্রদান।

উল্লিখিত ০৫টি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ বিভাগীয় বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। উপরোক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ১,৭২,০৮,০৭৭/-(এককোটি বাহাত্তর লাখ আট হাজার সাতাত্তর) টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে যার মাধ্যমে ৯,৬০০ (নয় হাজার ছয়শ) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প, কৃমিনাশক ট্যাবলেট বিতরণ, উন্নত জাতের ঘাস চাষের প্লট স্থাপন এবং উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। খামারে জীবাণুনাশক স্প্রেকরণে

২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে চলতি ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৪৫০ (চারশ পঞ্চাশ) টি স্প্রে মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।

এ ছাড়া জনগণ যাতে প্রাণিসম্পদ বিভাগীয় সেবা তাদের কাছাকাছি থেকে নিতে পারে সে জন্য 'ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট' (NATP) এর সহায়তায় রূপসা, দাকোপ, পাইকগাছা, ডুমুরিয়া ও বটিয়াঘাটা উপজেলায় প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে প্রাণিসম্পদ বিভাগীয় 'ফিয়াক' সেন্টার খোলা হয়েছে। এখানে একজন করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবাকর্মী নিয়মিত অবস্থান করেন; যার নিকট থেকে জনসাধারণ প্রাণিসম্পদ বিভাগের প্রয়োজনীয় পরামর্শ পেতে পারেন এবং প্রয়োজনে তার মাধ্যমে অতি সহজে প্রাণিসম্পদ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে।

অধ্যায়-৭

অর্থনৈতিক অবস্থা

অনেক আগ থেকেই খুলনা ছিল একটি বাণিজ্যিক বন্দর। ১৯৪৭ সালের আগে খুলনা ছিল ছোটো এক মফস্বল শহর। ১৯৮৪ সালে কলকাতার সঙ্গে খুলনার রেল যোগাযোগ স্থাপিত হলে পর্যটন ও বাণিজ্য-সুবিধা বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীকালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর খুলনা শহর দ্রুতগতিতে বেড়ে ওঠতে থাকে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একমাত্র নদীবন্দর হিসেবে স্বল্প সময়ের মধ্যে খুলনা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বন্দরে পরিণত হয়। মূলত চালনা বন্দরের পত্তনই খুলনা শহর দ্রুত গড়ে ওঠার অন্যতম কারণ। বন্দরের সুবাদে দ্রুতগতিতে গড়ে ওঠতে থাকে শিল্প কারখানা। একই সঙ্গে জনসংখ্যাও বাড়তে থাকে।[১]

খুলনা জেলার অর্থনীতি প্রধানত কৃষিনির্ভর। তবে সুন্দরবন এবং মোংলা সমুদ্রবন্দর খুলনা জেলার অর্থনীতির রক্ত সঞ্চালনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। খুলনা জেলার মোট আয়তন ৪৩৮৯.১১ বর্গকিলোমিটার যার মধ্যে ৬০৭.৮০ বর্গকিলোমিটার নদীনালা ও হাওর-বিল এবং ২০২৮.২২ বর্গকিলোমিটারজুড়ে বনভূমি বিস্তৃত। দেশের মোট আয়তনের মধ্যে খুলনা জেলার আয়তন ২.৯৭%। আয়তনের দিক থেকে খুলনা বিভাগের ১০টি জেলার মধ্যে খুলনা জেলার স্থান প্রথম এবং দেশের মোট ৬৪টি জেলার মধ্যে চতুর্থ।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী খুলনা জেলার মোট জনসংখ্যা ২৩,১৮,৫২৭ জন যা দেশের মোট জনসংখ্যার ১.৬০%। খুলনা জেলার ৯টি উপজেলার মধ্যে ডুমুরিয়া উপজেলায় জনসংখ্যা সর্বোচ্চ (৩,০৫,৬৭৫) এবং সর্বনিম্ন ফুলতলায় (৮৩,৮৮১)। খুলনা জেলায় জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০৪৬ জন। ভাসমান জনসংখ্যা ১৬৫৮ জন।

খুলনা জেলায় উৎপাদিত কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে স্থানীয় ও উচ্চ ফলনশীল ধান, গম, পাট, শাকসবজি, সুপারি ও পান প্রধান। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রকার ডাল, তৈলবীজ, ইক্ষু, আলু, মশলা এবং আম, কাঁঠাল, কলা, পেয়ারা, নারকেল প্রভৃতি ফলমূল উৎপাদিত হয়। এ জেলার রফতানিপণ্যের মধ্যে পাট, এবং চিংড়ি মাছ প্রধান। বিশ্ববাজারে বাংলাদেশ থেকে রফতানিকৃত চিংড়ির ৭৫% খুলনা জেলা সরবরাহ করে থাকে।

বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মতো গোরু-মহিষ, ছাগল-ভেড়া, হাঁস-মুরগি প্রভৃতি এখানকার প্রধান গৃহপালিত প্রাণী। এ জেলা মৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধ। এ জেলাতে কৃষি ছাড়াও পশু পালন ও মৎস্য চাষ আয়ের অন্যতম উৎস। লোনা পানির সামুদ্রিক মাছের মধ্যে রূপচান্দা, শুকচান্দা, লটিয়া, ছুরি, বাগদা চিংড়ি;

---

[১] মোঃ নুরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৫৪।

নদীতে পাঙ্গাশ, ইলিশ, চিতল, বোয়াল, ভেটকি, পারসা, ট্যাংরা, তপসে মাছ; বিল ও পুকুরে মিঠা পানির মাছের মধ্যে কালিবাউস, রুই, কাতলা, মৃগেল, শোল, কই, মাগুর, শিং প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। গত শতাব্দীর আশির দশক থেকে ব্যাপকহারে চিংড়ি ঘেরে মাছের চাষ শুরু হয়। সারা জেলাতেই বিভিন্ন প্রকার মাছের চাষ হয়ে থাকে। এ জেলা দেশের মৎস্য চাহিদার একটি উল্লেখযোগ্য অংশের জোগান দিয়ে থাকে। নদী, শাখানদী, খাল-খাড়ি, হাওর-বিল, পুকুর ও দিঘি থেকে এমনকি বর্ষাকালে জল নিমজ্জিত ধানক্ষেত ও বন্যা প্লাবন ভূমি থেকে বিভিন্ন প্রকার মাছ আহরণ করা হয়।

খুলনা জেলায় পাটকল, মেটাল ফ্যাক্টরি (ধাতব কারখানা), জাহাজ নির্মাণ শিল্প (শিপইয়ার্ড), ইস্পাত কারখানা, ক্যাবল মিল, চালের কল, আটার কল, বরফ কল, প্রেস মিল ও স' মিল রয়েছে। খুলনা জেলায় হ্যান্ডলুম, বাঁশের কাজ, মৃৎশিল্প, কারপেন্টার ও টেইলারিং (বস্ত্র বয়ন শিল্প) এবং জুয়েলারি রয়েছে। এ জেলার অর্থনীতিতে কৃষিখাতের তুলনায় অ-কৃষিখাতের ভূমিকা এখনও গৌণ। তবে ২০০১-২০০৩ সালের অর্থনৈতিক শুমারিতে অকৃষিখাতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রসারের তথ্য পাওয়া যায়।

খুলনা জেলায় অসংখ্য নদনদী জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। জেলার অর্থনীতিতে এই নদীগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। যোগাযোগের ক্ষেত্রে নৌপথ প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত কয়েকটি প্রধান নদনদী হলো ভদ্রা, ভৈরব, রূপসা, শিবসা, পশুর, কপোতাক্ষ, আতাই, শোলমারী এবং সূতারখালী। প্রধান এই নদীগুলো আবার অসংখ্য শাখানদী, নালা, খাল ও খাড়ি দিয়ে বঙ্গোপসাগরের সাথে যুক্ত। নৌপথে জেলার বেশিরভাগ ব্যাবসাবাণিজ্য চলে। খুলনা শহর ও অন্যান্য নদীবন্দর বিশেষত মোংলা সমুদ্রবন্দরের মধ্যে নদীপথে রফতানি ও আমদানিকৃত দ্রব্যসামগ্রী আনা-নেওয়ার কাজে সারা বছরই শয়ে শয়ে নৌকা, স্টিমার, লঞ্চ, বার্জ ব্যস্ত থাকে। বর্তমানে স্থল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় পণ্য সামগ্রী ট্রাকযোগেও পরিবহণ করা হয়। এ জেলায় নদীনালার মোট আয়তন ৬০৭.৮০ বর্গকিলোমিটার যা জেলার মোট আয়তনের ১৩.৮৪%।[২] প্রতিবছরই বটিয়াঘাটা এবং দাকোপ উপজেলায় নদীভাঙনে প্রচুর জমি বিলীন হয়ে যায়। ২০০৮-২০০৯ সালে কয়রা উপজেলার কিছু জমি নদী ভাঙনকবলিত হয়।

গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি ঝড় খুলনা জেলার কৃষি অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বিগত ১৯৮৮ সালের ২৯ নভেম্বর খুলনা জেলায় সাইক্লোন হয়। ঝড়ের সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১৬০ কিলোমিটার। জোয়ারের পানি ২-১৪.৫ ফুট উচ্চতায় প্রবাহিত হয়। এ ঝড়ে মৃতের সংখ্যা ছিল ৬,১৩৩ জন। তা ছাড়া ফসল ও ঘরবাড়ির ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। বিগত ১৫/১১/২০০৭

[২] B.B.S. District Statistics Khulna, 2011, p. 4.

তারিখে বৃহত্তর জেলার ওপর দিয়ে ‘সিডর’ নামক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ঘণ্টায় ২২৩ কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত হয়। এ ঝড়ের তাণ্ডবে ৩,৩৬৩ জন লোক মারা যায়। নিখোঁজ হয় ৮৭১ জন। আহত হয় ৫৫২৮২ জন। গবাদিপশু মারা যায় ১৭,৭৮,৫০৭টি। ৪৩,৩২১ একর জমির ফসল সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়। আংশিকভাবে বিনষ্ট হয় ১৭,৩০,৩১৬ একর জমির ফসল। ১৭১৪ কিলোমিটার সড়ক সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়। বিগত ২৫/৫/২০০৯ তারিখে পশ্চিম বাগেরহাট ও খুলনা জেলার উপকূলবর্তী সাগরের দ্বীপে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস ‘আইলা’ আঘাত হানে প্রতি ঘণ্টায় ৮০-১০০ কিলোমিটার বেগে।[৩] আইলার প্রভাবে খুলনা জেলার বেশ কিছু অঞ্চল স্থায়ী জলাবদ্ধতার শিকার হয়।

অতীতে এ জেলার অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক ভালো ছিল। এলএসএস ও ম্যালি ১৯০৮ সালে প্রণীত খুলনা জেলা গেজেটিয়ারে এ সময়ের খুলনা জেলার জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বলেন-

“খুলনা জেলার জনগণ সার্বিকভাবে বেশ সমৃদ্ধ এবং তাদের অধিকাংশই ছিল কৃষির ওপর নির্ভরশীল। জমি ও বাগানের উৎপাদিত পণ্য দ্বারা তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ হতো এবং উদ্বৃত্ত দ্রব্যাদি বিক্রয় করে তারা প্রয়োজনীয় ছোটো-খাট বিলাস সামগ্রী ক্রয় করতো। উর্বর জমিতে প্রচুর ফসল বিশেষত, অধিক পরিমাণে ধান উৎপাদিত হতো। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থ পরিবারের বসতবাটিসংলগ্ন জমিতে নারকেল ও সুপারির বাগান ছিল। নারকেল ও সুপারি বিক্রয় করেই একজন রায়ত জমির খাজনা পরিশোধে সমর্থ ছিল। সুতরাং উৎপাদিত সম্পূর্ণ ধান তার লভ্যাংশ হিসেবে বিবেচিত হতো এবং মৌসুম অনুকূল হলে সে বছরে বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করতে পারতো। নদীপথের সংখ্যাধিক্যও কৃষকদের সমৃদ্ধির অনুকূল ছিল। চাল, পাট, সুপারি, নারকেল প্রভৃতি যে-কোনো কৃষি পণ্য তারা সহজে এবং স্বল্পব্যয়ে নৌকাযোগে বিক্রয় কেন্দ্রে কিংবা প্রয়োজনবোধে সরাসরি কলকাতায় পাঠাতো।

কৃষিজীবীদের বৃহদাংশই যে স্বচ্ছন্দময় জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিল তার উজ্জ্বল নিদর্শন হচ্ছে তারা পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেরা হাল কর্ষণ কিংবা ধান কর্তন করতো না। এসব কাজের জন্য তারা অন্য জেলা থেকে আগত শ্রমিকদের নিয়োগ করতো। ক্ষুদ্র চাষিরা পর্যন্ত কোনো প্রকার কৃষিকাজ করতে পছন্দ করতো না। তারা কেবলমাত্র নিয়োগকৃত শ্রমিকদের তদারকি করতো। এর কারণ তাদের ছিল গোলাভরা ধান, পুকুর ও নদীতে মাছ ধরার সুবিধা এবং বাগানে ছিল নারকেল, সুপারি ও অন্যান্য ফল-ফলাদি। তাদের প্রয়োজন ছিল কেবল লবণ, বস্ত্র, কেরোসিন, তামাক এবং যৎকিঞ্চিত অন্যান্য দ্রব্যাদি। তবে বৈরী মৌসুমে বিশেষত অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের কারণে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হতো। বৃষ্টিপাত পর্যাপ্ত না হলে আর্দ্রতার অভাবে ধানের ফলন কমে যেত, আবার অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে বন্যায় জমি প্লাবিত হয়ে ধানের চারা নষ্ট

---

[৩] B.B.S, Statistical Yearbook of Bangladesh. 2012, p. 18-20.

হতো। অনেক সময় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অত্যধিক হয়ে পড়তো। এর একটি কারণ ছিল যে, জেলাটি বিশেষত সুন্দরবনাঞ্চল লবণাক্ত পানির নদী ও খাল দ্বারা বহুধাবিভক্ত ছিল। অদূরদর্শিতাও তাদের সৌভাগ্যের পথে প্রতিবন্ধক ছিল। ধান কেটে ঘরে তোলার পর তারা মিতব্যয়ের নীতি বিস্মৃত হতো। অপরিণামদর্শীর মতো যথেচ্ছভাবে বস্ত্র ও বিলাসসামগ্রী ক্রয়ে ব্যস্ত থাকত। ফলে অনেকে ঋণের দায়ে আবদ্ধ হয়ে পড়তো। মহাজনের চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ আদায়ের দরুন ঋণজাল থেকে কৃষকের সামনে মুক্তির পথ খুব সামান্যই খোলা ছিল। সাধারণত ক্ষুদ্র চাষি এবং ভূমিহীন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক অবস্থার মধ্যে ছিল না। নির্দিষ্ট আয়ের নিম্ন বেতনভুক ভদ্রলোক শ্রেণি, যারা বাইরের ঠাট বজায় রাখাকে অপরিহার্য মনে করতো, ভালো পোশাক-আশাক পরিধান করা ও ছেলে মেয়েদের শিক্ষার সুব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যকীয় ভাবতো, তাদের পক্ষে দুর্মূল্যের বছরগুলো চিরাচরিত জীবনযাত্রার মান বজায় রাখা দুরূহ হয়ে উঠেছিল। এখানে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ছিল স্বল্প এবং তারা সামগ্রিকভাবে ভালো অবস্থায় ছিল। কারণ হিসেবে বলা যায় ফসল কাটার মৌসুমে সুন্দরবন অঞ্চলে ‘দাওয়াল’ বা শস্যকর্তনকারী শ্রমিকের বিরাট চাহিদা ছিল। শ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জনকারী কিছু শ্রমিক বিচক্ষণতার সঙ্গে উপার্জিত অর্থ ব্যবহার করতো। তাঁরা প্রতিবেশীদের কাছে অর্থ লগ্নি দিত। অন্যেরা বিয়েশাদি, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান ও মামলা মোকদ্দমায় যথেচ্ছভাবে এ অর্থ ব্যয় করতো।

সামগ্রিকভাবে এ সময়ে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। রেলপথ চালু হওয়ার পর বিনোদনের উদ্দেশ্য ছাড়াও কলকাতাভ্রমণ নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। আমদানিকৃত দ্রব্যসামগ্রী, খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যবহার সাধারণ ব্যাপার ছিল। এমনকি কৃষিজীবী সম্প্রদায় হাতাকাটা জামা, গলাবন্ধনী এবং পশমি আলোয়ান ব্যবহার শুরু করে। শহরাঞ্চলে এবং সেনহাটি ও মূলঘরের মতো উন্নত গ্রামসমূহে জনগণ ইতিআগে অপরিচিত চা-বিস্কুটের মতো বিলাস খাবারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।[৪]

১৯২০ থেকে ১৯২৬ সালের মধ্যে এক অনুসন্ধান জরিপ পরিচালিত হয়।[৫] এর উদ্দেশ্য ছিল কৃষিজীবী পরিবারের বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করা। L.R. Fawcus তার *Final Report on the Khulna Settlement*) (১৯২০-১৯২৬)-এ দু’শ্রেণির বাজেট প্রণয়ন করেছেন, একটি দরিদ্র কৃষক পরিবারের এবং অন্যটি সচ্ছল কৃষক পরিবারের। এ দু’ধরনের বাজেট দেখানো হলো:

---

৪ L.S.S. O’Malley, *Bengal District Gazetteers, Khulna* (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1908). Quoted in K.G.M. Latiful Bari, *Bangladesh District Gazetteers, Khulna* (Dhaka: Bangladesh Government Press, 1978), p. 158.

৫ L.R. Fawcus, *Final Report on the Khulna Settlement. 1920-1926* (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1927), p. 50.

(ক) দরিদ্র কৃষক পরিবার সাধারণত ৫ জন প্রাপ্তবয়স্ক ও ১ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত এবং আয়ের উৎস হচ্ছে ৬ একর চাষযোগ্য জমির ফসল। এ ধরনের পরিবারের বার্ষিক বাজেট ছিল নিম্নরূপ:

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ জেলার অর্থনৈতিক অবস্থারও পরিবর্তন হয়। ভূমির ওপর জনসংখ্যার চাপ অত্যধিক বৃদ্ধির ফলে জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ এবং অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীলতা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলে। বছরের পর বছরব্যাপী ভূমির ওপর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা চাপের দরুন কৃষিজোতগুলো ক্রমাগতভাবে খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। কৃষি খামারের সংখ্যা এবং আয়তনের দিক থেকে এ সময়ে জেলার কৃষিজোতের বিচ্ছিন্নকরণের হার ছিল যথাক্রমে ৮০% ও ৯৫%।[৬] এ ছাড়াও কৃষকের আয়ের প্রধান উৎস জমির উৎপাদিত ফসল হওয়ায় এবং তা প্রকৃতিনির্ভর হওয়ায় কৃষকদের আয়ের পরিমাণ প্রতি বছরই অনিশ্চিত ছিল। কৃষিজাত দ্রব্যের দাম বহুগুণে বাড়লেও কৃষিজীবীগণ বিশেষভাবে লাভবান হয়নি। কারণ কৃষিজাত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অকৃষিজাত দ্রব্যের দামও বেড়ে যায় (বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত দ্রব্যের তুলনায় শেষোক্ত দ্রব্যের দাম অধিক হারে বৃদ্ধি পায়)। তা-ছাড়াও কৃষকদের কাছে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ফসল বাদে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত ফসল খুব সামান্যই থাকতো। এ কারণে সার্বিকভাবে কৃষক সম্প্রদায় তাদের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য ক্রয়ে সক্ষম হতো না এবং কিছু সংখ্যক কৃষক জীবনধারণের জন্য ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ত।

এ সময়ে জেলার অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল কৃষির স্বল্প উৎপাদন। কাঠের লাঙ্গল ও বলদের সাহায্যে জমি চাষের প্রাচীন পদ্ধতি, কৃষিজোতের উপবিভাগ ও বিচ্ছিন্নকরণ, মূলধনের অপর্যাপ্ততা এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহের অভাব প্রভৃতি কারণে কৃষি উৎপাদন নিম্ন পর্যায়ে ছিল।

১৯৬১ সালে খুলনা জেলার আদমশুমারি প্রতিবেদন অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল কৃষিজীবী। এরপর জেলে সম্প্রদায়ের স্থান। বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক সুন্দরবনের সম্পদ আহরণে নিয়োজিত ছিল। কৃষকদের তুলনায় কাঠুরে সম্প্রদায় আর্থিক দিক থেকে দরিদ্র ছিল। মোট শ্রমশক্তির এক ক্ষুদ্রাংশ অকৃষিজীবী জনগোষ্ঠী জেলার অফিস আদালত এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে দক্ষ, আধাদক্ষ ও সাধারণ মানের কর্মে নিয়োজিত ছিল। জেলায় সম্পূরক কাজের সুবিধা সীমিত ছিল।

তথাপি, একুশ শতকের কৃষি বিপ্লবের ফলে বর্তমানে কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ উন্নত। বর্তমানকালে একটি দরিদ্র ও একটি সচ্ছল কৃষক পরিবারের বার্ষিক বাজেট দেখানো হলো-

---

[৬] K.M.G Latiful Bari(Edited), *Bangladesh District Gazetteers*, Khulna,1978. p.161.

(ক) একটি দরিদ্র কৃষক পরিবার সাধারণত ৩ জন প্রাপ্তবয়স্ক ও ২ জন অপ্রাপ্ত বয়স্ক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত এবং আয়ের উৎস হচ্ছে ৩ একর চাষযোগ্য জমির ফসল। ২০১৭ সালে খুলনা জেলায় এ ধরনের পরিবারের বার্ষিক বাজেট এমন:

সারণি-৫৭

একটি দরিদ্র কৃষক পরিবারের (২০১৭ সালের) বার্ষিক বাজেট

আয়	টাকা	ব্যয়	টাকা
১. বাৎসরিক আয়: উৎপন্ন ফসলাদি ও অন্যান্য উৎস হতে	১,১০,০০০/-	১. খাজনা ও অন্যান্য দেয়	২৫,০০০/-
		২. করসমূহ	৫০০/-
		৩. চাষাবাদের খরচ	৬০,০০০/-
২. বাৎসরিক আয়: দুগ্ধ, হাঁস মুরগি, ডিম, শাক-সবজি, ফলমূল এবং বাগানের অন্যান্য দ্রব্য থেকে।	৭০,০০০/-	৪. গবাদিপশু প্রতিপালনের খরচ	২৫,০০০/-
		৫. ডাক্তার ও ওষুধের খরচ	১৫,০০০/-
		৬. কৃষি সরঞ্জামাদি ভাড়া	২৫,০০০/-
		৭.গৃহস্থালির সাধারণ ব্যয়	২৫,০০০/-
		৮. বস্ত্র ক্রয়	১৪,০০০/-
		৯. বিলাস দ্রব্য ক্রয়	১৭,০০০/-
মোট বার্ষিক আয়:	১,৮০,০০০/-	মোটামুটি বাজেট:	১,৮১,৫০০/-
		ঘাটতি বাজেট:	১,৫০০/-

উৎস: উপপরিচালক, বিআরডিবি, খুলনা।

(খ) একটি সচ্ছল কৃষক পরিবার সাধারণত ৩ জন প্রাপ্তবয়স্ক ও ২জন অপ্রাপ্ত বয়স্ক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত এবং আয়ের উৎস হচ্ছে ৬ একর চাষযোগ্য জমির ফসল। ২০১৪ সালে খুলনা জেলায় এ ধরনের পরিবারের বার্ষিক বাজেট নিম্নরূপ:

সারণি-৫৮

একটি স্বচ্ছল কৃষক পরিবারের বার্ষিক বাজেট

আয়	টাকা	ব্যয়	টাকা
১. বাৎসরিক আয়: উৎপন্ন ফসলাদি ও অন্যান্য উৎস হতে	১,৫০,০০০/-	১. খাজনা ও অন্যান্য দেয়	৩,০০০/-
		২. করসমূহ	৫০০/-
		৩. চাষাবাদের খরচ	৯০,০০০/-
২. বাৎসরিক আয়: দুগ্ধ, হাঁস মুরগি, ডিম, শাক-সবজি, ফলমূল এবং বাগানের অন্যান্য দ্রব্য থেকে।	৬০,০০০/-	৪. গবাদিপশু প্রতিপালনের খরচ	১২,০০০/-
		৫. ডাক্তার ও ওষুধের খরচ	১২,০০০/-
		৬. কৃষি সরঞ্জামাদি ভাড়া	৩০,০০০/-
		৭.গৃহস্থালির সাধারণ ব্যয়	১৫,০০০/-
		৮. বস্ত্র ক্রয়	১৫,০০০/-
		৯. বিলাস দ্রব্য	২০,০০০/-
মোট বার্ষিক আয়:	২,১০,০০০/-	মোট বার্ষিক ব্যয়:	১,৯৭,৫০০/-
		ব্যয় অতিরিক্ত বার্ষিক আয়:	১২,৫০০/-

উৎস: নিজস্ব জরিপ, জরিপকাল- ২০১৪ সাল।

জনসংখ্যা

১৮০২ সালে খুলনা ও বাগেরহাট মহকুমায় প্রথম লোক গণনার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। ১৮৬১ সালে কালেক্টর জেমস ওয়েস্টল্যান্ড গ্রাম পাহারাদারদের সাহায্যে তদানীন্তন যশোর জেলায় সর্বপ্রথম আধুনিক পদ্ধতিতে আদমশুমারির চেষ্টা চালান। ওই শুমারি অনুযায়ী খুলনা মহকুমার মোট লোকসংখ্যা ছিল ২,১৩,০৭১ জন, তন্মধ্যে মুসলমান-১,১০,৮৬৭ জন এবং হিন্দু -১,০২,২০৪ জন। মোট বাড়ির সংখ্যা ছিল ২৯,৮৫৩টি। ১৮৭২ সালে বর্তমান বৃহত্তর খুলনা জেলায় সর্বপ্রথম আধুনিক পদ্ধতির সার্বিক আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়। এ শুমারিতে তৎকালীন খুলনা মহকুমার আয়তন ছিল ৬১৫ বর্গমাইল, গ্রাম-শহরের মোট সংখ্যা ছিল ৫৪৯টি, বাড়ির সংখ্যা ৪২,৩৩৪টি, মোট লোকসংখ্যা ছিল ৩,২৪,০০১ জন, প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যার গড় ছিল ৪৬৬ জন।[৭] ১৮৯১ সালের আদমশুমারিতে জেলার জনসংখ্যা ৯% বৃদ্ধি পায়। আগেকার আদমশুমারিতে খুলনা জেলার আয়তনের মধ্যে ২,৬৮৮ বর্গমাইল সুন্দরবনকে ধরা হয়নি। এ সময়ে সুন্দরবনসহ জেলার আয়তন দাঁড়ায় ৪,৭৬৫ বর্গমাইল। এরপর থেকে প্রতি দশকের প্রথম বছরে জনসংখ্যা গণনার পদ্ধতি শুরু হয়। ১৯০১ সাল থেকে জেলার জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৩২-৪১ সময়কালে জনসংখ্যা অধিকহারে বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানি বোমার আতঙ্কে ব্যাপক সংখ্যক লোকের কলকাতা ত্যাগ এবং খুলনা ও নিকটবর্তী জেলাসমূহে আশ্রয় গ্রহণ। ১৯৫২-৬১ সময়ে বিহার ও ভারতের অন্যান্য স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে খুলনায় প্রচুর মোহাজেরের আগমন হয়। এ সময় খুলনার শিল্পায়নও শুরু হয়। অনেকগুলো পাটকল, নিউজপ্রিন্ট মিল, শিপইয়ার্ড, চালনা বন্দর ইত্যাদি এ দশকে স্থাপিত হয়। বিপুলসংখ্যক লোক বিভিন্ন জেলা থেকে চাকরি এবং ব্যাবসার উদ্দেশ্যে খুলনায় আসে। পরিচ্ছন্ন ছোটো শহর খুলনা হঠাৎ প্রাণচঞ্চল জনবহুল হয়ে ওঠে।

১৯৪২ সাল থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত কম। কারণ হিসেবে বলা যায় পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় অনাহারে মৃত্যু, রোগ, মহামারির জন্য মৃত্যু, আকালের জন্য বিলম্বিত বিবাহ, অপুষ্টির জন্য প্রজনন শক্তি হ্রাস এবং আগত মোহাজেরদের তুলনায় অধিক লোকের দেশত্যাগ। ১৯৫১ সালে খুলনা জেলার (তৎকালীন খুলনা মহকুমা) মোট জনসংখ্যা ছিল ৬,৮৪,০০০ এবং ১৯৬১ সালে ৮,৪১,০৯৬ জন। ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ১৭.৬% এবং প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল ৫২৬ জন। ১৯৭৪ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৩,৮৬,৩৪৭ জন। ১৯৬১ সালের তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির এ হার হচ্ছে ৪৫.১৮%। ফলে প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৭৬৮ জন। ষাটের দশকে শিল্পায়নের গতি আরও বৃদ্ধি পায়। ফলে অন্যান্য জেলা থেকে কর্মসংস্থানের লোভে প্রচুর লোক আসতে থাকে। এ দশকেও ভারতে পর পর অনেকগুলো দাঙ্গার ফলে বহু

---

[৭] W.W. Hunter, A *Statistical Account of Bengal, 24-Parganas and Sundarbans* (Delhi: D.K Publications, First Reprinted 1973), p. 42.

মুসলমান মোহাজের খুলনায় চলে আসে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের কারণে আদমশুমারি নির্ধারিত সময় অপেক্ষা তিন বছর পিছিয়ে যায়। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী খুলনা সদর মহকুমার (বর্তমানে খুলনা জেলা) মোট জনসংখ্যা ছিল ১৩,৮৬,৩৪৭ জন। খোলা বাজারে খাদ্য দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির ফলে খুলনার বিধিবদ্ধ রেশন ব্যবস্থা বাইরের লোককে আকৃষ্ট করে। এসব বিভিন্ন কারণে ১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত বিলম্বিত আদমশুমারিতে জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

১৯৮১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী খুলনার জনসংখ্যা ছিল ১৭,৭৭,৬৮৪ জন এবং প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল ৯৩৬ জন। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুসারে খুলনা জেলার জনসংখ্যা ছিল ২০,০২,৮৫৯ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল ৪.০৩%। ১৯৮১-৯১ সময়কালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী আদমশুমারিগুলোর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষা হ্রাস পায়। এর কারণ শিক্ষার বিস্তার ও জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা, বিলম্বে বিবাহ এবং পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণহেতু কম সংখ্যক সন্তানের জন্মদান।

২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী খুলনা জেলার মোট জনসংখ্যা ছিল ২৩,৭৮,৯৭১ জন। প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল ৫৪১ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল ১.৭০। সাক্ষরতার শতকরা হার ছিল ৫৭.৮। মোট গৃহস্থালির সংখ্যা ছিল ৪,৯৯,৩২৪টি, যা সমগ্র দেশে ছিল মোট ৩,২১,৭৩,৬৩০টি। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী খুলনা জেলার মোট জনসংখ্যা ২৩,১৮,৫২৭ জন। এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার -০.২৫, যখন সারা দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৪৭। এখানে সাক্ষরতার শতকরা হার ছিল ৬০.১ যখন সারা দেশে ছিল ৫১.৮%।

এখানে বসবাসকারী ৫,৪৭,৩৪৭টি পরিবারের মধ্যে পাকা ঘরে ১৮.৩%, আধাপাকা ঘরে ২৩.০%, কাঁচা ঘরে ৫৬.৬%, ঝুপড়ি ঘরে ২০.০% বাস করে। ভাসমান জনসংখ্যা ১৬৫৮ জন। ২০১১ সালের আদমশুমারিতে বাঁশ-ছন-হোগলা-গোলপাতার তৈরি ঘরের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে ১৯৯১ সালে গ্রামাঞ্চলে কাঠ, বাঁশ, ছন, হোগলা, গোলপাতা দ্বারা অধিকাংশ বাসগৃহ নির্মিত হতো। গ্রামবাসীরা সাধারণত বেড়া নির্মাণের জন্য বাঁশ এবং ছাউনির জন্য গোলপাতা ব্যবহার করতো। বিভিন্ন ধরনের কাঁচা বাসগৃহের মধ্যে দোচালা, চৌচালা ও আটচালা ঘর উল্লেখযোগ্য। দোচালা বাসগৃহকে স্থানীয়ভাবে ‘বাংলা ঘর’ বলা হয়, যার নক্সা ও নির্মাণশৈলী ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের নিজস্ব। চৌচালা স্থানীয়ভাবে ‘চৌয়ারি-ঘর’ হিসেবে পরিচিত ছিল। অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা ঘরের ছাদের জন্য ঢেউ টিন ব্যবহার করতো। তবে ঘরের ভিত ও মেঝে সাধারণত মাটির তৈরি হতো। গ্রামাঞ্চলে ইট নির্মিত ঘরবাড়ির সংখ্যা অতি অল্প ছিল। শহরাঞ্চলের অধিকাংশ বাসগৃহ ছিল ইটের তৈরি। তবে শহরাঞ্চল

সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক স্থাপত্যে নির্মিত বাসগৃহাদির সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী জেলার প্রতিটি গ্রামে প্রতিনিয়ত আধাপাকা ও পাকা গৃহ নির্মিত হচ্ছে। জেলা শহরে ও উপজেলা শহরে নির্মিত হচ্ছে বহুতল ভবন। এখানে সেনেটারি টয়লেট ব্যবহার করে ১৮.৪% হাউজহোল্ড এবং টয়লেট ব্যবহার করে না ৩.৬% হাউজহোল্ড।

কৃষিখাত

খুলনা জেলার জমির পরিমাণ ২,০০০.৩৬ বর্গকিলোমিটার, সংরক্ষিত বনভূমি ২,০২৮.২২ বর্গকিলোমিটার এবং জলাভূমির পরিমাণ ৬০৭.৮০৪ বর্গকিলোমিটার। জেলার মোট জমির মধ্যে উঁচু জমির পরিমাণ ৪১,৬৬৬ একর; মাঝারি ভূমি ১,৩৩,৯৪১ একর, নিচু ভূমি ১,৫০,৬১১ একর। ২,৩৩,৭৩৫ একর দোআঁশ মাটি, বেলে মাটি ৭২,৮৩৯ একর, এঁটেল মাটি ১,০৯,১৪৭ একর, কংকর মাটি ১,২৯৭ একর (যা দিঘলিয়া উপজেলার অন্তর্ভুক্ত) এবং অন্যান্য ১৬,৭৭৮ একর।

১৯৮১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী সমগ্র দেশে কৃষিকাজে নিয়োজিত জনশক্তির শতকরা হার অপেক্ষা খুলনা জেলার হার ছিল অনেক কম। এ সময়ে খুলনা জেলার ৪৮.৫৬% লোক জীবনধারণের জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল ছিল, যা বাংলাদেশে ছিল ৬৪%। জেলার মোট পরিবারের মধ্যে ৩৭% কৃষিকাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল, যেখানে সমগ্র বাংলাদেশে ছিল ৪৫%। ১৯৮৩-৮৪ সালের কৃষিশুমারি অনুযায়ী খুলনা জেলার মোট হাউজহোল্ডিং/খানাসমূহের মধ্যে ৭৬.৪% ছিল কৃষিখানা, যা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ৭২.৭%। মোট পরিবারসমূহের ৪৪.৫% ছিল কৃষিশ্রমিক পরিবার, যা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ৩৯.৮%। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত খুলনা জেলা পরিসংখ্যান-১৯৮৭ অনুযায়ী জেলার মোট শ্রমশক্তি ১১.৬ লাখের মধ্যে ৬.৬ লাখ অর্থাৎ ৫৬.৬% কৃষিতে নিয়োজিত ছিল। ২০০৮ সালে খুলনা জেলায় মোট হোল্ডিংয়ের সংখ্যা ছিল-৫,০২,৮৩৫টি। অ-কৃষি হোল্ডিং ছিল ২,৯৬,০৯২টি। মোট কৃষিহোল্ডিং ছিল ২,০৭,৭৪৩টি। কৃষি শ্রমিক হোল্ডিং ছিল ১,৪৪,৩৫০টি।[৮]

২০০৩-২০০৪ সালের পর থেকে জেলায় কৃষিকাজে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে ভূমি কর্ষণের ক্ষেত্রে প্রাচীন মান্ধাতার আমলের কাঠের লাঙল ও বলদের ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। ধান মাড়াইয়ের জন্য অতীতের মতো বলদের পরিবর্তে ডিজেল ইঞ্জিন চালিত মাড়াই কল ব্যবহৃত হচ্ছে। নতুন নতুন উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের ফলে উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জেলার পুরো কৃষি ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে আধুনিকায়নের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ২০০৮ সালে খুলনা জেলায় কৃষি উৎপাদন কাজে মোট ১,১৪৪টি পাওয়ার টিলার, ২১২টি ট্রাক্টর এবং ৩,৩৩৪টি ধান মাড়াই মেশিনের ব্যবহার হয়েছিল।[৯] ২০১০-১১ সালে ৫৭,৮৭১ একর জায়গা জলসেচের আওতায় ছিল। সেখানে

---

[৮] B.B.S, Statistical Yearbook of Bangladesh. 2012, p. 128.

[৯] B.B.S. District Statistics, Khulna. 2011. p. 37.

৫,০৫৬টি পাওয়ার পাম্প এবং ৩৪,৭৪৪টি টিউব অয়েল ব্যবহার করা হয়। ৪,৭৯৩টি ডুন, ১,৩০৮টি সুয়িং বাস্কেট ব্যবহৃত হয়।[১০] ২০১০-১১ সালে বিদ্যুৎ ও ডিজেল চালিত মোট ৮,৮৭৯টি পাম্প ফিল্ডের মাধ্যমে মোট ৮৪,৭৬৪ একর কৃষিজমিতে জলসেচ করা হয়। এ সময়ে কেমিক্যাল সারের ব্যবহারও বৃদ্ধি পায়। ২০১০-১১ সালে খুলনা জেলায় মোট ১৬,৫৫৪ মেট্রিক টন ইউরিয়া, ৬,১৯৬ মেট্রিক টন টিএসপি, ৩,০১৯ মেট্রিক টন এমপি, ১,১৬১ মেট্রিক টন ডেপ, ২,১৭৯ মেট্রিক টন অন্যান্য সার ব্যবহৃত হয়।[১১]

সেচের আওতায় জমির পরিমাণ ১৯৮৩-৮৪ সালের কৃষিশুমারি অনুযায়ী খুলনা জেলার ৪০.৮% ভূমি কৃষিকাজে ব্যবহৃত হতো, যা বর্তমানে ৭৯%। ১৯৮৩-৮৪ সালে ৬.০% ভূমি সেচের আওতাধীন ছিল, যা বর্তমানে ৩৭%। ২০০৮ সালের কৃষিশুমারি অনুযায়ী খুলনা জেলায় ৩,৫৬,১৪৭টি কৃষি হোল্ডিং ছিল। এর মধ্যে মালিকানাস্বত্বসম্পন্ন হোল্ডিং ২,৪০,৯০৪টি এবং মালিকানা কাম রায়তি (টেনান্ট) সংখ্যা ছিল ৭১,০৫০টি। রায়তি হোল্ডিং ছিল ৪৪,১৯৩টি।[১২] এ সময়ে জেলায় চাষকৃত জমির মধ্যে একফসলি জমির পরিমাণ ছিল ২,২৫,৮২৮ একর, দোফসলিজমির পরিমাণ ছিল ১,১৫,৯০১ একর, তিন ফসলি জমির পরিমাণ ছিল ১৭,০৯৭ একর। নিট জমির পরিমাণ ছিল ২,৫৩,৯৬৪ একর এবং মোট জমির পরিমাণ ছিল ৫,০৮,৯২১ একর। ৭৯,৫১৪ একর আবাদি (অপারেটেড এরিয়া) জমির মধ্যে স্থায়ী ফসলি জমির পরিমাণ ছিল ১৭,৩২৩ একর, অস্থায়ী ফসলি জমির পরিমাণ ছিল ২,৫৩,৯৬৪ একর। অন্যান্য ভূমির পরিমাণ ছিল ৯০,৪৭৪ একর।[১৩] জমির উৎপাদনশীলতা ছিল ১৪২ ভাগ। ২০০৮ সালে খুলনা জেলায় বিভিন্ন জাতের ধান চাষ হয় মোট ২,৭০,৬৪৬ একর জমিতে। সেচের আওতাধীন ছিল ২,৭০,৬৪৬ একর জমি। গম চাষ করা হয় ২,৭০,৬৪৬ একর জমিতে এবং এর ২,৭০,৬৪৬ একর ছিল সেচের আওতায়। আলু চাষ হয় ৩,৩৬৩ একরে, এর মধ্যে ১,৩৩৬ একরে জল সেচ ছিল।[১৪] খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা, দিঘলিয়া, কয়রা এবং রূপসা উপজেলার প্রধান কৃষি পণ্য ধান, দাকোপ উপজেলার প্রধান কৃষিপণ্য ধান ও তরমুজ, ডুমুরিয়া, পাইকগাছা ও ফুলতলা উপজেলার প্রধান কৃষিপণ্য চিংড়ি মাছ। ২০১১ সালে খুলনা জেলার মোট পরিবারের ৪১.৩১% (৫,০৩,০০০টি) কৃষি পরিবারের খামার হতে উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে স্থানীয় ও উচ্চ ফলনশীল ধান, গম, পাট, শাকসবজি, সুপারি ও পান প্রধান। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রকার ডাল ও তৈলবীজ, ইক্ষু, আলু, মশলা এবং আম, কাঁঠাল, কলা, পেয়ারা, নারকেল প্রভৃতি ফলমূল উৎপাদিত হয়। সারণিতে ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ সালে উৎপাদিত বিভিন্ন কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন মাত্রা দেখানো হলো:-

---

[১০] ওই. পৃ. ৩৬।

[১১] ওই. পৃ. ৩৮।

[১২] ওই. পৃ. ৩১।

[১৩] B.B.S. District Statistics, Khulna, 2011, P.31

[১৪] ওই. পৃ. ৩২।

সারণি-৫৯
খুলনার কৃষিজ পণ্য উৎপাদন পরিসংখ্যান (২০০৯-১০/২০১০-১১)

সাল	আউশ		আমন		বোরো	
	জমির পরিমাণ	উৎপাদন মাত্রা	জমির পরিমাণ	উৎপাদন মাত্রা	জমির পরিমাণ	উৎপাদন মাত্রা
২০০৯-১০	১২৫৫৩ একর	৩৯৮৩৯ মে.টন	২০৭১৯৮ একর	৩৪৪৮২৭ মে.টন	১০৪৪৯১ একর	৫৭৮৯২৫ মে.টন
২০১০-১১	১১৭৩৭ একর	৪৫৬৯৯ মে.টন	১৭৩৩২২	৩৪৮০৯০ মে.টন	৯৫৩৬৩ একর	৬৯৯৭৪৬ মে.টন
	গম		পাট		আখ	
	জমির পরিমাণ	উৎপাদন মাত্রা	জমির পরিমাণ	উৎপাদন মাত্রা	জমির পরিমাণ	উৎপাদন মাত্রা
২০০৯-১০	৩৭১ একর	৩২৫.৮১ মে.টন	১৭৫৪.২ একর	৭২০২.৬১ মে.টন	৩৮৮.৭৫ একর	৭১৭৬.৫ মে.টন
২০১০-১১	৪১৪ একর	২৮৭ মে.টন	৬২১৮ একর	৬৭৩০ মে.টন	২৮০ একর	৬২২২ মে.টন
	মসুর		মুগ		যব	
	জমির পরিমাণ	উৎপাদন মাত্রা	জমির পরিমাণ	উৎপাদন মাত্রা	জমির পরিমাণ	উৎপাদন মাত্রা
২০০৯-১০	২৩৩.৭ একর	৬৯.৫৫ মে.টন	৯৮.৭৫ একর	২৯.৩২১ মে.টন	০০ একর	০০ মে.টন
২০১০-১১	২৪১.০৫ একর	৭০.২৫৫ মে.টন	১০৩.৫ একর	৩১.২৪ মে.টন	৩৭৬ একর	৪১৯ মে.টন
	মটর		খেসারি		মাসকলাই	
	জমির পরিমাণ	উৎপাদন মাত্রা	জমির পরিমাণ	উৎপাদন মাত্রা	জমির পরিমাণ	উৎপাদন মাত্রা
২০১০-১১	৪৪ একর	১৫.২৮ মে.টন	৩৩৫.৫ একর	১৮১.৭৫ মে.টন	১২০.৮৫ একর	৫৪.১৪৩ মে.টন
	আলু		মিষ্টি আলু		মোট পরিমাণ	
	জমির পরিমাণ	উৎপাদন মাত্রা	জমির পরিমাণ	উৎপাদন মাত্রা	জমির পরিমাণ	উৎপাদন মাত্রা
২০০৯-১০	৯৮৩ একর	১৭৫১ মেঃটন	১১৩ একর	৪৫৭ মে. টন	১০৮৮ একর	২১৭৮ মে. টন
২০১০-১১	১১৭.৮৭ একর	৬১২৭.৬১মে.টন	১১৪.২ একর	৪৪২.০৬ মে.টন	১২৭৪.৭ একর	৬৫২৫.২২ মে.টন
	সরিষা		চিনা বাদাম		তিল	
	জমির পরিমাণ	উৎপাদন পরিমাণ	জমির পরিমাণ	উৎপাদন পরিমাণ	জমির পরিমাণ	উৎপাদন পরিমাণ
২০০৯-১০	৬৪৩.৫ একর	১৪২.২৭ মেঃটন	২০ একর	১২ মে. টন	৫৬৯৫একর	১৫৪১.৪৫মে. টন
২০১০-১১	৬৬৩ একর	১৫২ মে.টন	২৪ একর	১৭ মে.টন	৫২৫১ একর	১৩৮৬ মে.টন
	মরিচ		পেঁয়াজ		রসুন	
	জমির পরিমাণ	উৎপাদন পরিমাণ	জমির পরিমাণ	উৎপাদন পরিমাণ	জমির পরিমাণ	উৎপাদন পরিমাণ
২০০৯-১০	৫২৫ একর	৬৩৭ মে.টন	৩২৬ একর	৬৮৮ মে. টন	১৪৭ একর	২২৯ মে. টন
২০১০-১১	৫১৩ একর	৬২২ মে.টন	৩৩৮ একর	৭১৭ মে.টন	১৪০ একর	২১০ মে.টন
	টমেটো		মুলা		শিম	
	জমির পরিমাণ	উৎপাদন পরিমাণ	জমির পরিমাণ	উৎপাদন পরিমাণ	জমির পরিমাণ	উৎপাদন পরিমাণ
২০০৯-১০	৬৪৮ একর	১৬৯২ মে.টন	৫৭৯ একর	১৯৬১ মে. টন	৫৪০ একর	২০১৫ মে. টন
২০১০-১১	৬৮০ একর	৪৯৯১মে.টন	৫৮৬ একর	১৯৮২ মে. টন	৪৮৫ একর	১৭৮৭মে. টন
	মিষ্টি কুমড়া		পটল		বাঁধাকপি	
	জমির পরিমাণ	উৎপাদন পরিমাণ	জমির পরিমাণ	উৎপাদন পরিমাণ	জমির পরিমাণ	উৎপাদন পরিমাণ
২০০৯-১০	৮৩৩ একর	৩০০২ মে.টন	৯৬ একর	১৪৫ মে. টন	৬৩৭ একর	৪৯৬০ মে. টন
২০১০-১১	৮৪৭ একর	২৯৪৩ মে.টন	১০৪ একর	১৬০ মে. টন	৭১৫ একর	৫১৭৯ মে. টন
	বেগুন		ঢ্যাঁড়শ		কচু	
	জমির পরিমাণ	উৎপাদন পরিমাণ	জমির পরিমাণ	উৎপাদন পরিমাণ	জমির পরিমাণ	উৎপাদন পরিমাণ
২০০৯-১০	১০৪১ একর	২৪১০ মে.টন	৩৩৫ একর	৫৮৩ মে. টন	৪৩১ একর	৯৩৮ মে. টন
২০১০-১১	১০২৩ একর	২৩১৬ মে.টন	৩২৭ একর	৫৩০ মে. টন	৪৫৩ একর	১১৬০ মে. টন
	ফুলকপি		শশা		তরমুজ/বাঙ্গি	
	জমির পরিমাণ	উৎপাদন পরিমাণ	জমির পরিমাণ	উৎপাদন পরিমাণ	জমির পরিমাণ	উৎপাদন পরিমাণ
২০০৯-১০	৪৮৩ একর	৩০৫৬ মে.টন	১৫৩ একর	১৯৩ মে. টন	২২৩৬ একর	৩৬৫৩৫ মে. টন
২০১০-১১	৬০০ একর	৩১০৪ মে.টন	১৬৪ একর	২০৫ মে. টন	২২২৬ একর	৪১৮০ মে. টন

	পেঁপে		পেয়ারা		লেবু	
	জমির পরিমাণ	উৎপাদন পরিমাণ	জমির পরিমাণ	উৎপাদন পরিমাণ	জমির পরিমাণ	উৎপাদন পরিমাণ
২০০৯-১০	২৩৫ একর	২০৭৮ মে.টন	২০২ একর	১৪২০ মে. টন	২৬৩ একর	১৭১২ মে. টন
২০১০-১১	২৫২একর	২২০৫ মে.টন	২০৪ একর	১৬০৪ মে. টন	২৩৭ একর	১৮৯১ মে. টন
	কাঁঠাল		কলা		আনারস	
	জমির পরিমাণ	উৎপাদন পরিমাণ	জমির পরিমাণ	উৎপাদন পরিমাণ	জমির পরিমাণ	উৎপাদন পরিমাণ
২০০৯-১০	২৫৭ একর	৩৬১৭ মে.টন	১২৫৯ একর	৪৯২৫ মে. টন	৪৬ একর	১৫৫ মে. টন
২০১০-১১	২৭৩ একর	৩৬১৯ মে.টন	২১১৬ একর	৪৩৯৩ মে. টন	৪০ একর	১৪৫ মে. টন
	আম		লিচু		জাম	
	জমির পরিমাণ	উৎপাদন পরিমাণ	জমির পরিমাণ	উৎপাদন পরিমাণ	জমির পরিমাণ	উৎপাদন পরিমাণ
২০০৯-১০	৮৬২ একর	৭১১১ মে.টন	১৪০ একর	২৬৭ মে. টন	১৩৮ একর	৮৮৩ মে. টন
২০১০-১১	৮৬৮ একর	৭১৮১ মে.টন	১৪৪ একর	৩১৪ মে. টন	৫৯ একর	৩০৯ মে. টন
	তেঁতুল		আদা			
	জমির পরিমাণ	উৎপাদন পরিমাণ	জমির পরিমাণ	উৎপাদন পরিমাণ	জমির পরিমাণ	উৎপাদন পরিমাণ
২০০৯-১০	৫৩৮ একর	১৪০৫০ মে.টন	৫৯ একর	৯৪০ মে. টন	একর	মে. টন
২০১০-১১	৫৪১ একর	১৩৬৯.৬৯মে.টন	৫২.১ একর	৭৯.৯৭ মে. টন	একর	মে. টন

Source : District Statistics, Khulna.2011. P. 40-53.

২০১১ সালে খুলনা জেলায় মিনিকেট চালের কেজি প্রতি গড় মূল্য ছিল ৪০ টাকা। সর্বোচ্চ মূল্য ছিল ফুলতলা উপজেলায় ৪৪ টাকা এবং সর্বনিম্ন ডুমুরিয়া উপজেলায় ছিল ৩২ টাকা। মাঝারি মানের চালের কেজি প্রতি গড় মূল্য ছিল ৩২ টাকা। সর্বোচ্চ মূল্য ছিল কয়রা উপজেলায় ৩৮ টাকা এবং সর্বনিম্ন ছিল ডুমুরিয়া উপজেলায় ২৫ টাকা। সাধারণ মানের চালের গড় মূল্য ছিল ২৫ টাকা, সর্বোচ্চ মূল্য ছিল দাকোপ উপজেলায় ৩০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ছিল ডুমুরিয়া উপজেলায় ২৩ টাকা। কেজিপ্রতি গমের গড় মূল্য ছিল ২০ টাকা। গমের কেজিপ্রতি সর্বোচ্চ মূল্য ছিল ফুলতলা উপজেলায় ২৫ টাকা এবং সর্বনিম্ন ছিল বটিয়াঘাটা উপজেলায় ১৮ টাকা। আটার গড় মূল্য ছিল কেজিপ্রতি ২৭ টাকা। সর্বোচ্চ মূল্য ছিল ডুমুরিয়া, কয়রা ও রূপসা উপজেলায় ৩০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ছিল বটিয়াঘাটা উপজেলায় ২৩ টাকা। আলুর কেজি প্রতি গড় মূল্য ছিল ১০ টাকা। সর্বোচ্চ ছিল সিটি করপোরেশনে ১৩.৪ টাকা। ভোজ্যতেল সয়াবিনের কেজিপ্রতি গড় মূল্য ছিল ১১০ টাকা। সর্বোচ্চ মূল্য ছিল ডুমুরিয়া ও দাকোপ উপজেলায় কেজি প্রতি ১৩০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ছিল বটিয়াঘাটা উপজেলায় ১১৫ টাকা।

২০১১ সালে এখানের একজন কৃষি শ্রমিক দৈনিক আয় করত ১৮০ টাকা। তখন সাধারণ মানের চাল ছিল ২৫ টাকা কেজি। ১৮০ টাকায় সাধারণ মানের চাল কেনা যেত ৭.২ কেজি। গড়ে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের জন্য জনপ্রতি দৈনিক ৬০০ গ্রাম চাল হিসেবে দৈনিক প্রয়োজন হতো ৩ কেজি চাল। যার মূল্য ছিল ৭৫ টাকা। চাল কেনার পর একজন কৃষি শ্রমিকের হাতে দৈনিক অতিরিক্ত ১০৫ টাকা থাকতো। গ্রামে বসবাস করায় এ সব কৃষি শ্রমিক পরিবারের শাক-সবজি প্রায় কিনতেই হতো না। অন্যান্য ব্যয়ও কম ছিল। ফলে অতিরিক্ত টাকা পরিবারের চিকিৎসা, শিক্ষা ও বস্ত্র খাতে ব্যয় করতে পারতো। বলাবাহুল্য,

অনেক কৃষি শ্রমিক পরিবারে একাধিক সদস্য পূর্ণকালীন ও খন্ডকালীন শ্রমদানে নিযুক্ত থাকায় পরিবারের মোট আয় বৃদ্ধি পেত। সারা বছরই কৃষি শ্রমিকদের হাতে কোনো না কোনো কাজ থাকতো। ফলে খুলনা জেলার কৃষি শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান আগের তুলনায় অনেক উন্নতি হয়েছে।

সারণি-৬০

খুলনা জেলার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজার মূল্য:

(মূল্য- প্রতি কেজি টাকায়)

উপজেলার নাম	চিকন চাল (মিনিকেট)	মাঝারি চাল	সাধারণ বা মোটা চাল	গম	আটা	আলু	সয়াবিন তেল
বটিয়াঘাটা	৪০	৩৫	২৬	১৮	২৩	১০	১১৫
দাকোপ	৪০	২৮	৩০	২০	২৬	১০	১৩০
দিঘলিয়া	৪২	৩৫	২৭	২০	২৬	১২	১২৮
ডুমুরিয়া	৩২	২৫	২৩	২০	৩০	১২	১৩০
খুলনা সিটি করপোরেশন	৪৩	৩৬	২৯.৪	২২.৬	২৭.৬	১৩.৪	১২৩.৬
কয়রা	৪৫	৩৮	২৬	১৫	২৮	১২	১২৫
পাইকগাছা	৪০	৩২	২৫	২০	৩০	১০	১২৫
ফুলতলা	৪৪	৩৩	২৩	২৫	২৮	১২	১২৮
রূপসা	০	৩৫	২৫	২২	৩০	১২	১২৪
তেরখাদা							
গড়	**৩৬.২**	**৩৩**	**২৬**	**২০**	**২৭.৬**	**১০**	**১২৫.৪**

Source: District Statistics, Khulna.2011. p 101.

২০১১ সালে খুলনা জেলায় কৃষিখাতে নিযুক্ত একজন পুরুষ শ্রমিকের দৈনিক গড় মজুরি ছিল ১৮০ টাকা এবং একজন মহিলা শ্রমিকের দৈনিক গড় মজুরি ছিল ১৫০ টাকা। ১৫ বছরের নিচে বয়স একজন শিশু শ্রমিকের দৈনিক গড়মজুরি ছিল ৮০ টাকা। খুলনা সিটি করপোরেশনে একজন পুরুষ শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ছিল ২৬০ টাকা, বটিয়াঘাটা এবং দাকোপ উপজেলায় ছিল ২৫০ টাকা, যা ছিল জেলার মধ্যে সর্বোচ্চ; সর্বনিম্ন ছিল কয়রা উপজেলায় ১৯০ টাকা। মহিলাদের সর্বোচ্চ দৈনিক গড়মজুরি ছিল বটিয়াঘাটা উপজেলায় ২০০ টাকা; এ ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ছিল ডুমুরিয়া উপজেলায় ১২০ টাকা। দিঘলিয়া, কয়রা, ফুলতলা ও রূপসা উপজেলায় শিশু শ্রমিকদের দৈনিক গড়মজুরি ছিল ১০০ টাকা, যা ছিল সর্বোচ্চ; সর্বনিম্ন ছিল ডুমুরিয়া উপজেলায় ৫০ টাকা।[১৫]

[১৫] B.B.S. District Statistics, Khulna, 2011, P. 103.

পশুপালন খাত খুলনা জেলার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পশু ও হাঁস-মুরগি থেকে আয় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। পশুর চামড়া, হাড়, শিং ইত্যাদি শিল্পের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলো বিদেশে রফতানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করাও সম্ভব। জেলার প্রতি উপজেলায় পশুপালন অফিস রয়েছে। জেলায় একটি পশুপালন হাসপাতাল রয়েছে। দেশের দরিদ্র জনগণকে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামার স্থাপনে উৎসাহ প্রদান ও সহায়তা করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প হতে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

খুলনা জেলা পশুসম্পদে বেশ সমৃদ্ধ। ১৯৮৪-৮৫ সালের কৃষিশুমারি অনুযায়ী খুলনা জেলার মোট ৪৯.৯% কৃষি হোল্ডিংয়ের কাছে গবাদিপশু ছিল, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যা ছিল ৫২.৫%। ৩৩.৬% হোল্ডিংয়ে ছাগল ও ভেড়া ছিল, যা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ৩৭.৮%। বাংলাদেশের মোট হাঁস-মুরগির ৩.৪% এখানে পাওয়া যায়, যা ৮২.৭% কৃষি হোল্ডিংয়ের কাছে ছিল। ১৯৮৪-৮৫ সালের মোট রিজিওনাল উৎপাদনের পশু পালন উপ-খাতের অবদান ছিল ৬.১%, যা বাংলাদেশের বেলায় ৬.৪%। ২০০৩-০৪ সালে খুলনা জেলায় গাভীর খামার ৩০০টি, ছাগলের খামার ৩৭টি, মুরগির খামার ৪২২টি, ভেড়ার খামার ২টি রেজিস্ট্রেশন করা হয়।[১৬]

২০০৮ সালে খুলনা জেলায় ৩,৭৪,৬২৬টি গোরু ও মহিষ, ২,৮৮,১৭৯টি ছাগল ও ভেড়া, ১৭,৬৩,৯৯৬টি হাঁস ও মুরগি ছিল এবং এসব লালনপালন কাজে নিযুক্ত শ্রমশক্তি ছিল মোট ৪,০৯,২৫৯ জন (পুরুষ ২,৮০,০১৫ + মহিলা ১,২৯,২৪৪)।[১৭] ২০০৮ সালে খুলনা জেলায় ১,৮৯,৪৭৭টি গবাদিপশু পালনকারী পরিবারের মধ্যে ১-৩টি গবাদি পশুর মালিক ছিল ১,১৬,৮৯৬টি পরিবার, ৪-৬টি গবাদি পশুর মালিক ছিল ৫৩,১৭৮টি পরিবার, ৭-৯টি গবাদি পশুর মালিক ছিল ১৩,৮৩৫টি পরিবার, ১০-১৫টি গবাদি পশুর মালিক ছিল ৫,০৯৪টি পরিবার এবং ১৫ বা ততোধিক সংখ্যক গবাদি পশুর মালিক ছিল ১,৪০৮টি পরিবার।[১৮] ২০০৮ সালে খুলনা জেলায় মোরগ-মুরগি লালনপালনকারী ১,৮২,০৪৬টি পরিবারের কাছে মোট মোরগ-মুরগি ছিল ১১,৭৬,৮৮৭টি, ১,২৯,৯২৬টি পরিবারের কাছে হাঁস ছিল ৬,১৮,৩৬১টি।[১৯] ২০১১ সালের তথ্য অনুযায়ী খুলনা জেলায় ২২০৬টি পোলট্রি ফার্ম ও ৯২১টি ডেয়ারি ফার্ম রয়েছে।[২০]

খনিজ সম্পদ খনিজ সম্পদে খুলনা জেলার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল সম্ভাবনাময়। এ জেলার তেরখাদা উপজেলার কলা মৌজায় পিট কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। এই পিট কয়লার স্তর ০.২৫ মিটার পুরু। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (১৯৯৯) এর হিসাব অনুসারে ৩৯ বর্গকিলোমিটার এলাকায় এই কয়লার মজুদের পরিমাণ ৮

---

[১৬] শিল্পায়নে খুলনা জেলা।।৩৭ .পৃ ,২০০৭ .খুলনা ,বিসিক ,

[১৭] B.B.S, Statistical Yearbook of Bangladesh. 2012, p. 126.

[১৮] B.B.S. District Statistics, Khulna. 2011. p. 33.

[১৯] ঐ. পৃ. ৩৪।

[২০] ঐ. পৃ. ২৩।

মিলিয়ন টন। এ ছাড়া উপকূলীয় এলাকায় তেল-গ্যাস ক্ষেত্রের উপস্থিতি ও সম্ভাবনার বিচারে পেট্রোবাংলা সমগ্র বাংলাদেশকে মোট ২৩ ব্লকে ভাগ করেছে। সুন্দরবন ৫ ও ৭ নং ব্লকের অন্তর্ভুক্ত।

শিল্প খাত

১৯৬১ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে খুলনা জেলায় শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে। এসময় খুলনা জেলায় স্থাপিত প্রধান শিল্পসমূহের মধ্যে ছিল বস্ত্রকল, হোসিয়ারি কারখানা, নিউজপ্রিন্ট, হার্ডবোর্ড, তেল শোধনাগার, আয়রন রি-রোলিং কারখানা, জাহাজ নির্মাণ, কাঠ প্রক্রিয়াজাতকরণ, দিয়াশলাই কারখানা, ক্যাবল ফ্যাক্টরি, ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, নারকেল ছোবড়ার আঁশ শিল্প এবং মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প। ১৯৬৩ সালে এখানে প্রথম কোল্ড স্টোরেজ বা মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপিত হয়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ শিল্পের মধ্যে টেক্সটাইল মিল, স্টিল মিল, পাটকল, হোসিয়ারি, শিপইয়ার্ড, পেপারকল, হার্ডবোর্ড মিল, ক্যাবল ফ্যাক্টরি; ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং, ধাতব, রাসায়নিক, রং, খাদ্য, তামাক, তাঁত, বাঁশ ও বেত, কাঠের দ্রব্য, পাটের জিনিস, মাটির তৈরি দ্রব্য, চাল ও ময়দার কারখানা, বরফ কল ও বেকারি উল্লেখযোগ্য।

১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত খুলনা জেলায় মোট ১১টি বড়ো আকারের পাটকল স্থাপন করা হয়। এ সব পাটকলে বার্ষিক ১,৫৫,০০০ টন পাটজাত দ্রব্য উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্যে হেসিয়ান, স্যাকিং এবং কার্পেট ব্যাকিং উল্লেখযোগ্য। এসব পাটকলে মোট ৩৭,০০০ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়। পাটকলগুলোর নাম ছিল- ১. দৌলতপুর জুট মিলস্ লিমিটেড, ২. প্লাটিনাম জুবলি জুট মিলস্ লিমিটেড, ৩. স্টার জুট মিলস্ লিমিটেড, ৪. ক্রিসেন্ট জুট মিলস্ লিমিটেড, ৫. পিপলস্ জুট মিলস্ লিমিটেড, ৬. অ্যাজাক্স জুট মিলস্ লিমিটেড, ৭. সোনালি জুট মিলস্ লিমিটেড, ৮. মোহসেন জুট মিলস্ লিমিটেড, ৯. আলীম জুট মিলস্ লিমিটেড, ১০. ইস্টার্ন জুট মিলস্ লিমিটেড, ১১. আফিল জুট মিলস্ লিমিটেড।

বিভাগীয় শহর, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও কাঁচামালের বিপুল সমারোহকে কেন্দ্র করে খুলনায় বড়ো বড়ো কলকারখানা গড়ে উঠেছে, যা একে শিল্প শহরের মর্যাদা দিয়েছে।[২১] ১৯৮২ সালে খুলনা মহানগরীতে ১১টি পাটকল, ১টি ক্যাবল ফ্যাক্টরি, ১টি নিউজপ্রিন্ট মিল, ১টি হার্ডবোর্ড মিল, ১টি জাহাজ নির্মাণ কারখানা বা শিপইয়ার্ড, ১টি বস্ত্রকল, ২টি ম্যাচ ফ্যাক্টরিসহ ছোটো বড়ো অনেক কারখানা ছিল। ভৈরব ও রূপসা নদীর তীরে খালিশপুর, রূপসা এবং শিরোমণি শিল্পাঞ্চলে এসব কারখানা অবস্থিত ছিল।[২২] ১৯৮৩ সালের জেলা পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ জেলায় দেশের ২২% পাটকল অবস্থিত ছিল এবং দেশের কর্মরত মোট পাট শ্রমিকের ২৩%। বাংলাদেশের মোট পাটজাত দ্রব্যের ২০.৬৪% এ জেলায় উৎপাদিত হতো। এখানে দেশের ৪% সুতিবস্ত্রকলে ১.৭৭% সুতা ও ২.০১%

[২১] মোঃ নুরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯-৪৪৮।
[২২] ওই, পৃ. ৩৫৪।

কাপড় প্রস্তুত হতো। ১৯৭৯-৮০ থেকে ১৯৮১-৮২ সাল পর্যন্ত তিন বছরে নিউজপ্রিন্ট উৎপাদনের বার্ষিক গড় ছিল ৩৫.৭১০ মেট্রিক টন। ১৯৮৮-৮৯ সালের সি.এম.আই (Census of Manufacturing Industries) প্রতিবেদন অনুযায়ী এ জেলায় মোট ৬১৫টি উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল। এর মধ্যে ২৬টি মৎস্য ও সমুদ্রজাত খাদ্য, ২৪টি অন্যান্য খাদ্য, ২১টি জুট ও টেক্সটাইল মিল, ২টি কটন টেক্সটাইল মিল, ৮টি মেশিনারি, ২৬টি জুট প্রেসিং ও বেলিং এবং ৫০৮টি অন্যান্য শিল্প কারখানা ছিল।

এক সময়ের শিল্পনগরী হিসেবে খ্যাত খুলনার খ্যাতি ধীরে ধীরে অস্তমিত হতে থাকে। এই অঞ্চলের বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর কয়েকটি ১৯৮৭ সাল হতে ২০০২ সালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে ১. কোরেশী স্টিল মিলস, ২. বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ ৩. খুলনা টেক্সটাইল মিলস ৪. বাংলাদেশ ম্যাচ ফ্যাক্টরি ৫. দৌলতপুর জুট মিলস ৬. খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস ৭. খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস বন্ধ হয়ে গেলে হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। এ সব শিল্পের ওপর নির্ভরশীল বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জীবিকার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে বন্ধ হওয়া শিল্পের কয়েকটি পুনরায় চালু করা হয়। ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে খুলনা জেলায় চালু পাটকল ছিল ৭টি। এ সব পাটকলে মোট ৩৪,৮৭৪ জন শ্রমিক কাজ করতো।[২৩] বিসিক, খুলনার এক প্রতিবেদন অনুসারে ২০০৭ সালে খুলনা জেলার মোট বৃহৎ শিল্প কারখানার সংখ্যা ছিল ১২, মাঝারি শিল্প সংখ্যা ৭৭টি, ক্ষুদ্র শিল্পের খাতভিত্তিক সংখ্যা ছিল ২,৪০৮টি, ৫৭টি উপখাতে কুটিরশিল্পের মোট সংখ্যা ১৯,৬৮৭টি।[২৪]

১৯৮৩-৮৪ সালের কৃষিশুমারি অনুযায়ী এ জেলায় ৮.২% পরিবারের কুটিরশিল্প ছিল এবং এটা সমগ্র বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ৬.৮%। এখানে ৭৭৫টি ধান ভাঙানো কল, ৪৪৯টি ময়দার কল, ১৪৬টি করাত কল, ১৬৮টি তেল কল, ৫২টি ইট ভাটা এবং ২২,১৪১টি চালু হস্তচালিত তাঁত ছিল। এ হস্তচালিত তাঁতে মোট ৩,৭৩৭ জন শ্রমিক কর্মরত ছিল। ১৯৮৪-৮৫ সালের মোট রিজিওনাল উৎপাদনের ৭.৩% এ খাতের অবদান এবং এটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ছিল ৮%।

১৯৮৩ সালের জেলা পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট হস্তচালিত তাঁত স্থাপনার ৪% এবং মোট তাঁতের ২.৯% খুলনা জেলায় অবস্থিত ছিল। দেশের মোট হস্তচালিত তাঁতজাত দ্রব্যাদির ২.৩% এখানে উৎপাদিত হতো। ১৯৯০ সালে খুলনা জেলায় ১,৮৭৮টি ইউনিটে মোট ৩,৫১৬টি তাঁত ছিল। ১,৮৬০টি পরিবারের হাতে ছিল ৩,৪৪০টি হস্তচালিত তাঁত, অংশীদারি ৭টি প্রতিষ্ঠানের ছিল ২৪টি তাঁত এবং ১১টি সমবায় ইউনিটের ছিল ৫২টি তাঁত। খুলনা জেলা পরিসংখ্যান-২০১১ অনুসারে খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা, ডুমুরিয়া ও ফুলতলা উপজেলায় ৬৮২ ওয়েভিং তাঁত এবং ১,৯৩১টি হস্তচালিত তাঁত রয়েছে। এ

[২৩] শিল্পায়নে খুলনা জেলা, বিসিক, খুলনা, ২০০৭, পৃ. ২৭।
[২৪] ওই. পৃ. ২৭-৩১।

ছাড়াও খুলনা জেলায় অটোরাইস মিল ৩৬টি, সেমি অটোরাইস মিল ২০৯টি, সাধারণ রাইস মিল ৪৭৪টি, ৮,১৩২টি হাস্কিং কটেজ মিল, ৩,১৭৩টি কটেজ মিল, ৬৪৯টি গুড়শিল্প, ৫টি বিড়ি কারখানা, ৬টি লবণ ফ্যাক্টরি, ৬৩টি মাছ শুঁটকিকরণ শিল্প, ২,৫২২টি মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেতের শিল্প ইউনিট ১,০৮৭টি, কাঠের কারখানা ৬৪৫টি, স'মিল ২৫৫টি, অয়েল মিল ৬৯টি, ৪৯টি বেকারি, ছাপাখানা ৭৭টি, দর্জির দোকান ২,৮৩৫টি, স্থানীয় গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি ১, কোল্ড স্টোরেজ ১টি, আটার কল ১১৫টি, প্লাস্টিক কারখানা ৪টি এবং অন্যান্য ১,০০৯টি শিল্প কারখানা রয়েছে।[২৫]

খুলনা জেলা পরিসংখ্যান-২০১১ অনুযায়ী ২০১১ সালে খুলনা জেলায় ১১টি পাটকলে ৫,৮৮৫টি তাঁতে মোট ২৯,৭২৮ জন শ্রমিক কর্মরত আছে। এ সময়ে ৩টি স্টিল মিলসহ মোট ৬৪টি বৃহৎশিল্প থাকলেও জেলায় কোনো টেক্সটাইল মিল, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি, ম্যাচ ফ্যাক্টরি, অ্যালুমিনিয়াম কারখানা কিংবা সুগার মিল ছিল না।[২৬]

১৯৫০ সালের আগে এ জেলায় লবণ ও গুড় প্রস্তুত ব্যতীত কোনো উল্লেখযোগ্য শিল্পের অস্তিত্ব ছিল না। ১৯৮২ সালে প্রকাশিত মো. নুরুল ইসলাম রচিত 'খুলনা জেলা' গ্রন্থে খুলনা জেলার লবণ শিল্প সম্পর্কে বলা হয় যে, একদা লবণ শিল্পে খুলনার সুনাম ছিল। ব্রিটিশ আমলে এই শিল্পের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। পাকিস্তান আমলেও লবণ শিল্পের দিকে নজর দেওয়া হয়নি। জেলার উপকূলবর্তী এলাকায় কুটিরশিল্পের ভিত্তিতে সাধারণত লবণ প্রস্তুত করা হয়। লবণ উৎপাদনের পর্যায়ে প্রাকৃতিক অবস্থাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে লবণ উৎপাদন করা সহজ হয়। খুলনা জেলায় প্রায় ১০,২২০ জন শ্রমিক লবণ উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত আছে। এখানে ২০টি লবণ মিল রয়েছে।[২৭]

মৎস্যসম্পদ

কৃষিক্ষেত্রে খুলনা জেলার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো মাছের প্রাচুর্য। জেলায় প্রধানত তিন ধরনের মাছ পাওয়া যায়। (১) মিঠা পানির মাছ (Fresh water fish) (২) লোনা পানির মাছ (Marine fish) এবং (৩) ঈষৎ লোনা পানির মাছ (Estuarine fish)। প্রথম শ্রেণির মধ্যে কই, মাগুর, শোল, শিং, রুই, কাতলা, মৃগেল, চিতল ইত্যাদি প্রধান। তেরখাদা ও অন্যান্য বিল এলাকায় এ জাতীয় মাছ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় শ্রেণির মাছের মধ্যে রয়েছে রূপচান্দা, শুকচান্দা, লটিয়া, বাগদা চিংড়ি ইত্যাদি। এসব মাছ গভীর সমুদ্রে ধরা পড়ে। প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট সময়ে সুন্দরবনের দুবলার চরে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে জেলেরা মাছ ধরতে আসে। এছাড়া ঈষৎ লোনা পানির মাছের মধ্যে দাতনা, ভেটকি, পাঙ্গাশ, বাইন, ট্যাংরা, চিতল, ভাংগন ইত্যাদি প্রধান। এ গুলো

---

[২৫] B.B.S. District Statistics, Khulna. 2011. p. 58-67.

[২৬] B.B.S. District Statistics, Khulna. 2011. p. 57.

[২৭] শিল্পায়নে খুলনা জেলা, বিসিক, খুলনা, ২০০৭, পৃ. ০৯।

সুন্দরবনের নদী ও খাল থেকে এবং বাঁধবন্দি এলাকা থেকে ধরা হয়। এ ছাড়াও রূপসার ইলিশ দেশবিখ্যাত মাছ।

সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের মধ্যে কেবলমাত্র খুলনা জেলাতেই একযোগে নদী-মোহনা, সুন্দরবন, খাল-বিল, খাঁড়ি, বর্ষাকালে ধানক্ষেত, বন্যা প্লাবনভূমি ও বাঁওড় এলাকায় প্রচুর মাছ ধরা হয়। ২০০১-২০০২ সালে জেলায় মোট ২২,১৯০ মেট্রিক টন মাছ ধরা হয়, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের ২,৫১,৯৯৯ মেট্রিক টন এবং বাংলাদেশের ৬,৮৫,০৮০ মেট্রিক টন পরিমাণের তুলনায় যথাক্রমে ৯% এবং ৩%। শুধু বিল এলাকা থেকে ২০০১-২০০২ সালে ১১৬ মেট্রিক টন মাছ ধরা হয়।[২৮] ২০১২-১৩ সালে বিল হতে ১১২ মেট্রিক টন, পুকুর হতে ১২,৩০৮ মেট্রিক টন, বাঁওড় হতে ১৬০ মেট্রিক টন এবং চিংড়ি ঘের হতে ৪০১০৭.০৭ মেট্রিক টন মাছ ধরা হয়।[২৯]

খুলনা জেলার সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা ধরনের পুকুর। ১৯৮৩ সালের জেলা পরিসংখ্যান অনুযায়ী খুলনা জেলার মোট আয়তনের প্রায় ৮% বিল/হাওর, ০.৪৭% পুকুর/দিঘি এবং ১২.৩% নদী/খাল ছিল, যেখানে এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শতকরা হার ছিল যথাক্রমে ২%, ১% এবং ৬%। ২০১৫ সালে খুলনা জেলার ৩৯,৮৪০টি পুকুর দিঘির মোট আয়তন ৪২৩৪.৭৩ হেক্টর। ২০১৫ সালে খুলনা জেলায় মোট মাছ ধরা হয় ৬৮,৬১২.৫০মেট্রিক টন। এ সব মাছ ধরার কাজে ২৭,৯৪২ জন জেলে নিয়োজিত ছিল। ২০১৫ সালে খুলনা জেলায় অভ্যন্তরীণ জলভাগ থেকে মোট ৬৮,৬১২.৫০ মেট্রিক টন মাছ আহরণ করা হয়। তার মধ্যে নদী থেকে ১৬৫৯.৫৬ মেট্রিক টন, খাল থেকে ১৪৪২.৬৭ মেট্রিক টন, বিল থেকে ৩৩৭৫.১৫ মেট্রিক টন, বাণিজ্যিক খামার থেকে ৬১৫১.০০ মেট্রিক টন, বাগদা ঘের থেকে ১৩,৪৪৭.১৭ মেট্রিক টন, গলদা ঘের থেকে ১৩,৮৯৭.৯০ মেট্রিক টন, ধান খেতে মাছচাষ থেকে ৬৫.০০ মেট্রিক টন, বরোপিট ৫০০.১৮ মেট্রিক টন, সামুদ্রিক মৎস্য অবতরণ ৬৮২০ মেট্রিক টন, ইলিশ অবতরণ ৪০৪০.০০ মেট্রিক টন, সুন্দর বন থেকে ২০৬২.০০ মেট্রিক টন, সমাজভিত্তিক মাছচাষ ২৩৪.৭৫ মেট্রিক টন, প্লাবনভূমি থেকে ২৭৭.০০ মেট্রিক টন, খাঁচায় মাছচাষ থেকে ২.৪০ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত হয়।

১৯৯৯ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলায় ৩টি, ২০০১ সালে পাইকগাছা উপজেলায় ১টি হ্যাচারি স্থাপিত হয়। মৎস্য অধিদপ্তরের ২০০৩ সালের তথ্য অনুযায়ী খুলনা জেলায় ৪টি মৎস্য সেবাকেন্দ্র ছিল। জেলা মৎস্য অফিস খুলনার তথ্য অনুসারে ২০১৫ সালে খুলনা জেলায় ১৪টি মৎস্য হ্যাচারি, ২৬২টি কার্পজাতীয় মাছের নার্সারি, ৫১টি চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা ছিল।

---

[২৮] Department of fisheries.

[২৯] B.B.S, Statistical Yearbook of Bangladesh 2012, p. 161.

২০০১৫-২০১৬ সালে খুলনা জেলায় ১৩,৪৪৭.১৭ মেট্রিক টন বাগদা চিংড়ি, ১৩,৮৯৭.৯০ মেট্রিক টন গলদা চিংড়ি মাছ উৎপাদিত হয়। ২০১৫-১৬ খুলনা জেলায় চিংড়ির ঘের থেকে ২৭,৩৪৫.০৭ মেট্রিক টন মাছ আহরিত হয়।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে খুলনা হতে প্রায় ২৪৮৬.৯৮ কোটি টাকার চিংড়ি বিশ্ববাজারে রফতানি হয়।

নদনদী খালবিলের জেলা খুলনায় মাছ একটি অর্থকরী সম্পদ। শুধু সুন্দরবন অঞ্চলে প্রায় ২০ হাজার মৎস্যজীবী রয়েছে। তাদের জীবনযাপনের প্রধান উৎসই হচ্ছে মাছ। এখানকার মাছ শুঁটকি করে রফতানিপূর্বক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয়। মাছ সংরক্ষণের জন্য প্রধানত সূর্যের আলো ব্যবহার করা হয়। মাছের নাড়িভূঁড়ি বের করে রোদে শুঁকিয়ে পরে বাণিজ্যিকভিত্তিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে রফতানি করা হয়। এ ছাড়া লবণ দিয়ে এবং বরফে মাছ সংরক্ষণ করে দেশে এবং বিদেশে রফতানি করা হয়। মাছ ও ব্যাঙ সংরক্ষণের জন্য হিমায়ন ব্যবস্থাও ব্যবহার করা হয়। খুলনায় কয়েকটি মাছ হিমায়ন কেন্দ্র আছে। ফিশ এক্সপোর্ট লি. প্রভৃতি সংস্থা মাছ হিমায়িত করে বিদেশে রফতানি করে। ফিশ এক্সপোর্ট লি. খুলনা জেলার মাছ সংরক্ষণের এক বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৭-৭৮ সালে এই প্রতিষ্ঠান ৪২,৭৮,০৯০ টাকা মূল্যের চিংড়ি মাছ, ব্যাঙের পা ও হোয়াইট ফিশ প্রভৃতি বিদেশে রফতানি করে। চিংড়ি তথা হিমায়িত খাদ্য বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রফতানি খাত হিসেবে চিহ্নিত। এ খাত থেকে আয় হচ্ছে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা। বর্তমানে দেশের মোট রফতানিকৃত চিংড়ির প্রায় ৭৫ শতাংশই খুলনা জেলা হতে বিদেশের বাজারে রফতানি হয়ে থাকে।

খুলনা দেশের অন্যতম চিংড়ি উৎপাদনকারী জেলা। ষাটের দশকের শেষে খুলনা-সাতক্ষীরার কিছু অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতার কারণে ফসল উৎপাদন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই এখানে মাছের স্থানীয় চাহিদা মেটাতে বিকল্প মাছ চাষ পদ্ধতিতে ঘের তৈরি করে মাছচাষ শুরু করা হয়। সে সময় কেবলমাত্র ভেটকি, পারশে এবং ট্যাংরা মাছচাষ করা হতো। পরে এ সব ঘেরে চিংড়ি মাছ চাষ শুরু হয়। সত্তরের দশকে বিশ্ব বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে চিংড়ি একটি লাভজনক উৎপাদনে পরিণত হয়। আশির দশকে চিংড়ির চাহিদা ব্যাপকহারে বেড়ে যাওয়ায় চিংড়িচাষ অর্থনৈতিক গুরুত্ব অর্জন করে। ফলে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বিশেষত দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে চিংড়িচাষ বিস্তার লাভ করে।

১৯৯৬-৯৭ সালে চিংড়ি চাষের জমির পরিমাণ ছিল ২৮,৬১৯ হেক্টর এবং তা থেকে ১১,৪৬০ মেট্রিক টন চিংড়ি উৎপাদিত হয়। মৎস্য অধিদপ্তরের ২০০৩ সালের এক হিসাব অনুযায়ী গত ২000-২০০১ সালে খুলনা জেলায় মোট ২৯,৫৫১ হেক্টর এলাকার চিংড়িঘের থেকে মোট ১৩,৮৮৯ মেট্রিক টন বাগদা ও গলদা চিংড়ি উৎপাদিত হয়। ২০০৯-১০ সালে খুলনা জেলায় ৯৯৮০ মেট্রিক টন

বাগদা চিংড়ি, ৮,৪০৯.১৪ মেট্রিক টন গলদা চিংড়ি মাছ উৎপাদিত হয়।[৩০] ২০১০-১১ খুলনা জেলায় চিংড়ির ঘের থেকে ৩৫,৭৭৫.৯০ মেট্রিক টন মাছ আহরিত হয়।[৩১] ২০১২-১৩ সালে ১২,৪৯০ মেট্রিক টন বাগদা চিংড়ি, ১১,৮৩৩.৭৭ মেট্রিক টন গলদা চিংড়ি মাছ উৎপাদিত হয়।[৩২]

খুলনা জেলাতেই দেশের অধিকাংশ চিংড়ি চাষের এলাকা অবস্থিত। জেলার অনেক অনাবাদি জমি ব্যবহৃত হচ্ছে চিংড়ি চাষে। ফলে বিপুলসংখ্যক লোক বেকারত্বের অভিশাপ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারছে চিংড়ি চাষের কল্যাণে। খুলনা জেলায় বর্তমানে গলদা, বাগদা, হরিনা, চাকা, গড্ডা, কোট্রা ইত্যাদি চিংড়ি উৎপাদিত হয়। বছরের মে থেকে আগস্ট পর্যন্ত মাছ বেশি পাওয়া যায়। কাঁচামালের সহজলভ্যতা এবং দক্ষ শ্রমিক প্রাপ্তির কারণেই খুলনা জেলা চিংড়ি রফতানির প্রধান উৎস ক্ষেত্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। স্বাধীনতা পূর্বকালের ২টি শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ স্বাধীনতা-উত্তর এ যাবৎকালে খুলনা জেলায় মোট ৭৪টি হিমায়িত খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ২৮টি। এ শিল্পে হাজার হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে খুলনা হতে প্রায় ১২০০ কোটি টাকার চিংড়ি বিশ্ববাজারে রফতানি হয়।

চিংড়ি তথা হিমায়িত খাদ্য বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রফতানি খাত হিসেবে চিহ্নিত। সমগ্র বিশ্বের চিংড়ি উৎপাদনের ২৫% বাংলাদেশে উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে দেশের মোট রফতানিকৃত চিংড়ির প্রায় ৭৫ শতাংশই খুলনা অঞ্চল হতে বিদেশের বাজারে রফতানি হয়ে থাকে। বিগত ২০০২-৩, ২০০৩-৪ ও ২০০৪-৫ সালে খুলনা জেলার চিংড়ি ও হিমায়িত মাছ রফতানির তথ্য নিম্নরূপ:

সারণি-৬১

খুলনা জেলার চিংড়ি ও হিমায়িত মাছ রফতানি (২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭):

পরিমাণ: মেট্রিক টন: কোটি টাকা

ক্র. নং	দ্রব্যের নাম	২০১৫-২০১৬ (জুলাই/১৫-জুন/১৬		২০১৬-২০১৭ (জুলাই/১৬-সেপটেম্বর/১৬)	
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
০১	হিমায়িত চিংড়ি	২৮,৫৪১.৪৪২	২,৪৮৬.৯৮	৯,৩৮১.৫৩৭	৭৩২.১৪
০২	হিমায়িত সাদা মাছ/ কার্প	১২১.২৪১	৪.৬৬	৪৮.৮১৬	১.০৭
০৩	বরফায়িত মাছ	৩,০২৪.০৫	১০১.২১	২৪৭.০১৪	৪.৩৪৭
	মোট	৩১,৬৮৬.৭৩৮	২,৫৯২.৮৫	৯,৬৭৭.৩৬৭	৭৩৭.৫৫৭

সূত্র: জেলা মৎস্য কার্যালয়, খুলনা।

[৩০] B.B.S, Statistical Yearbook of Bangladesh 2012, p. 161.
[৩১] ওই. পৃ. ১৫৪।
[৩২] ওই, পৃ. ১৬৮।

সারণি-৬২
খুলনা জেলার হিমায়িত চিংড়ি উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রমিক নং	চিংড়ির প্রকারভেদ	ঘেরের সংখ্যা	ঘেরের আয়তন (হেক্টর)	মোট উৎপাদন (মেট্রিক টন)	হেক্টর প্রতি উৎপাদন (কেজি/হেক্টর
০১	বাগদা	২৬,৭৭৩টি	৩৭,৪৬৪.৩৪	১৩,৪৪৭.১৭	৩৫৯.০০
০২	গলদা	৪৮,৯৪৩টি	২১,২৫৯.০৪	১৩,৮৯৭.৯০	৬৫৪.০০

বর্তমানে খুলনা জেলার মোট পুকুর দিঘির সংখ্যা ৩৯৮৪০টি, নদী- শাখানদী ৩৪টি। ২০১৫ সালে খুলনা জেলায় ১৩,৪৪৭.১৭ মেট্রিক টন বাগদা চিংড়ি, ১৩,৮৯৭.৯০ মেট্রিক টন গলদা চিংড়ি মাছ উৎপাদিত হয়।
খুলনা জেলায় সর্বমোট ৩৯,৮৪০টি পুকুর দিঘি আছে, যার মোট আয়তন ৪,২৩৪.১৫ হেক্টর। এছাড়া ৯,৪৪৯.৭৩ হেক্টর নদী, ১১,৩৮৪ হেক্টর বিল এবং চিংড়ি মাছ চাষের জন্য ৭৫,৭১৬টি ঘের আছে।[৩৩]

বনজ সম্পদ

খুলনা জেলা বনজসম্পদে সমৃদ্ধ। এ জেলার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে বাংলাদেশের একক বৃহত্তম বনভূমি সুন্দরবন অবস্থিত। সুন্দরবনের আয়তন ৬,০১৭ বর্গকিলোমিটার। তন্মধ্যে স্থলভাগের পরিমাণ ৪১৪৩ বর্গকিলোমিটার, যা সুন্দরবনের মোট আয়তনের ৬৭%। জলভাগের পরিমাণ ১৮৭৪ বর্গকিলোমিটার, যা মোট আয়তনের ৩১%। সুন্দরবন বাংলাদেশের মোট আয়তনের ৪.২% এবং সমগ্র বনভূমির ৪৪%। খুলনা জেলার দাকোপ, পাইকগাছা ও কয়রা উপজেলায় সর্বমোট ১,৬১৮ বর্গকিলোমিটারজুড়ে সুন্দরবনের অবস্থিতি। ১৯৮১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী সমগ্র বাংলাদেশে যেখানে ছিল মাত্র ১৫% বনাঞ্চল, সেখানে খুলনায় দেশের একক বৃহত্তম বনভূমি ‘সুন্দরবন’ ছিল মোট ভূমির ৪৮%।

সুন্দরবনে প্রায় ৪৫০টি নদনদী ও খাল রয়েছে। পশুর, রায়মঙ্গল, হাঁড়িয়াভাঙ্গা, বলেশ্বর, শিবসা, হরিণভাঙ্গা, বাঞ্জুয়া, ধুন্দলী, কোকিমনি, শ্যামা প্রভৃতি সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীসমূহের মধ্যে অন্যতম। এ বনের প্রধান উদ্ভিদ ‘সুন্দরী’। সুন্দরবনে ৩৩৪ প্রজাতির গাছপালা, ১৬৫ প্রজাতির শৈবাল এবং ১৩ প্রজাতির অর্কিড পাওয়া যায়। সুন্দরবনে মোট ৩৭৫ প্রজাতির বন্যপ্রাণী রয়েছে। বনের ৩১.১৫% জুড়ে রয়েছে বিশাল জলভাগ। মধু সুন্দরবনের একটি বড়ো সম্পদ। সুন্দরবনের প্রধান উদ্ভিদ হচ্ছে ‘সুন্দরী’ যা সমগ্র সুন্দরবনের উদ্ভিদের প্রায় ৭৩%। এরপর গেওয়ার অবস্থান, যা প্রায় ১৬%, বাকি ১১% উদ্ভিদরাজির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পশুর, গরান, কেওড়া, ধুন্দল, বাইন, কাঁকড়া, গোলপাতা, সিংড়া, হেতাল খলসী, হারগোজা ইত্যাদি। এ বন হতে প্রতিবছর মোট ১,১৩,৮৮৮ মেট্রিক টন গোলপাতা, ৫০০০ মেট্রিক টন ঘাস,

[৩৩] District Statistics, Khulna, 2011. p. 22.

১০০০ মেট্রিক টন হেতাল, ৭০০ মেট্রিক টন মাছ, ৩০০ মেট্রিক টন কাকড়া, প্রায় ৮ কোটি বাগদার পোনা সংগৃহীত হয়।

প্রাকৃতিক নৈসর্গিক দৃশ্য উপভোগের জন্য প্রতিবছর এখানে বহু সংখ্যক পর্যটকের আগমন হয়। সুন্দরবনের যে সকল স্থান পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলো হিরণপয়েন্ট, দ্বিতীয় হলো কটকা। বর্তমানে করমজলে পর্যটকদের উপস্থিতি বেশি দেখা যায়।

অর্থনৈতিক দিক থেকে বনটি বিরাট গুরুত্বসম্পন্ন। এ চিরহরিৎ বনের সুন্দরী, পশুর, বাইন, গেওয়া, গরান, কেওড়া, হেতাল, গোলপাতা, কাকরা, গর্জন, প্রভৃতি বৃক্ষের কাঠ আসবাবপত্র, ঘরের খুঁটি, জ্বালানি কাঠ, পাইলিং ইত্যাদি নানাকাজে ব্যবহৃত হয়। মধু, মোম, গোলপাতা, জ্বালানি কাঠ, মাছ প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান হয়। এসব থেকে সরকারও প্রচুর রাজস্ব আয় করে থাকে। এক সময়ে এর বনজ সম্পদের ওপর নির্ভর করে বেশ কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান এ জেলায় গড়ে উঠেছিল। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস রোধ করতে এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে, বৃষ্টিপাত ঘটাতে ও জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করতে এ বনের বিরাট অবদান রয়েছে। এ বনভূমি আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। গৃহ নির্মাণ ও জ্বালানি কাঠ, নিউজপ্রিন্ট, হার্ডবোর্ড এবং দিয়াশলাই শিল্পের কাঁচামাল বন থেকে পাওয়া যায়। সমগ্র দেশের বনাঞ্চল থেকে প্রাপ্ত আয়ের ২৬% এ জেলার অবদান। দেশের মোট বার্ষিক উৎপাদনের মধ্যে সুন্দরবন হতে আহরিত সম্পদরাজির অবদান হচ্ছে গৃহনির্মাণের কাঠ ৬৭.০২%, জ্বালানি কাঠ ৫৬.১১%, বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল ৫৮.২০%, মধু ৯৯.৯৫%, মাছ ৯১.৭৯%, গোলপাতা ৯৬.৮৫%। মোগল আমলে শাহ্ সুজার শাসনকালে (১৮৭৫-১৮৭৬) সর্বপ্রথম সুন্দরবন থেকে রাজস্ব আদায় শুরু হয়। বাংলাদেশের বন বিভাগের মোট রাজস্ব আয়ের ৫০% আসে সুন্দরবন থেকে।

ব্যাবসাবাণিজ্য হাটবাজারের সংখ্যা বৃদ্ধি জেলায় ব্যাবসা-বাণিজ্যের প্রসারতা নির্দেশক। বিবিএস-১৯৯৮ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী খুলনা জেলায় কেনাবেচা হয় ১৯৮টি হাটবাজারের মাধ্যমে। ২০১১ সালে কেনাবেচা বৃদ্ধির কারণে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৬১তে।[৩৪] ১৯৯০-৯১ সালে আর্থিক লেনদেন হয় ২২৪টি বিভিন্ন ব্যাংকের শাখার মাধ্যমে। ব্যাংকগুলোতে সঞ্চয়ী হিসাব ছিল ১.৬ লাখ, চলতি হিসাব ২৩ হাজার, নির্দিষ্ট জমা হিসাব ২২ হাজার এবং প্রায় ৩ হাজার স্বল্পকালীন জমা হিসাব ছিল।

১৯৯০-৯১ সালের চলতি বাজার দরে অত্র জেলায় অর্থনীতির প্রধান খাতসমূহের মোট আঞ্চলিক উৎপাদন (জিআরপি) ছিল কৃষিখাতে ১,৬৩৯.৫ কোটি টাকা, শিল্পে ৩৬৯.৯ কোটি টাকা, নির্মাণ ২৩৮.৪ কোটি টাকা, যানবাহন, স্টোরেজ ও

[৩৪] District Statistics, Khulna, 2011. p. 23.

যাতায়াত ৬০১.২ কোটি টাকা, বাণিজ্য ৩৭৪.৯ কোটি টাকা, গৃহনির্মাণ ৩৭২.৫ কোটি টাকা, পেশাগত ও বিবিধ সার্ভিসেস ৬০৭.৪ কোটি টাকা।[৩৫]

২০১১ সালে খুলনা জেলায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ৭৪টি শাখা হতে ১৮৭ কোটি টাকা কৃষি ও শিল্প ঋণ বিতরণ করা হয়। ঋণ সুবিধাভোগী পুরুষ ২,১৬০ এবং মহিলা ৭,০৭৩ জন ছিল। প্রাইভেট বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা (৪২) হতে ১৩৩.১১ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়।[৩৬] এর মধ্যে পুরুষ সুবিধাভোগী ছিল ৯,৭৭০ এবং মহিলা ৫,৪৬৯ জন।

খুলনা জেলায় ২০১১ সালে গ্রামীণ ব্যাংকের ২০টি শাখায় ১৫৬ জন কর্মরত ছিল। ব্যাংকের সদস্য সংখ্যা ছিল ৬০,৩১১ জন, হিসাব সংখ্যা ছিল ৬৮,৪৫৫টি।[৩৭] খুলনা সিটি করপোরেশনে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক এবং আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংকের ২টি শাখায় নিয়োজিত কর্মকর্তা- কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ৩৭ জন, সঞ্চয়ী হিসাব সংখ্যা ছিল ২,৫২৭টি এবং চলতি হিসাব সংখ্যা ছিল ৩,০৮১টি।[৩৮]

এছাড়াও খুলনা জেলায় সোনালী ব্যাংক লি. (৫টি শাখা), জনতা ব্যাংক লি. (৩টি শাখা), কৃষি ব্যাংক লি. (৩টি শাখা), অগ্রণী ব্যাংক লি. (৪টি শাখা), রূপালী ব্যাংক লি. (৩ শাখা), পূবালী ব্যাংক লি. (২টি শাখা), উত্তরা ব্যাংক লি. (জোনাল অফিস), সিটি ব্যাংক লি. (রিজিওনাল অফিস) ও এবি ব্যাংক লি. (রিজিওনাল অফিস) রয়েছে।

খুলনা জেলা পরিসংখ্যান-২০১১ অনুসারে খুলনা জেলায় বিভিন্ন দ্রব্যের পাইকারি ও খুচরা ব্যাবসা ৫১,৮৮৩টি, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট ৪,২৩২টি। ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ছিল ৪৮৯টি, ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প ৯,০৮৩টি, ২১টি মানি এক্সচেঞ্জ এজেন্সি রয়েছে।

বিভিন্ন সময়ে চালের বাজার মূল্য

চালসহ অন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম ও সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু এখানে চালব্যতীত অন্য খাদ্য সামগ্রীর সরকার অনুমোদিত তৎকালীন মূল্য জানা কঠিন। অতীতে সর্বপ্রথম যে সালের চালের বাজার মূল্য পাওয়া যায় তা হলো ১৮৮৭ সালে (প্রতি টাকায় ২১ সের ৩ ছটাক অথবা ১৯.৭৭০১ কেজি)। এ সময় শতাব্দীর শেষার্ধে চালের মূল্য অস্থিতিশীল ছিল। কখনও উর্ধ্বগতি কখনো নিম্নগতি। ১৮৯০ সালে চালের গড় মূল্য পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি ছিল অর্থাৎ টাকা প্রতি ১৩ সের ১২ ছটাক (১২.৮৩০৩ কেজি)।

---

[৩৫] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৩।

[৩৬] District Statistics, Khulna, 2011. p. 126.

[৩৭] ওই. পৃ. ১১৯।

[৩৮] ওই. পৃ. ১১৮।

১৮৯১ সালে চালের গড় মূল্য কিছুটা হ্রাস পায়। কিন্তু এর পরের বছরগুলোতে চালের মূল্য পুনরায় বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মূল্যের এ ঊর্ধ্বগতি ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। ১৮৯৫ সালে আবার চালের গড়মূল্যের নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয়, অর্থাৎ টাকা প্রতি ১৮ সের ৫ ছটাক (১৭.০৮৭৮ কেজি) হয়। ১৮৯৬ সালে চালের মূল্য পুনরায় বেড়ে যায়, অর্থাৎ টাকা প্রতি ১১ সের ১৪ ছটাক (১১.০৮০১ কেজি) হয়। পরের বছরগুলো আরও বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি টাকায় ৯ সের ১৪ ছটাকে (৯.২১৩৯ কেজি) দাঁড়ায়।

১৮৯৯ সালে চালের মূল্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়। এ সময় প্রতি টাকায় চাল বিক্রয় হয় ১৭ সের ১২ ছটাক (১৬.৫৬২৭ কেজি)। ১৯০০ সালে পুনরায় চালের মূল্যের ঊর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হয়। এ বছর প্রতি টাকায় চাল বিক্রয় হয় প্রতি ১৩ সের ১৪ ছটাক (১২.৪৮০৩ কেজি)। পরবর্তী বছরগুলো চালের দাম আবার বৃদ্ধি পায়। ১৯০৬ এবং ১৯০৮ সালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে প্রতি টাকায় চাল ৭ সের ৪ ছটাক (৬.৭৬৪৭ কেজি) থেকে ৮ সের ২ ছটাক (৭.৫৮১৮ কেজি) পর্যন্ত পাওয়া যেত। ১৯০৯ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে মূল্য পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয় এবং এ সময় চালের গড় মূল্য ছিল টাকা প্রতি ৯ সের ১২ ছটাক (৯.০৯৭৯ কেজি) থেকে ১১ সের ১১ ছটাক (১০.৯০৬১ কেজি)।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে চালের মূল্য পুনরায় দ্রুতগতিতে বেড়ে যায়। এ বছর চালের গড় মূল্য দাঁড়ায় টাকা প্রতি ৭ সের ১৪ ছটাক (৭.৩৪৭৭ কেজি)।

সারণি-৬৩
খুলনা জেলায় বিভিন্ন বছরে চালের বাজারদর

সাল	চালের বাজার দর	চালের পরিমাণ
১৮৮৭	চালের দর প্রতি টাকায়	২১ সের ৩ ছটাক (১৯.৭৭০১ কেজি)
১৮৯০	চালের দর প্রতি টাকায়	১৪ সের ৩ ছটাক (১৩.২৩৮৪ কেজি)
১৮৯৫	চালের দর প্রতি টাকায়	১৮ সের ৪ ছটাক (১৭.০২৯ কেজি)
১৮৯৬	চালের দর প্রতি টাকায়	১০ সের ০ ছটাক (৯.৩০১ কেজি)
১৮৯৯	চালের দর প্রতি টাকায়	১৮ সের ১২ ছটাক (১৭.৪৯৫৮ কেজি)
১৯০৫	চালের দর প্রতি টাকায়	১৩ সের ৪ ছটাক (১২.৩৬৩৩ কেজি)
১৯১৪	চালের দর প্রতি টাকায়	৭ সের ১০ ছটাক (৭.১১৪৭ কেজি)
১৯১৯	চালের দর প্রতি টাকায়	৫ সের ১২ ছটাক (৫.৩৬৫৫ কেজি)
১৯২৭	চালের দর প্রতি টাকায়	৫ সের ৫ ছটাক (৪.৯৫৭৫ কেজি)
১৯৩৩	চালের দর প্রতি টাকায়	১৩ সের ৩ ছটাক (১২.৩০৫৩ কেজি)
১৯৩৪	চালের দর প্রতি টাকায়	১২ সের ৫ ছটাক (১১.৪৮৯২ কেজি)
১৯৬৫	চালের দর ৩৪.০৩ টাকায় (সরু)	১ মণ (৩৭.৩২৪ কেজি)
১৯৬৬	চালের দর ৩১.৪৭ টাকায় (মাঝারি)	১ মণ (৩৭.৩২৪ কেজি)
১৯৬৭	চালের দর ২৮.৪৫ টাকায় (মোটা)	১ মণ (৩৭.৩২৪ কেজি)
১৯৬৮	চালের দর ৪৮.২৯ টাকায় (সরু)	১ মণ (৩৭.৩২৪ কেজি)

১৯৬৯	চালের দর ৪১.৪১ টাকায় (মাঝারি)	১ মণ (৩৭.৩২৪ কেজি)
১৯৭০	চালের দর ৩৯.১২ টাকায় (মোটা)	১ মণ (৩৭.৩২৪ কেজি)
১৯৭১-৭২	চালের দর ৫৮.৪০ টাকায় (মাঝারি)	১ মণ (৩৭.৩২৪ কেজি)
১৯৭২-৭৩	চালের দর ৮৮.৮০ টাকায় (মাঝারি)	১ মণ (৩৭.৩২৪ কেজি)
১৯৭৩-৭৪	চালের দর ১২০.৪০ টাকায় (মাঝারি)	১ মণ (৩৭.৩২৪ কেজি)
১৯৭৪(জানুয়ারি)	চালের দর ১৪৩.৪০ টাকায় (মাঝারি)	১ মণ (৩৭.৩২৪ কেজি)
১৯৭৪ (জুন)	চালের দর ২৮০.৮০ টাকায় (মাঝারি)	১ মণ (৩৭.৩২৪ কেজি)
১৯৭৪ (ডিসেম্বর)	চালের দর ২৬৫.৬৫ টাকায় (মাঝারি)	১ মণ (৩৭.৩২৪ কেজি)
১৯৭৭-৭৮	চালের দর ১২৩.৬০ টাকায় (মাঝারি)	১ মণ (৩৭.৩২৪ কেজি)
১৯৭৮-৭৯	চালের দর ১৭৪.৮০ টাকায় (মাঝারি)	১ মণ (৩৭.৩২৪ কেজি)
১৯৭৯-৮০	চালের দর ২৩৪.০০ টাকায় (মাঝারি)	১ মণ (৩৭.৩২৪ কেজি)
১৯৮০-৮১	চালের দর ১৯৮.৪০ টাকায় (মাঝারি)	১ মণ (৩৭.৩২৪ কেজি)
১৯৮২-৮৩	চালের দর ৭.৪২ টাকায়	১ সের (০.৯৩৩১ কেজি)
১৯৮৪-৮৫	চালের দর ৮.৮৩ টাকায়	১ সের (০.৯৩৩১ কেজি)
১৯৮৬-৮৭	চালের দর ১০.৩ টাকায়	১ সের (০.৯৩৩১ কেজি)
১৯৮৮-৯৯	চালের দর ১১.২০ টাকায়	১ কেজি (মাঝারি মানের)
১৯৮৯-৯০	চালের দর ১০.৮৬ টাকায়	১ কেজি (মাঝারি মানের)
১৯৯০-৯১	চালের দর ১২.০০ টাকায়	১ কেজি (মাঝারি মানের)
১৯৯২	চালের দর ১১.৭৫ টাকায়	১ কেজি (মাঝারি মানের)
২০১১	চালের দর ৩২ টাকায়	১ কেজি (মাঝারি মানের)

সূত্র: আবদুশ শাকুর, বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার বৃহত্তর খুলনা, ১৯৯৬, পৃ. ১৯০-২০৭: District Statistics, Khulna, 2011. p.101.

১০ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রি

তবে গরিব ও দুঃস্থ লোকদের জন্য ১০টাকা কেজি দরে সরকারিভাবে চাল বিতরণের জন্য কর্মসূচি চলমান আছে।

যোগাযোগ ও ব্যাবসা কেন্দ্র

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সাথে ব্যাবসাবাণিজ্যের উন্নতির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। জেলার নৌ, সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা অর্থনীতির কর্মকাণ্ডকে সচল ও সক্রিয় রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। চলাচল ও ব্যাবসাবাণিজ্যের জন্য বর্তমানে খুলনা জেলায় ৪টি রেলস্টেশন এবং ৩৬ কিলোমিটার রেলপথ; ২০টি লঞ্চঘাট এবং সারা বছর নৌচলাচল উপযোগী নদীপথ ৮২ কিলোমিটার ও শুধু বর্ষা মৌসুমে নৌচলাচল উপযোগী ৬৫৬ কিলোমিটার নদীপথ; ৪৪টি বাসস্ট্যান্ড ও ৬,৫৩৫ কিলোমিটার পাকা, আধাপাকা ও কাঁচা সড়কপথ রয়েছে। এ সব সড়ক পথে চলাচলকারী ভ্যানের মোট সংখ্যা ১২,৪২৮, রিকশা ১০,৭০৭টি, ইজিবাইক ও অটোরিকশা ১,৪৩৯, টেম্পুর সংখ্যা ১,০৬২, নছিমন+করিমন ১৮৬৬টি।[৩৯] এখানে খাদ্য, পাট, সার ইত্যাদি গুদামজাত করার জন্য রয়েছে ১৭৮টি খাদ্যগুদাম, ধারণক্ষমতা ১,৬০,৬৭৭ মেট্রিক টন; ৩টি সার গুদাম, ধারণক্ষমতা ১৫,০০০ মেট্রিক টন;

[৩৯] B.B.S. District Statistics, Khulna, 2011. p. 97-98.

১৬৭টি পাট গুদাম, ধারণক্ষমতা ৩৪২৫৩ মেট্রিক টন এবং অন্যান্য ৭টি গুদাম, ধারণক্ষমতা ১১,০০০ মেট্রিক টন।[৪০]

ব্যাবসাকেন্দ্র হিসেবে খুলনায় রয়েছে ৪৫টি গ্রোথ সেন্টার ও ২৬১টি হাটবাজার। উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে এখানে ছিল ২২০৬টি পোলট্রি খামার, ৯২১টি ডেয়ারি ফার্ম, ৭০৯টি বাণিজ্যিক, ৩টি হর্টিকালচার সেন্টার, ৮৬টি ইটের ভাটা।[৪১]

সেবা ও গণ-যোগাযোগ সাধারণ সেবা কেন্দ্র হিসেবে আছে ৯টি ফিলিং স্টেশন, ৭টি ফায়ার ব্রিগেড সার্ভিস স্টেশন, ৭০টি পুলিশ স্টেশন ও ফাঁড়ি, ৩৭টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস, ৫৯টি আইএসপি প্রোভাইডার এবং ১১২টি সাইবার ক্যাফে।[৪২]

এখানে বর্তমানে ৩২৩টি ক্রীড়া ক্লাব, ১১০টি সাংস্কৃতিক ক্লাব, ১টি বিজ্ঞান ক্লাব, বিভিন্ন ধরনের রেজিস্টার্ড ক্লাব ৬০১টি এবং ১৫৩টি অন্যান্য সামাজিক ও অফিসার্স ক্লাব, ১৩টি সিনেমা হল, পাঠাগার ১৬টি, অনাথ আশ্রম ৮৮টি এবং ৩৯টি অডিটরিয়াম রয়েছে। মোট সরকারি অফিসের সংখ্যা ৩৮৯, পোস্ট অফিসের সংখ্যা ১৬৭, রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের শাখা ৭৬, প্রাইভেট ব্যাংকের শাখা ৬২ এবং এনজিওর সংখ্যা ২০১, ডাকবাংলো ও রেস্টহাউজের সংখ্যা ১৯, রেস্টুরেন্ট ১,১৬২টি এবং আবাসিক হোটেল ৫৩টি। এ অঞ্চলের ৯৮৯টি গ্রামের মোট ৯৭,৫০৯টি হোল্ডিংয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে। এ ছাড়াও ৫৯টি বৃহৎ শিল্পে, ২,২৬৩টি মাঝারি শিল্পে ও ক্ষুদ্র শিল্পে, ১,১৬৩টি টিউবওয়েল, ৯৬৯টি পাওয়ার পাম্পে, ১৬,৯৫৮টি বাণিজ্যিক হোল্ডিংসহ অন্যান্য ৩৮৮টি বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে, যা জেলার সার্বিক অর্থনীতিকে সচল রেখেছে।

নির্মাণ সামগ্রী এখানে উন্নয়নের প্রধান অনুষঙ্গ নির্মাণের কাজ বেড়েছে বহুগুণ। সেই সাথে বেড়েছে নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য। ২০১১ সালের হিসাব অনুযায়ী গৃহনির্মাণ সামগ্রীর বার্ষিক গড় পাইকারি মূল্য ছিল ইট প্রতি হাজার ৬,০০০ টাকা, সিমেন্ট ৫০ কেজির প্রতি ব্যাগ ৩৬০ টাকা, লোহার রড প্রতি টন ৬২,০০০ টাকা, বালু ১ম মানের প্রতি সিএফটি ২৫ টাকা এবং ২য় মানের ১৮ টাকা, পাথর প্রতিটনের সর্বোচ্চ মূল্য ছিল দাকোপ উপজেলায় ১৫০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ছিল মেট্রোপলিটন সিটিতে ১৩৫ টাকা। মেট্রোপলিটন সিটিতে সিমেন্ট ও লোহার রডের মূল্য ছিল সর্বনিম্ন যথাক্রমে ৩৯২ টাকা প্রতি ব্যাগ ও ৫৩,০০০ টাকা প্রতি টন।

---

[৪০] ওই, পৃ. ৮৯।
[৪১] ওই, পৃ.২৩।
[৪২] ওই, পৃ. ২২।

সারণি-৬৪
খুলনা জেলার গৃহসামগ্রীর বাজার মূল্য (২০১৬)

(মূল্য-টাকায়)

উপজেলার নাম	ইট-০১ (প্রতি ১০০০)	সিমেন্ট (প্রতি বস্তা ৫০ কেজির রেঞ্জ)	লোহার রড (প্রতি টনের রেঞ্জ)	বালু-০১ (প্রতি সিএফটির রেঞ্জ)	বালু-০২ (প্রতি সিএফটির রেঞ্জ)
বটিয়াঘাটা	৮০০০	৩৬৫-৪১৫	৪৬০০০-৫১০০০	২২-৩২	৪-৫
দাকোপ	৮০০০	৩৬৫-৪১৫	৪৭০০০-৫১০০০	২৩-৩৩	৪-৫
দিঘলিয়া	৮০০০	৩৭০-৪১০	৪৭০০০-৫২০০০	২২-৩২	৫-৬
ডুমুরিয়া	৮০০০	৩৭০-৪১০	৪৭০০০-৫২০০০	২০-৩০	৪-৫
খুলনা সিটি করপোরেশন	৮৫০০	৩৬০-৪১০	৪৫০০০-৫১০০০	২০-৩০	৪-৫
কয়রা	৭৫০০	৩৭০-৪১০	৪৮০০০-৫৩০০০	২৫-৩৫	৪-৫
পাইকগাছা	৭০০০	৩৭৫-৪২০	৪৭০০০-৫২০০০	২৪-৩২	৪-৫
ফুলতলা	৭০০০	৩৬০-৪১০	৪৬০০০-৫১০০০	২০-৩০	৪-৫
রূপসা	৭০০০	৩৬০-৪১০	৪৬০০০-৫১০০০	২০-৩০	৪-৫

উৎস: কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, জেলা মার্কেটিং অফিস, খুলনা।

বিভিন্ন শ্রমের মজুরি

২০১৭ সালে খুলনা জেলায় গৃহ নির্মাণকাজে একজন রাজমিস্ত্রির দৈনিক গড় মজুরি ছিল ৬০০ টাকা। প্রায় সব উপজেলায় এ হার সম হলেও খুলনা মেট্রোপলিটন সিটি ও দিঘলিয়া উপজেলায় ছিল ৬৫০ টাকা। একজন জোগালির (হেলপার) দৈনিক গড় মজুরি ছিল ৩৭৫ টাকা। একইভাবে খুলনা মেট্রোপলিটন সিটি ও দিঘলিয়া উপজেলায় তা ৫০ টাকা বেশি ছিল। একজন তাঁতির দৈনিক গড় মজুরি ছিল ৬৫০ টাকা, রং মিস্ত্রির ৬০০ টাকা, ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রির ৬০০ টাকা এবং পাইপ মিস্ত্রির ছিল ৬০০ টাকা। অস্থায়ী শ্রমিকদের মাসিক গড় বেতন ৬,০০০ টাকা হলেও মালিকের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নেওয়ার কারণে স্থায়ী শ্রমিকদের মাসিক গড় বেতন ৫,০০০ টাকা। হিমায়িত মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে নিয়োজিত একজন শ্রমিকের মাসিক গড় বেতন অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার তারতম্যের জন্য ৪,০০০ টাকা থেকে ৪,৫০০ টাকা। অ-কৃষিখাতে একজন কুলির গড় দৈনিক মজুরি ছিল ৪০০ টাকা। এ ক্ষেত্রে রূপসা ও পাইকগাছা উপজেলায় ছিল সর্বোচ্চ দৈনিক ৪৫০ টাকা।[৪৩]

স্বাস্থ্যসেবা

স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও আর্থিক স্বচ্ছলতার সাথে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা সেবা গ্রহণের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গত এক দশকে খুলনা জেলার অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থার সার্বিক উন্নতির ফলে চিকিৎসাসেবা গ্রহণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও নার্সিংহোমে চিকিৎসা সেবাদানের সুযোগ প্রসারিত হয়েছে।

[৪৩] Khulna District Statistical Office, B.B.S. 2017.

১৯৮৩ সালের জেলা পরিসংখ্যান অনুযায়ী জেলায় ২৮টি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ছিল, ৫টি সরকারি হাসপাতাল, ৩৭টি দাতব্য চিকিৎসালয়, ৩টি মিশনারি হাসপাতাল এবং ৪৪টি অন্যান্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছিল। এ সকল স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং হাসপাতালসমূহে ৯০০ রোগীর শয্যাসুবিধা ছিল। প্রতি ৫,০০০ লোকের জন্য ডিগ্রিপ্রাপ্ত চিকিৎসকের সংখ্যা ছিল ১ জন। সমগ্র জেলায় ১৭৪টি পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে ২২ জন ডাক্তার ও ১,৫৫৬ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি জনসংখ্যা পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে ব্যাপৃত ছিল। এখানে শিশু কল্যাণ ও মাতৃমঙ্গল কার্যক্রমও চালু ছিল।

১৯৮৮-৮৯ সালে সিএমআই (Census of Manufacturing Industries) প্রতিবেদন অনুযায়ী এ জেলায় মোট ৫৩৭ শয্যাবিশিষ্ট ১৮টি থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ৪৭টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছিল। চিকিৎসকের সংখ্যা ১,৪৪৩ জন, তন্মধ্যে ৩৩৪ জন, এমবিবিএস ডাক্তার। এছাড়া ৫৫টি বন্ধ্যত্বকরণ কেন্দ্র, ৩৯টি ভ্রাম্যমাণ পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র, ৪৩টি ইনজেকশন কেন্দ্র, ৬৪টি এমআর কেন্দ্র এবং ৯০টি পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ছিল। এতে ২৯ জন পরিবার পরিকল্পনা ডাক্তার, ২০২ জন পরিবার পরিকল্পনা সহকারী, ৬৬৯ জন পরিবার কল্যাণ সহকারী এবং ১৬৫ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক ছিল।[৪৪]

২০১১ সালে খুলনা জেলায় মোট ১০৬টি বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও নার্সিংহোম রয়েছে। এতে মোট শয্যাসংখ্যা ১১৪৭। ডাক্তারের সংখ্যা ২০৩ জন, নার্স ৩৪৭, টেকনিশিয়ান-১৫১, অন্যান্য কর্মচারী ৫১৪ জন। এসব চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে ২০১১ সালে ইনডোর থেকে (পুরুষ-২৪,৩৫৯+মহিলা-২৮,২৭০)=৫২,৬২৯জন এবং আউটডোরে (পুরুষ-১,১৪,৫১৭+মহিলা-২,৪৯,৪৬০)= ৩,৬৩,৯৭৭জন রোগী চিকিৎসা গ্রহণ করে।[৪৫]

কমিউনিটি ক্লিনিক ২০১১ সালে খুলনা জেলার ১৯টি সরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও নার্সিংহোমে ১২১০টি শয্যা ছিল। চিকিৎসকের সংখ্যা ছিল ২৭৩ জন, নার্স ৪৮০ জন, টেকনিশিয়ান ৮৭ জন, অন্যান্য কর্মচারী ১,০৩৭ জন। এসব চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে ২০১১ সালে ইনডোরে (পুরুষ-৪৫,৭৪০+মহিলা-৬৫,৩১২) = ১,১১,০৫২ জন এবং আউটডোরে (পুরুষ ৩,০৭,১৩১+মহিলা ৪,৫৩,৪৬৯) = ৭,৬০,৬০০ জন রোগী চিকিৎসা গ্রহণ করে।[৪৬]

শিক্ষা অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত দক্ষ জনশক্তি। জনগণের দক্ষতা নির্ভর করে শিক্ষার ওপর। খুলনা জেলা শিক্ষাদীক্ষায় তুলনামূলক অগ্রসর ছিল। ১৮৮১ সাল থেকে এখানে শিক্ষার অগ্রগতি বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো। উক্ত বছরে খুলনা জেলায় সাক্ষরতা হার ছিল শতকরা মাত্র ৩.৬ জন। কেবলমাত্র

[৪৪] B.B.S. District Statistics, Khulna, 2011. p.125.
[৪৫] B.B.S. District Statistics, Khulna, 2011. p.125.
[৪৬] ওই, পৃ.১২৫।

পুরুষের মধ্যে শতকরা ৬.৭ জন এবং মহিলাদের শতকরা ০.১ জন লিখতে এবং পড়তে সক্ষম ছিলেন।[৪৭] ধীরে ধীরে এ জেলায় সাক্ষরতার হার বাড়তে থাকে। ১৯০১ সালে খুলনা জেলার সাক্ষরতার হার ছিল শতকরা ৬.৯ জন। এর মধ্যে শতকরা ১২.৪ জন পুরুষ এবং ০.৮ জন মহিলা অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন।

এভাবে দেখা যায় যে, খুলনা জেলার অর্থনৈতিক অবস্থার সকল সূচক, আয় ও ব্যয়, গৃহস্থালি, ব্যাবসা, চাকরি এবং শিক্ষা ঊর্ধ্বমুখী। পদ্মা সেতু নির্মাণ এবং খুলনার পাশে মোংলা পোর্টে নেওয়া বিভিন্ন কার্যক্রম এই জেলার মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রসারিত ও উন্নত করবে। পরিশেষে বলা যায় যে, বিশ্বমন্দার চাপের মধ্যে দিয়েও খুলনা জেলার অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রম উন্নতিশীল।

[৪৭] L.S.S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers, Khulna* (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1908), p. 158.

অধ্যায়-৮

যোগাযোগ ব্যবস্থা

সড়ক যোগাযোগ

সড়ক যোগাযোগ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবনপ্রবাহ (life line) হিসেবে পরিচিত। সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক, জেলা সড়ক এবং সেতুসমূহ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এই অধিদপ্তর ১৯৬২ সালে ২,৫০০.০০ কি.মি. রাস্তা নিয়ে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে এই অধিদপ্তরের আওতাধীন ২১,৫৪৯.০০ কি.মি. রাস্তা ও ১৮,২৫৪ টি সেতু আছে।

বাংলাদেশে বিদ্যমান সড়কসমূহ নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়দায়িত্ব যথাক্রমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার অধিদপ্তর (LGED) ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

খুলনা জেলার অভ্যন্তরীণ ও দেশের অন্যান্য অংশের সাথে সড়কপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা নদনদীর জালে আবদ্ধ। জেলার অধিকাংশ অভ্যন্তরীণ রাস্তাই আধাপাকা বা কাঁচা। নদী পারাপারে বিভিন্ন ফেরির ব্যবহার সময়ের অপচয় ঘটায়। জেলা সদর থেকে ২/১টি ছাড়া যে-কোনো উপজেলায় যেতে হলে অন্তত একটি ফেরি পারাপার করতেই হয়। জেলার সড়ক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ চিত্র ম্যাপ আকারে উপস্থাপন করা হলো-

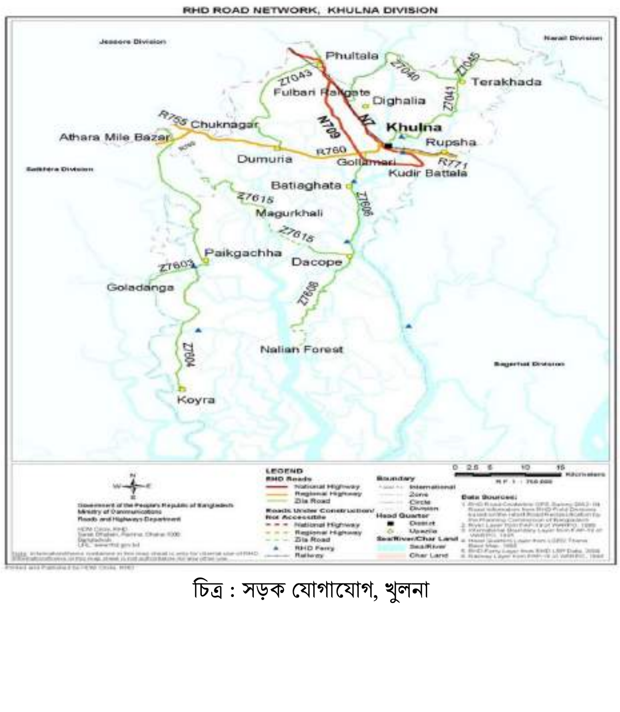

চিত্র : সড়ক যোগাযোগ, খুলনা

সারণি-৬৫
খুলনা জেলার সড়ক বিভাগের তথ্য

সড়কের মোট সংখ্যা	১৭ টি (৩+২+১২)
মোট সড়কের দৈর্ঘ্য	৩৭৪.২২৩ কি.মি.
জাতীয় মহাসড়কের দৈর্ঘ্য	৫৯.৬৫ কি.মি.
আঞ্চলিক মহাসড়কের দৈর্ঘ্য	৪২.০০ কি.মি.
জেলা সড়কের দৈর্ঘ্য	২৬৯.৫৩ কি.মি.
ব্রিজের সংখ্যা	১৫টি
ব্রিজের দৈর্ঘ্য	৩,০৫৬.৯ মি.
কালভার্টের সংখ্যা	৩২৬টি
কালভার্টের দৈর্ঘ্য	১,৪১৯.৫১ মি.
ফেরি ঘাটের সংখ্যা	০৫টি
টোল ব্রিজের সংখ্যা	০৪টি

সড়ক বিভাগ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সড়ক বিভাগ, খুলনার নির্বাহী প্রকৌশলী দাপ্তরিক প্রধান হিসেবে দপ্তর পরিচালনা করছেন। তাঁর আওতায় ৩টি উপবিভাগ আছে। তন্মধ্যে ২টি সিভিল ও ১টি মেকানিক্যাল উপবিভাগ আছে। খুলনা সড়ক বিভাগের আওতায় পরিচালিত সড়ক, ফেরিঘাট ইত্যাদির বিবরণ প্রদত্ত হলো:

সারণি-৬৬
খুলনা জেলার সড়ক বিভাগের গৃহীত প্রকল্পসমূহ

প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	সড়কের দৈর্ঘ্য	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লাখ টাকা)	প্রকল্পের অগ্রগতির হার (%)
ক) খুলনা (গল্লামারী) বটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান ফরেস্ট সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প; প্রকল্পের মেয়াদ:- ০১/১১/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৮ পর্যন্ত।	২৭.২৫ কি.মি.	৮১০৯.৫৩	৯৮
খ) খুলনা-চুকনগর-সাতক্ষীরা সড়কের ৪র্থ কিলোমিটারে ময়ূর নদীর ওপর গল্লামারী সেতু নির্মাণ প্রকল্প; প্রকল্পের মেয়াদ:- ০১/০১/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৫ পর্যন্ত।	৪৮.৮০ মি.	৮৬১.৩৪ (সংশোধিত)	১০০
গ) নগরঘাটা (দিঘলিয়া)-আড়ুয়া-গাজীরহাট-তেরখাদা সড়ক পুনর্বাসন ও রক্ষা প্রদান প্রকল্প; প্রকল্পের মেয়াদ:- ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ পর্যন্ত	২৯.০০ কি.মি.	১৭১৩.৪৮ (সংশোধিত)	১০০

প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	সড়কের দৈর্ঘ্য	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লাখ টাকা)	প্রকল্পের অগ্রগতির হার (%)
ঘ) খুলনা (রূপসা) শ্রীফলতলী-তেরখাদা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প; প্রকল্পের মেয়াদ:-০১/০৭/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০১৮ পর্যন্ত	২৩.০০ কি.মি.	৪৮৬০.৬৬ (সংশোধিত)	৯৯
ঙ) গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (খুলনা জোন) খুলনা-চুকনগর-সাতক্ষীরা সড়ক (খুলনা অংশ) প্রকল্প; প্রকল্পের মেয়াদ:- ০১/০৩/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৯ পর্যন্ত	২৮.৩০ কি.মি.	১৬২৯০.৪৩	৪০

সারণি-৬৭

খুলনা জেলার সড়ক বিভাগের মহাসড়ক, আঞ্চলিক ও জেলা সড়ক

সড়ক নং	সড়কের নাম	মোট সড়কের দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	কাঁচা সড়কের দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	পাকা সড়কের দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
জাতীয় মহাসড়ক :-				
এন-৭	দৌলতদিয়া-ফরিদপুর-মাগুরা-ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা সড়ক মোংলা (দিগরাজ) সড়ক (খুলনা অংশ)	৩৫.৫৬১	--	৩৫.৫৬১
এন-৭০৯	খুলনা শহর বাইপাস	২৬.৫৪	--	২৬.৫৪
আঞ্চলিক মহাসড়ক :				
আর-৭৬০	খুলনা-চুকনগর-সাতক্ষীরা সড়ক (খুলনা অংশ)	৩৩.৬৫	--	৩৩.৬৫
আর-৭৭১	রূপসা-ফকিরহাট-বাগেরহাট সড়ক (খুলনা অংশ)	৯.০০	--	৯.০০
জেলা সড়ক :				
জেড-৭০৪০	নগরঘাটা (দিঘলিয়া)-আড়ুয়া-গাজীরহাট-তেরখাদা সড়ক	২৯.০৬৬	--	২৯.০৬৬
জেড-৭০৪১	খুলনা (রূপসা)-শ্রীফলতলা-তেরখাদা সড়ক	২২.০৭৪	--	২২.০৭৪
জেড-৭০৪২	শ্রীফলতলা-সেনেরবাজার সড়ক	৪.৭১৪	--	৪.৭১৪
জেড-৭০৪৩	ফুলতলা-শাহ্পুর-মিক্সিমিল-ডুমুরিয়া সড়ক	২৮.৭৬০	--	২৮.৭৬০
জেড-৭০৪৫	তেরখাদা-মোল্লারহাট সড়ক (খুলনা অংশ)	১২.০০	--	১২.০০
জেড-৭০৪৭	তেরখাদা-বর্ণাল-কালিয়া সড়ক (খুলনা অংশ)	৫.৩৫৯	--	৫.৩৫৯
জেড-৭৬০৩	সাতক্ষীরা-আশাশুনি-গোয়ালডাংগা-পাইকগাছা সড়ক	১১.৫০	--	১১.৫০

জেড-৭৬০৪	বেতগ্রাম-তালা-পাইকগাছা-কয়রা সড়ক	৬৩.৫৬৭	--	৬৩.৫৬৭
জেড-৭৬০৬	খুলনা (গল্লামারী) বটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান ফরেস্ট সড়ক	৫৪.০৩২	--	৫৪.০৩২
জেড-৭৬১০	কয়রা-নোয়াবাকী-শ্যামনগর সড়ক (খুলনা অংশ)	৯.০০	--	৯.০০
জেড-৭৬১৫	দাকোপ-বার আড়িয়া-মাগুরখালী-তালা সড়ক (খুলনা অংশ)	২৪.০০	--	২৪.০০
জেড-৭৫৫৩	কেশবপুর-বেতগ্রাম সড়ক (খুলনা অংশ)	৫.০০	--	৫.০০
মোট =		**৩৭৪.২২৩**	--	**৩৭৪.২২৩**

সারণি-৬৮

খুলনা জেলার সেতু তথ্য

১।	খানজাহান আলী (রূপসা) সেতু	খুলনা জেলার আওতাধীন ভৈরব নদের ওপর অবস্থিত এবং এর দৈর্ঘ্য ১৩৬০.০০ মি.।
২।	শিবসা সেতু	বেতগ্রাম-তালা-পাইকগাছা-কয়রা সড়কের ৩৩ তম কিলোমিটারে অবস্থিত।
৩।	কয়রা সেতু	বেতগ্রাম-তালা-পাইকগাছা-কয়রা সড়কের ৫১ তম কিলোমিটারে অবস্থিত।
৪।	খর্নিয়া সেতু	খুলনা-চুকনগর-সাতক্ষীরা সড়কের ২৪ তম কিলোমিটারে অবস্থিত।
৫।	বটিয়াঘাটা সেতু	গল্লামারী-বটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান ফরেস্ট সড়কের ৭ম কিলোমিটারে অবস্থিত।

সারণি-৬৯

খুলনা জেলার ফেরি ঘাটের তথ্য

১।	ঝপঝপিয়া ফেরিঘাট	গল্লামারী-বটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান ফরেস্ট সড়কের ২১তম কিলোমিটারে অবস্থিত।
২।	পোদ্দারগঞ্জ ফেরিঘাট	গল্লামারী-বটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান ফরেস্ট সড়কের ২৮তম কিলোমিটারে অবস্থিত।
৩।	নগরঘাট ফেরিঘাট	দিঘলিয়া (নগরঘাটা)-আড়ুয়া-গাজীরহাট-তেরখাদা সড়কের ১ম কিলোমিটারে অবস্থিত।
৪।	আড়ুয়া ফেরিঘাট	দিঘলিয়া (নগরঘাটা)-আড়ুয়া-গাজীরহাট-তেরখাদা সড়কের ১২তম কিলোমিটারে অবস্থিত।
৫।	জেলখানা ফেরিঘাট	খুলনা সদরে অবস্থিত।

এলজিইডি, খুলনার নির্বাহী প্রকৌশলী দাপ্তরিক প্রধান হিসাবে ২২, রূপসা স্ট্রান্ড **এলজিইডি** রোড, খুলনায় এ দপ্তর পরিচালনা করছেন। তাঁর আওতায় খুলনা জেলার ০৯টি উপজেলায় বিদ্যমান এলজিইডির কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে খুলনা জেলায় প্রকল্পসমূহের আওতায় বিভিন্ন ধরনের স্কিমের কাজ চলমান রয়েছে। সেগুলো হলো:

প্রকল্পসমূহের নাম

১) দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (SWBRDP)।

২) বিশ্ব ব্যাংক সহায়তাপুষ্ট জরুরি-২০০৭ ঘূর্ণিঝড়, পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প (ECRRP)।

৩) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (IRIDP)।

৪) পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প RIDP (KBS)।

৫) ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প UIDP, (KBS)।

৬) উপজেলা ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প।

৭) আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (RAAIP)।

৮) কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্প (CCRIP)।

৯) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।

১০) উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প।

১১) ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের বাসস্থান নির্মাণ।

১২)আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিস ডেলিভেরি প্রকল্প (UPHCSDP)।

১৩) অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ সেক্টর প্রকল্প (PSSWRSP)।

১৪) রুরাল ইমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড রোড মেইনটেনেন্স কর্মসূচি (RERMP)।

১৫) রাজস্ব বাজেটের আওতায় সেচ অবকাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণ।

১৬) পল্লি সড়ক ও কালভার্ট মেরামত কর্মসূচি।

১৭) তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (PEDP-III)।

১৮) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্প (২য় পর্যায়)।

গুরুত্বপূর্ণ স্কিমসমূহের তালিকা :

১) রূপসা উপজেলাধীন আলাইপুর-খুলনা তেরখাদা সড়কে আঠারোবেকী নদীর ওপর ২১০.১৫ মি. প্রি-স্ট্রেসড গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ।

২) ডুমুরিয়া উপজেলাধীন বানিয়াখালী জিসি-শরাফপুর-কৈয়া জিসি সড়ক (চেই. ১৩২০০-১৬৮৯৭মি.) উন্নয়ন।

৩) ফুলতলা উপজেলাধীন চেঁচুড়ি জিসিসিআর- পায়রা জিসিসিআর লিংক রোড (চেই. ০০-১০০০মি.) উন্নয়নসহ একই সড়কে ২টি ইউড্রেন নির্মাণ।

৪) দাকোপ উপজেলাধীন কালিনগর জিসি-মোংলা পোর্ট (বানিয়াশান্তা বাজার) (চেই. ১২০০০-১৬০০০মি.) উন্নয়ন।

৫) বটিয়াঘাটা উপজেলাধীন গল্লামারী বাজার- বয়রা আন্দিরঘাটা এলাকায় খুদে খালের ওপর ২.৫০ কি.মি. চেইনেজে ৩০.০০মি. আরসিসি ব্রিজ নির্মাণ।

৬) পাইকগাছা উপজেলাধীন কপিলমুনি জিসি-কাঠালতলা আরএন্ডএইচ ভায়া তালতলার হাট সড়ক (চেই. ৩৭২৭-৫০৮০মি.) উন্নয়ন।

৭) দাকোপ উপজেলাধীন কালিনগর জিসি-মোংলাপোর্ট (বানিয়াশান্তা বাজার) (চেই. ০.০০-৪০০০মি.) উন্নয়ন।

৮) কয়রা উপজেলাধীন উপজেলা হেডকোয়ার্টার (দিঘিরপাড়)- গোলখালী সড়ক (চেই. ০.০০-১২১৩মি.) উন্নয়ন।

৯) ফুলতলা উপজেলাধীন সিকিরহাট ইউজেডআর-দক্ষিণডিহি কটন মিল ভায়া দক্ষিণডিহি এনএস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সড়ক (চেই. ৮০০-১৪৩০মি.) উন্নয়নসহ একই সড়কে ২টি ইউড্রেন নির্মাণ।

১০) পাইকগাছা উপজেলাধীন কপিলমুনি জিসি-শামুকপোতা বাজার-কাটামারি বাজার- জামতলা বাজার- বারোয়াড়িয়া জিসি (পাইকগাছা অংশ) সড়ক (চেই. ০০-৪৭৬০মি.) উন্নয়ন।

১১) রূপসা উপজেলাধীন রূপসা ইউজেডআর থানা হেডকোয়ার্টার-মানসা জিসি সড়ক (চেই. ০০-৩১৭৩মি.) বিসি দ্বারা উন্নয়ন।

১২) তেরখাদা উপজেলাধীন ছাগলাদাহ্ বাজার-নগরকান্দি জিসি ভায়া কুশলা সড়ক (চেই. ৫৭৫০-৯৩০০মি.) উন্নয়ন।

১৩) পাইকগাছা উপজেলাধীন পাইকগাচা আরঅ্যান্ডএইচ-বাকা জিসি-সড়কে ১৬৭০মি. চেইনেজে ৩১৫.০০মি. পিএসসি ব্রিজ নির্মাণ।

১৪) দিঘলিয়া উপজেলাধীন গাজিরহাট বাজার উন্নয়ন।

১৫) ডুমুরিয়া উপজেলাধীন ডুমুরিয়া ইউপি অফিস-সাহস নোয়াকাটি বাজার সড়ক (চেই. ৩৭৩৯-৪৭৩৯মি.) উন্নয়ন।

১৬) পাইকগাছা উপজেলাধীন বাঁকা গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন।

১৭) রূপসা উপজেলাধীন শিয়ালিহাট-নরনিয়া ওয়াপদা সড়ক (চেই. ০০-১৮০০মি.) উন্নয়নসহ একই সড়কে ১৯টি ইউড্রেন নির্মাণ।

১৮) ফুলতলা উপজেলাধীন দক্ষিণডিহি- রবীন্দ্রনাথ হাউজ (রবীন্দ্র কমপ্লেক্স) (চেই. ০০-৮০০মি.) বিসি দ্বারা উন্নয়ন।

১৯) বটিয়াঘাটা উপজেলাধীন নিজগ্রাম-বিরাট ভায়া বালিয়াডাঙ্গা ইউপি অফিস সড়ক (চেই. ১০০০-৩০০০মি.) বিসি দ্বারা উন্নয়ন।

২০) ডুমুরিয়া উপজেলাধীন সলুয়া বাজার - রঘুনাথপুর বাজার ভায়া রংপুর ইউপি অফিস সড়ক (চেই. ১২০০-৪০০০মি.) উন্নয়ন।

২১) কয়রা উপজেলাধীন আরঅ্যান্ডএইচ (দেওয়াড়া)- হোগলার হাট জিসি - ঘুগরাকাটি জিসি সড়ক (চেই. ০.০০-৩৯৭০মি.) উন্নয়ন।

২২) দিঘলিয়া উপজেলাধীন পাতারহাট বাজার উন্নয়ন।

২৩) দিঘলিয়া উপজেলাধীন তেলিগাতী আলম স্মৃতি সংসদ - ডা. হারেস আলীর মোড় সড়ক (চেই. ০০-১৪৬মি.) উন্নয়নসহ একই সড়কে ২টি ইউড্রেন কালভার্ট নির্মাণ।

২৪) বটিয়াঘাটা উপজেলাধীন আমিরপুর ইউপি অফিস - ফুলতলাহাট সড়কে ৩১০০মি. চেইনেজে নারায়ণখালী খালের ওপর ৩০.০০মি. আরসিসি ব্রিজ নির্মাণ।

২৫) তেরখাদা উপজেলাধীন তেরখাদা আরএন্ডএইচ - ছাগলাদাহ্ জিসি ভায়া উপজেলা হেড কোয়ার্টার ভায়া নাচুনিয়াঘাট সড়কে ২৪৫০মি. চেইনেজে ৩.০০মি. × ৩.০০ মি. ২ ভেন্ট আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ।

২৬) ডুমুরিয়া উপজেলাধীন সলুয়া বাজার - রঘুনাথপুর বাজার ভায়া রংপুর ইউপি অফিস সড়ক (চেই. ১২০০-৪০০০মি.) উন্নয়ন।

২৮) পাইকগাছা উপজেলাধীন শান্তা বাজার- জিয়া খাল মাথা জিসি সড়ক (চেই. ০০-১১০০মি.) বিসি দ্বারা উন্নয়ন এবং একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ।

২৯) কয়রা উপজেলাধীন ঘুগরকাটি জিসি-গিলাবাড়ী জিসি- নলিয়ান জিসি সড়ক (চেই. ৯৬-১০৯৬মি.) বিসি দ্বারা উন্নয়ন।

৩০) দাকোপ ও কয়রা উপজেলায় ২৪টি নতুন স্কুল কাম ডিজাস্টার সেল্টার নির্মাণ।

সারণি-৭০

খুলনা জেলার এলজিইডির আওতায় সড়কসমূহের তথ্যাবলি (২০১৬):

ক) উপজেলা সড়ক

ক্রমিক নং	উপজেলা	মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	কাঁচা (কি.মি.)	পাকা (কি.মি.)
১.	বটিয়াঘাটা	৮৬.৩০	১৪.৩০	৭২.০০
২.	দাকোপ	১৫১.৬০	৭২.৬০	৭৯.০০
৩.	দিঘলিয়া	৩১.০০	৩.৩০	২৭.৭০
৪.	ডুমুরিয়া	১০০.৬০	০.০০	১০০.৬০
৫.	কয়রা	১০৩.২০	৩২.৯০	৭০.৩০
৬.	পাইকগাছা	১২৪.১০	১১.৫০	১১২.৬০
৭.	ফুলতলা	৫১.১০	০.০০	৫১.১০
৮.	তেরখাদা	৫৯.১০	৩.১০	৫৬.০০
৯.	রূপসা	৪৬.১০	০.০০	৪৬.১০
সর্বমোট=		৭১৭.১০	১৩৭.৭০	৫৭৯.৪০

সূত্র: এলজিইডি, খুলনা।

খ) ইউনিয়ন সড়ক

ক্রমিক নং	উপজেলা	মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	কাঁচা (কি.মি.)	পাকা (কি.মি.)
১.	বটিয়াঘাটা	৫৭.৯০	১০.৯০	৪৭.০০
২.	দাকোপ	৫৩.৩০	১৬.৯০	৩৬.৪০
৩.	দিঘলিয়া	৪৩.৬০	১.০০	৪২.৬০
৪.	ডুমুরিয়া	১৫৪.৩০	৩০.২০	১২৪.১০
৫.	কয়রা	৫৬.৮০	২৪.৭০	৩২.১০
৬.	পাইকগাছা	৪৯.৬০	২৮.৭০	২০.৯০
৭.	ফুলতলা	১৫.৭০	০.৮০	১৪.৯০
৮.	তেরখাদা	৩৫.২০	৪.১০	৩১.১০
৯.	রূপসা	২৫.৫০	০.৫০	২৫.০০
সর্বমোট=		৪৯১.৭০	১২১.৮০	৩৬৯.৯০

সূত্র: এলজিইডি,খুলনা।

গ) গ্রামীণ সড়ক-এ

ক্রমিক নং	উপজেলা	মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	কাঁচা (কি.মি.)	পাকা (কি.মি.)
১.	বটিয়াঘাটা	২১৪.৩০	৯২.৫০	১২১.৮০
২.	দাকোপ	২১১.৩০	১৩৫.১০	৭৬.২০
৩.	দিঘলিয়া	১৯৮.৩০	৭৯.৩০	১১৯.০০
৪.	ডুমুরিয়া	৩৭৪.৪০	২৪১.৮০	৯৭.০০
৫.	কয়রা	২২৪.২০	১২৪.১০	১০০.১০
৬.	পাইকগাছা	২৮৬.৬০	১৪৬.৫০	১৪১.১০
৭.	ফুলতলা	১৭৮.৯০	৪২.৭০	১৩৬.২০
৮.	তেরখাদা	৮০.৬০	৪৭.০০	৩৩.৬০
৯.	রূপসা	১১৩.৯০	৩৫.৬০	৭৮.৩০
সর্বমোট=		১৮৮২.৫০	৯৪৪.৭০	৯৩৭.৮০

সূত্র: এলজিইডি, খুলনা।

ঘ) গ্রামীণ সড়ক-বি

ক্রমিক নং	উপজেলা	মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	কাঁচা (কি.মি.)	পাকা(কি.মি.)
১.	বটিয়াঘাটা	২৯৯.৩০	২১৩.২০	৮৬.১০
২.	দাকোপ	৪২৮.২০	৩৯৫.৪০	৩২.৮০
৩.	দিঘলিয়া	৮০.৬০	৫৩.৬০	২৭.০০
৪.	ডুমুরিয়া	৭১৭.৯০	৫৭৯.১০	১৩৮.৮০
৫.	কয়রা	২৩১.৬০	২০০.২০	৩১.৪০
৬.	পাইকগাছা	২৬২.২০	১৭৯.৬০	৮২.৬০
৭.	ফুলতলা	১০৪.৫০	৭৫.৭০	২৮.৮০
৮.	তেরখাদা	২৩১.২০	২১১.৮০	১৯.৪০
৯.	রূপসা	৬৩৮.৩০	৪৯০.৪০	১৪৭.৯০
সর্বমোট=		২৯৯৩.৯০	২৩৯৯.১০	৫৯৪.৮০

সূত্র:এলজিইডি, খুলনা।

খুলনা জেলার ০৯টি উপজেলায় পল্লি অঞ্চলে এলজিইডির বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ড খুলনা জেলার অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ অবদান রেখে চলেছে।

পদ্মা সেতু প্রকল্প ও চার লেন রাস্তা

পদ্মা বহুমুখী সেতু হবে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সেতু যা বাংলাদেশের মধ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাথে খুলনার সংযোগ স্থাপন করবে। খুলনা বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম বিভাগীয় শহর। এ অঞ্চলে মোংলা সমুদ্রবন্দর, প্রস্তাবিত পায়রা সমুদ্রবন্দর, সর্ববৃহৎ বেনাপোল স্থলবন্দর, ভোমরা স্থলবন্দর অবস্থিত। পদ্মা বহুমুখী সেতু চার লেনবিশিষ্ট রাস্তা, সিঙ্গেল লেন ফ্রেইট রেলওয়ে ট্র্যাক ও ইউটিলিটি লাইন ইত্যাদিসহ ডিজাইন করা হয়েছে। পদ্মা সেতু এশিয়ান হাইওয়ে রুট-এ/১ এবং ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে রুটে অবস্থিত। পূর্ব উপ-মহাদেশীয় মাল্টিমোডাল আন্তর্জাতিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক বিশেষভাবে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক পণ্য পরিবহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সেতুটি দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১৬টি জেলার ৩০ মিলিয়ন জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে অনন্য অবদান রাখবে।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে পরিবহণ সেক্টরে ৮০% পণ্য পরিবহণ সওজ অধীন বিভিন্ন শ্রেণির সড়ক দিয়ে হয়ে থাকে। সেতুটি বাস্তবায়িত হলে প্রতিদিন গড়ে ২৫ হাজার যানবাহন যাতায়াত করবে। তদুপরি প্রতিবছর ১০% হারে ট্রাফিক বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে সওজ-এর অধীন দুই লেনবিশিষ্ট ৭.৩০মি. চওড়া ঢাকা-খুলনা জাতীয় মহাসড়ক রয়েছে। তা দিয়ে উক্ত বিশাল সংখ্যক যানবাহন চলাচলে তীব্র যানজট এবং দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থাকবে।

পদ্মা সেতুর ১৩.৬০ কিলোমিটার চার লেনবিশিষ্ট অ্যাপ্রোচ সড়ক উন্নয়ন কাজ চলমান এবং বর্তমান সরকার প্রথম বুড়িগঙ্গা হতে মাওয়া পর্যন্ত ৩২.০০ কিলোমিটার রাস্তা চার লেনে উন্নীতকরণের উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। এশিয়ান হাইওয়ে ৪১-এর বাংলাদেশ রুটে টেকনাফ থেকে মোংলা পর্যন্ত ৭৫৪.০০ কিলোমিটার সড়ক যোগাযোগ প্রস্তাবিত আছে। সওজ কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত সাব-রিজিওনাল প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১৮৫০.০০ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণের জন্য ডিটেইল ডিজাইন প্রস্তুতির কাজ চলছে। তাছাড়া চলমান আঞ্চলিক সড়ক যোগাযোগ উদ্যোগ যেমন-বিসিআইএম-ইসি করিডোর, সাসেক রোড কানেক্টিভিটি প্রকল্প ও সার্ক রুট ইত্যাদি যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন বাংলাদেশের সড়ক মহাপরিকল্পনায় রয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় নিরাপদ যানচলাচল, অর্থনৈতিকভাবে লাভবান টেকসই যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে পদ্মাসেতুর বাস্তবায়নের পাশাপাশি ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ করাও প্রয়োজন।

নৌ যোগাযোগ

ঔপনিবেশিককাল থেকে প্রতিদিন বিশেষ বাহা (paddle) স্টিমার (রকেট লঞ্চ) চাঁদপুর, বরিশাল, মোংলা ও অন্যান্য রুট হয়ে ঢাকা ও খুলনার মধ্যে চলতো। রকেট সার্ভিস এখন বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জ উপজেলা পর্যন্ত চলমান আছে। সাদা কাঠের কেবিন, ক্রিসপি সাদা চাদরের বিছানা এবং পশ্চিমা ও স্থানীয় ডিশের চীনা কায়দায় পরিবেশনা, সুদৃশ্য নদীর মধ্য দিয়ে প্রশান্ত বাহা বাষ্প লঞ্চে সমুদ্রযাত্রা মানবমনে একটি দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি হয়ে থাকে।

সুন্দরবন, কলকাতা বা বাগেরহাটে ভ্রমণের জন্য বাহা স্টীমারে ভ্রমণ একটি সহজ ও উপভোগ্য মাধ্যম। বাহা স্টিমারে ভ্রমণ করে বাংলাদেশের নদনদীর সত্যিকার সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। বর্তমানে নদীগুলোর নাব্যতা হ্রাস পাওয়ায় খুলনা জেলায় রকেট সার্ভিস চালু নেই।

চিত্র: রকেট লঞ্চ

খুলনা বিভাগের নৌ-যোগাযোগের মোট পথ প্রায় ৯৩০ কি.মি.। নৌ-যোগাযোগের যাত্রীবাহী বাহন ১০টি। খুলনা টার্মিনাল ঘাট থেকে দৈনিক আনুমানিক ২০০ যাত্রী ওঠে এবং ২০০ যাত্রী নামে। বছরে প্রায় ৭৩,০০০ জন যাত্রী নৌপথে ভ্রমণ করে। খুলনা হতে দক্ষিণ অঞ্চলে শেষ গন্তব্য পর্যন্ত ৩২টি স্টেশন আছে। স্টেশনগুলোতে প্রতিদিন আনুমানিক ২০ × ৩৩ = ৬৬০ জন, বছরে ২,৪০,৯০০ জন × ২=৪,৮১,৮০০ জন যাত্রী ওঠানামা করে থাকে। খুলনা

থেকে দক্ষিণ অঞ্চলের যে সব স্টেশনে সড়কপথে মালামাল পরিবহণের ব্যবস্থা নেই সেসব স্টেশনে অল্প খরচে নৌপথে মালামাল গন্তব্যস্থানে পৌঁছে। তা ছাড়া সড়ক পথে মালামাল বহন খরচের চেয়ে নৌপথে খরচ আনুমানিক ৪০% কম। এছাড়া মালামালের অপচয়ও কম হয়। নৌপথে মালামাল পরিবহণ করে ভোক্তা/ব্যাবসায়ী/যাত্রী আর্থিকভাবে উপকৃত হন। খুলনা জেলার উপকূলীয় অঞ্চল পূর্বদিকে শরণখোলা, দুধমুখী ও হরিণটানা; দক্ষিণে দুবলার চর, হিরণ পয়েন্ট; পশ্চিমে রায়মঙ্গল পর্যন্ত বিস্তৃত। খুলনা জেলার দক্ষিণ দিকে সুন্দরবন অবস্থিত, জেলার উন্মুক্ত অংশের আনুমানিক প্রায় ৬৫% সুন্দরবন দ্বারা বেষ্টিত। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ, খুলনার নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন রুটে মোট ০৭ (সাত) টি যাত্রীবাহী লঞ্চ চলাচল করে। লঞ্চের নাম, রুটের নাম, রুটের দূরত্বসহ বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা হলো :

সারণি-৭১

রুটের দূরত্বসহ বিস্তারিত তথ্য

ক্র: নং	নৌ-রুট	খুলনা হতে দূরত্ব
১	খুলনা- মদিনাবাদ মদিনাবাদ-খুলনা	৯০ কি.মি.
২	খুলনা- মদিনাবাদ মদিনাবাদ-খুলনা	৯০ কি.মি.
৩	খুলনা- মদিনাবাদ মদিনাবাদ-খুলনা	৯০ কি.মি.
৪	খুলনা-জোড়সিং জোড়সিং- খুলনা	১০১ কি.মি.
৫	খুলনা- মদিনাবাদ মদিনাবাদ-খুলনা	৯০ কি.মি.
৬	খুলনা-নীলডুমুর নীলডুমুর- খুলনা	১২১ কি.মি.
৭	খুলনা-নীলডুমুর নীলডুমুর- খুলনা	১২১ কি.মি.

রেল যোগাযোগ রাজধানী ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য জেলার সাথে খুলনার রেল যোগাযোগ বিদ্যমান। ছক আকারে আন্তঃনগর ও মেইল ট্রেনগুলোর তালিকা দেওয়া হলো:

সারণি-৭২

আন্তঃনগর ও মেইল ট্রেনগুলোর তালিকা

ক্রমিক নং	ট্রেনের নাম	ট্রেনের প্রকৃতি	গন্তব্য
১.	কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস	আন্তঃনগর	রাজশাহী
২.	সুন্দরবন এক্সপ্রেস	আন্তঃনগর	ঢাকা

ক্রমিক নং	ট্রেনের নাম	ট্রেনের প্রকৃতি	গন্তব্য
৩.	রূপসা এক্সপ্রেস	আন্তঃনগর	সৈয়দপুর
৪.	সীমান্ত এক্সপ্রেস	আন্তঃনগর	সৈয়দপুর
৫.	সাগরদাঁড়ি এক্সপ্রেস	আন্তঃনগর	রাজশাহী
৬.	চিত্রা এক্সপ্রেস	আন্তঃনগর	ঢাকা
৭.	মহানন্দা এক্সপ্রেস	মেইল	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৮.	রকেট এক্সপ্রেস	মেইল	পার্বতীপুর
৯.	নকশীকাঁথা এক্সপ্রেস	মেইল	গোয়ালন্দ ঘাট
১০.	বেনাপোল এক্সপ্রেস	মেইল	বেনাপোল

এছাড়াও খুলনা-কলকাতা ট্রেন চালুর লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে এবং গত ৮ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে পরীক্ষামূলকভাবে উক্ত ট্রেনের উদ্বোধন করা হয়।

রেল ব্যবস্থার উন্নয়নে রেল লাইন সংস্কার ও যাত্রী সেবার মান বাড়ানোর লক্ষ্যে কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। জেলার রেলওয়ে স্টেশনগুলো (ফুলতলা, দৌলতপুর, খুলনা) সংস্কারের অভাবে আধুনিকতার ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত। রেল স্টেশনগুলো আধুনিকীকরণ করা প্রয়োজন। এছাড়া, ট্রেনের সংখ্যা বাড়িয়ে দেশের অন্যান্য অংশের সাথে ট্রেন যোগাযোগ ব্যবস্থা চালুর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

আকাশপথ

রাজধানী থেকে খুলনার সরাসরি বিমান যোগাযোগ নেই। তবে খুলনার যাত্রীরা ঢাকা থেকে যশোর রুটে বিমানে চলাচল করে। অতীতে খুলনা সার্কিট হাউস মাঠে স্থাপিত বিশাল হেলিপ্যাডে প্রায় প্রতিদিনই হেলিকপ্টার নামত। আশির দশকে একটি দুর্ঘটনার পর হেলিপ্যাডটির অংশবিশেষ রেখে মাঠটি অবমুক্ত করা হয়। পরে বিভিন্ন সময় নানা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জেলায় বিমানবন্দর স্থাপন সম্ভব হয়নি। আর্থসামাজিক ও ভৌগোলিক গুরুত্ব বিবেচনায় জেলায় একটি বিমানবন্দর স্থাপন করা জরুরি।

অধ্যায়-৯

শিল্প ও ব্যাবসাবাণিজ্য

শিল্প

খুলনা বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম শিল্পনগরী। অতীতে খুলনা শুধু সুন্দরবনের জন্য বিখ্যাত ছিল। এক সময় লবণ ও গুড় শিল্পের জন্য খুলনা বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে এ জেলা নীলচাষে সারা দেশে পরিচিত হয়ে ওঠে। ১৮৭০ সাল পর্যন্ত নীল ছিল বৈদেশিক বাণিজ্যের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তবে শুধু এসব ছোটোখাটো ব্যাপার নয়, আজ খুলনা বন্দরনগরী হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত স্থান। আবার শুধু বন্দরনগরীই নয়, আজ খুলনা শিল্পনগরী হিসেবেও সুপরিচিত। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ঢাকা ও চট্টগ্রামের পরেই খুলনার স্থান। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এসব শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভিত্তি করেই তৃতীয় শিল্পনগরী হিসেবে খুলনার অভ্যুদয় ঘটেছে।

খুলনা জেলায় পাট কল, চাউল মিল, বস্ত্র মিল ছাড়া এ শহরে ১৯৪৭ সালের আগে আর কোনো ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। এ অনগ্রসরতার মূল কারণ ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতি। ইংরেজরা ভারতবর্ষে প্রায় ২০০ বছর রাজত্ব করেছে। তবে এসব অঞ্চলে ভারী শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না। তারা এসব অঞ্চলকে ব্যবহার করেছে কাঁচামালের উৎস ও শিল্পজাত পণ্যের বাজার হিসেবে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৫০ সালের প্রথম থেকে ১৯৭০ সালের শেষ নাগাদ সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে খুলনার বর্তমান পাটকল, নিউজপ্রিন্ট, হার্ডবোর্ড, জাহাজ নির্মাণ কারখানা প্রভৃতি শিল্প কারখানা স্থাপিত হয়।[১]

প্রাচীন শিল্পসমূহ:

লবণশিল্প

মোগল আমল থেকেই জেলার সমুদ্র উপকূল লবণের অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। কৃষির পাশাপাশি লবণ, বস্ত্র, তাঁত ইত্যাদি কৃষকদের সম্পূরক পেশা হিসেবে ছিল। অতি প্রাচীনকাল থেকে সমুদ্রের লোনা পানি রোদে শুকিয়ে লবণ প্রস্তুত করা হতো। মোগল আমলে রাজস্ব সংগ্রহের একটি বিশেষ উৎস ছিল লবণশিল্প। তখন ইজারাদারদের মাধ্যমে প্রচুর লবণ উৎপাদনের ব্যবস্থা ছিল। লবণ উৎপাদক ও ব্যাবসায়ীগণকে পর্যাপ্ত সরকারি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হতো। পরবর্তীকালে নবাবি আমলে জেলার লবণশিল্প বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। এ শিল্পের অগ্রগতির ব্যাপারে বাংলার নবাবগণ বেশ পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। নবাব আলীবর্দী খাঁর আমলে লবণের মূল্য সবচেয়ে কম ছিল। তখন লবণের ব্যাবসায় শতকরা ২.৫ ভাগ থেকে ৫ ভাগ হারে কর ধার্য করা হতো।

---

[১] ড. শেখ গাউস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩৫।

আগে সুন্দরবনের রায়মঙ্গাল অঞ্চলটি ছিল বৃহত্তর খুলনা জেলায় লবণ উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। লবণ উৎপাদন কেন্দ্র ‘নির্মোক চৌকি’র সদর অফিস ছিল খুলনা শহরে। নির্মোক চৌকির প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন ইউয়াট সাহেব। লবণ শ্রমিকদের বলা হতো ‘মাহিন্দার’। আর যারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে দাদন দিয়ে মাহিন্দার সংগ্রহ করে তাদের সঙ্গে লবণ তৈরির জন্য চুক্তি করত তাদের বলা হতো ‘মালঙ্গি’। মালঙ্গিরা সরকারি সল্ট এজেন্টদের কাছ থেকে মোটা অংকের অগ্রিম নিয়ে লবণ প্রস্তুতের জন্য মাহিন্দারদের ঋণ দিত। এক কথায় মালঙ্গিদের লবণ শিল্পের মধ্যস্বত্বভোগী বলা যায়। গরিব মাহিন্দারগণ জীবনধারণের জন্য ঋণ গ্রহণ করে ইংরেজ বণিকদের অধীনে লবণ তৈরি করতে সম্মত হতো। কিন্তু ইংরেজ কর্মচারী ও মালঙ্গিরা মাহিন্দারদের ওপর অত্যাচার করতো। তাই অত্যাচারের ভয় এবং লবণাক্ত স্থানে স্বল্প সময়ে স্বাস্থ্য নষ্ট হতো বলে গরিব চাষিরাও আর মাহিন্দারের কাজ করতে চাইত না। ফলে জোর জুলুম করে লোক সংগ্রহের জন্য ইউয়াট সাহেব মালঙ্গিদের সিপাহি দিয়ে সাহায্য করতেন। এভাবে একদিকে লবণ চাষি আর অন্যদিকে মালঙ্গি ও লবণ সিপাহিদের মধ্যে লড়াই লেগেই থাকত। আদালতেও এ অত্যাচারের প্রতিকার পাওয়া যেত না। উৎপাদিত লবণের ওপর তিন/চার গুণ সুদ আদায় করা হতো। হেংকেল সাহেব বৃহত্তর খুলনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হওয়ার পর মাহিন্দারগণ ঐক্যবদ্ধভাবে তার নিকট উৎপীড়ন বন্ধের আবেদন জানায়।

লবণ শিল্পের উন্নতির জন্য ব্রিটিশ আমলে কোনো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ না নেওয়ায় এবং উন্নত যন্ত্রের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে উৎপাদিত সস্তা লবণ এ দেশে আসতে শুরু করায় ১৮১৭ সালের পরে খুলনায় লবণ শিল্পের সংখ্যা কমে যেতে থাকে। তবে গত শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে লবণ শিল্প কিছুটা পুনরুজ্জীবিত হয়েছে।[২]

ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে লবণ শিল্পের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি আগে উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্রের লোনা পানি থেকে কুটিরশিল্পভিত্তিক লবণ প্রস্তুত করা হতো। ফলে বৃষ্টিপাত, আবহাওয়ার আর্দ্রতা, বাতাসের তাপ-চাপ, লোনা পানিতে লবণের কমবেশি ইত্যাদি প্রাকৃতিক খেয়ালিপনার ওপর লবণ উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর করত। কার্তিক থেকে বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকায় সময়টি লবণ প্রস্তুতের জন্য অধিক উপযোগী। লবণ প্রস্তুতের সাধারণ পদ্ধতি দুইটি। একটি হচ্ছে সূর্য কিরণের সাহায্যে (Solar process) এবং অন্যটি অনুস্রাবণ (Lixiviation) পদ্ধতি। খুলনায় অনুস্রাবণ পদ্ধতিতে লবণ তৈরি করা হয়। সুন্দরবনসহ সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল থেকে সংগৃহীত লবণ কাদার মিশ্রণ কতগুলো বাঁশের চোঙ্গের ভেতর ঢুকিয়ে চোঙগুলোকে একটি মাচাঙের সাথে আটকিয়ে রাখা হয়। চোঙের নিম্নভাগে ছাকনির জন্য একটি পাতলা কাপড়

[২] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা : ২৪০-২৪১

বেঁধে রাখা হয়। এর পর চোঙের ভেতরে জোরে পানি প্রবেশ করান হয়। ফলে লবণের দ্রবণটি কাদামুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসে। এরপর লবণ পানি একটি মাটির পাত্রে সংগ্রহ করা হয় এবং পর্যায়ক্রমে তাপ দিয়ে পরিষ্কার লবণ পাওয়া যায়।

অনুস্রাবণ পদ্ধতিতে শ্রমিকের মাথাপিছু লবণ উৎপাদনের পরিমাণ সূর্যরশ্মির সাহায্যে উৎপাদিত লবণের চেয়ে অনেক কম হতো। ১৯৬২-৬৩ সালে দেখা গেছে এই পদ্ধতিতে মাথাপিছু উৎপাদিত লবণের পরিমাণ এ জেলায় যেখানে ৪.১০ কুইন্টাল সেখানে চট্টগ্রাম জেলায় সূর্যরশ্মির সাহায্যে মাথাপিছু উৎপাদিত লবণের পরিমাণ ছিল ৯০ কুইন্টাল। লবণ প্রস্তুতের দিক দিয়ে (পরিশোধিত) চট্টগ্রামের এর পরেই খুলনার স্থান ছিল। তবে অপরিশোধিত লবণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নোয়াখালীর পরেই এ জেলার স্থান ছিল।[৩]

বিসিক-এর মাধ্যমে ‘সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্যক্রম’ এর মাধ্যমে দেশের জনসাধারণকে আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করে আয়োডিনের অভাবজনিত রোগ ও তার প্রতিকার করাই মূল উদ্দেশ্য। বর্তমানে খুলনায় লবণ মিলের সংখ্যা ১৮টি। এর মধ্যে চালু রয়েছে ১২টি আর বন্ধ রয়েছে ০৬টি। উল্লেখযোগ্য মিলসমূহের তালিকা দেওয়া হলো।

লবণ কারখানার নাম	**অবস্থান**
১. মেসার্স সুন্দরবন সল্ট ইন্ডাস্ট্রিজ	সিংহেরচর, রূপসা, খুলনা।
২. রাজাপুর সল্ট ইন্ডাস্ট্রিজ	রাজাপুর, রূপসা, খুলনা।
৩. পদ্মা সল্ট ইন্ডাস্ট্রিজ	দামোদর, ফুলতলা, খুলনা।
৪. তিস্তা সল্ট ইন্ডাস্ট্রিজ	সিকিরহাট, ফুলতলা, খুলনা।
৫. গফফার ফুড প্রোডাক্টস প্রাইভেট লি.	কেডিএ-১ শিরোমণি শিল্প নগরী
৬. রমনা সল্ট রিফাইনারিজ	সিংহেরচর, রূপসা, খুলনা।
৭. মা সল্ট ইন্ডাস্ট্রিজ	২২, ভৈরব স্ট্যান্ড রোড, খুলনা।
৮. তিতাস সল্ট ইন্ডাস্ট্রিজ	নিকলাপুর, রহিমনগর, রূপসা, খুলনা।
৯. মেঘনা সল্ট ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রা.) লি.	সিংহেরচর, রূপসা, খুলনা।
১০. মধুমতি সল্ট ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রা.) লি.	দামোদর, ফুলতলা, খুলনা।
১১. পূরবী সল্ট ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রা.) লি.	সিংহেরচর, রূপসা, খুলনা।
১২. যমুনা সল্ট ইন্ডাস্ট্রিজ লি.	সিংহেরচর, রূপসা, খুলনা।

উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো প্রধানত আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন করে। প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাঁচামাল হিসেবে কাঁচালবণ ও আয়োডিন ব্যবহৃত হয়। কাঁচামাল প্রধানত চট্টগ্রাম, টেকনাফ, কক্সবাজার, মহেশখালী ও ভারত থেকে আমদানি করা হয়। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান প্রতিবছর ১৫ হাজার টন লবণ

[৩] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৭৫।

উৎপাদন করে। আবার কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান ৭,২০০ মেট্রিক টন লবণ উৎপাদন করে।

খেজুর গুড় উৎপাদন খেজুর গুড় প্রাক-ব্রিটিশ আমল থেকে অদ্যাবধি উল্লেখযোগ্য শিল্প হিসেবে স্বীকৃত। বর্তমানকালেও এ শিল্পের বিস্তৃতি অব্যাহত রয়েছে। খুলনা জেলার ফুলতলা ও ডুমুরিয়া উপজেলায় খেজুরের গুড় তৈরি করা হয়।

নীল ও অন্যান্য শিল্প এক সময় এই জেলা যখন যশোর জেলার অধীনে ছিল তখন অন্যান্য প্রস্তুতকৃত দ্রব্যের মধ্যে নীলও ছিল জেলার অন্যতম প্রধান শিল্পজাত দ্রব্য। ১৮৬০ সালে দেখা গেছে জেলার বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চিনির পরেই ছিল নীলের স্থান। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে জেলার অন্যান্য ছোটোখাটো শিল্পের মধ্যে মৃৎশিল্প ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিম্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা রংবেরং মাটি দিয়ে বাসনকোসন তৈরি করত। এগুলোর ব্যাপক ব্যবহার ছিল এবং বিশেষভাবে খেজুরের গুড় তৈরির কাজে অধিক ব্যবহৃত হতো। কাসারি সম্প্রদায় কাঁসার সাধারণ বাসন পত্রসহ অন্যান্য তৈজসপত্র তৈরি করত।[৪]

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কিছুটা প্রকৃতিগত কারণেই এ জেলায় কিছু কুটিরশিল্প গড়ে ওঠে। তার মধ্যে মৎস্য চাষ, নৌকা তৈরি, মধু আহরণ, বাঁশ ও বেতের কাজ, গোলপাতার কাজ, মাদুর তৈরি প্রভৃতি প্রধান। এসব শিল্পের প্রচলন আজও কিছু চালু রয়েছে।

বৃহদায়তন শিল্প বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে দেখা যায় এ জেলায় বৃহদায়তন শিল্পের যথেষ্ট অগ্রগতি সূচিত হয়েছে। এসব শিল্পের কিছু নাতিদীর্ঘ আলোচনা দেওয়া হলো।

পাটশিল্প

রাষ্টায়ত্ত পাটশিল্প:

পিপলস জুট মিলস্ লি. খুলনার ভৈরব নদের তীরে পিপলস জুট মিলস্ অবস্থিত। এটি খুলনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাটকল। ইপি আইডিসির উদ্যোগে ১৯৫২ সালে ৬৯.১৮৭ একর জমি অধিগ্রহণ করে প্রথমে ৮০০ তাঁতের সমন্বয়ে ১নং মিল স্থাপিত হয় এবং ১৯৫৪ সালে প্রথম বাণিজ্যিকভিত্তিক উৎপাদন শুরু হয়।

১৫/১০/৫৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে রেজিস্ট্রিভুক্তির মাধ্যমে আগা খান গ্রুপ এটি ক্রয় করে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত করে। ১৯৬৪-৬৫ সালে ওয়েজ আর্নার স্কিমে ৭৯টি বড়ো তাঁতের সমন্বয়ে মিল নং-৩ এবং ১৯৬৭ সালে তৎকালীন ইপি আইডিসির সহায়তায় ২৫০টি ছোটো তাঁতের সমন্বয়ে মিল নং-২ প্রতিষ্ঠিত হয়।

[৪] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, ২৪১-২৪২।

স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত মিলটি আইপিডিসি-এর পরিচালনাধীন ছিল। স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নং পিও-২৭ অনুযায়ী জাতীয়করণের মাধ্যমে বিজেএমসির ওপর প্রকল্পটি পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। স্বাধীনতার আগে কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল ১৭৫, কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ৬৩২ এবং শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৭,২০৩ জন।

২০০১-২০০২ অর্থ বছরে ১,২৬৫.৪৮ লাখ টাকা পাট খাতে দেনা নিয়ে ২০০২-২০০৩ অর্থবছরের পাট ক্রয় কার্যক্রম শুরু করা হয়। সরকারি ১১.০০ কোটি এবং নিজস্ব বিক্রয় খাতে প্রাপ্ত ৮.০০ কোটি সর্বমোট ১৯.০০ কোটি টাকা পাট খাতে ব্যয় করে প্রায় ১২.০০ কোটি টাকার পাট খরিদ করা হয়, যা প্রয়োজনের শতকরা ৮০ ভাগ। আর্থিক বছরের শেষের দিকে মিল বিরাষ্ট্রীয়করণের সরকারি সিদ্ধান্তের সংবাদে পাট ব্যাবসায়ীরা বাকিতে পাট সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। আর্থিক সংকটের কারণে নগদ মূল্যে পাট খরিদ করা সম্ভব না হওয়ায় জুলাই'০৩ সালে পাটের প্রচণ্ড অভাব দেখা দেয়। অতঃপর ২০০৭ সালের ১১ জুলাই মিলটি তৎকালীন সরকার বন্ধ করে দেয়। পরবর্তীকালে এই মিলটি কাজী ফার্ম লিমিটেডের নিকট লিজ দেওয়া হয় এবং পিপলস জুট মিলের পরিবর্তে খালিশপুর জুট মিল নাম দেওয়া হয়। ২০১৩ সালের ২৪ জানুয়ারি চালু হওয়ার পর বর্তমানে মিলে কর্মরত কর্মকর্তা ১১০, কর্মচারী ৪৭১, শ্রমিক এবং ৩৩৭৬ জন। এর মধ্যে হেসিয়ানে ৬০৮, স্যাকিং-এ ২,৩৪৫ ও সিবিসি ৬৬ জন। অন্যান্য জায়গায় হাজিরা শ্রমিক হিসেবে ৩৫৭ জন শ্রমিক কাজ করছে।[৫] মিলে ওয়ার্কশপ, বিদ্যুৎ মেরামত, কারখানা ও পাম্প হাউস আছে। বর্তমানে মিলটি লাভজনক অবস্থায় আছে।

ক্রিসেন্ট জুট মিলস্ কো. লি.

আগা খান গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এবং মেসার্স র‍্যালি ব্রাদার্স লি. এর যৌথ পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত হয় খুলনার সবচেয়ে বড়ো এই জুট মিল। আদমজী পাটকল ছিল দেশের মধ্যে বৃহত্তম। এর পরেই খুলনার স্থান, মিল প্রতিষ্ঠার তারিখ ২০.০৩.১৯৫২। উৎপাদন শুরু হয় ০১.১০.১৯৫৪ তারিখে। মিলে মোট জমির পরিমাণ ১১৩.০৩ একর। এর মধ্যে মিল এলাকাতে ১০৭.৭০ একর এবং মিল এলাকার বাইরে ৫.৩৩ একর মিলে প্রথম পর্যায়ে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৫ লাখ টাকা। এর ৪৯% অংশ ছিল তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের, আগা খানের ছিল ৩৪% শতাংশ এবং র‍্যালি ব্রাদার্স লি. অ্যান্ড জেমস মেকলি অ্যান্ড সন্স লিমিটেডের ছিল ১৭ শতাংশ। এভাবে এটি একটি লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই মিলটি নির্মাণে কারিগরি সহায়তা দান করে ইংল্যান্ডের বেলফ্যাক্টস্থ জেমস ম্যাকি অ্যান্ড সন্স লিমিটেড।

বর্তমানে এই মিলে তিনটি পৃথক ইউনিটের সমন্বয়ে সর্বমোট ১,০৩৩ টি ন্যারো তাঁত এবং ১০৩টি সিবিসি (কার্পেট ব্যাকিং ক্লথ) রয়েছে। বর্তমানে তিনটি

---

[৫] ব্যবস্থাপক (শ্রম ও প্রশাসন), খালিশপুর, জুটমিল খুলনা, তাং - ১১/০৫/২০১৪।

ইউনিট মিলে উৎপাদনের দৈনিক বাজেট (২০১২-২০১৩) ৮৭.৫০ মেট্রিক টন। এই মিলে বাৎসরিক পাট ব্যবহারের পরিমাণ প্রায় ২,৬৫,৮৭৬ কুইন্টাল। দেশের বিভিন্ন স্থানে এজেন্সির মাধ্যমে ও মিল গেটে এ পাট ক্রয় করা হয়। এজেন্সিগুলো হলো মাগুরা, চরমুগরিয়া (মাদারীপুর), কানাইপুর (ফরিদপুর), নীলফামারী, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, পলাশবাড়ী ও রানীনগর। এর মধ্যে নীলফামারী ও গাইবান্ধা এজেন্সি সবচেয়ে বড়ো। কাঁচা পাট রাখার জন্য মিলে সুবৃহৎ ১৮টি গুদাম রয়েছে। মিলে সর্বমোট বিদ্যুৎ চাহিদা ৩,২০০ কিলোওয়াট/ঘণ্টা। এর প্রায় সবই পাওয়া যায় পিডিবি থেকে। স্বাধীনতার আগে এই মিলের কর্মকর্তা ছিল ১৫৫, কর্মচারী ৬৪৭ এবং শ্রমিক ৭,১০৮ জন। বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা ১১৩, কর্মচারী ৫২৮ এবং শ্রমিক ৫,৩৬৩ জন। এখানে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ২৬৮ জন। এই মিলে শ্রমিকের বাসস্থানের সংখ্যা ৩৪২টি। এছাড়াও অতিথি ভবন ও আকর্ষণীয় মিলনায়তন রয়েছে।[৬]

দৌলতপুর জুট মিলস্ লি. মিলটি খালিশপুর, খুলনায় অবস্থিত। ২২.৫৯ একর জমির ওপর ১৯৫৩ সালে মিলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মিলে উৎপাদন শুরু হয় ১৯৫৫ সালে। এ মিল স্থাপনে কারিগরি সহায়তা দান করেন ইংল্যান্ডের জেমস ম্যাকী কোম্পানি। মিলটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এসএল শেঠীয়া। তিনি মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। এক সময় এটি মাড়োয়ারি মিল নামে পরিচিত ছিল। ১৯৫৫ সালে যখন মিলটির উদ্বোধন হয় তখন এর তাঁত সংখ্যা ছিল ২৫০টি। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পর মাড়োয়ারি শেঠীয়া দেশত্যাগ করেন। তখন তাদের দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণে মিলটি শত্রু সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হয় এবং ইপিআইডিসি এর দায়িত্বভার গ্রহণ করে। ১৯৭২ সালে জাতীয়করণের মাধ্যমে মিলটিকে বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। দীর্ঘদিন চালু থাকার পর ২০০২ সালের ৭ ডিসেম্বর তৎকালীন বিএনপি জোট সরকার মিলটি বন্ধ করে দেয়। দীর্ঘ দশ বছর বন্ধ থাকার পর বর্তমান সরকার ২০১৩ সালের ২৪ জানুয়ারি মিলটি পুনরায় চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আগে হেসিয়ান ও স্যাকিং উৎপাদিত হলেও বর্তমানে শুধু স্যাকিং উৎপাদিত হচ্ছে। প্রতিদিন উৎপাদনের পরিমাণ ৯.০৯ মেট্রিক টন। বর্তমানে তাঁতের সংখ্যা ১০০টি। মিলে বর্তমানে ২ শিফটে কাজ হয়। বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা ২০, কর্মচারী ৩য় ও ৪র্থ সহ ১০১ এবং শ্রমিক (অস্থায়ী) ৬৬৩জন। বর্তমান অর্থবছরে মিলের বিদ্যুৎ খরচ প্রতিদিন ৪,৫০০ থেকে ৫,০০০ ইউনিট পর্যন্ত।

এই মিলটি খুলনার দ্বিতীয় পাটকল এবং সারা বাংলাদেশের মধ্যে তৃতীয় পাটকল হিসেবে স্বীকৃত। খুলনায় ক্রিসেন্ট জুট মিলের পরেই এর স্থান। মিলটি স্থাপিত হয়েছে ভৈরব নদের তীরে, শহরের খালিশপুর নামক স্থানে। মিলটির প্রতিষ্ঠা ১৯৫৪-৫৫ সালে। মিলের মোট জমির পরিমাণ ৬১.৪৪ একর। এর মধ্যে মিল এলাকাতে ২১.৪৮ একর। মিল এলাকার বাইরে ৩৯.৯৬ একর (এর মধ্যে

---

[৬] এম. আই.এস.(ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম), ক্রিসেন্ট জুট মিলস অফিস থেকে প্রাপ্ত, তাং-১৫/০৫/২০১৪।

জরিপে ৫.৫৭ একর জমি রাস্তা হিসেবে সিটি কর্পোরেশনের নামে রেকর্ডভুক্ত হয়েছে)। মিলে উৎপাদন শুরুর তারিখ ন্যারোলুম (১নং মিল) ১৯৫৮ এবং ব্রডলুম (২নং মিল) ১৯৬৬।

প্লাটিনাম জুবিলি জুট মিলস্ লি.

হেসিয়ান, স্যাকিং, কার্পেট ব্যাকিং এগুলোই মিলের উৎপাদিত দ্রব্য। উৎপাদিত দ্রব্য সরাসরি বিদেশে রফতানি করা হয়ে থাকে। ১৯৬৯-৭০ সালে মিলে কাঁচাপাটের ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ২২,৫৭৩,২৭ টন এবং উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ ছিল হেসিয়ান ৯.৮৯৮ টন, স্যাকিং ৭.৫৩৯ টন ও কার্পেট ব্যাকিং ক্লথ ১,৬৪৫ টন। বর্তমান কাঁচাপাট ব্যবহারের পরিমাণ বছরে ৬ লাখ ২০ হাজার মণ। এই মিলের নিজস্ব একটি কর্মশালা ও পাওয়ার প্লান্ট আছে। পাট ক্রয়ের জন্য সারা দেশে ১৩টি এজেন্সি আছে। বর্তমানে মিলে কর্মরত কর্মকর্তার সংখ্যা ১০৩ জন। কর্মচারী ৪৩৮ জন। শ্রমিক ৪৩৮০ জন।[৭] ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ অন্যান্য মিলের সঙ্গে এটিকেও জাতীয়করণ করা হয় এবং বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশনের নিকট এ মিলের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। অন্যান্য মিলের মতো এ মিলটি বর্তমানে একটা অলাভজনক প্রতিষ্ঠান।

স্টার জুট মিলস্ লি.

খুলনার দিঘলিয়া উপজেলাধীন চন্দনীমহলো নামক স্থানে মিলটি অবস্থিত। মিলটির নির্মাণকাজ শুরু হয় ১৯৫৬ সালে। উৎপাদন শুরুর তারিখ ১নং মিল ১২ জুলাই ১৯৫৮ এবং ২নং মিল ১ জুলাই ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ। মিলের মোট জমির পরিমাণ ৫৬.৩১ একর। মিল এলাকাতে ৫৪.৮০ একর। মিল এলাকার বাইরে ১.৫১ একর। মিলটির একটি ইউনিটের নির্মাণব্যয় ছিল এক কোটি পঞ্চাশ লাখ টাকা। মিলের ২টি ইউনিটে হেসিয়ান (চট) ও স্যাকিং (বস্তা) উৎপাদন হয়। মিলের স্থাপিত তাঁতের সংখ্যা ৭৬০টি। উৎপাদিত দ্রব্যের ৯০% বিদেশে রফতানি করা হয়। বাকি ১০% দেশের মধ্যে সরবরাহ করা হয়। এখানে সিবিসি (কার্পেট ব্যাকিং ক্লথ) উৎপাদন হয় না। ১৯৬৯-৭০ সালে মিলে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল হেসিয়ান ৮,৫৮০ টন ও স্যাকিং ৮,৫৪৪ টন এবং তাঁতের সংখ্যা ছিল ৫৭০টি। সে সময়ে মিলে কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ৫৩২ এবং শ্রমিক ছিল ৩,৬৬৩ জন। বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তার সংখ্যা ৭০, কর্মচারী ২৮৫ জন এবং শ্রমিক ৩,০৭৭ জন। এর মধ্যে প্রায় ১০০ মহিলা শ্রমিক কাজ করে। মিলে ৬০ জন কর্মকর্তার থাকার ব্যবস্থা আছে।[৮] ১৯৭২ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নং পিও ২৭ মোতাবেক এই মিলটি জাতীয়করণ করে বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয় যা অদ্যাবধি চলছে।

আলীম জুট মিলস্ লি.

আলীম জুট মিল বিজেএমসি নিয়ন্ত্রিত একটি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান। এ মিলের স্থাপনব্যয় ১.৪৫ কোটি টাকা। মিলটি ফুলতলা উপজেলার আটরা শিল্প এলাকায় অবস্থিত। ১৯৬৪ সালে মিলটি সরকার কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে এবং ১৯৬৮

[৭] সহ-ব্যবস্থাপক, প্লাটিনাম জুবিলী জুট মিল অফিস থেকে প্রাপ্ত, তাং-১৮/০৫/২০১৪।
[৮] এম.আই.এস (ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশনস সিস্টেম), ষ্টার জুট মিল অফিস থেকে প্রাপ্ত, তাং-২২/০৫/২০১৪।

সাল থেকে উৎপাদন কাজ শুরু করে। এই মিল প্রধানত স্যাকিং (বস্তা) এবং হেসিয়ান (চট) এই দুই প্রকারের পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন করে। এ প্রতিষ্ঠানটি মোট ৪৪.৬৬ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত যার অবকাঠামো ১০ একর আবাসিক, ১১.৪৪ একর কৃষি, ১৪ একর পুকুর, ৩ একর মসজিদ/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং ০১ একর রাস্তা। এ মিলে বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তার সংখ্যা ৪০, কর্মচারী ১৬২ এবং শ্রমিক ১,১৭৮ জন। এ মিলে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত পাট স্থানীয়ভাবে জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, নীলফামারী, মাগুরা, ফরিদপুর ইত্যাদি স্থান হতে ক্রয় করা হয়ে থাকে। উৎপাদিত পাটজাত দ্রব্য স্থানীয়ভাবে সার কারখানা, খাদ্য বিভাগ, ভারত, সুদান, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে রফতানির মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়ে থাকে।[৯]

ইস্টার্ন জুট মিলস্ লি. এই মিলটি বিজেএমসি নিয়ন্ত্রিত একটি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান। মিলটি ফুলতলা উপজেলার আটরা শিল্প এলাকায় অবস্থিত। ২৯/০৭/১৯৬৭ তারিখে মিলটি সরকার কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে এবং ১/১১/১৯৬৫ তারিখ থেকে ২৫৪টি তাঁত নিয়ে উৎপাদন কাজ শুরু করে। এই মিল প্রধানত স্যাকিং (বস্তা), হেসিয়ান (চট), সিবিসি (কার্পেট ব্যাকিং ক্লথ), প্যাটেল স্যালভেজ (হালকা চট) জাতীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করে। অত্র প্রতিষ্ঠানটি মোট ৪০.২৭ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত।[১০] ১৯৬৯-৭০ সালে শ্রমিক সংখ্যা ছিল ১,২৫০জন এবং কর্মকর্তা ছিল ১৮০ জন। সে বছর কাঁচা পাট ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ৭,৬৩৩.২৫ টন এবং উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২,৭৮৮ টন হেসিয়ান ও ৪,৭৬৬ টন স্যাকিং।[১১] বর্তমানে কর্মকর্তার সংখ্যা ৪৭, কর্মচারী ২০৩ এবং শ্রমিক সংখ্যা ১,৪৭৩জন। মিলে উৎপাদিত দ্রব্য স্থানীয়ভাবে ছাড়াও বিদেশে রফতানির মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়ে থাকে।

ব্যক্তি মালিকানাধীন পাটকল

অ্যাজাক্স জুট মিলস্ লি. খুলনার মীরেরডাঙ্গা নামক স্থানে ভৈরব নদের তীরে পূর্ব পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে ৬৬ একর জমির ওপর মিলটি স্থাপিত হয়। এর জন্য ব্যয় করা হয় দেড় কোটি টাকা। ১৯৬৫ সালে মিলটিতে উৎপাদন কাজ শুরু হয়। এ সময় এর তাঁত সংখ্যা ছিল ২৫০টি। এর মধ্যে ১২৫টি স্যাকিং এবং ১২৫টি হেসিয়ান। বর্তমানে এর তাঁত সংখ্যা ২৫০। তবে কিছুটা পরিবর্তন করে হেসিয়ানে রাখা হয়েছে ৫০টি এবং স্যাকিংয়ে ২০০টি। ১৯৬৮-৬৯ সালে এর শ্রমিক সংখ্যা ছিল ১,৪৫০ জন এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী ছিল ১৮০ জন। বর্তমানে কর্মকর্তা ও কর্মচারী ১৮৫ জন। স্থায়ী শ্রমিক ৭৩০ এবং বদলি শ্রমিক ২২৬ জন। এখন স্থানীয়ভাবে সরবরাহকারীদের নিকট থেকে পাট কিনে মিল চালানো হয়। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির এক আদেশবলে সকল পাটকলগুলোর সঙ্গে এ

[৯] ফুলতলা উপজেলা প্রোফাইল।

[১০] ওই।

[১১] বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা -২৪৮।

প্রতিষ্ঠানটিকেও জাতীয়করণ করা হয়। পরে অলাভজনক বলে গণ্য হওয়ায় ১৯৮২ সালের ডিসেম্বরে মিলটিকে পুনরায় বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হয় এবং পুরানো মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

আফিল জুট মিলস্ লি.

মিলটি খুলনার আটরা মিলস্ এলাকায় অবস্থিত। ১৯৬৪ সালে মিলটি সরকার কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে এবং ১৯৬৭ সাল থেকে উৎপাদনকাজ শুরু করে। ২৫০টি তাঁতবিশিষ্ট এই মিলটি বর্তমানে স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তির উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। অত্র প্রতিষ্ঠানটি মোট ৫০.৫৩ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত।[১২] এই মিল প্রধানত স্যাকিং (বস্তা) এবং হেসিয়ান (চট) এই দুই প্রকারের পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন করে। সার্বিক কর্মকাণ্ডের সমন্বয়ে প্রায় ১,৫০০ জন শ্রমিক কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ব্যাবসায়ী রয়েছেন বলে জানা যায়।

সোনালী জুট মিলস লি.

ভৈরব নদের তীরে ১৯৬৮ সালে মিলটি স্থাপিত হয়। ১৯৬৮ সালে ২৫০টি তাঁত নিয়ে মিলটি পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু করে। ৫৬ একর জমির ওপর মিলটি স্থাপিত। ১৯৬৯-৭০ সালে এর কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ১,৬০০ জন। তৎকালীন বার্ষিক গড় উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২৬০ টন হেসিয়ান এবং ৪৭০ টন স্যাকিং।[১৩] ১৯৭২ সালে মিলটিকে জাতীয়করণ করা হয়। তবে লাভজনক না হওয়ায় ১৯৮৩ সালে তা বিরাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে মোস্তফা ইসলাম গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের নিকট হস্তান্তর করা হয়। বর্তমানে এ মিলে কর্মকর্তা ও কর্মচারী যথাক্রমে ৫২ ও ২০ জন এবং শ্রমিকের সংখ্যা ১,৬৪১ জন। আগে অবশ্য এর সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। এখানে কর্মকর্তা কর্মচারীদের আবাসন ব্যবস্থা এবং তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য একটি স্কুল আছে। কর্মচারীদের চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিষয়ে যত্ন নেবার জন্য ৩ জন কম্পাউন্ডার সহ এমবিবিএস ডাক্তার আছে। বর্তমানে মিলটিতে উৎপাদন বন্ধ রয়েছে।

মহসিন জুট মিলস লি.

১৯৭১ সালের ৪ জানুয়ারি হতে মিলটিতে প্রথম উৎপাদন শুরু হয়। মিলটি ভৈরব নদের তীরে অবস্থিত। জুট মিলটি সুতা তৈরি করে চাহিদামতো বিদেশে রফতানি করে। মিলটিতে স্থায়ী শ্রমিক সংখ্যা ৬৩৫ জন এবং বদলি শ্রমিকের সংখ্যা ২৭০ জন। মিলটিতে মোট ১৩৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত বলে জানা যায়।[১৪] বর্তমানে মিলটিতে উৎপাদন বন্ধ রয়েছে।

জুট ইয়ার্ন অ্যান্ড টোয়াইন মিলস্ লি.

বর্তমানে জুট ইয়ার্ন অ্যান্ড টোয়াইন মিলের মাধ্যমে পাটকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে সুতা তৈরি করা হচ্ছে। এসব মিলকে স্পিনিং মিল নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। সারা বাংলাদেশে এই শ্রেণির ৩০/৩৫টি মিল রয়েছে। এসব মিলে সাধারণত পাটের সুতা তৈরি হয়। এর অধিকাংশ সুতাই রফতানিযোগ্য। খুলনায় এই শ্রেণির ৫/৬টি মিল রয়েছে। এগুলো হলো জুট

---

১২ ফুলতলা উপজেলা প্রোফাইল।

১৩ বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৯।

১৪ ইতিহাস ও ঐতিহ্য খুলনা দৌলতপুর প্রকাশক মিতালি বই ঘর, প্রকাশকাল বাংলা, ১লা বৈশাখ ১৪১০ খ্রিস্টাব্দ ইংরেজি ২৪ এপ্রিল ২০০৩। পৃষ্ঠা : ৩৬৯।

স্পিনার্স লি., ট্রান্স ওশেন লি., সাগর জুট মিল লি. (সেনহাটি), স্পেশালাইজড জুট স্পিনিং মিল লি. প্রভৃতি।[১৫] এছাড়াও ২০০৬ সালে সুপার জুট মিল লি. ফুলতলা এলাকায় গড়ে উঠেছে।

জুট টেক্সটাইল মিলস লি. খুলনা জেলার ভৈরব নদের পাড়ে দিঘলিয়া উপজেলাধীন দেওয়াড়া গ্রামে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জুট টেক্সটাইল মিলটি অবস্থিত। ৬ একর জমির ওপর ২০১২ সালের এপ্রিল মাসে মিলটি গড়ে ওঠে এবং একই বছর উৎপাদন শুরু হয়। এই মিলে উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে চট, বস্তা ও সুতা অন্যতম। বর্তমান উৎপাদন প্রতিদিন ৩০ মেট্রিক টন। যার ভিতরে ১০ মেট্রিক টন হচ্ছে চট, বস্তা ও অবশিষ্ট ২০ মেট্রিক টন সুতা উৎপাদন হচ্ছে। উৎপাদনের শুরুতে শ্রমিকসংখ্যা ছিল ২৫০ জন। বর্তমান শ্রমিকসংখ্যা ৯৫০ জন। এর মধ্যে ৪০০ জন মহিলা শ্রমিক। কর্মকর্তা, কর্মচারী ও নিরাপত্তারক্ষীর সংখ্যা ১০২ জন। মিলটি শতভাগ রফতানিমুখী। এই মিলের প্রতিদিন উৎপাদনের টার্গেট ৬০ মেট্রিক টন। সেই লক্ষ্যে মিলটিতে মেশিন বসানোর কাজ চলছে। মিলটিতে কোনো শ্রমিক সংগঠন নেই। এখানে ৪০ জন কর্মকর্তা থাকার জন্য দু'টি আবাসিক ভবনের ব্যবস্থা আছে। কর্মচারীদের মধ্যে ২০টি পরিবারের থাকার ব্যবস্থা আছে। এছাড়াও ৩০০ পুরুষ শ্রমিকদের জন্য ব্যাচেলর কোয়ার্টার আছে। ১০০ জন মহিলা শ্রমিকের থাকারও ব্যবস্থা রয়েছে মিলটিতে। মেডিকেল সেন্টার, ডে-কেয়ার সেন্টারেরও ব্যবস্থা রয়েছে।

শাহনেওয়াজ জুট মিলস্ লি. এই মিলটি খুলনা জেলার ভৈরব নদের পাড়ে দিঘলিয়া উপজেলাধীন নগরঘাট এলাকার পাশে ২০১১ সালের জুন মাসে স্থাপিত হয়। ১.৩৯ শতক জমির ওপর মিলটিতে বর্তমানে সুতা উৎপাদিত হয়। ২ শিফটে প্রতিদিন উৎপাদন ১২ মেট্রিক টন। এখানে শ্রমিকসংখ্যা ৫৫০ জন। যার মধ্যে ৩ ভাগই মহিলা শ্রমিক। কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ২২ জন।[১৬] কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসিকের ব্যবস্থা না থাকলেও শ্রমিকদের জন্য মেসের ব্যবস্থা আছে। এখানে কোনো শ্রমিক সংগঠন নেই। প্রতিষ্ঠানটি শতভাগ রফতানিমুখী।

পাটকল ও উৎপাদিত পণ্যের পরিসংখ্যান:

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন, খুলনা জোন

সারণি-৭৩
পাটকলে স্থাপিত তাঁত

মিলের নাম	উৎপাদন শুরুর সময়ে				২৬ মার্চ ১৯৭২				৩১ ডিসেম্বর ১৯৯১			
	হেসিয়ান	স্যাকিং	সিবিসি	মোট	হেসিয়ান	স্যাকিং	সিবিসি	মোট	হেসিয়ান	স্যাকিং	সিবিসি	মোট
আলীম	১৫০	১০০	-	২৫০	১২৫	১২৫	-	২৫০	১৬২	৮৮	-	২৫০
ক্রিসেন্ট	১৫০	১৫০	-	৩০০	৬৯৪	৩৩১	৮৫	১১১০	৬৯৪	৩৩৯	১০৩	১১৩৬

[১৫] ড. শেখ গাউস মিয়া, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা: ৭৫৭-৭৫৯।

[১৬] সহ ব্যবস্থাপক প্রশাসন, শাহনেওয়াজ জুট মিল অফিস থেকে প্রাপ্ত, তাং, ০৯-০৬-২০১৪।

মিলের নাম	উৎপাদন শুরুর সময়ে				২৬ মার্চ ১৯৭২				৩১ ডিসেম্বর ১৯৯১			
	হেসিয়ান	স্যাকিং	সিবিসি	মোট	হেসিয়ান	স্যাকিং	সিবিসি	মোট	হেসিয়ান	স্যাকিং	সিবিসি	মোট
দৌলতপুর	১৭০	৮০	-	২৫০	১৭০	৮০	-	২৫০	১৭০	৮০	-	২৫০
ইস্টার্ন	১৫০	১০০	-	২৫০	১৫৫	১০১	৩২	২৮৮	১৫৫	১০১	৩৫	২৯১
পিপলস্	৫২৬	২৭৪	-	৮০০	৬৪০	৩৫৪	৭৯	১০৭৩	৫১৬	৩২৪	৮৩	৯২৩
প্লাটিনাম	৪৯০	২৬০	-	৭৫০	৬০২	২৭৩	৩২	৯০৭	৬০২	২৭৩	৮২	৯৫৭
স্টার	১০০	৮০	-	১৮০	৫৬০	২০০	-	৭৬০	৫৬০	২০০	-	৭৬০
মোট	১৭৩৬	১০৪৪	-	২৭৮০	২৯৪৬	১৪৬৪	২২৮	৪৬৩৮	২৮৬৯	১৪০৫	৩০৩	৪৫৫৫

উৎস: বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন, খুলনা জোন।

সারণি-৭৪
পাটকল উৎপাদন
বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন, খুলনা জোন

তাঁত উৎপাদন প্রতিবেদন (মে. টন)

মিলের নাম	১৯৮৬-৮৭ মোট	১৯৮৭-৮৮ মোট	১৯৮৮-৮৯ মোট	১৯৮৯-৯০ মোট	১৯৯০-৯১ মোট	১৯৯১-৯২ (ডিসেম্বর ৯১)
আলীম	৪,৩৪৭	৪,৩৭৮	৪,৩৬৪	৫,৩৭১	৪,২৮৯	২,৩৮৫
ক্রিসেন্ট	২৫,৩৬৫	২৩,৯৩৯	২৬,৭২২	২৮,১৪১	১৯,৮০৩	১০,৫৮৬
দৌলতপুর	৫,৩৩৫	৫,২৪৪	৫,১৪৭	৫,৪৮৭	৪,৫১৩	২,৪৭৫
ইস্টার্ন	৬,৬৩৪	৫,৫৪৬	৫,৬৬৬	৬,৫০৪	৪,৮২৮	২,৬৪৩
পিপলস	১৮,১৮১	১৭,৬১৫	১৮,১৩১	১৯,২৮০	১৫,৮৩৪	৭,৬১৫
প্লাটিনাম	১৯,২৫৭	১৭,৯৯৬	১৯,৬১০	২১,০৩২	১৫,৩৩১	৯,০১৮
স্টার	১২,৮৩০	১৩,৩৯৪	১২,৭৩৫	১২,২৭৯	১০,১৪৭	৪,৫৪৪
মোট :	১,২৩,৬৪১	১১,৭২৭২	১,২০,৪৬৪	১,২৮,৫০০	১,০০,০৯৫	৫৩,০৯৫

উৎস: বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন, খুলনা জোন।

খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি.

জাতীয় অর্থনীতিতে কাগজ শিল্পের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৭ সালের আগে এদেশে কোনো কাগজকল ছিল না। তখন কাগজের জন্য বিদেশের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হতো। ১৯৫৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনায় কর্ণফুলী কাগজকল স্থাপিত হয়। এটাই বাংলাদেশের প্রথম কাগজকল। তখনও এদেশে নিউজপ্রিন্ট তৈরির কোনো ব্যবস্থা হয়নি। ১৯৫৪ সালে তদানীন্তন পিআইডিসি কানাডার স্যান্ডওয়েল কোম্পানিকে নিউজপ্রিন্ট তৈরির সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ, কাঁচামাল প্রাপ্তির জরিপ, মিল তৈরি ও প্রাথমিক পর্যায়ের পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করে। সম্ভাব্যতা যাচাই ইতিবাচক বলে প্রতীয়মান হওয়ায় চুক্তি মোতাবেক মেসার্স স্যান্ডওয়েল কোম্পানি ১৯৫৭ সালে ১১৫.৫৩ একর জমি নিয়ে খুলনার খালিশপুরে ভৈরব নদের তীরে এর নির্মাণকাজ শুরু করে। ১৯৫৯ সালে এর নির্মাণকাজ শেষ হয়। ওই বছরের মে থেকে মিলটি উৎপাদন শুরু করে। ১৯৬৫ সালে স্যান্ডওয়েল কোম্পানির সাথে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন সংস্থা মিলটির দায়িত্বভার গ্রহণ করে। শুরু থেকেই মিলটি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

মিলটির প্রধান উৎপাদিত দ্রব্য নিউজপ্রিন্ট। এছাড়াও মেকানিক্যাল প্রিন্ট, বুকপ্রিন্ট, র‌্যাপার, ম্যাচ পেপার প্রভৃতি কাগজ তৈরি হয়ে থাকে।

এ মিলের এক প্রধান কাঁচামাল গেওয়া কাঠ। এই কাঠ আসে সুন্দরবন থেকে। এ মিলে বছরে কাঠ ব্যবহারের পরিমাণ ৪৫,০০,০০০ সিএফটি।

বর্তমানে এ মিলের বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ৪৮ হাজার মেট্রিক টন। এর মধ্যে ১নং মেশিনে ২১ হাজার মেট্রিক টন, ২নং মেশিনে ১৬ হাজার মেট্রিক টন এবং ৩নং মেশিনে ১১ হাজার মেট্রিক টন কাগজ উৎপাদিত হয়।[১৭] বিসিআইসি-এর অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে এবং দেশীয় বাজারে এর চাহিদাপূরণের পর অতিরিক্ত কাগজ বিদেশে রফতানি করা হয়ে থাকে। সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৩০/১১/২০০২ তারিখ হতে মিলটি বন্ধ ঘোষণা করে সমদুয় জনবল পে-অফ করা হয়। পরবর্তী সময়ে ২০০৫ সালের ৩১ জানুয়ারি সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয় খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলকে প্রাইভেটাইজেশন বোর্ডের নিকট হস্তান্তর করে।[১৮]

খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস্ লি.

খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস লি. খুলনা জেলার খালিশপুর থানায় অবস্থিত। এ প্রতিষ্ঠানটি বিসিআইসি-এর আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান। খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলের মতো এ মিলটিও কানাডীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৬৫ সালে নিউজপ্রিন্ট মিলের পাশেই ভৈরব নদের তীরে ৯ একর ৩৬ শতক জমির ওপর স্থাপিত হয়। মিলটি উৎপাদনে যায় ১৯৬৬ সালে। স্থাপনকালীন এর বার্ষিক উৎপাদনক্ষমতা ছিল ৩০০ লাখ বর্গফুট। ৫০.৮০ সে.মি. থেকে ১০৭ সে.মি. পুরু এবং ৩০-৪৮ সে.মি. থেকে ২৭৪ সে.মি. লম্বা ও ১২২ সে.মি. থেকে ১৩৭ সে.মি. চওড়া উন্নতমানের হার্ডবোর্ড এখানে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।[১৯] এই মিলের কাঁচামাল আসে নিকটবর্তী সুন্দরবন থেকে। এ মিলের হার্ডবোর্ড 'সানবোর্ড' ট্রেড নামে দেশ-বিদেশে পরিচিত। হার্ডবোর্ডের একপাশ মসৃণ। এর সাইজ সাধারণত ৮ ফুট × ৪ ফুট। এক পিচ হার্ডবোর্ডের ওজন প্রায় ১০ কেজি। এর ব্যবহার বহুবিধ। খেলনা, হালকা আসবাবপত্র, ফটো বাঁধানোর ফ্রেম, বাক্স, প্যাকেট প্রভৃতি তৈরিতে এটি ব্যবহৃত হয়। এই মিলের উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রধানত ৫টি শাখায় বিভক্ত। এগুলো হলো চিপার, পালপিং, ফরমিং, হট প্রেস ও ফিনিশিং। মিলটির নিজস্ব কোনো পাওয়ার প্লান্ট নেই। বিদ্যুৎয়ের জন্য মিলটি পুরোপুরি পিডিবি এর ওপর নির্ভরশীল। লোকসানি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৫ ডিসেম্বর ২০০২ সাল হতে মিলটি বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ১৬/১২/২০১২ থেকে মিলটি পে-অফ ঘোষণা করা হয়েছে। তবে ১৪/০৯/২০০৫ থেকে সরকারি সিদ্ধান্তে চালু হওয়ার পর নো ওয়ার্ক নো পেমেন্ট ভিত্তিতে ছিল। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ

---

[১৭] ড. শেখ গাউস মিঞা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬০-৭৬১।

[১৮] ওই, পৃ. ৭৬২।

[১৯] আবদুশ শাকুর পূর্বোক্ত- পৃ. ২৬১।

উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। এতে ৭০০/৮০০ কর্মচরী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

খুলনা শিপইয়ার্ড লি.

নগরীর লবণচরাসংলগ্ন রূপসা ও কাজিবাছা নদীর পশ্চিম তীরে ৬৮.৯৭ একর জমির ওপর শিপইয়ার্ড প্রতিষ্ঠিত। নদীর দিকে শিপইয়ার্ডের দৈর্ঘ্য ৫৫৪ মি.।[২০] এ শিপইয়ার্ড নির্মাণে কারিগরি সাহায্য দান করে জার্মানির মেসার্স স্টুল কেন কোম্পানি। প্রথম পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানটির জন্য ব্যয় করা হয় ২ কোটি ৩৪ লাখ ৯৯ হাজার ৫ শ টাকা।

খুলনা শিপইয়ার্ডে বিভিন্ন ধরনের নৌযান তৈরি এবং মেরামতের জন্য বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। যেমন প্লিটার কাপ, আউটার ফিটিং মেনটেন্যান্স, কার্পেন্ট্রি পেন্টিং ডক ফাউন্ড্রি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশান, ডিজাইন অ্যান্ড প্ল্যানিং বিভাগ প্রভৃতি। এর মধ্যে ডিজাইন ও পরিকল্পনা শাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে নিজস্ব প্রকৌশলী ও নির্মাণকারীদের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের নৌযানের নকশা করা হয়। তারপর বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে এ পূর্ণাঙ্গ রূপদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কাঁচামাল লোহা। এর মধ্যে রয়েছে এম.এম প্লেট, এস এস প্লেট, রড অ্যাঞ্জোল প্রভৃতি। এছাড়াও লাগে লৌহজাত নানা ধরনের সাজ সরঞ্জাম। এর অধিকাংশই আসে চিটাগং স্টিল মিল থেকে। তবে বিদেশ থেকেও কিছু লোহা বা লৌহজাত সামগ্রী আমদানি করা হয়। খুলনা শিপইয়ার্ডে জাহাজ নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয় ১৯৫৭ সালের ২৭ নভেম্বর। ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠানটিতে নির্মিত প্রথম নৌযান ছিল একটি বার্জ। এর বহনক্ষমতা ছিল ৩৭৫ টন। শিপইয়ার্ড প্রতিষ্ঠার পর এ পর্যন্ত প্রায় ৫০০টি বিভিন্ন ধরনের নৌযান নির্মাণ করেছে। এরমধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের মটর লঞ্চ, পোর্ট ফেরি, পন্টুন টাগ, কার্গো, অয়েল ট্যাংকার, হাউজ বোর্ড, কার্গো লঞ্চ, ওয়াটার কাম সাপ্লাই, ভ্যাসল ও বিভিন্ন ধরনের বার্জ। তাছাড়া নৌপরিবহণ সংস্থার জন্য ১২৪টি ২৫০ টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ডাম বার্জ, ৬৫০ টন বহনক্ষমতাসম্পন্ন ১২টি সমুদ্রগামী বার্জ, ৩টি ৯০ ফুট দীর্ঘ ইনল্যান্ড টাগ, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের জন্য ১টি দ্রুতগামী পেট্রোল বোট, ১টি ৫০০ টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ওয়াটার বোট এবং ১টা সার্ভিস বোট নির্মাণ করেছে। কৃষি উন্নয়ন সংস্থার জন্য ৩টি ৪০০ টন পরিবহণ-ক্ষমতাসম্পন্ন সার পরিবহণের জাহাজ তৈরি করেছে। খুলনা শিপইয়ার্ডের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থাপনা হলো বৃহৎ আকারের ৩টি অয়েল ট্যাংকার তৈরি। প্রথমটি তৈরি হয় ১৯৭০ সালে। দ্বিতীয়টি ১৯৭৫ সালে। তৃতীয়টি ১৯৭৬ সালে।[২১] ১৯৯০ সালে এটিকে রুগণ শিল্প হিসেবে ঘোষণা করা হয়, এটি বন্ধের উপক্রম হয়। ওই সময় তৎকালীন সরকার এটিকে ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে কয়েক দফা চেষ্টা করেও প্রতিষ্ঠানটি বিক্রি করা যায়নি। এতে ব্যবস্থাপনায় স্থবিরতা দেখা দেয়। ১৯৯৯ সালের ৩ নভেম্বর তৎকালীন সরকার

---

[২০] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪২।

[২১] ড. শেখ গাউস মিঞা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬৪-৭৬৫।

এটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠান যুদ্ধজাহাজ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এছাড়াও খুলনা শিপইয়ার্ডে ইলিশ গবেষণা জাহাজ ‘রূপালী ইলিশ’ নির্মাণ করে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে আরেকটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।[২২] খুলনা শিপইয়ার্ডে জাহাজ তৈরির প্রি-অর্ডার আছে ২০২০ সাল পর্যন্ত। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা জাহাজনির্মাণের জন্য নতুন অর্ডার দিচ্ছে।

বাংলাদেশ কেবল শিল্প লি.

শিল্প শহর থেকে ৮ মাইল দূরে শিরোমণি নামক স্থানে ভৈরব নদের তীরে শিল্পটি অবস্থিত। ১৯৬৭ সালের ৮ মে ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন ও ১৯৭০ সালে উৎপাদনের মধ্য দিয়ে ৩৩ একর জমির ওপর নির্মিত এ প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়। টেলিফোনের সকল কেবল উৎপাদিত হয় এখানে। শুরুতে এর উৎপাদনক্ষমতা ছিল ২ লাখ ২৫ হাজার কন্ডাকটর কিলোমিটার। বর্তমানে এর উৎপাদনক্ষমতা ৩ লাখ কন্ডাকটর কিলোমিটার।

বর্তমানে এখানে টেলিফোনের যেসব তার উৎপাদিত হচ্ছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্রাইমারি কেবল, সাবমেরিন কেবল, ইনস্টলেশন কেবল, ড্রপ অয়ার প্রভৃতি। কেবল উৎপাদনের জন্য এখানে যে দুটি প্রধান কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় তা হলো কপার ও পলিথিলিন। এসব কাঁচামাল আনা হয় বিদেশ থেকে। কেবল সর্বনিম্ন ৪ মিলিমিটার এবং সর্বোচ্চ ৯ মিলিমিটার ব্যাসবিশিষ্ট হয়ে থাকে। কভারসহ তা হয় যথাক্রমে ৭৬/৯ মি. মি., ১.০৫ মি. মি. ১.১/১৩ মি.মি. ১.৪/১.৬৫ মি.মি. ১.৬৫/১.৮ মি.মি. ব্যাসবিশিষ্ট।[২৩]

অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল তৈরি হয় খুলনাস্থ বাংলাদেশ কেবল শিল্পে (বাকেশি)। এটি শুধু খুলনার নয়, সমগ্র বাংলাদেশের জন্য গর্বের বিষয়। সকল বাধা অতিক্রম করে উৎপাদনের দিকে এগিয়ে গেলে খুলনা শিপইয়ার্ডের মতো এ প্রতিষ্ঠানটিও ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করতে পারে।

দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরি লি.

ষাটের দশকের মধ্যবর্তী সময়ে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের ধনাঢ্য ব্যাবসায়ী দাদা আবুল কাসেম খুলনায় রূপসার লবণচরা এলাকায় দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরি নির্মাণ করেন। ১৯৫৫ সালে এর নির্মাণকাজ আরম্ভ হয় এবং কাজ শেষ হয় ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি সময়। উদ্যোক্তা দাদা আবুল কাসেমের নামানুসারে ফ্যাক্টরির নাম রাখা হয় ‘দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস’। ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস প্রথম উৎপাদন শুরু করে। বিশেষ অসুবিধার কারণে ১৯৫৭ সালে তিনি এটি বিক্রয় করে দেন। ওই সময় থেকে মিলটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হতে থাকে। অতঃপর ১৯৭৩ সাল থেকে বিসিআইসি কারখানাটির দায়িত্বভার গ্রহণ করে।

---

[২২] দৈনিক পূর্বাঞ্চল,তাং- ১৫ জুন শনিবার ২০১৩।

[২৩] ড. শেখ গাউস মিঞা, পূর্বোক্ত- পৃ: ৭৭০।

১৯৮৪ সালের ১ অক্টোবর কারখানাটির ৭০ ভাগ শেয়ার বাংলাদেশ সরকার সুইডিশ ম্যাচের নিকট বিক্রি করে দেয়। ফলে তখন থেকে মিলটি বিসিআইসি ও সুইডিশ ম্যাচের যৌথ মালিকানায় পরিচালিত হতে থাকে। তৈরি ম্যাচের জন্য বিভিন্ন ব্রান্ড বা মার্কার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল টেক্সি, বেদুইন, একঘোড়া, সাতঘোড়া, প্রজাপতি, সুপারগেম প্রভৃতি। ১ ফেব্রুয়ারি ২০১০ সাল থেকে ফ্যাক্টরিটি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর থেকে মিলটি চালুর দাবি ওঠে খুলনার শ্রমজীবী মানুষের পক্ষ থেকে।[২৪]

কোরেশি স্টিল মিল লি.

কোরেশি স্টিল একটা রিরোলিং স্টিল মিল। এটা স্থাপিত হয় ১৯৬৬ সালে। এজন্য খুলনা শহরে রূপসা নদীর তীরে লবণচরা এলাকায় জায়গা নেওয়া হয় ৬.৭৮ একর। ১৯৫৫ সালে এর নির্মাণকাজ শুরু হয়। তবে উৎপাদনে যাওয়ার আগেই উদ্যোক্তা জনাব কোরেশি বিশেষ অসুবিধার কারণে মিলটি ইব্রাহীম শেঠ নামক একজন শিল্পপতির নিকট বিক্রি করে দেন। তার নিবাস ছিল ভারতের গুজরাটে।

১৯৭১ সালের পর মিলটি শত্রু সম্পত্তি বলে গণ্য হয়। ওই সময় কিছুদিন বন্ধ থাকার পর ১৯৭২ সালের শেষের দিকে ম্যানেজমেন্ট বোর্ডের অধীনে পুনরায় চালু করা হয়। ১৯৭৩ সালে মিলটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্টিল করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হতে থাকে। পরে স্টিল করপোরেশন ও ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন একীভূত হয়ে গেলে মিলটি এই নবগঠিত স্টিল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশনের (BSES) অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন মিলটি একটা লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হয় বলে জানা যায়। মিলটিতে সাধারণত এমএস রড তৈরি হতো। এর কাঁচামাল আসত চট্টগ্রাম স্টিল মিল থেকে জাহাজে করে। এটির দৈনিক উৎপাদন ছিল প্রায় ৭০/৮০ টন। ১৯৮৪ সালে সরকারি উদ্যোগে এটি পুরনো মালিকের হাতে ফেরত দেওয়া হয়। ওই সময় তিনি পুনরায় মিলটি চালুর চেষ্টা করেন। তবে নানা কারণে তা খুব বেশি ফলপ্রসূ হয়নি। কিছুদিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলার পর ১৯৮৭ সালের জুনে তা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।[২৫] খুলনায় এ শ্রেণির আর একটা ছোটো মিল ছিল, নাম কেআইটিসি (খুলনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেডিং করপোরেশন)। এটি স্থাপন করা হয় ভৈরব নদের ওপারে সেনহাটীতে। এ মিলটিও বন্ধ রয়েছে। তা'ছাড়া খুলনার খালিশপুর ও চন্দনীমহলে ইস্টবেঙ্গল রিরোলিং মিলস লি. ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ট্রেডিং করপোরেশন নামে ছোটো আকারের দু'টি মিল ছিল। বর্তমানে তা বন্ধ রয়েছে।

খুলনা টেক্সটাইল মিলস্ লি.

খুলনা শহরে বয়রা নামক স্থানে ২৫.৯৯ একর জমির ওপর এই মিলটি স্থাপিত হয় ১৯৩১ সালে। এজন্য ব্যয় হয় ৫০ লাখ টাকা। পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩০ লাখ টাকা। স্থাপনাকালীন এর তাঁতসংখ্যা ছিল ৯৭টি, শ্রমিক ছিল ৯০০ জন। প্রথমে মিলটির নাম দেওয়া হয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কটন মিল।

[২৪] দৈনিক পূর্বাঞ্চল, তাং- ২ ফেব্রুয়ারি ২০১০।
[২৫] ড. শেখ গাউস মিঞা, পূর্বোক্ত, পৃ: ৭৭২-৭৭৩।

সংক্ষেপে বলা হতো এপিসি কটন মিল। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা ছিল বলেই এ নামকরণ করা হয়। ১৯৩১ সালের ১০ অক্টোবর মিলটি উদ্বোধন হলেও তা পুরোপুরি উৎপাদনে যায় ১৯৫৫ সালে। মার্কিন কাপড় উৎপাদনের মাধ্যমে অতি অল্পদিনের মধ্যেই বিখ্যাত হয়ে ওঠে মিলটি। অবিভক্ত ভারতে মার্কিন কাপড়ের এক বড়ো চাহিদা মেটানো হতো এখান থেকে। তিন ধরনের মার্কিন কাপড় তৈরি হতো এখানে। এগুলো হলো জয়, রুবী ও রূপসা। তা ছাড়া রকমারি নামে এক ধরনের ধুতি তৈরি হতো এখানে। আর বিখ্যাত ছিল রঙিন সুতি শাড়ি। ১৯৬৯-৭০ সালে মিলে কাঁচামাল ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ১৩,৬৬,০২৯ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা। ১৯৭২ সালে মিলটি জাতীয়করণ করে বাংলাদেশ বস্ত্রকল সংস্থার অধীনে আনা হয়।[২৬] প্রথমে মিলটি লাভজনক থাকলেও বিগত ১৯৮৬ সাল থেকে লোকসানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। এক পর্যায়ে ১৯৭৩ সালের ১৯ জুন প্রায় ১২শ কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিককে বেকার করে মিলটি বন্ধ করে দেয় বিগত সরকার।

ওষুধ শিল্প জেলায় যে কয়েকটি ওষুধ শিল্প রয়েছে তার মধ্যে ন্যাশনাল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লি., অ্যাশেফটিক ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস উল্লেখযোগ্য। ন্যাশনাল কেমিক্যাল ওষুধ কারখানাটি ১৯৫০ সালে স্থাপিত হয় এবং ইনজেকশন, তরল পাউডার, ট্যাবলেট ইত্যাদি বিভিন্ন জাতের ওষুধ এখানে প্রস্তুত হয়ে থাকে। অ্যাশেফটিক ওষুধের কারখানাটি ১৯৫৭ সালে স্থাপিত হয় এবং এখানে ডিস্টিল ওয়াটার তৈরি করা হয়। বর্তমানে এপিসি ফার্মাসিউটিক্যাল ওষুধ কারখানাটি চালু রয়েছে।

অন্যান্য মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প এ জেলায় ন্যাশনাল আয়রন ফাউন্ড্রি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াকর্স লি. এবং বাংলাদেশ আয়রন অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস নামে দু'টি উল্লেখযোগ্য লৌহ কারখানা এই জেলায় রয়েছে। এসব কারখানার উৎপাদনের মধ্যে রয়েছে জিআই পাইপ, সিআই পাইপ, জালের কাঠি, বাটখারা, মাপক যন্ত্র, নলকূপের পাইপ, অন্যান্য খুচরা যন্ত্রাংশ ইত্যাদি। এ ছাড়াও জেলা শিপইয়ার্ড বোর্ডের মোতিয়াখালি এলাকায় লোহা কারখানা নামে একটি কারখানা রয়েছে। এখানে তৈরি করা হয় মিউনিসিপ্যাল এলাকার আবর্জনা বহনকারী গাড়ি, মলমূত্র বহনকারী গাড়ি, পানি বহনকারী গাড়ি, তৈল ও পানির ট্যাংক ইত্যাদি।[২৭]

অনেক চালকলের মধ্যে রূপসা রাইস মিল ও খুলনা রাইস মিল উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও জেলার সর্বত্রই চালের কল ও ময়দার কল রয়েছে।[২৮]

---

[২৬] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৬২।

[২৭] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৬৩-২৬৪।

[২৮] ওই পৃ: ২৬৪।

সারণি-৭৫
খুলনা জেলার চাল কলসমূহে নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যা:

উপজেলা/সিটি করপোরেশন	সংখ্যা	শ্রমিক সংখ্যা		
		পুরুষ	মহিলা	মোট
বটিয়াঘাটা	১৮৬	২০০	৭৫০	৯৫০
দাকোপ	০০	০০	০০	০০
দিঘলিয়া	২৩	২৫	২৩	৪৮
ডুমুরিয়া	৬৫	১১০	২২০	৩৩০
খুলনা সিটি করপোরেশন	২০	৮৬	৮৯	১৭৫
কয়রা	১০	১০	২০	৩০
পাইকগাছা	০০	০০	০০	০০
ফুলতলা	৫৫	১৭০	৩০১	৪৭১
রূপসা	১৩	৮৯	১৯৫	২৮৪
তেরখাদা	০২	০২	০৫	০৭
মোট =	৩৭৪	৬৯২	১,৬০৩	২,২৯৫

উৎস: District Statistics, Khulna, 2011

জেলায় পাটের গাঁইট বাঁধানো কারখানার সংখ্যা বেশ কয়েকটি। কিছু নাম ও প্রতিষ্ঠাকাল উল্লেখ করা হলো।

১) হেলান জুট প্রেস লি. (১৯৫২)। ২) মেসার্স বাংলাদেশ জুট ব্যালার লি. (১৯৫৫)। ৩) মেসার্স খুলনা ইন্ডাস্ট্রিজ লি. (১৯৫৩)। ৪) ভাঙ্গুরা জুট বেইলিং কোম্পানি (১৯৫৩)। ৫) সুলতানুল কিশনলাল জুট প্রেস (১৯৫৬)। ৬) মেসার্স দৌলতপুর জুট প্রেস লি. (১৯৬১)। ৭) দৌলতপুর ট্রেডার্স অ্যান্ড কোম্পানি লি. (১৯৬৫)। স্বাধীনতার পরে জামাল জুট প্রেস, শাহনেওয়াজ জুট প্রেস, ফরিদপুর জুট প্রেসসহ আরও কিছু প্রেস গড়ে উঠেছে। বর্তমানে খুলনায় ১৯টি জুট প্রেস রয়েছে।

উপরোক্ত পাটের গাঁইট বাঁধানো কারখানাগুলোর মধ্যে একমাত্র ভাঙ্গুরা জুট মিল বেইলিং কোম্পানি ছাড়া বাকি সব কারখানা দৌলতপুর উপজেলায় অবস্থিত। এই সমস্ত কারখানা থেকে ষাটের দশকের শেষভাগে বাৎসরিক ৮০০০০ টাকার পাটের গাঁইট প্রস্তুত করা হতো এবং শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১০০০ জন।[২৯]

[২৯] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৬৪।

সারণি-৭৬

খুলনা জেলার চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার তথ্য

খুলনায় আধুনিক ফিশ প্রসেসিং সেন্টার রয়েছে।

চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার তালিকা দেওয়া হলো:

ক্র.নং	কলকারখানার নাম	অবস্থান
১	আনাম সি ফুড	সিংহের চর, রূপসা
২	সুন্দরবন সি ফুড	রামনগর, রূপসা
৩	লকপুর ফিস প্রসেসিং কো.লি.	বাগমারা, রূপসা
৪	লকপুর সি ফুডস্ ইন্ডা.লি	বাগমারা, রূপসা
৫	মডার্ন সি ফুডস্ লি.	বাগমারা, রূপসা
৬	জাহানাবাদ সি ফুডস্ লি.	চর রূপসা, রূপসা
৭	বায়োনিক ফিস প্রসেসিং লি.	চর রূপসা, রূপসা
৮	বায়োনিক সী ফুডস লি.	চর রূপসা, রূপসা
৯	ন্যাশনাল সি ফুড ইন্ডা. লি.	চর রূপসা, রূপসা
১০	খুলনা ফ্রোজেন ফুডস্ এক্স.লি.	চর রূপসা, রূপসা
১১	শাহ্ নেওয়াজ সি ফুডস্ লি.	চর রূপসা, রূপসা
১২	প্রিন্স সি ফুডস্ লি.	চর রূপসা, রূপসা
১৩	গাজীপুর সি ফুডস্ লি.	চর রূপসা, রূপসা
১৪	সালাম সি ফুডস্ লি.	বাগমারা, রূপসা
১৫	ইন্টারন্যাশনাল শ্রিম্প এক্স. লি.	বাগমারা, রূপসা
১৬	সিগমা সি ফুডস্ লি.	চর রূপসা, রূপসা
১৭	ইউনিক আইস অ্যান্ড সি ফুডস্ লি.	চর রূপসা, রূপসা
১৮	নিউ ফুডস্ লি.	চর রূপসা, রূপসা
১৯	জেমিনি সি ফুডস্ লি.	চর রূপসা, রূপসা
২০	রুপালী সি ফুডস্ লি.	পূর্ব রূপসা, রূপসা
২১	সাউদার্ন সি ফুডস্ লি.	ইলাইপুর, রূপসা
২২	ফ্রেশ ফুডস্ লি.	ইলাইপুর, রূপসা
২৩	সেন্টমার্টিন সি ফুডস্ লি.	ইলাইপুর, রূপসা
২৪	স্টার সি ফুড ইন্ডা. লি.	দেওয়াড়া, রূপসা
২৫	ইমন আইস অ্যান্ড কোল্ড স্টোরেজ লি.	রহিমনগর, রূপসা
২৬	সি ফ্রেশ লি.	ইলাইপুর, রূপসা
২৭	হার্বার সি ফুডস্ লি.	ইলাইপুর, রূপসা
২৮	অর্গানিক শ্রিম্প এক্স. লি.	চর রূপসা, রূপসা

উৎস: ফুড ফ্রোজেন অফিস, খুলনা থেকে সংগৃহীত।

খুলনা জেলার অধিবাসীদের জন্য কুটিরশিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশা। পুরুষ এবং মহিলা সকলেই অবসর সময়ে এই পেশায় নিয়োজিত থেকে পরিবারের জন্য জীবিকার সংস্থান করে থাকে। দেশজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এখন আট লাখ ৩০ হাজার। এসব শিল্পে বছরে ৩৯ হাজার ৫৩৮ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। মূল্য সংযোজিত হচ্ছে ৩১ হাজার ৪৮৬ কোটি টাকার। সমপরিমাণ অর্থই প্রতিবছর মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) যুক্ত হচ্ছে। **কুটিরশিল্প**

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) পরিচালিত কুটিরশিল্প জরিপ ২০১১ তে এসব তথ্য ও চিত্র ওঠে এসেছে। জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০ অনুযায়ী ১০ জনের কম শ্রমিক নিয়ে গঠিত শিল্পগুলো কুটিরশিল্পের আওতায় পড়ে জমি ও ভবন বাদ দিয়ে এসব শিল্পের পুঁজি সর্বোচ্চ পাঁচ লাখ টাকা।

বিবিএস'র জরিপ অনুযায়ী কুটিরশিল্পগুলোর মাত্র ৩৫ শতাংশ কোনো না কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে নিবন্ধিত হয়েছে। অবশিষ্ট ৬৫ শতাংশই নিবন্ধিত হয়নি। শিল্প গড়তে বিসিকের কাছে নিবন্ধিত হতে হয়। জরিপ বলতে নিবন্ধিত কুটিরশিল্পগুলোর মাত্র ৩ দশমিক ৭০ শতাংশ নিবন্ধিত হয়েছে বিসিকে। ৯১ দশমিক ৮ শতাংশ উদ্যোক্তাই নিবন্ধন করেছেন।[৩০] স্থানীয় সরকারের আওতায় খুলনা জেলার কুটিরশিল্পের খাতভিত্তিক সংখ্যা ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো:

সারণি-৭৭

কুটিরশিল্পের খাতভিত্তিক সংখ্যা

ক্রমিক নং	শিল্প খাত/উপ-খাত	সংখ্যা
১.	খাদ্যজাত/ঢেঁকি শিল্প	২৫৮টি
২.	খাদ্যজাত/চানাচুর তৈরি	৫০টি
৩.	খাদ্যজাত/পোল্ট্রি	১১০৪টি
৪.	খাদ্যজাত/ডেইরি বা গাভী পালন	৯৪৭টি
৫.	খাদ্যজাত/গোরু মোটাতাজাকরণ	৬৯৬টি
৬.	খাদ্যজাত/মৎস্য চাষ (চিংড়ি)	৬,০০০টি
৭.	খাদ্যজাত/বেকারি	৪৫টি
৮.	খাদ্যজাত/ছাগল পালন	৯৮০টি
৯.	খাদ্যজাত/ভেড়া পালন	৫৫১টি
১০.	খাদ্যজাত/মিষ্টি তৈরি	৫৬০টি
১১.	খাদ্যজাত/মৌমাছি পালন	১৫০টি
১২.	খাদ্যজাত/গুড় তৈরি	১০০টি
১৩.	খাদ্যজাত /জ্যাম, জেলি, স্কচ, ভিনেগার	২০টি
১৪.	খাদ্যজাত /শুঁটকি মাছ	৪০টি

[৩০] শিল্পায়নে খুলনা জেলা প্রবৃদ্ধি সম্ভাব্যতা পুস্তিকা। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক), শিল্প সহায়ক কেন্দ্র, খুলনা। পৃষ্ঠা। ২৭৫।

ক্রমিক নং	শিল্প খাত/উপ-খাত	সংখ্যা
১৫.	বস্ত্রজাত /মশলা প্রক্রিয়াজাতকরণ	৩০টি
১৬.	বস্ত্রজাত /পোশাক তৈরি ও এমব্রয়ডারি	১,০৫০টি
১৭.	বস্ত্রজাত /মশারি তৈরি	১,১০৯টি
১৮.	বস্ত্রজাত /উলেন সোয়েটার	৩০টি
১৯.	বস্ত্রজাত /ব্লক বাটিক	২২টি
২০.	বনজ/ বাঁশ-বেত	৫০টি
২১.	বনজ/ কাঠের ফার্নিচার	৬২৭টি
২২.	বনজ/ মাদুর তৈরি	৪৭৫টি
২৩.	বনজ/ ছাতার বাট	২১৮টি
২৪.	বনজ/ ডেকোরেশন পিস	১৪টি
২৫.	বিড়ি	২০টি
২৬.	জর্দা, গুল	৫০টি
২৭.	ঘানি	৫০টি
২৮.	চিড়া, মুড়ি	৬০টি
২৯.	পাঁপড়	১৫০টি
৩০.	চানাচুর	৫০টি
৩১.	কুমড়োবড়ি	৫০টি
৩২.	নকশিকাঁথা	৩০টি
৩৩.	কাঁতা	৫টি
৩৪.	জুট হ্যান্ডি ক্রাফটস	৫টি
৩৫.	মাছ ধরার জাল	৪০৫টি
৩৬.	ঝাড়ু	২০০টি
৩৭.	তাল পাতার পাখা	২২৫টি
৩৮.	কাঠের চুড়ি	৭টি
৩৯.	জুতা/স্যান্ডেল	২০০টি
৪০.	স্লেট পেন্সিল	১০টি
৪১.	ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কাস	৩৩টি
৪২.	হ্যান্ডলুম	৫০টি
৪৩.	ফিশ নেট মেকিং	২০০টি
৪৪.	রেডিয়ো টিভি মেরামত	১৯৫টি
৪৫.	স্টিল ট্রাঙ্ক	২৫টি
৪৬.	মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট (বাদ্যযন্ত্র)	৯৩টি
৪৭.	হেয়ার অয়েল	১৪টি
৪৮.	মোমবাতি	১৩টি
৪৯.	আগরবাতি	১৯টি
৫০.	চক	৫টি
৫১.	রিকশা ও বাই সাইকেল মেরামত	৩৪৫টি
৫২.	কেমিকেল	২০টি

ক্রমিক নং	শিল্প খাত/উপ-খাত	সংখ্যা
৫৩.	বাণিজ্যিক	১৫০টি
৫৪.	মৃৎ শিল্প	৭২০টি
৫৫.	বিবিধ-স্বর্ণকার	১৯২টি
৫৬.	কর্মকার	৪৮০টি
৫৭.	শাখা তৈরি	১০০টি

উৎস: শিল্পায়নে খুলনা জেলা, প্রবৃদ্ধি সম্ভাব্যতা পুস্তিকা। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প করপোরেশন (বিসিক), শিল্প সহায়ক কেন্দ্র, খুলনা।

মৃৎশিল্প

খুলনা জেলার মৃৎশিল্পীরা সুদূর অতীত থেকেই নদীসন্নিহিত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছে। এর কারণ দুটি: প্রথমত, মৃৎপাত্র তৈরির জন্য কাঁচামালের সহজলভ্যতা, দ্বিতীয়ত, তৈরি দ্রব্যাদি বাজারজাত করার জন্য নদীপথের পরিবহণ সুবিধা। খুলনা সিটি করপোরেশন এলাকা এবং খুলনা জেলার ৬টি উপজেলায় বিভিন্ন স্থানে মৃৎশিল্পীরা রয়েছেন। এসব এলাকা হলো-

ক) খুলনা সিটি করপোরেশন: গিলাতলা, মহেশ্বরপাশা, বড়ো বয়রা, ছোটো বয়রা, বয়রা পূজাখোলা, শিববাড়ি এবং খালিশপুর। এসব এলাকায় কুমার সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের সংখ্যা ৫১৬ জন।

খ) দিঘলিয়া: সেনহাটি, তালপুকুর, গোয়ালপাড়া, সিলমপুর, দেওয়াড়া।

গ) ফুলতলা: পয়োগ্রাম, ধোখালি, আটরা।

ঘ) রূপসা: আলাইপুর, পিঠাভোগ, ঘাটভোগ, জাবুসা, নরিকেলী, চানপুর, ডোমরা, আমদাবাদ।

ঙ) বটিয়াঘাটা: আমীরপুর, নিকলেপুর, শ্যামগঞ্জ।

চ) ডুমুরিয়া: ডুমুরিয়া সদর, চিংড়ি, ষোলগাতী, ছবাড়িয়া, মধুগ্রাম, চুকনগর, ধামালিয়া, সরাফপুর, মলমলিয়া, চেঁচুড়ে, মিকশিমিল, রানাই, টিপনে।

ছ) পাইকগাছা: বোয়ালিয়া, বাকা, নাছিমপুর।

তেরখাদা, কয়রা ও দাকোপ উপজেলায় মৃৎশিল্পীদের অবস্থান দেখা যায় না।

যেসব এলাকার উল্লেখ করা হয়েছে সেখানকার কুমারদের অনেকেই এখন পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন। বর্তমানে প্লাস্টিক, মেলামাইন, অ্যালুমিনিয়াম, চিনামাটি, স্টিল, পিতল, কাঁসা ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত গৃহস্থালি দ্রব্যাদির সহজলভ্যতার কারণে মাটির তৈরি তৈজসপত্রের ব্যবহার অনেক কমে গেছে। এ ছাড়া আর্থসামাজিক কারণে এবং শিষ্ট ও আর্থিক সঙ্গতির অভাবে খুলনা জেলার কুমাররা মৃৎশিল্পের আধুনিকায়নের সাথে যুক্ত হতে পারছেন না। ফলে এ জেলার মৃৎ শিল্পের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য লুপ্ত হতে বসেছে।

নকশিকাঁথা শিল্প

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং জাতীয় মহিলা সংস্থা বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নকশিকাঁথা শিল্পের পুনরুজ্জীবনের প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাও গৃহভিত্তিক হস্তশিল্পের মাধ্যমে নারীকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য যেসব কার্যক্রম পরিচালনা করছে নকশিকাঁথা শিল্পকে রক্ষা করা সেসব কার্যক্রমের

মধ্যে রয়েছে। কিন্তু বাঙালি সংস্কৃতির এই মাধ্যমটি প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। দক্ষ সুচিশিল্পীর অভাব, কাঁচামালের দুর্মূল্য, নকশিকাঁথা সেলাইয়ের জন্য অখণ্ড অবসরের অভাব, রুচির পরিবর্তন প্রভৃতি কারণে নকশিকাঁথা শিল্প দুর্লভ হয়ে উঠেছে। খুলনা জেলায় ফুলতলা উপজেলার জামিরা এবং ডুমুরিয়া উপজেলার টোলনা গ্রামে নকশিকাঁথা তৈরির ব্যবস্থা রয়েছে।

অন্যান্য লোকশিল্প খুলনা জেলার অন্যান্য লোকশিল্পের মধ্যে রয়েছে ফুলতলার তাঁত শিল্প; খুলনা শহর, দৌলতপুর, খালিশপুর, পয়োগ্রাম এবং সরদারডাঙ্গার বাঁশ শিল্প; রূপসা উপজেলার সেনের বাজার ও আলাইপুরের কামার শিল্প; পাইকগাছা উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের মাদুর শিল্প প্রভৃতি।

খুলনা শিল্প নগরী দৌলতপুর উপজেলাধীন শিরোমণি নামক স্থানে জেলার শিল্পনগরী অবস্থিত। ১৯৬৩ সালে ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা কর্তৃক এই শিল্প নগরীর অনুমোদন হয় এবং ২১.৩৩ লাখ টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্পের কাজ হাত দেওয়া হয়। প্রায় ৪২ একর জমি নিয়ে খুলনা শিল্প নগরী স্থাপিত হয়েছে। এই নগরীর মোট ২৩৪টি প্লট বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য উদ্যোক্তার মাঝে বরাদ্দ করা হয়েছে। শিল্প উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়ে শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করাই শিল্প নগরীর উদ্দেশ্য। পাকা রাস্তা, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা, ডাকঘর ও ব্যাংক, বিশেষ ক্ষেত্রে জরুরি কাজের জন্য প্রকৌশলী সাহায্যের ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়া আরও উদ্দেশ্য হচ্ছে:
১. স্থানীয় কাঁচামাল ও অন্যান্য সম্পদের ব্যাপক ব্যবহার। ২. লোকজনের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি। ৩. রফতানির পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ। ৪. কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকরণ। ৫. কৃষি দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ইত্যাদি।[৩১]

সারণি-৭৮

বিসিক শিল্প নগরী, শিরোমণি, খুলনার শিল্প তথ্য

ক্র. নং	শিল্প ইউনিটের সংখ্যা	শিল্পে উৎপাদন	চালু শিল্প ইউনিটের সংখ্যা	বন্ধ শিল্প ইউনিটের সংখ্যা	মামলা কারণে নির্মাণকাজ হয়নি	বিদেশি বিনিয়োগকারীর সংখ্যা	নতুন কারখানার তালিকা
০১।	৯৬টি	৩০৫.১৫ কোটি টাকা	৫৯টি	৩৬টি	১টি	নাই	নাই

[৩১] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৫।

বিসিক শিল্পনগরী, শিরোমণি, খুলনায় অবস্থিত শিল্প ইউনিটগুলোর বাস্তব অবস্থাসম্বলিত তালিকা:

ক) **উৎপাদনরত :**	খ) **উৎপাদনযোগ্য :**
১. মেসার্স জুট স্পিনার্স লিমিটেড	১. মেসার্স খুলনা পেপারবোর্ড অ্যান্ড প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ লি.।
২. মেসার্স মিতালী ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	২. মেসার্স গোল্ডেন ফ্রেশ ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ
৩. মেসার্স তারেক অ্যান্ড পরশ ফ্লাওয়ার মিল	গ) নির্মাণাধীন:
৪. মেসার্স মিতালী বেকারি এন্ড কনফেকশনারি	নেই
৫. মেসার্স আবদুর রাজ্জাক লিমিটেড	ঘ) বরাদ্দকৃত ও নির্মাণের অপেক্ষায়
৬. মেসার্স মদিনা ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ	মেসার্স রহিম ফ্লাওয়ার মিল
৭. মেসার্স এ আর এ ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ	ঙ) নিষ্ক্রীয়/ রুগণ শিল্প ইউনিট:
৮. মেসার্স এ বি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	মেসার্স নাহিদ উডেন ইন্ডাস্ট্রিজ
২. মেসার্স মাহামুদ ফুড প্রসেসিং এন্ড কোল্ডস্টোরেজ লি.	২৬. টেক্সপিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
৩. মেসার্স মীর পলিমার অ্যান্ড প্লাস্টিক লিমিটেড	২৭. সোহানা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
৪. মেসার্স আব্দুল্লাহ ব্যাটারি কো. (প্রা.) লিমিটেড	২৮. বারী ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
৫. আব্দুল্লাহ ব্যাটারি কো. (প্রা.) লি. (ইউনিট-২)	২৯. রীপা মোজাইক এন্ড চিপস ইন্ডাস্ট্রিজ
৬. আব্দুল্লাহ ব্যাটারি কো. (প্রা.) লি.(ইউনিট-৩)	৩০. মধুমতি কোক এন্ড ব্রিকেস্ট ইন্ডা. (প্রা.) লিমিটেড
৭. আব্দুল্লাহ ব্যাটারি কো. (প্রা.) লি. (ইউনিট-৪)	৩১. মডার্ন পিপিব্যান্ড ইন্ডা. (প্রা.) লিমিটেড
৮. আব্দুল্লাহ ব্যাটারি কো. (প্রা.) লি. (ইউনিট-৫)	৩২. সায়েরা এ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রা.) লিমিটেড
৯. আব্দুল্লাহ ব্যাটারি কো. (প্রা.) লি. (ইউনিট-৬)	৩৩. জামান এ্যাসোসিয়েটস ইন্ডা. (প্রা.) লিমিটেড
১০. হ্যামকো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	৩৪. এ আর ফ্লাওয়ার মিল
১১. এভারেস্ট মেটাল অ্যান্ড ব্যাটারি কো.	৩৫. হক স্টিল ফার্নিচার ইন্ডাস্ট্রিজ
১২. খোরশেদ মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ (ইউনিট-১)	৩৬. পাইওনিয়ার স্টিল ফার্নিচার ইন্ডাস্ট্রিজ
১৩. খোরশেদ মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ (ইউনিট-২)	৩৭। পেস্ট্রিজ করপোরেশন ইন্ডাস্ট্রিজ
১৪. আব্দুল্লাহ ব্যাটারি কো. (প্রা.) লি (ইউনিট-৭)	৩৮. টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড
১৫. ফরিদ ব্যাটারি কো.	৩৯. বেঙ্গল জুটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
১৬. ফরিদ ব্যাটারি কো. (ইউনিট-১)	৪০. রাজীব অয়েল মিল
১৭. ফরিদ ব্যাটারি কো. (ইউনিট-২)	৪১. এস এস পলিথিন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
১৮. জামান ফাউন্ড্রি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ ওয়ার্কস	৪২. এশিয়া ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ
১৯. জামান ফাউন্ড্রি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ ওয়ার্কস (ইউনিট-১)	৪৩. খুলনা হ্যান্ডিক্রাফটস অ্যান্ড গিফটস ইন্ডাস্ট্রিজ
২০. জামান ফাউন্ড্রি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ ওয়ার্কস (ইউনিট-২)	৪৪. অর্ক লেদার ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রা.)লিমিটেড
২১. জামান ফাউন্ড্রি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ ওয়ার্কস (ইউনিট-৩)	৪৫. মিতালী ব্রেড অ্যান্ড বিস্কুট ফ্যাক্টরি
২২. ইউনিভার্সাল স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ	৪৬. জে অ্যান্ড জে ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস
২৩. এস এম ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস	৪৭. ফয়সাল ইন্ডাস্ট্রিজ
২৪. এসএম ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস (ইউনিট-১)	৪৮. অ্যাকুয়া রিসোর্স লিমিটেড

ক) উৎপাদনরত :	খ) উৎপাদনযোগ্য :
২৫. সুমন স্পুল ইন্ডাস্ট্রিজ	৪৯. এশিয়ান স্পুল ইন্ডাস্ট্রিজ
৫০. খুলনা অ্যালাইড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	৭৩. এশিয়ান প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ
৫১. মাহাবুব ব্রাদার্স (প্রা.) লিমিটেড	৭৪. আফরোজা গ্রেইন মিল ইন্ডাস্ট্রিজ
৫২. সাউথ ওয়েস্ট প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং লিমিটেড	৭৫. মীর রাইস মিল
৫৩. মা মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ	৭৬. স্যাম অ্যাডহেসিভ লিমিটেড
৫৪. আল আমিনস এন্ড রবিন ফ্যাক্টরি	৭৭. বাইওনিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
৫৫. দৌলতপুর আইস এন্ড কোল্ড স্টোরেজ লিমিটেড	৭৮. অ্যালাম ইন্ডাস্ট্রিজ
৫৬. হুগলি বিস্কুট কো. (ইউনিট-১)	৭৯. তাহমিনা এন্টারপ্রাইজ
৫৭. ডায়মন্ড রাইস মিল	৮০. দি ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্স ইন্ডা.
৫৮. মোহাম্মদিয়া ময়দা ও সেমাই কল	চ) বরাদ্দের জন্য অপেক্ষমাণ ও প্লট সংখ্যা: নেই।
৫৯. রোমেন প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ	
৬০. কাশেম ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ	
৬১. বেঙ্গাল ওয়্যারনেইল ইন্ডাস্ট্রিজ	
৬২. মুনির ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস	
৬৩. কোয়ালিটি জুট প্রোডাক্টস	
৬৪. জিয়া ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ	
৬৫. স্যাম অ্যাডহেসিভ লিমিটেড	
৬৬. খুলনা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রা.) লিমিটেড	
৬৭. রুহুল আমিন স অ্যান্ড ববিন ফ্যাক্টরি	
৬৮. লুবনা স অ্যান্ড ববিন ফ্যাক্টরি	
৬৯. সাগর স অ্যান্ড ববিন ফ্যাক্টরি	
৭০. জুট ইয়ার্ন ডায়িং অ্যান্ড স্টারসিং প্রসেসর ইন্ডাস্ট্রিজ	
৭১. খায়রুননেছা কেমিক্যাল অ্যান্ড স্পুল ইন্ডাস্ট্রিজ	
৭২. আলাউদ্দিন ফাউন্ড্রী অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস	
সুরমা অয়েল মিল	
খুলনা কংক্রিট পাইপ ইন্ডাস্ট্রিজ	

উৎস: বিসিক, খুলনা

খুলনা জেলার ব্যাবসাবাণিজ্য খুলনা জেলা একটি প্রসিদ্ধ জনপদ। স্থল এবং জল উভয় পথে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকার কারণে খুলনা জেলা প্রাচীনকাল থেকেই ব্যাবসাবাণিজ্যে সমৃদ্ধ ছিল। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে খুলনা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

ব্যাবসায়ী সম্প্রদায় ব্রিটিশ আমলে উল্লেখযোগ্য ব্যাবসায়ী সম্প্রদায় ছিল কায়স্থ, তেলি বাবুই, সাহা, মালো, বণিক ও নমশূদ্র। তার আগে স্থানীয় ব্যাবসায়ীদের মধ্যে মাড়োয়ারিরাই ছিল প্রধান। পাকিস্তান আমলে ব্যাবসাবাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার ছিল পাঞ্জাবি ও ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের। বর্তমান সময়ে খুলনার স্থানীয় ব্যাবসায়ীরা একচেটিয়াভাবে বিভিন্ন ধরনের ব্যাবসাবাণিজ্য পরিচালনা করছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেখা যায় যে, মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত লোকজন ব্যাবসাবাণিজ্যে নিজেদের নিয়োজিত করছে। বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের ব্যাবসায় নিজেদের নিয়োজিত করে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। সরকারি, বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য এনজিও, সমিতি ও ব্যাংক থেকে ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে এসব মানুষ বিভিন্ন ধরনের মাঝারি ও ক্ষুদ্র ব্যাবসাবাণিজ্য পরিচালনা করছে। খুলনা জেলার ডুমুরিয়া, বটিয়াঘাটা, ফুলতলা, পাইকগাছা ও রূপসা প্রভৃতি উপজেলায় বিভিন্ন ধরনের ফসলাদি, শাকসবজি যেমন লাউ, কুমড়া, টমেটো, বাঁধাকপি, ফুলকপি উৎপাদন করে দেশের বিভিন্ন জেলায় বাণিজ্যিকভাবে সরবরাহ করা হয়। শহরাঞ্চলের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলেও নিয়মিত ব্যাবসায়ী ও দোকানদার রয়েছে। আবার অনেক ব্যাবসায়ী আছে যাদের ব্যাবসা গ্রামাঞ্চলভিত্তিক। এরা নৌ বা সড়কপথে গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে খুচরা মালামাল কিনে নিজেরা শহরে চালান দেয় অথবা বড়ো বড়ো মহাজনদের কাছে বিক্রি করে। এ ধরনের ব্যাবসায়ীর মধ্যে একদলকে বলা হয় ফড়িয়া বা দালাল। এরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাষিদের কাছ থেকে কম দামে পণ্য কিনে মজুত করে। তারপর বড়ো বড়ো ব্যাপারিদের কাছে বিক্রি করে। এভাবে কৃষকদের উৎপাদিত ধান পাট নিজেদের গোলা থেকে মহাজনদের হাতে চলে যায় এবং মহাজনেরা এগুলো দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্রি করে।

খুলনায় একটি ফেডারেশন চেম্বার রয়েছে। উক্ত চেম্বার একজন পরিচালক এবং পাঁচ সদস্য নিয়ে গঠিত। খুলনার ব্যাবসায়িক স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল সাংগঠনিক কাজ মনিটরিং ও বাস্তবায়ন এই ফেডারেশনের মাধ্যমে করা হয়।

জেলার প্রধান কয়েকটি বাণিজ্যকেন্দ্র হলো : ফুলতলা, দৌলতপুর, আলাইপুর, কপিলমুনি, পাইকগাছা, চুকনগর, চালনা, ডুমুরিয়া ও কুদির হাট।

বিভিন্ন ব্যাবসা

খুলনা জেলায় বর্তমানে নানান ধরনের ব্যাবসাবাণিজ্য পরিচালিত হয়। খুলনা মহানগরীতে পাইকারি ও খুচরা ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান ৩৬ হাজার ৮শ ৫৮টি। গ্রামে ১৫ হাজার ২৫টি। গ্রাম ও শহর মিলে খুলনা জেলায় মোট ব্যাবসার সঙ্গে জড়িতদের সংখ্যা ৯৮ হাজার ৯শ ৫৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৯৪ হাজার ৬শ ৬৭ জন এবং মহিলা ৪ হাজার ২৯০ জন।[৩২]

মহানগরীতে যে ধরনের ব্যাবসা পরিচালিত হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

বিদেশে চিংড়ি রফতানি, পাট, পাটজাত পণ্য, টেক্সটাইল, চামড়া, কৃষি, পর্যটন, মৎস্য, দেশের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন ধরনের মাছ সরবরাহ, বীজ আমদানি-আমদানি রফতানি, ব্যাটারির মালামাল বিক্রি ও সরবরাহ, ওষুধ বিক্রি, পোশাক তৈরি ও সরবরাহ, এয়ার কার্গো ও কুরিয়ার সার্ভিস, বিভিন্ন ফার্ম, বায়িং হাউজ, টেইলার্স, মুদি-মনোহরি, পান-সিগারেট, মোটরপার্টস, টায়ার, টিউব,

[৩২] B.B.S, District Statistics 2011, Khulna(page-5)

জেনারেটর, গাড়ির যন্ত্রাংশ, অটোমেশিনারি, স্যালোমেশিন, হার্ডওয়্যার, পেইন্টস, ব্যাটারি মেরামত, মাইকের ব্যাটারি তৈরি, আবাসিক হোটেল, হোটেল রেস্তরাঁ, লৌহজাত দ্রব্য বিক্রি, পেট্রোল পাম্প, মোবাইল ফোন, লুবরিকেন্ট, পোল্ট্রি ফিশফিড সরবরাহ, প্লাস্টিক সামগ্রী বিক্রি, স্যানিটারি সামগ্রী বিক্রি, আয়ুর্বেদীয় ওষুধ বিক্রি, রড সিমেন্ট, খাদ্য পরিবহণ ঠিকাদার, ফটোস্ট্যাট, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, জর্দা তৈরি ও বিক্রি, ইট বালুর ব্যাবসা, মোবাইল চার্জার , সিডি রেকর্ডিং, কম্পিউটার, গদি তৈরি, খুচরা ডিমব্যাবসা, গুল, কেবল নেটওয়ার্ক, মাংস, শিপিং ব্যাবসা, ব্যাংকিং ব্যাবসা, ভোজ্যতেল উৎপাদন ও বিক্রি, ডকইয়ার্ড, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ট্যুরিজম, কাঠের ফার্নিচার, স্টিলের ফার্নিচার, বেকারি, ভলকানাইজিং, জ্বালানি তেল বিক্রি, রিকশার হুড, সিমেন্ট, মোমাবাতি তৈরি, আগরবাতি, চাল, গম, আটা, ময়দা সরবরাহকারী, পুরনো কাপড় ব্যাবসা, বুটিক সামগ্রী তৈরি, সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট, শিশি বোতল বিক্রি, অ্যাকুয়ারিয়াম, বেবি মশারি, কাগজের প্যাকেট, সাইকেল রিকশার পার্টস, অ্যাডফার্ম, অ্যালুমিনিয়াম দ্রব্য সরবরাহ, খাদ্যশস্য সরবররাহ, ঠিকাদারি ইত্যাদি।[৩৩] জেলার গ্রামাঞ্চলেও প্রায় অভিন্ন ব্যাবসা পরিচালিত হয়।

চলচ্চিত্র শিল্পকে কেন্দ্র করে খুলনায় গড়ে ওঠে সিনেমা হলের ব্যাবসা। খুলনা জেলায় মোট পনেরোটি প্রেক্ষাগৃহ আছে। এর অধিকাংশের অবস্থান শহর ও শহরতলীতে। এক সময় প্রেক্ষাগৃহের ব্যাবসা জমজমাট ছিল। বর্তমানে সে অবস্থা নেই। খুলনা ১৫টি প্রেক্ষাগৃহের আসন সংখ্যা ৭ হাজার ২শ ২৯টি।[৩৪]

ব্যাবসায়ীদের পুঁজির জোগান

ব্যাবসাবাণিজ্য প্রসারে বাণিজ্যিক ব্যাংক, বীমা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান একটি বিশাল ভূমিকা পালন করে। ঋণ প্রদানের মাধ্যমে পুঁজির জোগান দিয়ে থাকে এসব প্রতিষ্ঠান। এখানে বাণিজ্য সম্পর্কীয় কাজের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ পাবার সুযোগ রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় উৎস থেকে ব্যাবসায়ীরা ঋণ পেয়ে থাকেন।

বাংলাদেশ শিল্প ঋণ ব্যাংক বড়ো বড়ো শিল্পের জন্য ঋণ দিয়ে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ব্যাবসায়ীদের জন্য স্বল্পকালীন ঋণের ব্যবস্থা করে থাকে।

প্রাতিষ্ঠানিক উৎস

প্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা, বাংলাদেশ সমবায় পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বিনিয়োগ সংস্থা, বাংলাদেশ গৃহনির্মাণ সংস্থা। খুলনায় এসব প্রতিষ্ঠানের শাখা রয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বিভিন্ন সমবায় সমিতি, এনজিও থেকেও ব্যাবসায়ীদের ঋণ দেওয়া হয়।

---

[৩৩] লাইসেন্স শাখা। খুলনা সিটি করপোরেশন।

[৩৪] Statistical Yearbook of Bangladesh 2011. Bangladesh Bureau of Statistics, page-468

খুলনা জেলায় ৪শ ৮৯টি ব্যাংক, বিমা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে শহরে ৩শ ৩৫টি এবং গ্রামে ১৫৪টি। এসব প্রতিষ্ঠানে ৬ হাজার ৭শ ৬৯ কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছেন।[৩৫]

জেলায় সোনালী, কৃষি, অগ্রণী ও জনতা ব্যাংকের পাশাপাশি রয়েছে বিভিন্ন বেসরকারি ব্যাংকের শাখা। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য: ইউসিবিএল ব্যাংক , আইএফ আইসিব্যাংক, সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক, এবি ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, বেসিক ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক, আল-আরাফাহ ব্যাংক, ইস্টার্ন ব্যাংক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক, ডাচ বাংলা ব্যাংক, ব্রাক ব্যাংক, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, সাউথ ইস্ট ব্যাংক, ব্যাংক এশিয়া, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি., ন্যাশনাল ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক। কোথাও কোথাও এসব ব্যাংকের একাধিক শাখা রয়েছে।[৩৬]

এ জেলায় বাণিজ্যিক ব্যাংকের মোট ৭৩টি শাখা রয়েছে। প্রাইভেট বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা ৩৮টি, স্পেশ্যালাইজড ব্যাংক যেমন-কৃষি, কো-অপারেটিভ-এর সংখ্যা ২৩টি, বিদেশি ব্যাংকের শাখা ০২টি, গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা ২০টি। অন্যদিকে মহানগরী এলাকার ৪৬টি সহ খুলনা জেলায় মোট ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সংখ্যা ৮৪টি। সমবায় সমিতি রয়েছে ১ হাজার ৮শ ১২টি, মানি এক্সচেঞ্জ ২১টি।

ব্যাবসাবাণিজ্য প্রসারে এনজিও বা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এসব বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বিভিন্ন ব্যাবসায় পুঁজি বিনিয়োগ করে থাকে। খুলনা জেলায় এনজিওর মোট ১৫০টি শাখা আছে। এর মধ্যে কয়রা উপজেলায় ১০টি, তেরখাদায় ৬টি, ডুমুরিয়ায় ২২টি, দাকোপ ১৯টি, দিঘলিয়ায় ৬টি, পাইকগাছায় ১৪টি, ফুলতলায় ২৪টি, বটিয়াঘাটায় ১২টি, রূপসায় ১৩টি এবং মেট্রো এলাকায় ২৪টি।[৩৭]

অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস

অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলোর মধ্যে রয়েছে গ্রামের মহাজন বা ধনী ব্যক্তি, দালাল বা ফড়িয়া, ব্যাপারি, বন্ধুবান্ধব, দোকানদার, আত্মীয়স্বজন, স্থানীয় সমিতি প্রভৃতি। দেখা যায় আড়তদার ও কারখানা মালিকদের ব্যাবসায় সিংহভাগ অর্থই ফড়িয়া ও ব্যাবসায়ীদের কাছ থেকে নেওয়া হয়। এ ছাড়া ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ীদের কাছ থেকেও ঋণ পাওয়া যায়। দোকানদার ও ফেরিওয়ালারা তাদের গহনা, জমিজমা ইত্যাদি বন্ধক রেখেও ঋণ গ্রহণ করে।

রিয়েল স্টেট ও টেন্টি ব্যাবসা

ইতোমধ্যে খুলনা শহর এবং শহরতলীতে গড়ে উঠেছে রিয়েল স্টেট ও টেন্টি ব্যাবসা। কেউ কেউ জমি কিনে বিক্রি করে। কেউ অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি করে বিক্রি করে। কেউবা জমি ভাড়া দেয়। এ ছাড়া গ্রাম শহর উভয় স্থানে জমি বিক্রি

---

[৩৫] Bangladesh Bureau of Statistics, district statistics 2011, Khulna (page-5).

[৩৬] শিল্পোন্নয়নে খুলনা জেলা, প্রবৃদ্ধি সম্ভাব্য পুস্তিকা, ২০০৭, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) শিল্প সহায়ক কেন্দ্র, খুলনা, পৃ. ২৫।

[৩৭] ওই. পৃ. ২৬।

ব্যাবসা লাভজনক ব্যাবসায় পরিণত হয়েছে। ব্যক্তিপর্যায়ে জমি কিনে মূল্য বৃদ্ধির অপেক্ষায় কয়েকমাস রেখে দেওয়া হয়। মূল্য বৃদ্ধি পেলে আবার বিক্রি করে দেওয়া হয়। জেলায় রিয়েল স্টেট ও টেন্টিংয়ের ৬শ ৯৮টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে শহরে ৫শ ৬২টি এবং গ্রামাঞ্চলে ১শ ৩৬টি। এ ব্যাবসার সঙ্গে ১ হাজার ৮৫০ জন জড়িত।[৩৮]

আমদানি-রফতানি পণ্য জেলা থেকে অতীতে বিভিন্ন পণ্য জেলার বাইরে এমনকি বিদেশে রফতানি করা হতো। বর্তমানেও বিভিন্ন পণ্য জেলা থেকে রফতানি করা হয়। খুলনা জেলার যেসব রফতানিযোগ্য পণ্য রয়েছে তার মধ্যে পাট, পাটজাত দ্রব্য, কাঁচা ও উপযুক্ত চামড়া, চিংড়ি ও হিমায়িত মাছ ইত্যাদি। এ জেলার প্রধান রফতানি পণ্য চিংড়ি। জেলায় উৎপাদিত চিংড়ি ও হিমায়িত মাছ রফতানির মাধ্যমে সরকার বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে। ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে ২৮,৪৩৮.৬৭ মেট্রিক টন চিংড়ি ও হিমায়িত মাছ রপ্তানি করা হয় যার মূল্য ১,১০৯.৪৬ কোটি টাকা। ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে ৩৩১৩২.৭৯ মেট্রিক টন, মূল্য ১,৫৫১.৯৫ কোটি টাকা, ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরে ১,৬১৭.২৪ মেট্রিক টন, মূল্য ১০৯৯.২৩ কোটি টাকা।[৩৯]

এছাড়া জেলা থেকে অন্যান্য যে-সব পণ্য রফতানি করা হয় তার মধ্যে-

কৃষিজাত রফতানিযোগ্য পণ্য : কাঁচা পাট, ধান, চাল, ছোলা, তেলবীজ, সুপারি, নারকেল, গুড়, আম, কাঁঠাল ইত্যাদি। শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে একসময় নিউজপ্রিন্ট রফতানি করা হতো। কিন্তু বর্তমানে নিউজপ্রিন্ট মিল বন্ধ হয়ে যাবার কারণে উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। জুট মিলে তৈরিকৃত হেসিয়ান কার্পেটের তলার কাপড়, পাটজাত সুতা ইত্যাদি রফতানি করা হয়।

মাছের মধ্যে চিংড়ি ছাড়াও গলদা, পাবদা, রূপচাঁদা, ইত্যাদি বিদেশে রফতানি হয়ে থাকে। এ ছাড়া বনজ সম্পদের মধ্যে সুন্দরবন থেকে প্রাপ্ত কাঠ, জ্বালানি কাঠ, মধু, মৌচাক, গোলপাতা ও ঝিনুক রফতানি করা হয়।

অন্যদিক যেসব পণ্য জেলায় উৎপাদন করা যায় না বা উৎপাদনব্যয় বেশি পড়ে সেসব পণ্য বাইরে থেকে আমদানি করা হয়। এসব আমদানি পণ্যের মধ্যে রয়েছে- কাঁচা তুলা, পাকানো সুতা, স্যুতি বস্ত্র, হার্ডওয়্যার দ্রব্য, কাচের দ্রব্যাদি, পরিশোধিত চিনি, কেরোসিন, কয়লা, জুতা, চুন, তামাক, ওষুধ, খুচরা যন্ত্রপাতি, কেমিক্যাল, ভোজ্যতেল ইত্যাদি।

সিনেমা হল খুলনা সদর এবং উপজেলাগুলোতে বেশ কিছু সিনেমা হল রয়েছে। এগুলোতে সমসাময়িক সিনেমা প্রদর্শন করা হয়। খুলনার বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষজন সিনেমা হলে গিয়ে আনন্দ বিনোদনের জন্য এসব ছবি উপভোগ করেন। নিম্নে খুলনার উল্লেখযোগ্য সিনেমা হলোগুলোর নাম উল্লেখ করা হলো:

---

[৩৮] Bangladesh Bureau Of Statistics, District Statistics 2011, Khulna, page-5.

[৩৯] শিল্পোন্নয়নে খুলনা জেলা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫।

ক্র.নং	সিনেমা হলের নাম	সিনেমা হলের অবস্থান
১	শঙ্খ সিনেমা হল	শঙ্খ মার্কেট, ৬৮ খান-এ-সবুর রোড, খুলনা।
২	পিকচার প্যালেস সিনেমা হল	স্যার ইকবাল রোড, খুলনা
৩	সোসাইটি সিনেমা হল	কেডি ঘোষ রোড, খুলনা।
৪	সংগীতা সিনেমা হল	আপার যশোর রোড, খুলনা।
৫	স্টার সিনেমা হল	১৬৪ শের-এ-বাংলা রোড, খুলনা।
৬	ঝিনুক সিনেমা হল	স্যার ইকবাল রোড, খুলনা
৭	বৈকালী সিনেমা হল	বিআইডিসি রোড, খালিশপুর, খুলনা।
৮	লিবার্টি সিনেমা হল	বিআইডিসি রোড, খালিশপুর, খুলনা।
৯	চিত্রালী সিনেমা হল	বিআইডিসি রোড, খালিশপুর, খুলনা।
১০	মিনাক্ষী সিনেমা হল	দৌলতপুর, খুলনা।
১১	জনতা সিনেমা হল	ফুলবাড়ীগেট, খুলনা।
১২	শঙ্খ সিনেমা হল	ডুমুরিয়া বাজার, ডুমুরিয়া, খুলনা।
১৩	রূপসাগর সিনেমা হল	রূপসা, খুলনা।

সূত্র: জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা এর জেএম শাখার হালনাগাদকৃত তথ্য।

হাটবাজার

খুলনা জেলায় ব্যাবসাবাণিজ্যের জন্য বিভিন্ন বাণিজ্য কেন্দ্র, পাইকারি ও খুচরা মালামাল কেনাবেচার জন্য অসংখ্য হাটবাজার গড়ে উঠেছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে ১৭৯০ সালে খুলনায় কয়েকটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে ওঠে। এর মধ্যে প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হলো ফুলতলা এবং দৌলতপুর। একসময় খুলনায় প্রচুর পরিমাণে ধান, চাল, নারকেল ও সুপারি উৎপন্ন হতো। স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে এসব পণ্য বিদেশে রফতানি হতো।[৪০]

শিল্প ও ব্যাবসাবাণিজ্য প্রসারে হাটবাজরের গুরুত্ব অপরিসীম। ৯টি উপজেলা এবং একটি সিটি করপোরেশন এর ৮টি থানা নিয়ে খুলনা জেলা গঠিত। জেলার মধ্যে যে-ব্যাবসাবাণিজ্য তা মূলত হাটবাজারের মাধ্যমেই চলে। হাট ও বাজারের মধ্যে বেশ পার্থক্য রয়েছে। হাট সপ্তাহের এক বা দু দিন বসে। তবে হাটের দিন নির্ধারিত থাকে। নির্ধারিত দিন ছাড়া এখানে কোনো মালামাল বেচাকেনা হয় না। হাটের প্রায় সব দোকানপাট থাকে অস্থায়ী। অন্যদিকে বাজার একটি নির্ধারিত জায়গায় প্রতিদিন বসে। দোকান পাট থাকে স্থায়ী। গ্রামাঞ্চলে বাজারের চেয়ে হাটের সংখ্যাই বেশি।

[৪০] শিল্পোন্নয়নে খুলনা জেলা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩।

অতীতে জমিদারগণ এসব হাটবাজার থেকে খাজনা বা কর আদায়ের নামে মোটা অংকের অর্থ আদায় করতেন। ১৯৫০ সালে তৎকালীন সরকার সমস্ত হাট বাজারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ইজারাদাররা এসব হাটবাজার থেকে উপকর আদায় করলেও হাটবাজারের উন্নয়নে কোনো পদক্ষেপ নিতো না, ফলে বাধ্য হয়েই সরকার ইজারাপ্রথার সংস্কার করে। ১৯৭২ সালের ২৮ জুন বাংলাদেশ সরকার এ ইজারাপ্রথা বাতিল করে। স্থানীয় লোকদের মধ্য থেকে ৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত বাজারকমিটিকে উন্নয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ফলে হাট-বাজারগুলোর উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

কৃষিবাজার পরিদপ্তরের ১৯৭৩ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, খুলনা জেলায় ৯১টি বাজার ছিল। অন্যদিকে ২০০৭ সালে খুলনা জেলায় হাটবাজারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২২৮টিতে। অর্থাৎ ৩৪ বছরে জেলায় হাটবাজারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ১৩৭টিতে।[৪১]

Bangladesh Bureau of Statistics, district statistics 2011, Khulna (page -23) সূত্রে জানা যায়, খুলনা জেলায় মোট ২৬১টি হাটবাজার রয়েছে। এর মধ্যে বটিয়াঘাটা উপজেলায় ৩৪টি, দাকোপ ১৩টি, দিঘলিয়ায় ১৭টি, ডুমুরিয়ায় ৫৪টি, খুলনা সিটি করপোরেশন এলাকায় ২৭টি, কয়রা ২৯টি, পাইকগাছায় ৩৮টি, ফুলতলায় ৪টি, রূপসায় ২১টি এবং তেরখাদায় ২৪টি। এখানে দেখা যায় মাত্র ৪ বছরের ব্যবধানে জেলায় (মহানগরীসহ) মোট ৩৩টি বাজার বেড়েছে।

জেলার প্রধান প্রধান হাটবাজার

খুলনা জেলার বিভিন্ন উপজেলায় এবং জেলা সদরে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য প্রধান হাটবাজারের তালিকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনার রাজস্ব শাখার হালনাগাদকৃত তালিকা অনুযায়ী দেওয়া হলো:

সারণি-৭৯

উপজেলাওয়ারি হাটবাজারের তালিকা

ক্রমিক নং	উপজেলা/পৌরসভার নাম	হাটবাজারের নাম
১.	ফুলতলা উপজেলা- মোট ০৬টি	ফুলতলা হাট
		জামিরা হাট
		পথের হাট
		ইস্টার্নগেট বাজার
		ছাতিয়ানি বাজার
		গিলাতলা বাজার
২.	দাকোপ উপজেলা- মোট ১৬টি	চালনা হাট
		পানখালী হাট

[৪১] শিল্পোন্নয়নে খুলনা জেলা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩।

ক্রমিক নং	উপজেলা/পৌরসভার নাম	হাটবাজারের নাম
		খুটাখালী হাট
		রামনগর হাট
		নলিয়ান হাট
		কালিনগর হাট
		বটবুনিয়া হাট
		বানিশান্তা হাট
		জয়নগর হাট
		মোজামনগর হাট
		লক্ষ্মীখোলা হাট
		কালাবগী হাট
		কালাবগী গেটের হাট
		পোদ্দারগঞ্জ হাট
		বাজুয়া-চুনকুড়ি বাঁধের হাট
		সুতারখালী-কেওড়াতলা হাট
৩.	দিঘলিয়া উপজেলা- মোট ১৪টি	চ্যাটার্জীর বাজার
		আড়ংঘাটা বাজার
		ভট্টাচার্য্য বাজার
		পথের বাজার
		সেনহাটি বাজার
		কামারগাতি বাজার
		ডোমরা হাট
		১নং স্টারগেট বাজার
		সন্ন্যাসীর বাজার
		কোলা হাট
		গাজীর হাট
		সুরমা বাজার
		বানিয়াঘাট বাজার
৪.	পাইকগাছা উপজেলা- মোট ১৮টি	পাইকগাছা বাজার
		কপিলমুনি হাট
		আগড়ঘাটা হাট
		গদাইপুর হাট
		মলঙ্গী হাট
		বাঁকা হাট
		কাটিপাড়া হাট
		ষষ্ঠীতলা হাট
		ফুলবাড়ী হাট
		আমতলা হাট

ক্রমিক নং	উপজেলা/পৌরসভার নাম	হাটবাজারের নাম
		মিনাজ হাট
		চৌমহনী হাট
		বাইনতলা হাট
		সোলাদানা হাট
		কাটাখালী হাট
		চাঁদখালী হাট
		গড়াইখালী হাট
		শামুকপোতা হাট
৫.	বটিয়াঘাটা উপজেলা- মোট ১৭টি	কৈয়া বাজার
		হাটবাটি হাট
		কাতিয়ানাংলা হাট
		বয়ারভাংগা হাট
		গঙ্গারামপুর হাট
		আমতলা হাট
		সুরখালী হাট
		বারোয়াড়িয়া হাট
		সুখদাড়া হাট
		গাওঘরা হাট
		কুঠির হাট
		সায়দাল হাট
		ধাদুয়া হাট
		টালিয়ামারা হাট
		বিরাট-ঝালবাড়ি হাট
		জয়পুর হাট
		বাইনতলা হাট
৬.	তেরখাদা উপজেলা- মোট ০৯টি	তেরখাদা হাট
		জয়সেনা হাট
		ইখড়ী গোহাট
		বলর্দ্ধনা হাট
		আটলিয়া হাট
		পাতলা হাট
		সাচিয়াদহ হাট
		কাটেংগা হাট
		শেখপুরা হাট
৭.	রূপসা উপজেলা- মোট ১৪টি	সেনের বাজার
		নবাব বাজার
		আমতলা হাট

ক্রমিক নং	উপজেলা/পৌরসভার নাম	হাটবাজারের নাম
		রূপসা গো-হাট
		সামন্তসেনা নতুন হাট
		রূপসা কাঁচা বাজার
		নৈহাটি কালীবাড়ি বাজার
		জাবুসা হাট
		আলাইপুর বাজার
		শিয়ালী হাট
		বামনডাঙ্গা হাট
		পালের হাট
		পোলের হাট
		ডোবা হাট
৮.	ডুমুরিয়া উপজেলা- মোট ৩৫টি	ধামালিয়া হাট
		চেঁচুড়ী হাট
		কাটেংগা হাট
		বরুণা হাট
		শাহপুর হাট
		থুকড়া হাট
		রঘুনাথপুর হাট
		রুদাঘরা হাট
		মিকশিমিল হাট
		হাসানপুর হাট
		শোলগাতী হাট
		খর্নিয়া হাট
		টিপনা হাট
		চুকনগর হাট
		কাঁঠালতলা হাট
		বয়ারসিং হাট
		আঠারো মাইল হাট
		মাদারতলা হাট
		শোভনা প. হাট
		জিয়ালতরা হাট
		গাবতলা হাট
		বানিয়াখালী হাট
		শরাফপুর হাট
		বসুন্দিয়া হাট
		নোয়াকাটি হাট
		নোয়াকাটি মাঠের হাট

ক্রমিক নং	উপজেলা/পৌরসভার নাম	হাটবাজারের নাম
		কাঞ্চননগর হাট
		বান্দা হাট
		মৈখালী হাট
		ডুমুরিয়া হাট
		রংপুর কাটাখাল হাট
		শলুয়া হাট
		গুটুদিয়া হাট
		শিবনগর হাট
		কাঁঠালিয়া হাট
৯.	কয়রা উপজেলা- মোট ২১টি	আমাদি হাট
		আমাদি বাজার
		ভান্ডারপোল হাট
		হাতিয়ারডাংগা হাট
		ঘুগরাকাটি হাট
		হোগলার হাট
		খোড়লকাটি হাট
		গিলাবাড়ী হাট
		ডাক্তারবাদ হাট
		চৌকুনি হাট
		বানিয়াখালী হাট
		শুতির হাট
		হায়াতখালী হাট
		অন্তাবুনিয়া হাট
		ঝিলেঘাটা হাট
		দেউলিয়া হাট
		বেদকাশী হাট
		বড়োবাড়ী হাট
		দিঘিরপাড় হাট
		জোড়শিং হাট
		ঘড়িলাল হাট
১০.	খুলনা সদর ১১টি (কেসিসি নিয়ন্ত্রিত)	খুলনা বড়ো বাজার
		নতুন বাজার হাট
		রূপসা সান্ধ্য বাজার
		রূপসা কাঁচা বাজার ও রূপসা মৎস্য বাজার
		চানমারী বাজার
		জোড়াকল বাজার

ক্রমিক নং	উপজেলা/পৌরসভার নাম	হাটবাজারের নাম
		মিস্ত্রীপাড়া বাজার
		ময়লাপোতা সান্ধ্য বাজার
		জোড়াগেট গো-হাট ও কাঁচা বাজার
		শেখপাড়া বাজার
		নিউমার্কেট বাজার
	খুলনা সদরের অন্যান্য বাজার	সোনাডাঙ্গা কাঁচা বাজার
		চিত্রালী বাজার
		বানরগাতী বাজার
		বয়রা বাজার
		রায়েরমহল বাজার
		বউ বাজার
		গল্লামারী বাজার
		লবণচরা বাজার
		টুটপাড়া খালপাড় বাজার
		হাউজিং বাজার
		বৈকালি বাজার
		খালিশপুর নিউমার্কেট বাজার
		দৌলতপুর বাজার
		মহেশ্বরপাশা কালিবাড়ি বাজার
		তেলীগাতি কাঁচাবাজার
		শিরোমণি বাজার
		বাদামতলা বাজার
		দোলখোলা বাজার
		নিরালা পাইকারি কাঁচাবাজার
		ফুলবাড়িগেট বাজার
		পাবলা কাঁচা বাজার

হাটবাজারে যেসব পণ্য বেচাকেনা হয়

জেলার হাটবাজারে যেসব পণ্য কেনাবেচা হয় তা হলো: চাউল, মাছ, তরিতরকারি, পেঁয়াজ, রসুন, গুড়, ওষুধ, ধান, মাছ, আলু, গম, আটা, পান, তামাক, গুল, গোরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, মহিষ, ভেড়া, লবণ, ডাল, সরিষা, তিল, হলুদ, বাঁশ, খুঁটি, গোলপাতা, কাপড়, থালা, বাসন, জুতা, তিল, হলুদ, পান, সুপারি, নারকেল, মাদুর, দুধ, কবুতর, চিনাবাদাম, রবিশস্য, ডাবসহ নিত্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্য।

কয়েক বছর ধরে সমবায় অধিদপ্তর খুলনা জেলার বেশ কিছু সমবায় বাজার বসিয়ে ব্যাবসা করছে। এ ভাবে টিসিবির মাধ্যমে সরকার বিভিন্ন সময়

স্বল্পমূল্যে পণ্য বিক্রি করে থাকে। সমবায় অফিসের ২০1৪ সালের পরিসংখ্যান মতে, খুলনা জেলায় মোট ১৬টি সমবায় বাজার রয়েছে। এর মধ্যে খুলনা মহানগরীতে ৪টি এবং দাকোপ উপজেলায় ২টি, পাইকগাছায় ২টি, ডুমুরিয়ায় ১টি, দিঘলিয়ায় ২টি, রূপসায় ১টি, ফুলতলায় ১টি, বটিয়াঘাটায় ১টি, তেরখাদায় ১টি এবং কয়রায় ১টি। (সূত্র: জেলা সমবায় অফিস, খুলনা)

মেলা সুদূর অতীতকাল থেকে খুলনা জেলায় পালাপার্বণ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, তীর্থস্থানকে কেন্দ্র করে মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বর্তমানেও সে অবস্থা থেকে খুলনা জেলার মানুষ পিছিয়ে যায়নি। বিভিন্ন পূজাপার্বণ, মুসলিম সম্প্রদায়ের ঈদ উৎসব, নতুন বছরের প্রথম দিন বা পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে শহরে মেলা বসে থাকে। গ্রামাঞ্চলে সাধারণত পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে মেলা বসে। এ ছাড়া গ্রাম এবং শহর উভয় স্থানে তীর্থ বা ধর্মীয়স্থানে প্রতিবছর নির্ধারিত দিনে মেলা বসে। কোনো কোনো মেলা বছরে একদিন, কোনো মেলা একাধিক দিনও বসে। মেলায় একদিকে যেমন কৃষকরা তাদের কৃষিজাত পণ্য বিক্রির জন্য নিয়ে আসে, অন্যদিকে তেমনি কারিগরদের গৃহজাত পণ্যের প্রচুর সমাগম মেলায় দেখতে পাওয়া যায়। মেলায় বিভিন্ন পণ্য বিক্রির পাশাপাশি বিনোদনের ব্যবস্থা থাকে। গ্রাম্য মেলায় থাকে ঘোড়দৌড়, লাঠিখেলা ইত্যাদি। শহরের মেলায় থাকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বর্তমানে মেলা তার বৈশিষ্ট্য পাল্টাচ্ছে। ব্যাবসাবাণিজ্যের প্রয়োজনেই সৃষ্টি করা হচ্ছে মেলার। বিশেষ করে সরকারি উদ্যোগে জেলা এমনকি থানা পর্যন্ত মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। যেমন- কৃষিমেলা, বাণিজ্যমেলা, বৃক্ষমেলা, আইটিমেলা, গাড়িমেলা ইত্যাদি। এছাড়া ধর্মীয় অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক মেলা দেখা যায়, যা এখনও বিলুপ্ত হয়নি।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প করপোরেশন (বিসিক)-এর শিল্পায়নে খুলনা, প্রবৃদ্ধি সম্ভাব্য পুস্তিকা (২০০৭) থেকে জানা যায়, খুলনা জেলায় ১৯টি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে খুলনা জেলা স্কুল মাঠের বসন্তমেলা, খুলনা জাতিসংঘ পার্কসহ বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত বৈশাখিমেলা, ফুলতলা দক্ষিণডিহি রবীন্দ্র কমপ্লেক্সের লোকমেলা, শহিদ হাদিস পার্কের বিজয়মেলা ও স্বাধীনতা দিবসের মেলা, শহিদ হাদিস পার্ক ও বয়রাস্থ বিভাগীয় গণগ্রন্থাগার প্রাঙ্গণের বই ও হস্ত শিল্পমেলা, জেলা ক্রীড়া উন্নয়ন মাঠে তাঁত বা বস্ত্রমেলা, খুলনা কয়লাঘাট ও শিববাড়ি মোড়ের দুর্গাপূজা মেলা, দিঘলিয়া উপজেলার পানিগাতিতে সীমান্দারমেলা, পাইকগাছায় কপিলমুনির বারুণীর মেলা, পাইকগাছার দুবলার চটিমেলা, ডুমুরিয়ার ছাতিয়ানি বাজারের মাঘীপূর্ণিমা দিঘিরমেলা, রূপসার কুদির বটতলার কুদিরমেলা, গিলাতলা ও ঘাটভোগের খেজুর ভাঙারমেলা, খুলনা ধর্মসভার কালীপূজার মেলা, তেরখাদার ছাগলদাহ বাগড়দহ বুড়োমারমেলা, শহিদ হাদিস পার্কের বৃক্ষমেলা।

জেলায় মোট ১৭৮টি খাদ্যগুদাম রয়েছে। এগুলোর ধারণক্ষমতা ১,৬০,৬৭৭ **গুদামঘর** মেট্রিক টন। এর মধ্যে শহর এলাকায় ১৬৭টি এবং অন্যত্র ১১টি। সার গুদাম রয়েছে ৩টি, ধারণক্ষমতা ১৫,০০০ মেট্রিক টন। পাটগুদামের সংখ্যা ১৬৭টি। এর মধ্যে ১৫৮টি-ই শহরে। ৯টি অন্যত্র। এগুলোর ধারণক্ষমতা ৩৪,২৫৩ মেট্রিকটন। অন্যান্য গুদামের সংখ্যা ৭টি। ধারণক্ষমতা ১১,০০০ মেট্রিক টন।

সারণি-৮০

খাদ্য গুদামসমূহের তালিকা

ক্র: নং	এলএসডি/সিএসডির নাম	গুদাম সংখ্যা	ধারণক্ষমতা (মে. টন)	গুদামের ধরন
১	চালনা এলএসডি	০২টি	১০০০	এফ এস-২
২	ডুমুরিয়া এলএসডি	০৪টি	২০০০	এফ এস-২
৩	পাইকগাছা এলএসডি	০২টি	১০০০	এফ এস-২
৪	তেরখাদা এলএসডি	০২টি	১৫০০	এফ এস-২
৫	বটিয়াঘাটা এলএসডি	০১টি	৫০০	এফ এস-২
৬	ফুলতলা এলএসডি	০১টি	১০০০	এফ এস-২
৭	ঘুগরাকাটি এলএসডি	০২টি	৭৫০	এফ এস-২
৮	আলাইপুর এলএসডি	০১টি	২৫০	এফ এস-২
মোট এলএসডি =		১৫টি	৮,০০০	
৯	খুলনা সিএসডি	৬৩টি	৬৮,০০০	(জে কে = ৫৮টি এবং ইইসি= ৫টি)
১০	মহেশ্বরপাশা সিএসডি	৫৯টি	৫৮,০০০	(পি টাইপ= ৩৮টি, জে টাইপ= ১১টি)
মোট সিএসডি=		১২২টি	১,২৬, ০০০	সি টাইপ=৬টি এবং ডি টাইপ= ৪টি

এলএসডি ও সিএসডির মজুত খাদ্যশস্য সরকার নির্দেশিত টি-আর, জি-আর, ভিজিডি, কাবিখা, ভিজিএফ, ও এমএস ইপিসহ অন্যান্য জরুরিখাতে বিলি বিতরণ হয়ে থাকে।

খুলনা জেলায় অনুকূল পরিবেশ, সরকারি-বেসরকারিভাবে ঋণপ্রাপ্তিতে সহজলভ্যতার কারণে ব্যাবসাবাণিজ্যের দুত প্রসার ঘটছে।

অধ্যায়-১০

স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ও জনস্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য

নদীবহুল ভূপ্রকৃতি ও বনজঙ্গালে পরিপূর্ণ আর্দ্র পরিবেশ এবং সুপেয় পানীয় জলের অপ্রতুলতার কারণে অতীতে খুলনা স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল না। ম্যালেরিয়াসহ বিভিন্ন জ্বর ও নানাবিধ রোগব্যাধির প্রকোপ ছিল ব্যাপক। নদীবহুল এই জেলায় শহর থেকে দূরাঞ্চলে মহামারীর সময় জরুরিভিত্তিতে চিকিৎসা প্রদানের জন্য জেলা বোর্ড ভাসমান চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু এ ব্যবস্থার কার্যকারিতা আশানুরূপ না হওয়ায় বাতিল হয়ে যায়।

খুলনা জেলাসদরে ১৮৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ডিসপেনসারিটি তদানীন্তন বাংলার ছোটো লাট স্যার জন উডবার্ণের নামানুসারে ১৮৯৮ সালে উডবার্ণ হসপিটাল নামে নামকরণ করা হয়।[১] এখানে পুরুষদের জন্য ১৭টি এবং মহিলাদের জন্য ৭টি শয্যা ছিল। পৌরসভা ও অন্যান্য সংস্থার আর্থিক সাহায্যে এই হাসপাতালের ব্যয় নির্বাহ করা হতো। হাসপাতাল সরকারি বেতনভোগী সহকারী তত্ত্বাবধায়ক দ্বারা পরিচালিত হতো। জেলার অবশিষ্ট ডিসপেনসারিগুলো এলএমএফ. ডিপ্লোমাধারী স্থানীয় ডাক্তাদের তত্ত্বাবধানে জেলা বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হতো।

১৯০৭ সালে আবাসিক রোগীদের চিকিৎসার জন্য খুলনা সদরে একটি সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। তবে ১৯৩০ সালের আগে খুলনা জেলার চিকিৎসা ব্যবস্থা অনুন্নতই ছিল। অধিকাংশ হাসপাতাল ও ডিসপেনসারি ৩য় শ্রেণির চিকিৎসালয় ছিল। আস্তে আস্তে খুলনার চিকিৎসা ব্যবস্থায় উন্নয়ন ঘটতে থাকে। বিশেষ করে ১৯৬০ সাল ও এর পরবর্তী বছরগুলোতে অবস্থার অনেক উন্নতি ঘটে। ১৯৩০ সালে বৃহত্তর খুলনা জেলায় যেখানে সমস্ত হাসপাতালগুলোর শয্যাসংখ্যা ছিল ৭৬টি সেখানে ১৯৬০ সালের দিকে একমাত্র খুলনা হাসপাতালেই শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৫০। এভাবে হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা, চিকিৎসা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধে বৃদ্ধির ফলে ক্রমবর্ধমান হারে জনগণ চিকিৎসা সুবিধে লাভে সমর্থ হয়।[২] ১৯৬২ সালে খুলনার বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শয্যাসংখ্যা ছিল উল্লেখ করা হলো:

খুলনা সদর হাসপাতাল-১০০, খুলনা ২৫০ শয্যা হাসপাতাল- ২৫০, খুলনা ১০ শয্যা হাসপাতাল-১০, কয়রা থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্র-৩১, দাকোপ থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্র-৩১, বটিয়াঘাটা থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্র-৩১, মোট শয্যা সংখ্যা-৪৫৩ (জেলার সকল হাসপাতাল)।

২০১৪ সালের তথ্যানুযায়ী খুলনা জেলায় মোট হাসপাতালের সংখ্যা ছিল ১০। এগুলো হলো-জেনারেল হাসপাতাল, বক্ষব্যাধি হাসপাতাল, সংক্রামক ব্যাধি

---

[১] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩১২।

[২] ওই. পৃ: ৩১৫।

হাসপাতাল, পুলিশ হাসপাতাল, কেন্দ্রীয় জেল হাসপাতাল, কপিলমণি জেসি হাসপাতাল, রেলওয়ে হাসপাতাল, খুলনা শিশু হাসপাতাল, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও শহিদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল। হাসপাতালগুলোর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো:

খুলনা জেনারেল হাসপাতাল

খুলনা শহরের উত্তর পার্শ্বে ভৈরব নদের তীরে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ১৯৩৫ সালে ৩.১১৪ একর দানকৃত জমির ওপর স্থাপিত খুলনা জেনারেল হাসপাতালের যাত্রা শুরু হয়।[৩] ১৯৪৪ সালে হাসপাতালটি সরকারি কর্তৃত্বে আনয়ন করা হয়।[৪] পঞ্চাশের দশকের শেষে হাসপাতালটি ৫০ শয্যা এবং ষাটের দশকের শেষে ১০০ শয্যায় উন্নীত হয়। ১৯৭০-৭১ সালে এই হাসপাতালে ১৩০টি শয্যা ছিল।[৫] ১৯৬৬-৭০ সালে ৩৬৫৮২ আবাসিক এবং ৩৬৭০৪৫ অনাবাসিক রোগীর এখানে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। এদের বার্ষিক গড় সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭৩৯৬৪ এবং ৭৩৪০৯ জন। ১৯৭০ সালে ৬২৭৮ জন চিকিৎসাধীন রোগীর মধ্যে ৪৫৩ জনের মৃত্যু হয়। ১৯৭০-৭১ সালে হাসপাতালের মোট আয় হয়েছিল ৫৬,৬৯৯ টাকা এবং মোট ব্যয় হয়েছিল ৪৭৭২৯৫ টাকা। বর্তমানে হাসপাতালটির শয্যাসংখ্যা ১৫০টি। বিভাগ ৯টি। ২০০৮ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত হাসপাতালে চিকিৎসা সেবাপ্রাপ্ত রোগীর বার্ষিক পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো:

সারণি-৮১

খুলনার জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	বছর	ভর্তিকৃত রোগী	বহির্বিভাগে সেবাপ্রাপ্ত রোগী
১.	২০০৮	৮,২৯৯ জন	১,৭৪,২৬৬ জন
২.	২০০৯	৮,৭৮৭ জন	১,৭৬,৬০৭ জন
৩.	২০১০	৮,৭৪২ জন	১,৬৮,৪১০ জন
৪.	২০১১	-	-
৫.	২০১২	-	-
৬.	২০১৩	৭,৯৫৬ জন	১,৭৮,৪৪০ জন
৭.	২০১৭	১০,৫৮৬ জন	১,৭০,৯৯৯ জন

সুত্র: সিভিল সার্জনের দপ্তর, খুলনা।

বক্ষব্যাধি হাসপাতাল

খুলনা সদরে অবস্থিত স্বতন্ত্র বক্ষব্যাধি হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৪৮ সালে। ১৯৭১ সালে এই হাসপাতালকে উন্নীত করে এর শয্যাসংখ্যা ২৩ থেকে ১০০ করা হয়। এর মধ্যে ৮৫টি পুরুষদের জন্য আর ১৫টি মহিলাদের জন্য। আবাসিক রোগী হিসেবেই এখানে যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসা করা হতো, এদের

[৩] জেনারেল হাসপাতাল, খুলনা কর্তৃপক্ষ, ২০১৪।

[৪] অন্য এক তথ্যমতে ১৯৬৪ সালে খুলনা, পৌরসভা কর্তৃক 'উডবার্ন হসিপটাল' নামে পরিচিত বর্তমান খুলনা জেনারেল হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা হয়।

[৫] তারমধ্যে সাধারণ শয্যা ছিল ৪৭টি, সাধারণ শল্য চিকিৎসার শয্যা ছিল ৪২টি, প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ শয্যা ২৩টি, শিশু রোগ শয্যা ১০টি এবং কেবিন ছিল ৮টি। প্রতি কেবিনের জন্য ১৮ টাকা ভাড়া নেওয়া হতে পারে।

উপস্থিতির বার্ষিক গড় ছিল ৫৪.৭১। এখানে প্রতিদিন গড়ে ৩০-৩৫ জন রোগী চিকিসার জন্য আসে। বর্তমান শয্যাসংখ্যা ১০০টি। এখানে রয়েছে মোট ১০টি ওয়ার্ড (সাধারণ ওয়ার্ড-৮টি এবং এমডিআর ওয়ার্ড-২টি) খুলনাতে যক্ষ্মা ক্লিনিক নামে একটি সরকারি ক্লিনিক রয়েছে। বক্ষব্যাধি হাসপাতালে ভর্তিকৃত রোগীর পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো:

সারণি-৮২

বক্ষব্যাধি হাসাপাতালে ভর্তিকৃত রোগীর পরিসংখ্যান (২০১২-২০১৬)

ক্রমিক নং	বছর	বোর্ড ভর্তি	জরুরি ভর্তি	মোট ভর্তি
১.	২০১২	-	-	৩৭৫ জন
২.	২০১৩	-	-	৩৫৮ জন
৩.	২০১৪	-	-	৪০৯ জন
৪.	২০১৫	-	-	৩৭৫ জন
৫.	২০১৬	-	-	৩৭৬ জন
৬.	২০১৭	-	-	৩১৩৪ জন

সূত্র: বক্ষব্যাধি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, খুলনা, ডিসেম্বর ১৬।

সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল

খুলনা সদরের মীরেরডাঙ্গায় স্বতন্ত্র সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৮ সালে। হাসপাতালটি ২০ শয্যাবিশিষ্ট। খুলনা সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালে ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা ও মৃত রোগীর পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো:

সারণি-৮৩

সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালে ভর্তিকৃত ও মৃত রোগীর পরিসংখ্যান

(১৯৯৮-২০১৭)

বছর	ভর্তিকৃত রোগী	মৃত রোগী	বছর	ভর্তিকৃত রোগী	মৃত রোগী
১৯৯৮	৩৩১৬ জন	৭৭ জন	২০০৮	২০৭৭ জন	২১ জন
১৯৯৯	২৮৮৯ জন	৫১ জন	২০০৯	৩৪৭৩ জন	১৭ জন
২০০০	২১৫৫ জন	৫৪ জন	২০১০	১৯৬০ জন	২৭ জন
২০০১	২১৯৬ জন	৪৬ জন	২০১১	২৩৯৪ জন	৩৭ জন
২০০২	২০৫৩ জন	৪৮ জন	২০১২	২০৬৯ জন	২৫ জন
২০০৩	২৩৩৮ জন	৫০ জন	২০১৩	২৬০৮ জন	১৮ জন
২০০৪	২৮৯৭ জন	৩৭ জন	২০১৪	৩৫৩০ জন	৩১ জন
২০০৫	২০০৪ জন	৩২ জন	২০১৫	৪১৫০ জন	৩৪ জন
২০০৬	২৮১৪ জন	৫১ জন	২০১৬	৪৩২২ জন	২৫ জন
২০০৭	১৮১২ জন	৩১ জন	২০১৭	৪০৮০ জন	১৪ জন

সূত্র: সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, খুলনা, ডিসেম্বর ১৬।

পুলিশ হাসপাতাল

জেলা পুলিশ সদস্যদের চিকিৎসার জন্য এটি একটি বিশেষ সরকারি হাসপাতাল। আগে এখানে আবাসিকভাবে রোগীদের চিকিৎসার জন্য ৩২টি শয্যা ছিল। ১৯৬৬ সালে চিকিৎসাপ্রাপ্ত অনাবাসিক রোগীর সংখ্যা ছিল ১২১৪৬

এবং তাদের দৈনিক উপস্থিতির গড় ছিল ৩৩.২৭। ১৯৯৭ সালে এটিকে বিভাগীয় পুলিশ হাসপাতালে রূপান্তর করা হয়। শুরুতে এর শয্যাসংখ্যা ছিল ১০০টি। বর্তমানে হাসপাতালটির শয্যাসংখ্যা ৫০টি। এখানে প্রতিদিন বহির্বিভাগে ২৫০ জন এবং আন্তঃবিভাগে ১০ জন রোগীর সেবা প্রদান করা হয়।[৬]

কেন্দ্রীয় জেল হাসপাতাল জেল কয়েদি ও জেল কর্মচারীদের চিকিৎসার জন্য বিভাগপূর্বকালে প্রতিষ্ঠিত এই কেন্দ্রীয় জেল হাসপাতালটি একটি দ্বিতীয় শ্রেণির বিশেষ সরকারি হাসপাতাল। আবাসিক রোগীদের জন্য ২৬টি শয্যা আছে। জেল হাসপাতালের ব্যয় সংকুলান জেল বাজেট থেকেই হতো। এর আন্তঃবিভাগে ৪৪৫ জন ও বহির্বিভাগে ৮৫২ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

কপিলমণি জেসি হাসপাতাল পরলোকগত রায় সাহেব বিনোদ বিহারী সাধু ১৯ মার্চ ১৯২৬ সালে নিজ ব্যয়ে কপিলমণি জেসি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে জেলা পরিষদকে হাসপাতালের ভার অর্পণ করা হয়। বর্তমানে ১০ শয্যাবিশিষ্ট এ হাসপাতালটিতে প্রতিবছর প্রায় ১০০০ রোগী ভর্তি ও চিকিৎসা নিয়ে থাকে।[৭]

রেলওয়ে হাসপাতাল রেলের কর্মচারীদের চিকিৎসার জন্য ১৯০১ সালে খুলনা রেলওয়ে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে এটি খুলনা রেলওয়ে ডিসপেনসারি নামে চালু আছে। এখানে প্রতিদিন ৫০ থেকে ৬০ জন রোগীর চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রশাসন ডিসপেনসারিটির রক্ষণাবেক্ষণ করে।[৮]

খুলনা শিশু হাসপাতাল খুলনা শিশু ফাউন্ডেশনের প্রথম প্রকল্প খুলনা শিশু হাসপাতালটি ১৯৮০ সালের ৭ সেপটেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি যে জায়গায় অবস্থিত তার মালিক ছিল তৎকালীন ভারত সম্রাট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই স্থানে ব্রিটিশ সরকার এয়ার ফোর্স ক্যাম্প গড়ে তোলে। ব্রিটিশরা দেশ ছাড়ার পর স্থানটির মালিক হয় সরকার এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকে খুলনা মিউনিসিপ্যালিটির। পরবর্তীকালে খুলনা মিউনিসিপ্যালিটি পরিবর্তিত হয় খুলনা সিটি করপোরেশনে।[৯] খুলনা সিটি করপোরেশন খুলনা শিশু হাসপাতালকে ০.৭৭ একর জমি দান করে। এ স্থানে ৫ ও ৪ তলাবিশিষ্ট দুটি ভবন গড়ে তোলা হয়। বর্তমানে সেই ভবনে হাসপাতালের আন্তঃবিভাগ ও বহির্বিভাগ চালু আছে। হাসপাতালটি ১৮ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত। হাসপাতালের বেড সংখ্যা ২৮৫টি। এখানে রয়েছে মোট ১৯টি বিভাগ। এগুলো হলো: বহির্বিভাগ, আন্তঃবিভাগ, প্যাথলজি বিভাগ, এক্সরে বিভাগ, ইপিআই বিভাগ, ব্লাড ব্যাংক, পুষ্টি বিভাগ, দন্ত বিভাগ, চক্ষু বিভাগ, নাক-কান-গলা বিভাগ, চর্মরোগ বিভাগ, সার্জারি বিভাগ, নিওনেটাল ওয়ার্ড, ফ্রি ওয়ার্ড, ইনকিউবেটর ওয়ার্ড, প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য

[৬] বিভাগীয় পুলিশ হাসপাতাল, খুলনা, জুন ২০১৪।

[৭] কপিলমণি জেসি হাসপাতাল, কপিলমণি, খুলনা, জুন ২০১৪।

[৮] খুলনা রেলওয়ে ডিসপেনসারি, খুলনা, জুন ২০১৪।

[৯] খুলনা শিশু হাসপাতাল প্রতিবেদন-২০১৪, খুলনা, জুন ২০১৪।

মানসিক বিকাশ কেন্দ্র ও ফিজিওথেরাপি সেন্টার, এনআইসিইউ ওয়ার্ড, আল্ট্রাসনোগ্রাফি ও কিডনি বিভাগ। এখানে ডাক্তার, নার্স, কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ মোট ২৫৫ জন কর্মরত। প্রতিদিন বহির্বিভাগে প্রায় ৬০০ থেকে ৭০০ রোগী দেখা হয় এবং আন্তঃবিভাগে ভর্তি থাকে ২০০ থেকে ২৬০ জন রোগী। হাসপাতালটিতে প্রতি মাসে ব্যয় হয় আনুমানিক ৩৫ লাখ টাকা। এরমধ্যে হাসপাতালে নিজস্ব আয় ৩০ লাখ টাকা। বাকি অর্থ সরকারি অনুদান ও বিভিন্ন দানশীল ব্যক্তিদের নিকট থেকে সংগ্রহ করা হয়। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে এ হাসপাতালে সরকারি অর্থ মঞ্জুরির পরিমাণ ছিল ৫৫ লাখ টাকা।[১০] ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে “খুলনা শিশু হাসপাতাল” এ সরকারি অর্থ মঞ্জুরির পরিমাণ ছিল ১(এক) কোটি টাকা।

খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

খুলনা জেলার সোনাডাঙ্গা আবাসিক এলাকায় ১৯৮০-৮১ শিক্ষাবর্ষে ৪৩.২৫ একর জমির ওপর খুলনা মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। পরে আরও ৩০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। কয়েক বছর পর খুলনা মেডিকেল কলেজের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে ১৯৮৯ সালের জানুয়ারি মাসে মেডিকেল কলেজটি পুনরায় চালু করা হয়। ১৯৯১-১৯৯২ শিক্ষাবর্ষে ২০জন ছাত্রী ও ৩০জন ছাত্র মোট ৫০জন শিক্ষার্থী নিয়ে পুনরায় খুলনা মেডিকেল কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়।[১১] সে সময়ে কলেজের সাথে সংযুক্ত এ হাসপাতালের জনবল ছিল মোট ২৪৬জন। বিভাগ ছিল ১০টি। বর্তমানে বিভাগসংখ্যা ১২টি, কর্মরত ডাক্তার সংখ্যা ৭৭ জন (পদ-৯৬টি), নার্স সংখ্যা ২৩৮জন (পদ-২৩৯টি), কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ৩৬০ জন (পদ-৩৭০টি) এবং আউটসোর্সিং জনবল ৩০জন (পদ-৩০টি)। হাসপাতালটি প্রতিবছর বহির্বিভাগে প্রায় ৪ লাখ এবং অন্তঃবিভাগে ২ লাখ ৪৩ হাজার রোগীর সেবা দিয়ে আসছে।[১২]

শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল

খুলনার জনগণের স্বাস্থ্যসেবার ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠভ্রাতা শহিদ শেখ আবু নাসেরের স্মরণে তদানীন্তন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৮ সালে এ হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে বিএনপি জোট সরকারের আমলে হাসপাতালটির নির্মাণকাজ বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর গত ২০০৯ ইং সালে দ্রুত হাসপাতালের নির্মাণকাজ শুরু হয়। গত ২০১০ সালের ৩০ মার্চ ৩০টি বেড নিয়ে কার্ডিওলজি ও নেফ্রোলজি বিভাগ দিয়ে অত্র হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে হাসপাতালটিতে ৭৫টি বেড ও ২০টি ডায়ালাইসিস বেড নিয়ে চিকিৎসাসেবা চলছে। সিসিইউ ইউনিটসহ কার্ডিওলজি বিভাগ-২৫ শয্যা, ডায়ালাইসিস-২০ শয্যা, নেফ্রোলজি বিভাগ-২০ শয্যা, নিউরোমেডিসিন-২০ এবং ইউরোলজি- ১০ শয্যা এবং অপারেশন থিয়েটারসহ আন্তঃ ও

---

[১০] খুলনা শিশু হাসপাতাল প্রতিবেদন-২০১৪, খুলনা, জুন ২০১৪।

[১১] মো. ইউনুসুর রহমান ও এসএম রইচ উদ্দিন আহম্মদ, খুলনা বিভাগের ইতিহাস (প্রথম খন্ড), খুলনা: গাঙচিল প্রকাশনা, ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ৪৬৫।

[১২] খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা, জুন ২০১৪।

বহির্বিভাগ চালু করা হয়েছে। এছাড়াও বহির্বিভাগে নিউরোসার্জারি ও ইউরোলজি বিভাগে রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হচ্ছে। নিচের সারণিতে হাসপাতালের বহির্বিভাগে ভর্তিকৃত রোগীর পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো:

সারণি-৮৪

শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতালে ভর্তিকৃত রোগীর পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	বছর	বহির্বিভাগে ভর্তি		মোট সংখ্যা
		সাধারণ বিভাগ	জরুরি বিভাগ	
১	২০১০	২,১৮০ জন	৯০৯ জন	৩,০৮৯ জন
২	২০১১	৪৬,৩৩৮ জন	১,৯১০ জন	৪৮,২৪৮ জন
৩	২০১২	৮৪,৬০৭ জন	২,৯৮২ জন	৮৭,৫৮০ জন
৪	২০১৩	৯০,৫১৬ জন	৬,০৩৮ জন	৯৬,৫৫৪ জন

সূত্র: ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট শহিদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, ৩০ জুন ২০১৪।

উল্লেখ্য, গত ৩০ মে ২০১২ সালে এ হাসপাতালে কার্ডিয়াক ক্যাথল্যাব উদ্বোধন হওয়ার পর অদ্যাবধি প্রায় ২০০ রোগীর করোনারি এনজিওগ্রাম সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে এখানে নিয়মিতভাবে হৃদরোগীদের বেলুন এনজিওপ্লাস্টি, স্টেন্টিং (রিং) ও পেসমেকার (হার্ট ব্যাটারি) প্রতিস্থাপন করা হয়। এছাড়া কিডনি ডায়ালাইসিস বিভাগের ২০টি বেডে প্রতিদিন তিন শিফটে ৬০ জন রোগীকে ডায়ালাইসিস সেবা প্রদান করা হয়। বর্তমানে হাসপাতালটিতে রক্ত পরিসঞ্চালন বিভাগ চালু হয়েছে।[১৩]

বেসরকারি হাসপাতাল খুলনায় সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পাশাপাশি সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৩টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। যথা- গাজী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (সোনাডাঙ্গা), আদ-দ্বীন আকিজ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (বৈকালী বাজার) ও সিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (ময়লাপোতা মোড়)। গাজী ও আদ-দ্বীন আকিজ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কার্যক্রম শুরু করলেও সিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নির্মাণাধীন।

ডিসপেনসারি খুলনা জেলার মোট ৫২টি ডিসপেনসারির মধ্যে ৩টি সাধারণ হাসপাতালের সাথে, ২টি সরকারি বিশেষ হাসপাতালের সাথে, ১টি বেসরকারি হাসপাতালের সাথে ও ৪টি সরকারি থানা ডিসপেনসারির সাথে সংশ্লিষ্ট। বাকিগুলো জেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ দ্বারা পরিচালিত। এই ৫২টি ডিসপেনসারির মধ্যে মাত্র ৪টি পৌর অঞ্চলে অবস্থিত। এ সকল ডিসপেনসারির মধ্যে খুলনা সদরে ১৮৬৪ সালে প্রথম ডিসপেনসারি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

---

[১৩] পরিচালক, ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল, খুলনা, ৩০ জুন ২০১৪।

যৌনব্যাধি প্রতিষেধক ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯৬১ সালে খুলনা শহরে যৌনব্যাধি ক্লিনিক স্থাপিত হয়।

যৌনব্যাধিসংক্রান্ত ক্লিনিক

খুলনা জেলায় ৩টি পল্লি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছিল। সেগুলোর বর্ণনা তুলে ধরা হলো:

পল্লি স্বাস্থ্যকেন্দ্র

সারণি-৮৫
পল্লি স্বাস্থ্যকেন্দ্র-বিষয়ক তথ্য

ক্রমিক নং	পল্লি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নাম	শয্যা সংখ্যা	খোলার তারিখ	অবস্থান
১.	জায়গির মহলো, আরএইচসি	৬টি	২৮/১২/১৯৬৫	পাইকগাছা
২.	শবখিবাগান, আরএইচসি	৬টি	২৪/১২/১৯৬৫	মোড়েলগঞ্জ
৩.	কালীগঞ্জ, আরএইচসি	৬টি	০৩/০১/১৯৬৬	কালীগঞ্জ

উৎস: *Bangladesh District Gazetteer*, Khulna, 1978, P. 243

প্রত্যেক কেন্দ্রেই বহির্বিভাগে সাধারণ চিকিৎসা প্রদান করা ছাড়াও ছোটো ধরনের শল্যচিকিৎসা প্রদান করা হতো। এছাড়া এটি ধাত্রী চিকিৎসা, শিশুস্বাস্থ্য পরিচর্যা, বিদ্যালয় স্বাস্থ্যপরিচর্যা, যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা, পরিবার পরিকল্পনায় সহযোগিতা প্রদান ইত্যাদি কাজ করতো। এসব পল্লি চিকিৎসা কেন্দ্রের প্রত্যেকটিতে একজন মেডিকেল কর্মকর্তা, একজন মহিলা স্বাস্থ্য পরিদর্শক, একজন পয়ঃ কাম ম্যালেরিয়া পরিদর্শক, একজন পরিচালিকা এবং একজন স্বাস্থ্য সহকারী ছিল।
২০১১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী খুলনা জেলার সদর উপজেলায় মাত্র ১টি মিশনারি ও চ্যারিট্যাবল হাসপাতাল রয়েছে। ৬৫ শয্যাবিশিষ্ট এ হাসপাতালে আন্তঃ ও বহির্বিভাগভিত্তিক সেবা প্রদান করা হয়।[১৪]

সারণি-৮৬
খুলনা জেলায় হাসপাতাল ও বেড সংখ্যা

স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিস্থান	সংখ্যা	বিছানা সংখ্যা
মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	১	৫০০
জেনারেল হাসপাতাল	১	১৫০
উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র	৯	৩৯৩
ইউনিয়ন সাব সেন্টার	১৪	০
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র	৫৪	০

[১৪] জেলা পরিসংখ্যান ২০১১, খুলনা, জুন ২০১৩, পৃ. ৮৫।

স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিস্থান	সংখ্যা	বিছানা সংখ্যা
ডিসপেনসারি	৩	০
কমিউনিটি ক্লিনিক	২০২	০
ট্রমা সেন্টার	০	০
এমসিডব্লিউসি	২	৪০
যক্ষা ক্লিনিক/হাসপাতাল	২	১০০
প্রাইভেট ক্লিনিক	১৮১	২১৪০
এনজিও ক্লিনিক	৩	১২০

কমিউনিটি ক্লিনিক পরিসংখ্যান পল্লি অঞ্চলে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়ার মানসে দেশব্যাপী কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি বিশেষ উদ্যোগ। এসব ক্লিনিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসেবে চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা সহ স্বাস্থ্য পরামর্শ দিয়ে থাকে। এছাড়া ক্ষেত্র বিশেষে সেবা গ্রহীতাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য বিশেষায়িত হাসপাতালে প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। খুলনা জেলায় শুরু থেকে ডিসেম্বর/২০১৭ পর্যন্ত ১৮৮টি কমিউনিটি ক্লিনিক বিদ্যমান আছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ৪টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণাধীন আছে যার প্রাক্কলিত ব্যয় ১০১.২১ লাখ টাকা এবং ১৩(তের)টি কমিউনিটি ক্লিনিক পুনঃনির্মাণ কাজ চলছে যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৩০১.৮৪ লাখ টাকা।

পরিবার কল্যাণ ১৯৬৫ সালে জনসংখ্যা সীমিত রাখার লক্ষ্যে একজন জেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ১জন জেলা টেকনিক্যাল কর্মকর্তা, ২৫ জন থানা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ৫০ জন থানা অফিস সহকারী এবং ২২ জন মহিলাকর্মী নিয়ে বৃহত্তর খুলনা জেলায় পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম শুরু হয়। জেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাকে Executive-cum-Publicity Officer বলা হতো। তাঁকে কারিগরি সহায়তা দিতেন জেলা টেকনিক্যাল অফিসার। খুলনা জেলার প্রথম পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় ছিল শহরস্থ ছোটো মির্জাপুরে একটি ভাড়া বাড়িতে। শুরুতে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী বিতরণ ও গণ-সচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরণের মধ্যেই পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিল।

খুলনা জেলার বয়রাস্থ আঞ্চলিক পণ্যাগার থেকে প্রতি মাসে উপজেলা পণ্যাগারগুলোতে উপকরণ সরবরাহ করা হয়। এ কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকেন আঞ্চলিক সরবরাহ কর্মকর্তা। খুলনা জেলার দাকোপ ও কয়রা অফিস কাম গুদাম, ডুমুরিয়া, বটিয়াঘাটা, দিঘলিয়া ও তেরখাদায় সদ্যনির্মিত গুদাম এবং ফুলতলা, রূপসা, পাইকগাছা ও সদর থানার একটি রুমকে গুদাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা-কর্মীদের চাহিদা অনুযায়ী পরিবার পরিকল্পনা উপকরণ সরবরাহ করেন।

খুলনা মা ও শিশু কল্যাণকেন্দ্র খুলনা শহরের ছোটো মির্জাপুরে অবস্থিত। এ কেন্দ্র সম্পর্কে যতদূর জানা যায় এটি এক হিন্দু জমিদারের আরবান ডিসপেনসারি হিসেবে পরিচালিত হতো। পরবর্তীকালে এ কেন্দ্রটি পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে হস্তান্তর করা হয় যা মা ও শিশু কল্যাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। এ কেন্দ্রে পরিবার পরিকল্পনাসহ মা ও শিশুদের সেবা দেওয়া হয়। বর্তমানে এখান থেকে জরুরি প্রসূতি সেবা দেওয়া হয়। কিশোর কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা, ক্যানসার অণুবীক্ষণ VIA (Visual Inspection of Cervix with Acetic Acid-জরায়ু ক্যানসার) এবং CBE (Clinical Breast Examination-স্তন ক্যানসার) কার্যক্রমও চলছে।

সারণি-৮৭

খুলনা মা ও শিশু কল্যাণকেন্দ্রের সেবা কার্যক্রম

সাল	প্রসব পূর্ব সেবা	প্রসব পরবর্তী সেবা	প্রসব সেবা		শিশু সেবা (০-৫)	স্থায়ী পদ্ধতি		ইমপ্লান্ট	আইইউডি	এমআর	VIA	CBE
			স্বাভাবিক সেবা	সিজারিয়ান অপারেশন		মহিলা	পুরুষ					
২০০৮	৫৯৮০	৯৯৮	৪৯৮	৯৩	৫৫১৭	৪৩	৬০	২৯	৪১	১২	৫৩৫	৩৪১
২০০৯	৬২২৪	৯৩৩	৭৫৮	৩২৮	৪৩১০	২৩৫	৩৩৬	৫৫	৪৩	৩৫	৭০৩	৭০৩
২০১০	৭৩২৯	১৫৯৮	১৩১২	৪৪৩	৪৪৬৮	৩৪৮	৯৯৪	৬০	২৬	৩১	৮৩২	৮৩২
২০১১	৮২৯৯	১৭৯৫	১০৫৮	৫২১	৫৩৫৬	৫৪৪	৬৬৭	৪৬৯	৫৫	৩২	৭৩৬	৭৩৬
২০১২	৯০৩১	১৭০৩	৯৪১	৪৭০	৫৩৩৭	৩৬৬	৩৭৪	১৭৪	৬৫	৪৫	৭৬৬	৭৬৬
২০১৩	৮৫৬১	১৩৯৬	৭৬৩	৩৮৩	৫০৩১	৩১৪	১১২	২০৭	৬২	৩১	৭০৮	৭০৮
২০১৪	৮২১০	১৮১০	৩৬৪	৩২৩	২৬০৯	৩৩৩	৬২	৩১৮	২৪২	২৪	৬৩৪	৬৩৪
২০১৫	৬৫২৫	১২৮৪	৩০৩	২২০	২৪১৪	২৩২	৮	৫৯৩	৩০৪	৩৩	৫৩১	৫৩১
২০১৬	৫৫৯১	১৭৮৫	২৪৪	১৯২	২৫১৮	১৬৭	৮	৪৮১	১৬১	৪১	৪০৫	৪০৫
২০১৭	৫৫৫১	১৬৮০	৪৫৬	২৩০	৪২২৫	১৪৩	২০	৪৬৩	১৩৯	৩৪	৩৮৪	৩৪৮

উৎস: মা ও শিশু কল্যাণকেন্দ্র, সদর, খুলনা।

খুলনা জেলার পরিবার পরিকল্পনা মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবায় সরকারি কাজের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলো বিশেষ অবদান রাখছে। এসব সংস্থা পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর থেকে অনুমোদনসাপেক্ষে মা, শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা দিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯১ সাল থেকে দি স্যালভেশন আর্মি খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলায় ২নং রঘুনাথপুর ইউনিয়নে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এ সংস্থাটি বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিবার পরিকল্পনা সেবা এবং আন্দুলিয়া গ্রামে অবস্থিত হাসপাতাল থেকে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকে।

এ ছাড়াও খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার দেলদুয়ারে আরও একটি মা ও শিশু কল্যাণকেন্দ্র অবস্থিত। তবে জনবলের অভাবে কেন্দ্রটি বর্তমানে চালু নেই। ইউনিয়নপর্যায়ে খুলনা জেলাতে ৪৭টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র (ইউএইচঅ্যান্ডএফডব্লিউসি) আছে যার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা ডেলিভারি কেন্দ্র

(ইউএইচঅ্যান্ডএফডব্লিউসি) এর সংখ্যা ২৭টি। এসব কেন্দ্রে একজন সাব-অ্যাসিসটেন্ট কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (এসএসিএমও) ও একজন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (এফডব্লিউভি); মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করেন। ইউনিয়নের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র স্থাপিত ওয়ার্ড বাদে, বাকি ওয়ার্ডে মাসে পূর্বনির্ধারিত একটি বাড়িতে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রতিমাসে প্রতি ওয়ার্ডে একটি স্যাটেলাইট ক্লিনিক স্থাপন করেন। অর্থাৎ প্রতি ইউনিয়নে ৮টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক সংগঠিত হয়। খুলনা জেলায় এরূপ স্যাটেলাইটের সংখ্যা প্রতি মাসে ৩৬১টি। স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও স্বাস্থ্য বিভাগের ইপিআই কার্যক্রম একই সঙ্গে সম্পাদিত হয়।

সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি রঘুনাথপুর ইউনিয়নের ছয়টি গ্রামে দি স্যালভেশন আর্মি বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে। সেগুলো হচ্ছে কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ পরিচালনা, সঞ্চয়ী দল পরিচালনা, কিশোর-কিশোরী দল পরিচালনা, বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা এবং সামাজিক সচেতনতামূলক নাটক মঞ্চায়ন। এছাড়াও ইউনিয়নের ০৬টি গ্রামের ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গুণগত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সারণি-৮৮

দি সালভেশন আর্মি, ডুমুরিয়া, খুলনা কার্যক্রম

সাল	সক্ষম দম্পতি	স্থায়ী পদ্ধতি		আইইউডি	ইমপ্লান্ট	গর্ভবতী সেবা		প্রসব সেবা	শিশু সেবা (০-৫)	সি এ আর
		পুরুষ স্থায়ী পদ্ধতি	মহিলা স্থায়ী পদ্ধতি			প্রসব পূর্ব সেবা	প্রসব পরবর্তী সেবা			
২০০৯	১৭৯৬	২১	১৭	১০	-	১৭৯৫	১৪৫	১৩৫	৮৭২৫	৮৭.৮৬%
২০১০	১৮১৮	৮	২০	৯	৫	২২৪৩	২৭৩	৯৫	৯৩৬২	৮৭.৬২%
২০১১	১৮২৩	২৪	৪২	৫	৭২	২৬৫০	৩১৮	১৩৬	১০১৭০	৮৮.৫৯%
২০১২	১৮৪৪	৭	১৯	৭	৩৩	২৮৯৪	৩৬৪	১৯২	৯৯৮১	৮৬.৩৩%
২০১৩	১৮৭৮	৭	২৯	৫	১৫	২৬৪৫	৩৫০	১৯১	৯৮৮৩	৮৫.৯৯%

উৎস: উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, খুলনা।

বি.দ্র: ২০১৩ সালের পর থেকে স্যালভেশন আর্মির রিপোর্ট আপডেট করা হয়নি কারণ ওখানে পরিবার পরিকল্পনার কাজ হয়নি।

মেরী স্টোপস ক্লিনিকের কার্যক্রম ১৯৯৬ সালের সেপটেম্বর মাস থেকে খুলনা জেলায় মেরী স্টোপস ক্লিনিকের কার্যক্রম শুরু হয়। মেরী স্টোপস ক্লিনিক মূলত ক্লিনিকভিত্তিক সেবা প্রদান করে। স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে খুলনা জেলার পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে বিশেষ অবদান রাখছে। এছাড়া সংস্থাটি অনাকাঙ্খিত গর্ভধারণে এমআর (Menstruation Regulation) সেবা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকে।

সারণি-৮৯

মেরী স্টোপস ক্লিনিক, খুলনা কার্যক্রম

সাল	স্থায়ী পদ্ধতি		আইইউডি	ইমপ্লান্ট	গর্ভবতী সেবা		শিশু সেবা (০-৫)	এমআর সেবা
	পুরুষ স্থায়ী পদ্ধতি	মহিলা স্থায়ী পদ্ধতি			প্রসব পূর্ব সেবা	প্রসব পরবর্তী সেবা		
২০০৯	৩২৬৪	৬৪	৫৬	৩৩	৩১১	২৬	৭৫	৯৯৪
২০১০	২১৮৭	৩৩	২৬৫	২৬	৩২৯	২২	৫০	১১৯১
২০১১	৬৮৬	২১	২৭০	৫১	৩৩৫	৩১	৪১	১২৩২
২০১২	৩৭৫	৬	২৪০	৬৫	৩৭৪	১৩	৪৩	১১০০
২০১৩	৩২৮	৩	১৯০	৮৯	৩২৭	২১	৬১	১০২১
২০১৪	৬	৬	৩৩৩	৮৬	-	-	-	-
২০১৫	৭	৮	২৬৮	১৩৯	-	-	-	-
২০১৬	৩	-	২৫২	২৬৯	-	-	-	-
২০১৭	৪৭	৪	৪৭২	২২৫	৯২	-	-	৬৭৬

উৎস: মেরী স্টোপস ক্লিনিক, খুলনা

খুলনা জেলায় বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফর ভলান্টারি স্টেরিলাইজেশন (বিএভিএস) সংস্থার কাজ শুরু হয় ১৯৯৮ সালে। মূলত এ সংগঠনটি ক্লিনিকভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করে। শহরের বিভিন্ন জায়গায় উদ্বুদ্ধকরণ কাজের মাধ্যমে সংস্থাটি পরিবার পরিকল্পনার স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করে। **বিএভিএস**

সারণি-৯০

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফর ভলান্টারি স্টেরিলাইজেশন (বিএভিএস), খুলনা কার্যক্রম

সাল	স্থায়ী পদ্ধতি		আইইউডি	ইমপ্লান্ট	ইনজেকশন	খাবার বড়ি
	পুরুষ	মহিলা				
২০০৯	১৯৭০	০৬	-	৩৫	১০২৩	২২২৯
২০১০	৩১২২	৪৫	০৫	০১	১৫৪২	২৫৩৮
২০১১	৩০০১	৯১	২১	৮৫	৭৯২	১২৬০
২০১২	২৭৭৮	৬০	৩১	৭২	১৪৯০	১৭৫৫
২০১৩	২৬৯৬	৪০	০৩	৩৫	২৩৫৫	২৩০৭
২০১৪	২১৪১	৩৬	৪	৫২	৩৫৪৬	৮১৬৬
২০১৫	১৬৩৭	৪২	০	৪৯	৩৫৬৩	৮৯২৮
২০১৬	১৪৩৫	৪৯	৮	৩০	৩৪৩৬	১০৩৭৭
২০১৭	১০৮১	৩৭	০	১৬	৯২৮	১২০১

উৎস: বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফর ভলান্টারি স্টেরিলাইজেশন (বিএভিএস), খুলনা।

১৯৮২ সালে পিকেএস একটি বেসরকারি অলাভজনক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সূর্যের হাসি ক্লিনিক নামে এ সংস্থাটি বিশেষ পরিচিত। সংস্থাটি খুলনা জেলায় সিটি করপোরেশনের **সূর্যের হাসি ক্লিনিক- পি কে এস**

১,২,৩,৪,৫,৬,১২,১৯,২০,২২,২৪,২৭,২৮,২৯,৩০ ও ৩১ নং ওয়ার্ডে, ডুমুরিয়া উপজেলার জোয়ার্দ্দার পাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ফুলতলা উপজেলায় সফলতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে পিকেএস ২৬টি স্টাটিক ও ৪৩টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের পাশাপাশি এ সংস্থা শিশু স্বাস্থ্য, মাতৃ স্বাস্থ্যসেবা, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, সিজারিয়ান অপারেশনসহ নিরাপদ প্রসব সেবা কার্যক্রম, আরটিআই/এসটিআই, যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা, স্ক্রিনিং ফর সার্ভিক্স (Cervical Cancer) এবং ক্লিনিক্যাল স্তন পরীক্ষা (Breast examination) সেবা প্রদান করে আসছে।

সারণি-৯১

পিকেএস-এর কার্যক্রম

সাল	সক্ষম দম্পতি	স্থায়ী পদ্ধতি		আইইউডি	ইমপ্লান্ট	গর্ভবতী	ডেলিভারি	প্রসব পূর্ববর্তী সেবা	শিশুসেবা (০-৫)
		পুরুষ	মহিলা						
২০০৯	৪৬৮৪৯	৪	২৪	১৯৬	৭	২১,২৮৪	৫৭৯	৬,৯৫৮	৮৩,৩৮০
২০১০		১০	৪০	৮৯	৫	২৮,৩২৩	৬৯৭	৯,০০০	১,০০,৫৩৩
২০১১		২৬	৫২	২২৩	২৩৩	৪২,৫৬৮	৮৮২	১৪,২৯৯	১,৬১,০৭৬
২০১২		৩৯	৯৫	২০৫	৯৬	৪৬,০৯৮	১১৪২	১৬,৮০৬	১,৬১,৯২০
২০১৩		৪২	৯১	১৮০	২৮৫	৫১,৮৫৫	১,১৯৮	১৯,৮৯৮	১,৭৭,০৭৯
২০১৪	৪৬৮১০	৩৫	৯০	২০৬	৩১১	৪৯৫৫৫	৮২০	২০৭৮৭	৯৪৩৫৩
২০১৫	৩৪৯৮৭	২০	৩০	২০২	৩৪৩	৮৩৩২৭	১৩২০	৪৩৬৮৪	৮৮২২০
২০১৬	৩৪২১৮	২০	৬১	২৪২	৩৩৮	৮৫৯২৬	১০৮৩	২৪৮৯৫	২২১০০

উৎস: উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, খুলনা।

কেএমএসএস (খুলনা মুক্তি সেবা সংস্থা) ২০১৩ সাল থেকে খুলনা সিটি করপোরেশনের ৭,৮,৯,১০,১১,১৩,১৪,১৫,১৬,১৭,১৮,২১,২৩,২৫ ও ২৬ নং ওয়ার্ডে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে সংস্থাটি স্টাটিক ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে খুলনা সিটি করপোরেশন এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

আরএইচ স্টেপ Reproductive Health Services and Education Program ১৯৮৩ সাল থেকে খুলনা সদর হাসপাতালে স্থাপিত হয়ে এম আর ট্রেনিং এবং সার্ভিস কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীকালে ১৯৯২ সালে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হাসপাতাল তত্ত্বাবধায়ক ও গাইনি বিভাগীয় প্রধানের তত্ত্বাবধানে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের পাশাপাশি সংস্থাটি ডাক্তার, উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (এসএসিএমও), প্যারামেডিক্স (এউডব্লিউভি ও স্টাফ নার্স) দের ইনফেকশন প্রিভেনশন ও এম আর প্রশিক্ষণ দেয়।

এছাড়া নিরাপদ এমআর, পোস্ট অ্যাবরশন কেয়ার, ক্যানসার পূর্ব অবস্থান পর্যবেক্ষণ, স্তন টিউমার পরীক্ষা, ক্লিনিক, স্কুল ও কমিউনিটি পর্যায়ে কৈশোর,

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা এবং অধিকার সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

খুলনা জেলায় পরিবার পরিকল্পনা সমিতি, বাংলাদেশ (এফপিএবি) এর কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭১ সালে। খুলনা জেলার সিটি করপোরেশন এলাকা, রূপসা ও তেরখাদা উপজেলায় কার্যক্রম চালু আছে। মা, শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ছাড়াও গর্ভবর্তী মা, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম, মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম, কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম, এইচআইভি/এইডস প্রিভেনশন কার্যক্রম, অ্যাবরশন কার্যক্রম ও বিসিসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। **এফপিএবি**

সারণি-৯২
এফপিএবি-এর কার্যক্রম

সাল	মহিলা স্থায়ী পদ্ধতি	পুরুষ স্থায়ী পদ্ধতি	আইইউডি	ইমপ্লান্ট	প্রসব পূর্ব সেবা	প্রসবোত্তর সেবা	শিশু সেবা (০-৫)
২০০৯	২৬	৫৪৪	১৯০	-	৬১৯	২৪৫	১১৪৫
২০১০	১৯	৩০২	১০৮	১৬	৭৫৬	৩১২	১৬৬৫
২০১১	২০	২৯১	৭৫	২৩৮	১০৯০	৪৪৫	২৩৮৬
২০১২	৩৫	১৩৯	১১৭	৪৭৯	২০৮২	৬১১	৩০৯৭
২০১৩	১৯	১২৪	১০৯	৬৩৫	১৯২১	৪৫৬	২০৫০
২০১৪	১৪৯	২৮	১৫০	৭৭০	১২৯৬	২৩৯	২৪০
২০১৫	৪৭	২৫	৭৮	৪০৮	১১৭০	৩৩৪	৩৩৯
২০১৬	৫	৬	৩৪	৩২৭	৪০৩৮	১৭৯৯	১৫৭৫

উৎস: উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, খুলনা।

১৯৮১ সালে খুলনা জেলায় লোকসংখ্যা ছিল ১৭,৭১,১০১ জন। ৩০ বছর পর ৫,৪৭,৪২৬ জন বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১ সালে লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ২৩,১৮,৫২৭ জন। গত ৩০ বছরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০.৯১ শতাংশ। ১৯৫১ সালে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ০.৫ শতাংশ। পরবর্তী সময়ে এ হার বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৪ সালে ২.৪৮ শতাংশে পৌঁছায়। বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে তা নিম্নগামী হয়ে ২০১১ সালে ১.৩৭ শতাংশে পৌঁছায়। ২০১৪ সালে খুলনা জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ০.৬০ শতাংশ। গত আদমশুমারিতে লোকসংখ্যা হ্রাসের কারণ সম্ভবত অভিবাসন (Migration)। বর্তমানে খুলনা জেলায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে লোক বাস করে ৪৯০.৪৯ জন। সেখানে বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে বাস করে ১,০১৫ জন।

সারণি-৯৩
খুলনা জেলার জনসংখ্যা

সাল	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	শতকরা বৃদ্ধির হার
১৯৮১	১৭,৭১,১০১	৯,৪৭,৩৯৪	৮,২৩,৭০৩	-
১৯৯১	২০,১০,৬৪৩	১০,৫৪,৬৩৩	৯,৫৬,০১০	১৩.৫৩

সাল	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	শতকরা বৃদ্ধির হার
২০০১	২৩,৫৭,৯৪০	১২,৩৪,৩২০	১১,২৩,৬২০	১৭.২৭
২০১১	২৩,১৮,৫২৭	১১,৭৫,৬৯৬	১১,৪২,৮৪১	-১.৬৭

তথ্যসূত্র: Population and Housing Census-2011, Community Report:Khulna.

খুলনা জেলার টিএফআর টিএফআর বলতে একজন মহিলা তার প্রজনন সময়ে (১৫-৪৯ বছর) মোট কতজন সন্তান জন্ম দিলেন তা বোঝায়। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। বাংলাদেশে ১৯৫০-১৯৫৫ সালে টিএফআর ছিল-৬.৪। ১৯৭১-১৯৭৫ সালে কমে দাঁড়ায় ৬.৩। ১৯৮৭-১৯৮৯ সালে টিএফআর ছিল ৫.১। সেখান থেকে কমে ১৯৯৫-৯৭ সালে ৩.৩ এ পৌঁছায়। ২০১১ সালে টিএফআর ছিল ২.৩। খুলনা বিভাগে টিএফআর ১.৯ এবং খুলনা জেলায় বর্তমানে টিএফআর ১.৮৫।

উৎস: Partners in Population and Development (PPD)

সারণি-৯৪
পরিবার পরিকল্পনা সেবা ব্যবহার পরিসংখ্যান

জুলাই/১৬ হতে জুন/১৭

উপজেলার নাম	স্থায়ী পদ্ধতি		আই ইউ ডি	ইমপ্লান্ট	খাবার বড়ি	কনডম	ইনজেকশন
	পুরুষ	মহিলা					
দিঘলিয়া	৩৮২	৭৮	৭০৪	১৬৮৭	৩২০৯৭	১৭০১৫	১১৫৫০
ডুমুরিয়া	৩২৯	৮৯	৮৩৭	১৮৩৪	২৪৫৭৪	৪৩০১	১০৩৪৪
সদর	৩৩২	১১৬৮	১৬৪৩	১৩৫১	২৫৪৩৭	১২৮৫৮	৯৩১৮
দাকোপ	৩৬	২৬	৫৯	৫৫৮	১৪৭৯৭	১১৭৩	৩৫২২
তেরখাদা	৭৫	৫	২০৪	৩৮৯	১০০৯৪	২২৬০	২৭০৪
ফুলতলা	৯১	৪২	৬৯৩	৫১৯	৮৬৭৯	৩২৩১	৪৫৮২
বটিয়াঘাটা	৪৮	৫৫	২২১	৪৯১	১৬২৭০	২৭৯৫	৫১১৪
পাইকগাছা	১৯৯	১৪	২০৮	৫৬৬	২৩৯৪৮	১৬৭৩	৮১২২
রূপসা	২০০	৪৭	৬৫৮	৯৩৮	১৪২৯৮	২৬৫৩	৪০৩৯
কয়রা	১৩২	৩	১৭১	৩৮৯	২০৪৯৯	১৪৯৫	৩৫৫৯
মোট	১৫২৭	১৮২৪	৫৩৯৮	৮৭২২	১৯০৬৯৩	৪৯৪৫৪	৬২৮৫৪

উৎস: উপপরিচালক, জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস, খুলনা।

জনস্বাস্থ্য আগে খুলনায় ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা, বেরিবেরি, গুটিবসন্ত, আমাশয় প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। রোগব্যাধির জন্য মানুষ তখন দেশি আয়ুর্বেদিক ওষুধ এবং দৈবশক্তির ওপরেই নির্ভর করত।[১৫] তৎকালীন বাংলার ড্রেইনেজ কমিটির ১৯০৭ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে খুলনা জেলা চারটি আঞ্চলিক বিভাগে বিভক্ত। যেমন- উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল প্লাবন সীমার কিছু উর্ধ্বে অবস্থিত, ঘন জনবসতিপূর্ণ, উত্তরপূর্বাঞ্চল

---

[১৫] শেখ মাসুম কামাল ও জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, ব্যাঘ্রতট, জেলা প্রশাসন, সাতক্ষীরা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬, পৃ. ১২১।

যশোর সীমানা থেকে দক্ষিণে বাগেরহাট পর্যন্ত বিস্তৃত জলাভূমি সমাকীর্ণ নিম্নভূমি, মধ্যাঞ্চল সুন্দরবনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং সর্বশেষ অঞ্চল দক্ষিণে অবস্থিত জনবিরল সুন্দরবন।[১৬]

তখন যশোরসংলগ্ন জেলার উত্তরাঞ্চল সবচেয়ে অস্বাস্থ্যকর ছিল। কয়েকটি নদী এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার ফলে পলিমাটির ক্রমাগত অবক্ষেপণে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল উঁচু হয়ে ওঠে এবং দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল নিম্নভূমিতে পরিণত হয়। বছরের অধিকাংশ সময় জলাবদ্ধ থাকার ফলে অঞ্চলটি বিল ও জলায় পূর্ণ। জেলার মধ্যাঞ্চলও জলাভূমি তবুও উন্মুক্ত ও বনজঙ্গল কম থাকায় পরিবেশ অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর ছিল। আবাদি জমির দক্ষিণে জনবসতি খুবই বিরল; এর কারণ পানীয় জলের অপ্রতুলতা ও গ্রাম গড়ে ওঠার মতো ভূমির স্বল্পতা। খুলনা জেলার জনস্বাস্থ্য, চব্বিশ পরগনা ব্যতীত অন্যান্য জেলার জনস্বাস্থ্য অপেক্ষা ভালো ছিল। তবে অন্যান্য জেলার মতো এই জেলাতেও ম্যালেরিয়াসহ বিভিন্ন প্রকার জ্বরজনিত মৃত্যুর সংখ্যা ছিল সর্বাধিক।

উনিশ শতকের শেষ নয় বছরে জন্মের হার মৃত্যুহার অপেক্ষা অধিক ছিল। ১৮৯২ সাল থেকে মৃত্যু সংখ্যার যে প্রতিবেদন পাওয়া যায় তন্মধ্যে ১৯০০ সালের মৃত্যুহার ছিল সর্বাধিক, প্রতি বর্গমাইলে ৩৮.৮ এবং ১৮১৩ সালে মৃত্যুসংখ্যা ছিল সর্বনিম্ন, মৃত্যুহার প্রতি বর্গমাইলে ২৭.২৭। ১৯০২ সালে জন্মহার ছিল সর্বোচ্চ (৪৩.৯৭) এবং ১৮৯২ সালে জন্মহার ছিল সর্বনিম্ন (২৫.৫০)।[১৭]

জন্ম-মৃত্যু পরিসংখ্যান

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর অধীন বাংলাদেশ সেম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস-২০১৭ এর প্রদত্ত রিপোর্টে ২০০৮ হতে ২০১৭ পর্যন্ত খুলনা জেলার প্রতি হাজারে জন্ম-মৃত্যুর বার্ষিক হার তুলে ধরা হলো:

সারণি-৯৫

খুলনা জেলার প্রতি হাজারে জন্ম ও মৃত্যু হার (২০০৮-২০১৭)

বছর	জন্ম হার			মৃত্যুহার		
	মোট	গ্রাম	শহর	মোট	গ্রাম	শহর
২০০৮	১৯.৪০	-	-	৬.১৫	-	-
২০০৯	-	-	-	-	-	-
২০১০	১৯.০৩	১৯.১২	১৮.৮৯	৬.৬৪	৬.০৯	৭.০৪
২০১১	১৭.৮৮	১৭.৩২	১৮.৬৯	৫.৫৮	৬.১৪	৪.৭৯
২০১২	১১.৮১	১১.৫৫	১২.০৪	২.৭৮	৩.৮২	১.৮৫
২০১৩	১৫.৮০	-	-	৫.৯০	-	-
২০১৪	১৫.৬০	-	-	৪.৮০	-	-
২০১৫	১৫.৯০	-	-	৪.১০	-	-

[১৬] K.G.M.Luthful Bari, ibid, P-230.

[১৭] K.G.M. Luthful Bari, P. 230.

বছর	জন্ম হার			মৃত্যুহার		
	মোট	গ্রাম	শহর	মোট	গ্রাম	শহর
২০১৬	১৭.৩০	-	-	৪.৬০	-	-
২০১৭	১৬.৯০	-	-	৪.৯০	-	-

সূত্র: *Report of SVRS, Bangladesh Bureau of Statistics*

সারণিতে দেখা যায় যে, ১৯২১ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত মোট ১০ বছরের মধ্যে ১৯২৩ ও ১৯২৪ সালে কলেরা, গুটি বসন্ত এবং ডায়রিয়ার মৃত্যুর হার অপেক্ষাকৃত কম। এর প্রধান কারণ হলো ওই দু' বছর মহামারি প্রতিষেধক ইনজেকশন ও টিকা অন্যান্য বছরের তুলনায় অধিক হারে দেওয়া হয়েছিল।[১৮] যদিও ওই সকল জন্ম-মৃত্যুর পরিসংখ্যান সঠিক ও সম্পূর্ণ নয় তবুও বিভিন্ন বছরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বিভিন্ন রোগে মৃত্যু ইত্যাদির তুলনামূলক পরিসংখ্যানের জন্য ওই সকল উপাত্ত থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হতো। ১৯৬০ সালে জনসংখ্যা ছিল ৩২,৩৪৪ জন (হাজারে হার ছিল ১৫.৫) এবং মৃত্যুসংখ্যা ছিল ১৯,১২৪ জন (হাজারে হার ছিল ৯.২)। ১৯৬৬ সালে রেজিস্ট্রিকৃত জন্ম সংখ্যা ছিল ২৯.৮১৪ জন (জন্মহার- ৯.৫) আর মৃত্যুসংখ্যা ছিল ১৪,৮৫১ (মৃত্যুহার- ৪.৭) জন। ১৯৫১-৬২ সাল পর্যন্ত শিশুমৃত্যুর বার্ষিক গড় ছিল ২৫৮৩ জন। নবজাত শিশুর প্রতি হাজারে মৃত্যুর হার ছিল ৭৯.৬। ১৯৬৬ সালে ১৮২৬ জন শিশুর মৃত্যু হয়। প্রতি হাজারে মৃত্যুহার ছিল ৬৪.৯৪। শিশু জন্মের সময় প্রসূতির মৃত্যুসংখ্যা এই জেলায় খুব উপেক্ষণীয় নয়। ১৯৫১-৬২ সালে প্রসূতি মৃত্যু সংখ্যার বার্ষিক গড় ছিল ১৫৬.৪। ১৯৬৬ সালে ১৭১ জন প্রসূতির মৃত্যু হয়। এর অধিকাংশই গ্রামাঞ্চল থেকে প্রাপ্ত মৃত্যুর খবর।

বর্তমান চিত্র :

সারণি-৯৬
হাসপাতালে বিভিন্ন রোগের ভর্তি হার

ক্র. নং	রোগ	সংখ্যা	হার
১.	ডায়রিয়া ও অন্যান্য সংক্রমণজনিত অন্ত্রের সমস্যা	৪,১৪৮	৫.২%
২.	শারীরিক আঘাত	১,৯৬৯	২.৪৭%
৩.	পেপটিক আলসার	১,৬২৪	২.০৪%
৪.	ভাইরাল নিউমোনিয়া	১,২৮৮	১.৬২%
৫.	অ্যাপেনডিসাইটিস	১,২২৩	১.৫৩%
৬.	শ্বাসনালীর সাধারণ সমস্যা	১,২১৩	১.৫২%
৭.	হৃদরোগ	১,২০১	১.৫১%
৮.	পেট ব্যথা	১,১৮৪	১.৪৯%
৯.	কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট	১,১৩৪	১.৪২%
১০.	হাঁপানি	১,০৯১	১.৩৭%

[১৮] Ibid- P. 5.

সারণি-৯৭
হাসপাতালে বিভিন্ন রোগে মৃত্যুহার (১৯০৪)

ক্র. নং	রোগ	মৃত্যুর হার
১.	হৃদরোগ	১৫.৯৩%
২.	রক্তনালীর সমস্যা	০৮.৪২%
৩.	ক্যানসার	৪.০৪%
৪.	স্ট্রোক	৩.৩৭%
৫.	ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ	২.৭০%
৬.	অন্যান্য	

সূত্র: সিভিল সার্জনের কার্যালয়, খুলনা

সারণি-৯৮
হাসপাতালের বিভিন্ন রোগের ভর্তিহার (বছরভিত্তিক)

ক্র. নং	রোগ	২০১২		২০১৩		২০১৪		২০১৫		২০১৬	
		সংখ্যা	হার	সংখ্যা	হার	সংখ্যা	হার	সংখ্যা	হার	সংখ্যা	হার
১	ডায়রিয়া ও অন্যান্য সংক্রামক জনিত অন্ত্রের সমস্যা	২৩০	২.৫৯	২০২	২.২৬	১৪৯	১.৬৮	২০৩	২.৩৩	১৯১	২.১৪
২	শারীরিক আঘাত	১২৮৪	১৪.৪৮	১৪৫৯	১৬.৩১	১৬০৭	১৮.০৭	১১৮০	১৩.৫৫	১২১২	১৩.৬০
৩	পেপটিক আলসার	২৫৫	২.৮৮	২০৩	২.২৭	২৪৬	২.৭৭	১৮৬	২.১৪	২৮৫	৩.২০
৪	ভাইরাল নিউমনিয়া	১৮৫	২.০৯	১৪০	১.৫৬	২২৫	২.৫৩	১৬০	১.৮৪	১৯৯	২.২৩
৫	অ্যাপেন্ডিসাইটিস	১৩৫	১.৫২	১৩৯	১.৫৫	১৭৭	১.৯৯	১৬৫	১.৮৯	৬৭৯	৭.৬২
৬	শ্বাসনালীর সাধারণ সমস্যা	৩২৭	৩.৬৯	৩৫৯	৪.০১	৩৭০	৪.১৬	৫০৯	৫.৮৪	৫০৩	৫.৬৫
৭	হৃদরোগ	৩১৪	৩.৫৪	৪৩৪	৪.৮৫	৪৭৬	৫.৩৫	৬৮১	৭.৮২	৩৯৭	৪.৪৬
৮	পেটব্যাথা	৭২০	৮.১২	৫০০	৫.৫৯	৪৯৫	৫.৫৭	৬৭০	৭.৬৯	৭৬৮	৮.৬২
৯	কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট	১৩৭	১.৫৫	১০৬	১.১৮	১৫১	১.৭০	১১৭	১.৩৪	১৩৬	১.৫৩
১০	হাঁপানি	৫৮৮	৬.৬৩	৬৮৬	৭.৬৭	৫০৫	৫.৬৮	৬৭৬	৭.৭৬	৭১০	৭.৯৭

সূত্র: **জেনারেল হাসপাতাল,খুলনা।**

সারণি-৯৯
হাসপাতালের বিভিন্ন রোগের মৃত্যুহার (বছরভিত্তিক)

ক্রমিক নং	রোগ	২০১২		২০১৩		২০১৪		২০১৫		২০১৬	
		সংখ্যা	হার	সংখ্যা	হার	সংখ্যা	হার	সংখ্যা	হার	সংখ্যা	হার
১	হৃদরোগ	২৩	০.২৬	১৯	০.২১	২৭	০.৩০	২৭	০.৩১	১৭	০.১৯
২	রক্তনালির সমস্যা	১	০.০১	১	০.০১	৫	০.০৬	৪	০.০৫	৩	০.০৩
৩	ক্যান্সার	১	০.০১	২	০.০২	১	০.০১	৬	০.০৭	৫	০.০৬
৪	স্ট্রোক	৩৩	০.৩৭	২০	০.২২	৩৩	০.৩৭	৩২	০.৩৭	২৬	০.২৯
৫	ক্রনিক	৬	০.০৭	৭	০.০৮	৭	০.০৮	৬	০.০৭	৯	০.১০

ক্রমিক নং	রোগ	২০১২		২০১৩		২০১৪		২০১৫		২০১৬	
		সংখ্যা	হার	সংখ্যা	হার	সংখ্যা	হার	সংখ্যা	হার	সংখ্যা	হার
	অবস্ট্রকটিভ পালমোনারি ডিজিজ										
৬	অন্যান্য	৩২	০.৩৬	৩১	০.৩৫	১৮	০.২০	২৬	০.৩০	২৫	০.২৮

সূত্র: **জেনারেল হাসপাতাল,খুলনা।**

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, জেলায় ছোঁয়াচে রোগ হিসেবে এখনো ডায়রিয়া প্রথম অবস্থানে আছে। এছাড়া, নিউমোনিয়া ও শ্বাসনালীর সমস্যা নিয়ে জেলার হাসপাতালগুলোতে প্রচুর রোগী ভর্তি হয়। বর্তমানে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা, এন্টিবায়োটিকের বহুল ব্যবহার এসব রোগে মৃত্যুর পরিমাণ প্রায় শূন্যের কোঠায় নামিয়ে এনেছে। সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব কমে গিয়ে বর্তমানে জেলায় অসংক্রামক ব্যাধি মানবমৃত্যুর প্রধান কারণ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

অতীত রোগসমূহের চিত্র:

ম্যালেরিয়া দেশ বিভাগের (১৯৪৭) পরে মৃত্যুর প্রধান কারণ হিসেবে ম্যালেরিয়াকে চিহ্নিত করা হতো। ১৯৫১-৬২ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়াজনিত মৃত্যুসংখ্যার বার্ষিক গড় ছিল ৩৫৩৪.২৫। অর্থাৎ প্রতি হাজারে মৃত্যুর হার ছিল ১.৭। পরবর্তীকালে খুলনা জেলায় ম্যালেরিয়া জ্বরে মৃত্যু হ্রাস পায়। ১৯৬৬ সালের চিকিৎসাধীন ১৬,৩৯৫ জন ম্যালেরিয়া রোগীর মধ্যে ১,০৯৭ জনের মৃত্যু হয়।

জাতীয় ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের অধীনে খুলনা জেলায় ১৯৫৪ সাল থেকে ডিডিটি স্প্রে করার কাজ শুরু হয় এবং ১৯৫৯ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই কাজ চলে। তারপর ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ কার্যক্রম শুরু করা হয়। ১৯৫৯ সালের শেষ দিকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকটি নির্বাচিত স্থানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ কার্যক্রমের পূর্ববর্তী জরিপের কার্যভিত্তিক পরিচালনা করা হয়। খুলনার ৮টি থানার ৩২টি গ্রামে জরিপ হয় এবং ১৬১৬ জনের রক্ত পরীক্ষা করা হয়। ১৯৬১ সালে ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ কার্যক্রম নামে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা গঠন করা হয়। দেশ থেকে ম্যালেরিয়া নির্মূল করাই ছিল এই কার্যক্রমের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কার্যক্রমকে প্রস্তুতি, আক্রমণ ও সংহতিকরণ এই তিন কর্মসূচিতে বিভক্ত করা হয়।

খুলনা জেলায় ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ কার্যক্রমের জন্য মাত্র একটি অঞ্চলভুক্ত করা হয় এবং খুলনা সদর মহকুমা ও বাগেরহাট সদর মহকুমাকে ওই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ কার্যক্রমকে বাস্তবায়িত করার জন্য এর সময়সীমা প্রতি অঞ্চলের জন্য ৭ বছর ধার্য করা হয়। এ অঞ্চলের কাজ যথাক্রমে ১৯৬৬ সালের অক্টোবরে এবং ১৯৬৭ সালের সেপটেম্বর আরম্ভ হয়ে যথাসময়ে সম্পাদিত হয়। এ অঞ্চল থেকে ২,০৩,৫৩১ জনের রক্ত আণুবীক্ষণিক পরীক্ষার জন্য ১৯৭০ সালে সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে ১০৪ জনের রক্ত সন্দেহাতীতভাবে ম্যালেরিয়া জীবাণু দৃষ্ট বলে প্রমাণিত হয়। ১৯৭০-৭১ সালে ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ কার্যক্রমে এই জেলায় ৬,২৯,৬৫৪.০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছিল।

সাম্প্রতিক সময়ে এ জেলায় জাতীয় ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং এনজিও, স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক প্রতিকার ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার হওয়ায় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার হার প্রায় শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

কলেরা

বিভিন্ন সময়ে এ জেলায় কলেরা মহামারি আকারে দেখা দেয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বছর হচ্ছে ১৯৫৭, ১৯৬০ এবং ১৯৬৭-৭০ সালে। ১৯৫৭ সালে মোট মৃত্যুসংখ্যা ছিল ৩৮২ জন এবং প্রতি হাজারে মৃত্যুহার ছিল ১.৮৩। ১৯৬০ সালে ৭৫টি গ্রামে কলেরা মহামারি আকারে দেখা দেয় এবং ১৭৫ জন আক্রান্ত রোগীর মধ্যে ১১৩ জনেরই মৃত্যু হয়। ১৯৬৭-৭০ সালে আক্রান্ত ৪,৪৫৭ জন রোগীর মধ্যে ২২৩ জনের মৃত্যু হয়। কলেরা তখন এই জেলায় মহামারি আকারে বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্যমান ছিল। মানুষ সারা বছরই কলেরায় আক্রান্ত হতো। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবই ছিল কলেরা প্রাদুর্ভাবের প্রধান কারণ। সাধারণত নদীর দূষিত পানি পানের ফলে জনগণ কলেরায় আক্রান্ত হতো। ১৯৭০ সালে এই জেলায় মোট ২২,৫৭,৭৮৯ জনকে কলেরার টিকা দেওয়া হয়। বর্তমানে বিচ্ছিন্নভাবে কলেরায় আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেলেও মহামারি বিলুপ্ত হয়েছে।

গুটিবসন্ত

১৯৫১ সালে জেলায় মারাত্মক মহামারি আকারে গুটিবসন্তের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। গুটি বসন্তে মৃত্যুর হার ছিল ০.৯১ এবং মৃত্যু হয়েছিল ১,৮৯৭ জনের। ১৯৫৮ সালে গুটিবসন্তে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১,৩১৫ জন। মোট ১৯,৫৭১ জন গ্রামবাসীকে টিকা দেওয়া হয়েছিল এবং টিকা দেওয়ার জন্য ২৮৩ জন পল্লি স্বাস্থ্যকর্মী নিযুক্ত হয়েছিল। বর্তমানে এ রোগ নির্মূল হয়েছে।

আমাশয় ও উদরাময়

আমাশয় ও উদরাময় এই দু'টি ব্যাধিকে গুরুত্ব বিবেচনায় একই শিরোনামভুক্ত করা যায়। ১৯৫১ সালে অ্যামিবিক ও ব্যাসিলারি আমাশয়ে যথাক্রমে ৫,৪৮৮ জন (অনাবাসিক ৫,৩৩৩ এবং আবাসিক ১৫৫জন) এবং ২,০৮০ জন (অনাবাসিক ১,০২৫ এবং আবাসিক ৫৫ জন) আক্রান্ত হয়েছিল এবং যথাক্রমে ১ জন ও ১৫ জনের মৃত্যু হয়। ওই একই সময়ে উদরাময়ে আক্রান্ত ৫,৮২৬ জনকে (অনাবাসিক ৫,৭৪৫ এবং আবাসিক ৮১ জন) চিকিৎসা করা হয়েছিল। তারমধ্যে ১০ জন মারা যায়। ১৯৬০-৬৩ সালের মধ্যে আমাশয়ে মোট ১,৩১৭ জনের এবং উদরাময়ে ৭,০৭০ জনের মৃত্যু হয়। তার মধ্যে ১৯৬০ সালে আমাশয় ও উদরাময়ে যথাক্রমে ৩২৮ এবং ১২৫ জনের মৃত্যু হয়। বর্তমানেও এ রোগের প্রাদুর্ভাব আছে কিন্তু এ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর হার প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে।

কালাজ্বর

কালাজ্বরের প্রাদুর্ভাব ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৫০ সালে এই রোগে ৯৪ জন মারা যায়। বিভাগোত্তরকালে এটি ছিল সর্বোচ্চ মৃত্যু সংখ্যা। তারপর মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস পেয়ে ১৯৬২ সালে ২৭ জনে নেমে আসে। ১৯৫১-৬২ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর মৃত্যুর বার্ষিক গড় সংখ্যা ছিল ১০৭.৮। অর্থাৎ প্রতিবছরে মৃত্যু সংখ্যার হার ছিল ৪.৬। এরপর ১৯৬৬ সালে এই জেলায় কালাজ্বরে মাত্র ১৬ জন মারা যায়।

কালাজ্বরের প্রাদুর্ভাব ক্রমশই হ্রাস পাওয়ায় এর বিশেষ চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো উঠিয়ে দেওয়া হয় এবং সরকারি ডিসপেন্সারিগুলোতে এই রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা রাখা হয়। খুলনা জেলার কালাজ্বর চিকিৎসার বিবরণ তুলে ধরা হলো:

কালাজ্বর চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোর অবস্থান (১৯৬৬ সালের আগে)

কেন্দ্রের নাম	ইউনিয়ন	থানা	মহকুমা
সন্গা	সুরখালী	বটিয়াঘাটা	খুলনা সদর
চুকনগর	আটলিয়া	ডুমুরিয়া	খুলনা সদর

সূত্র: *Bangladesh District Gazetteer*, Khulna, 1978, Dhaka, P.236.

বর্তমানে জেলার কয়রা উপজেলায় দু-একটি ছাড়া অন্যত্র কালাজ্বরের প্রাদুর্ভাব নেই।

যক্ষ্মা যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে খুলনায় ১৯৫৭ সালে ১৩৪ জন মারা যায়। তারপর ক্রমান্বয়ে এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬২ সালে ১৯৭-এ দাঁড়ায়। ১৯৬৬ সালে ১৫৭ জন এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। খুলনা জেলায় ১৯৫১-৬২ সালে এই রোগে মৃত্যুর বার্ষিক গড় ছিল ১৮৪.৫ অর্থাৎ প্রতি হাজারে ০.০৮। ১৯৫৪ সালে ১৫ জনের এই রোগে মৃত্যু হয়। ১৯৫৭ সালের মৃত্যুসংখ্যা ছিল সর্বনিম্ন ১৩৫ জন। উল্লিখিত মৃত্যুসংখ্যা দ্বারা এই রোগের ব্যাপকতা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে সঠিক ধারণা পাওয়া যায় না, কারণ এ হিসেবে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীদের সংখ্যা ধরা হয়নি। তা ছাড়া আমাদের দেশের মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হলো যক্ষ্মা রোগকে গোপন করা। এ জন্যই মৃত্যুর কারণ যে যক্ষ্মা সে সম্বন্ধে সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। যক্ষ্মা সংক্রামক ব্যাধি, সেজন্যই মানুষ যক্ষ্মা রোগকে ভীতির চোখে দেখত। বর্তমানে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা ও সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাব কমে গেছে। জেলার সব সরকারি হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, এনজিও ইত্যাদি ‘DOTs centre’ এর মাধ্যমে দ্রুত যক্ষ্মা রোগনির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান করে যক্ষ্মা ভীতি ও মৃত্যু অনেক কমিয়ে এনেছে।

কুষ্ঠরোগ এই জেলায় কুষ্ঠরোগে মৃত্যুসংখ্যা খুব কম নয়। ১৯৫৭ সালে এ রোগে মৃত্যুসংখ্যা ছিল ৪১ জন এবং ১৯৫৬ সালে সর্বনিম্ন সংখ্যা ছিল ১ জন। ১৯৬৬ সালে ৩ জন কুষ্ঠরোগীর মৃত্যু হয়। জেলায় কোনো কুষ্ঠরোগের হাসপাতাল নেই। সাধারণ হাসপাতালেই এই রোগের চিকিৎসা প্রদান করা হয়ে থাকে। তবে গত তিন বছরে এ জেলায় কারো কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া যায় না।

ক্যানসার পঞ্চাশের দশকে প্রথম বাংলাদেশে ক্যানসারের প্রকোপ লক্ষণীয় ছিল। ১৯৫৩ সালে অনাবাসিক ব্যবস্থায় খুলনা জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে ১৮ জন ক্যানসার আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা করা হয়। এছাড়া ১৯৬৩ সালে ক্যান্সারাক্রান্ত হয়ে ৩২ জনের মৃত্যু হয়। বর্তমানে জেলায় মোট মৃত্যুর ৪.০৪% ক্যান্সারের কারণে হয়।

এছাড়া, রোগের প্রক্রিয়া পরিবর্তনের ফলে হাইপ্রেশার, ডায়াবেটিস, স্থুলতা, মানসিক সমস্যা ইত্যাদি আগের ছোঁয়াচে রোগসমূহের স্থান দখল করেছে। ম্যালেরিয়া, কলেরা, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা ইত্যাদি ছোঁয়াচে রোগ কমে গিয়ে অসংক্রামক রোগের দৌরাত্ম্য বাড়ছে। এ পরিবর্তনের ফলে রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে গঠনগত পরিবর্তন দৃশ্যমান।

এক সময় খুলনা পৌর এলাকায় বাধ্যতামূলকভাবে টিকা দেওয়া হতো। গুটিবসন্তের টিকা দেওয়ার জন্য বেতনভোগী টিকাদার নিযুক্ত থাকতো। পল্লি এলাকায় টিকা দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল না। সেখানে টিকা দেওয়ার জন্য সেপটেম্বর থেকে মার্চ এই কমাসের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত টিকাদারদের দিয়ে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হতো। তারা টিকা দেওয়ার পারিশ্রমিক হিসেবে জনপ্রতি ১২ পয়সা করে গ্রহণ করতো।

চিকিৎসা ব্যবস্থা

১৯৩০ সালের আগে বৃহত্তর খুলনা জেলার চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত ছিল না। অধিকাংশ হাসপাতাল ও ডিসপেনসারি ৩য় শ্রেণির চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ছিল। এ গুলোতে শয্যাসংখ্যা ছিল অনেক কম। এর মধ্যে খুলনা উডবার্ন হাসপাতালে ছিল মাত্র ৩৭টি। অধিকাংশ জটিল ও মুমূর্ষু রোগীকে বহির্বিভাগের রোগী হিসেবে চিকিৎসা প্রদান করা হতো। এ সময় প্রায় ১ লাখ চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর মধ্যে মাত্র ১ হাজার রোগী হাসপাতালে অবস্থান করে চিকিৎসা-সুবিধা লাভ করে। ১৯৩০ সালে স্থানীয় সরকারের অধীনে খুলনা জেলার বিভিন্ন হাসপাতাল ও ডিসপেনসারির পরিসংখ্যান সারণিতে দেখানো হলো।

সারণি-১০০

হাসপাতাল ও ডিসপেনসারির পরিসংখ্যান (১৯৩০)

ডিসপেনসারির নাম	স্থানীয় বরাদ্দ	অন্যান্য সরকারি বরাদ্দ	ভারতীয় বরাদ্দ	অন্যান্য উৎস	মোট	আয়	বহির্বিভাগে রোগীর সংখ্যা
উডবার্ন হাসপাতাল, খুলনা	২,২৫৭/-	৮০৫/-	৭৪৮/-	১,৮০৮/-	৯,২৩০/-	১০,০৪০/-[১৯]	৬,৪৭৬[২০] জন
সতীশচন্দ্র ডিসপেনসারি, ডুমুরিয়া	১,৭০৭/-	৯/-	১৪৮/-	৮৩/-	১,৯৪৭/-	১,৮১২/-	৭,৩৫৩ জন
ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডিসপেনসারি, দাকোপ	২,১০৬/-	২৮/-	১৪১/-	১১/-	২,২৮৬/-	২,১৭৫/-	৪,৮২৪ জন
পাইকগাছা ডিসপেনসারি	১,৭০৮/-	৩৭/-	১১০/-	৪৯/-	১,৯০৯	১,৭৭৯/-	৪,৬৭০ জন

সূত্র: *Bangladesh District Gazetteer*, Khulna, 1933, P.18

[১৯] এরমধ্যে পৌরসভার বরাদ্দ ছিল-৩৪২৩ টাকা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের বরাদ্দ ছিল-৩,৪২৩ টাকা।

[২০] আন্তঃ বিভাগে রোগীর সংখ্যা-৬৯২।

বর্তমানে ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সদর হাসপাতাল এই তিন স্তরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে হৃদরোগ, কিডনি সমস্যা, অর্থোপেডিকস ইত্যাদির চিকিৎসার সুব্যবস্থা রয়েছে।

চিকিৎসা ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধাও বৃদ্ধি পায়। ১৯৩০ সালে খুলনার অধিকাংশ হাসপাতাল ও ডিসপেনসারির চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল নিম্নমানের। তবে ১৯৬০ সালে ও তার পরবর্তী সময়ে অবস্থার অনেক উন্নতি ঘটে। এভাবে হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা, চিকিৎসা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ফলে ক্রমবর্ধমান হারে জনগণ চিকিৎসা-সুবিধা লাভে সমর্থ হয়। নিচে খুলনা জেলার সরকারি স্বাস্থ্য ক্লিনিকের বেড সংখ্যা, ডাক্তার ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো:

সারণি-১০১

২০১৭ সালে খুলনা জেলার সরকারি স্বাস্থ্য ক্লিনিক ও স্বাস্থ্যকর্মী বিষয়ক পরিসংখ্যান

উপজেলা/সিটি করপোরেশন	বেড	ডাক্তার (জন)	নার্স (জন)	টেকনিশিয়ান (জন)	অন্যান্য স্টাফ (জন)
বটিয়াঘাটা	৩১টি	৬	১৪	৯	৮২
দাকোপ	৫০টি	৬	১৯	৪	৮৯
দিঘলিয়া	৩১টি	৯	১৫	৮	৭১
ডুমুরিয়া	৩১টি	৯	১৯	৪	১৩৫
কয়রা	৫০টি	৬	১১	৪	৭৩
পাইকগাছা	৬০টি	৫	১৬	৬	১২১
ফুলতলা	৫০টি	১০	১৬	৮	৫৮
রূপসা	৩১টি	৮	১৮	৫	৮০
তেরখাদা	৩১টি	১০	১১	৩	৬২
মোট	১২৩০টি	৬৯	১৩৯	৫১	৭৭১

সূত্র: জেলা পরিসংখ্যান ২০১১, খুলনা, জুন ২০১৩, পৃ.৮৩

মা ও শিশু স্বাস্থ্য চিত্র

খুলনা জেলায় মা ও শিশু স্বাস্থ্যের বর্তমান চিত্র আশাব্যঞ্জক। সমন্বিত টিকাদান কর্মসূচি ও মাতৃ স্বাস্থ্য উন্নয়নে প্রসূতিপূর্ব, প্রসূতিকালীন ও প্রসূতি পরবর্তী সেবা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এছাড়া আইএমসিআই, স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম ফলপ্রসূ প্রভাব বয়ে আনছে।

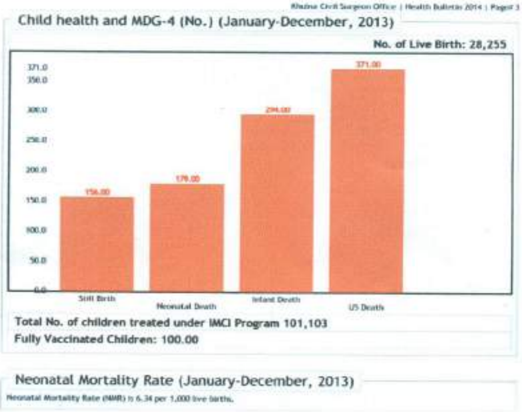

চিত্র: শিশু স্বাস্থ্য

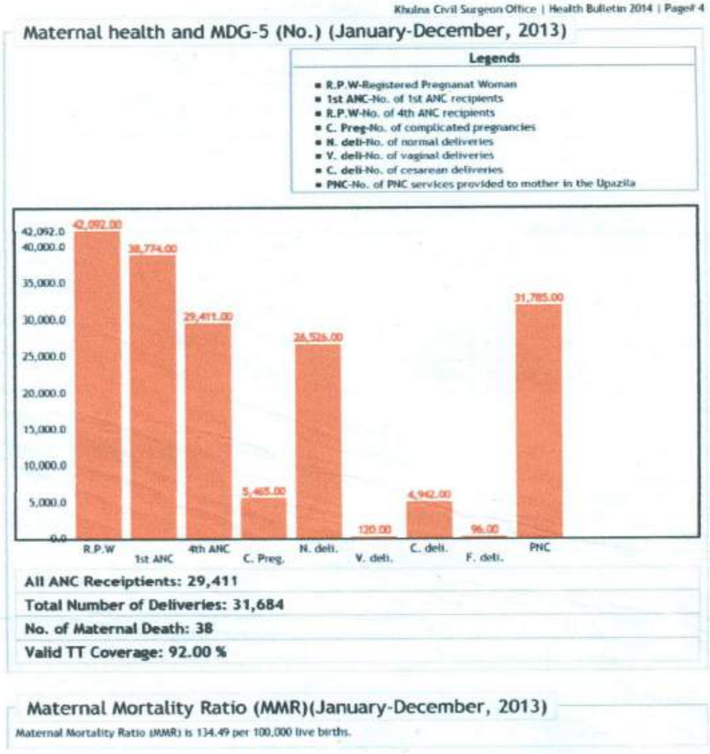

চিত্র: মাতৃস্বাস্থ্য

আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ও অপারেশন সরকারিভাবে জেলার একমাত্র এমআরআই (MRI) মেশিনটি শেখ আবু নাসের হাসপাতালে স্থাপিত আছে। এখানে জটিল ও কঠিন রোগনির্ণয় করা যায়। এছাড়া করনারি এনজিওগ্রাফি, জিন ডিটেকশন, সি ডি ৪ কাউন্ট (CD4)-এর মতো জটিল ও অত্যাধুনিক রোগনির্ণয় ব্যবস্থা বিদ্যমান। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের অপারেশনের মধ্যে ল্যাপারস্কপি, অনকোলজিক্যাল সার্জারি অন্যতম। এছাড়া সাধারণ অপারেশনসমূহ যেমন- অ্যাপেনডিসেকটমি, পারফোরেশন, পাইলস, হার্নিয়া ইত্যাদি জেলার হাসপাতালগুলোতে রুটিন অপারেশন হিসেবে চলমান। জেলায় PET scan যন্ত্র স্থাপিত না হওয়ায় ক্যানসার রোগীদের রোগের প্রগ্রেস জানতে ঢাকায় ছুটতে হয়। এছাড়া আধুনিক রেডিয়োথেরাপি এখনো জেলায় চালু হয়নি।

স্বাস্থ্য শিক্ষা সিভিল সার্জনের প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানে একজন জেলা স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা ও একজন মাঠকর্মী তথা পরিদর্শক নিয়ে প্রত্যেক জেলা সদরে একটি করে স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ অফিস গড়ে উঠেছে। জনগণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও সংস্কার দূরীকরণ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ১৯৬৩ সালে তৎকালীন খুলনায় স্বাস্থ্যশিক্ষা সম্পর্কিত একটি অফিস স্থাপিত হয়।[২১] বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন সেমিনার করে এবং চিকিৎসা কর্মকর্তা, সিভিল সার্জন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও সমাজকর্মীদের সহযোগিতায় বিদ্যালয়, কলেজ, সম্মেলন কেন্দ্র, গণকেন্দ্রে বক্তব্য উপস্থাপনের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ছোঁয়াচে রোগের বিস্তার ও প্রতিষেধক, ধাত্রীবিদ্যা ও শিশু লালন, খাদ্য পুষ্টি ও ভারসাম্য খাদ্য গ্রহণ ইত্যাদি সম্বন্ধে অফিসটি প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করে থাকে। কলেরা, গুটিবসন্ত ইত্যাদি মহামারি আকারে দেখা দিলে এই অফিস স্থানীয় সংগঠন ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণের সহযোগিতায় তাৎক্ষণিক স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

বিদ্যালয় স্বাস্থ্য প্রকল্প বিদ্যালয় স্বাস্থ্য প্রকল্পের অধীনে খুলনা শহরে ১৯৬১ সাল থেকে একটি বিদ্যালয় স্বাস্থ্য ক্লিনিক চালু রয়েছে। ১৯৬৬-৬৭ সালে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নকল্পে ৫,৬৫৪.৫৪ টাকা ব্যয় হয়। ইউনিসেফের সহযোগিতায় ক্লিনিকটি স্থাপিত হয়েছিল। বিদ্যালয় স্বাস্থ্যপ্রকল্প নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করে -

১. শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে অসুস্থ শিক্ষার্থীদের ওষুধের ব্যবস্থা করা।

২. শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে চশমা বিতরণ করা।

৩. সপ্তাহে একবার বিদালয় ভবন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ভবন পরিদর্শন করা।

৪. ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, খেলাধুলা, যুব কল্যাণ সংগঠন এবং বিদ্যালয় স্বাস্থ্য সংগঠন ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

---

[২১] শেখ মাসুম কামাল ও জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২।

৫. স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে কাজ করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া ও মনোনয়ন প্রদান করা।

৬. দুপুর বেলা নাস্তা পরিবেশন করা।

৭. প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং মাসে অন্তত দুবার শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুষ্টি সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করা ইত্যাদি সম্পন্ন করতে হয়।

পয়ঃনিষ্কাশন

গ্রামাঞ্চলে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা জেলা পরিষদ এবং শহরাঞ্চলে খুলনা সিটি করপোরেশন পরিচালনা করে। জেলা পরিষদ, খুলনা গ্রামাঞ্চলে স্যানিটারি ল্যাট্রিন সুবিধা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও ময়লা নিষ্কাশন ব্যবস্থা পরিচালনা করে। ২০১৩-১৪ সালের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে জেলার ৯১% পরিবারে স্যানিটারি ল্যাট্রিন সুবিধা বিদ্যমান। ফলে আগে উন্মুক্ত স্থানে মলমূত্র ত্যাগের ফলে যেসব পানিবাহিত রোগ অতিমাত্রায় প্রচলিত ছিল তার প্রকোপ আশানুরূপ কমেছে। একটি জনস্বাস্থ্য গবেষণাগার ও একটি ক্লিনিক্যাল গবেষণাগার জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে কার্যক্ষম আছে।

নগর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

নগরাঞ্চলে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য ১৯৬৫-৬৬ সালে ৩,৩৭,৩৩৯.৩৭ টাকা ব্যয় করা হয়। ১৯০৬ সালে চালু করা ওয়ার্কস পদ্ধতির মাধ্যমে শহরের কেন্দ্রে রক্ষিত দু'টি পানি সংরক্ষণাগার থেকে খাবার পানি সরবরাহ করা হতো। রেলওয়ে স্টেশনের নিকট এবং খান এ সবুর রোডের সংযোগস্থলে খুলনার প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট মি. ক্লারির নামানুসারে একটি বড়ো পানি সংরক্ষণাগার স্থাপন করা হয়। বর্তমানে ফুলতলা, খালিশপুর, দিঘলিয়া, দৌলতপুরসহ শহরের বিভিন্ন অংশে স্থাপিত সংরক্ষণাগার থেকে খুলনা ওয়াসা পানি সরবরাহ করে। তিলক পাথরঘাটা, রূপসায় ৬০ একর জমির উপরে একটি বড়ো পানি শোধনাগার ও সংরক্ষণাগার স্থাপন কার্যক্রম চলছে। খুলনা সিটি করপোরেশন শহরাঞ্চলে পয়ঃব্যবস্থার দায়দায়িত্ব বহন করে। আগে আবর্জনা ও মলমূত্র গোরুর গাড়িতে স্থানান্তর করা হতো। পরবর্তীকালে খুলনা সিটি করপোরেশন পরিচ্ছন্নতার জন্য ট্রাক্টর আমদানির পর সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। আগে শহরের প্রায় সব ড্রেনই কাঁচা ছিল এবং এগুলো সঠিকভাবে চালু ছিল না। বর্ষাকালে ড্রেনগুলো বন্ধ হয়ে যেতো। কাঁচা ড্রেন নতুন করে খনন করতে হতো। কিন্তু তাতেও খুব বেশি দিন চালু থাকতো না। এখন এই অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। সিটি এলাকায় কিছু নতুন পাকা ড্রেন তৈরি করা হয়েছে। পাকা রাস্তাও তৈরি হয়েছে। সাম্প্রতিক এক গবেষণা থেকে জানা যায়, খুলনার শতকরা ৯১% পরিবারের সদস্যরা উন্নত পয়ঃব্যবস্থা ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া ৪৭.১ শতাংশ পরিবার বাচ্চাদের ময়লা নিরাপদ স্থানে রেখে দেয়।

পাশাপাশি ৭৪.১ শতাংশ পরিবারের হাত ধোয়ার স্থানে পানি ও সাবানের ব্যবস্থা আছে। ৮৮ শতাংশ পরিবারের যে, কোনো স্থানে সাবানের ব্যবস্থা আছে।[২২]

পল্লি এলাকায় পানি সরবরাহ খুলনার পল্লি এলাকায় খাবার পানির সরবরাহ অপর্যাপ্ত ও মিঠা পানির পরিমাণ অপ্রতুল। জনসাধারণ আগে নদী, পুকুর এবং কূপসহ অন্যান্য সংরক্ষণাগার থেকে খাবার পানি সংগ্রহ করতো, ফলে পানিবাহিত নানা রোগের প্রকোপ বেশি ছিল। পরবর্তী সময়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের মাধ্যমে নতুন নলকূপ স্থাপন ও পুরানো নলকূপের সংস্কারের ফলে জেলার পল্লি এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। জেলার পল্লি এলাকায় ৭,৪২৪টি অগভীর নলকূপ চালু অবস্থায় ছিল। ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে ১,৬৭৭টি নলকূপ স্থাপন করা হয়। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ ১৯৭০ সালে ৭৮টি নতুন নলকূপ স্থাপন করে এবং ১,০৩৫টি পুরানো নলকূপ সংস্কার করে। বর্তমানে এ জেলার শতকরা ৯৩.৭ শতাংশ পরিবারের সদস্যরা উন্নত খাবার পানির উৎস ব্যবহার করে।[২৩] খুলনা জেলাধীন উপজেলাসমূহে বিভিন্ন ধরনের পানির উৎসের পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো:

সারণি-১০২
উপজেলাওয়ারি পানির উৎসের পরিসংখ্যান

উপজেলা	অগভীর নলকূপ	গভীর নলকূপ	ভিএসএসটি	এসএসটি	আরডব্লিউ এইচ	পিএসএফ	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট
রূপসা	১৭০৩	১৬২১	৫	-	-	৯	-
দিঘলিয়া	১৩৪২	১৭৪৭	-	-	-	১০	-
তেরখাদা	১৬১৪	১১৪২	-	-	-	১৪	-
বটিয়াঘাটা	১১৩২	১৭৪৭	৫	৩১	-	২৪	-
ফুলতলা	১২২১	১২৭২	-	-	-	৫	-
ডুমুরিয়া	২০৭৩	৩০৬৫	-	৩	-	৯	-
দাকোপ	৪৮৯	২৫	১৪৩	৮৮৮	৫২৭	৫২১	১
পাইকগাছা	২৬৭০	১৪	৩১	৬১৫	৭৫৩	৫০৬	-
কয়রা	৩৩৮	১৫৪৬	৭০	২১৯	৩৩২	২১৮	২
মোট	১২,৫৮২	১২,১৭৯	২৫৪	১৭৫৬	১৬১২	১৩১৬	৩

সূত্র: জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন, সিডর, আইলা ইত্যাদির কারণে বিদ্যমান অগভীর নলকূপসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ফলে পানযোগ্য মিঠা পানির অভাব আবার প্রকট হয়েছে। অধিক সংখ্যক ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন ও গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে জেলার গ্রামাঞ্চলে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি করা যেতে পারে।

---

[২২] Progotir Pathey (Multiple Indicator Cluster Survey 2012-2013), Key District Level Findings, BBS and UNICEF, May 2014, P. 11.

[২৩] *Ibid*, 2014, P. 11.

খুলনা ওয়াসা

খুলনা শহরের পানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের নিমিত্তে ২০০৮ সালে খুলনা ওয়াসা প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ওয়াসার উৎপাদক নলকূপের সংখ্যা ৮৩টি (চালু আছে)। ওয়াসার মোট ওয়াটার পাইপ লাইনের দৈর্ঘ্য ২৮১ কিলোমিটার এবং মোট ১৬০০ বাড়িতে ওয়াসার পানির সংযোগ রয়েছে। খুলনা নগরীর প্রতিদিনের পানির চাহিদা ২৪ কোটি লিটার হলেও খুলনা ওয়াসা মাত্র ১১ কোটি লিটার পানি সরবরাহ করে থাকে। খুলনা ওয়াসার ২টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট রয়েছে। একটির অবস্থান ফুলতলার গিলাতলায় যার উৎপাদনক্ষমতা প্রতিদিন ১২ লাখ ৫০ হাজার এবং অন্যটি খুলনা ওয়াসার ভেতরে অবস্থিত, যার উৎপাদনক্ষমতা প্রতিদিন ৫৫ লাখ লিটার। ৬০ একর জমির ওপরে রূপসা উপজেলায় প্রস্তাবিত পানি শোধনাগার চালু হলে শহরাঞ্চলে পানি সরবরাহের পুরোটাই করতে পারবে খুলনা ওয়াসা।

অধ্যায়-১১

শিক্ষা

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শিক্ষাব্যবস্থা

খুলনা অঞ্চল শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাচীনকাল থেকেই ছিল অগ্রসরমান। শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঐতিহ্য ধারণ করে আছে এ অঞ্চলের প্রাচীন সমাজ। পাশ্চাত্য শিক্ষা সূচনার আগে এ এলাকায় একটা প্রথাবদ্ধ শিক্ষাধারা চালু ছিল।[১] টোল, পাঠশালা, মাদরাসা, মক্তব প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণি, বর্ণ ও ধর্মাবলম্বী বাঙালি শিক্ষাগ্রহণ করত। তবে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উচ্চশ্রেণির ব্যবহারিক শিক্ষার চাহিদা মেটাতে ফারসি স্কুলের বেশ রমরমা ছিল।[২] অন্যদিকে নিম্নশ্রেণির শ্রমজীবী মানুষের ব্যবহারিক শিক্ষার প্রয়োজন মেটাতো অসংখ্য পাঠশালা। বেশিরভাগ জনবহুল গ্রামগঞ্জে অন্তত একটি পাঠশালা ছিল। এসব পাঠশালায় গুরুমহাশয়গণ বাংলা লেখা, পড়া, অঙ্ক, ব্যাবসাবাণিজ্য ও জমিজমার হিসাব, চিঠিপত্র লেখা এমনকি বাড়ি তৈরি, পুকুর খনন প্রভৃতি ব্যবহারিক ও কারিগরি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন।[৩] এই বাংলা পাঠশালা ব্যবস্থা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্য গড়ে তুলতে এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল।

ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার পর এদেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা সংকুচিত হতে থাকে। এ দেশে ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতি বিষয়ে ইংরেজ শাসকদের মতানৈক্য ছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস, হোরেস উলসালে, হল্ট ম্যাকেনজি এবং প্রিন্সেস প্রমুখ মনে করতেন, আরবি ও সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে এ দেশে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চা ফলপ্রসূ হবে না। অন্যদিকে চার্লস গ্রান্ট, বেবিংটন মেকলে, ট্রাভেলিয়ন প্রমুখ বিশ্বাস করতেন যে, ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চা শাসক ও শাসিত উভয়ের জন্য হবে কল্যাণকর। ১৮৩৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে মেকলে বলেন, ‘শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে এমন একটি শ্রেণি তৈরি করা যা রক্ত ও বর্ণে হবে ভারতীয়, কিন্তু প্রকৃতি, আদর্শ, নীতি ও বুদ্ধিবৃত্তিতে হবে পুরোপুরি ইংরেজ’।[৪] এরপর উড ডেসপ্যাচ (১৮৫৪), হান্টার রিপোর্ট (১৮৮২), লর্ড কার্জনের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার (১৯০২-০৪) এবং সার্জেন্ট কমিটি (১৯৪৪) ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলিত পদ্ধতির মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যতের জন্য কিছু পদক্ষেপের সুপারিশ করেন। কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সেসব প্রতিবেদনে সর্বজনীন শিক্ষার কথা আসেনি। তা ছাড়া কোনো ঔপনিবেশিক সরকারের কাছে কেউ আশাও

---

১ পরমেশ আচার্য, বাঙালি ভদ্রলোকের শিক্ষাচিন্তা: উনিশ শতক, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ২২৭।

২ পরমেশ আচার্য, বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১৬৭-১৬৮।

৩ পরমেশ আচার্য, ওই পৃ. ১১৩-১১৪।

৪ মেকলের শিক্ষানীতির সেই সুচতুর পরিকল্পনা-'To form a class who may be interpreters between us (The British) and the millions whom we govern, a class of persons Indian in blood and colour but English in test, in morals and in intellect'

করত না। কিছু সংস্কার পরবর্তীকালে হয়েছে তবে মূল কাঠামোকে ঠিক রেখে। স্বাধীন পাকিস্তান বা স্বাধীন বাংলাদেশে সেই ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতির আমূল পরিবর্তন করার জন্য ফলপ্রসূ উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি।

বেবিংটন মেকলের শিক্ষা বিষয়ক সুপারিশ পাস হয় ১৮৩৫ সালে। আর খুলনা শহরের পত্তন হয় ১৮৪২ সালে নয়াবাদে মহকুমা স্থাপনের মাধ্যমে।[৫] অর্থাৎ মেকলে সাহেবের শিক্ষানীতি ঘোষিত হবার মাত্র সাত বছর পর। মহকুমা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার অল্প কিছুকাল পরে প্রথম মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট মি. এ.জি.শ' নয়াবাদ থেকে তাঁর দফতর গুটিয়ে বর্তমান জেলা প্রশাসকের সরকারি বাসভবন এলাকায় একটি গোলপাতার ঘরে নতুন করে স্থাপন করেন। স্বাভাবিকভাবে তখন ভৈরব নদের পশ্চিম পাড়ে খুলনার গুরুত্ব বাড়তে থাকে। মামলামোকদ্দমা, ব্যাবসাবাণিজ্য, চাকরিবাকরির কারণে লোকজন এ এলাকায় বাস করতে শুরু করে এবং দ্রুত শহর গড়ে উঠতে থাকে। খুলনা মহকুমা ঘোষিত হবার ৪০ বছর পর অর্থাৎ ১৮৮২ সালে তা জেলায় উন্নীত হয়। জেলায় উন্নীত হবার পর খুলনা শহর আরও কলেবরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরই সাথে মানুষের বহুবিধ প্রয়োজনীয় চাহিদার পাশাপাশি শিক্ষার চাহিদাও অনুভূত হতে থাকে। বহিরাগত এবং চাকরিরত মানুষের সন্তানদের জন্য প্রয়োজন হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। তবে ১৮৪২ সালে মহকুমা, ১৮৮২ সালে খুলনা জেলা এবং ১৮৮৪ সালে খুলনা পৌরসভা হওয়া পর্যন্ত খুলনা শহরে কোনো প্রকার নিয়মিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল না।[৬] কিন্তু ইতোমধ্যে ব্রিটিশ শাসনের মূলকেন্দ্র কলকাতায় ইংরেজি মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষার প্রচলন শুরু হয়ে যায়। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সে সব শিক্ষার যাত্রা শুরু। সেই শিক্ষার প্রভাব কলকাতার বাইরে অন্যান্য স্থানের মতো খুলনা জেলাও কলকাতাকেন্দ্রিক এই শিক্ষাধারার প্রভাবের বাইরে ছিল না। সেই প্রভাবের ফলে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ রেখে খুলনা জেলার প্রাণকেন্দ্র এবং তার আশেপাশে বর্ধিষ্ণু এলাকাগুলোতে আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। ব্রিটিশদের প্রবর্তিত নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠ্যসূচি, শিক্ষাক্রম, পরীক্ষাপদ্ধতি ইত্যাদির প্রচলন শুরু হয়। এর আগে এই এলাকার পাঠশালাগুলোতে সুনির্দিষ্টভাবে এসব কিছুই ছিল না। ব্রিটিশদের এই পদ্ধতিগত শিক্ষাব্যবস্থাকে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন ছিল নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। সে জন্যে অন্যান্য এলাকার মতো খুলনা এলাকায়ও গড়ে ওঠে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

১৯০৮ সালে ও 'ম্যালী কর্তৃক লিখিত বৃহত্তর খুলনা জেলার গেজেটিয়ারে এই জেলার অতীত শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। তাতে

[৫] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ১।
[৬] প্রফেসর মো. বজলুল করিম, (প্রধান সম্পাদক), ইতিহাস ও ঐতিহ্যে খুলনার দৌলতপুর, খুলনা, মিতালী বইঘর, ১৪১০, পৃ. ১১।

দেখা যায় ১৯০১ সালের আদমশুমারির সময় সাক্ষর লোকের সংখ্যা গণনার্থে যে অনুসন্ধান কার্য চালানো হয়েছিল তাতে কেবল লিখতে এবং পড়তে সক্ষম ব্যক্তিকে সাক্ষর তালিকাভুক্ত করা হয়। তা সত্ত্বেও খুলনা জেলার সাক্ষর ব্যক্তির হার ছিল শতকরা মাত্র ৬.৯ জন। শতকরা ১২.৪ জন এবং ০.৮ জন মহিলা অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। তবে লক্ষণীয় যে, সাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা অন্যান্য জেলার তুলনায় খুলনা জেলায় বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কেননা অবিভক্ত বাংলার সাবেক প্রেসিডেন্সি বিভাগের মধ্যে চব্বিশ পরগনা জেলা ব্যতীত অপর কোনো জেলা খুলনার সমকক্ষ ছিল না। ১৮৮১ সাল থেকে এখানে শিক্ষার অগ্রগতি বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো। উক্ত বছরে খুলনা জেলার কেবল পুরুষের মধ্যে শতকরা ৬.৭ জন এবং মহিলাদের শতকরা ০.১ জন লিখতে পড়তে সক্ষম ছিলেন।[৭]

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থী সংখ্যা

শিক্ষা পরিদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৮৮১ সালে খুলনা জেলার সর্বমোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৭৫২টি এবং ছাত্রসংখ্যা ছিল ২২,৮২২ জন এবং ১৮৯১ সালে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১,২৫৭ এবং ছাত্রসংখ্যা ৩০,২৬৯তে দাঁড়ায়। পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে অনেক বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত সংকট যেমন ১৮৮৩-৯৪ সালে ফসলের অজন্মা, ১৮৮৫ সালে ঘূর্ণিঝড় এবং ১৮৯৭ সালে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ইত্যাদির ফলে ১৯০১ সালে বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ৯৮০তে দাঁড়ায়। তবে ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পায়নি বরং বেড়ে ৩৪,৩৫৬ হয়েছিল। ১৯০৬-০৭ সালে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১,১০২টি এবং ছাত্রসংখ্যা সর্বমোট ৪০,১১৪তে দাঁড়ায়। ওই বছর একটি চারুকলা শিক্ষার মহাবিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৮] এ সময়ে মোট স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও হাইস্কুল ছিল মাত্র ২৩টি এবং ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩,৬২৮ জন। তবে, ১৯০২ থেকে ১৯০৭ সালের মধ্যে এই পাঁচবছরে নারীশিক্ষার অগ্রগতি হয়েছিল উল্লেখযোগ্য হারে। ১৯০২ সালে সকলস্তরের স্কুলে ছাত্রীসংখ্যা ছিল ২,৬১০ জন। ১৯০৭ সালে সে সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৪,২২১ জনে। এ সময়ে এই বৃদ্ধির হার ছিল প্রায় ৬০%।[৯] উল্লেখ্য যে, ১৯০৬-০৭ সালে ১২৩টি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের সহ-শিক্ষা চালু ছিল এবং সেখানে ছাত্রী ছিল ২,৬৪০ জন। ১৯০৫ সালে খুলনায় হিন্দু ও মুসলিম পরিবারের বিধবা নারীদের জন্যে একটি প্রশিক্ষণ স্কুল চালু হয়। বিধবাদের সমাজে সম্মানজনকভাবে বাঁচার জন্যে তাঁদের আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ প্রশিক্ষণ স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে স্কুলের শিক্ষকদের স্ত্রীদেরও শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ ছিল। তবে, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে মাত্র দুবছর পরে ১৯০৭ সালে স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়।[১০] ওই বছরে অর্থাৎ

---

[৭] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৫৩।
[৮] ওই, পৃ. ৩৫৩।
[৯] K.G.M Latiful Bari, Bangladesh District Gazetteers Khulna, Dacca, Bangladesh Government Press, 1978. P. 249.
[১০] পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫১।

১৯০৭ সালে কয়েকজন আইনজীবী ব্যক্তিগত অর্থায়নে খুলনায় একটি ন্যাশনাল স্কুল চালু করেন। প্রথম অবস্থায় সেখানে ছাত্র ছিল ১০০জন। একই সময়ে খুলনায় সাধারণ স্কুলের পাশাপাশি ৬টি সংস্কৃত টোল, ১০টি মক্তব, ১১টি নৈশ বিদ্যালয় এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটি কোরআন স্কুল চালু ছিল। ওই কোরআন স্কুলে ছাত্র ছিল ২৫ জন। ১৯০৬-০৭ সালে খুলনা জেলার মোট জনসংখ্যার ৬১% ছিল মুসলমান এবং ৩৯% ছিল হিন্দু।[১১] কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষায় মুসলমানরা ছিল পশ্চাৎপদ, সে কারণে স্কুলগুলোতে মুসলমান শিক্ষার্থী ছিল তুলনামূলকভাবে কম। বিভিন্নস্তরের স্কুলে হিন্দু শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৬,৪৮৫জন, শতকরা ৬৬ভাগ। অন্যদিকে মুসলমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৩,৪৫৮ জন, শতকরা ৩৩.৫৫ ভাগ।[১২]

খুলনা জেলার অধিকাংশ বিদ্যালয় নদীর তীরবর্তী অধিকতর উন্নত স্থানসমূহে গড়ে উঠেছিল, কেননা এসব অঞ্চলে বিত্তশালী হিন্দু এবং মুসলিম লোকের বসতি ছিল। এতদঞ্চলের গ্রামগুলোও ছিল আয়তনে বৃহৎ এবং জনবহুল। কিন্তু, জেলার দক্ষিণাঞ্চলের চিত্র ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। সুন্দরবন এবং নদনদী প্রবাহিত কর্দমাক্ত ও নিম্নভূমির এ অঞ্চলে অধিবাসী বলতে ছিল অধিকাংশই নিম্নশ্রেণির হিন্দু ও দরিদ্র মুসলমান। সেজন্যে এই এলাকায় সামান্য কয়েকটি মধ্য ইংরেজি ও প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। একটি বিদ্যালয় থেকে অপরটি অনেক দূরে অবস্থিত ছিল। শিক্ষার্থীর উপস্থিতির হারও ছিল নগণ্য। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনেকই বন্ধ হয়ে যায় অথবা নামমাত্র খোলা থাকে। কারণ, চাষাবাদের মৌসুমে ভূমি চাষ, বীজ বপন, চারা রোপণ, ফসল কাটা ইত্যাদি কৃষিকাজে অভিভাবকগণ মাঠে ব্যস্ত থাকতেন। বিদ্যালয়ের ছাত্ররা তখন বিদ্যালয়ে হাজির না হয়ে বড়োদের সঙ্গে একত্রে কৃষিক্ষেত্রে কাজ করত এবং পরিবারের জন্য অন্যান্য কাজ যেমন- গো-মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদির দেখাশোনা এবং ক্ষেতখামারের অন্যান্য খুঁটিনাটি কাজ করত। বিদ্যালয়ে নাম থাকলেও তাদেরকে ওই মৌসুমে অনুপস্থিত থাকতে দেখা যেত। ফলে জেলার দক্ষিণাঞ্চলে শিক্ষার তেমন অগ্রগতি ঘটেনি।[১৩]

শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি উদ্যোগের একটি হলো শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির। উক্ত কর্মসূচি আওতায় বর্তমান সরকার বিভিন্ন প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদরাসাগুলোতে উপবৃত্তি প্রদান করে আসছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কর্মসূচির আওতায় কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। সেগুলো হলো:

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	নির্ণায়ক	তথ্য	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	সুবিধাভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য

[১১] পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫১।
[১২] পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫২।
[১৩] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৪।

১।	শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি	বিনামূল্যে বই বিতরণ	মাধ্যমিক বিদ্যালয়-৪২০ মাদরাসা-১৫১	-	মাধ্যমিক স্তরে -১,৫৯,২৪০ জন	
		উপবৃত্তি প্রদান	মাধ্যমিকা বিদ্যালয়-৪২০ মাদরাসা-১৫১	৪,৭৬,৮৮,৫০৮/-	মাধ্যমিক স্তরে- ৩০,৯৫৭ জন	
০২।		মিড ডে মিল	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১১৫৭ টি	-	১৬৭৬২৭ জন	মায়েদের মাধ্যমে টিফিন বক্সে খাবার আনার মাধ্যমে ১১৫৭ টি বিদ্যালয়ে মিডডে মিল চালু করা হয়েছে।
		বিনামূল্যে পাঠ্য বই বিতরণ	বিনামূল্যে পাঠ্য বই বিতরণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা=১৬৮৮	-	২২৮০১৩ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ১০৮৬৬৫৭ খাদ্য বই বিতরণ করা হয়েছে।	
		উপবৃত্তি প্রদান	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১১৫৭ টি	-	১৮৩৬৩২ জন	

সূত্র: জেলা শিক্ষা অফিস ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, খুলনা।

প্রাথমিক শিক্ষা

'সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা' স্লোগান অনুযায়ী ছয় থেকে দশ বছর পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার বয়স। আগে শহরাঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করত পৌরসভা আর গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা দপ্তর। এ ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই দেশের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেন। ফলে ঔপনিবেশিক আমলের অবহেলিত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

সারণি-১০৩

১৯২১ হতে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত বৃহত্তর খুলনার প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং ছাত্রসংখ্যা[১৪]

সাল	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শিক্ষার্থীসংখ্যা
১৯২১-২২	১,৪৫৫	৪৭,৯৩৯
১৯২২-২৩	১,৪৮২	৪৮,২৮৭
১৯২৩-২৪	১,৭৫১	৫৭,১৫২
১৯২৪-২৫	১,৮৪১	৬২,১৫৯

[১৪] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬২।

সাল	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শিক্ষার্থীসংখ্যা
১৯২৫-২৬	১,৭৭২	৬১,২২১
১৯২৬-২৭	১,৯৩৩	৬৬,৫৬২
১৯২৭-২৮	২,০৪০	৭২,০৬১
১৯২৮-২৯	২,০৭৩	৭৫,০৯১
১৯২৯-৩০	২,০২৪	৭৫,৩৫৪
১৯৩০-৩১	২,০৫৬	৭৫,৯৫১

১৯৬০-৬১ সালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল ১,২৯২টি এবং শিক্ষার্থীসংখ্যা ছিল ১,২৬,৯৭২ জন। ১৯৬৬-৬৭ সালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল ১,৩১৮টি এবং শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ১,৯৬,৯৯৪ জন।[১৫]

দেখা যায়, ১৯৩০-৩১ এর তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৯৬০-৬১ সালে হ্রাস পেলেও শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরবর্তী তথ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থী উভয় সংখ্যাই যে ক্রমান্বয়ে বেড়েছে তা লক্ষ করা যায়।

সারণি-১০৪

১৯৭১-৭২ থেকে ১৯৭৯-৮০ সাল পর্যন্ত এক বছর অন্তর প্রাথমিক শিক্ষার তথ্য[১৬]

সাল	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শিক্ষকসংখ্যা	শিক্ষার্থীসংখ্যা
১৯৭১-৭২	১,৩৪৫	৫,৪৪৭	২,৪৭,০০৩
১৯৭৩-৭৪	১,৮৬৫	৭,৬৪৫	৩,৮৯,২৮৪
১৯৭৫-৭৬	১,৭৬০	৭,১৩৮	৪,২৫,৮৮৭
১৯৭৭-৭৮	২,৩০০	৭,৯৬৮	৩,৫৯,১২২
১৯৭৯-৮০	২,০৯৫	৮,৫৭৪	৩,৪৫,০০১

বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসংখ্যা ১৯৭১-৭২ সালের তুলনায় ১৯৭৩-৭৪ সালে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ এক বছর পর ১৯৭৫-৭৬ সালে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সামান্য হ্রাস পেলেও শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৭৭-৭৮ সালে আবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষার্থীরসংখ্যা হ্রাস পায়। ১৯৭৯-৮০ সালের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা উভয়ই হ্রাস পায়।

সারণি-১০৫

২০১২ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার তথ্য[১৭]

সাল	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শিক্ষকসংখ্যা	শিক্ষার্থীসংখ্যা
২০১২-২০১৩	১৭৬৫	৭৬৪৪	২৮৪৮৬৫
২০১৩-২০১৪	১৭৪৪	১১৯১৩	২৮৬৯৯৬

[১৫] ওই, পৃ. ৩৬৩।

[১৬] ওই, পৃ. ৩৬৩।

[১৭] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৩।

২০১৪-২০১৫	১৬৯৮	৮২৬২	২৮৯৮৪৭
২০১৫-২০১৬	১৮৩২	৯৬১৬	২৭২৮০৮
২০১৬-২০১৭	১৮৮৪	৯৫৬০	২৫৬৮০৫

সারণি-১০৬
২০১২ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত খুলনা জেলার প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য[১৮]

সাল	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা			শিক্ষকসংখ্যা			শিক্ষার্থীসংখ্যা		
	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট
২০১২-১৩	৬২৫	১১৪০	১৭৬৫	৩৪২১	৪২২৩	৭৬৪৪	১৩১৭৮০	১৫৩০৮৫	২৮৪৮৬৫
২০১৩-১৪	১১২৩	৬২১	১৭৪৪	৫৫১৫	৬৩৯৮	১১৯১৩	২১৯৬৫১	৬৭৩৪৫	২৮৬৯৯৬
২০১৪-১৫	১১৩১	৫৬৭	১৬৯৮	৫৬৩৬	২৬২৬	৮২৬২	২২৯৮৬১	৫৯৯৮৬	২৮৯৮৪৭
২০১৫-১৬	১১৫২	৬৮০	১৮৩২	৫৭৬৯	৩৮৪৭	৯৬১৬	১৮৮৯৭৬	৮৩৮৩২	২৭২৮০৮
২০১৬-১৭	১১৫২	৭৩২	১৮৮৪	৬০১৫	৩৫৪৫	৯৫৬০	১৭৫৪৪৭	৮১৩৫৮	২৫৬৮০৫

সারণি-১০৭
২০১৭ সালে খুলনা জেলার উপজেলাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর তথ্য [১৯]

উপজেলা/সিটি করপোরেশন	স্কুল সংখ্যা	শিক্ষকসংখ্যা			শিক্ষার্থীসংখ্যা		
		পুরুষ	মহিলা	মোট	বালক	বালিকা	মোট
কয়রা	১৪০	৪১২	৩২০	৭৩২	৯৩২১	৯২২০	১৮৫৪১
সিটি করপোরেশন	১২৬	৩১০	৫৬৩	৮৭৩	১২০৬৫	১৬৯৩২	২৮৯৯৭
ডুমুরিয়া	২১৪	৬৪৯	৪৫৭	১১০৬	১৩২৩৮	১৩০৩২	২৬২৭০
তেরখাদা	১০২	২৩৭	৩০৭	৫৪৪	৭১১৫	৭৯১১	১৫০২৬
দাকোপ	১১৭	২৫৩	২৫৪	৫০৭	৫৫৪৫	৬৫২১	১২০৬৬
দিঘলিয়া	৫০	১২৯	১৮৬	৩১৫	৫৩৭৯	৫১৪২	১০৫২১
পাইকগাছা	১৬৭	৫১১	৫২২	১০৩৩	১০০৮৪	১০৭৬৯	২০৮৫৩
ফুলতলা	৫৫	৯৪	২৫৬	৩৫০	৩৮০৭	৪৫৯৮	৮৪০৫
বটিয়াঘাটা	১১৫	১৯০	৪১০	৬০০	৬৮৩৪	৬৮৫৪	১৩৬৮৮
রূপসা	৬৮	১০৮	২৭৮	৩৮৬	৬১৪৪	৭১১৬	১৩২৬০
সর্বমোট	১১৫৪	২৮৯৩	৩৫৫৩	৬৪৪৬	৭৯৫৩২	৮৮০৯৫	১৬৭৬২৭

সারণি-১০৮
২০১৭ সালে খুলনা জেলার নন-রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উপজেলাভিত্তিক সংখ্যা [২০]

উপজেলা/সিটি করপোরেশন	স্কুল সংখ্যা	শিক্ষকসংখ্যা			শিক্ষার্থীসংখ্যা		
		পুরুষ	মহিলা	মোট	বালক	বালিকা	মোট
কয়রা	১	৩	১	৪	২১	১৪	৩৫
সিটি করপোরেশন	৯	৩৩	২১	৫৪	৬৭৯	৫৫৪	১২৩৩

[১৮] ওই, পৃ. ৩৬৫।
[১৯] জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, খুলনা।
[২০] জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, খুলনা।

উপজেলা/সিটি করপোরেশন	স্কুল সংখ্যা	শিক্ষকসংখ্যা			শিক্ষার্থীসংখ্যা		
		পুরুষ	মহিলা	মোট	বালক	বালিকা	মোট
ডুমুরিয়া	-	-	-	-	-	-	-
তেরখাদা	-	-	-	-	-	-	-
দাকোপ	২	৫	৩	৮	৪৭	৬৩	১১০
দিঘলিয়া	১	২	০২	৪	২০৩	২২০	৪২৩
পাইকগাছা	-	-	-	-	-	-	-
ফুলতলা	১	২	২	৪	৬৫	৫৫	১২০
বটিয়াঘাটা	১	২	২	৪	৯৪	১০৩	১৯৭
রূপসা	-	-	-	-	-	-	-
সর্বমোট	১৫	৪৭	৩১	৭৮	১১০৯	১০০৯	২১১৮

বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মতো খুলনা জেলাতেও কিন্ডারগার্টেন স্কুলের প্রচলন শুরু হয়। আমাদের দেশে ব্রিটিশ আমল থেকে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি সাম্প্রতিককালে কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা পদ্ধতি শুরু হয়েছে। শিশুদের খেলাধুলার পাশাপাশি পড়ালেখার প্রতি মনোযোগী করে তোলার ক্ষেত্রে কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলো তাদের শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলন করেছে। শুরুতে এধরনের স্কুল জেলা শহরে প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে উপজেলাপর্যায়েও কিন্ডারগার্টেন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলো কখনো ব্যক্তিগত ও একাধিক ব্যক্তির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়।

সারণি-১০৯
২০১৭ সালে খুলনা জেলার উপজেলাভিত্তিক কিন্ডারগার্টেন স্কুল, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা[২১]

উপজেলা/সিটি করপোরেশন	স্কুল সংখ্যা	শিক্ষকসংখ্যা			শিক্ষার্থীসংখ্যা		
		পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
কয়রা	৭	১৮	১০	২৮	৩১২	৩০১	৬১৩
সিটি করপোরেশন	১৪৪	৪৫০	৬৫৪	১১০৪	১০৪৩০	৮৭৩৯	১৯১৬৯
ডুমুরিয়া	৩১	৮৬	১০০	১৮৬	১৬৭১	১৬৬৪	৩৩৩৫
তেরখাদা	৫	১৪	১৬	৩০	৪৮৮	৩৫৪	৮৪২
দাকোপ	৬	২০	২৮	৪৮	২০২	২৪২	৪৪৪
দিঘলিয়া	১৮	৫১	৩৭	৮৮	৫৮৬	৬১৫	১২০১
পাইকগাছা	২২	৩০	৪৩	৭৩	১০৭০	১১৩০	২২০০
ফুলতলা	২১	৬০	৬৬	১২৬	১২৪৪	১০৩৬	২২৮০
বটিয়াঘাটা	২১	৪৯	৬২	১১১	৫৮৭	৯৮৯	১৫৭৬
রূপসা	৩৭	১৭৯	৮০	২৫৯	১৪২৭	১৬০২	৩০২৯
সর্বমোট	৩১২	৯৫৭	১০৯৬	২০৫৩	১৮০১৭	১৬৬৭২	৩৪৬৮৯

[২১] ওই।

বাংলাদেশে সরকারি, বেসরকারি রেজিস্টার্ড, নন-রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) পরিচালিত স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়েছে। বেশকিছু এনজিও তাদের অন্যান্য কর্মকান্ডের সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার কার্যক্রমও চালিয়ে যাচ্ছে।

সারণি-১১০

খুলনা জেলার উপজেলাভিত্তিক এনজিও স্কুল, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর তথ্য নিম্নরূপ[২২]

উপজেলা/সিটি করপোরেশন	স্কুল সংখ্যা	শিক্ষকসংখ্যা			শিক্ষার্থীসংখ্যা		
		পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
বটিয়াঘাটা	১৮	২৩	৪০	৬৩	৪৫৫	৪৫১	৯০৬
দাকোপ	৫	৪	৮	১২	১৯৫	১০৬	৩০১
দিঘলিয়া	১১	২	৯	১১	৯২	৫৯	১৫১
ডুমুরিয়া	৫৭	০	৫৭	৫৭	৭২২	১,০২৬	১,৭৪৮
সিটি করপোরেশন	৫৩	১০৭	১২৩	২৩০	৫,৩৬১	৫,০৪৪	১০,৪০৫
কয়রা	৩৬	২০	১৬	৩৬	৩৬০	২৫১	৬১১
পাইকগাছা	৪	১	৩	৪	১২৯	১০৭	২৩৬
ফুলতলা	৫	৫	১৬	২১	৩০০	২৭১	৫৭১
রূপসা	১৯	০	১৯	১৯	২১৩	৩৮১	৫৯৪
তেরখাদা	১৯	০	১৯	১৯	১৯০	৩৪০	৫৩০
সর্বমোট	২২৭	১৬২	৩১০	৪৭২	৮,০১৭	৮,০৩৬	১৬,০৫৩

মিডল ইংলিশ এবং জুনিয়র হাইস্কুল

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণির প্রবর্তন না হওয়া পর্যন্ত (ডিসেম্বর, ১৯৫১) এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা, ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত মাইনর স্কুল ও দশম শ্রেণি (অর্থাৎ ম্যাট্রিকুলেশন/প্রবেশিকা, বর্তমানে এসএসসি মান পরীক্ষা পর্যন্ত) উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় (হাইস্কুল) স্তর ব্যবস্থা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণি পাঠ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর মাইনর স্কুলগুলো ওঠে যায় এবং এগুলোর অধিকাংশ অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠের ব্যবস্থাসহ জুনিয়র হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয়।

সারণি-১১১

মাধ্যমিক শিক্ষাবিষয়ক তথ্য[২৩]

সাল	মিডল ইংলিশ স্কুল	শিক্ষার্থী	মিডল ভারনাকুলার স্কুল	শিক্ষার্থী
১৯২১-২২	৫২	৭,০২৬	১১	৫৪
১৯২২-২৩	৫২	৭,২৬০	১১	৫৮৪
১৯২৩-২৪	৫৮	৭,৭৪৩	৯	৫৫৫
১৯২৪-২৫	৬২	৭,৭০৬	৮	৫৮৭

[২২] জেলা পরিসংখ্যান অফিস, খুলনা।
[২৩] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৭।

১৯২৫-২৬	৭১	৮,০১৫	৬	৪০৭
১৯২৬-২৭	৭০	৯,১০৪	৩	১২৯
১৯২৭-২৮	৭০	৮,৮৮১	০	০
১৯২৮-২৯	৭৫	৯,৮৫৭	০	০
১৯২৯-৩০	৮১	১০,৬৩১	০	০
১৯৩০-৩১	৮৩	৯,৭১৩	০	০

বর্ণিত ছকটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ১৯২১-২২ সালে মিডল ইংলিশ স্কুলের সংখ্যা ছিল ৫২টি এবং মিডল ভারনাকুলার স্কুলের সংখ্যা ছিল ১১টি। এই দশকের শেষে ১৯৩০-৩১ সালে মিডল ইংলিশ স্কুলের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে ৮৩টিতে দাঁড়ায়। কিন্তু মিডল ভারনাকুলার স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ১৯২৭-২৮ সালে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ছাত্রসংখ্যাও ভারনাকুলার স্কুলের তুলনায় ইংলিশ স্কুলে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। ১৯৩০-৩১ সালের পর হতে ১৯৫৯-৬০ পর্যন্ত কোনো জুনিয়র হাইস্কুলের পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না।

সারণি-১১২

১৯৬০-৬১ সালের জুনিয়র হাইস্কুল এবং মিডল ইংলিশ (এম.ই) স্কুলের তথ্য:[২৪]

	জুনিয়র হাই স্কুল	মিডল ইংলিশ স্কুল
বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১৭	৬২
শিক্ষকসংখ্যা	৮৬	১৫৬
ছাত্রসংখ্যা	১,৫৩৩	১,৩৫০

জেলা শিক্ষা অফিসারের তথ্য অনুযায়ী ১৯৬৫-৬৬ সালে সমগ্র খুলনা জেলার বালকদের জন্য ৭০টি জুনিয়র হাইস্কুল, ১৩টি মিডল ইংলিশ স্কুল (এম.ই) ছিল। বালিকাদের জন্য ছিল ১৭টি জুনিয়র হাইস্কুল এবং ৩টি মিডল ইংলিশ স্কুল।[২৫]

১৯৬৬-৬৭ সালে শিক্ষাক্ষত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। সরকারি আদেশে সকল মিডল ইংলিশ স্কুল জুনিয়র হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয়। ফলে পরবর্তী সময়ে সমগ্র খুলনা জেলার জুনিয়র হাইস্কুলের সংখ্যা দাঁড়ায় এরকম[২৬]

সারণি-১১৩

১৯৬৬ হতে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত খুলনা জেলার জুনিয়র হাইস্কুলের তথ্য

সাল	জুনিয়র হাইস্কুলের সংখ্যা		
	বালক	বালিকা	মোট
১৯৬৬-৬৭	৯৭	২১	১১৮

---

[২৪] ওই. পৃ. ৩৬৭।

[২৫] ওই. পৃ. ৩৬৮।

[২৬] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৮।

১৯৭১-৭২	৯৮	২৬	১২৪
১৯৭৩-৭৪	১১৩	৪৭	১৬০
১৯৭৪-৭৫	১১৪	৩৬	১৫০
১৯৭৫-৭৬	-	-	১৪৯
১৯৮২	৮৪	২৯	১১৩

প্রদত্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় জুনিয়র হাইস্কুলের সংখ্যা কোনো কোনো সময় কমেছে আবার কোনো কোনো সময় বেড়েছে। এর পেছনে স্বাধীনতা পরবর্তীকালের নানাবিধ আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ রয়েছে। তবে সামগ্রিক হিসেবে জুনিয়র হাইস্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে জনগণের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক জুনিয়র হাইস্কুলকে উন্নীত করা হয়েছিল। হাইস্কুল সংক্রান্ত প্রদত্ত তথ্যে দেখা যাবে যে হাইস্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি খুলনা জেলায় বরাবর অব্যাহত থেকেছে। জুনিয়র হাইস্কুলের মতো হ্রাস বৃদ্ধি ঘটেনি।

জুনিয়র হাইস্কুলের সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি থাকলেও ওই সব স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি ব্যাহত হয়নি বরং এখানে উল্লেখ্য যে, ছাত্র সংখ্যার তুলনায় ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি অধিক।[২৭]

সারণি-১১৪

জুনিয়র হাইস্কুলের শিক্ষার্থীর সংখ্যা-

বছর	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
২০০৮	১০৯৫	১৭৮২	২৮৭৭
২০০৯	১০৮১	১৮৪০	২৯২১
২০১০	৯৮৮	১৮২৪	২৮১২
২০১১	১০১২	১৭২১	২৭৩৩
২০১২	১০৭৬	১৯৮৪	৩০৬০
২০১৩	৭৯৭	২১৩১	২৯২৮
২০১৪	৮৪৭	১৬৩৪	২৪৮১
২০১৫	৮৮৩	১৫০৭	২৩৯০
২০১৬	৯১৭	১৫৩৮	২৪৫৫
২০১৭	৮২৩	১৪৮২	২৩০৮
মোট	৯৫১৯	১৭৪৪৩	২৬৯৬৫

প্রাথমিক শিক্ষার পর শুরু হয় মাধ্যমিক শিক্ষা। মাধ্যমিকপর্যায়ে সাধারণ শিক্ষার মধ্যে মানবিক, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে শিক্ষা দেওয়া হয়। তবে এই

[২৭] ওই. পৃ. ৩৬৯।

পর্যায়ে কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে। দশম শ্রেণির শিক্ষা সমাপ্তির পর মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের আগে খুলনা জেলাসহ অবিভক্ত বাংলার সমগ্র পরীক্ষা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ করত। পাকিস্তান আমলে ইস্ট পাকিস্তান সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ড পরে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এবং ১৯৬৩ সাল থেকে যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড দ্বারা খুলনা জেলার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রিত হয়।

১৯০৬-০৭ সালে সমগ্র খুলনা জেলায় ১টি সরকারি স্কুলসহ ২৩টি হাই ইংলিশ স্কুল ছিল। ১৯০৭-০৮ হতে ১৯২০-২১ সাল পর্যন্ত এ জাতীয় স্কুলের পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। ২০০৮ হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত জেলার হাই স্কুলের সংখ্যা ও ছাত্রসংখ্যা প্রদত্ত হলো।

সারণি-১১৫

২০০৮ হতে ২০১৭ পর্যন্ত খুলনা জেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তথ্য[২৮]

বছর	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা
২০০৮	৩৮৪	১৩২২৮৪
২০০৯	৩৮৫	১৩৩১৬৪
২০১০	৩৮৮	১৩২৫১২
২০১১	৩৮৮	১৩৪৭৮২
২০১২	৩৯০	১৩৮৯৫০
২০১৩	৩৯০	১৪১৩২২
২০১৪	৩৯০	১৪২৮১৪
২০১৫	৩৯৩	১৪৫৭২৮
২০১৬	৩৯৩	১৫০৮৪৪
২০১৭	৩৯৩	১৪৮৮৪০

১৯৩১-১৯৫৭ পর্যন্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কোনো পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। এর পরবর্তী সালের যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তা ছকে দেখানো হল:[২৯]

সারণি-১১৬

১৯৫৭ থেকে ৬৭ পর্যন্ত জেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তথ্য

সাল	বিদ্যালয়ের সংখ্যা		মোট	শিক্ষকসংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা
	সরকারি	বেসরকারি			
১৯৫৭-৫৮	১	১০৮	১০৯	০	০

[২৮] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭১।

[২৯] ওই. পৃ. ৩৭১।

১৯৬০-৬১	২	১০৪	১০৬	১,০২২	২৪,২২২
১৯৬১-৬২	৪	১২৩	১২৭	০	০
১৯৬৬-৬৭	৪	০	১৬০	১,৮৬০	৪৯,৩১৯

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর সমগ্র খুলনা জেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান ছকে দেখানো হলো:

সারণি-১১৭

১৯৭৩ হতে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে খুলনা জেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তথ্য [৩০]

সাল	বিদ্যালয়ের সংখ্যা			শিক্ষকসংখ্যা			শিক্ষার্থীসংখ্যা		
	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট
১৯৭৩-৭৪	৪	৪১৪	৪১৮	০	৪,৩৪৭	৪,৩৪৭	০	১,১৮,৩৬১	১,১৮,৩৬১
১৯৮১-৮২	৮	৫৮৭	৫৯৫	২০৭	৬,০৩১	৬,২৩৮	৫,০০০	১,৫৫,০০০	১,৬০,০০০
১৯৮৫-৮৬	১৫	৫২৫	৫৪০	২৮২	৬,২৩২	৬,৫১৪	৯,০০০	১,২৭,০০০	১,৩৬,০০০
১৯৮৯-৯০	২৯	৮০১	৮৩০	৫২৫	৮,৭৯৯	৯,৪২৪	১০,০০০	১,৯৯,০০০	২,০৯,০০০

১৯৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষে বর্তমান খুলনা জেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা সরকারি ৯, বেসরকারি ২১৬, মোট ২২৫টি। সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ২৬৪, বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ৩,২৪০, মোট ৩,৫০৪ জন। সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থী ৯৪,৪৮৬ জন।[৩১]

সারণি-১১৮

খুলনা জেলার উপজেলা/থানাভিত্তিক স্কুল, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী তথ্য ২০১৬ সাল পর্যন্ত

সরকারি স্কুল

থানা/ উপজেলা	স্কুলসংখ্যা	শিক্ষকসংখ্যা			শিক্ষার্থী		
		পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
ডুমুরিয়া	১	৮	২	১০	০	৩৪৮	৩৪৮
ফুলতলা	১	৫	৩	৮	০	১৯২	১৯২
বটিয়াঘাটা	০	০	০	০	০	০	০
দাকোপ	১	৮	২	১০	০	২০০	২০০
তেরখাদা	০	০	০	০	০	০	০
দিঘলিয়া	০	০	০	০	০	০	০
রূপসা	০	০	০	০	০	০	০
কয়রা	০	০	০	০	০	০	০
পাইকগাছা	২	১৬	১	১৭	৪৫৬	৫৬২	১০১৮
খুলনা সিটি	৫	৯৯	৮৭	১৮৬	২৭৭৯	৪২৭৪	৭০৫৩
সর্বমোট	১০	১৩৬	৯৫	২৩১	৩২৩৫	৫৫৭৬	৮৮১১

সূত্র: জেলা শিক্ষা অফিস, খুলনা।

[৩০] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭২।
[৩১] ওই।

সারণি-১১৯

খুলনা জেলার উপজেলা/ থানাভিত্তিক স্কুল, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী তথ্য ২০১৬ সাল পর্যন্ত

বেসরকারি স্কুল

থানা/ উপজেলা	স্কুল সংখ্যা	শিক্ষকসংখ্যা			শিক্ষার্থী		
		পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
ডুমুরিয়া	৬২	৫৮৯	১৮৭	৭৭৬	১০৫৬৫	১০৩৪৫	২০৯১০
ফুলতলা	১৮	১৭১	৮১	২৫২	৩৯৬২	৫৩০১	৯২৬৩
বটিয়াঘাটা	২৫	২২০	৭৩	২৯৩	৪১৮৩	৪৫৭৫	৮৭৫৮
দাকোপ	৪১	৩৬৯	৮১	৪৫০	৪৬৭৩	৫৪১৫	১০০৮৮
তেরখাদা	১৬	১৬৪	৪৯	২১৩	৩৭৫৮	৪৩৫১	৮১০৯
দিঘলিয়া	১৬	১৭১	৮১	২৫২	৪০৫৭	৫১৪৬	৯২০৩
রূপসা	২১	১৯৩	৭৬	২৬৯	৪৮০০	৬২৬৭	১১০৬৭
কয়রা	৩৬	৩৪৪	৭০	৪১৪	৬১২৯	৫৯০৯	১২০৩৮
পাইকগাছা	৫২	৫০০	১১০	৬১০	৭৭৮৯	৮৬৮৩	১৬৪৭২
খুলনা সিটি	৯৬	৮০২	৫৬১	১৩৬৩	১৭৫৮৫	২০৭০৭	৩৮২৯২
সর্বমোট	৩৮৩	৩৫২৩	১৩৬৯	৪৮৯২	৬৭৫০১	৭৬৬৯৯	১৪৪২০০

সূত্র: জেলা শিক্ষা অফিস, খুলনা।

মাধ্যমিক স্কুলে সাধারণত ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করা হয়। কিন্তু, বর্তমান সময়ে জেলা শহর ও উপজেলা শহরে অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করা হচ্ছে। এধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ‘কলেজিয়েট স্কুল’ হিসেবে অভিহিত করা হয়। ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়, নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং তারপর কলেজ পর্যায়ের শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে।

সারণি-১২০

খুলনা জেলার উপজেলা/ থানাভিত্তিক স্কুল, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী তথ্য ১০১৬ সাল পর্যন্ত

স্কুল এন্ড কলেজ (কলেজিয়েট স্কুল)

থানা/ উপজেলা	স্কুল সংখ্যা	শিক্ষকসংখ্যা			শিক্ষার্থী		
		পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
ডুমুরিয়া	১	২৩	৭	৩০	১৮১	১৬৮	৩৪৯
ফুলতলা	৫	১২১	৫৩	১৭৪	২০৪১	৯৬৭	৩০০৮
বটিয়াঘাটা	১	২২	৬	২৮	৪৬৯	৪৮৫	৯৫৪
দাকোপ	১	১১	৪	১৫	২৫১	১৯০	৪৪১
তেরখাদা	০	০	০	০	০	০	০
দিঘলিয়া	০	০	০	০	০	০	০
রূপসা	১	৪১	১০	৫১	৭৪৪	৫৮৩	১৩২৭
কয়রা	১	১১	৫	১৬	৬০০	২০১	৮০১
পাইকগাছা	২	৫৭	৮	৬৫	৭৬১	৫৭৩	১৩৩৪
খুলনা সিটি	৬	২০১	৭৮	২৭৯	৫১৯২	২৪০৪	৭৫৯৬
সর্বমোট	১৮	৪৮৭	১৭১	৬৫৮	১০২৩৯	৫৫৭১	১৫৮১০

সূত্র: জেলা শিক্ষা অফিস, খুলনা।

বর্তমানে খুলনা জেলায় ১১টি সরকারি কলেজ আছে। এর মধ্যে ৪টি মহিলা কলেজ এবং অন্য ৭টি মহিলা ও পুরুষ উভয়েই। ২০১৬ সাল পর্যন্ত এসব কলেজে ৫৫৪ শিক্ষক এবং ৫০,১০৪ জন শিক্ষার্থী (মহিলা ২১,০৯৫ ও পুরুষ ২৯০১১ জন) ছিল[৩২]।

মহাবিদ্যালয়/ কলেজ

আমাদের দেশে কলেজ শিক্ষা উচ্চ শিক্ষার পর্যায়ভুক্ত। সাধারণত কলেজগুলোকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায়-উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে খুলনা জেলায় মাধ্যমিক শিক্ষা শুরু হলেও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষা শুরু হয়েছে বিশ শতকের গোড়ায়। অর্থাৎ খুলনা জেলায় কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ শতকের প্রারম্ভিককালে ১৯০২ সালে খুলনার দৌলতপুরে। এর আগে খুলনা জেলার মানুষের উচ্চ শিক্ষার জন্যে নড়াইলের ভিক্টোরিয়া কলেজ ও কলকাতার বিভিন্ন কলেজে ভর্তি হতে হতো।

সারণি-১২১

১৯২১ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত খুলনা জেলার কলেজ ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা:[৩৩]

সাল	কলেজের সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা
১৯২১-২২	২	৬১২
১৯২২-২৩	২	৮১১
১৯২৩-২৪	২	১,০৬৩
১৯২৪-২৫	২	১,১১২
১৯২৫-২৬	২	১,০৩৫
১৯২৬-২৭	২	৯৪১
১৯২৭-২৮	২	৮২৩
১৯২৮-২৯	২	৭৮৪
১৯২৯-৩০	২	৭৫৬
১৯৩০-৩১	২	৫৮০

এই পরিসংখ্যানে দেখা যায়, উক্ত দশ বছরে কলেজের সংখ্যা অপরিবর্তিত হয়েছে, অন্যদিকে ছাত্রসংখ্যা ১৯২৩ থেকে ১৯২৬ সালের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়ে ক্রমে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত খুলনা জেলায় সরকারি ব্রজলাল কলেজ ১৯০২ সালে, সরকারি পিসি কলেজ, বাগেরহাট ১৯১৮ সালে, সরকারি মহিলা কলেজ ১৯৪০ সালে এবং সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এতে দেখা যায়, ব্রিটিশ আমলে সমগ্র খুলনা জেলায় মাত্র ৪টি কলেজ ছিল। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত কলেজের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩টি। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত

---

[৩২] EMIS 2016 (Education Management Information System).

[৩৩] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৭।

সরকারি ও বেসরকারি মোট কলেজের সংখ্যা ছিল ৪৭টি, শিক্ষকের সংখ্যা ১,১১৮ জন এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৮,৯৯৯ জন।[৩৪]

বর্তমানে খুলনা জেলায় ৯টি সরকারি কলেজ আছে। এর মধ্যে ৩টি মহিলা কলেজ এবং অন্য ৬টি মহিলা ও পুরুষ উভয়েই। ২০১১ সাল পর্যন্ত এসব কলেজে ৩৫৮ জন শিক্ষক এবং ৪২,০৬১ জন শিক্ষার্থী ছিল। খুলনা জেলার সরকারি ও বেসরকারি কলেজসমূহের মধ্যে ৩টি কলেজে উচ্চমাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত পাঠদান করা হয়।

সারণি-১২২

২০১১ সাল পর্যন্ত খুলনা জেলার উপজেলাভিত্তিক বেসরকারি কলেজের তথ্য:[৩৫]

উপজেলা/সিটি করপোরেশন	কলেজ সংখ্যা	শিক্ষকসংখ্যা			শিক্ষার্থীসংখ্যা		
		পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
বটিয়াঘাটা	৬	১২৮	৪১	১৬৯	১,৩১৮	৯১২	২,২৪০
দাকোপ	৫	১৪০	২৪	১৬৪	১,১১১	৮০৪	১,৯১৫
দিঘলিয়া	৩	৫৮	২৩	৮১	১,২৩২	৯০৬	২,১৩৮
ডুমুরিয়া	১০	৪১০	৫৯	৪৬৯	৩,৪৮৫	১,৭৪৩	৫,২২৮
সিটি করপোরেশন	১২	৩৫৯	১৮৮	৫৪৭	১৫,১৮২	১০,১৪৫	২৫,৩২৭
কয়রা	৪	১০৯	১০	১১৯	১,০২১	৯৮৫	২,০০৬
পাইকগাছা	৮	২০৫	৩৫	২৪০	১,৫০৭	১,৯৫০	৩,৪৫৭
ফুলতলা	৪	৫৫	৩১	৮৬	১,৫২০	১,১১৪	২,৬৩৪
রূপসা	৫	৯৪	৩৪	১২৮	৭৮৪	১,০৬৪	১,৮৪৮
তেরখাদা	৪	৭৫	১১	৮৬	৫১৬	৭৯৯	১,৩১৫
সর্বমোট	৬১	১,৬৩৩	৪৫৬	২,০৮৯	২৭,৬৭৬	২০,৪২২	৪৮,১০৮

সরকারি বিএল কলেজ

প্রাচীন কলেজ হিসেবে বিএল কলেজ একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। হিন্দু বালকদের ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে খুলনার দৌলতপুর 'হিন্দু একাডেমি' ১৯০২ সালে স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠানটির দুটো অংশ ছিল- একটি কলেজ অন্যটি চতুষ্পাঠী। সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে চতুষ্পাঠী ১৯০৩ সালে স্থাপিত হয়। ১৯০৭ সালে কলেজটি আই.এ এবং ১৯০৯ সালে বিএ ও বিএসসি শিক্ষা প্রদানের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করে। বিশিষ্ট আইনজীবী ব্রজলাল শাস্ত্রী এই কলেজটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কলেজটি ভৈরব নদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। প্রথমে কলেজটির সীমানা সংক্ষিপ্ত থাকলেও পরবর্তীকালে হাজী মুহম্মদ মহসীনের সৈয়দপুর ট্রাস্টের জমিতে সম্প্রসারিত হয়। বর্তমানে জমির পরিমাণ প্রায় ৪০ একর। কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ছাত্রসংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৭ সালে ঔপনবেশিক শাসন থেকে মুক্তি লাভের পর ভারত এবং পাকিস্তান দুটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে ছাত্রসংখ্যা ব্যাপকভাবে কমে যায়। ১৯৫১-৫২ সালে সমগ্র কলেজে মাত্র

[৩৪] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৯।

[৩৫] জেলা পরিসংখ্যান অফিস, খুলনা।

২২৮জন ছাত্র ছিল। ১৯৬৭ সালের ১ জুলাই কলেজটি সরকারিকরণ করা হয়। খুলনা জেলার উচ্চ শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে বি.এল কলেজের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বর্তমানে এই কলেজে ১৭টি বিষয়ে সম্মান এবং ১৮টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু আছে। এছাড়া উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক পাস কোর্স চালু আছে। কলেজে বর্তমানে শিক্ষকসংখ্যা ১৮০ জন এবং শিক্ষার্থীসংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার। কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসনের জন্যে ৭টি হোস্টেল আছে, এরমধ্যে ৫টি ছাত্রদের এবং ২টি ছাত্রীদের জন্যে। ছাত্র-ছাত্রীদের কলেজে আনা-নেওয়ার জন্যে ৪টি বাস রয়েছে। এছাড়া কলেজে ১টি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি আছে যেখানে বর্তমানে গ্রন্থসংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। কলেজ ক্যাম্পাসে একটি মসজিদ, মন্দির, শহিদমিনার, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ভাস্কর্য আছে।

সরকারি মহিলা কলেজ

১৯৪০ সালে স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, আগ্রহ এবং পৃষ্ঠপোষকতায় বয়রাতে একটি মহিলা কলেজ বেসরকারি কলেজ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তখন কলেজটির নাম ছিল খুলনা গার্লস কলেজ। খুলনার করোনেশন বালিকা বিদ্যালয়ে এর ক্লাস শুরু হয়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র কলেজ স্থাপন নিঃসন্দেহে প্রগতির স্বাক্ষর। ১৯৪২ সালে কলেজের উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা মহেন্দ্র কুমার ঘোষের পিতামহের নামানুসারে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয় রাজেন্দ্র কুমার গার্লস কলেজ (আর কে গার্লস কলেজ)। তখন এই কলেজটি ছিল খুলনা শহরের আহসান আহমেদ রোডে অবস্থিত একটি ভবনে। এই সাল পর্যন্ত টিনের ছাউনিযুক্ত গৃহে এই কলেজটি কার্যনির্বাহ করে। অতঃপর প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব নানাদিক থেকে বেড়ে যায়।

শিক্ষানুরাগী বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের সহযোগিতায় ও কিছু ধনী ব্যক্তিদের অর্থ সাহায্যে কলেজটি দিনে দিনে উন্নতি লাভ করে। ১৯৫১ সালে এর নাম পরিবর্তন করে পুনরায় নামকরণ করা হয় খুলনা গার্লস কলেজ। ১৯৬০ সালে কলেজটি সরকারি উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং খুলনা দৌলতপুরের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত বয়রা এলাকায় প্রায় ১৭ একর জমি নিয়ে কলেজ নির্মাণ শুরু হয়। ১৯৬৫ সালে কলেজটি এর বর্তমান অবস্থান বয়রাতে নবনির্মিত ভবনে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৬৮ সালে এই কলেজটি সরকারিকরণ করা হয়। ১৯৫২ সালে এ কলেজে স্নাতক (পাস), ১৯৬৩ সালে উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান, ১৯৬৪ সালে বাংলা ও অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক সম্মান কোর্স চালু হয়। বর্তমানে এ কলেজে ১১টি বিষয়ে স্নাতক সম্মান এবং ২টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর কোর্স পড়ানো হয়। কলেজে শিক্ষকসংখ্যা ৬০জন এবং শিক্ষার্থীসংখ্যা ৩ হাজারের বেশি।

আযম খান সরকারি বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়

১৯৫৩ সালে খুলনার তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় যশোর রোডে অবস্থিত মডেল হাইস্কুল ক্যাম্পাসে খুলনা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালে কলেজটির নিজস্ব কোনো জমি বা দালান ছিল না। পরবর্তীকালে হুকুমদখলের মাধ্যমে মোট ৩.৮৭ একর জমি কলেজের দখলাধীনে আনা হয়। অল্পসংখ্যক ছাত্র নিয়ে নৈশ বিভাগে কলেজটি প্রথম শুরু হয়। তদানীন্তন

প্রাদেশিক গভর্নর লে. জে. আযম খানের নামানুসারে কলেজের নামকরণ করা হয় 'আযম খান কমার্স কলেজ'। ১৯৬৩ সালে স্নাতকপর্যায়ে লেখাপড়া শুরু হয়। ১৯৭২ সালে হিসাব বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগে স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা হয়। ১৯৭৯ সালের ৭ মে থেকে কলেজটি সরকারি করা হয়। বর্তমানে এ কলেজটি জেলা শহরে বাবুখান রোডে অবস্থিত। জমির পরিমাণ ২.৭৮ একর। এছাড়া নগরের সাউথ সেন্ট্রাল রোডে ১.০৯ একর জমিতে ৪০ কক্ষ বিশিষ্ট ৪তলা একটি ছাত্রাবাস আছে। বর্তমানে এ কলেজে বাণিজ্য বিষয়ের ৪টি বিভাগে স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু আছে।

সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিশেষ করে আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজন আরও বেশি। সেদিকে লক্ষ্য রেখে খুলনা জেলায় বেশকিছু বৃত্তিমূলক সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এছাড়া প্রযুক্তি ও প্রকৌশল শিক্ষার জন্য খুলনায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ৩টি বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, খুলনা করোনেশন টেকনিক্যাল স্কুল, ভোকেশনাল ট্রেনিং স্কুল, ইউসেপ-মহসীন স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে এধরনের শিক্ষা প্রদান করা হয়।

সারণি-১২৩

২০১১ সাল পর্যন্ত খুলনা জেলার উপজেলাভিত্তিক টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর তথ্য [৩৬]

উপজেলা/সিটি করপোরেশন	প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	শিক্ষকসংখ্যা			শিক্ষার্থীসংখ্যা		
		পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
বটিয়াঘাটা	২	৯	৩	১২	১১৬	৪৭	১৬৩
দাকোপ	১	১২	১	১৩	২৮০	৮০	৩৬০
দিঘলিয়া	২	২০	৪	২৪	৩৮৬	২১৪	৬০০
ডুমুরিয়া	২	৭০	১১	৮১	৩১০	১১৫	৪২৫
সিটি করপোরেশন	১৯	১৮২	৩০	২১২	৬,৫৬৮	১,২৮৭	৭,৮৫৫
কয়রা	০	০	০	০	০	০	০
পাইকগাছা	৩	১৫	৪	১৯	১৬০	১৬৩	৩২৩
ফুলতলা	৩	১২	৪	১৬	১৯২	১০৪	২৯৬
রূপসা	৩	২৩	৫	২৮	১৮৫	৮৭	২৭২
তেরখাদা	৩	৭	৩	১০	২৫২	১৮২	৪৩৪
সর্বমোট	২৪	২৭৬	৩৩	৩০৯	৪,৫০৩	১,৩৪৬	৫,৮৮৯

[৩৬] জেলা পরিসংখ্যান অফিস, খুলনা।

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৬৭ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (বিআইটি) নামে যাত্রা শুরু করে। খুলনা শহরের ১০ কি.মি. উত্তরে তেলিগাতী নামক স্থানে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। নানা কারণে এর একাডেমিক সেশন শুরু হয় ১৯৭৪ সালের ৩ জুন। তখন এর শিক্ষক ছিল মাত্র ৭ জন। জমি নেওয়া হয় ১০০ একর। ১২০ জন ছাত্র নিয়ে প্রাথমিক যাত্রা শুরু হয়। বিভাগ খোলা হয় ৩টি-সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রিক অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। পরবর্তীকালে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভাগের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। দেশি ছাত্রছাত্রীর পাশাপাশি আশির দশকের শেষ সময় পর্যন্ত এখানে দেশের বাইরে থেকে বিশেষ করে নেপাল, ভারত, মিয়ানমার, ইরান, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশের শিক্ষার্থীরা পড়তে আসতো। বর্তমানে বিদেশি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা নেই বললেই চলে। ১৯৯৪ সালে বিআইটি খুলনায় স্নাতকোত্তর এবং ১৯৯৮ সালে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি প্রদানের কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর প্রতিষ্ঠানটি থেকে এম.ফিল ও পিএইচ.ডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়। ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বরে খুলনা বিআইটিকে প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয়। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানে তিনটি অনুষদে ১৬টি অ্যাকাডেমিক বিভাগে মোট ৩,৪৬০ জন শিক্ষার্থী লেখাপড়া করে। এ প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ২১৯জন শিক্ষক কর্মরত আছেন। ছাত্রছাত্রীদের আবাসনের জন্যে ৭টি আবাসিক হল আছে। এর মধ্যে ৬টি ছেলেদের ও ১টি মেয়েদের হল । প্রতিবছর এখানে ৭৮৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়।

শিক্ষক	৪০০+
শিক্ষার্থী	৫২০০জন
স্নাতক	৪১৭৮ জন
স্নাতকোত্তর	৯৮৬ জন
ডক্টরেট শিক্ষার্থী	২৯ জন

কুয়েটে ৩টি অনুষদের অধীনে মোট ১৮টি বিভাগ আছে। এর মাঝে ১৪টি বিভাগ থেকে স্নাতক ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

খুলনা সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

খুলনা শহরের খালিশপুর এলাকায় ১৯৬৩ সালে ৩২.৫ একর জমির ওপর এ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। এখানে ২৯টি ল্যাবরেটরি ও ওয়ার্কসপ রয়েছে। শুরুতে অল্প সংখ্যক শিক্ষার্থী ও শিক্ষক নিয়ে এর যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে এখানে ৮টি অ্যাকাডেমিক বিভাগে প্রতিবছর ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করে। প্রতিষ্ঠানটিতে বর্তমানে মোট শিক্ষক রয়েছে ১০০ জন এবং শিক্ষার্থী ৩,৮০০ জন। প্রতিবছর এখান থেকে ৭০০ জন শিক্ষার্থী পাস করে বের হয়। বর্তমানে মোট শিক্ষার্থী ৪,০০০।

খুলনা মেডিকেল কলেজ গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের আগে খুলনা জেলায় কোনো মেডিকেল কলেজ ছিল না। খুলনায় ১৯৭০ সালে মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু অনেক পরে ১৯৮০-৮১ সালে মেডিকেল কলেজের শিক্ষাবর্ষ শুরুর উদ্দেশ্যে ছাত্র ভর্তি করা হয়। তবে, দুর্ভাগ্যের বিষয় হাসপাতাল স্থাপিত হলেও কলেজ স্থাপনের কাজটি পিছিয়ে যায়। সে কারণে দীর্ঘ বিরতির পর খুলনা মেডিকেল কলেজের প্রকৃত যাত্রা শুরু হয় ১৯৯২ সালে। শিক্ষাবর্ষের শুরুতে ৫০জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। ২৫০ শয্যা হাসপাতাল ক্যাম্পাসেই এর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। হাসপাতালের জরুরি বিভাগ এবং এর সংলগ্ন ওয়ার্ড নিয়ে কলেজের শিক্ষাদান কেন্দ্র তৈরি হয়। ২০০১ সালে এখানে ২০টি বিভাগে মোট ৫৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মরত ছিলেন এবং ৫টি ব্যাচে মোট ২৪২ ছাত্র-ছাত্রী ছিল। বর্তমানে এখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১০৫০ জন।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯০ সালের আগে খুলনা শহরে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। ১৯৯০ সালের ৩১ জুলাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থাকল্পে বিজ্ঞান ও বাংলাদেশের জন্য উপযোগী বিকাশমান ডিসিপ্লিনসমূহের ওপর গুরুত্বারোপ করে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় আইন জাতীয় সংসদে পাস হয়। ১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষে নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও কৌশল, ব্যাবসায় প্রশাসন ও স্থাপত্য এই ৪টি ডিসিপ্লিনে ৮০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে এই উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীকালে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা চালানো হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমুখী বিষয়ের পাশাপাশি ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষে এখানে ৩টি সাধারণ বিষয় চালু হয়। বর্তমানে এখানে ২৪টি ডিসিপ্লিনে ৪,৬৮৮ শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে। এর মধ্যে বিদেশি শিক্ষার্থী ১২ জন। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে মোট শিক্ষক কর্মরত আছেন ৪০০ জন। ১০৫.৭৫ একর জমির ওপর ৩টি হল, ৫টি অনুষদ ও ১টি ইনস্টিটিউট, প্রশাসনিক ভবন ও একাডেমিক ভবন রয়েছে। ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে এখানে ভর্তি হয়েছে ১,৫৭৩ শিক্ষার্থী। এ পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০ জন পিএইচ.ডি এবং ৯ জন এম.ফিল ডিগ্রি অর্জন করেছে।

বর্তমানে ৬টি অনুষদের অধীনে ২৮টি ডিসিপ্লিন এবং ১টি ইনস্টিটিউট রয়েছে। বর্তমানে ডীন ০৫ জন। অ্যাকাডেমিক কর্মকর্তা ২৬৩ জন। শিক্ষার্থী প্রায় ৫,০০০জন (সূত্র: www.ku.ac.bd)

মাদরাসা শিক্ষা ব্রিটিশ সরকারের উদ্যোগে ১৭৮১ সালে স্থাপিত হয় কলকাতা মাদরাসা। তবে খুলনা জেলায় প্রথম কোনো মাদরাসা কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার সঠিক ইতিহাস জানা যায় না। দৌলতপুর মহসিন স্কুল ১৮৭৪ সালে হাই স্কুলে রূপান্তর হওয়ার পর আরবি-ফারসি শিক্ষার জন্য স্কুলের শাখাস্বরূপ একটি মাদরাসা শ্রেণি খোলা হয়। এরপর ইসলামি শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে খুলনা শহরে ১৯০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইউসুফিয়া মাদরাসা। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শেখ মো.

ইউসুফ। তিনি প্রায় একক উদ্যোগে তাঁর বাড়ির পাশে এই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এটা ছিল হাই মাদরাসা নামে একটা নিউ স্কিম সিনিয়র মাদরাসা। তখন খুলনা অঞ্চলে মুসলমানরা ছিল শিক্ষা-দীক্ষায় চরমভাবে অনগ্রসর। তাঁর এই মাদরাসা স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল অনগ্রসর, পশ্চাৎপদ, দুর্দশা ও হতাশাগ্রস্ত মুসলমান যুবকদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে নতুন পথের সন্ধান দেওয়া। ইউসুফিয়া মাদরাসার অনুসরণে খুলনা জেলার বর্তমান রূপসা থানার কাজদিয়া গ্রামে একটা হাই মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯১৪ সালে দৌলতপুরের স্থানীয় কিছু বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে দৌলতপুর জুনিয়র মাদরাসা। ১৯০২ সালে প্রতিষ্ঠিত ইউসুফিয়া মাদরাসা ১৯৪৭-এর পরে ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। দেশ বিভাগের পর পঞ্চাশের দশকের শুরুতে খুলনা শহরে তিনটি মসজিদ ছিল। এগুলো হলো টাউন জামে মসজিদ, টুটপাড়া ও শেখপাড়া মসজিদ। এসব মসজিদে কিছু মক্তব ও ফোরকানিয়া মাদরাসা চালু ছিল বলে জানা যায়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে এ এলাকার মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষার প্রসারের একটা পরিবেশও তৈরি হয়। খুলনা টাউন মসজিদে এক সভায় ১৯৫২ সালের ২ এপ্রিল আলিয়া মাদরাসার শুভ উদ্বোধনের দিন ধার্য হয়। খুলনা শহরের প্রথম পূর্ণাঙ্গ মাদরাসা এটাই। টুটপাড়া জামে মসজিদে তখন অল্প কিছু সংখ্যক ছাত্র নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে খুলনা শহরের খানজাহান আলী রোডে বিশাল জায়গায় সুরম্য ভবনে এ মাদরাসার কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। স্বাভাবিক পাঠ্যসূচির বাইরেও এখানে শিক্ষার্থীদের কর্মমুখী শিক্ষাদানের জন্য একটা ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার চালু আছে। তাছাড়া দর্জি বিজ্ঞান, কাঠ শিল্প এবং কম্পিউটার শিক্ষা দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে খুলনায় আরও অনেক বড়ো বড়ো মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকারি, বেসরকারি ও বিদেশি সাহায্যপুষ্ট এসব মাদরাসার ছাত্রসংখ্যাও যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে খুলনা জেলায় কয়েকটি মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মেয়েদের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে এ মাদরাসাগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া সরকারি সাহায্য ব্যতীত স্থানীয় কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত ও অন্যান্য সাহায্যপুষ্ট বেশকিছু কওমি মাদরাসাও আছে।

সারণি-১২৪

১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৭১-৭২ সাল পর্যন্ত ৩-৪ বছর অন্তর খুলনা জেলার সর্বপ্রকার মাদরাসার সংখ্যা এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা[৩৭]

বছর	মাদরাসার সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা
১৯৬০-৬১	৫৫	৩,০৮৩
১৯৬৬-৬৭	৫৭	৮,০০৮
১৯৭১-৭২	১৭৪	৭,১৫৮

[৩৭] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৭।

সারণি-১২৫

১৯৮২ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বৃহত্তর খুলনা জেলায় বিভিন্ন প্রকার মাদরাসার সংখ্যা[৩৮]

বছর	দাখিল	আলিম	ফাজিল	কামিল	মোট
১৯৮২	১০৪	২৮	২৬	১	১৫৯
১৯৮৩	১০৩	৩০	২৬	১	১৬০
১৯৮৪	১১১	৩০	২৬	১	১৬৮
১৯৮৫	১১১	৩০	২৭	১	১৭৩
১৯৮৬	১৪৬	৩৪	২৮	১	২০৯
১৯৮৭	১৮৬	৩৪	২৭	২	২৪৯
১৯৮৮	২০১	৩৫	২৬	২	২৬৪
১৯৮৯	২২৩	৩৫	২৬	৩	২৮৭
১৯৯০	২৩১	৩৯	২৪	৩	২৯৭

১৯৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষে খুলনা জেলায় (বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা বাদে) মোট মাদরাসা ছিল ৬৭টি, শিক্ষকসংখ্যা ছিল ১,১৫২ জন এবং শিক্ষার্থীসংখ্যা ছিল ২৪,২১২ জন। ২০০৬ সালে খুলনা জেলার দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল- এই ৪ ক্যাটাগরিতে মোট ১৩১টি মাদরাসা ছিল। এসব মাদরাসার ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪৮,১২২ জন এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ২,০৪০ জন।[৩৯]

সারণি-১২৬

২০১১ সালে খুলনা জেলার উপজেলাভিত্তিক মাদরাসা, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা:[৪০]

উপজেলা/সিটি করপোরেশন	মাদরাসা সংখ্যা	শিক্ষকসংখ্যা			শিক্ষার্থীসংখ্যা		
		পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
বটিয়াঘাটা	৬	৫৯	১০	৬৯	৮৬২	৯১৭	১,৭৭৯
দাকোপ	৫	৬৬৮	৪	৭২	৭৪৬	৯,০৯০	১,৬৫৫
দিঘলিয়া	১	১২	২	১৪	২১৬	১৯১	৪০৭
ডুমুরিয়া	২৬	৪৫০	৫৫	৫০৫	৩,৫৭৬	১,০৯০	৪,৬৬৬
সিটি করপোরেশন	১৭	১৯৮	৫৯	২৫৭	৪,২৮৩	১,৬৪০	৫,৯২৩
কয়রা	২৭	৩৭০	৩৫	৪০৫	৫,৩৫০	১,৯০০	৭,২৫০
পাইকগাছা	২১	২৭৫	১০	২৮৫	২,৪১০	২,৭১০	৫,১২০
ফুলতলা	৬	৭৩	১৭	৯০	৭৮৭	৬৭১	১,৪৫৮
রূপসা	৯	১০৩	১০	১১৩	১,৩৯৭	৯৮৬	২,৩৮৬
তেরখাদা	৬	৮৩	১৩	৯৬	১,৭৭১	১,৩৩৪	৩,১০৫
সর্বমোট	১২৪	১,৬৯১	২১৫	১,৯০৬	২১,৩৯৮	১২,৩৪৮	৩৩,৭৪৬

---

[৩৮] ওই, পৃ. ১৬৮।

[৩৯] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭।

[৪০] জেলা পরিসংখ্যান অফিস, খুলনা।

সারণি-১২৭
২০১১ সাল পর্যন্ত খুলনা জেলার উপজেলাভিত্তিক কওমি মাদরাসা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর তথ্য:[৪১]

উপজেলা/সিটি করপোরেশন	মাদরাসা সংখ্যা	শিক্ষকসংখ্যা			শিক্ষার্থীসংখ্যা		
		পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
বটিয়াঘাটা	৫	১৩	০	১৩	৪২৬	০	৪২৬
দাকোপ	০	০	০	০	০	০	০
দিঘলিয়া	০	০	০	০	০	০	০
ডুমুরিয়া	৫	৮৭	৯	৯৬	৮২২	৪২৫	১,২৪৭
সিটি করপোরেশন	২০	৪৫	১৮	৬৩	১,১৩৩	৩৭৩	১,৫০৬
কয়রা	৫	২০	০	২০	৩০০	০	৩০০
পাইকগাছা	১৩	৯১	০	৯১	৫২৪	০	৫২৪
ফুলতলা	০	০	০	০	০	০	০
রূপসা	৫	২৮	০	২৮	৫৩৩	০	৫৩৩
তেরখাদা	২১	৪৬	১৪	৬০	৭৯৫	৪৩৬	১,২৩১
সর্বমোট	৭৪	৩৩০	৪১	৩৫৮	৪,৫৩৩	১,২৩৪	৫,৪৯৭

সারণি-১২৮
২০১১ সাল পর্যন্ত খুলনা জেলার উপজেলাভিত্তিক এবতেদায়ি মাদরাসা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর তথ্যঃ[৪২]

উপজেলা/সিটি করপোরেশন	মাদরাসা সংখ্যা	শিক্ষকসংখ্যা			শিক্ষার্থীসংখ্যা		
		পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
বটিয়াঘাটা	১৩	৩৯	১২	৫১	১,১৫৭	১,১৫৪	২,৩১১
দাকোপ	৩	৬	০	৬	৩০০	৭০	৩৭০
দিঘলিয়া	২	৮	০	৮	১৫৪	৯২	২৪৬
ডুমুরিয়া	৭	২৩	৬	২৯	৫৬২	৪৮৪	১,০৪৬
সিটি করপোরেশন	১৯	৬৬	১৬	৮২	১,১৪৪	৩৫৬	১,৫০০
কয়রা	৪	৮৮	২০	১০৮	৩০০	২৪৮	৫৪৮
পাইকগাছা	২৪	৯৬	০	৯৬	৮০৫	৭২১	১,৫২৬
ফুলতলা	৯	৮১	০	৮১	৫৪৬	৫৩৫	১,০৮১
রূপসা	৩	১২	০	১২	২৩৯	১৬৪	৪০৩
তেরখাদা	২	৬	২	৮	১৫০	১১৫	২৬৫
সর্বমোট	৮৬	৪২৫	৫৬	৪৮২	৫,৩৫৭	৩,৯৩৯	৯,২৯৬

শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়

১৯৬৮ সালে খুলনা শহরের উত্তরপশ্চিম কোণে প্রায় ১২ কি.মি. দূরে তেলিগাতী নামক স্থানে খুলনা শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এ কলেজের ক্লাস শুরু হয় ১৯৭১ সালের ১ জুলাই। কলেজের জন্য তখন জমি নেওয়া হয় ৭ একর। শুরুর সময় শিক্ষকসংখ্যা ছিল ১৬ জন। ১৯৭৪-৭৫ সালে এর ছাত্র সংখ্যা

[৪১] ওই।
[৪২] জেলা পরিসংখ্যান অফিস, খুলনা।

দাঁড়ায় প্রায় ৩০০জন। ১৯৯৩-৯৪ সালে এ কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪৯০ জন এবং শিক্ষকসংখ্যা ছিল ৩১জন। আগে কলেজটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত থাকলেও বর্তমানে তা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে।

প্রাইমারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট খুলনায় 'গুরু ট্রেনিং' স্কুল নামে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। ১৯৫১ সালে তৎকালীন সরকার পিটিআই স্কুলে রূপান্তরিত করে। এ সময়ে এর শিক্ষাক্রমকেও পুনর্বিন্যস্ত করা হয়। এতে পূর্ববর্তী শিক্ষাক্রম থেকে পিটিআইয়ের শিক্ষাক্রম আরও সমৃদ্ধ হয়। ১৯৬৬-৬৭ সালে খুলনা জেলার খুলনা, বাগেরহাট এবং সাতক্ষীরা মহকুমায় (বর্তমানে জেলা) ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট চালু হয়। খুলনার প্রতিষ্ঠানটি পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গতা পায়। বর্তমানে শহরের খানজাহান আলী রোডে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিআই) অবস্থিত। এই ইনস্টিটিউটে বর্তমানে ২৯ জন প্রশিক্ষক আছেন এবং প্রতিবছর ২০০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে।

সিটি আইন মহাবিদ্যালয় ১৯৬৫ সালে খুলনা সিটি ল' কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। খুলনায় আইন শিক্ষার সবচেয়ে পুরাতন এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এটি। খুলনা অঞ্চলের মানুষের মধ্যে আইন শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে মূলত এই কলেজটি স্থাপিত হয়। শুরুতে অস্থায়ীভাবে এর সান্ধ্যকালীন ক্লাস শুরু হয় শহরের হ্যানে রেলওয়ে স্কুলে। প্রথমদিকে এর ছাত্র এবং শিক্ষকসংখ্যা খুব কমই ছিল। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে এর শিক্ষার্থী ও শিক্ষকসংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৯৬৭ সালে কলেজটি আহসান আহমেদ রোডে তৎকালীন কলকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিস্টার যশো প্রকাশ মিত্র ও একই হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি জ্যোতিপ্রকাশ মিত্রের পিতা ভুবনচন্দ্র মিত্রের বাড়িতে ওঠে আসে। এ বাড়িতে 'ল কলেজ আসার আগে খুলনা গার্লস কলেজের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে এ কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬০৫জন।

কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট খুলনায় এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ১৯৩৭ সালে খুলনার পুরাতন দৌলতপুর-সাতক্ষীরা মহাসড়কের পাশে স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করেছিলেন খুলনার প্রথম কলেজ সরকারি বিএল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব ব্রজলাল শাস্ত্রী। প্রতিষ্ঠানটির পূর্ণনাম ছিল কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সংক্ষেপে 'কৃষি প্রশিক্ষণায়তন'। কৃষিপ্রধান এ দেশের মানুষের কৃষি সম্পর্কে বিজ্ঞান ও বাস্তবসম্মত শিক্ষাদান অপরিহার্য। সেই কারণে ব্রজলাল শাস্ত্রী এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন। শুরুতে এ প্রতিষ্ঠানের জন্যে ১১০ একরের মতো জমি অধিগ্রহণ করা হয়। এখানে ভর্তির সর্বনিম্ন যোগ্যতা বিজ্ঞানসহ দ্বিতীয় শ্রেণির এসএসসি। এখানে দুধরনের কোর্স চালু আছে- মেক আপ কোর্স ও নিয়মিত কোর্স। বাংলাদেশ সরকারের কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সিলেবাস অনুযায়ী এর পাঠ্যসূচি

পরিচালিত হয়। এখানে ৯টি বিভাগ রয়েছে- কৃষিতত্ত্ব, খামার যন্ত্রপাতি, মৎস্য ও পশুপালন বিদ্যা, জলবায়ু ও খামার এবং গার্হস্থ্য অর্থনীতি। এই প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ৯ জন প্রশিক্ষক আছেন এবং প্রতিবছর এখানে ২৪০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানটিকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্যে জাতীয় সংসদে একটি আইন পাস হয়েছে। অতিদ্রুত এর বাস্তবায়ন শুরু হবে।

শারীরিক বিকলাঙ্গ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

১৯৬২ সালে সমাজসেবা অধিদপ্তরের উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। সমাজের প্রতিবন্ধীরা যাতে বোঝা না হয়ে কর্মক্ষম জনশক্তিতে পরিণত হতে পারে সেই লক্ষ্যেই এ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। এ বিদ্যালয়টি প্রথমে শুরু হয় শহরের মৌলভী পাড়ায় একটি ভাড়া বাড়িতে। ১৯৬৫ সালে যশোর-খুলনা মহাসড়কের পাশে গোয়ালখালী নামক স্থানে ৪ একর জমির উপরে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কুলটিতে দুটি শাখা রয়েছে- একটি অন্ধ বিদ্যালয় এবং অন্যটি মূক ও বধির বিদ্যালয়। স্কুলের সঙ্গেই এ দুটোরই ওয়ার্কশপ আছে। এখানে মূল প্রতিষ্ঠানের পরিচালক থাকেন একজন এবং স্কুলের দুই শাখায় থাকেন দুজন প্রধান শিক্ষক। অন্ধ শাখায় প্রধান শিক্ষকসহ সহকারী শিক্ষক আছেন ৬ জন এবং বধির শাখায় শিক্ষকের সংখ্যা মোট ৭ জন।

ইংরেজি মাধ্যম স্কুল

আমাদের দেশে মূলধারার শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার প্রচলন শুরু হয়েছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে ঢাকাতে প্রথম ইংরেজি মাধ্যম স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব স্কুলে প্লে, বাণিজ্যিক, কেজি শ্রেণি থেকে 'এ' লেভেল/ 'ও' লেভেল পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। খুলনা জেলা শহরে বেশ কয়েকটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরমধ্যে সাউথ হেরাল্ড স্কুল, রোজডেল স্কুল, ক্লাসিক ইংলিশ স্কুল, টিউলিপ ইংলিশ স্কুল ও ব্লু বার্ড স্কুল অন্যতম।

সারণি-১২৯
১৯২১ সালে ও পরবর্তী আদমশুমারিসমূহে প্রাপ্ত খুলনা জেলার সাক্ষরতার তথ্যাবলি[৪৩]

বছর	জনসংখ্যা	সাক্ষরের সংখ্যা			সাক্ষরের হার		
		পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
১৯২১	১৪,৬৮,৯৭০	০	০	০	০	০	১০.৬৯
১৯৩১	১৬,২৬,১৪৮	১,২২,৩৫১	১৫,৪৫৫	১,৩৭,৮০৬	১৪.৪	২.০	৮.৫০
১৯৪১	১৯,৪৪,৪১৮	০	০	০	০	০	১৪.৫৯
১৯৫১	২০,৫৭,৫০৬	৩,৮৯,৫৬৫	১,০৭,৬১০	৪,৯৭,১৭৫	৩৫.৮	১০.৯	২৩.৯৫

তথ্যসূত্র: Population and Housing Census-2011, Community Report:Khulna.

১৯৬১ সালে খুলনা জেলায় পুরুষ সাক্ষরতার হার ৩২.৫৮% এবং মহিলা ১১.১৮%, মোট ২২.৪০%। ১৯৭৪ সালে পুরুষ সাক্ষরতার হার ৩৬.০% এবং

[৪৩] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৬।

মহিলা ১৭.৭%, মোট ২৭.২%। ১৯৮১ সালে পুরুষ সাক্ষরতার হার ৩৪.২% এবং মহিলা ১৭.৮%, মোট ২৬.৩%। ১৯৯১ সালে খুলনা জেলায় (বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা ব্যতীত) মোট জনসংখ্যা ২০,০২,৮৫১ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১০,৪৮,৯২৮ এবং মহিলা ৯,৫৩,৯২৩ জন। গড় শিক্ষার হার ৩৪.৬৩%।[৪৪] ২০০৫ সালের হিসাব অনুযায়ী খুলনা জেলার মোট জনসংখ্যা ২৩,৩৪,২৮৫ জন। পুরুষ ৫১.৮৭% এবং মহিলা ৪৮.১৩%। মোট শিক্ষার হার ৪৩.৯০%। পুরুষ ৫২.২০% এবং মহিলা ৩৩.৪০%।

সারণি-১৩০
২০০১ ও ২০১১ সালের খুলনা জেলার উপজেলাভিত্তিক সাক্ষরতার হার

উপজেলা/সিটি করপোরেশন	সাল ২০০১			সাল ২০১১		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
বটিয়াঘাটা	৪৬.৬০	৪৯.০০	৫৩.০০	৫৯.০	৫০.৭	৫৪.৯
দাকোপ	৫৫.৫২	৪২.৪	৪৯.৩৪	৬২.৯	৪৯.১	৫৬.০
দিঘলিয়া	৫৯.২০	৫০.৬৪	৫৫.১৫	৫৬.৬	৫১.৯	৫৪.৩
ডুমুরিয়া	৪১.৯১	৫৫.০৪	৪৮.৭০	৫৭.৪	৪৭.৭	৫২.৬
সিটি করপোরেশন	৭৪.৬৯	৬৬.১৭	৭০.৪	৭৫.৮৪	৬৯.২	৭২.৬৮
কয়রা	৫৩.১৭	৩৫.৯৯	৪৪.৪৬	৫৫.৮০	৪৫.২	৫০.৪
পাইকগাছা	৫৩.৯৩	৩৭.৩৩	৪৫.৮৪	৫৮.৬০	৪৭.১	৫২.৮
ফুলতলা	৬২.৮০	৫২.৯০	৫৮.০০	৬২.৮০	৫৫.৩	৫৯.০
রূপসা	৫৮.২৩	৫০.৯৩	৫৪.৭০	৬০.৯০	৫৫.৬	৫৮.২
তেরখাদা	৪৮.১২	৪১.৮০	৪৫.০৬	৪৯.৯০	৪৭.৭	৪৮.৫
সর্বমোট	৬৩.৩০	৫১.৮০	৫৭.৮০	৬৪.৩০	৫৫.৯	৬০.১

তথ্যসূত্র: Population and Housing Census-2011, Community Report:Khulna, p-11-63.

[৪৪] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৬।

অধ্যায়-১২

ভাষা ও সাহিত্য

১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুসারে এ জেলায় প্রায় ৯৯.০৮ শতাংশ লোকই ছিল বাংলাভাষী। উক্ত আদমশুমারি অনুসারে দেখা যায় এ জেলায় বসবাসকারীদের মধ্যে ভাষাভাষী হিসেবে (১) ভারতীয় আর্য শাখা- (ক) বাংলা-২৪,২৬,২২৭ জন, (খ) উর্দু-১,৯১,৭১ জন, (গ) হিন্দি-১,০৪৯ জন, (ঘ) গুজরাটি=৮,৯২, (ঙ) সিন্ধি-২৬৭, (চ) পাঞ্জাবি-১৭৯ জন, (ছ) উড়িয়া-৪৫ জন, (জ) মারাঠি-৪০ জন, (ঝ) আসামি-৩ জন। (২) ইউরোপীয় শাখা- ইংরেজি-১১২ জন। (৩) ইরানি শাখা-পশতু-১২৪ জন, ফারসি-৯ জন, বালুচি-৪ জন। (৪) সেমিটিক শাখা-আরবি-১৪ জন। (৫) দ্রাবিড় গোষ্ঠী-ব্রাহুই-৪ জন। (৬) তিব্বতি চীনা গোষ্ঠী- বর্মী-৬ জন। (৭) অন্যান্য- আসামীয় বর্মী উপভাষা-৫৭৪ জন ছিল। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এ জেলার অধিবাসীদের মধ্যে এক বা একাধিক ভাষার ব্যবহার হতো। তার মধ্যে ছিল, বাংলা, উর্দু, ইংরেজি, হিন্দি, সংস্কৃত, সিন্ধি, পাঞ্জাবি, পশতু ও অন্যান্য। ১৯৯১ সালের আদমশুমারিতে বিভিন্ন ভাষার ব্যবহারের কোনো চিত্র পাওয়া যায় না। সেখানে দেখানো হয়েছে এ জেলার অধিকাংশ অধিবাসীই বাংলা ভাষাভাষী।

খুলনার উপভাষা

ড. জর্জ গ্রিয়ারসন তাঁর প্রণীত 'কেন্দ্রীয় বাংলা ভাষার পূর্বাভাস' গ্রন্থে খুলনা জেলার উপভাষার উদাহরণ দিয়েছেন। তাঁর মতে, এ জেলার ভাষায় ঢাকা, বরিশাল এবং পশ্চিম বাংলার বাংলাভাষার যোগসূত্র রয়েছে। তিনি খুলনা জেলার উপভাষার যে উদাহরণ দিয়েছেন তা নিম্নরূপ:

"অ্যাকজন মানশির দুই ছওয়াল ছিলো। তার মধ্যে ছোট্টা জোন তার বাবার কলো, বাপ, আমার ভাগে যে জিনিস পড়ে, সে আমরে দাও। তারপর তিনি তার বিষয় তারগো দুইজনের ভাগ করে দেলেন। শেষে ওই ছোটো ছওয়াল তার সব লগে দূর দেশে যাওয়ার কিছুদিন মধ্যে বেওজন খরচ করে সব উড়োয়ে দিলো। সেসব খরচ করার পর সেই জায়গায় বড়ো মানান্তও হলো, আর তার কষ্টো হতে লাগলো। তখন সে ওই দেশের অ্যাকজোন লোকের কাছে যেয়ে পড়লো। সে তাওকে মাঠে সুওর চরাতে দিলো। সুওরে যে খোশা খাতো, সে তা খাতে ইচ্ছা করতো, তা তারে কেউ দিলো না। যখন সে বুঝতে পারলো, সে কলো যে আমার বাপের কতো মাইনের চাকর অনেক খোরাক পায় আর পাকে দিতি পারে, আর আমি ক্ষিধায় মারা যাই। আমি ওঠে আমার বাপের কাছে যাবো, আর তানাওকে কবো, বাপ। আমি ঈশ্বরের কাছে আর তোমার কাছে পাপ করিছি। আমি আর তোমার ছেলের যুগগি নয়। আমাওকে তোমার অ্যাকজোন মান্দেরের মোতো রাখো। পরে সে উঠলো আর তার বাপির কাছে এলো। সে অনেক তফাৎ থাকতি, তার বাপ তারে দেখতি পালো। আর দয়া হোয়ে দড়য়ে যায়ে তার ঘাড়ের পর পড়ে চুমো দিলো। আর ছেলে তাওকে কলো, বাপ আমি

ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ও তোমার নজরে পাপ করিছি। আর আমি তোমার ছেলে নামের যুগগি নয়। কিন্তু বাপ তার চাকরদের কলো, ভালো পোশাকে আনো, হাতে আংটি ও পায়ে জুতা পরাও। আর আমরা খেয়ে-দেয়ে আমোদ করি। কেননা আমার এই ছেলে মরে যায়ে ফের বাঁচছে। সে হারায়ে যায় আর পাত্তা গ্যাছে। আর তারা আমোদ করতি লাগলো।

তখন তার বড়ো ছেলে ক্ষ্যাতে চিলো। আর য্যামোন বাড়ির কাছে এলো গান নাচ সুনতি প্যালো। তখন অ্যাকজোন চাকররে ডেকে বাত্তা নিলো, এ সকলের মানে কি? তখন সে তারে বললো, তোমার ভাই আইছে। তাইতে তোমার বাপ অ্যাক ভোজ দিয়েছেন। কেনোনা তিনি তাতে ভালোভাবে পাইছেন। তাতে সে রাগ করলো আর বাড়ির মদ্ধি যাতি চেলো না। তাইতি তার বাপ তাইরি এলো, আর বুজোতি লাগলো। সে জব দিয়ে তার বাপেরে কলো, দেখো, এতো বছর আমি তোমার সেবা করছি, কখনো তোমার কথা অমান্য করি নাই। তবু তুমি কখনো আমাকে অ্যাকটা ছাগলের ছাও দেও নাই যে আমি বন্ধুদের নিয়ে আমোদ করি। কিন্তু যখন তোমার সেই ছেলে এলো, যে বেশ্যাদের সঙ্গে তোমার সম্পত্তি খেয়ে চেলিছে, তুমি তার জন্যে এক ভোজ দিলে। পরে তিনি তারে কলো, তুমি বরাবর আমার কাছে আছ, আর আমার যথাসর্বস্ব তোমারি। আমাদের আমোদ-আলোদ করা উচিত, কেননা তোমার এই ভাই মরেছিলো পরে আবার বাঁচিছে। সে হারায়ে যায়, ফের পাত্তা গেছে।”

উল্লেখ্য, ড. র্জজ গ্রিয়ারসন যে উপভাষা এখানে তুলে ধরেছেন তা অনেক আগে সংগ্রহ করা। বর্তমানে এ ভাষার অনেক শব্দ মানুষ উচ্চারণ করে না। শুধু তাই নয়, এর অর্থও অনেকে বোঝে না।

খুলনা জেলায় পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব পড়েছে অনেক ক্ষেত্রে। খুলনা জেলায় নদীনালা ও বনাঞ্চল থাকায় সব স্থানে শিক্ষার আলো ভালোভাবে পৌঁছাতে পারেনি। তাই নিজেদের বোধগম্য ভাষা ও বাইরে থেকে আসা শব্দগুলো মিশিয়ে এক সংকর জাতীয় ভাষায় লোকজন কথা বলে থাকে। একারণে জেলার প্রতিটি গ্রামে ও উপজেলায় ভিন্ন প্রকৃতির ভাষায় লোকজনকে কথা বলতে শোনা যায়। এ ভাষাকে ব্যাকরণের নিয়মে বাঁধা যায় না। জেলার ভাষায় বিভিন্নতা থাকলেও ৪টি এলাকাভিত্তিক ভাগ করা যায়।

ক) এলাকা: তেরখাদা, রূপসা, দিঘলিয়া উপজেলায় নড়াইল, গোপালগঞ্জ ও বাগেরহাট-এ সমস্ত জেলার আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব লক্ষ করা যায়। যেমন: ‘তুমি কোনো হানে যাতিছ’?

খ) এলাকা: ফুলতলা ও ডুমুরিয়া উপজেলা ও দৌলতপুর থানার পাশের বিভিন্ন গ্রামে একই রীতির ভাষা ব্যবহৃত হয়। পার্শ্ববর্তী থানার পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন: ‘তুমি কো আনে যাচ্ছ।’

গ) এলাকা: দাকোপ ও বটিয়াঘাটা উপজেলায় কয়েক শ্রেণির ভাষা পরিলক্ষিত হয়। যেমন: 'তুমি দান ক্যন যেতে চাও।'

ঘ) এলাকা: পাইকগাছা ও কয়রা উপজেলার আঞ্চলিক ভাষা এ জেলার অন্যান্য এলাকার ভাষা থেকে বড়ো রকমের পার্থক্য লক্ষ করা যায়। যেমন: 'তুমি কনে যাচ্ছ।'

জেলার আঞ্চলিক ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব: খ এর উচ্চারণ 'ছ' হয়। জ, য এর উচ্চারণ চ হয়। স, ঠ, ধ এর উদাহরণ ট ও দ হয়। ফ, ব এর উচ্চারণ- 'প' হয়। ভ এর উচ্চারণ 'ব' হয়। ও এর উচ্চারণ 'ন' হয়। উল্লেখ্য, ক, খ, গ, চ, ট, ঠ, ঢ, ন, ণ, ত, দ, প এবং ম এ কয়টি ব্যক্তির ধ্বনি অবিকৃত থাকে। বর্ণে ও উচ্চারণের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রায় লক্ষ করা যায় শব্দের শেষে অধিকাংশ স্থানে মহাপ্রাণ ঘোষ বর্ণে মহাপ্রাণত্য শোনা যায়। তালব্য বর্ণেও স স্থলে দন্ত তালব্য দেখা যায় এবং কর্মকারকে বিভক্তির ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

বাক্যতত্ত্ব: জেলার আঞ্চলিক ভাষার বাক্যে পদ প্রয়োগ রীতি (বাকতত্ত্ব) ব্যাকরণের সাধারণ নিয়ম মেনে চলে অনেক স্থানে ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। যেমন: কুড়োর ব্যারাম হয়েছে (মুরগির অসুখ হয়েছে।)

রূপতত্ত্ব: জেলার আঞ্চলিক ভাষার পদ গঠনপ্রণালি হলো: ক্রিয়াপদের পরে নে, নি, নেদি শব্দ ব্যবহার হয়। কর্তার বহুবচনে আশা বিভক্তি হয়। কর্মা, কর্ম, সম্পাদন ও সম্বন্ধে বহুবচনে গা, গে, গো বিভক্তি হয়। অনুজ্ঞা বুঝাতে ধাতুর সাথে প্রায়ই সে বিভক্তি যোগ হয়। সম্বোধন ক্ষেত্রে 'হাদা' সম্বোধন পদ ব্যবহৃত হয়।

খুলনার লেখক

খুলনা জেলায় যাঁদের পৈতৃকনিবাস, ভারত থেকে এসে যাঁরা জেলার মধ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন, এদের মধ্যে যাঁদের প্রকাশিত গ্রন্থ আছে, তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (১৮৩৪-১৯০৭): জন্মস্থান: গ্রাম সেনহাটি, উপজেলা: দিঘলিয়া। কবি ও শিক্ষাবিদ। ফারসি ও সংস্কৃত ভালোভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। ঢাকায় বাংলা স্কুলের শিক্ষক। পরে যশোর জিলা স্কুলে প্রধান পন্ডিতের কাজ করে অবসর নেন (১৮৭৪-৯৩)। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের '*সংবাদ প্রভাকর* ' পত্রিকায় কবিতা প্রকাশ করে প্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত হন। *মনোরঞ্জিকা, কবিতা কুসুমাবলী, ঢাকা প্রকাশ* প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। যশোর থেকে *দ্বৈবার্ষিকা* নামে সংস্কৃত বাংলা মাসিক পত্রিকা পরিচালনা করেন। রচিত গ্রন্থ: '*সদ্ভাবশতক*' (ঢাকা জ. ১৮৬১) 'রামচন্দ্র দাস' ছদ্মনামে আত্মজীবনী, *রাসের ইতিবৃত্ত,* (ঢাকা ১৮৬৮), *'মোহনভোগ'* (ঢাকা ১৮৭১), *কৈবল্যতত্ত্ব* (কুমারখালী ১৮৮২)। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ *'সদ্ভাবশতক'* শেখ সাদী ও হাফিজের কবিতার ভাবানুবাদ।

মুনশী খয়রাতুল্লাহ সরদার (১৮৪২-১৯৩৬): কুষ্টিয়ার শিলাইদহের কবি রবীন্দ্রনাথের জমিদারি এস্টেটে নায়েবি পদে চাকরি করতেন। জন্ম : গ্রাম-সামন্তসেনা, উপজেলা-রূপসা, জেলা-খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: *খোদা হাফেজ* (১৯০০), *কারবালা তরঙ্গ কাব্য* (১৯০৬), *'তারিখে রসুল'* (১৯১৩), তাঁর খোদা হাফেজ গ্রন্থটি তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ করেছিল।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪): জন্মস্থান: গ্রাম বাড়লি, উপজেলা-পাইকগাছা, জেলা খুলনা। বৈজ্ঞানিক, রসায়নবিদ, অধ্যাপক ও রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রথম ভারতীয় স্থাপনকারী। তিনি ডি.এস সি.পি এইচডি, ওসি,আই,ই অর্জন করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে নাইট উপাধি দেয়। তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা প্রবর্তনের একজন প্রধান উদ্যোক্তা। ১৯১০ সালে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ইতিহাস, ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন তিনি। প্রেসিডেন্সি কলেজে (১৮৮৯-১৯১৬) ও অবসর গ্রহণের পর বিজ্ঞান কলেজে (১৯১৬-১৯৩৬) অধ্যাপনা করেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : *নব্য রসায়নবিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি* (১৯০৬), *অন্নসমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও প্রতিকার* (১৯৩৬), *হিন্দু রসায়নী বিদ্যা* (১৯৩৬)। *পতিতা সমস্যা, বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার* প্রভৃতি।

সতীশচন্দ্র মিত্র (১৮৭২-১৯৩১): ইতিহাসবিদ, অধ্যাপক, খুলনা জেলার পাইকপাড়ার মাতুলালয়ে জন্ম। পৈতৃকনিবাস খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার দেওয়াড়া (মতান্তরে আইচগাতি)। প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : *মা* (১৮৯৬), *প্রতাপ সিংহ* (১৯০৪), *উচ্ছ্বাস* (১৯০৮), *যশোর খুলনার ইতিহাস* (১ম খণ্ড) (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯১৪), *যশোহর খুলনার ইতিহাস* (২য় খণ্ড) দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯৬৫), *হরিদাস ঠাকুর* (১৯২৫), *সপ্ত গোস্বামী* (১৯২৭), *শিশু পাঠ্য যশোরের ইতিহাস* (১৯২৮), *শিশুপাঠ্য খুলনার ভূগোল* (১৯৩২), *প্রাথমিক বাঙ্গালার ইতিহাস* (১৯০২), *ভারতবর্ষের ইতিহাস* (১৯২২), *শিশু রঞ্জন ভারতবর্ষের ইতিহাস* (১৯১৬), *ঐতিহাসিক পাঠ* (১৯৩০)।

আব্দুল গফুর সিদ্দিকী (১৮৭২-১৯৫৯): পিএইচ.ডি, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, গবেষক। পৈতৃকনিবাস ভারতের ২৪ পরগনার ঘাসবাগ গ্রামে। খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলার দামোদর গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। প্রকাশিত গ্রন্থ- *বিষাদ সিন্ধুর ইতিহাস পটভূমি মুসলমান ও বঙ্গ সাহিত্যের কথা* (১৯২২), *শহিদ তিতুমীর* (১৯৬১), *হযরত গোরাচাঁদ গাজী* (১৯৫০), *স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, লায়লী মজনু* (১৯৫০), *শিরি ফরহাদ* (১৯৫০), *বিষাদ সিন্ধুর পরিশিষ্ট* (১৯৫০)।

মাওলানা আহমদ আলী (১৮৭৬-১৯৭১): সাংবাদিক, খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার মেছোখনা গ্রামে জন্ম। প্রকাশিত গ্রন্থ : *ইসলাম মহিমা, রসুলুল্লাহর ভবিষ্যৎবাণী ও মুক্তির পথ; রেহেলাতে খোলাফায়ে রাশেদীন*।

কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬): জন্মস্থান গ্রাম গদাইপুর, উপজেলা পাইকগাছা, জেলা খুলনা। লেখক ও শিক্ষাবিদ, ইংরেজিতে এম,এ। খ্যাতিমান এই লেখক *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা* পরিচালনা কমিটির সভাপতি ছিলেন। কলকাতা থেকে মাসিক সাহিত্য পত্রিকা *শিক্ষক* সম্পাদনা করেন (১৯২০-১৯২৩)। প্রকাশিত গ্রন্থ : *ভূগোল শিক্ষা প্রণালী* (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ), *মোসলেম জগতে বিজ্ঞান চর্চা* (১৯০৫), *সরল সাহিত্য*, *প্রাথমিক জ্যামিতি*, *নবী কাহিনী, ঐতিহাসিক পাঠ,* (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ), *কামারের কান্ড* (১৯১৯)। বিখ্যাত উপন্যাস 'আবদুল্লাহ' তার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম।

বিনোদবিহারী সাধু (বঙ্গাব্দ ১২৯৬-১৩৪১) রায় সাহেব, ব্যাবসায়ী। জন্ম: খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার কপিলমুনি গ্রামে। প্রকাশিত গ্রন্থ *'আমার ব্যাবসা জীবন',* (প্রথম সংস্করণ বাংলা ১৩৩৯ ও তৃতীয় সংস্করণ ১৩৯৩)।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৯২-১৯৬১): জন্মগ্রাম সেনহাটী, উপজেলা রূপসা, জেলা খুলনা। রাজনীতি সচেতন নাট্যকার। জাতীয় বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পাস করে বি,এ পর্যন্ত পড়েন। জাতীয় কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। বিভিন্ন সময়ে সাপ্তাহিক *হিতবাদী, বিজলী, আত্মশক্তি* প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। প্রায় ৩০টি নাটক লিখেছিলেন। উল্লেখযোগ্য নাটক: *রক্ত কমল* (১৯২৯), *গৈরিক পতাকা* (১৯৩০), *ঝড়ের রাতে* (১৯৩১), *নার্সিং হোম* (১৯৩৩), *দেশের দাবী* (১৯৩৪), *স্বামী-স্ত্রী* প্রলয় (১৯৩৭), *তটিনীর বিচার* (১৯৩৯), *রাষ্ট্র বিপ্লব* (১৯৪৪), *সিরাজদ্দৌলা* প্রভৃতি।

কাজী আকরাম হোসেন (১৮৯৬-১৯৬৩): অধ্যাপনা। জন্মস্থান : খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলার পয়গ্রাম কসবা। প্রকাশিত গ্রন্থ : *ইসলামের ইতিহাস* (১৯২৪), *ইসলামের ইতিকথা* (১৯৩২), *ইসালাম কাহিনী* (১৯৩১), *যুগবাণী* (১৯৪৩), *পল্লিবাণী* (১৯৪৩), *মুক্তিবাণী* (১৯৪৩), *আমরা বাঙ্গালি* (১৯৪৫), *পথের বাঁশি* (১৯৪৫), *মসনবী রুমি* (১৯৪৭)।

ইসমাইল হোসেন (১৯০২-১৯৮৭): জন্মস্থান দৌলতপুর, খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ : *দরদী*।

দবীর উদ্দিন আহম্মেদ (১৯০৬-১৯৮৮): চাকরিজীবী, জন্মস্থান: গ্রাম বাগালী, উপজেলা কয়রা, খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ : *বিস্মৃতির অন্তরালে* (১৯৮১)। বাংলা নাটক : *সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৯৮৪)*।

ডা. আবুল কাসেম (১৯০২-১৯৮৭)। জন্ম : দৌলতপুর, খুলনা। বহু গ্রন্থপ্রণেতা। কাব্যগ্রন্থ : *মানসী* (১৯২৮), *হজরত মোহাম্মদ* (১৯৩১)। *জীবন: মহর্ষি মোহসিন* (১৯৩৬), *বাঙ্গালার প্রতিভা* (১৯৩৯)। উপন্যাস: *ঈসা খা স্বর্ণময়ী* (১৯৩৯)। এই বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন মিস ফজিলাতুন নেসা। ভ্রমণ কাহিনি : *আমার*

ভূ-প্রদক্ষিণ (১৯৩০), *ভারত ভ্রমণ* (১৯৩৬), *মহাসাগরের দেশে* (১৯৩৭), *দূর-দূরান্তরের* (১৯২৬)। অন্যান্য গ্রন্থ : *বিজ্ঞানের জন্মরহস্য* (১৯৩৬) ইত্যাদি।

মোহাম্মদ এবাদুল্লা (জ. ১৯১১): খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার বেদকাশী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : *মালঞ্চ, কাওসার, ঝরা ফুল, মুক্তাহার, হক নসিব*।

এ, এফ, এম, আবদুল জলিল (১৯১৬-১৯৭৮): জন্মস্থান: গ্রাম-পানতিতা, উপজেলা- তেরখাদা, জেলা-খুলনা। ওকালতি করতেন, কিন্তু ঝোঁক ছিল গবেষণাকর্মে। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ '*সুন্দরবনের ইতিহাস*'। অন্যান্য গ্রন্থ : *ইবনে খালদুন* (১৯৪৭), *ইউরোপীয় সভ্যতায় ইসলামের দান* (১৯৪৭), *পারস্য সাহিত্য* (১৯৪৯), *মুসলিম আইন ও সমাজ ব্যবস্থা* (১৯৪৯), *মুসলিম সংস্কৃতি* (১৯৪৯), *আইয়ুব আমলের ভূত* (১৯৭০), *ইরানের বুলবুল* (১৯৬৩), *মুসলিম সভ্যতায় নারী, খুলনা জেলার ইতিহাস, পূর্ববঙ্গের কৃষক বিদ্রোহ, হজরত খান জাহান আলী, পাঁচ হাজার বছরের বাংলা ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, সুন্দরবনের কাহিনী, মুজিব সরকারের উত্থান-পতন, আমার দেখা আইন আদালত, কারাগারের কাহিনী, আমার কথা, সুফি কাহিনী, আমার চোখে রাজনীতির চল্লিশ বছর।*

খগেন্দ্রনাথ বসু: ডাক্তার ছিলেন। পৈতৃকনিবাস: খুলনা মহানগরীর দৌলতপুর থানার মহেশ্বরপাশা গ্রামে। প্রকাশিত গ্রন্থ: *মহেশ্বরপাশা পরিচয়, দৌলতপুর বিবরণ* (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৪০ বাংলা)।

আমির আলী জোয়ারদার (জ. ১৯১৭): অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ। জন্মস্থান খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার মধুগ্রামে। প্রকাশিত গ্রন্থ: *স্রষ্টা ও সৃষ্টি* (১৯৮৬)।

কে. আলী (কাওসার আলী) (জ. ১৯২০): অধ্যাপক, ইতিহাসবিদ সমাজসেবক। জন্মস্থান খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার গ্রামে। প্রকাশিত গ্রন্থ: *ইসলামী শিক্ষার রূপরেখা,* (২য় সংস্করণ) ১৯৭৩) *আধুনিক ইউরোপের পরিচয়*। (৫ম সং-১৯৭৩) *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস* (৩য় সং-১৯৭৩); *ইসলামের ইতিহাস* (২য় সং ১৯৭৬), *বাংলাদেশ ও পাক ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস*। (১০ম সং ১৯৭৪) ও অন্যান্য।

কাজী আবদুল খালেক (জ. ১৯২০): জন্মস্থান: গ্রাম গাইকুড়, থানা-দৌলতপুর, জেলা খুলনা। পেশা সাংবাদিকতা ও শিক্ষকতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: *যারা মরুতে ফুটালো ফুল, চাঁদের বুকে মাটির মানুষ; গল্পের আসর, বাংলার বীর সেনা।*

মো. শেখ ইউসুফ আলী (১৯২০-১৯৮০): জন্মস্থান: খুলনা শহরের পশ্চিম বানিয়াখামার। প্রকাশিত গ্রন্থ: *তারা রানী*।

শেখ ইসমাইল হোসেন: (জ. ১৯২১) শিক্ষকতা, জন্মস্থান: খুলনা শহরের দৌলতপুরে। প্রকাশিত গ্রন্থ : *মরু দুলাল* (রচনাকাল ১৯৫৪, প্রকাশ ১৯৮১), *দরদী* (১৩৩০ বাং), *স্বাস্থ্য গাথা* (১৩৩৪ বাং)।

গাজী শামছুর রহমান (১৯২১-১৯৯৮): জন্মস্থান: গ্রাম মালতিয়া, ডুমুরিয়া, খুলনা। সুপরিচিত আইন বিশেষজ্ঞ। আইনবিষয়ক বহু গ্রন্থপ্রণেতা। প্রবন্ধ, নাটক, শিশু সাহিত্য প্রভৃতিও লিখেছেন। গ্রন্থ: *নয়া শপথ* (নাটক ১৯৬৬), *উত্তরণ* (নাটক ১৯৬৭), *আড়ালে তার সূর্য হাসে* (গল্প ১৯৬৯), *এক পুরুষ দুই স্ত্রী* (উপন্যাস ১৯৬৯), *নজরুলের বিচার ও কারাদণ্ড* (প্রবন্ধ ১৯৬৮), *মুসলিম আইনের রূপরেখা* (১৯৭০), *আইনের চোখে* (১৯৭১), *আইনের আলোকে* (১৯৭৪), *বিচারক জীবনের স্মৃতিচারণ* (১৯৮৬), *সাক্ষ্য আইনের ভাষা* (১৯৭৭), *সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ভাষ্য* (১৯৭৭), *দণ্ডবিধির ভাষ্য* (১৯৭৭), *বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থা* (১৯৭৭), *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ভাষ্য* (১৯৭৭), *আইনের অন্ধকারে* (১৯৭৭), *নবীদের কথা* (১৯৬৯) প্রভৃতি।

আবুল হোসেন (১৯২২-২০১৪): জন্মস্থান: আড়ুয়াডাঙ্গা। গ্রাম দেওয়াড়া, উপজেলা, রূপসা, জেলা খুলনা। কবি ও সমালোচক। আধুনিক বাংলা কবিতার অগ্রণী কবি। গ্রন্থ: *নববসন্ত* (কবিতা ১৯৪০), *পার্বত্য* পথে (ভ্রমণ ১৯৪৬), *জ্যাক লন্ডনের অরণ্যের ডাব* (অনুবাদ ১৯৫৪), *বিরস সংলাপ* (কবিতা ১৯৬৯), *হাওয়া তোমার কি দুঃসাহস* (কবিতা ১৯৮২), *দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে* (কবিতা, ১৯৮৫) প্রভৃতি। আবুল হোসেন ও সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেনের যৌথ সম্পাদনায় *সংলাপ* নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয়। সাত সংখ্যা প্রকাশনা অবধি আবুল হোসেন এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

আহমদ আলী (১৯২৪-১৯৮৫): খুলনা জেলা বটিয়াঘাটা উপজেলার ভাণ্ডারকোট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রকাশিত গ্রন্থ কাব্য - *নামবে এবার ঢল* (১৯৮০)।

বেদুইন সামাদ (প্রকৃত নাম শেখ আব্দুস সামাদ) (জ. ১৯২৪): সরকারি কর্মকর্তা, (পৈতৃকনিবাস ভারতে) তিনি ভারত থেকে এসে প্রথমে যশোরে বসবাস শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে স্থায়ীভাবে খুলনার খালিশপুরে বসবাস করেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস-*বেলা শেষে* (বাং ১৩৬৫), *দুই নদীর এক ঢেউ* (বাং ১৩৬৭), *ধূম নগরী* (১৯৬৫), নিষ্পত্তি (বাং ১৩৬৪), *পথে যেতে যেতে* (বাং ১৩৭০), ছোটো গল্প-*ফুল ও কুড়ি* (১৯৬৭), *নাটক-অভিযান* (বাং ১৩৬৭)।

শেখ সোলায়মান আহমেদ (জ. ১৯২৫): সরকারি চাকরিজীবী পৈতৃকনিবাস : ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া থানার চাকদাহ গ্রামে। খুলনা শহরে স্থায়ী বসবাস। প্রকাশিত গ্রন্থ : *কাব্য সত্যের সন্ধানে* (২০০৫)।

খোন্দকার জিল্লুর রহমান (জ. ১৯২৮): শিক্ষক, জন্মস্থান: খুলনা শহরের খালিশপুরে মুজগুন্নিতে। প্রকাশিত গ্রন্থ: *হুগলির গল্প* (১৯৯৬), *হোমিও চিকিৎসায় রোগ মুক্তি* (১৯৯৮), কাব্য-*অসীম ছোঁয়া* (২০০৬)।

মুহাম্মদ আব্দুল হালিম (জ. ১৯২৯): আইনজীবী, জন্মস্থান: গ্রাম পানতিতা, উপজেলা তেরখাদা, জেলা-খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: *খুলনার ভাষা অন্দোলন: আটচল্লিশ ও বায়ান্ন* (১৯৮৫), *পুরাঘটিত বর্তমান* (১৯৮৬), *ভাটি বাংলার কিংবদন্তি* (১৯৯২), *মুর্শিদাবাদ ও সিরাজ পরিবার* শতাব্দীর সাক্ষী : *এ এইচ দেলদার আহমেদ* (২০০০), *খুলনার ঐতিহ্য* (২০০১), *তেরখাদার ইতিহাস*।

জনার্দণ চৌধুরী (জ. ১৯৩০): জন্মস্থান-পাবলা, দৌলতপুর, খুলনা, চাকরিজীবী। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য- *সময়ের পংক্তি* (২০০৫)।

আনোয়ারুল কাদির খান: ডাক্তার জন্মস্থান-খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলার পয়গ্রাম কসবা। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাজী ইমদাদুল হক এর *আব্দুল্লাহ উপন্যাসের* ৩০-৪০ পরিচ্ছেদ রচনা, *আমাদের দুঃখ* (১৯৩৪)।

মুহম্মদ আবূ তালিব (১৯২৮-২০০৭): জন্মস্থান: গ্রাম গোয়ালখালি, খালিশপুর, খুলনা। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। প্রাবন্ধিক ও গবেষক। গ্রন্থ: *বাংলা সাহিত্যের ধারা* (১৯৬৮), *লালন শাহ ও লালন গীতিকা* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৬৮), *লালন পরিচিতি* (১৯৬৮), *বিস্মৃত ইতিহাসের তিন অধ্যায়* (১৯৬৮), *লোক সাহিত্য* (১৯৫২), *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী* (১৯৫৫), *ছোটোদের মাওলানা কারামত আলী* (১৯৬৩), *দ্বিতীয় সংস্করণ* (১৯৭০), *মুনশী শেখ জমীর উদ্দিনের আত্মজীবনী* (সম্পাদিত, ১৯৬৭), *হজরত শাহ মখদুম রূপোশ (রহ.)-এর জীবনেতিহাস* (১৯৬৯), *ফকির নেতা মজনু শাহ* (১৯৬৯), *বাংলা সাহিত্যের একটি হারানো ধারা* (১৯৭০), *উত্তরবঙ্গের ইসলাম প্রচারের গোড়ার কথা হযরত শাহ মখদুম ও তাঁর সঙ্গিগণ* (১৯৭০), *বঙ্গের সাহিত্যের সাধনা* : ৬৫০-১০০০ খ্রি. (১৯৭৫), *বাংলা সনের জন্মকথা* (১৯৭৭), *এম, কে আলীর বাহিরের ডাক ও ঘরের কথা* (সম্পাদিত ১৯৭৭), *আবিটা গাবিটা গামা* (১৯৭৮), *ডক্টর হিলালি স্মারকগ্রন্থ* (সম্পাদিত, ১৯৭৮), *উপেক্ষিত সাহিত্যে সাধক সাতজন* (১৯৮০), *আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষা* (১৯৭৯), *মানব জাতির সপক্ষে* (১৯৯১), *যশোর জেলায় ইসলাম* (১৯৯১), মোহাম্মদ গোলাম হোসেন (১৯৯), *কিংবদন্তির যশোর* (বাংলা ১৩৯৫), খুলনা জেলায় ইসলাম (১৯৮৮), *ভাষা লিপি ও সাহিত্য* (বাংলা ১৩৯৭), মুসলমানি কথা (১৯৯৫)।

আঞ্জুমান আরা বেগম (জ. ১৯২৯): খুলনা জেলায় জন্ম। প্রকাশিত গ্রন্থ উপন্যাস *পঙ্গু* (১৯৫৩), *আকাশ বাসর* (১৯৬৪), *অনুক্ত* (১৯৬৫), *বিপলিত* (১৯৬৬), *আমি, হেনা মিতা* (১৯৬৭), *অবাক পৃথিবী* (১৯৬৭)।

মো. মোর্তজা (১৯৩০-১৯৭১): ডাক্তার, খুলনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : *প্রেম ও বিবাহের সম্পর্ক* (১৯৬২), *জনসংখ্যা ও সম্পদ* (১৯৬৩), *চরিত্রহীনার অধিকার* (১৯৬৫), *পাক-ভারত সংঘর্ষের তাৎপর্য* (১৯৬৬), *চিকিৎসা শাস্ত্রের কাহিনী* (১৯৬৮)।

সমীর আহমেদ (জ. ১৯৩০): ভাষা সৈনিক, ব্যাবসায়ী। (ভারতের পশ্চিম বাংলায় পৈতৃকনিবাস) বর্তমানে খুলনা শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : *বিশিষ্ট ফটোগ্রাফি ছড়ায় কবিতায়* (২০০৬)।

মোহাম্মদ সৈয়দুর রহমান সাঈদ (জ. ১৯৩১-মৃত): সমাজসেবী, খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার দেওয়াড়া গ্রামে জন্ম। প্রকাশিত গ্রন্থ : *রক্তে লেখা দিনলিপি* (১৯৯৮)।

আনোয়ারা বেগম (জ. ১৯৩১): অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা। পৈতৃকনিবাস ভারতে। জন্মস্থান : খুলনা মহানগরীর খালিশপুরে। প্রকাশিত গ্রন্থ- *সেলাই শিক্ষা* (১৯৬২), *আধুনিক কাটিং ও সেলাই শিক্ষা* (১৯৬২), *চারপাশের শিলারাশি* (১৯৬৭), *আধুনিক রান্না শিক্ষা* (১৯৬৮), *গাদ্দার (অনুবাদ)* (১৯৭৫), *উল্টা গাছের গল্প* (১৯৭৯)।

মানাফ ডা. (জ. ১৯৩১): জন্মস্থান- গ্রাম-মুজগুন্নি, খুলনা শহর। শিক্ষাগত যোগ্যতা এমবিবিএস, ভাষা সৈনিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : *সরস নীরস* (১৯৮২), *নানা রঙের দিনগুলি* (১৯৮২)।

এস.এম. রফিকুল আলম (জ. ১৯৩৩): জন্মস্থান: গ্রাম-খালিশপুর, খুলনা। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও গীতিকার। প্রকাশিত গ্রন্থ : *রক্ত স্মারক* (১৯৯৭), *জীবন আলো* (১৯৮২), *সঞ্চয়ান, আল্লাহ ও রসুল (দ.)* (২০০০), *শিশুকণ্ঠ* (২০০৫), *সাওয়াল জওয়াব* (২০০৬), *সুরেলা ছন্দ* (২০০৮)।

বেগম আশরাফুন নেছা (জ. ১৯৩৪): সাংবাদিক, পৈতৃকনিবাস গ্রাম- কলিঙ্গা, মহকুমা বসিরহাট, জেলা ২৪ পরগনা। পশ্চিমবাংলা, ভারত। প্রকাশিত গ্রন্থ: *নাটক ভুলের ফসল*। তিনি খুলনা শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন।

আবুল কালাম সামসুদ্দিন (১৯৩৪-১৯৯১): রাজনীতিবিদ, জন্মস্থান-মির্জাপুর, খুলনা শহর। প্রকাশিত গ্রন্থ : *শহর খুলনার আদিপর্ব* (১৯৮৬), *ধূসর অতীত* (১৯৯)।

ফাহমিদা আমিন (১৯৩৬): সমাজকর্মী। তিনি খুলনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : রম্য রচনা *অনিবার্য কারণবশত, নিম মধু*।

বেগম মাজেদা আলী (জ. ১৯৩৬): শিক্ষাবিদ সমাজসেবী, জন্মস্থান : গ্রাম কাশীপুর, দৌলতপুর, খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ : *কাব্য জীবনের উপপাদ্য* (১৯৯৯), *গোধূলির স্বপ্ন* (২০০৬), খুলনার শিক্ষিকা পরিচিতি। (২০০৮) শিশু সাহিত্য : *হাসি খুশির মেলা, হাসি খুশির দোলা, হাসিখুশির খেলা ও প্রজন্ম-৭১*।

শেখ হাসান উদ্দিন (মরহুম) : সরকারি কর্মকর্তা (অবসরপ্রাপ্ত) : জন্মস্থান খুলনা মহানগরীর কাশীপুরে। প্রকাশিত গ্রন্থ : *অনেক রাত অনেক তারা* (১৯৯৬)।

শেখ আনোয়ার হোসেন (জ. ১৯৩৬): ব্যাবসায়ী, জন্মস্থান : গ্রাম- দেওয়ানা, দৌলতপুর, খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ : *আমার ভারত ভ্রমণ* (১৯৮৩), *আমার সৌদি ভ্রমণ।*

এসএম রহমত উল্লাহ (জ. ১৯৩৬): সংস্কৃতিকর্মী, জন্মস্থান : দিঘলিয়া, খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ : *সত্যের সন্ধানে* (১৯৯৯), *মন ও মানুষ* (২০০৩), *বিরহের নীলকণ্ঠ* (কাব্য ২০০৫), *ভালোবাসার মৌ মৌ গন্ধ* (কাব্য ২০০৬)।

জামান মনির (১৯৩৬-১৯৯৯): চাকরিজীবী, ভারতের ২৪ পরগনা জেলার হাবড়া থানার বেড়গুম গ্রামে ছিল তাঁর পৈতৃকনিবাস। তিনি খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলার দামোদর গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। তিনি বাংলাদেশ বেতারের একজন নাট্যকার ছিলেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: *গল্পগ্রন্থ-চিমটি* (১৯৬২), *উপন্যাস অচেতন প্রহর* (১৯৬৮), *কানা গলির সজন মন* (১৯৭০), শিশু সাহিত্য: *শাস্তি দিলেন শায়েস্তা* (১৯৮৩), *পরশমণির পরশে* (১৯৮৪), *জাহাজ চলে সাগর জলে* (১৯৮৫), *কামার খালীর এক সংগ্রামী* (১৯৮৬), *তারামথা নেই* (১৯৮৮), *ছোটোদের হযরত আবুজর গিফারী* (১৯৮৮), *গুণীজনের গুণের কথা* (১৯৯৪), *নবী মোর পরশ মণি* (১৯৯৫), *সোনার কাঠির ছোঁয়ায়* (১৯৯৭), *আজব দরবেশ সৈয়দ মওলা* (১৯৯৯)।

এস এম আব্দুল জববার (১৯৩৮-১৯৮৬): আইনজীবী, জন্মস্থান : গ্রাম শরাফপুর, উপজেলা ডুমুরিয়া, জেলা খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ : *চ্যাবন প্রাশ*।

এস এম আকরাম আলী (জ. ১৯৩৯-১৯১৪): আইনজীবী, জন্মস্থান- পাইকগাছা, জেলা খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: *ন্যায় বিচারের অন্তরায়, বিচারের অন্তরায়, আইনের জটিলতা ফাঁক ফোকর এবং সহজ সমাধান*।

বিষ্ণুপদ সিংহ (জ. ১৯৪০): অবসরপ্রাপ্ত বেসরকারি চাকরিজীবী, কবি ও সংস্কৃতিকর্মী। গ্রাম- আইচগাতি, উপজেলা-রূপসা, জেলা খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: *শীতের সুখ-দুঃখ*। তিনি কবিতালাপ গোষ্ঠীর অন্যতম সংগঠক।

মোল্লা ফজলুর রহমান (মরহুম): সরকারি চাকরিজীবী, খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলায় পৈতৃকনিবাস। খুলনা শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: কবিতা *জাগো জিহাদি জোয়ান* (১৯৭০), *আগুনের পৃথিবী* (১৯৮৫), *তিনি কাব্যরত্ন উপাধি লাভ করেছিলেন।*

জগবন্ধু রায় (জ. ১৯৪১): প্রাক্তন অধ্যাপক, জন্ম খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার তিলডাঙ্গা গ্রামে। প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা *জীবন নদীর তীরে* (বাং ১৩৯৪)।

মোহাম্মদ শাহজাহান (জ. ১৯৪১): চাকরিজীবী, জন্ম ভারতে। বর্তমানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন মহেশ্বরপাশা, দৌলতপুর, খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: *প্রেমই স্বর্গ* (১৯৬০), *লীলাবতীর কবিতা* (১৯৫৯) ও *স্বাধীনতার ফল* (১৯৫৯)।

ইজাজ হোসেন (জ. ১৯৪১): সরকারি কলেজের প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক। জন্মস্থান : গ্রাম- দামোদর, উপজেলা- ফুলতলা, জেলা- খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ : শামসুর রহমান (১৯৮১), *বৃত্তাবদ্ধ জীবন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ছড়া দিলাম ছড়িয়ে।*

মন্নুজান হোসেন (জ. ১৯৪৩), শিক্ষিকা, জন্ম : খুলনা শহর। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস- *ভালোবাসার ভুবন* (১৯৮২,) *জনারণ্যে সুবাতাস* (১৯৯২), *কাব্য সায়াহ্নে একা* (২০০২)।

ইলিয়াস হোসেন (জ. ১৯৪৩), সংস্কৃতিকর্মী, জন্ম : খুলনা শহরের বানিয়াখামার। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য- *আমরা ঘুমাবো না* (১৯৭৯), *আরক্ত রুমাল* (১৯৮৮)।

গাজী আব্দুর রহমান দামোদরী (জ. ১৯৪৪): শিক্ষিক, গ্রাম দামোদর, উপজেলা, ফুলতলা, খুলনা, প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য *সীমাহীন সাগরের প্রহরী* (২০০৬)।

নূর মোহাম্মদ টেনা: সাংবাদিক, জন্ম : খুলনা শহর, প্রকাশিত গ্রন্থ: *খুলনার লোক সাহিত্য* (জ. ১৯৭০), *সম্পাদনা ও সংগ্রহ খুলনার লোককবি* (১৯৮১), *খুলনার সাতক্ষীরা বাগেরহাট এর প্রবাদ* (২০০৫), *খুলনার সাতক্ষীরা বাগেরহাট জেলার পালকির গান* (২০১৩)।

নারায়ণচন্দ্র রায় (জ. ১৯৪৫): সহকারী অধ্যাপক অব: (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) গীতিকার ও নাট্যকার। জন্মস্থান: গ্রাম তেঁতুলিয়া, উপজেলা বটিয়াঘাটা, জেলা খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: *ভাটির গাঙের নাইয়া* (২০০৫), *উজানগাঙের বাঁকে* (২০০৬), *হরিচাঁদ গুরুচাঁদ কথা* (২০০৬)।

আশরাফুন্নেসা দুলু (জ. ১৯৪৫): সংস্কৃতিকর্মী, জন্ম খুলনা শহর। প্রকাশিত গ্রন্থ : *ধারাপাত,* প্রথম খণ্ড (১৯৬০), *ভিম বাবু* (১৪১২ বাংলা) *ছোট্ট পাখি টুনটুনি* (২০০৬)।

আব্দুল হাই বিপুল (জ. ১৯৪৫): জন্মস্থান : মহেশ্বরপাশা, খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ : *কাব্য এখানেই যবনিকা নয়* (১৯৮০), *জীবনের দুই রূপ, কবিতার সংকল্প আমার সুর অন্যান্য মানব, দীপাবলীর দীপ, আমার স্বাধীনতায় তুমি, তোমাকে ভালবাসার কাব্য, স্মৃতি* র *আড়ালে তুমি।*

কাবেদুল ইসলাম: সরকারি কর্মকর্তা; জন্মস্থান: খুলনা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: *বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ১ম খণ্ড* (২০০১), *বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা* (১৯৯৯), *তোমার জন্য কবিতা* (১৯৯১), *নৈঃশব্দের কালবেলা* (১৯৮৭), ছোটোগল্প -*কার্নিসে দাঁড়কাক* (১৯৯০), *অন্তর্গত দ্বৈরত* (২০০২), *অলৌকিক সনেট গুচ্ছ* (২০০২), *অবিনাশী রাজস্ব ব্যবস্থা* (২য় খণ্ড) (২০০২)।

কামাল মাহমুদ: কবি ও সাংবাদিক, জন্ম (১৯৫৭) জন্মস্থান: ঝিনাইদহ, পিতার চাকরিসূত্রে ছোটবেলা থেকে খুলনায় বেড়ে ওঠা ও বসবাস। বর্তমানে খুলনায়

স্থায়ী। বাংলাদেশ প্রতিদিন-এর বার্তা সম্পাদক। প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থ: সনাতন সুন্দর (১৯৮৮) মেঘের ময়ূর (১৯৯০), এ ছিল নির্মেঘ জ্যোৎস্নার রাত (২০১০)।

অরুণ কুমার দত্ত (জ. ১৯৪৬): শিক্ষকতা, জন্মস্থান: খুলনা শহরে। প্রকাশিত গ্রন্থ: *শিক্ষা লাভের প্রয়োজনীয়তা ও উপায়* (১৯৯৫)।

শেখ আবদুল জলিল (জ. ১৯৪৬): প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ, খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার উখিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: *কাব্য -সূর্য সিঁড়ি* (১৯৮৬), *নিরাশার বসতি* (১৯৯১), *ডুমুরিয়ার ইতিহাস* (২০০২), *নষ্ট ডায়েরি* (২০০৩)।

সৈয়দ কাদের নওয়াজ (জ. ১৯৪৭): সরকারি চাকরিজীবী গীতিকার ও নাট্যকার বাংলাদেশ বেতার। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার কালুতাক গ্রামে। বর্তমানে তিনি খুলনা শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : *জীবনী -এক নজরে বিশ্বনবী* (১৯৮৭) প্রবন্ধ-নির্বাসিত প্রবন্ধ (২০০৯,। নাটক- *নিয়তির সিঁড়ি* (২০১৩)। উপন্যাস- *অভিনেত্রী* (১৯৯৬), কাব্য- *প্রত্যাশা* (১৯৯৩), ছোটোগল্প -*দৃষ্টির সীমানায়* (১৯৯১), *প্রেম শাশ্বত* (২০০০) কাব্য-*চৈতিক* (২০১০), *মন বলাকা* (২০০৭)।

পীযূষ কান্তি মণ্ডল (জ. ১৯৪৮), শিক্ষক, গ্রাম-হড্ডা, উপজেলা-কয়রা, জেলা-খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য-*ছন্দ* (২০০৭), *রূপসী* (২০০৭), *মা* (২০০৭), *উত্তরণ* (২০০৫)।

স.ম.বাবর আলী (জ. ১৯৪৯): আইনজীবী, জন্মস্থান : গ্রাম- গজালিয়া, উপজেলা-পাইকগাছা, জেলা-খুলনা। বর্তমানে খুলনা মহানগরীতে বসবাস। প্রকাশিত গ্রন্থ : *স্বাধীনতার দুর্জয় অভিযান* (১৯৯১)।

আবু আহমেদ শিকদার (জ. ১৯৪৯): সংস্কৃতিকর্মী, জন্মস্থান: গ্রাম-নৈহাটি, উপজেলা-রূপসা, জেলা-খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য *মারণাস্ত্র বিসর্জন* (১৯৮২)।

খাদিজা খাতুন (জ. ১৯৪৯): শিক্ষিকা, জন্মস্থান: খুলনা শহরের বসুপাড়ায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য *ঠিকানা* (২০০৬), *দক্ষিণা বাতাস* (২০০৬)।

খুলনায় বসবাসরত অন্য জেলার লেখক

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় যাঁদের পৈতৃকনিবাস কিন্তু খুলনা জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন, যাঁদের প্রকাশিত গ্রন্থ আছে, তাঁদের নামের তালিকা:

মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩): মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন। যশোর জেলার বিদ্যানন্দকাঠি গ্রামে তাঁর পৈতৃকনিবাস। বিয়ে হয়েছিল খুলনা জেলার দিঘলিয়া উপজেলার সেনহাটি গ্রামে। প্রকাশিত গ্রন্থ : *প্রিয় প্রসঙ্গ* (১৮৮৪), কাব্য- *কুসুমমাঞ্জলি* (১৮৯৩), *বীর কুমার বধ* কাব্য (১৯০৪)।

শেখ আব্দুল গনি (জ. ১৯২৮): সরকারি কর্মকর্তা, পৈতৃকনিবাস গ্রাম রাখালগাছি, উপজেলা ও জেলা বাগেরহাট। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য-*জলে জাগে ঢেউ*।

মীর আমির আলী (১৯৩২-১৯৯৬): কলেজের কর্মচারী। পৈতৃকনিবাস গ্রাম রামনগর, উপজেলা দৌলতখান, জেলা ভোলা। খুলনা মহানগরীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : *তুমি আজ কত দূরে* (১৯৬৩), *খুলনা শহরের ইতিহাস* (১৯৮০), ডুমুরিয়ার কৃষক আন্দোলন ও বিষ্ণু চ্যাটার্জি, *আদর্শ পাঠশালা ও অন্যান্য* (১৯৮৮), *খুলনার লোক সাহিত্য* (১৯৯৯)।

এ, কে. মকবুল আহমেদ (১৯৩৫-১৯৯১): সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা। পৈতৃকনিবাস গ্রাম: ভেলুকিয়া, জেলা: ভোলা। খুলনা মহানগরীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস *পথে বিপথে পথে,* গল্পগ্রন্থ- *নষ্ট যুবরাজ,* কাব্য- *আমার অভিজ্ঞান বলছে,* নাটিকা- খাদেম (বাং ১৩৫৮), *ধূসর মাটি, নীল আকাশ* (বাংলা-১৩৬৩), কবিতা *অনুরাগ,* নাটক-*গাঁয়ের মেয়ে, লতা বৌদি*।

মো. বজলুল করিম (জ. ১৯৩৮): সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর, (পৈতৃকনিবাস গ্রাম চেচানিয়া দেওয়ানের পাড়া, থানা-করিমগঞ্জ, মহকুমা কৃষ্ণনগর, জেলা নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। প্রকাশিত গ্রন্থ : *অস্তিত্ববাদ ও মানবতাবাদ* (১৯৮৩), *হেগেলোত্তর দর্শন* (১৯৮৬), *ব্রজলাল কলেজের ইতিহাস* (১৯৮৯), *শিক্ষা ও প্রশাসনে মন্দির মসজিদের ভূমিকা* (২০০৩), *বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোনো বিবর্তনের ধারায়* (২০০৮-১০), *কুষ্টিয়ার দৌলতপুরকে যেমন দেখেছি* (২০১২), *খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস* (২০১২)।

মোহম্মদ মোশাররাফ হোসেন (জ. ১৯৩৯): অবসরপ্রাপ্ত বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী, গীতিকার বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন, পৈতৃকনিবাস গ্রাম: বেতকা, উপজেলা: কাউখালী, জেলা: পিরোজপুর। প্রকাশিত গ্রন্থ: *ভ্রমণ কাহিনী -পোতে পোতাশ্রয়ে* (১৯৮৮), *বর্ণের ছড়াগুচ্ছ* (১৯৯৪)।

হাসান আজিজুল হক (জ. ১৯৩৯): রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ছোটো গল্পকার, প্রাবন্ধিক কথাশিল্পী। পৈতৃকনিবাস-ভারতের বর্ধমান জেলায়। পরে খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলায় স্থায়ী হন। বর্তমানে রাজশাহীতে বসবাস করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস- *শামুক, বৃত্তায়ন,* (১৯৯১), *'শিউলি'* (২০০৬), *আগুনপাখি'* (২০০৬), *সাবিত্রী* উপাখ্যান (২০১৩), *সমুদ্রের স্বপ্ন শীতল অরণ্য* (১৯৬৪), *জীবন ঘষে আগুন* (১৯৭৩), *নামহীন গোত্রহীন* (১৯৭৬), *'পাতালে হাসপাতাল'* (১৯৮১), *আমরা অপেক্ষা করছি* (১৯৮৯), *রোদে যাবো* (১৯৯৫), *মা মেয়ের সংসার (১৯৯৭), বিধবাদের কথা ও অন্যান্য গল্প* (২০০৭); *অতঃপর আঁধি* (১৯৯৮), *কথা লেখা কথা* (২০০৩), *লোকযাত্রা আধুনিক সাহিত্য* (২০০৫), *বাচনিক আত্মজৈবনিক*

(২০১১), *রবীন্দ্রনাথ ও ভাষা ভাবনা* (২০১৪) দর্শন বিষয়ক কিশোর সাহিত্য *লাল ঘোড়া আমি* (১৯৮৪), *চালচিত্রের খুঁটিনাটি* (১৯৮৬),*একাত্তর: করতলে ছিন্নমাথা* (২০০৫), প্রবন্ধ গ্রন্থ: *কথাসাহিত্যের কথকতা* (১৯৮১), *অপ্রকাশের ভার* (১৯৮৮), *সক্রেটিস* (১৯৮৬)।তিনি ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে আদমজী সাহিত্য পুরস্কার এবং ১৯৭০-এ বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আরও অনেক পুরস্কার, পদক ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন তিনি। ১৯৯৯ -এ তিনি একুশে পদকও লাভ করেন।

মনু ইসলাম: সাহিত্য সংগঠক, আইনজীবী। জন্ম (১৯৫৪), বাকেরগঞ্জ, বরিশাল। পিতার চাকরিসূত্রে স্কুল জীবন থেকে খুলনায় বেড়ে ওঠা। ১৯৭৮ সাল থেকে খুলনায় 'কবিতালাপ' সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: শিল্প সাহিত্য সুন্দরবন, ব্যক্তিত্ব '........... ফ্রম বাংলাদেশ, পোর্ট সিটি খুলনা, হুজ হু ইন বাংলাদেশ ইত্যাদি।

জোয়ারদার আসাদুজ্জামান (জ. ১৯৪০): প্রাক্তন সরকারি কর্মকর্তা (পৈতৃকনিবাস গ্রাম সারঙ্গদিয়া, উপজেলা: শ্রীপুর, জেলা: মাগুরা। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য- *অমরগাথা* (বাং ১৪১০), *চিত্তে বেতন* (২০০৫), *খালি তরী বইলো ঘাটে* (২০০৬), *বাজাই ব্যথার বাঁশি* (২০০৬), *বাজে আমার হিয়ার মাঝে* (২০০৯), *নির্বাচিত কবিতা* (২০১৪)। বিভিন্ন সংগঠন থেকে পদক ও স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত।

শাহনাজ বেগম (জ. ১৯৪১): সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর। পৈতৃকনিবাস চট্টগ্রাম শহর। প্রকাশিত গ্রন্থ : *টেরাকোটা* (২০০২)।

মাজেদা হক (জ. ১৯৪২): সংস্কৃতিকর্মী। পৈতৃকনিবাস - সাতক্ষীরা জেলায় প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা - *ত্রিধারা* (২০০২), *দৃষ্টির সীমানায় কপোতাক্ষের মরা বাঁকে*- ছোটোগল্প।

মিনা রহমান (জ. ১৯৪২): পৈতৃকনিবাস - বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার ভাবনা গ্রামে। বর্তমানে খুলনা শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : *এক স্বপ্নের পূর্ণিমায়* (১৯৯৮), *এক তৃষ্ণার ভাগীরথী* (১৯৯৯)।

আলমগীর মহিউদ্দিন হাদি: প্রাক্তন অধ্যক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস *অমাবস্যা* (জ. ১৯৯০), *আকাশ ও ধরিত্রী* (১৯৬০)।

স.ম. আবুল বাশার (জ. ১৯৪৪): সরকারি চাকরিজীবী। পৈতৃকনিবাস - গ্রাম বাবরখানা, উপজেলা: উজিরপুর, জেলা: বরিশাল। খুলনা শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: *মামার বড়াই, ভোরের হাওয়া* (২০০৩)।

শেখ গাউস মিয়া (জ. ১৯৪৫): পিএইচ.ডি, সরকারি কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক, পৈতৃকনিবাস - বাগেরহাট জেলার বাদে কাড়াপাড়া গ্রামে। প্রকাশিত গ্রন্থ: *বাগেরহাটের ইতিহাস* ২য় খন্ড (২০০৩), *মহানগরী খুলনা: ইতিহাসের আলোকে* (২০০৪), *মুক্তি সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ* (২০০৫), *মুক্তিযুদ্ধে খুলনা জেলা*

(২০০৬), *ভাষা আন্দোলন খুলনা ও বাগেরহাট* (২০০৮), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ: সুন্দর সাব সেক্টর* (২০১১), *বাংলাদেশের উৎসব ও মেলা - বৃহত্তর খুলনা জেলা* (২০১২)।

সুশান্ত সরকার (জ. ১৯৪৫): সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর গবেষক, গীতিকার ও নাট্যকার বাংলাদেশ বেতার। পৈতৃকনিবাস – গ্রাম: বিষ্ণুপুর, জেলা: বাগেরহাট। প্রকাশিত গ্রন্থ: *পুঁজ পাঁচড়ার পাঁচালি* (১৯৮৭), *পালি প্রাকৃত সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব সমীক্ষা* (১৯৮৮), *কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার* (১৯৮৯), *ফলবতী মৃত্তিকা* (১৯৯২), *উইলিয়াম কেরি: জীবন ও সাধনা* (১৯৯৩), *বিরুদ্ধ বাতাসে* (১৯৯৬), *নোনামাটি* (১৯৯৭) কাব্য- *অন্তরে অনন্ত জ্বালা* (২০০৮), অনুবাদ: *প্লেয়িং বোয়াল* (২০০৪), *লোক সাংস্কৃতিক আঙ্গিকে নাট্য উপাদান* (২০০৪), *ধীরেন্দ্রনাথ পাল একাকী অভিযাত্রী* (২০০৫), *ভিন্ন ভুবনে রবীন্দ্রনাথ* (২০০৮)।

নূরজাহান বেগম শেলী (জ.১৯৪৫): শিক্ষিকা; পৈতৃকনিবাস চট্টগ্রামে। বর্তমানে খুলনা মহানগরীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ- কবিতা *অবশেষে ভোর* (২০০৩)।

অচিন্ত্য কুমার ভৌমিক (জ. ১৯৪৭): সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ছোটো গল্পকার, গীতিকার ও নাট্যকার - বাংলাদেশ বেতার। পৈতৃকনিবাস নড়াইল জেলার লোহাগড়ায়। বর্তমানে খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলার দামোদর গ্রামের সাহাপাড়া রোডে স্থায়ীভাবে বসবাস। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাহিনী কাব্য *চিকন কালার বাঁশী* (১৯৬৩), *মোর বিয়ে হবি কবে* (১৯৬৪)। গ্রন্থ দুটি নড়াইলের দীপালী প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

হুমায়ন কবির বালু (১৯৪৭-২০০৪): মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, সাংবাদিক ও সভাপতি, খুলনা প্রেস ক্লাব। নড়াইল জেলার ইতনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ-খুলনা কমিটির যুগ্ম আহবায়ক ছিলেন। তিনি ১৯৮৪ সালে নব গঠিত খুলনা প্রেস ক্লাবের প্রথম সাধারণ সম্পাদক এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দৈনিক জন্মভূমির প্রকাশক-সম্পাদক ও খুলনা প্রেস ক্লাবের সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন। ২০০৪ সালের ২৭ জুন হুমায়ুন *কবীর বালু* নিজ কর্মস্থল 'দৈনিক জন্মভূমি'-এর প্রধান ফটকে সন্ত্রাসীদের বোমা হামলায় নিহত হন। পরবর্তীকালে তাঁকে মরণোত্তর রাষ্ট্রীয় সম্মাননা একুশে পদকে ভূষিত হন।

মানিক চন্দ্র সাহা (১৯৫৬-২০০৪): মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক ও সভাপতি, খুলনা প্রেস ক্লাব। নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার চালতলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দৈনিক সংবাদে যোগদানের মাধমে তিনি সাংবাদিকতার জীবন শুরু করেন। পরবর্তীকালে তিনি বিবিসি এবং একুশে টিভি'র খুলনা প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৪ সালের ১৫ জানুয়ারি *খুলনা* প্রেস ক্লাবের কাছে ছোট মির্জাপুরের রাস্তায় বোমা হামলায় নিহত হন। মৃত্যুকালে তিনি ইংরেজি

দৈনিক নিউ এজ এবং বিবিসি'র সাথে জড়িত ছিলেন। খুলনা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। মানিক চন্দ্র সাহা মরণোত্তর রাষ্ট্রীয় সম্মাননা একুশে পদকে ভূষিত হন।

এফ এম তৈয়বুর রহমান (জ. ১৯৪৯): সাহিত্য সংগঠক, পৈতৃকনিবাস ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলার কবির গাঁও গ্রামে। বর্তমানে খুলনা শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: *ছন্দ মালা* (১৯৯০), *পল্লি বধূয়া* (১৯৯০), *বিচিত্রা* (১৯৯০), গল্পগ্রন্থ *বড়ো পাঠা* (১৯৯০), *মরুপথে যাত্রা* (১৯৯১), *কবির কল্পনা* (১৯৯৩), *বাণী* (১৯৯২), *কবিত্ব লাভ* (১৯৯৫), গল্পগ্রন্থ- *হলদে পাখি* (১৯৯৫), *বঙ্গবন্ধু* (১৯৯৫), *ইসলামী শিহরণ* (১৯৯৫)।

বিজন বিহারী শর্মা (জ. ১৯৪৯): চাকরিজীবী, প্রকৌশলী থেকে স্নাতক। পৈতৃকনিবাস দৌলতখান বাজার, জেলা-ভোলা। প্রকাশিত গ্রন্থ: *মল্লিকা, আমার চন্দ্র মল্লিকা* (২০০০)।

বেগম ফেরদৌসী আলী (জ. ১৯৫০): দি ডেইলি ট্রিবিউন সম্পাদক, নারী নেত্রী ও উদ্যোক্তা, পৈতৃকনিবাস, ফরিদপুর শহরের ঝিলটুলি। প্রকাশিত গ্রন্থ: *দেখে আসা দিনগুলি* (২০০৯)।

রোজি রহমান (জ. ১৯৫১): জন্মস্থান গ্রাম: বড়োবেরাইদ, থানা বাড্ডা, ঢাকা। সংস্কৃতিকর্মী। বর্তমানে খুলনা মহানগরীতে স্থায়ীভাবে বসবাস। প্রকাশিত গ্রন্থ: *স্মৃতির পাখিরা কথা কয়* (২০০৫), *রোজি রহমানের একগুচ্ছ কবিতা* (২০০৫), *রোজি রহমানের আরও একগুচ্ছ কবিতা* (২০০৭)।

গাজী আব্দুল্লাহেল বাকী (১৯৫১-): পিএইচ.ডি, অধ্যাপক, পৈতৃকনিবাস সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার উকশা গ্রামে। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য *PEACE LOST AND REGAINED* (১৯৯৫), *শান্তির হৃদয় একটি* (১৯৯৬), *হরিণীর সবুজ চোখ* (১৯৯৭), *কাঠবিড়ালির ভাবনা* (১৯৯৮), *স্বদেশ প্রেম* (১৯৭১), *রুবাইয়াত* (২০০০) দয় একটি (১৯৯৬), *কাঠবিড়ালির ভাবনা* (১৯৯৮), *রুবাইয়াত* (২০০০)। বর্তমানে খুলনা শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

এসএম, আতিউর রহমান (জ. ১৯৫২): সরকারি চাকরিজীবী (পৈতৃকনিবাস গ্রাম সড়াতলা, জেলা নড়াইল) প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য *ডাকে পিয়া প্রিয়া* (২০০৬)।

রহিমা জালাল হাসি (জ. ১৯৫৪): সংস্কৃতিকর্মী, (পৈতৃকনিবাস-শেখের হাট, জেলা-ঝালকাঠি)। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য *মিনি প্যাকে ভালবাসা* ২০১২।

মো. ইউসুফ আলী চিশতী (জ. ১৯৫৪): সাহিত্য সংগঠক। পৈতৃকনিবাস পিরোজপুর জেলায়। বর্তমানে খুলনা শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস। প্রকাশিত গ্রন্থ: *কাব্য আলোর শিখা, আলোর ভুবন*।

আশরাফ উল আলম (জ. ১৯৫৪): এনজিও ব্যক্তিত্ব। পৈতৃকনিবাস ঝিনাইদহ জেলায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : *দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়নের পন্থা অন্বেষা* (১৯৯৭), *খাস জমির লড়াই* (১৯৯৮), *জলাবদ্ধ বিল ডাকাতিয়া ও ভবদহর কৃষক আন্দোলন* (১৯৯৯), *শহিদ করুণাময়ী সরদারের রক্তাক্ত পদচিহ্ন বেয়ে* (২০০০)।

ডি কে মন্ডল (দুলাল কুমার মন্ডল) (জ. ১৯৫৪): পত্রিকার সম্পাদক, সাহিত্য সংগঠক। পৈতৃকনিবাস, গ্রাম বিঘাই, উপজেলা ফকিরহাট, জেলা বাগেরহাট। বর্তমানে খুলনা মহানগরীতে স্থায়ীভাবে বসবাস। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য *পাতা ঝরার দিন* (১৯৯৬), *বীজবোনার সময় এখন* (১৯৯৬), গবেষণা *মধ্যবিত্তের চিঠি* (১৯৯২), *মাদকাসক্তির বিষাক্ত ছোবল* (১৯৯২) উপন্যাস- *মানুষ নয়, সব মানুষ* (১৯৯৪), *সমাধান অন্যরকম* (১৯৯৩), *অসময়ের অতিথি* (১৯৯৬), *বিলম্বিত বিবেদ* (১৯৯৫), *তুমি শুধু আমার* (১৯৯৭), *কলংকিত বাসর* (১৯৯৫), *দায়মুক্ত* (১৯৯৭), *গন্তব্যে হলো না ফেরা* (১৯৯৭), *বৈরী হাওয়া* (২০১০), ভগবানের ঠিকানা (২০১৪)।

সাহিদা আখতার পুতুল (জ. ১৯৫৫): অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা, সংস্কৃতিকর্মী। পৈতৃকনিবাস কুমিল্লা জেলায়। বর্তমানে খুলনা শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য *প্রেক্ষণ* (২০০৬)।

জাহানারা আলী জানু: (জ. ১৯৫৬): শিক্ষিকা (অবসরপ্রাপ্ত), পৈতৃকনিবাস গোপালগঞ্জ জেলায়। বর্তমানে খুলনা শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস। প্রকাশিত গ্রন্থ কাব্য- *স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি*, *গল্প-পোড়া ফুলের গন্ধ*।

দুখু বাঙাল (মুহম্মদ ইসহাক দুখু) (জ. ১৯৫৭): সরকরি চাকরি থেকে স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ। পৈতৃকনিবাস পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার ছোটো ডালিয়া গ্রামে। বর্তমানে খুলনা শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। সম্মাননা পদক ও সম্মাননা স্মারকপ্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য *নির্বাচিত নির্বাসন* (১৯৮৬), *নির্জন পাথর* (১৯৯৪), *কাছে আসি দূরে যাই* (২০০১), *সমুদ্র সান্নিধ্যে মন* (২০১১)।

আলী কাশেম (জ. ১৯৫৭): সংস্কৃতিকর্মী, পৈতৃকনিবাস-গ্রাম মাছিয়াড়া, উপজেলা-মুকসুদপুর, জেলা-গোপালগঞ্জ। প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা *একুশ বছর ঘুমের ভিতর হাঁটা* (১৯৯৮)।

অমিয় পাল (জ. ১৯৫৮): শিক্ষক, সাংবাদিক। পৈতৃকনিবাস গ্রাম-দিঘলকান্তি, উপজেলা ও জেলা: মাগুরা প্রকাশিত গ্রন্থ: *কাব্য* (১৯৯৩)।

হাসনা হেনা (জ. ১৯৫৯): সাহিত্য সংগঠক। পৈতৃকনিবাস গ্রাম আলোকদিয়া, উপজেলা ও জেলা: মাগুরা। বর্তমানে খুলনা মহানগরীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য-*ভালোবাসার নতুন পৃথিবী অবিশ্বাসের,*

অগ্নিগ্রাসের স্বপ্নের পাখিরা (২০০৫), *ভালোবাসার উৎসারিত আলো, আমি বাংলার মেয়ে, শেষ গোলাপ* (২০১৩)।

অর্পণউজ্জামান (জ. ১৯৫৯): আইনজীবী ও কবি। সত্তর দশকে লেখালেখি শুরু করেন। পৈতৃকনিবাস গ্রাম খলিশাখালী, উপজেলা: কাশিয়ানী, জেলা: গোপালগঞ্জ প্রকাশিত গ্রন্থ: *চন্দ্রভুক বন্য বিড়াল* (১৯৯৪)।

মো. জাকির হোসেন (জ. ১৯৫৯): এম.এ. পিএইচডি, সাংবাদিক ও আইনজীবী। পৈতৃকনিবাস গ্রাম মিরুখালী, উপজেলা: মঠবাড়িয়া, জেলা: পিরোজপুর। প্রকাশিত গ্রন্থ: কবিতা- *সেই এলে এতদিন পর* (২০১৪)।

এ,কে আজাদ (জ. ১৯৬০): সংস্কৃতিকর্মী। পৈতৃকনিবাস গ্রাম দৈবজ্ঞহাটি, উপজেলা: মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট। প্রকাশিত গ্রন্থ: কবিতা *নাক্ষত্রিক অভিষেক শেষে* (২০১৪)।

আবুল খায়ের মোস্তফা (জ. ১৯৬০): ব্যাংকার, পৈতৃকনিবাস বাগেরহাট জেলায়। বর্তমানে খুলনা মহানগরীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ *ধূসর দৃষ্টির সীমানা* (২০০৫), *লিফিং গ্লাস* (২০০৮)।

ফরিদ আহমেদ (জ. ১৯৬৫): সংবাদপত্রের সম্পাদক, আইনজীবী। পৈতৃকনিবাস গ্রাম: পাথালিয়া, জেলা: গোপালগঞ্জ। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভ্রমণ কাহিনী- *ভ্রমণ ও ইতিহাস* (২০১২)।

জেসমিন আকরাম (জ. ১৯৬৫): সংস্কৃতিকর্মী, পৈতৃকনিবাস গ্রাম দশানী, উপজেলা ও জেলা: বাগেরহাট। বর্তমানে খুলনা শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য *নীল ডানায়* (২০০৫), *ধূসর বকুল* (২০০৬), উপন্যাস- *বিন্দি* (২০০৬)।

আল ওয়াহিদ (শেখ ওয়াহিদুজ্জামান আল ওয়াহিদ) (জ. ১৯৬৭): পত্রিকার সম্পাদক, সাহিত্য সংগঠক। পৈতৃকনিবাস: গিমাডাঙ্গা গ্রাম, উপজেলা: টুঙ্গিপাড়া, জেলা: গোপালগঞ্জ। বর্তমানে খুলনা শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ কাব্য- *রাজসাক্ষী* (২০০৬), *রক্তের জলে আদিমাগুন* (২০০৬), *সাত রাজার ধন* (২০০৭), *কাব্যদূত* (২০০৭), *অভিনব* ‘ কাব্যরীতি সাত নারী ’(২০০৭)।

সঞ্জীব হাউলী (জ. ১৯৬৭): সাহিত্য সংগঠক, সরকারি চাকরিজীবী। পৈতৃকনিবাস গ্রাম পাঁচবাড়িয়া, উপজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা: সাতক্ষীরা। বর্তমানে খুলনা নগরীতে স্থায়ীভাবে বসবাস। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস- *ট্রাপ* (১৯৯৮), *প্রেমের জ্বালা* (১৯৯৯), *যোগ্য পিতার যোগ্য কন্যা* (২০০০), প্রবন্ধ- *হত্যার প্রতিবাদে* (২০০১), *সমকালীন লেখক রত্ন* (২০০৬), *খুলনার ত্রিরত্ন* (২০১০), *নতুন নিরীক্ষায় নজরুল* (২০১২)।

সেলিম আলতাফ (জ. ১৯৬৮): সংস্কৃতিকর্মী, পৈতৃকনিবাস রাজশাহী জেলায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস - *অনিন্দ্য অন্যতম* (১৯৯১) *জোছনা* (বাং ১৪১২)।

আসিফ আলতাফ (জ. ১৯৬৮): পৈতৃকনিবাস গ্রাম ভীমকাঠি, উপজেলা: নাজিরপুর, জেলা: পিরোজপুর। সহকারী অধ্যাপক (বাংলা), সাংবাদিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : *কৃষ্ণ মেঘের কাব্য* (২০০৫), *গৎকিঞ্চিৎ* (২০০৭), *জল তৃষ্ণার কাঁদে জলজ শরীর* (২০১০)।

শেখ মনিরুজ্জামান (জ. ১৯৬৯): চাকরিজীবী, এম.এ (পৈতৃকনিবাস গ্রাম লাল চন্দ্রপুর, উপজেলা: ফকিরহাট, জেলা: বাগেরহাট। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য- *ভালবাসা* (২০১৩), *রঙিন স্বপ্ন* (২০১৪)।

নাসির আহমেদ (জ. ১৯৬৯): ব্যাবসায়ী। পৈতৃকনিবাস ভোলা জেলা। প্রকাশিত গ্রন্থ : ছোটোগল্প - *আহত আর্তনাদ* (২০০৮)।

মুর্শিদা আহমেদ (জ. ১৯৬৯): প্রধান শিক্ষিকা: সংগীতশিল্পী, পৈতৃকনিবাস গ্রাম: চন্দ্র দিঘলিয়া, উপজেলা: গোপালগঞ্জ, জেলা: গোপালগঞ্জ। প্রকাশিত গ্রন্থ : *কাব্য- কবিতার মতো ভারী সন্ধ্যায়* (২০০৭), *স্বর্গভ্রষ্ট কবিতার পংক্তি এক* (২০০৯), *অগ্রন্থিত কবিতার গল্প কোনো* (২০১০), *বৃষ্টির দিয়াশলাই, ঠোকা আগুনে কবিতার খাতা পোড়ে* (২০১০), *তোমার কাছে লেখা আমার সেই চিঠিখানা এই* (২০১১) *প্রাচ্যের কিশোরী এখন অনেক বড়ো* (২০১১), *জীবন মানে একমুঠো ভস্মের ছাই* (২০১২), *আমার যত গান আমার শত গান* (২০১২), *এক টুকু ছোঁয়া লাগে এক টুকু ছোঁয়া লাগে* (২০১২), *তুমি কেবলই ছবি* (২০১২), *ফিফটি পোয়েম অব মুর্শিদা আহমেদ* (অনুবাদ : সিদ্দিক মাহমুদুর রহমান) (২০১৩), *মানুষের পায়ের কাছে বসে আছি নিঃশব্দ তেলাপোকা হয়ে*।

এস এম হোসাইন বিল্লাহ (বাংলা জ. ১৩৬২): সংস্কৃতিকর্মী; গীতিকার বাংলাদেশ বেতার। পৈতৃকনিবাস গ্রাম গোবরা, জেলা: নড়াইল। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য- *এ যুগের সমাজ* (১৯৮১), *গ্রামের মাঝে স্বাধীনতা* (১৯৮৩), *দীর্ঘ দিবস পরে* (১৯৮৮), *পরিবর্তন চাই* (২০০২), গল্পগ্রন্থ : *টক মিষ্টি ঝাল* (১৯৮৬), কাব্য- *পাগলাঘণ্টা* (২০১২)। বিভিন্ন সংগঠন থেকে পদকপ্রাপ্ত।

ইউসুফ আফেনদী (জ. ১৯৭০): সংস্কৃতিকর্মী, পৈতৃকনিবাস গ্রাম: তেলিখালি, উপজেলা: ভান্ডারিয়া, জেলা: পিরোজপুর। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য- *যে আমি অন্যজন* (২০০৮) উপন্যাস- *অন্যরকম মেয়ে* (১৯৯৯), *মেয়েটি অন্য রকম* (১৯৯৯)।

কে. এম আমিনুর রহমান (জ. ১৯৭০): সংস্কৃতিকর্মী। পৈতৃকনিবাস গ্রাম দুধলী, উপজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা: সাতক্ষীরা। প্রকাশিত গ্রন্থ: *গাংচিল স্বপ্নের বসতি* (বাংলা ১৪০০)।

ফারহানা ইসলাম জয়া (জ. ১৯৭১): শিক্ষকতা, মিডিয়াকর্মী পৈতৃকনিবাস গোপালগঞ্জ জেলায়। বর্তমানে খুলনা শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস। প্রকাশিত গ্রন্থ: *স্বাধীনতার একগুচ্ছ কবিতা* (১৯৮৭), *ধূসর বিকেলের পলাতকা ছায়া* (১৯৮৮)।

রেবেকা সুলতানা রেবা (জ. ১৯৭১): সংস্কৃতিকর্মী। পৈতৃকনিবাস পিরোজপুর জেলায়। বর্তমানে খুলনা মহানগরীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: কবিতা - *রঙ বদল* (২০০৯)।

শওকত আলম (জ. ১৯৭৩): ডাক্তার, পৈতৃকনিবাস গ্রাম: গাবুরা, উপজেলা: শ্যামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা। বর্তমানে বটিয়াঘাটা উপজেলার নরনিয়া গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: *নিঝুম রাতে চাঁদের দেশে* (২০০৫)।

হুমাউন কবীর পলাশ (জ. ১৯৭৪): সাংবাদিকতা। পৈতৃকনিবাস গ্রাম: চন্দ্র দিঘলিয়া, উপজেলা ও জেলা: গোপালগঞ্জ। বর্তমানে স্থায়ীভাবে বসবাস খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার হাটবাটি নামক স্থানে। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস- *দুই পুরুষ* (১৯৯৬)।

রুবিনা ইয়াসমিন (জ. ১৯৭৭): সংস্কৃতিকর্মী। খুলনায় জন্ম। প্রকাশিত গ্রন্থ: *কাব্যসুখ আমিও চেয়েছিলাম* (২০০৩)।

মাহমুদা হোসেন মিতা (জ. ১৯৭৯): সংস্কৃতিকর্মী। পৈতৃকনিবাস গ্রাম খালিয়া, উপজেলা মনিরামপুর, জেলা-যশোর। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য- *নীল চিঠি* (১৯৯৫)।

ইমরুল কায়েস (জ. ১৯৭৯): উপাধ্যক্ষ, কবি ও গীতিকার বাংলাদেশ বেতার। তাঁর পৈতৃকনিবাস মাগুরা জেলার মোহম্মদপুর উপজেলার কলাগাছি গ্রামে। বর্তমানে তিনি খুলনা শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ: *আমার যদি থাকতো ডানা* (বাংলা ১৪১৭), কবিতা *জন্মদিনে* (২০০৩), *মায়াবী সন্ধ্যার আহ্বান* (২০১৪) *গান - গীতি শতদল* (২০১২)।

মাহমুদুল হাসান সেতু (জ. ১৯৮৬): পৈতৃকনিবাস গ্রাম: পাতাকালি, উপজেলা: শ্যামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা। বর্তমানে খুলনা শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য- *বেয়েনট* (২০১০), *বিমূর্ত ভালোবাসা* (২০০৯)।

মোহাম্মদ রানা কাজী (জ. ১৯৮৭): সংস্কৃতিকর্মী, পৈতৃকনিবাস গ্রাম: খাকছাড়া, উপজেলা: মাদারীপুর, জেলা: মাদারীপুর। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য- *সুতোকাটা ঘুড়ি* (২০১৪)।

তাহিরাতুজ জোহরা (জ. ১৯৯০): সংস্কৃতিকর্মী, পৈতৃকনিবাস নোয়াখালী জেলায়। প্রকাশিত গ্রন্থ কাব্য *শেষ ভাদরের বেলা* (২০০৬) *আলো আঁধারের হাতছানি* (২০০৮)।

মাইকেল সুশীল অধিকারী: প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রবন্ধ- *প্রত্যক্ষ প্রতিদিন,* কাব্য- *বিনাশের শৃংখলে, নিষ্ক্রিয় উৎকণ্ঠা, নদীর কাছে হার মেনেছি, পাপড়ি ঝরা*

ব্যথা, বলা না বলা কথা (প্রবন্ধ), *একরক্কি* , *রেভা.ই.এল. ওয়েংগার* (১৯৯৫), *হাসাশোসা কথা* (১৯৯৩)।

সিরাজাম মুনিরা আববাসী: পৈতৃকনিবাস গ্রাম: সোনাখালী, উপজেলা: মোরেলগঞ্জ, জেলা-বাগেরহাট। বর্তমানে স্থায়ীভাবে খুলনা শহরে বসবাস করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: কবিতা- *প্রতিবনুকুতা* (২০১৪)।

জাহিদ ইকবাল (১৯৭৮,): সংস্কৃতিকর্মী, পৈতৃকনিবাস গ্রাম গজালিয়া, উপজেলা কচুয়া, জেলা বাগেরহাট। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস- *প্রেম জুয়াড়ি* (২০০১), *বেদনায় নীল বৃষ্টি* (২০০৪), *নভেল পুরুষ* (২০০৫)।

সৈয়দা মর্জিনা খানম: পৈতৃকনিবাস পিরোজপুর জেলায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : *সুন্দরবন রতন*।

সুপ্রসাদ গোস্বামী: সংস্কৃতিকর্মী। প্রকাশিত গ্রন্থ: *ওখানে হাত দিও না* (১৯৮৮)।

স্মৃতিরেখা বিশ্বাস: সংস্কৃতিকর্মী। প্রকাশিত গ্রন্থ: কবিতা- *নিরুদ্ধ অন্ধকার* (১৯৯২)

নূরুল ইসলাম সিদ্দিকী: প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস- *পথ ভুলে যাই*।

আহসান উদ্দিন মোহাম্মদ: প্রকাশিত গ্রন্থ : জাজের পথে।

সাজ্জাদুর রহমান এলিন: জন্ম- খুলনা (১৯৬৯): প্রকাশিত গ্রন্থ: *নজরুল কাব্যের অন্তরালে*।

ফাতেমা আলী জন্ম (১৯৫৭, খুলনা) প্রকৃত নাম আফরোজা আখতার: সংস্কৃতিকর্মী। পৈতৃকনিবাস পাবনা জেলায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: *ইসলামে নারী* (১৯৯৫), *দ্বিতীয় জীবন* (২০০৫) women in Islam।

নাজিম শাহরিয়ার কবি ও সংস্কৃতিকর্মী। একজন অবসরপ্রাপ্ত চাকরীজীবী। পৈতৃকনিবাস উপজেলা বরদিয়া, নড়াইল। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য- *হীরকের মোহন মন্ত্র* (১৯৯৬), আমার তখন সতের (২০১৮)।

মো. এনায়েত আলী (জ. ১৯৫০): মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষাগত যোগ্যতা এম,এ বাংলা, প্রাক্তন অধ্যাপক ও সাংবাদিক, জন্মস্থান গ্রাম কৃষ্ণনগর, উপজেলা: পাইকগাছা, জেলা: খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: *বৃহত্তর খুলনার সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা* (১৯৯৭), *দক্ষিণ খুলনার মুক্তিযুদ্ধে ক্যাপ্টেন আফজাল হোসেন-এর অবদান* (২০১২), *লোক সাহিত্যের ঐতিহ্য* (২০১৪)।

রাজিয়া আহমেদ বাবু সৈয়দা (জ. ১৯৫০): জন্মস্থান খুলনা। শিক্ষকতা, নাট্যকার, ও কথা সহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: *মনফুল বসন্ত* (১৯৮৭), *এক ফুলকি অভিমান* (১৯৯২), *শুধু নির্বাচন* (২০১১), *মেঘলা আকাশ* (২০০৪)।

শেখ শাহাদাৎ হোসেন বাচ্চু (জ. ১৯৫০): শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবক। জন্ম খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলায় বাতিখালি গ্রামে। প্রকাশিত গ্রন্থ: *আচার্য আমার* (২০০২), *খুলনার লোকসাহিত্য ও সাহিত্যচর্চা* (২০০৮), *পাইকগাছা ও কয়রা থানার স্মরণী বরণীয় যাঁরা* (২০০৯)।

এস এম সামসুল আরেফিন (জ. ১৯৫১): জন্মস্থান-বেতবুনিয়া, জেলা-খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: স্মৃতি-১ (১৯৮১), *স্মৃতি-২* (১৯৯১), *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ব্যক্তির অবস্থান* (১৯৯৪), *কবিতা-স্বপ্নের দিনগুলি* (১৯৯৭)।

জ্যোতির্ময় মল্লিক (জ. ১৯৫২): ছড়াকার, সাংবাদিক, সাহিত্য সংগঠক। পৈতৃকনিবাস গ্রাম: বয়ারডাঙ্গা, উপজেলা: বটিয়াঘাটা, মুক্তিযোদ্ধা মেজর জেলা খুলনা। বর্তমানে খুলনা শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস। প্রকাশিত গ্রন্থ: *ছোটোদের গল্পগ্রন্থ, পাহাড় চূড়ায় আগুন, সিংহের কেশর, গোয়েন্দার দুর্গতি, আমুদে পাহাড়,* অনুবাদ *অন্য দেশে রূপকথা* , ছড়া কবিতা- *খোকনরে তুই দেখে যা, মেঘ গুড় গুড় বৃষ্টি, রং বেরংর এর রূপকথা,* ছড়া -*পদ্ম পাতায় খই,* গবেষণা- *প্রবাদ ও লোক পরিবেশ, নীল রূপকথা*।

কবীর জাহাঙ্গীর (জ. ১৯৫২): কবি, সাংবাদিক, পৈতৃকনিবাস গ্রাম হরিশপুর, থানা: আমতা, জেলা: হাওড়া, ভারত। বর্তমানে খুলনা শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য *একাকি মধ্যরাতে* (২০০৩)। ছোটোগল্প *শেষ বিকেলের বৃষ্টি* (২০০৫)।

মশিরুজ্জামান (জ. ১৯৫২): সংস্কৃতিকর্মী, খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলার পয়গ্রাম কসবায় পূর্ব পুরুষদের বাড়ি ছিল। প্রকাশিত গ্রন্থ: *কাব্য শিকড় ভাবনা* (২০০৪), *কৌম* (২০০৬)।

বেগম হাসিনা জহুর (জ. ১৯৫৩): শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক, গ্রাম: গাড়াখোলা, উপজেলা: ফুলতলা। জেলা: খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস *অদৃশ্য খেয়াল* (২০০৮), *গহীন ভিতরে* (১৯৯৯), *স্মৃতির সবুজ দ্বীপে* (১৯৯৫), *অনুরাগের পরে* (২০০০), *অন্ধকারে পরাকাষ্ঠা* (২০০২) কাব্য: *চেতনার সৈকতে* (১৯৯২)।

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম (জ. ১৯৫৩): সরকারি কলেজের অধ্যাপক, গীতিকার ও নাট্যকার বাংলাদেশ বেতার, জন্মস্থান: গ্রাম: ঘুঘরাকাঠি, উপজেলা: কয়রা, জেলা: খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য- *হৃদয়ের একূল ওকূল* (২০০৬), *যৌবন কেন অস্থির ও তারার দেশের চাঁদ*।

নিজামউদ্দিন আহমেদ (জ. ১৯৫৪): অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা, অধ্যাপক, সংস্কৃতিকর্মী। পৈতৃকনিবাস ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণা জেলা। বর্তমানে খুলনা শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস -*আর এক কক্ষে* (১৯৯৭), ছোটোগল্প-*বন্দর বউ* (২০১১), কবিতা-*রুখো সভ্যতার সতীত্ব বিনাসীদের, তোমার উপমা তুমি* (১৯৯৯)।

আনোয়ার আহমেদ (জ. ১৯৫৪): সাংবাদিক। পৈতৃকনিবাস ভারতের পশ্চিম বাংলায়। বর্তমানে খুলনা শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস। প্রকাশিত গ্রন্থ: কবিতা- *হৈমন্তী তোমাকে*। প্রবন্ধ- *ঢাকার বাইরে সাংবাদিকতা*।

বিজয়া চক্রবর্তী (জ. ১৯৫৫): শিক্ষিকা। জন্ম খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলার দক্ষিণডিহি গ্রামে। প্রকাশিত গ্রন্থ: কবিতা- *নীরব প্রতিবাদ* (২০০৭)।

আলী হোসেন মনির (জ. ১৯৫৫): সংস্কৃতিকর্মী, পৈতৃকনিবাস গ্রাম পানপুর, জেলা নদীয়া, ভারত। খুলনা শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : গল্পগ্রন্থ *উড্ডীন জীবন* (১৯৯০)।

রানা রাজ্জাক (জ. ১৯৫৬): পিএইচ.ডি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, খুলনা শহরে জন্ম। প্রকাশিত গ্রন্থ: অনুবাদ- *হাতির দাঁতের ফাকুই* (১৯৮২)।

মল্লিক নিজাম উদ্দিন (জ. ১৯৫৬): সংস্কৃতিকর্মী। জন্মস্থান গ্রাম: দেওয়ানা, থানা: দৌলতপুর, জেলা: খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য- *অবরুদ্ধ* (২০০৬)।

আশরাফ বাবুল (জ. ১৯৫৬): সরকারি অধ্যাপক (বাংলা), জন্মস্থান : গ্রাম: দুর্জনী মহলো, উপজেলা: রূপসা, জেলা: খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য- *মিছিল নিষিদ্ধ এখন, দেখা হবে জ্যোৎস্নার হাটে,* উপন্যাস- *তবু দূরে*।

খান আখতার হোসেন (জ. ১৯৫৭): অধ্যক্ষ, খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার শাহপুর গ্রামে জন্ম। প্রকাশিত গ্রন্থ: *ফটোগ্রাফি শিক্ষা* (১৯৮৩), *শিল্প সম্পর্ক,* (১৯৯৬), *তবু নে পড়ে* (উপন্যাস ২০০০), *চুক নগরের লাশ* (২০০২), *দক্ষিণ বাংলার লেখক পরিচিতি* (২০০৭), *আবেগী ঝড়* (২০১২), *ফড়িং মেয়ে* (২০১৩), *টান* (২০১৩)।

শেখ আখতার হোসেন (জ. ১৯৫৯): ব্যাবসায়ী, জন্মস্থান দেওয়ানা, দৌলতপুর, খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: *খুলনার প্রতিভা* (১৯৮০), *বাঁশহদের তোলপাড়* (১৯৮০), *সাহিত্যিক ডা. আবুল কাসেম* (১৯৮০), *রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক ডা. মোজাম্মেল হোসেন* (১৯৮৫), *সাহিত্যিক মওলানা আহমাদ আলী* (১৯৮৬), *দক্ষিণ বাংলার দুই সাহিত্যিক* (১৯৮৬)।

শেখ অলিউর রহমান (জ. ১৯৫৮), প্রধান শিক্ষক কবি, গ্রাম: খান মহম্মদপুর, উপজেলা: রূপসা, জেলা: খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য- *শেষ হবে কৃষ্ণ পক্ষ* (২০০৯), *৩২ নম্বর ধানমন্ডি সড়ক* (১৯৯৯ ও ২০০৫), *নিজভূমে পরবাসী* (২০০৫)। *স্বাধীনতা ঘোষণার ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও ঘুমোতে পারি না আমি, অবদানের জন্য পদকপ্রাপ্ত*।

শেখ আবু আসলাম বাবু (জ. ১৯৫৯): সাংবাদিক ও সংস্কৃতিকর্মী। জন্ম খুলনা মহানগরীর দৌলতপুর। প্রকাশিত গ্রন্থ: *আর বিলম্ব নয়* (১৯৮৮), *মহানবীর আদর্শ ও বিশ্বশান্তি* (১৯৮৮), *বিশ্ব অলিম্পিক ও আমরা* (১৯৯২)।

এম,এ মজিদ (জ. ১৯৫৯): চাকরিজীবী, জন্মস্থান; গ্রাম: কুমারঘাটা, উপজেলা ডুমুরিয়া, জেলা: খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ : *মোঘল হাটের সন্ধ্যা* (১৯৭৯), *রক্ত দিয়ে বোনের বিয়ে* (১৯৯৫), *জাল সন্ন্যাসী* (১৯৯৫)।

রিনা নাসরিন (জ. ১৯৬০): পেশায় ব্যাংকার, কবি; পৈতৃকনিবাস খুলনা জেলার রূপসা উপজেলায়। খুলনা শহরে জন্ম। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস- *ঐখানে যাব* (২০০৪), কবিতা- *দ্বৈত সুবাস* (১৯৯২), *ঘাস শিশিরের বসতবাড়ি* (২০০২)।

আমজাদ হোসেন (জ. ১৯৬০): সংস্কৃতিকর্মী, প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য *ধন্যবাদ* (২০০৬)।

হাফিজুর রহমান: কবি ও সংস্কৃতিকর্মী। প্রাক্তন চেয়ারম্যান যশোর শিক্ষা বোর্ড। জন্ম (১৯৫৩), জন্মস্থান: ডুমুরিয়া, খুলনা। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ: দীর্ঘশ্বাসের বাঁশি (১৯৮৬), এপিটাফ ও অন্যান্য কবিতা (২০১২), ছায়ার সাথে বসবাস (২০১৬) ৪. সময় অসময় দুঃসময় (২০১৮)।

খান শওকত (জ. ১৯৬০): সংস্কৃতিকর্মী, কবি জন্মস্থান: গ্রাম: শাহপুর, উপজেলা: ডুমুরিয়া, খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: *যাদু ও ম্যাজিক* (১৯৯১), কাব্য- *আমেরিকা থেকে বলছি* (২০০৫), *প্রেম দিও না অস্ত্র দাও* (২০০৫)।

জি, এম. এমদাদ (জ. ১৯৬১): শিক্ষক, সাংবাদিক, জন্মস্থান গ্রাম: রামনগর, উপজেলা: পাইকগাছা, জেলা: খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: ইতিহাস, *সাদা সোনার রাজ্য (*২০০৬), নাটক- *ফিরে দেখা* (২০০৭)।

প্রভারঞ্জন বিশ্বাস ধীরাজ (জ. ১৯৬১): শিক্ষক, জন্মস্থান: গ্রাম: ফেদুয়ার আবাদ, উপজেলা: পাইকগাছা, জেলা খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য *নীলাঞ্জলি* (২০০৫), *প্রেমাশ্রু* (২০০৬)।

কাজী রফিকুল ইসলাম (জ. ১৯৬১): সাংবাদিক ও সংস্কৃতিকর্মী, শিক্ষক। জন্মস্থান : গ্রাম: গাইকুড়, থানা দৌলতপুর, খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য- *জন্মের আগে আমি* (১৯৮৬)।

মিনু মমতাজ (জ. ১৯৬৩২): অধ্যাপিকা, কবি ও সংস্কৃতিকর্মী, জন্মস্থান : খুলনা শহরে। প্রকাশিত গ্রন্থ : *মধ্যরাতের জানালায়* (২০০২), *বিসমিল্লাহ* (২০০২)।

বাসুদেব বিশ্বাস বাবলা (জ. ১৯৬৩): জন্মস্থান: পশ্চিম টুটপাড়া, খুলনা। সংগীত শিক্ষক। প্রকাশিত গ্রন্থ : *দক্ষিণবঙ্গের লোক সংগীত* (২০১২)।

তাপস বিশ্বাস (জ. ১৯৬৪): সহকারী অধ্যাপক, খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার শলুয়া গ্রামে জন্ম। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য- *কালের বাতাস, পদধ্বনি* (২০১১)।

নুরুন নাহার হীরা (জ. ১৯৬৫): সংস্কৃতিকর্মী, জন্মস্থান : গ্রাম শাহপুর, উপজেলা: ডুমুরিয়া, জেলা: খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: *রক্তাপ্লুত বাবার মুখ*।

স. ম. হাফিজুল ইসলাম (জ. ১৯৬৫): সাহিত্য সংগঠক। জন্মস্থান-খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার পাটকেলপোতা গ্রামে। বর্তমানে খুলনা শহরে বসবাস। প্রকাশিত গ্রন্থ: *ইসলামে নবলি অধিকার ও আদর্শজীবন* (২০০৬), *বিশ্ব ইসলামী জ্ঞানের বাগিচা ও অমূল্য বাণী* (২০০৫), *গোল কাঠের খনশরিমা* (২০০০), *সত্যগল্প কাহিনী* (২০০২), *যাও পাখি বল তারে* (কাব্য, ২০০৫)।

শাহী সবুর (জ. ১৯৬৬): ব্যাবসায়ী। গীতিকার, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার। গ্রাম: লাখোহাটি, উপজেলা: দিঘলিয়া, জেলা: খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: কবিতা *ভৃত্যের বাসনা* (২০১১), *চিত্তচোর* (২০১১), *কাব্য ধারায় বিশ্বনবীর জীবনী* (২০১৪); উপন্যাস- *বালিয়াডাঙ্গার বউ* (২০১২), গীতিনাট্য- *তারা সুন্দরী, নীল সাগরের ঢেউ, পরবাসে বারদিন,* ছড়া-*শিয়াল মামার বিয়ে, ছন্দে পড়া মজার পড়া , ছন্দে ছড়ায় বর্ণ শিক্ষা ও চন্দনগীতির মধুমালা।*

প্রকাশ ঘোষ (জ. ১৯৬৬): সংস্কৃতিকর্মী, জন্মস্থান, গ্রাম: গদাইপুর, উপজেলা: পাইকগাছা, জেলা: খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: *রহস্যময় কালো রাত্রি* (১৯৯৭), *প্রচ্ছদের কালির দাগ* (১৯৯৯), *অপাংক্তের জীবন মাঙ্গালিক* (২০০১)।

জগদীশ চন্দ্র সানা (জ. ১৯৬৭): সংবাদকর্মী। জন্মস্থান খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার লসূর গ্রামে। প্রকাশিত গ্রন্থ : *আমি কান পেতে রই,* কাব্য (১৯৯৬)।

মনিরুল ইসলাম সেলিম (জ. ১৯৬৭): সংস্কৃতিকর্মী, জন্মস্থান খুলনা শহর। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য- *বসন্তী ছন্দে* (২০১১), *হৃদয় ছোঁয়া ছন্দে* (২০১৩)।

মো. মামুন আলীম (জ. ১৯৬৭): আইনজীবী, পৈতৃকনিবাস গ্রাম: পানতিতা, উপজেলা: তেরখাদা, জেলা খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য *ভেতরে ভিন্নতর অন্ধকার* (১৯৯৭)।

গাজী শাহজাহান সিরাজ (জ. ১৯৬৬-): শিক্ষক, জন্মস্থান খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার গড়াইখালি গ্রামে। প্রকাশিত গ্রন্থ: *অন্তরে অন্তরীক্ষ* (১৯৯৮), *অরণ্যে এক পলাশ রোদ* (২০০০)।

তপন কুমার সরকার (১৯৬৯-২০১০): শিক্ষক, গ্রাম: কালাবগী, উপজেলা দাকোপ, জেলা: খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য- *সাগর কন্যা, 'চির বহ্নি জাহ্নবি, বর্ণ শতাব্দীর শৃংখল* (২০১৩)।

কাজী মাহফুজুর রহমান (জ. ১৯৬৯): চাকরিজীবী। জন্মস্থান খুলনা মহানগরীর মুজগুন্নীতে। প্রকাশিত গ্রন্থ : *গো যুক্ত এষণা* (২০০০)।

কাজী ফেরদাউস (জ. ১৯৬৯): চাকরিজীবী। জন্মস্থান খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার আনন্দনগর গ্রামে। প্রকাশিত গ্রন্থ: *এ ম্যানুয়াল ফর ক্লাসিফিকেশন অব লাইব্রেরি ম্যাটারিয়ালস* (২০০০)।

অসিত কুমার মণ্ডল (জ. ১৯৭০): সংস্কৃতিকর্মী, জন্মস্থান: গ্রাম কৈলাশগঞ্জ, উপজেলা দাকোপ, জেলা খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রবন্ধ: *বিংশ শতাব্দীর বিভাষণ* (২০০৯), *ছড়ার ছন্দে সুর আনন্দ* (২০০৯)।

মীরা মেহেরুন (জ. ১৯৭০): সরকারি চাকরিজীবী, শিক্ষা এম.এ। জন্মস্থান ছোটো বয়রা, খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: *জোৎস্নার বাতায়নে*।

মনিরুজ্জামান মনির (জ. ১৯৭০), চাকরিজীবী। জন্মস্থান রায়েরমহলো, খুলনা মহানগরী, খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ উপন্যাস দু'জন দু'জনার', গল্প: *তোমারই কাছে থাকবো, হৃদয়ের কাছাকাছি দু'জনে,* কবিতা- *নারী এবং ভালোবাসা*।

আব্দুস সামাদ আজাদ (জ. ১৯৭১-): আইনজীবী, গ্রাম মঠবাড়ি, উপজেলা কয়রা, জেলা খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস- *তুমি আমার ভালোবাসা* (১৯৯৬), *প্রিয়া লও সান্ত্বনা* (১৯৯৬), *শেষ বিকেলের রংধনু* (১৯৯৬), *মনের আকাশে তুমি* (১৯৯৭)।

নাসিমা খান (জ. ১৯৭১): শিক্ষক, গ্রাম যুগীহাটী, উপজেলা: রূপসা, জেলা: খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস- *কাহার বাড়ির বউ* (২০১০)।

নুরুল ইসলাম লাবলু (জ. ১৯৭১): শিক্ষা এম,এ (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), চাকরিজীবী, জন্মস্থান খুলনা শহর। প্রকাশিত গ্রন্থ: ছোটোগল্প- *অদ্ভুত আঁধারে* (২০০৬)।

সাবিনা ইয়াসমিন (জ. ১৯৭২): শিক্ষাগত যোগ্যতা বি,এ (অনার্স) এম,এ ইংরেজি, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, যশোর, জন্মস্থান গ্রাম: সরল, উপজেলা: পাইকগাছা, জেলা: খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: *দেখালেও দুই চন্দন* (১৯৯৪), *বলিতে ব্যাকুল* (২০00), *পূর্ণিমার পরদিন* (২০১০), *জলে জোৎস্নায়, এই অবেলায়* (২০১৩), *নিঃস্বরে গান* (২০১৪)।

ফাতিমা নূর (জ. ১৯৭৩): শিক্ষাগত যোগ্যতা এম, এ (বাংলা) শিক্ষিকা, গ্রাম বারাসাত, উপজেলা তেরখাদা, জেলা খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: *আদিম বিলাস* (২০০৫), *দেখি নাই ভোর দিনরাত্রি* (২০০৬), ছোটোগল্প: *সচালের মৃত* ২০০৬, ছড়া- *টুনটুনি,* গল্প- *আলোর ফুল* (২০০৬)।

উত্তম কুমার দাস (জ. ১৯৭৫): এনজিও কর্মী, জন্ম খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার চুকনগর গ্রামে। প্রকাশিত গ্রন্থ: *দলিতের পঞ্চরত্ন, ঋষি কাব্য* (২০০৬)।

মিনা রবিউল (মো. রবিউল ইসলাম) (জ. ১৯৬৫): শিক্ষা এম.এস,এস, চাকরিজীবী। জন্মস্থান মৌলভীপাড়া, খুলনা শহর। প্রকাশিত গ্রন্থ: ছোটো গল্প- *বাঈজী সময়* (২০০৬)।

ফেরদৌসী বেগম (জ. ১৯৭৬): জন্ম খুলনা শহরের টুটপাড়ায়। সাহিত্য সংগঠক। প্রকাশিত গ্রন্থ: *জীবন যখন থেমে যায়* (২০০০)।

স্বপন সরকার (জ. ১৯৭৭): ব্যাবসায়ী, জন্মস্থান: গ্রাম ঝড়ভাঙ্গা, উপজেলা বটিয়াঘাটা, জেলা খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ : *নাটক- সখা সখীদের জন্য* (২০০৩), ছোটো গল্প - *মমতা* (২০০৬)।

অনিশেষ চন্দন (জ. ১৯৭৮): হোমিও ডাক্তার, জন্মস্থান গ্রাম: হড্ডা, উপজেলা কয়রা, জেলা: খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য- *বিন্দু বিভাজন* (২০০২), উপন্যাস- *প্রথম পরিচয়* (২০০৪)।

কাজী মিতুল (জ. ১৯৭৯): পুরাকৌশলী, জন্মস্থান, খুলনা শহরের দৌলতপুরে। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস- *মেঘগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে* (২০০৪), ছোটোগল্প- *হৃদস্পন্দন* (২০০৫)।

সমরেশ মণ্ডল (জ. ১৯৭৯): শিক্ষক, জন্মস্থান গ্রাম হড্ডা, উপজেলা কয়রা, জেলা খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য- *বিবর্ণ স্মৃতি* (২০০৪), *সভ্যতার বোবা কান্না* (২০০৭)।

এ,কে মিজান (জ. ১৯৮০): সংস্কৃতিকর্মী, শিক্ষা বি.এ (অনার্স) এমএ (দর্শন), জন্মস্থান পশ্চিম টুটপাড়া, মাস্টারপাড়া, খুলনা শহর। প্রকাশিত গ্রন্থ: *জীবন যখন থেমে যায়, বোঝাতে পারিনি, মারুফা, সংকেত, অন্তরে অঞ্জলি, শূন্যতায় ঘেরা সুন্দর* (২০০৫)।

আসিফ কবির (জ. ১৯৮০): প্রকাশক দৈনিক জন্মভূমি। জ450ন্মস্থান খুলনা শহর। প্রকাশিত গ্রন্থ: গল্পগ্রন্থ- *উদখান্তি* (১৯৯৫), উপন্যাস- *ভালোবাসা* (১৯৯৬)।

তুহিন রায় (জ. ১৯৮১): বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, জন্মস্থান গ্রাম: কৈলাশগঞ্জ, উপজেলা: দাকোপ, জেলা খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ঢাকা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান* (২০১১)।

মো. আলী হায়দার (জ. ১৯৮২): সংস্কৃতিকর্মী। জন্মস্থান খুলনা শহরের শেখ পাড়ায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: *আমার ভুবনে তুমি* (২০০২)।

অসীম কুমার সরকার (১৯৮২): জন্মস্থান: গ্রাম: খড়িয়া, উপজেলা পাইকগাছা, জেলা খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য- *ধ্রুবতারা* (২০০৬)।

এম. আবু তাহের প্রিন্স (১৯৮৮): ছাত্র, গ্রাম আটরা, উপজেলা কয়রা, জেলা: খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: কবিতা- *স্বপ্নীল স্বাধীনতা* (২০১০)।

মো. ইলিয়াস ঢালী: জন্মস্থান গ্রাম পাবলা, থানা দৌলতপুর, খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস- *নবাগ পুরুষ* (২০০০)।

আহমেদ সজল (প্রকৃত নাম মো. সজন আহমেদ) (জ. ১৯৯০) সংস্কৃতিকর্মী। জন্মস্থান বাবলা, বনিকপাড়া, দৌলতপুর, খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য- *অন্ধকার ও আমি* (২০০৬)।

চৌধুরী মো. ফরিদ আহমেদ (জ. ১৯৬৯): অধ্যাপনা, জন্মস্থান মুসলমানপাড়া, খুলনা শহর। প্রকাশিত গ্রন্থ: *চেতনার অগলিকর মুক্ত, চেতনার সৈকত*।

কাজী শামিমা মিতা: শিক্ষিকা, জন্মস্থান: মুজগুন্নি, খুলনা শহর। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য- *প্রেম বিরহ বিদ্রোহ* (বাংলা ১৪১০)।

এম এ আলী: খুলনা জেলায় জন্ম। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস- *তুমি আজ কত দূরে* (১৯৬৩)।

কিসমত আলী বিশ্বাস: খুলনা জেলার খরমন্দা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: *কাশেম বধ গীতাভিনয়।*

খোন্দকার এরমান উদ্দীন: চিকিৎসক। খুলনা জেলার গোয়ালকালি গ্রামে জন্ম। প্রকাশিত গ্রন্থ: *চিকিৎসা রত্নমালা*।

মহম্মদ আজিজুর রহমান: জন্ম খুলনা জেলার রূপসা উপজেলায় আলাইপুর গ্রামে। প্রকাশিত গ্রন্থ: *মক্কা মদীনার প্রাচীন ইতিহাস ও আহকামে হজ্ব*।

তৈয়েবা খাতুন: শিক্ষা-এম,এ, (বাংলা) অবসরপ্রাপ্ত। জন্মস্থান খুলনা মহানগর। প্রকাশিত গ্রন্থ: *ক'দিনের অস্ট্রেলিয়া* (২০০৩), *আমি দেশে-বিদেশে* (২০০৫), *প্রাচ্যের ভেনিসে ১৪ মাস ১২০ দিন* (২০০৭)।

মুর্শিদা আকতার রনি: ব্যাবসায়ী, জন্মস্থান গ্রাম: গোপালপুর, উপজেলা: পাইকগাছা, জেলা: খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য- *প্রথম সকাল* (২০০৪)।

ফোকলোর লোকসাহিত্য

Material Folklore বা বস্তুকেন্দ্রিক ফোকলোর এবং Non Material Folklore বা Formalized Folklore অথবা শিল্প ও সাহিত্যকেন্দ্রিক ফোকলোর উভয় ক্ষেত্রেই খুলনা জেলার একটি সমৃদ্ধ অতীত আছে। ফোকলোরের মানুষগুলোর মধ্য দিয়ে জল-জঙ্গাল পরিবেষ্টিত খুলনার লোকজীবনে আচার-আচরণ, বিশ্বাস, সংস্কার, জীবিকা, খেলাধুলা, শিল্পচিন্তা, উৎসব, পার্বণ, সংগীত-সংস্কৃতি প্রভৃতির পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শ্বাপদ সমাকীর্ণ বাদাবন (সুন্দরবন) পরিষ্কার করে কোনো জনগোষ্ঠী এখানে প্রথম জনবসতি স্থাপন করেছিল তা নিয়ে মতান্তর আছে। কিন্তু জল-জঙ্গালের শত বৈরিতাকে জয় করে যুগ যুগ ধরে সেই জনগোষ্ঠী পল্লবিত হয়েছে, গড়ে তুলেছে নিজস্ব সংস্কৃতি। সে সংস্কৃতিতে ছায়াপাত ঘটেছে তাদের চারপাশের প্রত্যক্ষ জীবন ও জগতের। সুন্দরবনের গহীন অরণ্য, অসংখ্য নদনদী, হিংস্র বাঘ, বিশালাকৃতির কুমির, ভয়ংকর সাপ, সুন্দর হরিণ, জলভূমি, বনসন্নিহিত অঞ্চলের রোগবালাই, নৌযান, বাঘে মানুষে লড়াই, প্রভৃতি বিষয়গুলো হয়ে উঠেছে তাদের সংস্কৃতির অনুষঙ্গ। ফোকলোরের একটি সর্বজনীন চরিত্র আছে। এমন কি আছে একটি আন্তর্জাতিক অবয়ব।

ড. মো. শহীদুল্লাহ লিখেছেন, ‘আমরা সেক্সপিয়ারে পড়িয়াছিলাম রাক্ষসদের বাঁধা বুলি হইতেছে, “Fie, For, and firm, I Smell the blood of a British Man, ইহার সঙ্গে তুলনা করুন উপকথার হাঁও মাঁও খাঁও মানুষের গন্ধ পাঁউ। এই সাদৃশ্য হইল কোথা হইতে? তবে কি একদিন ওই সাদা ইংরেজ আর এই কালা বাঙ্গালীর পূর্ব পুরুষগণ ভাই ভাই রূপে একই তাঁবুর নিচে বাস করিত? সে আজ কত দিনের কথা কে জানে” আসলে ফোকলোরের অধিকাংশ মানুষ বিশেষত বস্তুকেন্দ্রিক ফোকলোরের অধিকাংশ উপাদান একটি বিশেষ দেশের বা অঞ্চলের সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ নয়। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে লোকসংস্কৃতির একই ধরনের স্থানিক পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন দেশ-অঞ্চলে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রচলিত হয়। এ জন্যই লোকসংস্কৃতির আবেদন অসাম্প্রদায়িক, সর্বজনীন, বিশ্বজনীন।

খুলনা জেলার ফোকলোর বিষয়াবলির মধ্যে প্রথমেই ‘দেশজ খেলা’ সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে:

দেশজ খেলার ছড়া

সুপ্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে হরেক রকম খেলা। সময়ের বিবর্তনের সাথে এসব খেলাধুলার অনেকই হারিয়ে যেতে বসেছে। খুলনা জেলার প্রচলিত বহিরাঙ্গন খেলাধুলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বুড়িচ্ছু, গোল্লাছুট, দাড়িয়াবান্দা, বাইসকোপ, হা-ডু-ডু/কাবাডি, কিতকিত, কানামাছি প্রভৃতি। অন্তঃকক্ষ খেলাগুলোর মধ্যে রয়েছে বাঘবন্দি, ফুলন-দুলন/গুটি খেলা, কড়ি খেলা, পুতুল খেলা, নাম পাতাপাতি খেলা প্রভৃতি। এসব খেলার অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয় ছড়া। যেমন-

বুড়িচ্ছু, হা-ডু-ডু, কিতকিত খেলার ছড়া

- কিত কিত আলা
  কিত কিত কই,
  খোকা তোমার বাতা কই।
  (দৌলতপুর)
- ডুগ্ ডুগে ভাই কালাচান
  কাপড়চোপড় আ’টে বান।
  (ফুলতলা)
- চু-রে হরু
  পাট কাটিটা সরু,
  পাট কাটিটার ফুঁদিলি
  ব্যাঙে মারে গোরু।
  (ডুমুরিয়া)

বাইসকোপ খেলার ছড়া

এ ভেনটি বাইচকোপ্
তে তে তেইশকোপ,
চুলটানা বাবু আনা
নান্টু বাবুর বৈঠক খানা।
কাল বলেছে যেতে
পান দেবে খেতে
পান হলো ছোটো
বুড়ি তুমি ওঠো।

(ফুলতলা)

পুতুল খেলার ছড়া

তেঁতুলের পাতা তেঁতুল।
বিয়ে পড়ালো পুতুল,
আরে বারে ধান দেবো
বিবি তুমি কবুল।

(দৌলতপুর)

কানামাছি খেলার ছড়া

চৌ চৌ চৌ !
চোখ দু'ডো খুলে দ্যাখো
রাঙ্গা দু'ডো বউ।

(দৌলতপুর)

ধাঁধা ও হেঁয়ালি ফোকলোরের অপর অংশটি Non material folklore বা Formalized folklore, বাংলায় যাকে বলা চলে শিল্প ও সাহিত্যকেন্দ্রিক ফোকলোর। এই দ্বিতীয় ভাগে পড়ে ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন, লোকগীতি, লোককাহিনি, জারিগান, যাত্রাগান প্রভৃতি। খুলনা জেলার Non material folklore বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতোই অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

'ধাঁধা লোক-সাহিত্যের একটা প্রধান অঙ্গ। এর আকার সংক্ষিপ্ত কিন্তু সরস, আর ভেতরে বুদ্ধিগম্য রহস্যময়তা। ভারতবর্ষের প্রাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতেও ধাঁধার পরিচয় পাওয়া যায়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও যে সুদূর অতীত থেকে ধাঁধার প্রচলন ছিল তার বহু প্রমাণ রয়েছে। সংস্কৃত গ্রন্থ ঋগবেদ, মহাভারত, হিব্রু ধর্মগ্রন্থ, বাইবেল, আরব্য উপন্যাস, প্রাচীন গ্রিক সাহিত্য প্রভৃতি রচনায় ধাঁধার প্রচলন ছিল তার অনেক নমুনা আছে। আমাদের বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদেও অনেক ধাঁধা দেখা যায়। কাজেই ধারণা করা যেতে পারে যে, ধাঁধার জন্ম হয়েছিল আদিম সমাজে। ধাঁধা ও হেঁয়ালির মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য লক্ষ করা যায় না। ধাঁধা মূলত বস্তু-প্রধান আর হেঁয়ালি কল্পনা ও বুদ্ধিপ্রধান।

খুলনা জেলার ধাঁধা ও হেঁয়ালিগুলোর মধ্য দিয়ে লোকজীবনের বিভিন্ন উপাদানের পরিচয় যেমন মেলে তেমনি প্রকাশিত হয় রচয়িতাদের গভীর

অনুসন্ধিৎসা, জীবনবোধ ও রসজ্ঞান। খুলনা জেলায় প্রচলিত ধাঁধা ও হেঁয়ালিগুলোর কয়েকটি এমন:

১

গায় লইয়া কাঁটা।

বসে আছে সাঁই বেণী।। (আনারস)

২

আকাশ হইতে পড়ল বুড়ি ঝুড়ি-কাঁথা লইয়া

সেই বুড়ি কাইজ্যা করে সভার মধ্যে গিয়া।। (হুক্কা)

৩

আল্লার কি কুদরত্।

গাছের আগায় সরবত।। (নারকেল)

৪

ছোটো কালে ঘোমটা।

বড়ো হইলে নেংটা।। (বাঁশ)

৫

হাত নাই, পাও নাই, রসিক নাগর।

অনায়াসে পার হয় অকূল সাগর।। (সাপ)

৬

আগায় ছাতি গোড়ায় মাথি।

ছেলে কান্দানো লাঠি।। (ওল গাছ)

৭

আছে ফল গাছ নাই।
খায় ফল ছোবা নাই।। (শিলা)

৮

খোদার এমনি কাম।
এক ঘরে এক খাম।। (ছাতা)

৯

এত্কুল, বেত্কুল, মেটে কুলীর ছাও।
মার্তে মার্তে চেপ্টা করলে,
তারে নি তোমরা খাও।। (চিড়া)

১০
এ-পারে বাঁশ ও-পারে বাঁশ।
দুই বাঁশে যুদ্ধ করে বার মাস।। (চোখের পাতা)

১১
আল্লাহ্‌র কি মেহেরবানি।
লাঠির ভিতর মিঠা পানি।। (আখ)

১২
হউরি মউরি চৌরি ঘর
আট কন্যার এট্‌টা বর।। (ছাতা)

১৩
রাস্তার ধারের গাছটা
ফল ধরিছে পাঁচটা;
হাজার লোকে খা'য়ে গ্যালো।
আরও পাঁচটা থা'য়ে গ্যালো।। (হাতের পাঁচ আঙ্গুল)

১৪
ফুল ঝুর্‌ ঝুর করে,
সুনার ঘর ভা'ঙে গিলি
কে গড়তি পারে ? (ডিম)

১৫
গলা কাট্‌লি ধলা রক্ত,
রক্ত মনিহার;
এই শ্লোকটা যে কতি পারবে
বুদ্ধি আছে তার। (পেঁপে গাছ)

প্রবাদ ও প্রবচন

প্রবাদ শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'প্রচলিত কথা'। কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায় একে সংজ্ঞায়িত করা দুঃসাধ্য। তবে স্পেন দেশে প্রচলিত একটি উক্তিকে সাধারণত প্রবাদের সংজ্ঞা হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। উক্তিটি হলো, 'A proverb is a short sentence based on long experience.' মানব ইতিহাসের ঠিক কোন্‌ সময়ে প্রবাদের উৎপত্তি তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে প্রাচীন গ্রন্থাদি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, চার-পাঁচ হাজার বছর আগেও মানব সমাজে প্রবাদের ব্যবহার ছিল, চর্যাপদের কোনো কোনো চর্যায় প্রবাদের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এ থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশে প্রবাদের ঐতিহ্য অনেক প্রাচীন।

অধিকাংশ প্রবাদই রূপক ও বক্রোক্তি সহযোগে রচিত হয়। সাধারণত দেখা যায় (১) কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতা, (২) কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা, (৩) কিংবদন্তি,

(৪) চাষ-বাস-জলবায়ু, (৫) সামাজিক রীতিনীতি, (৬) লোক-ওষুধ (folklore medicine) ইত্যাদিকে নিয়েই প্রবাদ রচিত হয়।

কিছু কিছু প্রবাদে প্রকাশিত হয়েছে এক ধরনের ভুয়ো দর্শন। ডাক ও খনার বচন, চাণক্য-বাক্য প্রভৃতি এ শ্রেণিভুক্ত। এ সবগুলো প্রবচন নামেই অধিক প্রচলিত। তবে প্রবচন শব্দটি প্রবাদ শব্দের পরিপূরক হিসেবেই সাধারণত ব্যবহৃত হয়।

প্রবাদ আছে যেগুলো খুলনা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, খুলনা জেলার এসব প্রবাদেরও রয়েছে দেশ-কালোত্তীর্ণ সর্বজনীন আবেদন, পার্থক্য কেবল ভাষা ও বলার ভঙ্গিতে। তেমন কয়েকটি প্রবাদ

১। **স্বার্থপরতা প্রসঙ্গে :**
তুমার আছে আমার আছে,
আসো ব'সে খাই,
তুমার নেই আমার আছে
কিসির কলার ভাই

২। **অযোগ্যের সম্মান লাভ প্রসঙ্গে :**
হাবাতের ছুঁয়াল গাড়ু পায়ে,
সারারাত মরে পানি খা'রে

৩। **উপযাচককে কটাক্ষ**
কাচা গুয়োর রসে
ফল ধরিছে কষে,
কল্লার সাথে কইনা কথা
ঘষে ঘেষে আসে

৪। **সমৃদ্ধ অতীতের স্মৃতিচারণ:**
যে দিন নাইরে নাতি,
মাচা তলে বাতি,
আর দানা গুড়
খুচে খুচে খাতি

৫। **স্বজন চেনা প্রসঙ্গ**
কোনো চাচী কতো ভালোবাসে,
বুঝা যায় তা কার্তিক মাসে।

৬। **আপন ক্ষমতা অতিক্রমকারী সম্পর্কে:**
পারে না ঘট গড়তি
যার মঠের বায়না দিতি

৭। **ক্ষমতার অপব্যবহার সম্পর্কে:**
কাঠে কুড়োনির মাইয়ে যদি
ধুতি চাদোর পায়,
আল্লাদ করি মারে লাথি
লাঠ সাহেবের গায়

৮। **লাজুকের হঠাৎ প্রগলভতা প্রসঙ্গে:**
নজুপতী নিশি,
তোর লজ্জা নেলো কিসি

৯। **অকাজে সময়ক্ষেপণ প্রসঙ্গে:**
নাতি খাতি বিলা গ্যালো
উঠতি পাল্লাম না,
কওন যাবো কাজে
জো গ্যালো ভাটি গ্যালো
সাজ না সাজে

১০। **বেশি আশা করে যারা তাদের সম্পর্কে:**
আশা করিছে কাউরো,
পালকি খাবে ডেউরো,
ডেউরো আর পাকলে না
কাউরো আর খালে না

ছড়া:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. সুকুমার সেন সকলেই একমত যে, লোক সাহিত্যের প্রাচীনতম রূপ বা ধারাটির নাম ছড়া। সমগ্র বাংলাভাষী মানুষের জন্য এমন সর্বজনীন ও লোকায়ত সম্পদ আর খুব বেশি নেই। শিশু থেকে নারী, মজুর থেকে চাষি সর্বশ্রেণির মানুষের কাছে চির নতুন, চির পুরাতন এই ছড়া রচিত, রক্ষিত ও বিস্তৃত হয়েছে স্মৃতি ও কথনের মাধ্যমে। ‘স্বাভাবিক চিরন্তনে ইহারা আজ রচিত হইলে পুরাতন এবং সহস্র বছর আগে রচিত হইলেও নতুন’।

ছড়ার রাজ্যে বুদ্ধি ও বিচারের সুযোগ নেই। এখানে রসের মূল্য অনেক বেশি। ছড়া হলো হৃদয় থেকে উৎসারিত এক সাহিত্যরীতি যা ‘মানবমনে আপনি জন্মিয়াছে’।

ছড়ার মধ্যে একটা চিরত্ব আছে। কোনো ছড়াটি কোনো শতাব্দী বা কত সালে রচিত হয়েছিল- এ প্রশ্ন কাউকে জড়িত করে না। ‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান’ ছড়াটি কোনো যুগের কেউ জানে না। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ দেখিয়েছেন বিভিন্ন সময়ে ছড়াটির ভাষাগত কিছু পরিবর্তন ঘটেছে।

ছড়ার ভাষাভঙ্গি নিয়ত পরিবর্তনশীল। যুগে যুগে নতুন ছড়া জন্মাচ্ছে এবং রূপান্তরিত হচ্ছে। আদিম ভাষা ও রূপ পরিত্যাগ করে গ্রহণ করছে নতুন ভাষা ও ভঙ্গি। মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ার সময় পরিবেশের প্রয়োজনে একই ছড়া গ্রহণ করছে নতুন শব্দ ও বাক্যরীতি। 'ছেলে ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো' পশ্চিম বাংলার এ ছড়াটির বর্গী-উত্তর বাংলায় এসে 'টিয়া' এবং 'গরকি' তে রূপান্তরিত হয়েছে।

শিশু ভুলানো ছড়া

ছড়া মূলত শিশুসাহিত্য। কিন্তু অন্যান্য বিষয় নিয়েও ছড়া রচিত হয়। খুলনা জেলার নিম্নোক্ত ছড়াগুলো তার নিদর্শন-

ক) ভূত আমার পুত,
পেতণি আমার ঝি
বাঁশ তলাদে আসবো যাবো,
করবি আমার কি? (খুলনা সদর)

খ) জষ্ঠি মাসের বিহান রাতি
মাঝু চলে আম কুড়াতি,
আয়রে সাজু ফিরে আয়
ওই রাস্তাদে কেন্দো যায়। (খুলনা সদর)।

গ) কাক ডাকে কা কা
কোকিল ডাকে কু কু
বাগানে শিয়াল ডাকে
হুক্কা হু! হুক্কা হু! (ডুমুরিয়া)

ঘ) আড়ি দিয়ে কথা কয়
ব্যাং পুড়াদে ভাত খায়,
সেই ব্যাঙ ঘরে যায়
গাবুদ ওবুদ লাথি খায়। (বটিয়াঘাটা)

ঙ) আলটা ধানের পালটা চাল
গেয়ো ধানের খই,
মা কয়ছে বাড়ি যাতি
পথঘাট কই।
পথঘাট এঁকিবেঁকি
ফুল ধরিছে ঝাকি ঝাকি।

শাশুড়ি-পুত্রবধূ সম্পর্ক-বিষয়ক ছড়া

ক) বউমা নানতি জানে না
বউমা ভানতি জানে না,
বউমার নান্দার সময় হলি
বউমা ঘোমে বাঁচে না। (পাইকগাছা)

খ) বাবু এ্যামন গুণের ভাগ্যবর্তী বউ আমার
বউয়ের রূপে ঝালোক মারে!

স্বলোক ঘর আকার করে!
আবার ইচ্ছে করে পেতনি আসে
বউকে বলে সই আমার!
বাবু এমন গুণের গুণবতী বউ আমার। (খুলনা সদর)

গ) ধান ভানতি কোলি বউ ভিকশে লেগে বসে,
পানি আনতি কোলি বউ পবন ঘোড়া ছোটে।
পানি আনা বড়ো মুখ ধান ভানা বড়ো দুঃখ,
পানি আনতি গেলি দ্যাখ্যা যায় ভিন্ন লোকের মুখ। (দাকোপ)

ঘুমপাড়ানি ছড়া

ক) চান্দের মান কুড়ি
খায় দুডো মুড়ি,
বুড়ো বসে পাট কাটে,
বুড়ি বসে চরকা কাটে (দৌলতপুর)।

খ) আয় ঘুম যায় ঘুম
দত্তপাড়া দিয়ে
দত্তর বউ পান দিছে
ইলাজ ভরি দিয়ে। (দৌলতপুর)।

অধ্যায়-১৩

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়

মৌর্য যুগে এবং মৌর্য-পূর্ব যুগে (খ্রিস্টপূর্ব ৩২৪-১৮৩ অব্দ) বাংলায় স্থানীয় সরকার বা শাসন ব্যবস্থার প্রচলন ছিল।[১] সে সময় গ্রামের বিশিষ্ট পরিবারের প্রবীণদের দ্বারা একটি পরিষদ গঠন করা হতো। এ পরিষদ স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে গ্রামের প্রশাসনের কাজ চালাত। তবে পর্যাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক পর্যন্ত বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের সঠিকরূপ অজানা রয়ে গেছে। গুপ্ত শাসনকালে (৩২৪-৫৩৫ সালে) নগর ও গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে দেশ শাসন করা হতো। গুপ্ত আমলে বাংলার প্রশাসন বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত ছিল, যথা- ভুক্তি,' বিষয়', 'মণ্ডল', 'বীথি' ও 'গ্রাম'। এ পর্যায়গুলো বর্তমানে 'বিভাগ', 'জেলা', 'মহকুমা', 'থানা' এবং গ্রামের সঙ্গে তুলনীয়।[২] পাল সম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের সময় (খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে) বাংলাদেশে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হয়েছিল। পাল রাজাদের পরে বাংলায় সেন বংশীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেন আমলে স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থায় কোনো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা হয়নি। তুর্কি যোদ্ধা ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজির হাতে সেন বংশের পতন ঘটে।

গ্রাম প্রশাসনের কাজকর্ম সাধারণত গ্রামের মোড়ল দ্বারা পরিচালনা করা হতো। মোড়ল সাধারণত উত্তরাধিকার সূত্রে বহাল থাকত। প্রতিটি গ্রামসরকার নিজ নিজ এলাকার শিক্ষা, ধর্ম ও গ্রামবাসীদের নৈতিক চরিত্রের প্রতি লক্ষ রাখত। মোগল আমলে বাংলাকে সুবা বা প্রদেশে পরিবর্তন করা হয় এবং শাসনকর্তা পদে সুবাদার নিয়োগ করা হয়। সুবাকে 'সরকার'-এ বিভক্ত করে ফৌজদারকে তার শাসক এবং সরকারকে 'পরগনায়' বিভক্ত করে তার শাসক এবং থানাকে 'মৌজায়' এবং মৌজাকে 'মহল্লায়' বিভক্ত করে যথাক্রমে চৌকিদার ও মহল্লাদার বা মল্লিককে এর দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়। মোগল আমলে পঞ্চায়েতের ওপর গ্রাম প্রশাসনের কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। প্রত্যেক গ্রামেই পরিষদ বা পঞ্চায়েত ছিল।

ব্রিটিশ আমল

ব্রিটিশ শাসকগণ দ্রুতই এ দেশের প্রশাসনে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ১৮৮৫ সালে 'স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন' পাস করা হয়। এ আইন গ্রামাঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই আইনের বলেই গ্রামাঞ্চলে তিনস্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। প্রত্যেক জেলায় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, মহকুমা পর্যায়ে

---

[১] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৯৫।

[২] ওই. পৃ. ৪৯৫।

লোকাল বোর্ড, কয়েকটি গ্রাম নিয়ে ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়। প্রদেশের লেফটেনেন্ট গভর্নরকে এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্থাপন করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। খুলনা মিউনিসিপ্যালিটি ১৮৮৪ সালে স্থাপিত হয়।[৩] ১৮৮৪ সালের আগে এ জেলা যশোরের একটি মহকুমা ছিল। তাই খুলনা সদরে মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠা হতে দেরি হয়। জেলায় স্বায়ত্তশাসনের ইতিহাস ১৮৮৬ সালে খুলনা জেলা বোর্ড গঠনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়।

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড গঠন বেঙ্গল কাউন্সিল কর্তৃক গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে ১৮৮৫ সালের 'স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন অ্যাক্ট' পাস হয় এবং ১৮৭১ সালের অ্যাক্টের অধীনে পূর্বতন ডিস্ট্রিক্ট কমিটি বিস্তৃতরূপে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে রূপান্তরিত হয়। ১৮৮৬ সালে খুলনা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড গঠিত হয়[৪] এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের নিমিত্তে এটিই ছিল জেলার প্রধান স্তর। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্যসংখ্যা সরকার আদেশের দ্বারা নির্ধারণ করতেন। বোর্ডের সদস্য হিসেবে সরকারি চাকরিজীবী ব্যক্তি যেমন ছিলেন তেমনি ছিলেন এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

তৎকালীন খুলনা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের গঠন

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের তিন চতুর্থাংশ ছিল নির্বাচিত এবং এক চতুর্থাংশ ছিল মনোনীত সদস্য। বিভিন্ন জেলার আয়তন ও লোকসংখ্যার তারতম্য অনুযায়ী বোর্ডের সদস্যসংখ্যা ১৬ থেকে ৬৬ জন পর্যন্ত হতো। বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করতেন নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে একজন। এ ছাড়া নির্বাচিতদের মধ্য থেকে একাধিক ভাইস চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হতো। এছাড়াও প্রয়োজন অনুযায়ী সরকার বোর্ডের অতিরিক্ত সদস্য নিয়োগ করতেন। জেলার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা ও জনমঙ্গলের যাবতীয় কাজ করত জেলা বোর্ড। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে রাস্তাঘাট, সেতু-কালভার্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, ফেরি ব্যবস্থাপনা, পথিকদের সুবিধার্থে সরাইখানা ও বাংলো নির্মাণ, কূপ , পুকুর, জলাশয় খনন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্হা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা উন্নয়নে বিভিন্ন ডিসপেনসারি ও হাসপাতাল স্হাপন এবং পয়ঃপ্রণালি ও নর্দমা, দুর্ভিক্ষ, মহামারি প্রভৃতি দুর্যোগে সাহায্য ও গতিবিধান, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাহায্য দান, খোঁয়ারসমূহের নিয়ন্ত্রণ, পশু চিকিৎসালেয়র নির্মাণ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণ প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৯-৪০ অর্থবছরে খুলনা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বাজেটের পরিমাণ ছিল ৫,৯১,২১২ টাকা।

ব্রিটিশ আমলের লোকাল বোর্ড ১৮৫৫ সালের অ্যাক্ট '৩'-এর বলে প্রাদেশিক সরকারের আদেশ অনুযায়ী লোকাল বোর্ডের ন্যূনতম সদস্যসংখ্যা ছিল ৬ জন। বিধি অনুযায়ী প্রত্যেক লোকাল বোর্ডের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য ছিল নির্বাচিত এবং এক তৃতীয়াংশ ছিল

[৩] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৯৬।
[৪] ওই. পৃ. ৪৯৬।

নিয়োগপ্রাপ্ত। প্রত্যেক লোকালবোর্ডের মোট সদস্যদের মধ্য থেকে কমিশনারের অনুমোদনসাপেক্ষে একজনকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হতো।[৫]

উক্ত আইনবলে খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা এই তিন মহকুমার জন্য লোকাল বোর্ড গঠিত হয়েছিল যা L.S.S.O Malley-এর প্রতিবেদন থেকে জানা যায়। খুলনা সদর লোকাল বোর্ডের সদস্যসংখ্যা ছিল ১২ জন। এদের সবাই ছিল সরকার কর্তৃক মনোনীত। লোকাল বোর্ডের কার্যাবলির মধ্যে ছিল ফেরি, খোঁয়াড়, দাতব্য চিকিৎসালয়, স্বাস্থ্যবিধান, পানি সরবরাহ, গ্রাম্যপথ ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করা। লোকাল বোর্ডগুলো ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের প্রতিনিধি হিসেবে জেলা বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছু কাজ করার ক্ষমতা পায়। লোকাল বোর্ডগুলো নিজস্ব কোনো ক্ষমতা ছিল না। নিজস্ব কোনো আয়ের উৎসও ছিল না। ১৮৮৫ সালের লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট অ্যাক্টের কিছু অংশ ১৯৩২ সালে সংশোধিত হয়। ১৯৩৬ সালে এ অ্যাক্টের গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনয়ন করা হয় এবং এর মাধ্যমে লোকাল বোর্ডগুলো অবলোপন করা হয়।

বুনিয়াদি গণতন্ত্র

আইয়ুব খান ‘বুনিয়াদি গণতন্ত্র’ নামক বিতর্কিত প্রশাসন পদ্ধতি চালু করেন ১৯৬১ সালে। ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পরপরই এ ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়। মৌলিক গণতন্ত্র আইন, ১৯৬১-এর ক্ষমতাবলে প্রবর্তিত এ ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকার প্রশাসনে ব্যাপক পরিবর্তন হয়। এ ব্যবস্থায় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড- ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এবং ইউনিয়ন বোর্ড- ইউনিয়ন কাউন্সিলে নামান্তরিত হয় এবং মিউনিসিপ্যাল প্রশাসন অর্ডিন্যান্স, ১৯৬০-এর বলে সব মিউনিসিপ্যালিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৯৬০ সালে মোট ২৮ জন সদস্য নিয়ে খুলনা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল যাত্রা শুরু করে যার ১৪ জন সরকার মনোনীত, বাকি ১৪ জন নির্বাচিত সদস্য।[৬] ডেপুটি কমিশনার, খুলনা পদাধিকারবলে কমিটির চেয়ারম্যান এবং মৌলিক গণতন্ত্রের সহকারী পরিচালক (খুলনা) পদাধিকারবলে কমিটির সচিব হিসেবে কাজ করতেন। নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হতো। সরকারি সদস্যদের মধ্যে জেলার গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরসমূহের প্রতিনিধি থাকতেন। ১৯৬০ সালে খুলনা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের আয়তন ছিল ১২,০৪৮.৭ বর্গকিলোমেটার (৪,৬৫২ বর্গমাইল)।

বিভিন্ন দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলকে চারটি দপ্তরে ভাগ করা হয়। কাউন্সিলকে কর নির্ধারণের ক্ষমতা দান করা হয়। কৃষি, যোগাযোগ, শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণমূলক বিষয়ে জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ পূরণের জন্য ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলকে উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হতো।

---

[৫] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৩।

[৬] আবদু শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৯।

১৯৬৬-৬৭ সালে কাউন্সিলের মোট আয়ের পরিমাণ ছিল ২৮,২৯,০৮৮.০২ টাকা এবং উদ্বৃত্ত জের ছিল ১৮,৬৬,৯৯০.১১ টাকা। সমাপনী জেরসহ মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২৩,৩১,২৭২.২৬ টাকা।

খুলনা জেলা বোর্ড, ১৯৭২ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক 'লোকাল কাউন্সিল অ্যান্ড মিউনিসিপ্যাল কমিটি (সংশোধনী)' আদেশ জারি করা হয়। এর বলে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ দ্বারা গঠিত সব স্থানীয় পরিষদ ভেঙে দেওয়া হয় এবং চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, সদস্য ও প্রশাসকের পদ বিলুপ্ত করা হয়। জেলা কাউন্সিলকে পরে জেলা বোর্ডে রূপান্তর করা হয়।[৭] একজন সভাপতি, একজন সহসভাপতি এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য নিয়ে জেলা বোর্ডের কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন প্রশাসক জেলা বোর্ডের কাজ পরিচালনা করতেন। জেলা বোর্ডের পূর্বতন কার্যক্রম অব্যাহত থাকে এবং নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। জেলা কাউন্সিলের কর্মচারীগণ জেলা বোর্ডের স্ব-স্ব দায়িত্বে বহাল থাকেন।

জেলা পরিষদ

১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ অনুযায়ী জেলা বোর্ড জেলা পরিষদ নামে পুনর্গঠিত হয়। সরকার কর্তৃক মনোনীত এবং প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত সদস্য নিয়ে জেলা পরিষদ গঠন করা হয়। কমিটিতে বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত নির্দিষ্ট সংখ্যক মহিলা সদস্য থাকতেন। এর মেয়াদ ছিল প্রথম সভা অনুষ্ঠানের তারিখ থেকে পাঁচ বছর।

২০০০ সালে সংশোধনীসহ নতুন স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন পাস হয়। নতুন আইন মোতাবেক জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ সৃষ্টি করা হয় এবং নির্বাচনের মাধ্যমে চেয়ারম্যান নিয়োগের ব্যবস্থা রাখা হয়। জেলা পরিষদে উপসচিবকে প্রেষণে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় এবং সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে সচিব হিসেবে নিয়োগের বিধান রাখা হয়। সরকারি আদেশে ২০.১২.১১ তারিখে ৬১টি জেলায় জেলা পরিষদ প্রশাসক নিয়োগ করা হয় এবং ২৯.১১.১৬ পর্যন্ত জেলা পরিষদের প্রশাসকগণ দায়িত্ব পালন করেন। এ আইন অনুযায়ী প্রতিনিধি সদস্য, মনোনীত সদস্য, মহিলা সদস্য ও সরকারি কর্মকর্তা সদস্য সমন্বয়ে জেলা পরিষদ পুনর্গঠিত হতো। জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। জেলা পরিষদ সরকারের পূর্ব অনুমতিক্রমে যে কোনো কর, রেইট, টোল এবং ফি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আরোপ করতেন। ২৮.১২.১৬ তারিখে জেলা পরিষদদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি জেলায় ১৫ জন সাধারণ সদস্য ও সংরক্ষিত আসনে ৫ জন মহিলা সদস্য

---

[৭] ওই. পৃ. ৫০০।

নির্বাচিত করা হয়। এই জেলার বর্তমান জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ হারুনুর রশিদ। তিনি ২৯/০১/২০১৭ তারিখ হতে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। জেলা পরিষদের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৮। এরমধ্যে সংরক্ষিত মহিলা সদস্যসংখ্যা ৪।

জেলা পরিষদের কার্যাবলি:

১। রাস্তাঘাট, ব্রিজ, পুল-কালভার্ট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্ম প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার।

২। দারিদ্র্য নিরসনসংক্রান্ত (রিক্সা-ভ্যানগাড়ি বিতরণ) প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

৩। নারী উন্নয়নসংক্রান্ত সেলাই প্রশিক্ষণ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

৪। আত্মকর্মসংস্থান, জীবনমান উন্নয়ন ও সচেতনতাসংক্রান্ত (কম্পিউটার প্রশিক্ষন) কার্যাক্রম।

৫। ধর্মীয় ও সামাজিক কল্যাণমূলক, ক্রীড়াসংস্কৃতি এবং জাবতীয় কর্মসূচি খাতে অনুদান প্রদান।

৬। অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান।

৭। গরিব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরএককালীন বৃত্তি প্রদান।

৮। অসহায় দরিদ্রদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ।

৯। বিভিন্ন দুর্যোগকালীন অসহায়দের মাঝে ত্রাণ বিতরণ বা আর্থিক সাহায্য প্রদান।

১০। ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে পাঠাগার স্থাপন, ভাষা শহীদ ও বীরশ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার ও জাদুঘর সংস্কার।

১১। স্মৃতিসোধ, শহিদমিনার নির্মাণ ও সংস্কার।

১২। বিভিন্ন উপজেলায় ডাক-বাংলোর মাধ্যমে সেবা প্রদান।

১৩। আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত গৃহহীনদের মাঝে গৃহনির্মাণ।

১৪। স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণ।

১৫। আর্সেনিকমুক্ত বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের লক্ষ্যে গভীর নলকূপ স্থাপন ও পুকুর সংস্কার।

১৬। জাতীয় দিবসগুলোতে সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণসহ তা প্রতিপালন করা।

খুলনা জেলা পরিষদে বর্তমানে নির্বাচিত একজন প্রশাসক, ২০ জন নির্বাচিত সদস্য একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং কারিগরি ও প্রশাসনিক শাখায় একজন সহকারী প্রকৌশলী ও একজন সচিব রয়েছেন। খুলনা জেলা পরিষদের নির্বাচন গত ২৮/১২/১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। জেলা পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব শেখ হারুনুর রশীদ। তিনি গত ২৯/০১/১৭ তারিখে যোগদান করেন। এছাড়া সাঁট মুদ্রাক্ষরিক, উচ্চমান সহকারী, অফিস সহকারী ও অফিস সহায়ক পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছেন।

খুলনা মিউনিসিপ্যালিটি খুলনা মিউনিসিপ্যালিটি ১৮৮৪ সালে স্থাপিত হয়। ১৫ জন সদস্য নিয়ে এটি গঠিত হয়। সদস্যদের মধ্যে ১০ জন ছিল নির্বাচিত, ১ জন ছিল মনোনীত এবং বাকি ৪ জন ছিল পদাধিকার বলে সদস্য। সে সময় মিউনিসিপ্যাল এলাকার আয়তন ছিল ১২.০২ বর্গ কি. মি. (৪.৬৪ বর্গমাইল)। ১৯০১-০২ সালের অর্থবছরের শেষের দিকের এক পরিসংখ্যান থেকে দেখা মিউনিসিপ্যালিটির পূর্ববর্তী দশ বছরের বার্ষিক গড় আয়ের পরিমাণ ছিল ২১,৬০০ টাকা এবং ব্যয় ছিল ১৯,৮০০ টাকা।

খুলনা মিউনিসিপ্যাল কমিটি মিউনিসিপ্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৬০-এর বলে খুলনা মিউনিসিপ্যালিটিকে পরে মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে রূপান্তর করা হয়। ১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী মিউনিসিপ্যাল কমিটির আওতাধীনে লোকসংখ্যা ছিল ২,২৯,১৯৯ এবং এর আয়তন ছিল ৩৭.০৪ বর্গ কি.মি. (১৪.৩০ বর্গমাইল)। ২৮ জন সদস্য নিয়ে এই কমিটি ছিল; ১৪ জন নির্বাচিত এবং ১৪ মনোনীত। এই মিউনিসিপ্যাল কমিটির অধীনে ১৪টি ইউনিয়ন কমিটি কাজ করত। ১৯৬৫-৬৬ সালে মিউনিসিপ্যাল কমিটির মোট আয়ের পরিমাণ ছিল ৩৪,০০,০০৪ টাকা এবং ১৯৬৪-৬৫ সালে ছিল ৩৮,৬২,২৮৭ টাকা।

খুলনা পৌরসভা বাংলাদেশ লোকাল কাউন্সিল অ্যান্ড খুলনা মিউনিসিপ্যাল কমিটির (সংশোধনী) আদেশ অনুযায়ী ১৯৭২ সালের ২০ জানুয়ারি খুলনা মিউনিসিপ্যালিটি খুলনা পৌরসভা নামে নামান্তরিত হয়।[৮] বাংলাদেশ লোকাল গভর্নমেন্ট অর্ডার ১৯৭৩ অনুযায়ী জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত ১ জন চেয়ারম্যান, ১ জন ভাইস-চেয়ারম্যান এবং নির্ধারিত সংখ্যক কমিশনার নির্বাচিত হয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। ১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী খুলনা পৌরসভার লোকসংখ্যা ১,২৭,৯৭০ জন। এই সংখ্যা ১৯৭৪ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪,৩৭,৩০৪ জন। ১৯৮১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী খুলনা পৌরসভার লোকসংখ্যা ৬,২৩,১৮৪। ১৯৮৩-৮৪ অর্থবছরে খুলনা পৌরসভার বাজেট ছিল ৫,৭৮,৮৫,০৬৩.০০ টাকা।

খুলনা সিটি করপোরেশন ১৯৮৪ সালের ১০ ডিসেম্বর গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উক্ত বছরের ১২ ডিসেম্বর থেকে খুলনা পৌরসভাকে খুলনা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন ঘোষণা করা হয়।[৯] করপোরেশনের এলাকার আয়তন ৪৫.৬৫ বর্গকিলোমিটার। লোকসংখ্যা প্রায় ১৫ লাখ। এ এলাকায় ৩১টি ওয়ার্ড, ১,২১৫টি রাস্তা, ৬৪২.১৮ কি.মি ড্রেন, ১৫টি অটোম্যাটিক ট্রাফিক সিগন্যাল, ৬৬,২৫৭টি হোল্ডিং, ২৪টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ২টি সরকারি হাসপাতাল, ৭টি পার্ক, ৮টি কবরখানা, ৩টি শ্মশান, ২১টি বাজার অবস্থিত। সিটি করপোরেশন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড যেমন- পার্ক, খেলার মাঠ ইত্যাদি নির্মাণ, কনজারভেন্সি কার্যক্রম যেমন- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি পরিচালনা করে থাকে। বর্তমানে মো. মনিরুজ্জামান সিটি করপোরেশনের দায়িত্ব পালন করছেন।

---

[৮] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫০৬।

[৯] ওই. পৃ. ৫০৬।

১৯৯০-৯১ অর্থবছরে মোট আয়ের পরিমাণ ৫,০৭,৬১,২৯৯.০০ টাকা। তন্মধ্যে ৪,৬১,৮১,৬৫১.৮০ টাকা নিজস্ব এবং ৪৫,৭৯,৬৪৮.০০ টাকা অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত। সর্বশেষ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ মাসে কর ও অন্যান্য ফি বাবদ ২১,৯৩,২৮,৬৫৪.১৪ টাকা আয় হয়েছে।

থানা কাউন্সিল

মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ, ১৯৫৯-এর বলে থানা কাউন্সিল গঠিত হয় এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিল এবং কমিটির চেয়ারম্যান থানা কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন এবং সরকারি সদস্যদের সংখ্যা জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত হতো। জেলা প্রশাসক সরকার কর্তৃক পদাধিকারীদের সরকারি সদস্য হিসেবে নিযুক্ত করতেন। যে মহকুমার অন্তগর্ত সে মহকুমা প্রশাসক পদাধিকার বলে সেই থানা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হতেন এবং থানার সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) পদাধিকারবলে সদস্য এবং ভাইসচেয়ারম্যান নিযুক্ত হতেন। থানা কাউন্সিলের প্রধান কাজ ছিল থানা এলাকার মধ্যে সকল ইউনিয়ন কাউন্সিল ও ইউনিয়ন কমিটিগুলোর উন্নয়নমূলক কাজের সমন্বয় সাধন করা। ইউনিয়ন কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত সকল উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাকেই থানা কাউন্সিলের মাধ্যমে যথারীতি পেশ করা হতো। থানা কাউন্সিলকেও তার কাজের জন্য জেলা কাউন্সিলের নিকট দায়ী থাকতে হতো। জেলা কাউন্সিল সময়ে সময়ে থানা কাউন্সিলকে তার কার্যাবলি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করত। কাউন্সিলের কর ধার্য করার ক্ষমতা ছিল না।

থানা উন্নয়ন কমিটি

স্বাধীনতার পরে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশের অধীনে প্রতিষ্ঠিত সব স্থানীয় প্রতিষ্ঠান বিলোপ করা হয়। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল (১) ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল, (২) থানা কাউন্সিল, (৩) ইউনিয়ন কাউন্সিল ও (৪) টাউন কমিটি। ১৯৭২ সালের লোকাল কাউন্সিল এবং মিউনিসিপ্যাল (সংশোধনী) আদেশ অনুযায়ী থানা কাউন্সিলের নাম হয় উন্নয়ন কমিটি।

থানা পরিষদ

স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ বলে থানা উন্নয়ন কমিটি থানা পরিষদ নামে পরিচিত হয়।[১০] থানা পরিষদ গঠিত হয় প্রতিনিধি সদস্য ও সরকারি সদস্য নিয়ে। থানার অন্তর্গত ইউনিয়ন পরিষদগুলোর চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে থানা পরিষদে প্রতিনিধি সদস্য হন। যে মহকুমার অধীনে যে থানাটি, সেই মহকুমার প্রশাসক পদাধিকার বলে থানা পরিষদের প্রশাসক ও চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। থানার সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) পদাধিকার বলে থানা পরিষদের সহসভাপতি ছিলেন।

---

[১০] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫১২।

উপজেলা পরিষদ ১৯৮২ সালের ২৩ ডিসেম্বর স্থানীয় সরকার (থানা পরিষদ ও থানা প্রশাসন পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ গঠিত হয়।[১১] একজন চেয়ারম্যান, প্রতিনিধি সদস্য, তিনজন মহিলা সদস্য, উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান, সরকারি সদস্য এবং একজন মনোনীত সদস্য নিয়ে গঠিত হতো। চেয়ারম্যান উপজেলার প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হতেন। উপজেলার আওতাধীন ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা চেয়ারম্যানগণ উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে থাকবেন। তিনজন মহিলা সদস্য উপজেলার অধিবাসীদের মধ্য থেকে মনোনীত হতেন। উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা উপজেলা পরিষদের সদস্যসচিবের দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি পরিষদের সেক্রেটারি হিসেবে সকল বিভাগের কাজের সমন্বয় সাধন করতেন। বিভিন্ন রকম কর, ফি, টোল, রেট ইত্যাদি পরিচালনার ক্ষমতা উপজেলা পরিষদকে দেওয়া হয়েছিল ফলে প্রতিটি উপজেলা পরিষদ উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল।

১৯৯১ সালে সরকার উপজেলা পদ্ধতি বিলুপ্ত করে পুনরায় থানা কাউন্সিলে রূপান্তর করেন। পরবর্তীকালে ২০০৭ সালে থানা পরিষদগুলোকে পুনরায় উপজেলা পরিষদে রূপান্তর করা হয়। খুলনা জেলায় থানার সংখ্যা ১৪টি। যথা বটিয়াঘাটা, দাকোপ, দৌলতপুর, ডুমুরিয়া, খুলনা সদর, কয়রা, পাইকগাছা, ফুলতলা, রূপসা, সুন্দরবন, সুন্দরবন রিজার্ভ, তেরখাদা, সোনাডাঙ্গা, লবণ চরা। পরবর্তীকালে থানা কাউন্সিলগুলোকে পুনরায় উপজেলা পরিষদে রূপান্তর করা হয়।

ইউনিয়ন বোর্ড অ্যাক্ট, ১৯১৯ বঙ্গীয় পল্লি স্বায়ত্তশাসন আইন পাস হয় ১৯১৯ সালে। এই আইন বলে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত বিলোপ করা হয় এবং এর পরিবর্তে অধিকতর কর্মক্ষমতা নিয়ে ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইউনিয়ন কাউন্সিল ১৯৫৯ সালে বুনিয়াদি গণতন্ত্রের আদেশ অনুযায়ী ইউনিয়ন বোর্ডগুলো বিলুপ্ত করা হয় এবং তদস্থলে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সূচনা হয়। এই আদেশ অনুযায়ী ইউনিয়ন কাউন্সিলই ছিল গ্রামাঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনের মৌলিক ইউনিট। এই কাউন্সিল ইউনিয়ন বোর্ডগুলোর অনুরূপ ছিল।

ইউনিয়ন পঞ্চায়েত ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ লোকাল কাউন্সিল এবং মিউনিসিপ্যাল কমিটির আদেশবলে সৃষ্ট সমস্ত স্থানীয় সংস্থাগুলো বিলোপসাধন করা হয় এবং সাবেক ইউনিয়ন কাউন্সিলকে ইউনিয়ন পঞ্চায়েতে রূপান্তরিত করা হয়।

ইউনিয়ন পরিষদ ১৯৭৩ সালের বাংলাদেশ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা) আদেশ অনুযায়ী ইউনিয়ন পঞ্চায়েত ইউনিয়ন পরিষদ নামে পরিচিত হয়। এক

---

[১১] ওই, পৃ. ৫১৩।

একটি ইউনিয়নের অর্ন্তগত ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান, একজন ভাইস চেয়ারম্যান এবং প্রতি ওয়ার্ড থেকে তিনজন সদস্য নিয়ে এক একটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ অনুযায়ী একজন চেয়ারম্যান, নয়জন সদস্য এবং ২ জন মহিলা সদস্য নিয়ে একটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। বর্তমানে খুলনায় মোট ৬৮টি ইউনিয়ন পরিষদ আছে। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ একজন চেয়ারম্যান, ৩ জন মহিলা সদস্য ও নয়টি ওয়ার্ডে নয়জন সদস্য নিয়ে গঠিত। সরকারি বাজেটের বাইরে এলাকার ভূমি উন্নয়ন করের ১% এখন ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়। এছাড়া, ইউনিয়ন পরিষদ গভর্নেন্স প্রজেক্টের আওতায় স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন সহায়তায় বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় কার্যক্রম

খুলনায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম মূলত দুটো সংস্থা সম্পন্ন করে থাকে। এগুলো হলো বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এবং জেলা সমবায় অফিস।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড পল্লির ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং বিত্তহীন জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত করে কৃষি, কুটিরশিল্প, ছোটো আকারে ব্যাবসাবাণিজ্য ইত্যাদির মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ সেবা ও আর্থিক সহায়তা দান করে থাকে। খুলনা জেলায় বিআরডিবির নিম্নবর্ণিত ১১টি প্রকল্প ও কমসূচি পরিচালিত হচ্ছে। এগুলো হলো:

১) ইউসিসিএল, ২) সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক), ৩) পল্লি প্রগতি প্রকল্প (পপ্রপ্র), ৪) অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি, ৫) একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প, ৬) সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি), ৭) আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২, ৮) গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প, ৯) অংশীদারত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি-২ (পিআরডিপি-২), ১০) অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি-২ এবং ১১) দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লি কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)।

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

খুলনা জেলার একটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প ‘একটি বাড়ি একটি খামার’-এর বিবরণী দেওয়া হলো:

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি বিশেষ উদ্যোগ। সারা বাংলাদেশে এর কার্যক্রম বিস্তৃত।

খুলনা জেলায় শুরু থেকে ডিসেম্বর/২০১৭ পর্যন্ত একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের এক নজরে সার্বিক কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্য (নতুন + পুরাতন) একটি বাড়ি একটি খামার সাংগঠনিক ও ঋণ কার্যক্রম তথ্য:

সারণি-১৩১

প্রকল্পের এক নজরে সার্বিক কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্য

ক্র. নং	উপজেলার নাম	ইউনিয়ন	সমিতি গঠন			সদস্য ভর্তি			সঞ্চয় জমা			ঋণ বিতরণ			ঋণ যোগ্য ক্রম:	ঋণ আদায় ক্রম	হার %	মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপী
			বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১।	রূপসা	০৫	২৫	২৫	৮৭	১৫০০	১৩৪৯	৫০৬৯	৪৯.০৪	৩৫.৫২	২১৮.৯৯	১৫০.০০	১৯২.৯৩	৭৭৬.০০	৫৭.১৬	৪০৭.১৬	৬৯%	১৮০.০০
২।	বটিয়াঘাটা	০৭	৩৫	২৮	১১২	২১০০	১১২০	৬০৮০	৫০.৪০	২৬.৮৮	২৪১.৭৩	১৫০.০০	২৭.০০	৬৭৩.০০	৬৪১.০৩	৪৫৪.০৯	৭১%	১৮৬.৯৪
৩।	ডুমুরিয়া	১৪	৭০	৬৮	২৫০	৭৫৬০	৪৮৯০	১২৪৫০	১৪২.৬৮	৭৫.৬৭	৪৫৬.৫২	৩৮০.৫০	২০০.০৬	১৮৮৮.৪৮	১৭৫৬.৩৯	১২৩৮.৩৯	৭১%	৫১৮.০০
৪।	ফুলতলা	০৪	৩৬	৩৬	৭২	২১১০	১৭৯০	৩৯০০	৩৮.৯০	৩৮.৬২	১৩৬.৩৭	২৫০.৪০	৯৬.৬৯	৪৪০.৯৬	৩৭৭.৪৪	২১২.৪৪	৫৬%	১৬৫.০০
৫।	পাইকগাছা	১০	৫০	৫০	১৭৩	৩০০০	২১১৭	৮৮৮৯	১৮০.১৮	৯০.৮৮	৪৮২.৯৬	৪৭৮.১১	৪৭৩.৪৫	১৬৫৯.৭০	১৩৩৮.০৯	১১৩৭.৪৮	৮৫%	২০০.৬১
৬।	দাকোপ	০৯	৪৫	৩৭	১৫৪	৪৮৬০	১৯৭৫	৮৯৮৬	৬৪.৮০	৫১.৭৮	৪০৩.২৭	১৩৫.০০	১৮৮.৬৪	১৩৫২.০৪	১৩৭১.৪৪	৮৫৭.৩১	৬৩%	৫১৪.১৩
৭।	তেরখাদা	০৬	৩০	২৩	৯৬	১৮০০	৮৬৫	৫২১৭	৫০.৪০	২১.৮২	১৯১.২৯	২০৫.৫০	১৭৯.৬৭	৪৯৩.৫৫	৪৫৩.১২	৩০৪.৯৭	৬৭%	১৪৮.১৫
৮।	দিঘলিয়া	০৬	৩০	৩০	১০২	১৮০০	১৪২৬	৫৭৪০	৮৩.৫২	৪৭.৩১	১২৯.৩৩	৬৬০.০০	১৯৭.০০	১৫৪৭.৫৫	১৩৫০.৬৬	১০৫৭.১৮	৭৮%	২৯৩.৪৮
৯।	কয়রা	০৭	৩৫	২৪	১১৩	২১০০	১০৭৫	৬৩৯৫	৭২.০০	৩৬.১৪	৩৭৮.৩৭	১২০.০০	৮৫.৩৪	৯৬৭.৫১	৬৭৪.৮৭	৬৭৩.৭০	৭০%	১.১৭
	মোট =	৬৮	৩৫৬	৩২১	১১৫৯	২৬৮৩০	১৬৬০৭	৬২৭২৬	৭৩১.৯২	৪২৪.৬২	২৬৪৭.৮৩	২৫২৯.৫১	১৬৪০.৭৮	৯৭৯৮.৭৯	৮৫৫০.২০	৬৩৪২.৭২	৭৪%	২২০৭.৪৮

বাংলাদেশের সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠী এ প্রকল্পের মূল উপকারভোগী। ভূমিহীন অর্থাৎ শূন্য হতে সর্বোচ্চ ৫০ শতক জমির মালিক, চরাঞ্চল/ অনগ্রসর এলাকায়

সর্বোচ্চ ১.০০ একর জমির মালিক, সর্বোপরি দরিদ্র বলে সর্বজনস্বীকৃত মানুষকে পর্যায়ক্রমে এ প্রকল্পের আওতায় এসে তাদের জীবিকায়ন নিশ্চিতের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রধান লক্ষ্য। বর্তমানে ৬৪ জেলার ৪৮৩টি উপজেলার ১৯২৮টি ইউনিয়নের ১৭৩০০ ওয়ার্ডে ১৭৩০০ গ্রামে ৬০ জন সদস্য নিয়ে অর্থাৎ ১০ লাখ ৩৮ হাজার পরিবার সরাসরি এ প্রকল্পের আওতায় উপকৃত হচ্ছে।

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য:

ক) প্রতি গ্রাম থেকে ৬০টি দরিদ্র পরিবার বাছাই করে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করা।

খ) দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সঞ্চয়মুখী করে তাদের পুর্জি গঠনের জন্য প্রতিটি দরিদ্র পরিবারকে নিজস্ব সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রকল্প থেকে মাসে সর্বোচ্চ ২০০ টাকা হিসেবে বছরে ২৪০০ টাকা উৎসাহ সঞ্চয় অনুদান হিসেবে প্রদান করা।

গ) সমিতি প্রতিবছরে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা সুদবিহীন ঘূর্ণায়মান স্থায়ী তহবিল প্রদান করা।

ঘ) ব্যক্তি সঞ্চয়, প্রকল্প হতে প্রদানকৃত উৎসাহ সঞ্চয় এবং ঘূণায়মান স্থায়ী তহবিল মিলে দুই বছরে প্রতি গ্রাম সমিতিতে ৯.০০ লাখ টাকার স্থায়ী তহবিল গড়ে তোলা।

ঙ) সমিতির সভাপতি, ম্যানেজার, সদস্যদের প্রয়োজনানুযায়ী বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

চ) উঠান বৈঠকের মাধ্যমে ঘূর্ণায়মান স্থায়ী তহবিল ব্যবহার করে নিজেদের প্রয়োজনানুসারে আয়বর্ধক প্রকল্প গ্রহণ করে মৎসচাষ, পশুপালন, নার্সারি, হাঁস-মুরগি ও গবাদিপ্রাণী পালনসহ লাগসই পেশাভিত্তিক জীবিকায়নের ব্যবস্থা করা।

ছ) এলাকার অনিবাসী ভূমি মালিকের অব্যবহৃত/ পড়ে থাকা জমিজমা সমিতির আওতায় চাষাবাদ ও তা সংরক্ষণ করা।

প্রকল্পের বিশেষত্ব:

ক) **কর্মসুযোগ সৃষ্টি:** সমিতি প্রতি বছরে সরকারি ও নিজস্ব সঞ্চয় মিলে ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং দু বছরে ৯.০০ লাখ টাকা সমিতির সদস্যদের স্থায়ী আমানত। উঠান বৈঠকের মাধ্যমে নিজেদের প্রয়োজনে এ অর্থ হতে ঋণ গ্রহণ করে তারা সৃষ্টি করবে কর্মসুযোগ বা জীবিকা। এভাবে বর্তমানে প্রায় ৫ লাখ পরিবার নিজেদের কর্মসংস্থান করেছে।

খ) ব্যয়ের চেয়ে সঞ্চিত তহবিল অধিক: অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, দেশের প্রায় ৯০ ভাগ প্রকল্পে প্রকল্প ব্যয় বা বরাদ্দ থেকে উপকারভোগীর কাছে পৌঁছায় ২৫-৫০ ভাগ। সরকারের বিশেষায়িত এ প্রকল্পের সবচেয়ে বড়ো অবদান হচ্ছে প্রকল্প ব্যয়ের চেয়ে প্রকল্প শেষে সঞ্চয়ের পরিমাণ ২৫% বেশি। প্রকল্প ব্যয় ১৪৯২ কোটি টাকা কিন্তু ২ বছর অন্তে ১৭,৩০০ সমিতির তহবিলের পরিমাণ দাঁড়াবে ১৮৫০ কোটি টাকা। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মূলধনের জন্য সদুখোর মহাজন বা এনজিওদের নিকট যেতে হবে না এবং ঋণের বোঝাও বইতে হবে না।

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পে খুলনা জেলার চিত্র নিম্নরূপ:

১) সমিতি গঠনের লক্ষ্যমাত্রা	: ৬১২।
২) গঠিত সমিতির সংখ্যা	: ৬১২।
৩) সদস্য ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা	: ৩৬,৭২০।
৪) ভর্তিকৃত সদস্য সংখ্যা	: ৩৬,৪৯৯।
৫) সদস্য সঞ্চয় জমা	: ২০,২০,২৬,৮৬০/-
৬) ঋণ বিতরণ	: ৭১,২৩,২৭,১০০/-
৭) ঋণ পরিশোধ	: ৩৬,১১,৮৪,৬৮৯/-
৮) মাঠে বকেয়া ঋণ	: ৩৫,১১,৪২,৪১১/-
৯) উৎসাহ বোনাস (সদস্যকে)	: ১৬,৮৬,৮৮,২৫৭/-
১০) থোক বরাদ্দ (সমিতিকে)	: ১৭,২৩,২৬,৯২৫/-
১১) মোট সম্পদ	: ৫৬,৪১,৫৩,৬৭৩/-

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের অর্ন্তনিহিত যে চিন্তা ও চেতনা রয়েছে তা জনগণ ইতোমধ্যে অত্যন্ত প্রশংসার সাথে গ্রহণ করছে। সরকারের প্রতি বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি জনগণের অসীম শ্রদ্ধা ও আস্থার সৃষ্টি হয়েছে। দেশের সকল গ্রামে এ কার্যক্রম চালু করা হলে একদিকে যেমন সরকার তথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টি হবে অন্যদিকে দরিদ্র জনগোষ্ঠী মাইক্রোক্রেডিট নামক ঋণের অত্যাচার থেকে চিরতরে মুক্তি পাবে। জাতীয় জীবনে সৃষ্টি হবে এক নতুন বিপ্লব-ইতিহাস হয়ে রবে জীবিকায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ মহান দর্শন- একটি বাড়ি একটি খামার।

সমবায় কার্যক্রম

খুলনা জেলায় সমবায় কার্যালয় মোট ১১(এগার)টি। ০৯(নয়)টি উপজেলা কার্যালয় ও ০১(এক)টি মেট্রোপলিটন থানা সমবায় কার্যালয় জেলা সমবায় কার্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত। এ ছাড়া বিভাগীয় সমবায় কার্যালয় ও ০১(এক)টি আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট খুলনা শহরে অবস্থিত।

সরকারি বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গঠিত স্বতঃপ্রণোদিতভাবে গড়ে ওঠা সমবায় সমিতির নিবন্ধন প্রদান, অডিট, পরিদর্শন, তদারকি, সমবায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, সমবায় সমিতি হতে সরকারি রাজস্ব আদায়, সমবায় সমিতির বিবাদ নিস্পত্তি ইত্যাদি জেলা সমবায় কার্যলয়ের প্রধান কার্যক্রম। খুলনা জেলায় বর্তমানে অডিটযোগ্য সমবায় সমিতির সংখ্যা ২২০৯। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সমবায় সমিতির অডিট সম্পাদন করা হয়। সরকারি রাজস্ব অডিট ফি বাবদ আদায়যোগ্য অর্থ প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে অডিট ফি বাবদ আদায় হয়েছে ২৩,০৭,৬০০/ টাকা। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে আদায় হয়েছে ২৬,৫৯,৬০০/- টাকা। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে আদায় হয়েছে ২৬,৫৯,৬০০/- টাকা। সমবায় উন্নয়ন তহবিল খাতে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর ধার্যের পরিমাণ ২৫,৮৯,৭১৩/- টাকা এবং এ পর্যন্ত আদায় হয়েছে ২০,৩২,৩৫৬/- টাকা। এছাড়াও নিবন্ধন ফি বাবদ ২৬,৫০০/- টাকা সরকারি রাজস্ব খাতে জমা দেওয়া হয়েছে। খুলনা জেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে পরিচালিত আশ্রয়ণ প্রকল্পের সংখ্যা ০২টি , আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)-এর সংখ্যা ২২টি এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ০৩টি। এ পর্যন্ত আশ্রয়ণ প্রকল্পের পূনর্বাসিত সদস্যদের মধ্যে ৩৩,৭৫,৫০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে আসল ও সার্ভিসচার্জসহ ৩২,৯০,৬৪৮/- টাকা আদায় হয়েছে। আদায়ের হার ৯৭%। আশ্রয়ণ ফেইজ-২ প্রকল্পের পুনর্বাসিত সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১,১৭,৩৭,৫০০/- টাকা। আসল ও সার্ভিসচার্জসহ আদায় হয়েছে ৮৫,৩১,৪৩৯/- টাকা। আদায়ের হার ৭৩%। এক্ষেত্রে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের পুনর্বাসিতদের মধ্যে ১১,৫০,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ রক্ষা হয়েছে এবং আসল ও সার্ভিসচার্জসহ মোট আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ৬,২৩,৭৬৫/- টাকা। আশ্রয়ণ প্রকল্পের পুনর্বাসিত সদস্যদের মধ্যে ২৭,৬০,৫০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে আসল+সার্ভিস চার্জসহ ২৬,১৬,১৫১/- টাকা আদায় করা হয়েছে। আদায়ের হার ৯৪%। আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) প্রকল্পের পুনর্বাসিত সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ৮১,৫২,৫০০/- টাকা। এর মধ্যে আসল ও সার্ভিসচার্জসহ ৫৩,৩১,৭৭৪/- টাকা আদায় করা হয়েছে। আদায়ের হার ৬৬%। খুলনা জেলায় দুগ্ধ সমবায় সমিতি কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনা জেলায় দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প চালু আছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় পাইকগাছা ও ডুমুরিয়া উপজেলায় ৮৫০টি গাভী ক্রয়ের জন্য ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ৪,৫০,০০,০০০/- টাকা (চার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা)। এর ফলে ৪২৫টি পরিবার দুগ্ধ উৎপাদনে সরাসরি যুক্ত হয়েছে। এ পর্যন্ত আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ ১,২৩,৬৭,৯৮০/- টাকা। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দৈনিক ৪,৫০০ লিটার দুধ উৎপন্ন হচ্ছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী

বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত উদ্যোগগুলোর মধ্যে ‘সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী’ একটি প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করা হয়। খুলনা

জেলায় এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত যেসব কার্যক্রমগুলো গৃহীত হয় তা উল্লেখ করা হলো।

ক্র: নং	ভাতা কর্মসূচির নাম	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ	বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ	ভাতা গ্রহিতার সংখ্যা	অবিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ	বিতরণের হার
১	বয়স্ক ভাতা	৫৯৮৩৩	৩৫৮৯৯৮০০০	৩৫৮৯৯৮০০০	৫৯৮৩৩	০	১০০%
২	বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা	২১৫০৭	১২৯০৪২০০০	১২৯০৪২০০০	২১৫০৭	০	১০০%
৩	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা	১৪০৩৭	১০১০৬৬৪০০	১০১০৬৬৪০০	১৪০৩৭	০	১০০%
৪	হিজড়া বয়স্ক বা বিশেষ ভাতা	১৩ জন	১২৪৮০০	১২৪৮০০	১৩	০	১০০%
৫	দলিত, হরিজন ও বেদে বয়স্ক বা বিশেষ ভাতা	২৮৪ জন	১১৩৬০০০	১১৩৬০০০	২৮৪ জন		১০০%
৬	প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি	১২৮৪ জন	৯০২৭৬০০	৯০২৭৬০০	১২৮৪ জন		১০০%
৭	হিজড়া শিক্ষা উপবৃত্তি	খুলনা জেলায় হিজড়া শিক্ষা উপবৃত্তিপ্রাপ্ত উপকারভোগী নেই।					
৮	দলিত, হরিজন ও বেদে শিক্ষা উপবৃত্তি	২৮২ জন	৮৬৮০০০	৮৬৮০০০	২৮২ জন		১০০%

সবার জন্য বিদ্যুৎ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের বিশেষ ১০টি উদ্যোগের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। এটি বর্তমান সরকারের একটি বড়ো সাফল্য। এতোদ্দেশ্যে সরকার 'সবার জন্য বিদ্যুৎ' প্রকল্প গ্রহণ করে। সে ধারাবাহিকতায় খুলনা জেলায়ও ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো:

<table>
<tr><th>প্রকল্পের নাম</th><th>নির্ণায়ক</th><th>তথ্য</th><th>সুবিধাভোগীর সংখ্যা</th></tr>
<tr><td rowspan="4">সবার জন্য বিদ্যুৎ</td><td>মোট বিদ্যুৎ লাইনের বিস্তৃতি</td><td>১৬৯২ কি.মি.(প্রায়)</td><td rowspan="4">১১ লাখ (প্রায়)</td></tr>
<tr><td>বিদ্যুতের চাহিদা</td><td>১৩৫ মেগাওয়াট(প্রায়)</td></tr>
<tr><td>বিদ্যুৎ গ্রাহক বা ভোক্তার সংখ্যা</td><td>২,০৫,৬২৮জন(প্রায়)</td></tr>
<tr><td>বিদ্যুৎ সরবরাহ</td><td>১৩৫ মেগাওয়াট(প্রায়)</td></tr>
</table>

অধ্যায়-১৪

ঐতিহাসিক স্থান ও এলাকা এবং স্থাপত্য

কয়রা উপজেলা

১৯৭৯ সালে প্রথমে এ উপজেলাটি থানা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় অতঃপর ১৯৮৩ সালে থানা থেকে উপজেলায় উন্নীতকরণ করা হয়। এ উপজেলার সীমানা উত্তরে-পাইকগাছা, দক্ষিণ ও আগে সুন্দরবন ও দাকোপ উপজেলা, পশ্চিমে-সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর ও আশাশুনি উপজেলা। জেলা সদর হতে দূরত্ব ১১০ কিলোমিটার, আয়তন ২৬৩.১২ বর্গকিলোমিটার, ইউনিয়ন পরিষদ-০৭টি, মৌজা-৭২টি এবং গ্রাম ১২৫টি। কয়রা উপজেলা থেকে সড়ক ও নৌপথে জেলা সদরে যাওয়া যায়।

এখানে তিনটি মহাবিদ্যালয়, বাইশটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দশটি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, চুয়ান্নটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সাতান্নটি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ আরও বাইশটি মাদরাসা এবং ৭টি ইউনিয়ন পরিষদ অফিস আছে। এখানে কিছু শিল্প ও কলকারখানা গড়ে উঠেছে তন্মধ্যে বরফকল, টেক্সটাইল মিল, বনজ শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি। এখানের প্রধান রফতানিদ্রব্য মাছের পোনা, সুন্দরবনের গাছ, গোলপাতা, মধু, কাঠ ও হস্তশিল্প।

কাটানীপাড়া

সেনহাট ইউনিয়নের সেনহাট একটি উল্লেখযোগ্য গ্রাম। এর আদিনাম ছুঁচোখালি (ছুঁচোহাটি)। এ গ্রামে কাটানীপাড়া নামে একটি প্রত্নস্থল রয়েছে। এ প্রত্নস্থলে একাধিক মন্দির ও ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এর অদূরবর্তী এলাকা দিয়ে ভৈরব নদ প্রবহমান।

খানজাহান আলী সেতু

রূপসা নদীর ওপর নির্মিত একটি সেতু। এটি রূপসা ব্রিজ নামেও পরিচিত। এটি ২১মে, ২০০5 সালে উদ্বোধন করা হয়। খুলনা শহরের রূপসা থেকে ব্রিজের দূরত্ব ৪.৮০ কিলোমিটার। এই সেতুকে খুলনা শহরের প্রবেশদ্বার বলা যায়। কারণ এই সেতু খুলনার সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলো বিশেষত মোংলা সমুদ্রবন্দরের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। সেতুটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১.৬০ কি.মি.। সেতুটিতে পথচারী ও অযান্ত্রিক যানবাহনের জন্য বিশেষ লেন রয়েছে। বর্তমানে এটি খুলনার একটি দর্শনীয় স্থানে পরিণত হয়েছে। রাতে সেতুর ওপর থেকে খুলনা শহরকে অপূর্ব সুন্দর দেখা যায়। উৎসবের দিনগুলোয় এই সেতুতে তরুণ-তরুণীরা ভিড় ও আনন্দ করেন। জাপানি সহায়তায় নির্মিত সেতুটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এই সেতুর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো দুপ্রান্তে দুটি করে মোট চারটি সিঁড়ি রয়েছে যার সাহায্যে মূল সেতুতে ওঠা যায়। প্রতিদিন প্রচুর দর্শনার্থী সেতুটি পরিদর্শন করতে আসেন।

খুলনা

খুলনা শহর রূপসা নদীর তীরে অবস্থিত। খুলনা হচ্ছে খুলনা বিভাগ ও জেলার সদর এবং বাংলাদেশের অন্যতম শিল্প নগরী। এ শহর বর্তমানে সিটি

করপোরেশন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। এ শহরের অধিকাংশ এলাকা তিনদিকে নদনদীবেষ্টিত। এ শহরের উত্তর সীমানায় ভৈরব নদ ও ফুলতলা থানার অন্তর্গত আটরা গিলাতলা ইউনিয়ন, পুর্ব ও দক্ষিণে রূপসা নদী এবং পশ্চিমে হাতিয়া নদী ও খুদী খাল রয়েছে।

যশোর জেলার অন্তর্গত খুলনা মহকুমা ১৮৪২ সালে গঠিত হয়। মহকুমায় উন্নীত হওয়ার পর খুলনাতেই মহকুমা সদর স্থাপন করা হয়। ১৮৮২ সালে খুলনা জেলা সদরে পরিণত হয়। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর এ শহর ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। কালক্রমে এখানে অনেক শিল্প কারখানা গড়ে ওঠে এবং এই শহরের জনসংখ্যাও বাড়তে থাকে। খুলনা শহরে শিল্প কারখানাসমূহের মধ্যে ১১টি পাটকল, ১টি কেবল কারখানা, নিউজপ্রিন্ট মিল, হার্ডবোর্ড মিল, জাহাজনির্মাণ কারখানা, বস্ত্র কল, ২টি দেশলাই কারখানাসহ ছোটো বড়ো অনেক শিল্প কারখানা অবস্থিত। খালিশপুর, রূপসা এবং শিরোমণি ইত্যাদি শিল্পাঞ্চল এলাকায় এসব কলকারখানা অবস্থিত।

খুলনা বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম পাট ব্যাবসা কেন্দ্র। চালনা বন্দরের সান্নিধ্যে হওয়ায় এখানে পাটের আড়তদারি ব্যাবসা গড়ে ওঠে। ভৈরব নদের উভয় তীরে অনেক পাকা এবং কাঁচা পাট প্রক্রিয়াকরণের জন্য জুট প্রেস আছে। সরকারি সংস্থা জুট ট্রেডিং করপোরেশন এবং জুট মার্কেটিং করপোরেশনসহ ব্যক্তিমালিকানার বেশকিছু প্রতিষ্ঠান এখানে পাট ব্যাবসায় নিয়োজি। শহরের দৌলতপুর এলাকা পাট ব্যাবসার প্রধান কেন্দ্র।

জেলা শহরে বহুসংখ্যক ঐতিহাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দৌলতপুর মহাবিদ্যালয়, আজম খান বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়, মহিলা মহাবিদ্যালয়, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, কৃষি বিদ্যালয়, পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, জিলা স্কুল, করোনেশন গার্লস স্কুল এবং খুলনা গার্লস স্কুল ইত্যাদি হচ্ছে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিল্প কারখানাগুলোর নিজস্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। এছাড়া অনেক সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

শহরের চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোর মধ্যে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল, জেনারেল হাসপাতাল উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও এখানে সংক্রামক ব্যাধি চিকিৎসাকেন্দ্র (ফুলবাড়িয়া এলাকায় অবস্থিত), বক্ষব্যাধি চিকিৎসাকেন্দ্র ও অন্ধ কল্যাণ সমিতি পরিচালিত চক্ষু হাসপাতাল ইত্যাদি আছে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সভা সমিতির জন্য শহরে কয়েকটি ঐতিহাসিক মিলনায়তন আছে। এগুলো হচ্ছে করোনেশন হল, সিটি করপোরেশন হল এবং রেলওয়ে ইনস্টিটিউট হল। এছাড়া হাদীস পার্ক এবং সার্কিট হাউস মাঠেও সভা-

সমিতি অনুষ্ঠিত হয়। শহরে সার্কিট হাউস ছাড়াও জেলা পরিষদ, প্লাটিনাম জুবিলী জুট মিল ও খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলের রেস্ট হাউস আছে। এছাড়া শহরে কয়েকটি বড়ো হোটেল যেমন- সিটি ইন, রয়েল ইন্টারন্যাশনাল ইত্যাদিতে বিভিন্ন সভা সমিতি, পারিবারিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশাসনিক এলাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছড়ানো-ছিটানো থাকলেও বেশিরভাগই শহরের প্রধান দুটি এলাকায় অবস্থিত। একটি হচ্ছে পুরানো শহর এলাকা (এ স্থানটি রূপসা-ভৈরব নদনদী মিলিত স্থলে অবস্থিত) এবং অপরটি হচ্ছে বয়রা এলাকা। পুরানো শহর এলাকায় জেলা প্রশাসন ভবন বা কালেক্টরেট, জেলা জজের আদালত, পুলিশ অফিস, জেলা পরিষদ, পৌরসভা অফিস, খুলনা উন্নয়ন সংস্থা ও বিভিন্ন ব্যাংকের অফিসসমূহ অবস্থিত। বয়রা এলাকায় (নূরনগর এলাকা নামেও পরিচিত) পানি উন্নয়ন বোর্ডের অফিস, অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল কর্তৃপক্ষের অফিস ইত্যাদি আছে।

প্রশাসনিক কেন্দ্রের সন্নিহিত স্টেডিয়াম এ জেলার ক্রীড়াঙ্গনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। অভ্যন্তরীণ নৌচলাচল কর্তৃপক্ষের টার্মিনাল এবং খুলনা রেল স্টেশন পাশাপাশি অবস্থিত। রেল এবং নৌপথ ভিন্ন সড়ক পথেও খুলনা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে সংযুক্ত। খুলনা শহরের তিন দিকই নদী বেষ্টিত বলে নদীতে প্রতিদিনই বহুসংখ্যক নৌকা পরিলক্ষিত হয়।

বর্তমানে শহরের প্রধান বিপণিকেন্দ্র হচ্ছে নিউ মার্কেট। অন্যান্য বিপণি কেন্দ্রসমূহের মধ্যে যশোর রোডে পিকচার প্যালেসের মোড়, দৌলতপুর মার্কেট, জেলা পরিষদ, ডাক বাংলো মার্কেট, রূপসা মার্কেট, খালিশপুর, বিআইডিসি রোডের চিত্রালী মার্কেট ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

খুলনা জাদুঘর

খুলনা বিভাগীয় জাদুঘর ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় জাদুঘরের আওতায় ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে জাদুঘরটি পরিচালিত। আয়তনের দিক থেকে এটি দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম জাদুঘর। এটি খুলনা সদরের শিব বাড়ি এলাকায় অবস্থিত।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের অন্যতম সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় গল্লামারীতে অবস্থিত। এটি খুলনা মহানগরী থেকে তিন কিলোমিটার পশ্চিমে খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কসংলগ্ন ময়ূর নদীর পাশে অবস্থিত। এর আয়তন ১০১.৩১৬ একর। ১৯৮৭ সালের ৪ জানুয়ারি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার গেজেট প্রকাশিত হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৯১ সালের ২৫ নভেম্বর। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসংখ্যা প্রায় ৫ হাজার এবং প্রতিবছর ২১টি বিষয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হয়।

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের অন্যতম সরকারি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়-'খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়' (কুয়েট) ফুলবাড়ীগেটে অবস্থিত। এটি খুলনা শহর থেকে ১৪ কি.মি. উত্তরে, যশোর-খুলনা মহাসড়কের পাশে অবস্থিত। আগে এর নাম

ছিল বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, খুলনা এবং তারও আগে খুলনা প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়। এটি বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অন্যতম। এখানে প্রায় তিন হাজার তিনশো ছাত্রছাত্রী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর প্রকৌশল ও বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা করছে। এখানকার শিক্ষকসংখ্যা ২০০র অধিক। বিশ্ববিদ্যালয়টির অঙ্গন সম্প্রসারণে নতুন কিছু ভবন তৈরি করা হয়েছে যেমন- অ্যাকাডেমিক ভবন, অডিটোরিয়াম কমপ্লেক্স, ছাত্রাবাস, গ্রন্থাগার, শিক্ষক ডরমিটরি ভবন ইত্যাদি। বর্তমানে আরও কিছু ভবনের নির্মাণকাজ চলছে।

গল্লামারী খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটে ময়ূর নদীর তীরে অবস্থিত গল্লামারী। ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের বেদনাবহ গণহত্যার স্মৃতিবিজড়িত স্থান গল্লামারী। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান রেডিয়ো স্টেশন (গল্লামারী রেডিয়ো সেন্টার) ভবনে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী মানুষদের ধরে এনে নির্মম নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করে গল্লামারী নদীতে ফেলে দেওয়া হতো। শহরের দু'কিলোমিটার অভ্যন্তরে গল্লামারী খালের পাশে এই বধ্যভূমির অবস্থান। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এই স্থানে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে পাকিস্তানি বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার-আলবদর বাহিনী। গল্লামারী এলাকায় রেডিয়ো সেন্টারে অসংখ্য নর-নারীকে ধরে এনে পৈশাচিক নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করে লাশ পার্শ্ববর্তী খালে ফেলে দেয়া হয়। কালের বিবর্তনে খালটির অস্তিত্ব এখন খুঁজে পাওয়া ভার। এই এলাকায় পাক হানাদার বাহিনী যে রেডিয়ো সেন্টারে ঘাঁটি গেড়েছিল সেটিও এখন নেই। খুলনা শহর মুক্ত হবার পর গল্লামারী খাল ও এর আশেপাশের স্থান থেকে প্রায় পাঁচ ট্রাক ভর্তি মানুষের মাথার খুলি ও হাড়গোড় পাওয়া যায়। ধারণা করা হয় ওই স্থানে আনুমানিক ১৫০০০ মানুষ হত্যা করা হয়। ১৯৯৫ সালে এখানে প্রথম একটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা হয়।

চাঁদখালী পাইকগাছা উপজেলার অন্তর্গত চাঁদখালী একটি গ্রাম ও ইউনিয়ন। এ গ্রামটি কপোতাক্ষ নদের তীরে অবস্থিত। যশোরের তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট হেংকেলের সময় থেকে (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে) এ এলাকাটি পরিচিতি লাভ করতে থাকে। তারই পরিকল্পনায় এখানে বন আবাদের দপ্তর স্থাপন করা হয়। স্বাভাবিকভাবে এখানে পণ্য বিক্রয় কেন্দ্রও গড়ে ওঠে। ১৭৮৬ সালে চাঁদখালী মহকুমা সদরের মর্যাদা পায়। চাঁদখালী ছিল ব্রিটিশ আমলে সুন্দরবন সীমান্তে অবস্থিত তিনটি বাজারের অন্যতম। অন্য দুটি হচ্ছে কচুয়া এবং হেংকেলগঞ্জ।

বর্তমানে চাঁদখালীর পূর্ব গুরুত্ব নেই। এখানে একটি ইউনিয়ন পরিষদ অফিস, উচ্চ বিদ্যালয়, পোস্ট অফিস ও ডাক্তারখানা আছে। কপোতাক্ষ নদের অপর তীরে বড়োদলের সাহেবহাটই এখন অধিক গুরুত্বপূর্ণ হাট।

চালনা (মোংলা) খুলনা শহর থেকে ৩২ মাইল দূরে পশুর ও মোংলা নদীর মিলিত স্থলের পূর্ব তীরে চালনা অবস্থিত। এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় সামুদ্রিকবন্দর। পাকিস্তান সৃষ্টির (১৯৪৭ সালে) পর দেশের একমাত্র সামুদ্রিকবন্দর চট্টগ্রামের পক্ষে এই অঞ্চলের আমদানি-রফতানির বাণিজ্য পণ্য খালাস ও বোঝাই অসম্ভব হয়ে

পড়লে তখন বিকল্প বন্দরের সন্ধান করতে হয়। সেজন্য বর্তমান মোংলা উপজেলার জয়মুনীতে (১৯৫০ সালে) পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম বন্দরের কাজ শুরু হয়। ১৯৫০ সালের ১১ ডিসেম্বর 'সিটি অব লীয়নস্' জাহাজ এই বন্দরে প্রথম নোঙর ফেলে। দুই বছর পর চালনার নিকট পশুর এবং চুনকুড়ি নদীর মিলিত স্থলে বন্দরটি স্থানান্তরিত হয়। এ স্থানটিও সামুদ্রিক বন্দরের জন্য উপযোগী না হওয়াতে ১৯৫৪ সালে এই বন্দর আবার চালনা থেকে ১২ মাইল দূরে মোংলায় স্থানান্তর করা হয়। মোংলায় বন্দর স্থানান্তরের পরও সরকারি নথিপত্রে এটি চালনা বন্দর নামেই উল্লিখিত হতে থাকে। বন্দরের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের দায়িত্ব চালনা বন্দর কর্তৃপক্ষ নামে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার ওপর অর্পিত। এখানে চালনা বন্দর কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তর অবস্থিত। খুলনা-মোংলা সড়কের মাধ্যমে সড়কপথেও এই বন্দরের সাথে খুলনার যোগাযোগ গড়ে উঠেছে।

চুকনগর

মুক্তিযুদ্ধের বেদনাবহ গণহত্যার স্মৃতিবিজড়িত স্থান চুকনগর। এটি খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলায় অবস্থিত। ভারতে যাবার জন্যে শরণার্থীরা ট্রানজিট হিসেবে বেছে নেন ডুমুরিয়ার চুকনগরকে। ১৯৭১ সালের ১৯ মে রাতে সবাই চুকনগরে এসে পৌঁছান। পরদিন সকালে সাতক্ষীরা এবং কলারোয়ার বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করার জন্য চুকনগরে সমাবেত হন তারা। সেখানে কোথাও তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। হাজার হাজার মানুষ চুকনগরের পাতোখোলা বিল, কাঁচাবাজার চাঁদনী, ফুটবল মাঠ, কালী মন্দিরসহ বিভিন্ন শ্মশানে আশ্রয় নেন। ভারতীয় সীমান্তবর্তী এই গ্রামে ২০ মে খুলনা ও বাগেরহাট থেকে ভদ্রা নদী পার হয়ে আসা ভারত অভিমুখী হাজার হাজার মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা না গেলেও চুকনগরে ৮ থেকে ১০ হাজার মানুষ গণহত্যার শিকার হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। ইতিহাসে এমন গণহত্যার নজির বিরল। গণহত্যায় শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশে চুকনগরে একটি স্মৃতিসৌধ স্থাপন করা হয়েছে যা 'চুকনগর শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ' নামে পরিচিত।

জেলা প্রশাসকের বাংলো

বাংলা সাহিত্যের প্রবাদপুরুষ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর স্মৃতিধন্য খুলনার জেলা প্রশাসকের বাংলো। ১৮৬০-১৮৬৪ সালে খুলনার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর থাকাকালীন সময়ে এই বাংলোই ছিল তাঁর বাসস্থান। ভৈরব নদের তীরে অবস্থিত এই বাংলোর বকুলতলায় বসেই কবি রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রেমের উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'।

জোড়া শিব মন্দির

খুলনা শহরে ৫নং ঘাটের কাছে এ প্রত্নস্থলের অবস্থান। এ প্রত্নস্থলের পাশাপাশি দুটি পূর্বমুখী মন্দির দাঁড়িয়ে আছে।দুটি মন্দিরই একই আকৃতি ও মশলায় তৈরি। মন্দির দু'টির উত্তরদিকে একটি বিশাল দিঘি ছিল। দিঘিতে এক সময় শান বাঁধানো ঘাটেরও অস্তিত্ব ছিল। জানা যায় যে, বাংলা ১৩৪৩ সনে জনৈক বলদেব আগরওয়াল নামে একজন মাড়োয়ারি এ স্থানটিতে একটি বাগান নির্মাণ

করেছিল। বর্তমান বাগানটির কোনো চিহ্ন নেই। তা ছাড়া ১৮৮০ সালে খুলনা রেলওয়ে স্টেশন তৈরির সময় সংলগ্ন দিঘিটির একাংশ ভরাট করে ফেলা হয়েছিল। একাত্তরে দেশ স্বাধীনের আগে মন্দিরটির লাগোয়া জমিতে একটি পাঠশালা ছিল বলেও জানা যায়। কিন্তু সেটারও কোনোা অস্তিত্ব আজ আর নেই।

অনেকে ধারণা করেন যে, দেওয়ান শ্রীকৃষ্ণরাম বসু নামে জনৈক হিন্দু বঙ্গাব্দ ১১০৮ সনে মন্দির দু'টি নির্মাণ করে সেখানে দু'টি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরে কে বা কারা মুর্তিগুলো অন্যত্র নিয়ে গেলে একজন রেলওয়ে কর্মকর্তার স্ত্রী কাশী থেকে পাঁচটি মূর্তি (?) এনে প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সে সবের কোনোটাই আজ আর নেই। কেবল কালোপাথরে তৈরি দু'টি শিবলিঙ্গ রয়েছে। সম্প্রতি এই ইমারত দু'টিকে স্থানীয় উদ্যোগে সংস্কার করে আংশিক নতুন আদল দেওয়া হয়েছে।

ডুমুরিয়া উপজেলা খুলনা সদরের অন্তর্গত ডুমুরিয়া একটি গ্রাম ও একই নামের উপজেলা সদর। এখানে একটি উচ্চ বিদ্যালয়, হাসপাতাল, ডাক্তারখানা ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিস আছে। এখানে পাট, ধান, চিনি ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে বেচাকেনা হয়। এখানে নৌকাও প্রস্তুত করা হয়। কুটিরশিল্পসমূহের মধ্যে এখানকার তৈরি পাপোশ ও তাঁত বস্ত্রের খ্যাতি আছে।

খুলনা জেলার ০৯টি উপজেলার মধ্যে সর্ববৃহৎ উপজেলা ডুমুরিয়া। জনসংখ্যা ৩,০৭,৬৪৪ জন। ইউনিয়ন পরিষদ ১৪টি, মৌজা ২০৪টি এবং গ্রাম ২৩৭টি। জেলা সদর থেকে উপজেলা সদরের দূরত্ব ১৫ কি.মি.। এটি খুলনা-৫ নির্বাচনী এলাকার মধ্যে অবস্থিত।

তেরখাদা উপজেলা ১৯১৮ সালে তেরখাদা থানার সৃষ্টি হয় এবং প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলে থানাটি পরবর্তীকালে ১৯৮৩ সালে উপজেলার মর্যাদা লাভ করে। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে তেরখাদা উপজেলাটি গুরুত্বপূর্ণ। তেরখাদা উপজেলার আয়তন ০.৫৪ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা ১,১৮,৮৫৪ জন। ইউনিয়ন পরিষদ-৪টি, মৌজা ৩৩টি এবং গ্রাম ১০০টি। জেলা সদর থেকে উপজেলা সদরের দূরত্ব ২৫ কি.মি.। এটি খুলনা-৬ নির্বাচনী এলাকার মধ্যে অবস্থিত।

দাকোপ উপজেলা দাকোপের উত্তরে বটিয়াঘাটা উপজেলা, আগে বটিয়াঘাটা ও রামপাল উপজেলা, দক্ষিণে সুন্দরবন এবং পশ্চিমে পাইকগাছা উপজেলা অবস্থিত। জেলা সদর হতে দূরত্ব ২৬ কিলোমিটার। আয়তন ৯৯১.৯৮ বর্গকিলোমিটার (সুন্দরবনসহ) এবং জনসংখ্যা ১,৫৮,৩০৯ জন (২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)। ইউনিয়ন পরিষদ ০৯টি, মৌজা- ২৫টি এবং গ্রাম ১০৬টি। এটি খুলনা-১ নির্বাচনী এলাকার মধ্যে অবস্থিত। দর্শনীয় স্থান করমজল, হিরণপয়েন্ট দাকোপ উপজেলায় অবস্থিত। দাকোপ উপজেলায় ১টি পৌরসভা আছে। দাকোপ উপজেলা থেকে সড়ক ও নৌপথে জেলা সদরে যাওয়া যায়।

দিঘলিয়া উপজেলা

৭ নভেম্বর ১৯৮৩ সালে দিঘলিয়া উপজেলার সৃষ্টি হয়। দিঘলিয়া উপজেলা ০৬টি ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে গঠিত। ভূখণ্ড মূলত ভৈরব নদের পলি থেকে সৃষ্টি। জনসংখ্যা ১,৬৩,২৬৫ জন। ইউনিয়ন পরিষদ- ০৬টি, মৌজা- ৩২টি এবং গ্রাম ৫৮টি। জেলা সদর থেকে উপজেলা সদরের দূরত্ব ১২ কি.মি.। এটি খুলনা-৪ নির্বাচনী এলাকার মধ্যে অবস্থিত।

এখানে দুইটি মহাবিদ্যালয়, চৌদ্দটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, চৌত্রিশটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পনেরোটি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ আরও ছয়টি মাদরাসা এবং ইউনিয়ন পরিষদ অফিস আছে।

দক্ষিণডিহি

একটি গ্রামের নাম। গ্রামটি ভৈরব নদের পশ্চিম পাড়ে খুলনার ফুলতলা উপজেলায় অবস্থিত। শান্ত নিরিবিলি এই গ্রাম বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুরবাড়ি। দক্ষিণডিহি গ্রামে দক্ষিণডিহি মৌজায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুর বেণী মাধব চৌধুরীর বাড়িতেই গড়ে উঠেছে রবীন্দ্র স্মৃতি জাদুঘর। জাদুঘরের সংস্কার ও আধুনিকায়ন পরবর্তী ভবনটির উদ্বোধন করা হয় ১০ মে ২০১৪ তারিখে। প্রতিদিন এখানে হাজার হাজার দর্শনার্থী আসেন জাদুঘর ও রবীন্দ্র শ্বশুরবাড়ি কমপ্লেক্স দেখতে। এখানে কবিগুরু ও কবিপত্নীর আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিবছর ২৫ বৈশাখ ও ২২ শ্রাবণ এখানে নানা আয়োজনে রবীন্দ্রজয়ন্তী ও কবিপ্রয়াণ দিবস পালন করা হয়।

প্রত্নস্থলটিতে একটি ইটনির্মিত ত্রিতল ভবন রয়েছে। সমতল ভুমি থেকে ৬০.১ সেমি. উঁচু একটি নিরেট মঞ্চের ওপর এই ইমারত দন্ডায়মান। দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ইমারতটির মেঝের পরিমাপ ১৮.২৮ মি/৬০'-০" ও ১৬.৭৬ মি./৫৫'-০"। এটি একটি দক্ষিণমুখী ত্রিতল ভবন। নিচের তলায় পাশাপাশি তিনটি প্রায় গোলাকার খিলানপথ দিয়ে প্রবেশ করে প্রথমে পড়বে অপ্রশস্ত একটি বারান্দা। তারপর পিছনে রয়েছে পাঁচটি প্রায় সম-আকৃতির কোঠা। দ্বিতলে রয়েছে দু'টি কোঠা এবং ত্রিতল ধ্বংসপ্রাপ্ত। দ্বিতলের গতরদৃশ্যকে দুজোড়া বেলুনাকার থাম দিয়ে তিনটি সমান অংশে বিভক্ত করা হয়েছে।

দৌলতপুর

একটি ইউনিয়ন ও একই নামের থানা সদর। এ স্থানটিকে খুলনা শহরের একটি অংশও বলা যেতে পারে। খুলনা শহর থেকে ৫ মাইল উত্তরে যশোর-খুলনা সড়কের পাশে ভৈরব নদের তীরে এ স্থানটি অবস্থিত। রেল ও স্টিমারযোগে এখান থেকে খুলনায় যাতায়াত করা যায়।

পাকিস্তান আমলে এখানে অনেকগুলো কলকারখানা গড়ে ওঠে। খুলনা শিপইয়ার্ড ভিন্ন খুলনার প্রায় বড়ো বড়ো শিল্প কারখানাগুলো এ এলাকাতেই অবস্থিত। এখানকার শিল্প ও অন্যান্য কারখানাগুলোর মধ্যে গোয়ালপাড়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র, নিউজপ্রিন্ট মিল, স্টার জুট মিল, পিপলস্ জুট মিল, ক্রিসেন্ট জুট মিল ও দৌলতপুর জুট মিল উল্লেখযোগ্য। পাট বেচাকেনার জন্য এ স্থানটি প্রসিদ্ধ।

এখানে একটি সরকারি মহাবিদ্যালয় (বিএল কলেজ, দৌলতপুর), কৃষি মহাবিদ্যালয়, উচ্চবিদ্যালয়, ডাক্তারখানা, হাসপাতাল, ইউনিয়ন পরিষদ অফিস, সাবরেজিস্ট্রি অফিস ও যক্ষা হাসপাতাল আছে।

নেহাল উদ্দিন ফকিরের মাজার এ প্রত্নস্থলটি ২নং ইউনিয়নের নেহালপুর গ্রামে অবস্থিত। এই প্রত্নস্থলে একটি অনুচ্চ এবং অতি ক্ষতিগ্রস্ত ঢিবি রয়েছে। আয়তাকারে (১৮.২৮ মি/৬০'-০" এবং ১৭মি./৫৬'-০") বিস্তৃত এ ঢিবির সর্বোচ্চ স্থান পার্শ্ববর্তী সমতল আবাদি জমির পৃষ্ঠদেশ থেকে ৩.৬৫মি./ ১২'-০" উচ্চতায় অবস্থিত। ঢিবিটির পৃষ্ঠদেশ বর্তমানে আগাছা ও ঝোপজঙ্গালে আবৃত। কেবল একটি অংশ কবরস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। স্থানীয় জনগণ বিশ্বাস করে যে, এ ঢিবিতে নেহাল উদ্দীন ফকির নামে একজন মুসলিম সুফি-সাধকের কবরস্থান আছে। তারা আরও বিশ্বাস করে যে, এই নেহাল উদ্দীন পনেরো শতকের যোদ্ধাসাধক উলুঘ খান-ই-জাহানের সমসাময়িক ছিলেন। কিন্তু এই বক্তব্যের সমর্থনে কোনো যোগসূত্র পাওয়া যায়নি।

পাইকগাছা উপজেলা পাইকগাছা উপজেলার উত্তরে সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলা এবং খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলা, আগে বটিয়াঘাটা উপজেলা, এবং পশ্চিমে সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি ও কালীগঞ্জ উপজেলা। জেলা সদর হতে দূরত্ব ৬৫ কিলোমিটার। আয়তন ৩৮৩.৮৭ বর্গকিলোমিটার। ইউনিয়ন পরিষদ- ১০টি, মৌজা- ১৭৪টি এবং গ্রাম ২১২টি। জনসংখ্যা ২,৪৭,৯৮৩ জন। এটি খুলনা-৬ নির্বাচনী এলাকার মধ্যে অবস্থিত।

পায়গ্রাম-কসবা মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পায়গ্রাম কসবা গ্রামে অবস্থিত। প্রাচীন মসজিদ ঢিবিটি যশোর-খুলনা মহাসড়কে বর্তমান বেজেরডাংগা বাসস্ট্যান্ড থেকে ৩ কি.মি. পশ্চিম-উত্তর কোণায় ভৈরব নদের ১৫০ মিটার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি থেকে ৭-৮ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট প্রাচীন মসজিদ ঢিবির পরিমাপ ৩০ মি. × ৩০ মি.। ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক খননে আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করে। জানা যায় ‘খুলনা-যশোরের ইতিহাস’ নামক প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থের প্রণেতা ও ইতিহাসবিদ শ্রীসতীশ চন্দ্র মিত্র এক শতাব্দী আগে ১৯১০ সালে এই প্রাচীন মসজিদ ঢিবি পরিদর্শন করে তার গ্রন্থে ঢিবির নিচে লুকায়িত পুরকীর্তি সম্পর্কে আভাস দিয়ে বলেন, “এটি বাগেরহাটের ষাটগুম্বুজের ন্যায় কোনো বৃহৎ নামাজের স্থান বা দরবার গৃহ ছিল বলে অনুমিত হয়”। ঢিবির পাদদেশে দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা দুখানা কথিত কষ্টিপাথর (Salte) ও রাজমহল পাথরের অস্তিত্বের কথাও তিনি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ছাড়াও গ্রামটির ভূমি গঠন, স্থানিক নামকরণ থেকেও গ্রামটির প্রাচীনত্ব ও সমৃদ্ধ ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা মেলে। পায়গ্রাম কসবার খানজাহান (র.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি মধ্যযুগীয় শহরের অস্তিত্ব ছিল বলে গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত শহরে জলাশয় খনন, পাকা সড়ক নির্মাণ ও মসজিদ স্থাপনের কথাও জানা যায়। অধিকাংশ মসজিদ

কালের বিবর্তনে হারিয়ে গেলেও এই মসজিদটি ঢিবি আকারে টিকে ছিল। পায়গ্রাম কসবা পীর খানজাহান (র.) এর বিশ্বস্ত সহচর পীরালী তাহেরের জন্মস্থান বলেও কথিত।

পিসি রায়ের বাড়ি

বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (পি.সি.রায়) এর জন্মভূমি। ১৮৬১ সালের ২ আগস্ট খুলনার পাইকগাছা উপজেলার কপোতাক্ষ নদের তীরবর্তী রাড়ুলীতে স্যার পি.সি. রায় জন্মগ্রহণ করেন। পি.সি.রায় ছিলেন একাধারে বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও শিল্পী। সমাজ সংস্কারে মানবতাবোধে উজ্জীবিত ছিলেন। তিনি তদানীন্তন সময়ে পল্লি মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমবায় ব্যাংক পদ্ধতি চালু করেন। ১৯০৯ সালে নিজ জন্মভূমিতে কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। চারটি গ্রামের নাম মিলে ১৯০৩ সালে বিজ্ঞানী স্যার পি.সি.রায় দক্ষিণ বাংলায় প্রথম আর.কে.বি.কে হরিশচন্দ্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন।

রাড়ুলী ইউনিয়নের বাড়ুলী গ্রামে অবস্থিত এ বাড়িটি একটি সংরক্ষিত পুরাকীর্তি। প্রায় ১ হেক্টর/২.৪৭ একর জমির ওপর বিস্তৃত এই বাড়িতে মোট চারটি স্থাপনা ও একটি পুকুর রয়েছে। বাড়ির দক্ষিণ প্রান্তের স্থাপনাটির নাম ‘সদর বাড়ি’। এর পশ্চিম অংশ চিলেকোঠাবিশিষ্ট। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্ররায়ের পিতা হরিশচন্দ্র রায়চৌধুরী খুব সম্ভবত ঊনিশ শতকের শেষ অর্ধাংশের কোনো এক সময় এ বাড়িরনির্মাণ কাজ শুরু করেছিলেন। ভবনগুলোর ছাদ সমতল, পোড়ামাটির টালি আকৃতির ইট ব্যবহৃত হয়েছে। নির্মাণকাজের অন্যান্য উপকরণের মধ্যে আধুনিক ধরনের ইট, চুনসুরকি, কাঠের রেলিং প্রভৃতি অন্যতম। দেয়ালের গা চুনকামসহ পলেস্তরায় আবৃত। তবে উপরে আধাগোলাকার খিলান-নকশা রয়েছে। মন্দির অংশে রূপান্তরিত অনুপূরক খিলানের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

পিঠাভোগ

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের বাস্তুভিটা হিসাবে খ্যাত কুশারী বাড়ি রূপসা উপজেলার ৫নং ঘাটভোগ ইউনিয়নের অন্তর্গত পিঠাভোগ গ্রামে অবস্থিত। নওয়াপাড়া বিশ্বরোড থেকে ৭ কি.মি. দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে পিঠাভোগ কাজদিয়া সেতু পার হয়ে ১ কি.মি. আগে ঘাটভোগ ইউনিয়ন পরিষদের প্রাচীন ভৈরব নদের ৪০০ ফুট উত্তর পাড়েই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের বসতভিটা। ২০১৫ সালে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক কবিগুরুর পূর্বপুরুষের বাস্তুভিটাকে সংরক্ষিত পুরাকীর্তি ঘোষণা করা হয়। আঠারবেকী নদীর পূর্বতীরে ও ভৈরবের উত্তর অববাহিকায় মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে গড়ে ওঠা এ প্রাচীন জনপদটি প্রচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করছে।

খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে আদিশুরের রাজত্বকালে কান্যকুব্জ থেকে যে পঞ্চব্রাহ্মণের আবির্ভাব ঘটে তাদের মধ্যে শান্ডিল্য গোত্রীয় ক্ষিতিশ ছিলেন অন্যতম। পিঠাভোগের কুশারীরাও শান্ডিল্য গোত্রীয় ক্ষিতিশের বংশজাত ব্রাহ্মণের উত্তরপুরুষ। কথিত রয়েছে ভট্টনারায়ণের পুত্র দ্বীননাথ শান্ডিল্য গোত্রীয় শোত্রীয় ব্রাহ্মণ মহারাজা ক্ষিতিশুরের অনুগ্রহে বর্ধমান জেলার ‘কুশ’ নামক

গ্রামে দানস্বত্ব লাভ করে কুশারী গোত্রীয়ভুক্ত হন। সেখান থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ব পুরুষের উপাধি কুশারী উদ্ভত হয় (রবীন্দ্র জীবনী, ১ম খন্ড প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৯২)। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকে কুশারী গোত্রের বিভিন্ন শাখা এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। কালক্রমে ঢাকা, বাঁকুড়া ও খুলনা'র রূপসা থানার পিঠাভোগ গ্রামে তাদের আবাসভূমি গড়ে ওঠে।

দ্বীননাথ কুশারীর অষ্টম পুরুষ তাঁরানাথ কুশারী ভৈরব তীরবর্তী পিঠাভোগ গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তারানাথ কুশারীর দুই পুত্র রামাগোপাল ও রামনাথ। রামগোপালের পুত্র জগন্নাথ কুশারীই ছিলেন ঠাকুরবংশের আদিপুরুষ যিনি খুলনা ফুলতলার দক্ষিণডিহি নিবাসী শুকদেব রায়চৌধুরীর এক কন্যাকে বিয়ে করে পীরালি ব্রাহ্মণ গোত্রভুক্ত হয়ে ("বৈবাহিক দোষে দুষ্ট হয়ে") জাতিচ্যুত হন এবং দক্ষিণ ডিহির শ্বশুরালয়ে স্থায়ী বসতি স্থাপনে বাধ্য হন। এই জগন্নাথ কুশারীর দ্বিতীয় পুত্র পুরুষোত্তম থেকেই ঠাকুরধারা প্রবহমান। জগন্নাথ কুশারীর পরবর্তী বংশধর পঞ্চনন কুশারী পারিবারিক মতোপার্থক্যের কারণে গঙ্গাতীরে কালিঘাটে কলকাতা শহরের নিকটবর্তী গোবিন্দপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ইংরেজরা তখন গোবিন্দপুর, সুতানুটি, কলকাতা এই তিনটি গ্রাম নিয়েই কলকাতা শহরের গোড়াপত্তন করে। কুশারীরা ব্রাহ্মণ ছিলেন বিধায় স্থানীয় রুচিবান মানুষেরা ব্রাহ্মণ পঞ্চানন কুশারীকে সসম্মানে ঠাকুর বলে ডাকতেন। এভাবেই তারা কালক্রমে পিঠাভোগ গ্রামের কুশারী থেকে কলকাতার ঠাকুর হলেন। কলকাতার সম্মানীত পঞ্চানন কুশারী ওরফে পঞ্চানন ঠাকুরের পরবর্তী বংশধর নীলমণি ঠাকুর প্রভূত অর্থবিত্তের মালিক হয়ে কলকাতার জোড়সাঁকোয় গিয়ে বাড়ি করেন।

রামনাথ কুশারীর যে বংশধর তাদের শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ আভিজাত্য নিয়ে পিঠাভোগ গ্রামে বসবাস করতো তাদের মধ্যে তারিণী কান্ত কুশারী ছিলেন অন্যতম। তিনি ইংরেজ কোম্পানির সাথে ব্যাবসা করে, লাইট রেলওয়ে কোম্পানির শেয়ার কিনে এবং স্টিমার কোম্পানিতে ম্যানেজারি করে প্রভূত অর্থবিত্তের মালিক হন। তিনি জগন্নাথ কুশারীর অংশভুক্ত ৯.৩৫ একর জমির মালিকানা লাভ করে কুশারীবাড়িতে পুকুর খনন ও অট্টালিকা নির্মাণ করেন। পিতৃকুল, মাতৃকুল ও শ্বশুরকুলের সুবাদে রবীন্দ্র পরিবারের সাথে খুলনার দক্ষিণডিহি ও রূপসা থানার পিঠাভোগ গ্রামের কুশারীদের বিভিন্ন সময়ে ঐতিহাসিক আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে ওঠে।

প্রতাপাদিত্যের গড়

এই প্রত্নস্থলে একটি পুরনো দুর্গের কিছু বিক্ষিপ্ত নিদর্শন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এটি বেদকাশী ইউনিয়নের বেদকাশী মৌজায় অবস্থিত। আয়তাকার নির্মিত এই বিলুপ্তপ্রায় দুর্গের পরিমাপ উত্তর-দক্ষিণ প্রায় ৩৩৫.২৮/১১০০'-০" এবং পূর্ব-পশ্চিমে ২৭৪.৩১ মি./৮৯৯'-৯"। এর চওড়া ইটের দেয়ালের চিহ্ন সনাক্তকরণযোগ্য অবস্থায় বেশ কয়েকটি স্থানে দেখা যায়। একটি স্থানে এর উচ্চতা সর্বোচ্চ ৬০.৯৫ মি./২'-০" পাওয়া গেছে। এ ছাড়াও পার্শ্ববর্তী ভুমির

পৃষ্ঠদেশের বর্তমান অবস্থা অবলোকন করে অনুমিত হয় যে, উক্ত প্রাচীরের গতরভাগ ঘেঁষে একসময় প্রতিরক্ষা খাড়ি ছিল। এই দুর্গের ভিতরে অবস্থিত নিদর্শনাদিও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। স্থানীয় লোকজনের নিকট এ স্থানটি ‘বড়োবাড়ি’ নামে পরিচিত।

ফুলতলা উপজেলা

ফুলতলা উপজেলা ১৯১৭ সালের ১৫ জুলাই থানা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৭ সালের ২১ সেপটেম্বর গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার পর ১৯১৮ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ফুলতলা থানার কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীকালে উপজেলায় উন্নীত হয় ১৯৮৩ সালে। জেলা সদর হতে দূরত্ব ২২ কিলোমিটার। আয়তন ৭৪.৩৩ বর্গকিলোমিটার। ইউনিয়ন পরিষদ- ০৪টি, মৌজা- ২৪টি এবং গ্রাম ৩৮টি। উপজেলার উত্তরে- অভয়নগর (যশোর), দক্ষিণে- দিঘলিয়া ও খুলনা সিটি করপোরেশন, আগে- অভয়নগর, পশ্চিমে-ডুমুরিয়া উপজেলা।

বটিয়াঘাটা উপজেলা

উত্তরে খুলনা সদর ও রূপসা উপজেলা, আগে ফকিরহাট ও রামপাল উপজেলা, দক্ষিণে দাকোপ ও পাইকগাছা উপজেলা এবং পশ্চিমে ডুমুরিয়া উপজেলা। জেলা সদর হতে দুরত্ব ১০ কি.মি.। আয়তন ২৩৫.৩২ বর্গকিলোমিটার। ইউনিয়ন পরিষদ ০৭টি, মৌজা ৩৬টি এবং গ্রাম ১৭২টি। জনসংখ্যা ১,৭১,৬৯১ জন।

বাজুয়া

দাকোপ উপজেলার অন্তর্গত বাজুয়া একটি গ্রাম ও ইউনিয়ন। চালনা থেকে ৫ মাইল দূরে বাজুয়া খালের তীরে এ গ্রামটি অবস্থিত। এখানে মৎস্য রফতানি সংস্থার কোল্ড স্টোরেজ আছে। প্রধানত চিংড়ি মাছই এখানে রফতানির জন্য হিমায়িত করা হয়। চালনার পার্শ্ববর্তী উপ-বন্দর হিসেবে বাজুয়ার গুরুত্ব ক্রমশই বাড়ছে। এখানে একটি মহাবিদ্যালয়, উচ্চবিদ্যালয় ও ইউনিয়ন পরিষদ অফিস আছে।

বাসুমঠ

খুলনার প্রত্নস্থলের অপর একটি অন্যতম ইমারত বাসুমঠ। এ ছোট্ট অথচ সুন্দর ইমারতটি একটি স্মৃতি মন্দির। এটা ৭মি./২৩'-০" বর্গাকার একটি মঞ্চের ওপর দন্ডায়মান। আট ধাপ বিশিষ্ট সিঁড়ি দিয়ে দক্ষিণ দিক থেকে আরোহণযোগ্য মঞ্চটির ওপর রয়েছে চারদিকে খোলা বারান্দাবেষ্টিত মূল স্মারককোঠা। মন্দিরটির ছাদের চার কোণে চারটি এবং মাঝখানে একটি অপেক্ষকৃত বড়ো আকারের গম্বুজ স্থাপন করে মন্দিরটিকে ‘পঞ্চরত্ন’ রূপ দেওয়া হয়েছে।

স্থাপত্যিক ও কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে মন্দিরটি আনুমানিক উনিশ শতকে নির্মিত বলে ধরে নেওয়া যায়। মন্দিরটিতে অবশ্য একটি লিপিসম্বলিত মর্মর পাথর সংস্থাপিত রয়েছে। এ লিপির পাঠ অনুযায়ী জনৈক শ্রী অধির হর চৌধুরী বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ সালে রায় কুমুদ বন্ধু দাস শর্মা বাহাদুরের সময়কালের বহু আগেই নিজ স্মৃতি রক্ষার্থে এ মন্দির নিমার্ণ করেছিলেন। তবে এর মূল নির্মাতা শ্রী ললিত মোহন রায় যিনি বাস্তদেব পূজার্থে স্মৃতি মন্দিরটি উৎসর্গ করেছিলেন।

বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিনের সমাধিসৌধ মুক্তিযুদ্ধের মহান বীরত্বের স্মৃতিবিজড়িত খুলনার মাটিকে ধন্য করে এখানে ঘুমিয়ে আছেন বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন। তিনি ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে খুলনার রূপসা নদীতে একটি যুদ্ধজাহাজে থাকাকালে শত্রুপক্ষের বিমান হামলায় শহীদ হন। এরপর রূপসা নদীর পূর্বপাশে বাঘমারা গ্রামে নদীর পাশে তাকে দাফন করা হয়। এই বীর ১৯৩৫ সালে নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি উপজেলার বাঘপাচড়া গ্রামে (বর্তমান শহীদ রুহুল আমিন নগর) জন্মগ্রহণ করেন। খুলনার রূপসা উপজেলার বাগমারা গ্রামে দেড় একর জমির ওপর বাংলার বীরসন্তানদের রুহুল আমিন সমাধিসৌধ অবস্থিত।

ভবনাথ মল্লিক জোড় বাংলা মন্দির খুলনা শহরের উত্তর অংশে মহেশ্বরপাশা এলাকার মল্লিকপাড়ায় এই প্রত্নতত্ত্বের অবস্থান। প্রত্নস্থলটিতে আধুনিক যুগ শুরু পর্বের একটি দক্ষিণমুখী দ্বিতল দালান, খোলা চত্বর, দেয়াল, দু'টি পকুর এবং মধ্যযুগের শেষ পর্বে নির্মিত একটি জোড়বাংলা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। দ্বিতীয় ভবনটি বর্তমানে জিয়া কলেজ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। জোড়বাংলা মন্দিরটি শিল্প-ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রচলিত লোকশ্রুতি অনুযায়ী নবাবি আমলে ভবনাথ মল্লিক নামে একজন সেরেস্তাদার গোবিন্দের প্রাণ প্রতিষ্ঠাকল্পে এ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।

মসজিদকুর মসজিদ কপোতাক্ষ নদের তীরে মসজিদকুর ইউনিয়নের মসজিদকুর গ্রামে অবস্থিত এই প্রত্নস্থলে একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ মাটিচাপা পড়া অবস্থায় আবিস্কৃত হয়েছিল। পরে মাটি অপসারণ ও প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যাদি পরিচালনা করে মসজিদটিকে দর্শনীয় অবস্থায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। মসজিদের ছাদ নয়টি আধাবৃত্তাকার গম্বুজ দিয়ে আবৃত। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী পনেরো শতকের বিখ্যাত সাধক-যোদ্ধা উলুঘ খান-ই-জাহানের দু'সহচর বুড়া খাঁ (বোরহান খাঁ) ও তাঁর পুত্র ফতেহ খাঁ এই মসজিদের নির্মাতা। এই জনশ্রুতিকে সমর্থন করার মতো যদিও কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না তথাপি মসজিদের স্থাপত্যশৈলীর সঙ্গে বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ ও নয় গম্বুজ মসজিদের আংশিক সাদৃশ্য পাওয়া যায়। সেহেতু মসজিদটিকে খ্রিস্টীয় পনের-ষোল শতকের নিদর্শন হিসাবে ধরে নেওয়ার ক্ষেত্রে তেমন বাধা নেই। এটি একটি সংরক্ষিত পুরাকীর্তি।

রূপসা উপজেলা একটি গ্রাম, ইউনিয়ন ও একই নামের উপজেলা সদর। এখানে উপজেলা সদর দপ্তর, উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি অফিস আছে।

এখানে তিনটি মহাবিদ্যালয়, এগারোটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পাঁচটি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ছেচল্লিশটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও চৌদ্দটি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ আরও তেইশটি মাদরাসা এবং ইউনিয়ন পরিষদ অফিস আছে।

এখানে কিছু শিল্প ও কলকারখানা গড়ে উঠেছে তন্মধ্যে বস্ত্র, পাট, পাটজাত শিল্প, পেপার বোর্ড প্রিন্টিং, ট্যানারি ও রাবার, কেমিক্যাল শিল্প, গ্লাস, সিরামিক, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি।

২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এ উপজেলার জনসংখ্যা ৬০৪,৬৭জন। ইউনিয়ন পরিষদ- ০৫টি, মৌজা ৭৮টি এবং গ্রাম ৬৪টি। দর্শনীয় স্থানসমূহ হলো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ব পুরুষের আদি বাসস্থান রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি সংগ্রহশালা, বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমীনের মাজার স্মৃতিসৌধ, বীর বিক্রম মহিবুল্লার মাজার (স্মৃতিসৌধ)।

শেখ আফজালের মাজার ও ঢিবি

ডুমুরিয়া সদর থেকে ২৪ কি.মি. (১৪.৯১ মাইল) দক্ষিণ-পশ্চিমে আরশনগর গ্রামে এ প্রত্নস্থলটি অবস্থিত। প্রত্নস্থলটিতে বর্তমানে একটি নতুন মাজার ঘর ও এর সংলগ্ন স্থানে সম্প্রতি নির্মিত একটি মসজিদ দেখা যায়। এর সংলগ্ন স্থানে একটি মাঝারি আকারের পুকুরও রয়েছে। স্থানীয় জনগণের ধারণা মাজারটিতে হযরত শেখ শাহ আফজাল নামক একজন মুসলিম সাধুপুরুষ সমাহিত রয়েছেন এবং তার তৈরি মসজিদটি বর্তমানে বিলুপ্ত। বিলুপ্ত মসজিদের ভগ্নাবশেষের ওপরই আনুমানিক ষাট বছর আগে বর্তমানে দণ্ডায়মান মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছিল। এই মসজিদে শ্বেত পাথরের ওপর উৎকীর্ণ একটি লিপিও ছিল। লিপিটি বর্তমানে বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে রক্ষিত আছে বলে জানা যায়। প্রত্নস্থলটিতে বর্তমানে প্রাচীন ইমারতাদির কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। তবে বিভিন্ন স্থানে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে কিছু পুরানো ইট ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। কোনো কোনো ইটের পরিমাপ ২২.৮ সেমি./- ১৭.৭ সেমি./১-৫। কয়েকটি ইটের গায়ে চুনমিশ্রিত ইটের গুড়ার মশলার প্রলেপ দেখা যায়। এভাবে বিলুপ্ত ইমারত দুটির নির্মাণকাল আনুমানিক আঠার-উনিশ শতক বলে প্রাথমিকভাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

শিরোমণি

মুক্তিযুদ্ধে খুলনার বীরত্বগাথার স্মৃতিবিজড়িত আরেকটি স্থান শিরোমণি। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও খুলনা স্বাধীন হয়েছিল এক দিন পর ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে। খুলনা শিরোমণি কৌশলগত যুদ্ধজয়ের এক অনন্য স্থান হিসেবে স্থান করে নিয়েছে বিশ্বইতিহাসে। এখানে একটি স্মৃতিসৌধ স্থাপন করা হয়েছে।

সেনহাটি

খুলনা জেলার দিঘলিয়া উপজেলার সেনহাটি গ্রাম কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জন্মস্থান। বাংলা সাহিত্যে কবির ‘দুটি কবিতা’ শীর্ষক ক্ষুদ্র কবিতাটি কালজয়ী স্থান পেয়েছে। ‘যে জন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি’ কিংবা ‘চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে’ কবিতা বাঙালি জীবনে অবশ্যপাঠ্য হিসেবে বিবেচিত। সেনহাটি এককালে বাংলার সর্বপ্রধান বৈদ্য স্থান ছিল। এ গ্রামে অনেক প্রাচীন জলাশয় আছে। এ গ্রামে একটি প্রাচীন মন্দিরের অস্তিত্ব জীর্ণ অবস্থায় দৃষ্ট হয়। এটি একটি দোচালা কালী মন্দির। ১৭৯৭ সালে এ এলাকার ভূম্যধিকারী রাজা শ্রীকান্ত রায় এ মন্দিরটি নির্মাণ করেন।

অধ্যায়-১৫

ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ

বাংলা ভাষা আন্দোলন (১৯৪৮-১৯৫২)

ব্রিটিশ শাসন হতে স্বাধীনতা লাভের আন্দোলনে পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগোষ্ঠী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। তবে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারতীয় মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয় তা ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে ছিল এক অভূতপূর্ব ঘটনা। তদানীন্তন বাংলাকে বিভক্ত করে পূর্ব বাংলার মুসলিমপ্রধান এলাকাগুলো নিয়ে গঠিত হয় পূর্ব বাংলা প্রদেশ আর ভারতের পশ্চিমাঞ্চলীয় মুসলিমপ্রধান এলাকাগুলোকে নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশ। পাকিস্তানের এ দু অংশের মধ্যে ১,৫০০ মাইল বিস্তৃত ছিল ভারত।

পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ভাষা বাংলা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু শুরুতেই পূর্ব পাকিস্তানের এ ন্যায্য অধিকারকে নস্যাৎ করার জন্য উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হয়।

পরে ১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু এবং ইংরেজির সঙ্গে বাংলা ভাষাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষারূপে সরকারি স্বীকৃতির দাবি উত্থাপন করেন। গণপরিষদে বাংলা ভাষার স্থান না হওয়ায় ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ঢাকা শহরে ছাত্রসমাজের প্রতিবাদে প্রায় হাজারখানেক ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। বন্দি ছাত্রনেতাদের মধ্যে ছিলেন- শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ, শওকত আলি, কাজী গোলাম মাহবুব প্রমুখ।

জিন্নাহ ও বাংলা ভাষা

পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকা শহরে সফরে আসেন এবং ২১ মার্চ ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করেন- পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোনো ভাষা নয়।

রেসকোর্স মাঠে জনসভার মাঝখান থেকে মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর ওই বক্তৃতার বিরুদ্ধে 'না' 'না' সূচক প্রতিবাদ ধ্বনি উত্থিত হয়।

বাহান্নর ভাষা আন্দোলন ও অমর একুশে

পূর্ববাংলার সচেতন জনগণ এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। পরবর্তীতেও পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখে। আরবি হরফে বাংলা প্রচলন ও বাংলা ভাষা সংস্কারের চেষ্টাও তারা চালায়। বাংলা বর্ণমালা উচ্ছেদের অপচেষ্টাও তারা চালায়। কিন্তু ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন ঢাকায় নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে যখন ঘোষণা করেন যে, উর্দুই

হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, তখন ঢাকায় ছাত্রসমাজ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। প্রতিবাদস্বরূপ ৩০ জানুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয় এবং সেদিনই বার লাইব্রেরিতে আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আওয়ামী মুসলিম লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ, খিলাফতে রাব্বানী পার্টির প্রতিনিধিদের নিয়ে 'সর্বদলীয় কর্মপরিষদ' গঠিত হয়। কাজী গোলাম মাহবুব কর্মপরিষদের আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। অন্য সভ্যরা ছিলেন- আবুল হাশিম, আতাউর রহমান খান, কামরুদ্দীন আহমদ, শামসুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, আবদুল মতিন ও খালেক নেওয়াজ খান। শেখ মুজিবুর রহমান তখন পর্যন্ত আটক; তিনি ১৯৪৯ সালের মার্চ মাস থেকে একটানা বন্দি। ৪ ফেব্রুয়ারি পুনরায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয় এবং স্থির হয় যে ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস রূপে পালিত হবে। ১৬ ফেব্রুয়ারি 'পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে জেলে শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদ অনশন শুরু করেন। শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রথমে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এবং পরে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তর করা হয়।

২১ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে ঢাকা এবং অন্যান্য স্থানে সাফল্যের সঙ্গে ছাত্র ধর্মঘট পালন এবং সকাল এগারোটার পর গাজীউল হকের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন কলাভবন প্রাঙ্গণের আমতলায় এক বিরাট ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সিদ্ধান্ত জানান, কিন্তু সংগ্রামী ছাত্ররা সে সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। আবদুল মতিন ও আবদুস সামাদ আজাদের প্রস্তাব মতো ছাত্ররা দশজনের অসংখ্য দলে বিভক্ত হয়ে শৃঙ্খলার সঙ্গে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারপর দলে দলে ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার অতিক্রম এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে গ্রেফতারবরণ করতে থাকে। একইসঙ্গে পাকিস্তানি সৈন্যরা মিছিলে গুলি চালিয়ে বেশকিছু ছাত্রজনতাকে হত্যা করে।

এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের খবর দাবানলের মতো শহরময় ছড়িয়ে পড়লে ঢাকা শহর বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ২২ ফেব্রুয়ারি সকালে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এবং সর্বত্র কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে সামরিকবাহিনী এবং ইপিআর নামানো হয়। ইতোমধ্যে বিক্ষোভ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সরকারি অফিস, রেলওয়ে, রেডিয়ো সব জায়গায় ধর্মঘট চলে। সরকার বস্তুতপক্ষে অচল হয়ে পড়ে। ২৩ ফেব্রুয়ারি পুনরায় হরতাল পালিত হয় এবং আবুল বরকত যেখানে গুলিবিদ্ধ হন, সেখানে ২৩ ফেব্রুয়ারি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা রাতারাতি একটি শহিদমিনার নির্মাণ করেন। ওই শহিদমিনারের উদ্বোধন করেছিলেন ২৪ ফেব্রুয়ারি সকালে অনানুষ্ঠানিকভাবে শহিদ শফিউর রহমানের পিতা আর ২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে *দৈনিক আজাদ* সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন। কিন্তু সেদিন অপরাহ্নে পুলিশ শহিদমিনারটি ধ্বংস

করে দেয়। ইতোমধ্যে পুলিশ নিরাপত্তা আইনে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, আবুল হাশিম, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক অজিতকুমার গুহ, অধ্যাপক মোজফফর আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক পুলিন দে, গোবিন্দলাল ব্যানার্জি, খয়রাত হোসেন, মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ প্রমুখকে গ্রেফতার করে। সামরিকবাহিনী, ই.পি.আর, পুলিশ শহরের বিভিন্ন ছাত্রাবাসে আক্রমণ এবং শত শত ছাত্রকে গ্রেফতার করে। ছাত্রদের হল থেকে বের করে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়। চলতে থাকে ত্রাসের রাজত্ব। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে শহিদ হন রফিকউদ্দিন আহমদ, আবুল বরকত, আবদুল জব্বার, আবদুস সালাম আর ২২ ফেব্রুয়ারি শহিদ হন শফিউর রহমান, আবদুল আউয়াল, কিশোর অহিউল্লাহ এবং আরও একজন অজ্ঞাত পরিচয় বালক।

ভাষা আন্দোলনে খুলনা

ভাষা আন্দোলনের সূচনা থেকেই খুলনাবাসী এতে অংশ নেয়। ১৯৪৭ সালের শেষ দিকে ঢাকায় যখন ভাষা বির্তক চলছিল, খুলনায় তখন বিভিন্ন সংগঠন গড়ে উঠছিল। তখন ঢাকার সাথে খুলনার বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের একটি অংশও নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। ১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদের পরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলায় বক্তৃতা দেওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে খুলনায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এর প্রতিবাদে ২৭ ফেব্রুয়ারি খুলনার দৌলতপুর কলেজে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তৃতা দেন আমজাদ হোসেন, ধনরঞ্জন দাশ, মনসুর আলী, জগদীশ বসু ও অন্যান্য ছাত্র নেতারা।[১] প্রতিবাদ সভায় খাজা নাজিম উদ্দিনকে নিন্দা ও ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এসময় খুলনায় রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে মুসলিম লীগ, কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব ছিল। মুসলিম লীগের অধিকাংশ নেতা-কর্মী ভাষা আন্দোলনকে সুনজরে দেখেনি। এক্ষেত্রে মুসলিম লীগের নাজিম উদ্দিনবিরোধী অংশ ভাষা আন্দোলনের পক্ষে যোগ দেয়। রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে একটি প্রচারপত্র বিলি ও খুলনা শহরে জনসভা করা হয়। খুলনার দেওয়ালে দেওয়ালে হাতে লেখা পোস্টারও লাগানো হয়। ১৯৪৮ সালে ১১ মার্চ পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ কর্তৃক প্রদেশব্যাপী 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত কার্যকরণে খুলনার ছাত্রসমাজ প্রস্তুতি নিতে থাকে। যদিও আগের দিন রাতে সংগঠক শৈলেশ ঘোষ, স্বদেশ বোস, সন্তোষ গুপ্ত, ধনরঞ্জন দাস, তাহমীদ উদ্দিনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশের নেতাদেরও পুলিশ হুমকি দিয়ে আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে। যদিও সব ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করে ১১ মার্চ তৎকালীন খুলনার কলেজ দৌলতপুর বি.এল কলেজসহ খুলনার স্কুলগুলোতে ধর্মঘট পালিত হয়। খুলনা সেদিন মিছিলের শহরে পরিণত হয়।

---

[১] অচিন্ত্য বিশ্বাস, 'খুলনা', দৃষ্টব্য আবু মো. দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত) *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস,* ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০০০, পৃ. ২০৮।

স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল পার্কে (হাদিস পার্ক) অনুষ্ঠিত জনসভায় লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন আনোয়ার হোসেন। সন্ধ্যায় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। কর্মসূচির নেতৃত্ব দেওয়ায় মডেল স্কুলের ছাত্র মতিয়ার রহমানকেও গ্রেফতার করে। যদিও গণদাবির পরিপ্রেক্ষিতে আগের দিন আটককৃত ছাত্রনেতাদের ১১ মার্চ জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।[২]

২১ ও ২৪ মার্চ যথাক্রমে রেসকোর্স ময়দান ও কার্জন হলের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর রাষ্ট্রভাষা উর্দুর পক্ষে ঘোষণার বিরুদ্ধে ঢাকায় ছাত্রসমাজের প্রতিক্রিয়ার সংবাদ খুলনায় পৌঁছালে এখানেও ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এতে ছাত্রলীগের প্রগতিশীল অংশ এবং তৎকালীন ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা তৎপর হয়ে ওঠেন।[৩] তাঁরা দৌলতপুর কলেজে (বর্তমানে বি.এল কলেজ) আলোচনায় বসেন এবং মাতৃভাষার দাবিতে সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বক্তব্যের প্রতিবাদে এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সে সময়ে একটি ইশতাহার ছাপা হয়। ইতোমধ্যে দেশের কোথাও যাতে কোনো রকম আন্দোলন গড়ে উঠতে না পারে সেই মর্মে ঢাকা থেকে প্রাদেশিক শহরগুলোতে কড়া নির্দেশ পাঠানো হয়। খুলনার তৎকালীন পুলিশ সুপার মহীউদ্দিন ছাত্রনেতাদের তাঁর অফিসে তলব করেন এবং ছাত্রদের চলমান কর্মকান্ড বন্ধ করার নির্দেশ দেন। পুলিশ প্রশাসনের দমনপীড়ন সত্ত্বেও পরদিন ছাত্ররা প্রতিবাদ সভা করে। একটি লিখিত ঘোষণাপত্র পাঠের মধ্য দিয়ে সভা সমাপ্ত হয়। ঘটনার জের ধরে ঐদিন সন্ধ্যায় একজন ছাত্র পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন।[৪] পুলিশের ব্যাপক তৎপরতায় আন্দোলনকারীরা গোপনে কর্মকান্ড চালান। তা সত্ত্বেও ১৯৪৮ সালের শেষ দিকে গ্রেফতার হন আন্দোলনের নেতা ছাত্র ফেডারেশন সভাপতি সন্তোষ গুপ্ত ও সাধারণ সম্পাদক ধনরঞ্জন দাস। ফলে এসময় সাময়িক সময়ের জন্য আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

খুলনায় ১৮ ফেব্রুয়ারি সুনু মিঞার 'আজাদ গ্রন্থালয়'-এ এম.এ. গফুর, সামসুদ্দিন সুনু (সুনু মিঞা), তোফাজ্জেল হোসেন ও এম.এ. বারী মিলে বৈঠক করেন। বৈঠকে শহরব্যাপী পোস্টারিং ও স্কুল কলেজে ধর্মঘট আহ্বানের পরিকল্পনা করা হয়। ২০ ফেব্রুয়ারি রাতের অন্ধকারে যশোর রোড, বি কে ডি ঘোষ রোড ও শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দেওয়ালে প্রায় শ'খানেক পোস্টার লাগানো হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি পরিকল্পনাকারীদের সঙ্গে সমীর আহমেদসহ আরও কয়েকজন স্কুলে স্কুলে গিয়ে ক্লাস বর্জনের আহ্বান জানান। এতে বি.কে.স্কুল এবং সেন্ট জোসেফ স্কুলের শিক্ষার্থীরা হরতাল পালন করে ও মিছিলে যোগ দেয়। খুলনার করোনেশন গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা নিজ উদ্যোগে স্কুলের দেওয়ালে বাংলা ভাষার

---

[২] ওই, পৃ. ২১০-২১১

[৩] আবদুল হালিম, *খুলনার ভাষা আন্দোলন আটচল্লিশ থেকে বায়ান্ন খুলনা*; রওশনারা বেগম কর্তৃক প্রকাশিত, ২১ , ১৯৮৫, পৃ. ৩।

[৪] আবদুল হালিম, *খুলনার ভাষা আন্দোলন আটচল্লিশ থেকে বায়ান্ন খুলনা*; রওশনারা বেগম কর্তৃক প্রকাশিত, ২১ , ১৯৮৫, পৃ. ৪-৭।

পক্ষে হাতে লিখে পোস্টার লাগায়। দৌলতপুর বি.এল কলেজে হরতালে নেতৃত্ব দেন মালিক আতাহার উদ্দীন, নুরুল ইসলাম নান্নু, জাহিদুল হক, মিজানুর রহমান প্রমুখ। ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় মিছিলে গুলি বর্ষণের সংবাদ খুলনায় পৌঁছায় ২২ ফেব্রুয়ারি। এ সংবাদ পেয়ে যুবনেতা আবু মুহম্মদ ফেরদাউস, এস.এম.এ জলিল, নুরুল ইসলাম আন্দোলনরত এম.এ গফুরের প্রচেষ্টাকে সহায়তা করতে এগিয়ে আসেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন, ঢাকায় ছাত্রদের ওপর হামলার প্রতিবাদে খুলনায় ২৩ ফেব্রুয়ারি হরতাল, মিছিল ও প্রতিবাদ সভা করা হবে। কয়েকটি গুঁড়ো দুধের কৌটা জোগাড় করে আন্দোলনকারীরা শুরু করেন রোড কালেকশন। যতদূর জানা যায়, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই কৌটাগুলো পূর্ণ হয়ে যায়। ২২ ফেব্রুয়ারি থেকেই ভাষা আন্দোলনে যোগ দেয় খুলনার অধিকাংশ মানুষ। ২৩ ফেব্রুয়ারি খুলনায় সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত হয়। তাছাড়া আরও অনেক ছাত্রনেতা আন্দোলনে এগিয়ে আসেন। এদের মধ্যে অ্যাডভোকেট আবদুল জববার, অ্যাডভোকেট আবদুল হালিম, সমীর আহমেদ, গাজী শহীদুল্লাহ, লুৎফর রহমান জাহাঙ্গীর, আনোয়ারা বেগম, বেগম মাজেদা আলী (রানু), মিজানুর রহিম, জাহীদুল হক প্রভৃতি ব্যক্তির নাম উল্লেখযোগ্য। ঢাকার নির্দেশক্রমে ২৪ ফেব্রুয়ারি 'আজাদ গ্রন্থাগার'-এ ১১জনের সমন্বয়ে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কমিটি গঠিত হয়। পরবর্তীকালে এই কমিটিতে যুক্ত হন আরও ৫ জন। ২৫ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ সারা দেশে হরতাল আহ্বান করে। খুলনাতেও সেদিন সফলভাবে হরতাল পালিত হয় এবং তৎকালীন গান্ধী পার্কে বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এটিই ছিল মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে খুলনার মানুষের প্রথম স্বতঃস্ফূর্ত তীব্র প্রতিবাদের বহিঃপ্রকাশ। ২৫ ফেব্রুয়ারির জনসভার পরই প্রতিবাদের আগুন ছড়িয়ে পড়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতেও। বিশেষ করে বাগেরহাট এবং সাতক্ষীরা শহরে এ ঘটনার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। ২৬ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে খুলনা আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র কাজী নুরুল ইসলাম। ২৮ ফেব্রুয়ারি গান্ধী পার্কে অনুষ্ঠিত আরেকটি বিশাল জনসভায় তিনি ঢাকায় ঘটে যাওয়া ২১ ফেব্রুয়ারির মর্মস্পর্শী ঘটনার বর্ণনা দেন। ২৮ ফেব্রুয়ারির পর থেকে খুলনায় ভাষা আন্দোলন নতুন গতি পায়।[৫] কিন্তু আন্দোলন যত বেগবান হতে থাকে, ভাষা সৈনিকদের ওপর সরকারের জুলুম নিপীড়নও তত বাড়তে থাকে। সারা দেশের মতো খুলনাতেও নতুন করে শুরু হয় ধরপাকড়। দীর্ঘ সময়জুড়ে চলতে থাকা এই আন্দোলনের ফলে খুলনায় মুসলিম লীগ ধীরে ধীরে গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকে। এরই ফলে রাষ্ট্র পক্ষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে স্থানীয় মুসলিম লীগের নেতারা ভাষা সৈনিকদের ওপর শারীরিক নির্যাতনের পথে অগ্রসর হয়। এমনই একটি ঘটনা ১৯৫৩ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি ঘটে। ওই দিন সর্বস্তরের মানুষের এক মিছিলে খান এ সবুর

[৫] আবদুল হালিম, পর্বোক্ত, পৃ. ১২

খানের লাঠিয়াল বাহিনী হামলা চালায়। যদিও মিছিলকারীদের ধাওয়ায় এ দলটি পালিয়ে যায়।

খুলনায় ১৯৫৪ সালে ভাষা শহিদদের স্মরণে তৎকালীন দৌলতপুর কলেজের ছাত্র সংসদের উদ্যোগে প্রথম শহিদমিনার নির্মিত হয়। রাতারাতি কলেজ কর্তৃপক্ষের অনুমতির তোয়াক্কা না করেই নির্মিত হয় এ মিনার। তখন দশ থেকে পনেরো ফুটের একটি স্তম্ভ এবং একটি মঞ্চের সমন্বয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল মিনারটি। কয়েকদিন পরেই বিনা অনুমতিতে নির্মাণের অপরাধে কলেজ কর্তৃপক্ষ মিনারটি ভেঙে ফেলে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন থেকে ১৯৬৬ সালের ৬ দফা

১৯৫৩ সালের ৯ মে কার্জন হলে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন বসে। কিন্তু মতোবিরোধ এবং সংঘাতের মধ্য দিয়ে কাউন্সিল স্থগিত হয়ে যায়। ওই বছর ২৪ আগস্ট নুরুল আমিনের উদ্যোগে পুনরায় কাউন্সিল অধিবেশন বসে। সেই অধিবেশনে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন নূরুল আমিন এবং প্রচার সম্পাদক নির্বাচিত হন খুলনার খান এ সবুর।[৬] অন্যদিকে ভাষা আন্দোলন-পরবর্তী সময়ে খুলনায় আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলে এ. এইচ. দেলদার আহমেদ, এ.এইচ.এম আলী হাফেজ, এ.এফ আব্দুল জলিল, নুরুল ইসলাম নুরু এতে যোগ দেওয়ায় নতুন দলটি শক্তিশালী হতে থাকে। খুলনার সবুর খানবিরোধীরা মুসলিম লীগ ছেড়ে আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগ দিলে খুলনায় মুসলিম লীগের একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতায় পরিণত হন।

১৯৫৪ সালে নির্বাচনের বছর। যুক্তফ্রন্টের এই নির্বাচনকে ঘিরে পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলের মতো খুলনাতেও চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। যুক্তফ্রন্টের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে সারা বাংলায় শত শত সভা, সমাবেশ আয়োজিত হয়। তৎকালীন খুলনার মিউনিসিপ্যাল পার্ক ও সার্কিট হাউজ ময়দানেও বড়ো জনসমাগমের মধ্য দিয়ে বেশ কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে সময় যুক্তফ্রন্টের প্রধান নির্বাচনি মুখপত্র ছিল ইত্তেফাক। খুলনায় নির্বাচনের আগে ইত্তেফাক বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। নির্বাচনি প্রচারণাকে কেন্দ্র করে খুলনায় বেশ কয়েকটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। সে সময় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নামে খুলনায় মুসলিম লীগের একটি লাঠিয়াল বাহিনী ছিল। এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী মূলত বিহারিদের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল। ইসলামের দোহাই দিয়ে মুসলিম লীগের নেতারা তাদের পক্ষে টেনেছিল। এই বাহিনী নিয়মিত যুক্তফ্রন্টের মিটিং মিছিলে হামলা চালাতো। তবে জনতার পালটা আক্রমণে মুসলিম লীগের এই বাহিনী ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। মুসলিম লীগের এই গুন্ডা বাহিনীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন খান এ সবুর। সে সময় মুসলিম লীগের 'ইসলামের নামে অনৈসলামিক কাজ ও দুর্নীতি দুঃশাসন' নিয়ে বাগেরহাটের লোককবি শামসুদ্দিন আহমদ মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে একটি জনপ্রিয় লোকসংগীত রচনা করেছিলেন যা যুক্তফ্রন্টের

---

[৬] ড. শেখ গাউস মিঞা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪

বিভিন্ন জনসভায় গীত হতো। ’৫৪-এর নির্বাচনে জেতার জন্য মুসলিম লীগ সম্ভাব্য সকল পন্থাই অবলম্বন করেছিল। পুলিশ, প্রশাসন, রেডিয়ো, যানবাহন সবই তখন তাদের হাতে ছিল। নির্বাচনকে ঘিরে প্রচারণার উদ্দেশ্যে ফাতেমা জিন্নাহকে ঢাকায় আনা হয়। তিনি ঢাকার পলটন ময়দানে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের জনসভায় কায়েদে আজমের পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার আহবান জানান এবং মুসলিম লীগের পক্ষে ভোট চান। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে নির্বাচন শেষ হয়। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ জয় পায়। নির্বাচন স্বতন্ত্র নির্বাচনি প্রথায় অনুষ্ঠিত হওয়ায় যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২২৩টিতে বিজয়ী হয়। মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৯টি আসন। ৫টি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বিজয়ী হয়।[৭] খুলনার ৮টি মুসলিম আসনের ৮টি লাভ করে যুক্তফ্রন্ট। বিজয়ীরা হলেন মোন্তাজ আহমেদ, জি.এম ওকনাত আলী, এনায়েতুল্লাহ, সৈয়দ মোস্তফা গাউসুল হক, এএফএম আব্দুল জলিল, আ. গনি খান, তৈয়বুর রহমান ও আব্দুল আজিজ।

১৯৫৪ সালের ৩০ এপ্রিল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করে যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচিত হন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক। ৫৪’র নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের ভরাডুবি কেন্দ্রীয় সরকারকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। বেড়ে যায় ষড়যন্ত্র আর অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা। ১৯৫৪ সালে আদমজী পাটকলে বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গা বাঁধিয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর চেষ্টা চলে। ৩০ মে এ কে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করা হয় এবং ৯২ (খ) ধারা অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তন করা হয়।

১৯৫৫ সালের ৬ জুন ৯২ (খ) ধারা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। কিন্তু এ সময় তীব্র মতোবিরোধের কারণে ভাঙন ধরে যুক্তফ্রন্টে। আতাউর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একটা বড়ো অংশ যুক্তফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে যায়। যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে থেকে যায় সালাম খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের খন্ডিত একটি অংশ। এই বিভাজনের প্রভাব খুলনাসহ পূর্ব বাংলার অন্যান্য অংশেও ছড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী একে ফজলুল হকের কাছে পুনরায় মন্ত্রিসভা গঠনের আহবান জানান। আবু হোসেন সরকারকে প্রধানমন্ত্রী করে যুক্তফ্রন্ট অবশেষে মন্ত্রিসভা গঠন করে। ১৯৫৬ সালে পররাষ্ট্রনীতি বিষয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর তীব্র মতোবিরোধ হয়। মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ ত্যাগ করেন। ১৯৫৭ সালের সেপটেম্বর মাসে মওলানা ভাসানী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের এক সম্মেলন আহবান করেন। আওয়ামী লীগের একটি অংশ এবং গণতন্ত্রী দলের নেতারা এই সম্মেলনে যোগ দেন। খুলনা থেকে প্রতিনিধি হিসেবে সম্মেলনে যোগ দেন এম এ গফুর ও অ্যাডভোকেট আব্দুল জববার। এই

[৭] Report on the Election of East Bengal Legislative Assembly 1954, Dacca: Bangladesh Election Commission 1977, P. 33, 342

সম্মেলনেই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বা সংক্ষেপে ন্যাপ নামে একটি নতুন রাজনৈতিক শক্তির জন্ম হয়। ইতিহাসের নিরিখে পূর্ব পাকিস্তানে এই সম্মেলনের প্রভাব ছিল গভীর এবং সুদূরপ্রসারী।

১৯৫৮ সালে ইস্কান্দার মির্জা সামরিক আইন জারি করেন। একের পর এক গ্রেফতার হতে থাকেন পূর্ব পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। খুলনার বেশ কয়েকজন নেতা সে সময় কারাবরণ করেন। যার ফলে মিটিং, মিছিলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে খুলনা। ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক আইন জারির মাধ্যমে ইস্কান্দার মির্জাকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। পাকিস্তানের রাজনীতিতে আসে নতুন বাঁক বদল। আইয়ুব খান পাকিস্তানের রাজনীতিতে ‘মৌলিক গণতন্ত্র’ নামে নতুন একটি ভাবনার সম্প্রসারণ ঘটান। ১৯৬০ সালের জানুয়ারি মাসে সারা দেশে মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই বছর মৌলিক গণতন্ত্রীদের ৯৫ ভাগ পেয়ে আইয়ুব খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খানের অনুসারীরা মুসলিম লীগের এক সম্মেলন আয়োজন করেন। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে মুসলিম লীগ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। আইয়ুব খান সমর্থনকারীদের নাম হয় কনভেনশন মুসলিম লীগ, অন্য পক্ষ খাজা নাজিম উদ্দীনের নেতৃত্বে কাউন্সিল মুসলিম লীগ নামধারণ করে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সে সময়ে খুলনায় কাউন্সিল মুসলিম লীগের কোনো অনুসারী ছিল না। খুলনায় কনভেশন মুসলিম লীগে যোগ দেন খান এ সবুর, এসএমএ মজিদ, এসএম আমজাদ হোসেন।

সামরিক আইন জারির পর গ্রেফতারকৃত পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী। ১৯৬২ সালের ১৯ আগস্ট জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি দুই প্রদেশের কিছু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সংক্ষেপে এনডিএফ. নামে দলহীন একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। এনডিএফ.-এর মূল লক্ষ্য ছিল দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা। সেই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতেই সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী জনসভা আয়োজিত হতে থাকে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬২ সালে তিনি খুলনায় আসেন।[৮] সার্কিট হাউজ ময়দানে অনুষ্ঠিত সভায় সংগঠনটি উল্লেখযোগ্য সমর্থন পায়। খুলনার দেলোয়ার আহমেদ, মমিনউদ্দিন আহমেদ, এ এফ এম আবদুল জলিল, তফসির উদ্দিন আহমেদ এতে যোগ দেন। তাঁরা আইয়ুববিরোধীদের সংগঠিত করেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও তখন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবিতে এনডিএফ.-এর পক্ষাবলম্বন করে। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন দল ও মোর্চার সমন্বয়ে পালিত হয় ‘দাবি দিবস’। ১৯৬২ সালে শাসনতন্ত্রে তিন বছর পর পর নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। ১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আয়োজিত হয়। কনভেনশন মুসলিম লীগ প্রার্থী হিসেবে আইয়ুব খানকে

[৮] ড. শেখ গাউস, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮২।

মনোনীত করে। নির্বাচনকে সামনে রেখে সকল বিরোধী দল সম্মিলিত হয়। বিরোধী প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হন ফাতেমা জিন্নাহ। এই নির্বাচনকে ঘিরেও খুলনায় উদ্দীপনা সঞ্চার হয়। ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আইয়ুব খান পুনরায় বিজয়ী হন। ইতোমধ্যে মৌলিক গণতন্ত্রীদের দ্বারা জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে খুলনা থেকে যথাক্রমে খান এ সবুর ও এস এম মজিদ কনভেনশন মুসলিম লীগের মনোনয়নে জয়ী হন।

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। সে সময় পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের অসহায়ত্বের কথা চিন্তা করে শেখ মুজিবুর রহমান স্বায়ত্তশাসনের দাবি হিসেবে ঐতিহাসিক ৬ দফা প্রণয়ন করেন। এই পর্বে আওয়ামী লীগ একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তারা ৬ দফা দাবিতে গণআন্দোলন জোরালো করে তোলে। এই ৬ দফা ১৯৬৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে উত্থাপিত হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন লাভ করে। ৬ দফার মূল দাবিটিই ছিল স্বায়ত্তশাসনের। তারপর শুরু হয় ৬ দফার পক্ষে আওয়ামী লীগের প্রচারাভিযান। শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলার পথেপ্রান্তরে পরিভ্রমণ করে ৬ দফার বক্তব্য প্রচার করেন। ক্রমেই দ্রুত পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পট পরিবর্তিত হতে থাকে। পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক মঞ্চের প্রাণ হয়ে ওঠেন শেখ মুজিবুর রহমান। আইয়ুব খান ঘোষণা করেন ৬ দফার জবাব দেওয়া হবে অস্ত্রের ভাষায়। ১৯৬৬ সালের ১৯ এপ্রিল শেখ মুজিবুর রহমান খুলনা আসেন।[৯] অনুষ্ঠিত জনসভায় তৎকালীন মিউনিসিপ্যাল ময়দানে (বর্তমানে হাদিস পার্ক) ৬ দফার বিশদ ব্যাখ্যা দেন এবং জনগণকে ৬ দফার পক্ষে উদ্বুদ্ধ করেন। খুলনা থেকে ফেরার পথে মাগুরায় শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ৬ দফার সমর্থনে মিছিল চলতে থাকে, পালিত হয় হরতাল। সবুর খান শুরু থেকেই ৬ দফার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন। আইয়ুব খানের মন্ত্রী সবুর খান একে 'তথাকথিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ও ভারতের মদদে এ দাবি উত্থাপন করা হয়েছে' বলে মন্তব্য করেন। ৬ দফার পক্ষে ব্যাপক সাড়া লক্ষ করে স্বয়ং আইয়ুব খান বাংলাদেশ সফরে এসে খুলনায়ও আসেন। তিনি ৬ দফাকে ভারতীয় ষড়যন্ত্র বলে তা প্রত্যাখ্যানের জন্য জনগণকে আহবান জানিয়ে ব্যর্থ হন। এখানে ছাত্রলীগ, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, ছাত্র ইউনিয়ন, শ্রমিক সংগঠনগুলো মিলে বরং ৬ দফার পক্ষে জনমত গড়ে তোলে। ২৫ জানুয়ারি হরতাল চলাকালীন পুলিশের গুলিতে দৌলতপুর ও খালিশপুরে ৩জন নিহত হয়। এ সময় শহরে কারফিউ জারি করা হয়। কারফিউ চলাকালীন ২৬

[৯] উদ্ধৃত মোল্লা আমীর হোসেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে খুলনা জেলা, অপ্রকাশিত এম. ফিল. থিসিস, রাজশাহী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬, পৃ. ৬৪।

জানুয়ারি উর্দুভাষী বিহারিদের হাতে ২জন আন্দোলনকারী ছুরিকাহত হলে বিক্ষুব্ধ জনগণ তৎকালীন যোগাযোগ ও পূর্ত মন্ত্রীর বাসভবনে আগুন দেয়।[১০]

১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। ১২ ডিসেম্বর খুলনায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায় তিনি আওয়ামী লীগ ও ন্যাপকে চরম বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দেন। ঘোষণা করেন আগরতলা ষড়্যন্ত্র মামলার কথা। ১৯৬৮ সালে ৬ জানুয়ারি সরকার কর্তৃক এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় ১৮জন সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তি ভারতীয় হাইকমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি জনাব ওঝার সঙ্গে যোগাযোগ করে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। এই অপরাধের মুখ্য সঞ্চালক হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানকে চিহ্নিত করা হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমানসহ কয়েকজন বাঙালি সিএসপি অফিসার ও বাঙালি সেনা সদস্যদের নামে দায়ের করা হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। এই মামলার অভিযুক্তদের অন্যতম তাজুল ইসলাম এবং মামলার বিচারকদের মধ্যে অন্যতম মাকসুম-উল-হাকিম ছিলেন খুলনার সন্তান। যদিও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নিষ্ফল হয়েছিল। এই মামলার পেছনে রাষ্ট্রপক্ষের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নির্মূল করা। কিন্তু মামলার ফলে আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে ওঠে। ক্রমেই তা ব্যাপকতর রূপধারণ করে ছড়িয়ে পড়ে গোটা পূর্ব বাংলায়।

’৬৯-এর গণআন্দোলন ও ৭০-এর নির্বাচন

’৬৯-এর গণআন্দোলন খুলনাকেও উদ্দীপ্ত করে। এই আন্দোলন একদিকে যেমন গণজোয়ারের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস অন্যদিকে তেমনই স্বৈরাচারী নিপীড়নের লোমহর্ষক অধ্যায়। ১৯৬৯ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে তাঁর বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করার ফলে ছয় দফা সমর্থন ও শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে ছাত্রদের মধ্যে নজিরবিহীন ঐক্য গড়ে ওঠে। সকল ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। ছয় দফাকে হুবহু সন্নিবেশিত করে ১১ দফা দাবিনামা উত্থাপন করে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে ৬ দফার পক্ষে গণসমর্থন গড়ে তোলার কাজ শুরু হয় এ সময় থেকে। ছাত্রদের এই কর্মসূচি ঘোষণার তিন দিন পর ৭ ফেব্রুয়ারি ৮টি রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের লক্ষ্যে ৮ দফা দাবিতে একটি মিলিত কর্মসূচি ঘোষণা করে। গঠিত হয় গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি বা সংক্ষেপে ডাক। ঢাকার অব্যবহিত পরেই গঠিত হয় খুলনায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।[১১]

১৯৬৯ সাল পর্যন্ত দেশের সিংহভাগ শ্রমিক সংগঠন ছিল বামপন্থি ভাবাদর্শে পরিচালিত। ১৯৬৯ সালের পর থেকে ছয় দফা এবং ১১ দফা আন্দোলনের মধ্য

---

[১০] মুহাম্মদ আব্দুল হালিম, *খুলনার ঐতিহ্য*, পৃ. ৮৭, ৯০। উদ্ধৃত, মোল্লা আমীর হোসেন।

[১১] ড. শেখ গাউস মিঞা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৭।

দিয়ে আওয়ামী লীগও শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলে। নবগঠিত আওয়ামী লীগ সমর্থিত শ্রমিক লীগ দুত একটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক শক্তিতে রূপ নেয়।

১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ধর্মঘট চলাকালীন ঢাকায় মিছিলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে নিহত হন ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান। আসাদ হত্যার ঘটনায় সারা দেশে আন্দোলন দুর্বার রূপধারণ করে। ২১, ২২ ও ২৩ জানুয়ারি সারা দেশে ধর্মঘট আহবান করা হয়। এই ঘটনার প্রভাব পড়ে খুলনাতে। খুলনার মিউনিসিপ্যাল পার্কে শহিদ আসাদের গায়েবি জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নিয়মিতভাবে চলতে থাকে মিছিল, মিটিং। ২৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় খুলনা শহরে এক বিরাট মশালমিছিল বের হয়। এ মিছিল দৌলতপুর বি.এল কলেজ থেকে শুরু হয়ে সমগ্র খালিশপুর শিল্পাঞ্চল প্রদক্ষিণ করে। ২৪ জানুয়ারি ঢাকায় 'গণঅভ্যুত্থান দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খুলনায় ওইদিন সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয় এবং বিকালে ডাক-এর উদ্যোগে স্থানীয় পৌর পার্কে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় আসার পথে জনতার মিছিলের সঙ্গে পুলিশের বেশ কয়েকটি বড়ো সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সবচেয়ে বড়ো সংঘর্ষটি হয় ডাকবাংলো মোড়ে। ২৪ জানুয়ারি ঢাকায় পুলিশের গুলিতে নিহত হন দুজন। চলমান হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ২৫ জানুয়ারি পুনরায় সারা দেশে হরতাল পালিত হয়। ঐদিন খুলনার দৌলতপুর ও খালিশপুরে পুলিশের গুলিতে নিহত হন তিনজন, আহত হন অনেকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে স্থানীয় প্রশাসন শহরে ইপিআর. তলব করে এবং কারফিউ জারি করা হয়।

সে সময় ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলনে খুলনার ছাত্রনেতৃবৃন্দের মধ্যে নজরুল ইসলাম, আবুল খয়রাত, সুশান্ত নন্দী, হাসিনা বানু শিরিন, সৈয়দ ইসা, কাজী ওয়াহীদুজ্জামান, রণজিৎ দত্ত, এটিএম খালেদ, রশিদ আহমেদ, নুরজ্জামান বাচ্চু, কৃষ্ণা দাশ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। সে সময় কে ডি ঘোষ রোডের 'তৃপ্তি নিলয়' ছিল প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিয়মিত আড্ডার স্থান।

খুলনার গণআন্দোলনের ইতিহাসে সাড়া জাগানো অধ্যায় ১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। ওই বছর ২১ ফেব্রুয়ারি সারা দেশের মতো খুলনাতেও শহিদ দিবস হিসেবে পালনের কর্মসূচি গৃহীত হয়। ওই সময় খুলনায় কোনো কেন্দ্রীয় শহিদমিনার ছিল না। পৌর পার্কে অস্থায়ী শহিদমিনার তৈরি করে সেখানেই মানুষ শ্রদ্ধা নিবেদন ও পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে। ১৯৬৯ সালেও সেই প্রথায় শহিদ দিবস পালিত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি ভোর থেকেই শহরে মিছিলের ঢল নামে। মিছিলের পর মিছিল আসতে থাকে পৌর পার্ক অভিমুখে। সকাল নয়টার সময় একটি মিছিল রূপসা শিপইয়ার্ড থেকে যাত্রা শুরু করে। মিছিল যত এগোতে থাকে মানুষও তত বাড়তে থাকে। মিছিল অগ্রসর হতে থাকে রূপসা ফেরিঘাট হয়ে খানজাহান আলী রোড ধরে। টুটপাড়া কবরস্থান এলাকা থেকে মিছিলটি আরও বড়ো হয়ে হাজী মো. মহসিন রোডে প্রবেশ করে। সেখানে অবস্থিত পৌর চেয়ারম্যানের বাড়ি ছিল তৎকালীন খুলনার এডিসি. আফজাল কাহুতের নিবাস।

আফজাল কাহুত খুলনা পৌরসভার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানও ছিলেন। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে তিনি বাগেরহাটে ছাত্রদের একটি মিছিলে গুলি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই খবর দ্রুতই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। খুলনাবাসীও ঘটনাটি জানতে পারে। ফলে তাঁর প্রতি জনতার রোষ আগে থেকেই জমা হয়েছিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ২১ ফেব্রুয়ারির মিছিলটি মহসিন রোডে কাহুতের বাসভবন অতিক্রম করার সময় জনতা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বলা হয়ে থাকে সেদিন মিছিল থেকে কাহুতের বাসভবন লক্ষ করে ঢিল ছোড়া হয়। তখন বাসভবনটির ভেতর থেকে মিছিল লক্ষ্য করে পালটা গুলি ছোড়া হয়। আনুমানিক সাড়ে দশটার দিকে মিছিলে গুলিবর্ষণ করা হয়। এই ঘটনায় শহিদ হন হাদিস এবং আলতাফ। আহত হন আরও দশ থেকে বারোজন। সে সময় জনতার রোষানলে পড়ে পুলিশ পিছু হটতে বাধ্য হয়। পালাতে গিয়ে জনতার হাতে ধরা পড়া দুই পুলিশ সদস্য ইটের আঘাতে নিহত হন। পরবর্তী সময়ে মিছিলটি লোয়ার যশোর রোডে অবস্থিত খান এ সবুরের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। মহসিন রোডে মিছিলে পুলিশের গুলি বর্ষণ এবং হত্যার ঘটনা শহরে ছড়িয়ে পড়লে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বেলা একটার দিকে খালিশপুরের কলকারখানা থেকে হাজার হাজার শ্রমিক মিছিল করে খুলনার কেন্দ্রস্থল পৌর পার্কে এসে সমবেত হয়। তাদের সঙ্গে আরও যুক্ত হয় শহরের বিভিন্ন অংশ থেকে আসা বিক্ষুব্ধ জনতা। সেখানে শহিদদের জানাজা অনুষ্ঠানের কথা ছিল। জনতার ভিড় দেখে পরে জানাজার অনুষ্ঠান সার্কিট হাউজ ময়দানে সরিয়ে নেওয়া হয়। বেলা আড়াইটার কাছাকাছি সময়ে জানাজা শেষে ফিরতি মিছিলে গুলি বর্ষিত হয়। এই ঘটনায় নিহত হন প্রদীপ। সাউথ সেন্ট্রাল রোডটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় প্রদীপ সড়ক এবং শহিদ হাদিসের নামানুসারে পৌর পার্কের নাম পালটে রাখা হয় 'হাদিস পার্ক', পৌর মিলনায়তনের নাম করা হয় শহিদ আলতাফ মিলনায়তন।

১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে পতন হয় আইয়ুব সরকারের, ক্ষমতায় আসেন আরেক সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান। গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে সফরকালীন ১৯৬৯ সালের ২৯ আগস্ট খুলনা আসেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৬৯ সালের ২৮ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতারভাষণে ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার এবং ওই বছর ৫ অক্টোবর এক ব্যক্তি এক ভোটের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন।[১২]

১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হলে পুনরায় ৬ দফার পক্ষে জনমত তৈরির অভিযান শুরু হয়। ১৯৭০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু খুলনা আসেন। সার্কিট হাউজ ময়দানে তাঁর আগমনে অনুষ্ঠিত হয় স্মরণকালের বৃহত্তম জনসভা। জনসভায় তিনি ৬ দফাকে অবলম্বন করে

[১২] *একাত্তরে বাংলাদেশের অভ্যুদয়,* শহিদুল ইসলাম, বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ, ঢাকা, বইমেলা ২০১৩, পৃ. ২৮৮।

স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে নির্বাচন ব্যবস্থার মাধ্যমে গণমানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান।

১৯৭০ সালের ১৫ আগস্ট এক ঘোষণায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে দেন। ঘোষণায় ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদ নির্বাচন এবং ১৯ ডিসেম্বর অথবা তারও আগে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের তারিখ নির্দিষ্ট করা হয়। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর পূর্ব বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে স্মরণাতীতকালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের অন্য জেলাগুলোর মতো ক্ষতিগ্রস্ত হয় খুলনাও। অবশেষে সরকারের দীর্ঘসূত্রতা, বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে সামরিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়নির্বাচন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে আওয়ামী লীগের খুলনা জেলা সভাপতি শেখ আব্দুল আজিজ, সেক্রেটারি মো. হাবিবুর রহমান, খুলনা শহর আওয়ামী লীগ সভাপতি সালাউদ্দিন ইউসুফ, সেক্রেটারি এ. এইচ. এম. আলী হাফেজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অন্যদিকে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম লীগের খান এ সবুর, এসএমএ. মজিদ, ডা. মোজাম্মেল হোসেন এবং ন্যাশনাল ছাত্র ফেডারেশন (এনএসএফ) ও বিহারিরা সক্রিয় ছিল। সবকটি আসনেই আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা জয়ী হন। জাতীয় পরিষদে খুলনার আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা ৭৫.১১% এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৭০.৪৫% ভোট পায়।[১৩]

মুক্তিযুদ্ধে খুলনা

১৯৭১ সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। ১৩ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা দেওয়া হয় ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক অধ্যাদেশ জারি করে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল করে। এই ঘোষণার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় সারা দেশে। ক্রমেই খুলনা পরিণত হয় মিছিলের নগরীতে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে গঠিত হয় ‘স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ’। ছাত্রলীগের মিলিট্যান্ট গ্রুপের সমন্বয়ে গঠন করা হয় ‘জয় বাংলা’ বাহিনী। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে বিচার চলাকালীন গুলি করে হত্যা করার পরিপ্রেক্ষিতে এই বাহিনী গঠিত হয়েছিল। তাই প্রথমে এই বাহিনীর নামকরণ করা হয়েছিল ১৫ ফেব্রুয়ারি বাহিনী বা সার্জেন্ট জহুর বাহিনী। পরবর্তীকালে নামকরণ করা হয় ‘জয় বাংলা’ বাহিনী। খুলনায় এই বাহিনীর প্রধান ছিলেন শেখ আব্দুল কাইয়ুম।[১৪] ২ মার্চ খুলনায় হরতাল পালিত হয়।

৩ মার্চ পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি চরমে ওঠে। ৩ মার্চ থেকেই শুরু হয়ে যায় অসহযোগ আন্দোলন। ঐদিন হরতাল চলাকালীন খুলনায় নিহত হন তিনজন। তারা হলেন জয়নাল আবেদিন, আমজাদ হোসেন ও কাজী। আহত হন

[১৩] মোল্লা আমীর হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬১-২৬২।

[১৪] শেখ আব্দুল কাইয়ুম, ‘খুলনায় প্রথম স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করা হয় আজ’। ‘দৈনিক পূর্বাঞ্চল’ ২৩ মার্চ, ২০১৪, পৃ. ২।

অনেকে। ঐদিন বিক্ষুব্ধ জনতা কে. ডি. ঘোষ রোডে অবস্থিত বন্দুকের দোকান ভেঙে অস্ত্র সংগ্রহ করে। আরও কয়েকটি অস্ত্রের দোকান লুট করে অস্ত্র সংগ্রহ করা হয়। মার্চের প্রথম সপ্তাহে খুলনায় 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। এই পরিষদের যুগ্ম আহবায়ক ছিলেন স. ম. বাবর আলী, শেখ শহিদুল ইসলাম, ইস্কেন্দার কবীর বাচ্চু ও হুমায়ূন কবীর বালু। সদস্য ছিলেন শেখ আব্দুল কাইয়ুম, হায়দার গাজী, সালাহ্উদ্দিন রুনু, হেকমত আলী ভূঁইয়া, আবুল কাশেম, ফকির সিরাজুল হক, মাহাবুবুল আলম হিরণ, শেখ শওকাত আলী এবং মিজানুর রহমান। পরবর্তীকালে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'-এর উদ্যোগে খুলনা শহরকে বারোটি ইউনিটে বিন্যাস করে ছাত্র সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়।[১৫] এ সময় থেকেই সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে যুদ্ধের ট্রেনিং শুরু হয়ে যায়।[১৬] জয় বাংলা বাহিনীতে বহু স্বেচ্ছাসেবক ও ছাত্র যোগ দেন। সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের সহযোগিতায় উৎসাহী যুবকরা সামরিক প্রশিক্ষণ নেন। শুরুতে বাঁশের লাঠি, ডামি রাইফেল দিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণ ক্যাম্প খোলা হলেও ইসলামবাদ কমিউনিটি সেন্টারে অবস্থিত ক্যাম্পটি ছিল অন্যতম। এখানে ২টি ডামি রাইফেল দিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। ছাত্র, যুবক ছাড়াও খালিশপুরের জুট মিলগুলোর শ্রমিকরা এতে প্রশিক্ষণ নেন। ডা. আমান উল্লাহ কাজী, হুদা সাহেব, ইলিয়াস খান প্রশিক্ষণ কাজে নেতৃত্ব দেন। শ্রমিক এলাকার প্রায় ৫০০ শ্রমিক প্রশিক্ষণে অংশ নেন। পরবর্তী সময়ে খুলনা শহর ছাড়িয়ে থানা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। উল্লেখ্য যে, সে সময় খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন শেখ আব্দুল আজিজ, সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মো. হাবিবুর রহমান খান এবং জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান ছিলেন শেখ কামরুজ্জামান টুকু। খুলনা সদর মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন মো. জোবেদ আলী, সাধারণ সম্পাদক ছিলেন কাজী আব্দুস সালাম এবং আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান ছিলেন মো. মুনছুর আলী। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন খুলনা শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট আলী হাফেজ, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সালাহ্ উদ্দিন ইউসুফ এবং শহর আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান মির্জা খয়বার হোসেন।[১৭]

এ সময়ে খুলনার খালিশপুর শিল্পাঞ্চলে বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গা বেধে যায়। দাঙ্গায় নিহত হন বহু বাঙালি শ্রমিক। ১২ মার্চ 'স্বাধীন বাংলা সংগ্রাম পরিষদ'-এর উদ্যোগে শহিদ হাদিস পার্কে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। সরকার

---

[১৫] স. ম. বাবর আলী, স্বাধীনতার দুর্জয় অভিযান। সাঁকোবাড়ি প্রকাশন। দ্বিতীয় সংস্করণ। ডিসেম্বর ১৬, ২০১০, ঢাকা, পৃ. ৩৩-৩৫।

[১৬] ড. শেখ গাউস মিঞা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৩-৩২৪।

[১৭] স.ম. বাবর আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬।

কর্তৃক জারি হয় ১১৫ নং সামরিক অধ্যাদেশ। তা সত্ত্বেও ১৪ মার্চ খুলনায় মিটিং মিছিল শোভাযাত্রা অব্যাহত থাকে।

২১ মার্চ অসহযোগের ১৯তম দিন সারা দেশের মতো খুলনাতেও কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। আওয়ামী লীগ, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী হাদিস পার্কে এক সমাবেশ করে। সমাবেশ শেষে মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। ২২ মার্চ খুলনা থেকে লু. র. জাহাঙ্গীর সম্পাদিত ও প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'দেশের ডাক' পত্রিকা স্বাধীন বাংলার রঙিন পতাকাসহ পূর্ণ পৃষ্ঠার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে।[১৮] খুলনার স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু থেকেই পত্রিকাটির সাহসী ভূমিকা ছিল। ২৩ মার্চ পূর্বনির্ধারিত পাকিস্তান দিবস পালনের বদলে 'প্রতিরোধ দিবস'-এর ডাক দেওয়া হয়। পাকিস্তানের পতাকার পরিবর্তে সারা দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরই প্রেক্ষিতে ২৩ মার্চ খুলনায় 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' ও 'জয় বাংলা বাহিনী' পাকিস্তান দিবসের পরিবর্তে বাংলাদেশ দিবস পালন করে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে।[১৯]

২৫ মার্চ রাতে শুরু হয় 'অপারেশন সার্চ লাইট' নামে মানবসভ্যতার ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা। ওই রাতে গ্রেফতার করা হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। গ্রেফতারের পূর্বে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। খুলনা অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য ছাত্রসমাজের উদ্যোগে গঠিত হয় বিপ্লবী পরিষদ। আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতা কামরুজ্জামান টুকু সর্বসম্মতভাবে এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। সদস্য হন স. ম. বাবর আলী, শেখ আব্দুল কাইয়ুম, ডা. আসিফুর রহমান, ইস্কেন্দার কবীর বাচ্চু প্রমুখ। এই পরিষদের নেতৃত্বে দ্রুত শহরের শিরোমণি, ফুলবাড়ি রেলগেট, দৌলতপুর, খুলনা জংশন, গল্লামারী, রূপসা ও লবণচরা এলাকায় ঘাঁটি গড়ে তোলা হয়।[২০] এরই মধ্যে ঢাকা থেকে যশোর ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তানি বাহিনীকে যশোর, খুলনা শহর, যশোর রোড, বিমানবন্দর, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও খুলনা রেডিয়ো স্টেশন প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার এবং বাঙালি ই.পি.আর, পুলিশের জোয়ানদের নিরস্ত্র করা ও আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টিসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতাদের গ্রেফতার করার নির্দেশ পাঠানো হয়।[২১] খুলনার নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতারের জন্য বাড়িতে বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হাবিবুর রহমান গ্রেফতার হন। পাকিস্তানি বাহিনী খুলনা শহরে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। পুলিশ, ইপিআর সদ্যসরা আগেই কেউ কেউ নিরাপদ স্থানে চলে গেলে তারা ব্যাপক হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা পান।

---

[১৮] ওই, পৃ. ৩৭।

[১৯] শেখ আব্দুল কাইয়ুম, 'খুলনায় পতাকা তোলা হয় হানাদার বাহিনীর টহলের মধ্যে' *বাংলাদেশ প্রতিদিন*। ১০ মার্চ, ২০১৪, ঢাকা।

[২০] ড. শেখ গাউস মিঞা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৬।

[২১] এম আর আখতার মুকুল, *আমি বিজয় দেখেছি*, সাগর পাবলিশার্স, আগস্ট ১৯৯৬, ঢাকা, পৃ. ৩০৬।

২৬ মার্চ খুলনায় পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর প্রথম গেরিলা আক্রমণের ঘটনা ঘটে। কামরুজ্জামান টুকু, আব্দুল কাইয়ুম, ডালিম, তপন, জ্যোতিষ, বিনয় মিলে খুলনা সার্কিট হাউজ ও তৎসন্নিকটস্থ ইউএফডি ক্লাবে পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্পে এই আক্রমণের পরিকল্পনা করেন।[২২] পাকিস্তানি সেনাছাউনিতে আনুমানিক রাত ৮টায় এই আক্রমণ চালানো হয়। ২৮ মার্চ খুলনা প্রবেশ করে পাকিস্তানি বাহিনীর একটি বিশাল কনভয়। নওয়াপাড়ায় আসার আগেই ছাত্র-শ্রমিক-জনতা মিলে রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। সেই ব্যারিকেড সরিয়ে পাকিস্তানি বাহিনী চলে আসে ফুলতলায়। ফুলতলায় জনতার সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের খণ্ড যুদ্ধে শহিদ হন আবু বক্কর।[২৩] এ সময় ফুলতলার মন্দিরে ঢুকে পাকিস্তানি সেনারা ডা. মনিন্দ্রনাথকে হত্যা করে এবং গুলি করতে করতে খুলনা অভিমুখে এগিয়ে যায়।[২৪] অধ্যাপক আবু সুফিয়ান তখন ফুলবাড়ি রেলগেটে আরও একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। পাকিস্তানি সেনারা সেখানেও জনতার প্রতিরোধের মুখে পড়ে। পাকিস্তানি বাহিনীর কনভয় খুলনার পথে অগ্রসর হতে গিয়ে তৃতীয় বড়ো বাধার সম্মুখীন হয় বৈকালীতে এসে। এই খণ্ডযুদ্ধে ঘটনাস্থলেই শহিদ হন মুন্সী মোফাজ্জেল হোসেন।[২৫] এরই মধ্যে খুলনার বিপ্লবী পরিষদ এবং মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প শহর থেকে রূপসা নদীর অপর পাড়ে সরিয়ে নেওয়া হয়। রূপসা থানার নৈহাটির দেবীপুর হাই স্কুলে গড়ে ওঠে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্থায়ী ক্যাম্প। পরে তাদের স্থায়ী ক্যাম্প স্থাপিত হয় বাগেরহাট ডাকবাংলোতে।

সংবাদ পেয়ে মেজর এমএ জলিল (পরবর্তীকালে ৯ নম্বর সেক্টর কমান্ডার), মেজর হুদা, ক্যাপটেন মেহেদী প্রমুখকে সঙ্গে করে বরিশাল থেকে বাগেরহাট আসেন। বাগেরহাট এসডিওর অফিস ও বাসায় পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয়। ২ এপ্রিল বাগেরহাট এসডিওর ট্রেজারি থেকে প্রায় তিনশত পঞ্চাশটি রাইফেল সংগ্রহ করা হয়। এই অস্ত্রগুলোর সমন্বয়ে খানজাহান আলীর দরগায় বিশাল একটি ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। মেজর জলিল ও কামরুজ্জামান টুকুর পরিকল্পনায় ৩ এপ্রিল ১২টা ১ মিনিট থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে অর্থাৎ ৪ এপ্রিলে মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ শুরু করেন গল্লামারী রেডিয়ো সেন্টারে। এই যুদ্ধে শহিদ হন সুবেদার জয়নাল আবেদিন, মোসলেম ও হাবিব।[২৬] ইতিআগে চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র দখল হওয়ার ঘটনায় পাকিস্তানি জান্তার টনক নড়ে। খুলনা রেডিয়ো স্টেশনে আগেই সেনা মোতায়েন করা ছিল। তাই সেনাবাহিনীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চট্টগ্রামের মতো খুলনা রেডিয়ো স্টেশনকেও স্বাধীনতা যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করা কিংবা

---

[২২] স. ম. বাবুর আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯।

[২৩] ওই, পৃ. ৪১।

[২৪] ওই, পৃ. ৪১।

[২৫] নিতাই পাল, ‘ একাত্তরে বৈকালীর মুক্তিযুদ্ধ’, সময়ের খবর, ২৬ মার্চ, ২০১২, পৃ. ৩।

[২৬] শেখ আব্দুল কাইয়ুম, ‘রেডিয়ো সেন্টার আক্রমণ,’ সমকাল, সংবাদ পত্র, মার্চ ২৬, ২০১৪, পৃ. ২০।

সম্ভব হলে বেতারকেন্দ্রের যন্ত্রপাতি নিয়ে মুক্তিবাহিনীর জন্য পৃথক একটি বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে খুলনা রেডিয়ো স্টেশন দখলের পরিকল্পনা করা হয়। তবে মুক্তিযোদ্ধাদের রেডিয়ো সেন্টার দখলের চেষ্টা সফল হয়নি। কিন্তু খুলনার প্রথম সশস্ত্র সম্মুখযুদ্ধ হিসেবে ঘটনাটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে।[২৭]

রেডিয়ো স্টেশনে অপারেশনের পর থেকেই মুক্তিযোদ্ধারা খণ্ড খণ্ড দলে উন্নত অস্ত্রশস্ত্র এবং ট্রেনিংয়ের জন্য ভারতে পাড়ি জমাতে শুরু করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ভোমরা নামক স্থানে একটা ক্যাম্প গড়ে ওঠে। সেখানে চলে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাথমিক পর্যায়ে ট্রেনিং। এর দায়িত্বে ছিলেন তখন ৯ নম্বর সেক্টরের অন্যতম সংগঠক এমএ. গফুর। তাঁদের উদ্যোগে সাতক্ষীরা ন্যাশনাল ব্যাংক থেকে অপারেশন করে উদ্ধার করা হয় এক কোটি পঁচাত্তর লাখ টাকা। পরে এই টাকা এমএ. গফুরের সহায়তায় বশিরহাট ট্রেজারিতে বাংলাদেশ সরকারের নামে জমা করা হয়। উল্লেখ্য যে, ভোমরা বর্ডার এলাকায় এই ক্যাম্পটি গড়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধের কোনো সেক্টর এবং ভারত সরকারের সহায়তায় গড়ে ওঠা ট্রেনিং ক্যাম্পগুলোর আগেই।[২৮] জানা যায়, যুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের কাছে এতো বড়ো অঙ্কের টাকা জমা পড়ার ওটাই প্রথম ঘটনা। খুলনা শহর ও আশেপাশের এলাকা ছাড়াও বাটিয়াঘাটা, পাইকগাছা, তেরখাদায় ব্যাপক প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় পাকিস্তানি বাহিনী।

ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগসহ মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অনেকে ভারতে গমন করেন এবং ভারত সরকারের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের আশ্রয়ের ব্যবস্থাসহ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

খুলনা থেকে আগত মুক্তিযোদ্ধারা পশ্চিমবঙ্গের টাকি, হিঙ্গালগঞ্জ, বিহারের চাকুরিয়া, উত্তর প্রদেশের দেরাদুনের তেন্দুয়া, আসামের হাফলং প্রভৃতি স্থানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। সেক্টর কমান্ডের অধীনে পরিচালিত এ সকল বাহিনী ‘মুক্তিযোদ্ধা’ বা Freedom Fighter (FF) নামে পরিচিত হয়। মে মাসে মুজিব বাহিনী বা Bangladesh Liberation Force (BLF) নামে আর একটি বাহিনী গড়ে তোলা হয়। খুলনা বিভাগে মুজিব বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন তোফায়েল আহমেদ। বৃহত্তর খুলনা জেলার মুজিব বাহিনীর প্রধান ছিলেন শেখ কামরুজ্জামান টুকু।[২৯] খুলনা জেলায় ২টি সেক্টরে অন্তর্ভুক্ত হয়। খুলনা জেলার বৃহত্তর অংশ ৯ নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর এম.এ. জলিল (১৫ নভেম্বর পর্যন্ত)। খুলনার বাকি অংশ অর্থাৎ দৌলতপুর-সাতক্ষীরা ৮ নম্বর সেক্টরভুক্ত ছিল। সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পালন

---

[২৭] স. ম. বাবুর আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫।

[২৮] ড. শেখ গাউস মিঞা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫২।

[২৯] মোল্লা আমীর হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২।

করেন মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (আগস্ট পর্যন্ত) এবং পরবর্তী সময়ে মেজর এম.এ. মঞ্জুর।

১৯৭১ সালের মে মাসে খুলনায় প্রথম মওলানা এ কে এম ইউসুফের নেতৃত্বে রাজাকার নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। জুন মাসে সরকারি অধ্যাদেশ জারি করা হলে সংগঠনটি রাষ্ট্রীয় অনুমোদন লাভ করে। লুট, অগ্নিসংযোগ, নারীনির্যাতন এবং গণহত্যায় পাকিস্তানি বাহিনীর পাশাপাশি এদেরও বড়ো ভূমিকা ছিল। যতদূর জানা যায়, রাজাকার নামক এ সশস্ত্র সংগঠনটি মওলানা এ কে এম ইউসুফ গড়ে তুললেও এর পথপ্রদর্শক ছিলেন খান এ সবুর।[৩০] খুলনায় রাজাকারদের প্রধান আস্তানা ছিল ভূতের বাড়ি খ্যাত আনসার ক্যাম্প।

এদিকে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে বিক্ষিপ্ত প্রতিরোধ ও খণ্ডযুদ্ধ যেমন চলতে থাকে অন্যদিকে সাধারণ মানুষের ওপর পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার বাহিনীর খুন, নারীনির্যাতন, লুট, অগ্নিসংযোগ আর গণহত্যাও চলতে থাকে সমান তালে। ফলে মুক্তিকামী যুবক এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যেমন ভারতে সামরিক প্রয়োজনে পাড়ি জমাতে থাকেন তেমনই সাধারণ নিরস্ত্র মানুষও দলে দলে ভারতে নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে ছুটে চলে। ২৭ মার্চ বিহারিদের সহায়তায় পাকিস্তানি বাহিনীর একটি কনভয় খালিশপুর প্রবেশ করে। বাঙালিদের ক্ষীণ প্রতিরোধ ভেদ করে তারা বিহারিদের সহায়তায় খালিশপুর নিউজপ্রিন্টে প্রবেশকালীন নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। এখানে প্রবেশকালীনই বড়ো ধরনের গণহত্যা সংঘটিত করে তারা। তারপর থেকে খালিশপুর গণহত্যার একটি কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। ২৭ মার্চ নকুল চক্রবর্তীর বাড়িতে (বর্তমান পাইওনিয়ার কলেজ) অ্যাডভোকেট নকুল চক্রবর্তী ও তাঁর দুই পুত্র (অজিৎ ও সুজিত), তাঁর এক পাচক (কালিপদ) ও এক কর্মচারীকে হত্যা করে পাকিস্তানি বাহিনী।[৩১] রাতে তারা আলতাপোল লেনে মাধবচক্রবর্তীসহ তিনজনকে গুলি করে হত্যা করে।[৩২] এর পর একে একে ১ মে অজোপাড়া, ১২ মে চিতলমারি, ৮ মে চরেরহাট, ১৭ মে দুর্জনী মহলো ও বটিয়াঘাটা, ২০ মে চুকনগর, ২১ মে ঝাউডাঙ্গা (সাতক্ষীরা), ২২ মে শিরোমণি, ৭ এপ্রিল মুন্সীবাড়ি, ১৫ এপ্রিল রংপুর, ২৩ এপ্রিল পাটকেলঘাটাসহ বিভিন্ন স্থানে গণহত্যা সংঘটিত হয়। নির্বিচারে যত্রতত্র হত্যার ঘটনা ঘটে অসংখ্য। সম্ভ্রম হারান অসংখ্য নারী।

পাকিস্তানি ও রাজাকার বাহিনীর হাতে খুলনা অঞ্চলে গণহত্যার সবচেয়ে নৃশংসতম দুটি নজির চরেরহাট এবং চুকনগর। ৮ মে সাধারণ যাত্রীপূর্ণ দুটি লঞ্চ নড়াইল জেলার রঘুনাথপুর থেকে খুলনা আসার সময় চরেরহাটে লঞ্চ থামিয়ে যাত্রীদের লাইনে দাঁড় করিয়ে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করা হয়। ২০

---

[৩০] ওই, পৃ. ১২৬-১২৭।

[৩১] উদ্ধৃত

[৩২] ড. শেখ গাউস মিঞা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫২।

মে চুকনগরে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসের বৃহৎ এবং নৃশংসতম গণহত্যা সংঘটিত হয়। চুকনগর খুলনার ডুমুরিয়া থানার বড়ো ব্যাবসাকেন্দ্র। সেদিন চুকনগর ছিল দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত মানুষের ভিড়ে পূর্ণ। চুকনগর হয়ে ভারত সীমান্তে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য মানুষ সেদিন চুকনগর বাজারসংলগ্ন এলাকায় দলে দলে সমবেত হয়েছিল। বেলা ১১টার দিকে সেখানে নিরস্ত্র মানুষের ওপর পাকিস্তানি বাহিনী হামলা করে। সেখানে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করা হয় অসংখ্য মানুষ। ধারণা করা হয় সেদিন চুকনগর গণহত্যায় মৃতের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার।[৩৪]

তাছাড়াও খুলনা খালিশপুর, গল্লামারী, রেল স্টেশন, ফরেস্টঘাট এলাকাজুড়ে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসররা বহু লোক হত্যা করে বধ্যভূমি রচনা করে। যুদ্ধের পুরো সময় জুড়েই চলে পাশবিক হত্যাকাণ্ড। নির্বিচারে হত্যা এবং নারীনির্যাতন চলে খুলনায় অবস্থিত রাজাকার ও পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্পগুলোতে। খুলনায় পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকারদের উল্লেখযোগ্য টর্চার সেল ছিল সার্কিট হাউজসংলগ্ন হেলিপোর্ট ও গল্লামারী রেডিয়ো স্টেশনের টিনের ঘরটি।[৩৫]

জুন মাসের শেষ সপ্তাহে মুক্তিযোদ্ধারা গড়ইখালী রাজাকার ক্যাম্প বিনা যুদ্ধে ও রক্তপাতহীনভাবে দখল করে নেন। জুলাই মাসের ৮ তারিখে আক্রমণ করা হয় পাইকগাছা থানা। এখানে উল্লেখ্য যে, পাইকগাছা থানার পুলিশ বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে পাকিস্তান সরকারের অনুগত ছিল এবং শান্তি কমিটি ও রাজাকারদের সাথে মিলে এলাকার মানুষের ওপর নিপীড়ন চালাচ্ছিল।

৮ জুলাই আনুমানিক বিকাল চারটার দিকে মুক্তিযোদ্ধারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে থানা ঘিরে অবস্থান নেন এবং পুলিশ বাহিনীকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানায়। পুলিশ বাহিনী বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করলে সন্ধ্যায় এই অপারেশন শেষ হয়।[৩৬]

১৫ আগস্ট রাতে পরিচালিত হয় প্রথম মোংলা বন্দর অপারেশন। মোংলা বন্দর দক্ষিণাঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখা এবং যুদ্ধের রসদ সরবরাহের জন্য পাকিস্তানি বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন ছিল। তাই পাকিস্তানি বাহিনীর রসদ সরবরাহ এবং অবস্থান দুর্বল করে দিতে বাংলাদেশের নৌ কমান্ডোরা মোংলা বন্দরকে তাঁদের টার্গেট হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। ওই রাতে ছোটো ছিপ নৌকায় করে নৌ কমান্ডোরা বন্দর উপকূলে এসে পৌঁছান। তাঁরা ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে বুকে মাইন বেঁধে চিতসাঁতার দিয়ে নদীর কূল থেকে এক-আধ মাইল দূরে অবস্থিত পাকিস্তানি জাহাজগুলোর কাছে পৌঁছান এবং জাহাজে মাইন লাগিয়ে

[৩৪] ওই, পৃ. ৩৫৩।

[৩৫] আনোয়ারুল কাদির, 'খুলনা অঞ্চলে গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গ' অংশু, সাময়িকী, সনাক। মার্চ ২০১০।

[৩৬] মোল্লা আমীর হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮-১২৯।

দেন। মুক্তিযোদ্ধাদের লাগানো মাইনে বিস্ফোরিত হয়ে ডুবে যায় পাকিস্তানি বাহিনীর ৬টি জাহাজ। মোংলা বন্দরে ৮ অক্টোবর পুনরায় আরেকটি অপারেশন পরিচালিত হয়েছিল। নৌ কমান্ডোরা ওইদিনের অপারেশনে আরও দুটি বিরাটাকার পাকিস্তানি জাহাজ ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হন। নৌ কমান্ডো আক্রমণে লে. গাজী রহমত উল্লাহ দাদু, খিজির আলী, রুহুল আমীন, লে. মোল্লা জালাল উদ্দিন নেতৃত্ব দেন।

১৯ সেপটেম্বর মুক্তিবাহিনী এবং রাজাকার ও পাকিস্তানি বাহিনীর মধ্যে সংঘটিত হয় বাঁকার যুদ্ধ। ঐদিন বেলা এগারোটার দিকে গোপন সংবাদে মুক্তিযোদ্ধারা জানতে পারেন দুইটি লঞ্চভর্তি রাজাকার ও পাকিস্তানি বাহিনী বাঁকা ক্যাম্প আক্রমণ করতে আসছে। খবর পেয়ে মুক্তিযোদ্ধারা কপোতাক্ষ নদের তীরে রিং বাঁধের আড়ালে তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে অবস্থান নেন। কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনীর ভারী গোলা বর্ষণে তারা বেশি সময় টিকতে না পেরে পিছু হটতে বাধ্য হন। সেই সুযোগে পাকিস্তানি সেনা এবং রাজাকার বাহিনী তীরে নেমে পড়ে এবং গুলি করতে করতে সামনের দিকে এগোতে থাকে। তারপর পাকিস্তানি বাহিনী বাঁকা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প জ্বালিয়ে দেয়।[৩৭] যতদূর জানা যায়, বাঁকার যুদ্ধে শহিদ হয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধা শংকর কুমার অধিকারী, এনায়েত আলী মোড়ল, কামরুল ইসলাম খোকন, আইর উদ্দীন গাজী, আব্দুল মালেক মোড়ল ও আবু তালেব মোড়ল।[৩৮]

নভেম্বর মাসের শেষের দিকে মুক্তিযোদ্ধারা বারোআড়িয়ার রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণের জন্য অভিযান পরিচালনা করেন। বারোআড়িয়া ছিল মূলত হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা। এলাকায় বসবাসরত হিন্দু জনগোষ্ঠীকে কোণঠাসা করে রাজাকার বাহিনী সেখানে ক্যাম্প স্থাপন করেছিল। রাজাকারদের খুন, নারীনির্যাতন, জমি দখল, লুটপাটে বারোআড়িয়া পরিণত হয়েছিল এক বিভীষিকাময় জনপদে। রাজাকারদের নির্মমতার শিকার হয়েছিলেন গুরুপদ মণ্ডল ও তার সন্তানেরা। চোখের সামনে স্বামী সন্তানদের নির্মম মৃত্যু দেখে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন গুরুপদ মণ্ডলের স্ত্রী গুরুদাসী মণ্ডল। বারোআড়িয়ার অভিযানটি সফল হয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধারা বারোআড়িয়া ক্যাম্প থেকে রাজাকারদের হটিয়ে ক্যাম্পটি দখলে নিয়েছিলেন। বারোআড়িয়ার অপারেশনে শহিদ হন জ্যোতিষ ও বিনয়।[৩৯]

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সংঘটিত হয় কপিলমুনির যুদ্ধ। প্রায় তিন রাত তিন দিনের যুদ্ধের পর বিনোদবিহারী সাধুর সুরক্ষিত জমিদার ভবনে স্থাপিত ঘাঁটি আক্রমণ করে পাকিস্তানি সেনাদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হয়। এ যুদ্ধে শহিদ হন মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার হোসেন আনু, তোরাব আলী ও আনসার আলী গাজী।

---

[৩৭] আবুল কালাম আজাদ, 'বাঁকার যুদ্ধ ১৯৭', সময়ের খবর, ২৬ মার্চ, ২০১২।

[৩৮] স. ম. বাবুর আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬-১১৮।

[৩৯] স. ম. বাবুর আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮-১৩০।

কপিলমুনি যুদ্ধের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল এবং কপিলমুনি এলাকার আশেপাশে গ্রামবাসীর সক্রিয় সহযোগিতা। কপিলমুনির যুদ্ধ শেষে জনতার দাবি অনুসারে আত্মসমর্পণকৃত রাজাকারদের ১৫-২০জনকে মুক্তি দিয়ে বাকিদের কপিলমুনি হাই স্কুল মাঠে গুলি করে হত্যা করার মধ্য দিয়ে গণআদালতের রায় কার্যকর করেন মুক্তিযোদ্ধারা।[৪০] যুদ্ধ চলাকালীন গণআদালতে রাজাকারদের এই প্রকাশ্য বিচার ছিল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের একটি বিরল ঘটনা।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে রচিত হতে থাকে মুক্তিযোদ্ধাদের একের পর এক বিজয়গাথা। ৯ নম্বর সেক্টরে চলতে থাকে শেষ যুদ্ধের জোর প্রস্তুতি। মুক্তিযোদ্ধারা শ্যামনগর, কালীগঞ্জ, দেবহাটা, সাতক্ষীরা মুক্ত করে এবং মিত্র ও মুক্তিবাহিনী ঝিকরগাছা, যশোর, নওয়াপাড়া হয়ে খুলনার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। এমনই পরিস্থিতিতে নৌবাহিনী ও নৌ গেরিলারাও মুক্তিসংগ্রামের শেষ প্রস্তুতি নেন। ইতোমধ্যে নবম সেক্টরের মোংলা, দাকোপ, মুন্সিগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে পাকিস্তানি বাহিনীর জাহাজ ডুবিয়ে ও গানবোটে হামলা চালিয়ে বাংলাদেশের নৌ কমান্ডোরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তারপর চূড়ান্ত বিজয় অভিযানে ৭ ডিসেম্বর ভারতীয় নৌ কমান্ডার এম.এন. সামন্তের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ পদ্মা ও পলাশ এবং মিত্র বাহিনীর যুদ্ধজাহাজ পানভেল মোংলা বন্দর, হিরণপয়েন্ট, খুলনার পি.এন.এস তিতুমীর নৌ ঘাঁটি দখলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। ৯ ডিসেম্বর আনুমানিক সকাল আটটায় যুদ্ধ জাহাজ তিনটি রায়মঙ্গল নদী অতিক্রম করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জলসীমায় প্রবেশ করে। ১০ ডিসেম্বর ভোরে জাহাজ তিনটি আকরম পয়েন্ট থেকে মোংলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানি বাহিনীর চোরাগোপ্তা হামলার আশঙ্কায় মুক্তিবাহিনী ও মিত্র বাহিনীর জাহাজ তিনটিতে চাঁদতারাখচিত পাকিস্তানের পতাকা লাগানো ছিল। সাড়ে সাতটা নাগাদ বিনা বাধায় তারা মোংলা জয় করে। তারপর জাহাজ তিনটি খুলনার নৌঘাঁটি পিএনএস তিতুমীর দখলের উদ্দেশ্যে পশুর নদী অতিক্রম করে শিপইয়ার্ডের কাছাকাছি পৌঁছলে ৪টি জঙ্গিবিমান জাহাজ ৩টির ওপর দিয়ে উড়ে যায়। যুদ্ধ জাহাজে অবস্থানরত মুক্তিবাহিনী ও মিত্র বাহিনীর সদস্যরা নিশ্চিত ছিল না বিমান ৪টি কাদের দ্বারা পরিচালিত। তাই তাঁরা প্রথমে কমান্ডার সামন্তের নির্দেশে পালটা আক্রমণ থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু বিমান চারটি অতর্কিত ফিরে আসে এবং শেষের বিমানটি থেকে মুক্তিবাহিনীর জাহাজ পদ্মার ওপর বোমা বর্ষণ করা হয়। পদ্মার ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। বিমানগুলো নৌ জাহাজ পলাশকে লক্ষ্য করেও বোমা নিক্ষেপ করে। সেই পরিস্থিতিতে জাহাজের বিমানবিধ্বংসী কামানের সাহায্যে পালটা আক্রমণ চালানো হয়। এ সময় শিপইয়ার্ড থেকে পাকিস্তানি বাহিনী এবং বিএমসি ও দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরি থেকে

[৪০] শেখ আব্দুল কাইয়ুম, 'কপিলমুনির যুদ্ধে পরাজিত যুদ্ধাপরাধীদের গণ আদালতে বিচারে মৃত্যু-কার্যকর করা হয়'; অংশু, সাময়িকী, পঞ্চম সংখ্যা, মার্চ, ২০০৯-১০, পৃ. ৩৩।

রাজাকার বাহিনীর সদস্যরা জাহাজগুলোকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে শুরু করে। এ ঘটনায় মুক্তিবাহিনীর একটি জাহাজ রূপসা নদীতে ডুবে যায়। অন্য জাহাজটি হাড়করের সামনে চরে ওঠে আটকা পড়ে। ঘটনায় পদ্মার অধিনায়ক লে. মিত্রসহ ২১ জন মুক্তিযোদ্ধা ও নৌসেনা হানাদার বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। পলাশকে লক্ষ্য করে বোমা ও গুলি বর্ষণ করা হয়। এই যুদ্ধে শহিদ হন বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিনসহ ৮জন।[৪১] এ অভিযানের করুণ পরিণতির মধ্য দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের খুলনা বিজয়ের প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ইতোমধ্যে কপিলমুনির যুদ্ধে অংশ নেওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের দলটি লঞ্চযোগে বারোআড়িয়া, মাইলমারা হয়ে বটিয়াঘাটার কাছে আসে এবং জলমা চকরখালি হাই স্কুলকে মুক্তিযোদ্ধাদের শেষ ক্যাম্প হিসেবে ঠিক করা হয়। ১০ ডিসেম্বর খুলনা দখলের মূল পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়।[৪২] ১৪ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধা মেজর জয়নুল আবেদীন খান, গাজী রহমত উল্লাহ, আখতার, লে. সামছুল আরেফিন, শেখ আব্দুল কাইয়ুম, নুরুল ইসলাম, ইসলাম বন্দ, আখতার বন্দ, দাউদ, রেজাউল করিম, শেখ মোশারফ হোসেন প্রমুখ খুলনা লায়ন্স স্কুল ও খুলনা রেডিয়ো সেন্টারে অবস্থিত পাকিস্তানি বাহিনীর ঘাঁটিতে এক দুর্ধর্ষ অভিযান চালান। কিন্তু হানাদার বাহিনীর ভারী গোলা বর্ষণের মুখে অভিযান ব্যর্থ হয়।[৪৩]

অন্যদিকে ১২ ডিসেম্বর রাতে খুলনার শিরোমণিতে পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় ও মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বিত বাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। শিরোমণি শিল্প এলাকার ইস্টার্ন জুট মিল, আফিল ও আলিম জুট মিল এবং ক্যাবল ফ্যাক্টরিতে পাকিস্তানি বাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে শুরু হয় মুক্তি ও মিত্র বাহিনীর মেশিনগানের ভারী গোলা বর্ষণ। মিত্র বাহিনী কলকাতার দমদম বিমানবন্দরে যোগাযোগ করে বিমান হামলার পরামর্শ দেয়। তার ফলে শুরু হয় সর্বাত্মক বিমান হামলা। এই হামলায় পাকিস্তানি বাহিনী প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৪৪]

১৩ ডিসেম্বর মিত্র বাহিনীর ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশটি সাঁজোয়া গাড়ির একটি বহর মেজর গনি ও মহেন্দ্র সিংয়ের নেতৃত্বে যশোর রোড হয়ে শিরোমণি ঢুকে পড়লে চক্ষু হাসপাতালের সামনে পাকিস্তানি বাহিনীর ভারী গোলা বর্ষণের শিকার হয়। পাকিস্তানি বাহিনীর এই আক্রমণে আনুমানিক ২০০-৩০০জন ভারতীয় সৈন্য শাহাদাত বরণ করেন। এরই মধ্যে ইস্টার্ন জুট মিলে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এখানে পাকিস্তানি সেনারা ভারতীয় বাহিনীর হাতে বন্দি হয়। শিরোমণির মীর আব্দুল গফফারের বাড়ির নিকট পাকিস্তানি বাহিনীর চারটি ট্যাংকই ভারতীয়

[৪১] কাজী মোতাহের রহমান, ‘খুলনা বিজয়ের প্রথম অভিযান’। সময়ের খবর, সংবাদপত্র। মার্চ ২৬, ২০১১।

[৪২] স. ম. বাবুর আলী।‘খুলনা বিজয়’। সময়ের খবর, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পাতা। সংবাদ পত্র। মার্চ, ২৬, ২০১১। পৃ. ৩।

[৪৩] ওই, পৃ. ১৪৮-১৪৯।

[৪৪] স. ম. বাবুর আলী,‘খুলনা বিজয়’, সময়ের খবর, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পাতা, সংবাদ পত্র, মার্চ, ২৬, ২০১১। পৃ. ১৪৮-১৪৯।

বিমানবাহিনীর হামলায় ধ্বংস হয়ে যায়। শিরোমণি রেলস্টেশন এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর গোলাবারুদ বহণকারী একটি ট্রাকবহরও এ সময় ধ্বংস হয়ে যায়। ১৫ ডিসেম্বরের পর থেকে শিরোমণিতে যুদ্ধের প্রচণ্ডতা কমে আসে। ১৬ ডিসেম্বর আসে মহান বিজয়দিবস। কিন্তু এ দিন সারা দেশে পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করলেও খুলনায় অবস্থিত পাকিস্তানি সেনারা আত্মসমর্পণ করেনি।[৪৫]

১৭ ডিসেম্বর মুজিব বাহিনীর সদস্যরা শেখ কামরুজ্জামান টুকুর নেতৃত্বে রূপসা ঘাট হয়ে খুলনা শহরে প্রবেশ করেন এবং হাদিস পার্কে সমবেত হন। তারও পরে প্রায় সাড়ে সাত'শ মুজিব বাহিনীর সদস্য আজম খান কমার্স কলেজ ও শাহীন হোটেলে অবস্থান নেন। মুক্তিযোদ্ধারা সার্কিট হাউজে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে দেন। পরে মেজর জলিল (৯ নং সেক্টর কমান্ডার) ও মেজর মঞ্জুর (৮ নং সেক্টর কমান্ডার) শিরোমণির যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করে মিত্র বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে সার্কিট হাউজে এসে পৌছান।[৪৬] সার্কিট হাউজ ময়দানে ১৭ ডিসেম্বর দুপুরে মুক্তিবাহিনী ও মিত্র বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী।

যতদূর জানা যায়, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন যুদ্ধে শহিদ হয়েছিলেন- মো. আবু বক্কর, হাবিবুর রহমান খান, নারায়ণ কুমার হোড়, আকবর কবীর, শেখ খসরুজ্জামান, আতিয়ার রহমান, মনোরঞ্জন মজুমদার, আব্দুল মালেক মোড়ল, মো. কামরুল ইসলাম, শংকর কুমার অধিকারী, পঞ্চানন সরদার, আইয়ুব আলী গাজী, সুলতান খাঁ, আব্দুল আজিজ মোল্লা, জ্যোতিষ কুমার মণ্ডল, শেখ আনোয়ার হোসেন (আনু), শিবানন্দ বিশ্বাস, ভীমচন্দ্র পাল, মুন্সী মনিরুল ইসলাম, এনায়েত আলী, আবু তালেব মোড়ল, আয়েন উদ্দিন গাজী, নুরুল ইসলাম (মান্নু), কাজী সরফুদ্দিন আজমত হোসেন, আব্দুল মান্নান, লাল মিঞা, মোসলেম আলী হাওলাদার, আকতার হোসেন পিরু, আলম, হারুন, হরিদাস মজুমদার, ইদ্রিস আলী, গাজী আনসার আলী, সিরাজুল হক মুন্সী, আলাউদ্দিন কদ্দুস, ইব্রাহীম হোসেন, লায়েক হোসেন, মোফাজ্জল হোসেন, শেখ শামসুর রহমান, শেখ সোহরাব হোসেন, এবিএম মাহবুব আলী, আব্দুল গফুর, মো. আবুল খায়ের, মো. মোজাম আলী, আনোয়ার হোসেন, মো. হরমুজ আলী, আমজাদ হোসেন, শফি উদ্দিন, কাজী মহিউদ্দিন, মো. সাইদ, রুহুল আমিন (বীরশ্রেষ্ঠ), সিপাহি দেলোয়ার হোসেন, হাবিলদার খান মকসুদ আলী, সিপাহি আব্দুল হক, আফতাব আহমেদ, সিপাহি শহিদুল ইসলাম, নায়েক সর্দার আবু তালেব, সিপাহি ইমরুল কায়েস, সিপাহি আব্দুল কাদের, সুবেদার এবিএম শামসুর রহমান, সিপাহি

[৪৫] স. ম. বাবুর আলী। পূর্বোক্ত পৃ. ১৫০-১৫৪।

[৪৬] কাজী মোতাহের রহমান, পূর্বোক্ত।

খাদেম সর্দার, সোয়ার আব্দুল ওয়াদুদ খান, সিপাহি আবুল হোসেন, হাবিলদার জয়নাল আবেদীনসহ অনেকে যাদের নাম তালিকাভুক্ত হয়নি।[৪৭]

মুক্তিযুদ্ধে আহত হয়েছিলেন- নৌ কমান্ডো মো. জহুরুল হক, আব্দুল খালেক, টি এবিসিদ্দিক, এসএম তোরাব আলী, রুহুল আমিন গাজী, শেখ আলী আফসার, শেখ রুহুল আমিন, বিভাষচন্দ্র বৈরাগী, এসএম হাবিব দুলাল, গোলাম মোহাম্মদ, আবুল ফজল হেলাল, শরৎচন্দ্র মন্ডল, মো. আলী প্রমুখ।[৪৮]

শেখ আবু নাসের ছিলেন খুলনার অন্যতম মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে খুলনা অঞ্চলে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং তাঁর জন্ম ১৯২৮ সালে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতার বাসভবনে অবস্থানকালে তিনিও নির্মম হত্যাকান্ডের শিকার হন। তাঁর নামে ১৯৯৬ সালে খুলনা স্টেডিয়ামকে শেখ আবু নাসের স্টেডিয়াম নামকরণ করা হয় এবং ২০১০ সালে খুলনায় শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়।

শেখ আবদুল আজিজ মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের ৯ নম্বর সেক্টরের লিয়াজোঁ অফিসার ছিলেন। তাঁর জন্ম ১৯২৯ সালে বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ উপজেলার তেলিগাতী গ্রামে। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ও এলএলবি পাস করেন। তিনি আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার একাধারে যোগাযোগ, কৃষি, তথ্য এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী। তা ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে দলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। দীর্ঘদিন সুপ্রিম কোর্টে আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধে খুলনা অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল আনুমানিক ১,৩৬৬জন এবং রাজাকার বাহিনীর সংখ্যা ছিল আনুমানিক পাঁচ শতাধিক।[৪৯]

খুলনায় এখন পর্যন্ত শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা লিপিবদ্ধ করার কাজটি সম্পন্ন হয়নি। জাতীয় স্বীকৃতিস্বরূপ শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের খোদাই করা নামফলকও নির্মিত হয়নি। খুলনায় সরকারিভাবে শিরোমণি, বৈকালী, গল্লামারী, কপিলমুনি, বটিয়াঘাটা, পাইকগাছাসহ অন্যান্য ঐতিহাসিক যুদ্ধক্ষেত্রগুলোকে চিহ্নিত করাও হয়নি। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রদান করা হলো:

---

[৪৭] মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা ফাউন্ডেশন থেকে সংগৃহীত।

[৪৮] ওই।

[৪৯] সামছুল আরেফিন, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান,* ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ১১৯৫, পৃ. ৬২৭।

সারণি-১৩২

শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা

তালিকার নাম: শহিদ বেসামরিক গেজেট

ক্র. নং	ক্র. নং/ গেজেট নং	মুক্তিযোদ্ধার নাম	মুক্তিযোদ্ধার পিতার নাম	গ্রামের নাম
১	১৬৭৬	শহিদ আবুল বাসার খান	মৃত আঃ রহমান খান	তেলিগাতী
২	১৮৯৬	শহিদ আঃ আলী মাতবর	মৃত ওয়াজেদ আলী মাতবর	ওয়েস্ট সেন্ট্রল ব্লক-সি ১৬, বাসা নং-১৭৩, খালিশপুর হাউজিং এস্টেট,
৩	১৮৯৭	শহিদ নজরুল ইসলাম	মৃত আঃ রাজ্জাক মন্ডল	এন,জে,৪৫, হাউজিং এস্টেট,
৪	১৮৯৮	শহিদ মুনসী মনিরুল ইসলাম	মুনশী আতোয়ার রহমান	নয়াবাটি মুনশী বাড়ি
৫	১৮৯৯	শহিদ খোরশেদ আলম	মৃত রইজ উদ্দিন শেখ	এনজেড-৬১, হাউজিং এস্টেট,
৬	১৯০০	শহিদ পঞ্চানন সর্দার	মৃত রশিক লাল সরদার	আড়ংঘাটা
৭	১৯০১	শহিদ আইয়ুব আলী গাজী	মৃত আলহাজ শহর আলী গাজী	দেয়ানা
৮	১৯০২	শহিদ জয়নাল আবেদীন	মৃত শেখ লেহাজ উদ্দিন	চন্দনী মহল
৯	১৯০৩	শহিদ শেখ আনোয়ার হোসেন	মৃত শেখ মিনাজ উদ্দিন	মোসাব্বরপুর
১০	১৯০৪	শহিদ নির্মলকান্তি ঢালী	মনোহর আলী	মাথাভাঙ্গা
১১	১৯০৫	শহিদ জ্যোতিষ কুমার মন্ডল	মৃত সন্তোষ কুমার মন্ডল	সুন্দরমহল
১২	১৯০৬	শহিদ শিবানন্দ বিশ্বাস	মৃত আনন্দ মোহন বিশ্বাস	পরিচালনা
১৩	১৯০৭	শহিদ মোকাদ্দেছ মিয়া	মৃত রঞ্জু মিয়া	সেনহাটী
১৪	১৯০৮	শহিদ মোকাদ্দেছ মিয়া	মৃত রঞ্জু মিয়া	সেনহাটী
১৫	১৯০৯	শহিদ শেখ খসরুজ্জামান	শেখ মাহমুদ আলী	শিরোমণি
১৬	১৯১০	শহিদ আবুল হোসেন মোল্লা	মৃত বাহাদুর মোল্লা	আলকা
১৭	১৯১১	শহিদ ছলেমান সর্দার	মৃত ইসমাইল সর্দার	বুড়িয়ারডাঙ্গা
১৮	১৯১২	শহিদ শেখ হরমুজ আলী	মৃত শেখ এখলাছ উদ্দিন	পায়গ্রাম
১৯	১৯১৩	শহিদ কামরুল ইসলাম	গোলাম আকবর সরদার	শ্রীকণ্ঠপুর
২০	১৯১৪	শহিদ শংকর কুমার অধিকারী	অনীল কুমার অধিকারী	ভবানীপুর
২১	১৯১৫	শহিদ আঃ মালেক	মোঃ ছায়েদ আলী মোড়ল	শ্রীকণ্ঠপুর
২২	১৯১৬	শহিদ তালেব মোড়ল	ফরিদ উদ্দিন মোড়ল	বাকা
২৩	১৯১৭	শহিদ এনায়েত আলী	মানিক মোড়ল	বাকা
২৪	১৯১৮	শহিদ আইন উদ্দিন গাজী	মৃত নাজিম উদ্দিন গাজী	শ্রীকণ্ঠপুর
২৫	১৯১৯	শহিদ নারায়ন কুমার হোড়	মৃত সতীশ চন্দ্র হোড়	হরিসাদকাটি
২৬	১৯২০	শহিদ নওশের আলী	মোঃ নজির হোসেন শেখ	চরকোদলা
২৭	১৯২১	শহিদ সরফরাজ উদ্দিন	মৃত সাদাইমানি মোল্লা	তেরখাদা
২৮	১৯২২	শহিদ নজরুল ইসলাম	মৃত বাবর আলী কারিকর	সাতবাড়ীয়া
২৯	১৯২৩	শহিদ গিয়াস উদ্দিন	মৃত মসলেম উদ্দিন প্রমানিক	ভবানীপুর

তালিকার নাম: সশস্ত্র বাহিনী শহিদ গেজেট

ক্র. নং	ক্র. নং/ গেজেট নং	মুক্তিযোদ্ধার নাম	মুক্তিযোদ্ধার পিতার নাম	গ্রাম	ডাকঘর/ ইউনিয়ন	উপজেলা/ থানা	জেলা/ মহানগর
১	৪০০	শহিদ শহিদুল ইসলাম	মরহুম আব্দুল গণি মৃধা	ধানখালী	পাকগননী	তেরখাদা	খুলনা
২	৪০১	শহিদ সরদার আবু তাহের	ইউসুফ সরদার	বারাসাত	পাক বারাসাত	তেরখাদা	খুলনা
৩	৪০২	শহিদ ইমরুল কায়েস	খলিলুর রহমান	জুনারী	জুনারী	তেরখাদা	খুলনা
৪	৪০৩	শহিদ আব্দুর কাদের	মরহুম শেখ আব্দুল লতিফ	মেলেক পুরাইকাটি	গদাইপুর	পাইকগাছা	খুলনা
৫	৪০৪	শহিদ সোলায়মান খান	মোঃ আছালত আলী খান	বালিয়া ডাঙা	শাহ আউলিয়া বাগ	অন্যান্য	খুলনা
৬	৪০৫	শহিদ এ বি এম সামছুর রহমান	আব্দুল রশিদ	৩৮ টুথপাড়া সেন্ট্রাল রোড	খুলনা	অন্যান্য	খুলনা
৭	৪০৬	শহিদ খাদেম সর্দার		ইস্টার্ণ স মিল	২নং কাস্টম ঘাট	অন্যান্য	খুলনা
৮	৪০৭	শহিদ আব্দুল ওয়াদুদ খান	আব্দুল আজিজ খান	গোলনা	সাজিয়াড়া	ডুমুরিয়া	খুলনা
৯	৪০৮	শহিদ আবুল হোসেন	মরহুম মোদাছের হোসেন	খলসী	সাজিয়াড়া	ডুমুরিয়া	খুলনা

তালিকার নাম: শহিদ বিজিবি গেজেট

ক্র. নং	ক্র. নং/ গেজেট নং	মুক্তিযোদ্ধার নাম	মুক্তিযোদ্ধার পিতার নাম	গ্রাম	ডাকঘর/ ইউনিয়ন
১	২৩৬	শহিদ দেলোয়ার হোসেন	মৃত সৈয়দ ইজাহারুল হক	সেনহাটি	সেনহাটি
২	২৩৭	শহিদ খান মকসুদ আলী	মৃত মৌলবি আরমান আলী খান	খায়রাবাদ	খায়রাবাদ
৩	২৩৮	শহিদ আব্দুল হক	মৃত ইদ্রিস আলী	বাসা নং এন সি-৫, রোড নং ১৬, ৫ম তলা	পিপলস গেটের সামনে ভাই ভাই স্টোর
৪	২৩৯	শহিদ আফতাব আহমেদ	ফাতেহ হোসেন খান	প্লট নং-৭, রোড নং-১৩	ইস্ট সাউথ হাউজিং স্টেট

তালিকার নাম: শহিদ পুলিশ গেজেট

ক্র. নং	ক্র. নং/ গেজেট নং	মুক্তিযোদ্ধার নাম	মুক্তিযোদ্ধার পিতার নাম	গ্রাম	ডাকঘর/ ইউনিয়ন	উপজেলা/ থানা	জেলা/ মহানগর
১	৬৬	শহিদ মোসলেম আলী	আঃ করিম সিকদার	চালিতাবুনিয়া	মুরাদগঞ্জ	অন্যান্য	খুলনা
২	১৮৭	শহিদ শেখ সামছুর রহমান	মৃত ইসমাইল শেখ	টুটপাড়া মেইন রোড	খুলনা	অন্যান্য	খুলনা
৩	১৯৫	শহিদ শেখ সোহরাব হোসেন	মৃত ছাদেক আলী	পায়গ্রাম	ফুলতলা	ফুলতলা	খুলনা
৪	১৯৯	শহিদ এ বি এম মাহবুব আলী	মৃত আঃ আজিজ মিয়া	১৪, শামসুর রহমান রোড়	খুলনা	অন্যান্য	খুলনা
৫	২১৬	শহিদ আঃ গফুর	মৃত হেছর উদ্দিন	বুড়িয়ার ডাঙ্গা	ফুলতলা	ফুলতলা	খুলনা
৬	২২১	শহিদ মোঃ আবুল খায়ের	মৃত লাল মোহাম্মদ	বারাসাত	পাক পারাসাত	তেরখাদা	খুলনা
৭	২২৫	শহিদ মোঃ মোজাম আলী	মৃত ওয়াজেদ আলী বিশ্বাস	কৃষ্ণনগর	দেবদুয়ার	পাইকগাছা	খুলনা
৮	২৫৩	শহিদ মোঃ হরমুজ আলী	মৃত এখলাচ আল	পায়গ্রাম কসবচা	বেজেরডাংগা	ফুলতলা	খুলনা

ক্র. নং	ক্র. নং/ গেজেট নং	মুক্তিযোদ্ধার নাম	মুক্তিযোদ্ধার পিতার নাম	গ্রাম	ডাকঘর/ ইউনিয়ন	উপজেলা/ থানা	জেলা/ মহানগর
			শেখ				
৯	২৭৭	শহিদ আমজাদ হোসেন	মৃত এমকে জাবেদ আলী	বারাসাত	বারাসাত	দিঘলিয়া	খুলনা
১০	২৭৮	শফি উদ্দিন	মৃত আবুল কাশেম	চন্দনী মহল	চন্দনী মহল	দিঘলিয়া	খুলনা
১১	২৯৬	শহিদ কাজী মহিউদ্দিন	মৃত কাজী মনির উদ্দিন	যুগনীপাশা		ফুলতলা	খুলনা

বাঙালির মুক্তির আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকে অম্লান করে রাখতে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসকে স্মরণীয় রাখার প্রয়াস হিসেবে খুলনার শহিদ হাদিস পার্কে নির্মিত হয় শহিদমিনার। স্বাধীনতা সংগ্রামে শহিদদের স্মৃতিকে ধরে রাখতে ১৯৯৫ সালে নির্মিত হয় গল্লামারী স্মৃতিসৌধ। ১৯৯৫ সালে গঠন করা হয় 'মুক্তি সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ গবেষণা ফাউন্ডেশন'। মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য 'দুর্জয়-৭১' স্থাপিত হয় ১৯৯৫ সালে ৩১ ডিসেম্বর। এই ভাস্কর্য নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধা শেখ আব্দুল কাইয়ুম। বিভাগীয় শহর খুলনার শহিদ হাদিস পার্কে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক হিসেবে 'দুর্জয়-৭১' স্থাপন ছিল গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। কারণ এটিই ছিল খুলনার প্রথম স্বাধীনতা ভাস্কর্য। তারপর ১৯৯৭ সালে 'বীর বাঙালি' নামে মুক্তিযুদ্ধের আরেকটি ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়। তা ছাড়াও অফিসার্স ক্লাবের ম্যুরাল চিত্র, স্বাধীনতা চত্বর, স্বাধীনতার রক্ত সিঁড়ি, অর্জন প্রভৃতি খুলনা জেলার গুরুত্বপূর্ণ মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য হিসেবে পরিচিত।[৫০]

[৫০] ড. শেখ গাউস মিঞা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯২-৪০০।

অধ্যায়-১৬

খাদ্য ও পুষ্টি

২০১১ সালে খুলনার জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২৩,১৮,৫২৭ জন। খুলনার গ্রামাঞ্চলের ৪৭% এবং শহরাঞ্চলের ৪৩% মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে।[১] আবার পরিবারের প্রধান আয় উপার্জনকারী জনসংখ্যার ৩৭% অশিক্ষিত এবং মাত্র ২২% মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপন করেছে।[২]

খুলনা চিংড়ির শহর নামে পরিচিত, কারণ বাংলাদেশের রফতানিকৃত চিংড়ির তিন-চতুর্থাংশই বৃহত্তর খুলনা এলাকায় চাষাবাদ করা হয়। সাম্প্রতিক উপাত্ত অনুযায়ী খুলনার অধিকাংশ অধিবাসী জীবিকা চিংড়ি ও মৎস্য চাষের ওপর নির্ভরশীল। ভূমির অধিকাংশ জায়গাজুড়েই রয়েছে চিংড়ি ও মৎস্য খামারগুলো। এই অঞ্চলে লবণাক্ততা ও গোচারণ ভূমির স্বল্পতার দরুন গবাদি পশুর সংখ্যা কম। মাটিতে লবণাক্ততার কারণে ফসল উৎপাদন কম হওয়ায় খুলনা জেলার মানুষ খুলনার উত্তরাঞ্চল ও বাংলাদেশের অন্য অঞ্চল থেকে চাল আমদানি করে থাকে। তবে বর্ষাকালের কিছু সময় ছাড়া খুলনার বাজারে খাদ্যপণ্যের প্রাচুর্য থাকে।[৩]

খাদ্যের উৎস

খুলনার জনগণ তাদের খাদ্যশক্তি জোগানোর ক্ষেত্রে অধিকাংশই বাজার থেকে ক্রয়কৃত খাদ্যের ওপর নির্ভর করে থাকে। তবে দরিদ্র এবং সম্পদহীন জনগণ অন্যান্য উৎস যেমন- শ্রম বিনিময়, ভালনারেবল ফিডিং প্রোগ্রাম, নিজস্ব মৎস্য খামার ও উন্মুক্ত জলাশয় থেকেও খাদ্য সংগ্রহ করে থাকে। বাজার থেকে সাধারণত যেসব পণ্য ক্রয় করা হয় তার মধ্যে চাল, ডাল, ভোজ্যতেল, গোল আলু এবং শাকসবজি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কিছু মাছ, মাংস ও চিনিও ক্রয় করে থাকে। অধিকাংশ অধিবাসীই তাদের ক্যালোরির ৮০-৮৫% ভাত থেকে পূরণ করে। এ কারণে খুলনার অধিবাসীদেরকে বাজারদর ওঠানামা এবং মৌসুমি খাদ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। তবে কেউ কেউ হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশু পালন করেন এবং তা থেকে ডিম, দুধ ও মাংসের জোগান হয়। কিন্তু এ ধরনের লোকের সংখ্যা খুবই কম। ভাতের পাশাপাশি ফলমূল, মাছ মাংস ইত্যাদি থেকে পুষ্টির জোগার হয়।

---

[১] United Nations Development Programme, (2011). *Human Development Report 2011 Sustainability and Equity: A Better Future for All*. Last accessed 21st January 2013.

[2] Helen Keller International, (2011). *State of Food Security & Nutrition in Bangladesh 2011.*

[3] FEG Consulting and Save the Children (2008). *The Practitioners' Guide to the Household Economy Approach.* Regional Hunger and Vulnerability Programee. Johannesburg.

খাদ্যের প্রধান উৎস দানাদার খাদ্য, আলু, ডাল, প্রাণিজ প্রোটিনের মধ্যে মাছ, মাংস ও ডিম, শাকসবজি, ফল, দুধ, চিনি, তেল অথবা চর্বি এবং মশলা। এই খাদ্য উৎসের মধ্যে খুলনার জনগণ প্রতিদিন কী ধরনের খাবার গ্রহণ করে তা সারণির মাধ্যমে প্রদত্ত হলো: (০-৭ মাত্রা দেওয়া হয়েছে)। ০ দ্বারা কখনও খাওয়া হয় না এবং ৭ দ্বারা বেশি পরিমাণে খাওয়া হয় বোঝানো হয়েছে। প্রত্যেক খাদ্য উৎসের ক্ষেত্রে একটা মাত্রা/ওজন দেওয়া হয়েছে।)[8]

সারণি-১৩৩

খাদ্যের প্রকার ও গ্রহণ মাত্রা

ক্রমিক নং	খাদ্যের প্রকার	খাদ্যের উৎস	মাত্রা
০১ ০২	দানাদার শস্য : চাল, আটা, ভাত, রুটি মূলজাতীয় খাবার ও গোল আলু, মিষ্টি আলু, কলা	প্রধান খাবার	০২
০৩	ডাল জাতীয় : বাদাম, শিম	ডাল জাতীয়	০৩
০৪	শাকসবজি : সবুজ শাকসবজি, ডগা	সবজি জাতীয়	০১
০৫	ফলমূল	ফলজাতীয়	০১
০৬	প্রানিজ প্রোটিন : মাছ, মাংস, ডিম	মাছ, মাংস	০৪
০৭	দুধ ও দুগ্ধ জাতীয়	দুধ	০৪
০৮	তেল ও চর্বি	তেল জাতীয়	০.৫
০৯	চিনি	চিনি	০.৫
১০	আচার, চাটনি, মশলা	মশলা জাতীয়	০০

সূত্র: বিশ্ব খাদ্য সংস্থা, ২০০৭।

খাদ্যাভ্যাস খুলনার জনগণ সাধারণত প্রতিদিন তিন বেলা খাবার গ্রহণ করে থাকে। শহরে ও গ্রামীণ শিক্ষিত ও সচ্ছল পরিবার সকালে নাস্তা ও দুপুর এবং রাতে ভাত খেয়ে থাকে। গ্রামীণ সাধারণ পরিবারে তিন বেলায়ই ভাত খাওয়া হয়। প্রায় সব খাদ্যেই তারা নারকেল ব্যবহার করে যেমন- ডিম, মাংস, চিংড়ি এমনকি বিভিন্ন ধরনের শাকেও তারা নারকেল ব্যবহার করে। ভাতই এ এলাকার মানুষের প্রধান খাদ্য। ভাতের পর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মাছ, মাংস, ডাল জাতীয় প্রোটিন খাদ্য। খুলনায় মাছ সুলভ। নদনদী, বিল, ঘের, জলাশয় পুকুর ইত্যাদিতে প্রাকৃতিক ও চাষ করা মাছের প্রচুর জোগান খুলনায়। পাশাপাশি বিভিন্ন মৌসুমি তরিতরকারি শাকসবজি এবং ফলফলাদি মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রথাগতভাবে এসব খাবারের পাশাপাশি বর্তমানে প্রচলিত ফাস্ট ফুডও যুক্ত হয়েছে।

খুলনার জলবায়ু ও মাটি সারা বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের শস্য উৎপাদনের উপযোগী। শস্য উৎপাদনের এ উপযোগিতায় জেলার ভূমিরূপ, জলবায়ু, সাহসী জনগণের দক্ষভাবে দুর্যোগের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা ও নব উদ্ভাবিত

---

[8] *Ibid*, 2012.

কৌশল ব্যবহারের অবদান রয়েছে। খুলনায় গ্রীষ্মকালীন ফসলের চেয়ে শীতকালীন ফসল বেশি উৎপাদিত হয়। তবে সম্প্রতি দানাদার শস্য বিশেষ করে ধান ও গম উৎপাদনের প্রতি এবং চিংড়ি চাষের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করায় ফসল উৎপাদনে ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হয়।

'মাছে ভাতে বাঙ্গালি' এ প্রবাদটি বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত। মাছ প্রোটিন ও অন্যান্য জৈব পদার্থের অন্যতম উৎস। গত কয়েক বছরে খুলনা জেলায় মাছের উৎপাদন ধীরগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। বার্ষিক বৃদ্ধির হার অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু অভ্যন্তরীণ প্রাকৃতিক মৎস্য সংগ্রহের পরিমাণ কমেছে।

খুলনায় উৎপাদিত বন্য উদ্ভিদ ও শাকসবজি

খুলনায় বিভিন্ন ধরনের বন্য উদ্ভিদ ও সবজি খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এসব সবজির বাংলা ও ইংরেজি নাম উপস্থাপিত হলো। এক্ষেত্রে খুলনার অধিবাসীরা খায় এমন ১৪ ধরনের উদ্ভিদ ও সবজির নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি - ১৩৪

খুলনায় উৎপাদিত বন্য উদ্ভিদ ও সবজি

বন্য উদ্ভিদ যা সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়		
ক্রমিক নং	স্থানীয় নাম	ইংরেজি নাম
০১	থানকুনি	ইন্ডিয়ান পেনিওর্ট
০২	আমরুল শাক	উড সোরেল
০৩	হেলেঞ্চা	মার্শ হার্ব
০৪	মালঞ্চ	মালঞ্চ
০৫	তেলাকুচা	আইভি গোর্ড
০৬	পিপুল শাক	লঙ পিপার
০৭	কচু শাক	অ্যারোইডস
০৮	বথুয়া শাক	জুজ ফুট
০৯	নটে শাক	লিফ/সেন্টনডার আমারনথ
১০	ঢেঁকি শাক	ফার্ন
১১	নুনে শাক	গার্ডেন পার্সলেন
১২	টক পালং	সোরেল
১৩	শাপলা	ওয়াটার লিলি
১৪	পদ্ম	লোটাস

উৎস: রাও (২০০৪), সাইফুল্লাহ ও অন্যান্য (২০১০), বিআরআরআই (২০১২)।

খুলনায় প্রাপ্ত খাদ্যের ধরন

খুলনার জনগণের প্রধান খাদ্য ভাত ও রুটি। রুটি জাতীয় খাবারের মধ্যে লুচি, পরোটা, বাখরখানি, নানরুটি, চিতই পিঠা উল্লেখযোগ্য। রুটির সাথে সাধারণত মুরগির মাংস, গোরুর মাংস, খাসির মাংস, ডাল, সবজি এবং ভাতের সাথে সাধারণত মাছ, মুরগি, গোরুর মাংস, ডাল, ডিম ও সবজি খাওয়া হয়। মাংসের

মধ্যে সাধারণত খুলনার বিখ্যাত চুই ঝাল দেওয়া হয়। খুলনার জনপ্রিয় শাকের মধ্যে ঘি কাঞ্চন উল্লেখযোগ্য। কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানে (যেমন-বিবাহ বা অন্য অনুষ্ঠানে) বিশেষ করে শহরাঞ্চলের অধিবাসীরা বিরিয়ানি, দধি ও মিষ্টি বোরহানি পরিবেশন করে থাকে। গ্রামের অনুষ্ঠানে সাধারণত ভাত, মুরগি বা গোরুর মাংসের সাথে ডিম, ডাল, মিষ্টি ও দই দেওয়া হয়। বড়ো বড়ো হোটেল রেস্টুরেন্টে পশ্চিমা খাবারও পাওয়া যায়।

বিশেষ খাদ্য **চাটনি/আচার:** খুলনায় টক জাতীয় ফল যেমন কাঁচা আম, তেঁতুল, বরই, জলপাই, আমড়া ইত্যাদি দ্বারা আচার তৈরি করা হয়। আচার তৈরিতে সরিষার তেল ও খাবার সাদা সিরকা ও পাঁচফোড়ন ব্যবহৃত হয়।

মিষ্টান্ন: খুলনায় সাধারণ মিষ্টি, দই, হালুয়া এবং ডিম, গাজর, সুজি, ময়দা (নারকেল ও পেস্তা বাদাম দিয়ে) দ্বারা তৈরি খাবার মিষ্টান্ন হিসেবে খাওয়া হয়। নিচে খুলনার জনপ্রিয় মিষ্টান্ন খাবারের তালিকা উল্লেখ করা হলো:

রসগোল্লা: ছানা ও চিনির সিরকা দিয়ে তৈরি এক প্রকার গোল মিষ্টি যা প্রায় সবাই খায়।

সন্দেশ: দুধ ও চিনি দিয়ে তৈরি সন্দেশ এ এলাকার মানুষের অত্যন্ত প্রিয় খাবার।

সেমাই: ময়দার তৈরি শলাকার মতো সেমাই দুধ, চিনি, বাদাম ও কিচমিচ দিয়ে রান্না হয়। এটি ঈদের অনুষ্ঠানে একটি বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয় খাবার।

জিলাপি ও ছানার জিলাপি: বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সাধারণত গ্রামে জিলাপি মিষ্টান্ন হিসেবে দেওয়া হয়।
রসমালাই: দুধের তৈরি ছোটো ধরনের রসগোল্লা যা দই বা দুধের সরে ডোবানো থাকে।

খাজা: খুব মিষ্টি যা ময়দা, ঘি ও চিনি দ্বারা তৈরি।

মোয়া: গুড় ও মুড়ি বা চিড়া দিয়ে তৈরি মোয়া খুলনার মানুষের খুব প্রিয়।

দই: দুধ চিনি ও ব্যাকটেরিয়া দ্বারা তৈরি দই সাধারণত যে, কোনো অনুষ্ঠানের শেষে পরিবেশন করা হয়।

ফিরনি বা ক্ষীর: মুসলমানদের ঈদের অনুষ্ঠানে এটি বেশি খাওয়া হয়। কালোজিরা চালের সাথে ঘন দুধ এবং চিনি বা গুড় দিয়ে তৈরি ফিরনি বা ক্ষীর খুলনার জনপ্রিয় একটি মিষ্টান্ন।
জর্দা: প্রাকৃতিক রং মিশিয়ে চাল, ঘি ও চিনি দিয়ে তৈরি হয় জর্দা।

চমচম: ডিম্বাকৃতির মিষ্টান্ন যা রসগোল্লার চেয়েও মিষ্টি।

অন্যান্য মিষ্টান্নর মধ্যে কালোজাম, ছানা, হাওয়াই মিঠাই ও মালপোয়াও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নাড়ু: নারকেল গুড় বা চিনি দিয়ে তৈরি নাড়ু। সাধারণত হিন্দুরা তাদের পূজার সময় তৈরি করে থাকে।

পিঠা: খুলনায় ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন ধরনের পিঠা তৈরি হয়। এতে সাধারণত চালের গুড়া, নারকেল, খেজুর/তালের রস বা গুড় ব্যবহার করা হয়। শীতকালের চিতই ও ভাপাপিঠা খুবই জনপ্রিয়। তেলে ভাজা পিঠার মধ্যে পান পিঠা বা তেলে পিঠা খুবই জনপ্রিয়। চালের গুড়ার খামি করে মেশিনে তৈরি সেমাই পিঠা এই এলাকার জনপ্রিয় খাবার। সেমাই পিঠার সাথে মুরগির/মোরগের মাংস দ্বারা সাধারণত মেহমানদারি করা হয়। এছাড়া পাটিসাপটা, পাকোনো, পুলি ও ধুপি উল্লেখযোগ্য পিঠা।

পানীয় : খুলনার জনপ্রিয় পানীয় হচ্ছে খেজুরের রস, আখের রস, আখের গুড়ের শরবত, ডাবের পানি, ঘোল, বোরহানি, মালাই, চা, লাচ্ছি, ফালুদা, আমের জুস/শরবত, তরমুজের জুস/শরবত, বেলের শরবত ইত্যাদি। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে এসব পানীয় খুবই জনপ্রিয়।

নাস্তা : খুলনার অধিবাসীরা বিশেষ করে শহরাঞ্চলে বেলা ১১-১২ টায় ও সন্ধ্যায় নাস্তা করে থাকে। এছাড়া গ্রামে সাধারণত মেহমানদের আপ্যায়নের জন্য নাস্তা দিয়ে থাকে।

উৎসব অনুষ্ঠানের খাদ্যরীতি

বাংলাদেশের সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো বিভিন্ন উৎসব উদযাপন। খুলনা জেলায় ব্যাপকভাবে উদযাপিত কয়েকটি প্রধান উৎসব হলো পহেলা বৈশাখ, স্বাধীনতা দিবস, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, মহররম, দুর্গাপূজা, বড়োদিন, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, সরস্বতী পূজা ইত্যাদি।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সাধ্য অনুযায়ী অতিথিদের আপ্যায়ন করা হয়ে থাকে। বিবাহ অনুষ্ঠানসমূহে সাধারণত বিরিয়ানি সরবরাহ করা হয়। কখনও কখনও বিরিয়ানির বদলে খাবার সরবরাহ করা হয়।

ঈদুলফিতর

মুসলিম জনগোষ্ঠীর বড়ো একটি ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর। ঈদের নামাজের পর লোকজন ঘরে ফিরে আসে, একে অন্যের বাড়িতে বেড়াতে যায়। ফিতর উদযাপনে রোস্ট/পোলাও, পোলাও বিরিয়ানি ইত্যাদি খাবার দিয়ে তাদের আপ্যায়ন করা হয়। খুলনা জেলার গ্রামাঞ্চলে অত্যন্ত আনন্দ ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে ঈদ-উৎসব পালিত হয়।

ঈদুজজোহা

মুসলমানদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব ঈদুজজোহা। ঈদের দিন সকালে নামাজের পর সামর্থ্য অনুযায়ী লোকজন তাদের পছন্দের পশু কোরবানি দিয়ে থাকে এবং কোরবানির মাংস আত্মীয়স্বজন ও ধনী-গরিব সবার মাঝে বিলিয়ে

দেওয়া হয়। খুলনায় দেশের অন্যান্য এলাকার মতোই ঈদ উৎসব পালন করা হয়।

বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখ বাংলা পঞ্জিকার প্রথম দিন। এই দিন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মেলার আয়োজন করা হয় যেখানে বিভিন্ন কৃষিজ দ্রব্য, হস্তশিল্প সামগ্রী, খেলনা, প্রসাধনী ইত্যাদি এবং বিভিন্ন ধরনের খাবার ও মিষ্টি বিক্রয় করা হয়। যে, কোনো জনসমাগম এবং মেলায় বিভিন্ন ধরনের বাঙালি খাবার পিঠা এবং মিষ্টির উপস্থিতি সর্বদাই থাকে।

দুর্গাপূজা দুর্গাপূজা বাংলাদেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম প্রধান উৎসব যা দেশের সকল এলাকায় পালিত হয়। প্রায় ৯ দিন ধরে এ উৎসব পালিত হয়। পূজা উদযাপনের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থাৎ গ্রাম, শহর, নগর, বন্দর প্রভৃতি জায়গায় পূজামণ্ডপ তৈরি করা হয়। দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানেও বিভিন্ন ধরনের খাবার পরিবেশন করা হয়।

বড়দিন ও বৌদ্ধ পূর্ণিমা উৎসব খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড়ো উৎসব পালিত হয় যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন অর্থাৎ ২৫ ডিসেম্বর। এ উৎসবেও বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু খাবার পরিবেশিত হয়। বৌদ্ধ পূর্ণিমা বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। এ দিনও মজাদার খাবার পরিবেশিত হয়।

ডালসমূহ মসুর, মুগ, মাশকলাই, ছোলা, খেসারি, অড়হর, মটর ইত্যাদি ডাল হিসেবে পরিচিত। ছোলা ব্যতীত প্রায় সবগুলোই সুপ (ডাল) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ছোলা সাধারণত নাস্তার জন্য আস্ত সিদ্ধ খাওয়া হয় কিংবা প্রক্রিয়াজাত করে বেসন তৈরি করে নানাধরনের খাদ্য তৈরি করা হয়।

রান্নায় মশলার ব্যবহার মরিচ, মরিচের গুঁড়া, তেজপাতা, জিরার গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া, পাঁচফোড়ন, ধনিয়া গুঁড়া এবং সরিষা খুলনার প্রধান মশলা। সরিষার তেলসহ অন্যান্য উদ্ভিজ্জ তেলসমূহ খুলনার রন্ধনশালায় প্রাথমিক মাধ্যম, যদিও খাদ্যের ধরন অনুযায়ী কখনও কখনও ঘি ব্যবহৃত হয়। রান্নায় সাধারণ উপাদান হিসেবে রসুন, পেঁয়াজ, আদা, হলুদ, সেফরন, ঘি, ধনিয়া, জিরা, দারুচিনি, তেজপাতা এবং মরিচ বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। সবজি এবং মাছ রান্নায় পাঁচফোড়ন একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। আস্ত সাদা/কালো সরিষা কিংবা সরিষার পেস্টের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। খুলনায় লবণাক্ত পানির মাছ কিংবা সামুদ্রিক মাছ বিখ্যাত। চুঁই ঝাল এ অঞ্চলের রান্নায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ অঞ্চলের চুঁই গাছের কাণ্ড ও মূলের ছাল ছাড়িয়ে ছোটো ছোটো টুকরা করে মাছ কিংবা মাংস রান্নায় ব্যবহার করে, বিশেষত খাসি গোরুর স্ন্যাকসের সঙ্গে সচ হিসেবে কাসুন্দির ব্যবহারও বহুবিধ। কখনও কখনও মাছ কিংবা সবজি রান্নাতেও কাসুন্দি যোগ করা হয়।

খুলনায় পুষ্টির বর্তমান অবস্থা

Bangladesh Bureau of Statistics-এর প্রতিবেদনমতে, যদিও প্রায় সকল প্রশাসনিক বিভাগগুলো শিশু অপুষ্টির শিকার, এই সূচকে বিভাগগুলোর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। কম ওজনবিশিষ্ট শিশুদের হার খুলনাতে ২৮.৫ শতাংশ যা সিলেটে ৩৯.৭ শতাংশ। এই হার থাকার পরও গত ৪ বছরে ধীরগতিতে ক্রনিক অপুষ্টির হার কমেছে। এদেশের শিশুরা ভিটামিন এ, লৌহ, আয়োডিন এবং জিংক-এর অপুষ্টির শিকার। খুলনার শিশুদের মধ্যে অ্যানিমিয়ার ব্যাপকতা উল্লেখযোগ্য।[৫]

উচ্চ মাত্রার অপুষ্টি বা ওয়াস্টিং (শিশুদের ওজন ও উচ্চতার জেড স্কোর<২) সাধারণত স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্টি উপাদানের হঠাৎ কমে যাওয়ার কারণে ঘটে। প্রয়োজনীয় ক্যালোরি ও পুষ্টির অভাবে, একটি ওয়াস্টেড শিশু আমিষ, খনিজ পদার্থ এবং শক্তির জন্য নিজের পেশি বিপাক করতে থাকে।

একটি অতিমাত্রার অপুষ্ট শিশুর মৃত্যুর ঝুঁকি একটি সুস্থ শিশুর তুলনায় ২০ গুণ বেশি। গ্লোবাল একিউট ম্যালনিউট্রিশন (GAM) এর ব্যাপকতা খুলনায় ১৩% যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে একটি মারাত্মক স্বাস্থ্যগত সমস্যা।[৭] এইচ কে আই (Helen Keller International) (২০১১) এর মতে GAM, এর খুলনার হার জাতীয় হার (১২%) এর চেয়ে বেশি। GAM এর হার শহর অঞ্চলে ৮ শতাংশ। এটি অনস্বীকার্য যে, মায়ের খাদ্য ঝুঁকি, সম্পদ এবং শিক্ষার অবস্থা শিশুদের উচ্চ মাত্রার অপুষ্টির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। ক্রনিক অপুষ্টি/স্টান্টিং (শিশুদের উচ্চতা ও বয়সের জেডস্কোর<২) এর ব্যাপকতা খুলনায় ৩৩ শতাংশ, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, একটি মারাত্মক নাগরিক স্বাস্থ্য সমস্যা।[৮] আশার কথা এই যে, এটি জাতীয় হার এবং অন্যান্য জেলাসমূহের স্টান্টিংয়ের হারের চেয়ে কম। স্টান্টিং এর ক্ষেত্রের পল্লি অঞ্চলের হার (৪১%) শহরে এলাকার (৩০%) তুলনায় বেশি।

শিশুদের ন্যায় মহিলারাও ব্যাপকভাবে অপুষ্টির শিকার যার তারতম্য বিভিন্ন বিভাগে পরিলক্ষিত হয়। বিএমআই<১৮ কেজি/বর্গমিটার এর ব্যাপকতা খুলনাতে ৪৭.৬% যা সিলেটে ৫৯.৬%। প্রজনন বয়স এবং গর্ভাবস্থায় ক্লিনিক্যাল ভিওডির প্রসারতাও লক্ষণীয়। খুলনায় ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের ভিটামিন এ টিকা খাওয়ানোর হার ৯১%; অর্থাৎ ধরে নেওয়া যেতে পারে এ ভিটামিনের কোনো অভাব নেই। তদুপরি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী গর্ভধারণের ৬ সপ্তাহের মধ্যে খুলনা এলাকায় ৩৪% মহিলাকে উচ্চ শক্তির/মাত্রার ভিটামিন এ ট্যাবলেট দেওয়া হয়।

---

[৫] Multiple Indicator Cluster Survey 2012-2013, Bangladesh Bureau of Statistics

[৭] World Health Organization, (1995). Physical status: *The use and interpretation of anthropometry*. WHO technical report series 854. Geneva.

[৮] Ibid

সাম্প্রতিক এক জরিপে জানা যায়, খুলনায় ৫৪% শিশু ও ৩৭% নারী রক্তস্বল্পতায় ভোগে, যা একটি মারাত্মক স্বাস্থ্যগত সমস্যা। এটা অনস্বীকার্য যে, মায়ের খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে শিশুর পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য সরাসরি জড়িত। বিএমআই অনুযায়ী খুলনায় গর্ভধারণ করেনি এমন নারীদের ২০% নিম্ন ওজনসম্পন্ন। লক্ষণীয় যে, গর্ভধারণ না করা নারীদের ৩৪% উচ্চ ওজনজনিত সমস্যায় আক্রান্ত। আরও উল্লেখ্য যে, সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিম্ন ওজনের মহিলাদের সংখ্যা হ্রাস পায় এবং উচ্চ ওজনসম্পন্ন মহিলাদের হার বৃদ্ধি পায়। উচ্চ ওজন ধারণকারী মহিলাদের সংখ্যা পল্লি অঞ্চলের তুলনায় শহর অঞ্চলে বেশি।

শিশুকে খাদ্য খাওয়ানো এবং শিশুর যত্ন

অতি সাম্প্রতিক এক জরিপ থেকে জানা যায়, খুলনায় ৯৮% শতাংশ শিশু মায়ের দুধ পান করে, মাত্র ৪৪% শিশু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী প্রথম ৬ মাস মায়ের দুধ পান করে। অর্থাৎ প্রায় ৫৬% শিশুকে মায়ের দুধের পরিবর্তে অন্য কিছু খাওয়া বা পানের জন্য দেওয়া হয় যা ডায়রিয়ার জন্য মারাত্মক একটি ঝুঁকি। অধিকন্তু শহর এলাকায় এই হার (৬১%) যা গ্রামীণ এলাকার (৪৯%) চেয়ে বেশি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী একটি বৈচিত্র্যময় খাদ্যসামগ্রীতে ৭টি গ্রুপের মধ্যে কমপক্ষে ৪টি গ্রুপের উপস্থিতি অত্যাবশ্যক। হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল-এর তথ্য অনুযায়ী খুলনা জেলায় স্বাভাবিক সময়ে খাদ্য প্রদানকৃত ৯৪% শিশুর মধ্যে মাত্র ১৩ শতাংশ শিশু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশকৃত খাদ্যসামগ্রী পেয়ে থাকে। এই তথ্য থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, এই অঞ্চলের শিশুরা তাদের বৃদ্ধি এবং বিকাশের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ও সঠিক মানের খাদ্য পায় না। উপরিউক্ত জরিপ থেকে আরও জানা যায় যে, যে সমস্ত মা মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করেছেন তারা তাদের সন্তানদের অশিক্ষিত মায়েদের তুলনায় বৈচিত্র্যময় খাবার প্রদান করেন।

পুষ্টি শিক্ষা ও পুষ্টি জ্ঞান

উন্নত পুষ্টিজ্ঞান স্বাস্থ্যাবস্থা বজায় রাখা এবং সুস্বাস্থ্য সাধনের সহায়ক যা রোগের সংক্রমণ থেকে রক্ষার করে মানুষকে স্বাস্থ্যবান থাকতে সহায়তা করে। খুলনা শহরে বসবাসকারী মানুষের পুষ্টিজ্ঞান অত্যন্ত কম এবং তারা মায়ের গর্ভকালীন এবং দুগ্ধদানকালীন স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য যেমন- মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, সবজি, এবং ফলমূল ইত্যাদি গ্রহণে অসচেতন।

পুষ্টি শিক্ষার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে এবং নিরবচ্ছিন্ন মায়ের দুধ খাওয়ানো ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যসামগ্রী তৈরিতে মানবাচরণের পরিবর্তন অতীব জরুরি। খুলনার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পুষ্টি শিক্ষা কার্যক্রম প্রায় নেই বললেই চলে। শুধু কেসিসি উইমেন্স কলেজে স্নাতক পর্যায়ে খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি একটি শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। এ ছাড়া খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান ডিসিপ্লিনে বিচ্ছিন্নভাবে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষা কার্যক্রম
কেসিসি উইমেন্স কলেজ	খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে ৪-বছর মেয়াদি স্নাতক কোর্স। প্রতিবছর ৬০ জন ছাত্রী ভর্তি করা হয়।
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (জীববিজ্ঞান স্কুল)	এগ্রোটেকনোলজি ডিসিপ্লিন, বায়োটেকনোলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিন ও ফার্মেসি ডিসিপ্লিনে যৎসামান্য।

বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ এ অঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন রকমের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়, যা অপরিমিত পানি পান এবং উচ্চমাত্রার লবণাক্ত, অনিরাপদ বা আর্সেনিকযুক্ত পানি পানের জন্য হয়ে থাকে। ঘন বসতিপূর্ণ খুলনা শহর এবং এর কয়েকটি উপজেলার বিশুদ্ধ পানি পানের প্রধান উৎস গভীর নলকূপ। কিন্তু বিশুদ্ধ পানীয়জলের অভাব গ্রীষ্মে প্রকট আকার ধারণ করে; কারণ ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়ায় প্রয়োজনীয় পানি গভীর নলকূপের সাহায্যে ওঠানো সম্ভব হয় না। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী জেলার পাঁচটি উপজেলায় ২০১২-২০১৩ সালে পানির স্তর ২১ ফুট নিচে নেমে গিয়েছে যা ২০১১ সালে ২৬ ফুট নিচে নেমে গিয়েছিল। কাজেই এই উপজেলাগুলোর অধিকাংশ অঞ্চলের মানুষকে পুকুরের পানির ওপর নির্ভর করতে হয় যা পানের অযোগ্য।

অপরিমিত বৃষ্টিপাত, নাব্যতার অভাব এবং অত্যধিক ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার পানির স্তর নেমে যাওয়ার অন্যতম কারণ। বিশুদ্ধ পানি পানের সুযোগের অভাব এবং পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগসুবিধার অভাব বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবনযাপনের উন্নতি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের পথে উল্লেখযোগ্য বাধা। অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে ভূগর্ভস্থ এবং ভূ-উপরিভাগের পানির লবণাক্ততা, অগভীর জলাধারের আর্সেনিক দূষণ, জলাধারের অভাব এবং লবণমুক্ত পানি আহরণের জটিলতা। এ সমস্ত নেতিবাচক বিষয়ের প্রভাব এবং জনস্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক হুমকি হিসেবে বিবেচিত।

খুলনা শহরে পানি সরবরাহের চিত্র

খুলনা ওয়াসা ভূ-গর্ভস্থ পানির উৎস থেকে ১০২ এমএলডি পানি সরবরাহ করে; যার মধ্যে ৪২ এমএলডি পানি গভীর নলকূপ ব্যবহার করে উৎপন্ন করে এবং পাইপ লাইনের মাধ্যমে ১৬,৯০০ পরিবারের মধ্যে বিতরণ করে। অন্য ৬০ এমএলডি পানি উৎপন্ন হয় নিকটস্থ ১০,০০০ হস্ত চালিত নলকূপের মাধ্যমে (৪০০০ গভীর এবং ৬০০০ অগভীর) যা নগরীর বিভিন্ন সাধারণ অংশে অবস্থিত। বর্তমানে ১১০ এমএলডি ভূপৃষ্ঠের পানি সরবরাহের একটি বড়ো প্রকল্পের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

খুলনা মহানগরীর ৪৫ হাজার বাড়িতে নতুন করে পানির সংযোগ দিচ্ছে ওয়াসা। পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় গত ১০ ডিসেম্বর থেকে বিনামূল্যে এই সংযোগ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে দুই হাজার ৭০০ গ্রাহককে সংযোগ দেওয়া

হয়েছে। চলতি বছরের ডিসেম্বর নাগাদ গ্রাহকরা এই নতুন লাইনে পানি পাবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। ওয়াসা সূত্রে জানা গেছে, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের হিসাব অনুযায়ী নগরীতে হোল্ডিং বা বাড়ির সংখ্যা ৬৬ হাজার ৪৬৯। এর বিপরীতে ওয়াসার গ্রাহক আছে মাত্র সাড়ে ১৭ হাজার। নগরীর শতভাগ গ্রাহককে ওয়াসার পানি পৌঁছে দিতে নতুন করে সংযোগ প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

অধ্যায়-১৭

দুর্যোগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পুনর্বাসন

ভৌগোলিকভাবে দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলা করে এদেশের মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এতে বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে। দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত খুলনা এমন একটি ঝুঁকিপুর্ণ জেলা যেখানে প্রায়শ আঘাত হানছে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যা। পাশাপাশি নদীভাঙন, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতার মতো মারাত্মক আপদ অহরহ ঘটে আসছে। এছাড়াও অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, টর্নেডো, কালবৈশাখি, ফসলে পোকার আক্রমণ, চিংড়ি ভাইরাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মানবসৃষ্ট বিভিন্ন প্রকারের আপদ যেমন ইটভাটার সংখ্যা বৃদ্ধি, অগ্নিকাণ্ড, বাঁধ কাটা, অতিমাত্রায় ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনজনিত মাটি ও পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, বন উজাড় ও পরিবেশদূষণ ইত্যাদি খুলনা ভূখণ্ডকে চরম ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে।

দুর্যোগ

খুলনা অঞ্চল অতীতে বিভিন্ন সময়ে দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি দুর্যোগের শিকার হয়েছে। এগুলো হলো-[১]

দুর্ভিক্ষ

সমুদ্র সান্নিধ্যের কারণে কৃষি জমিতে লবণ পানির প্রবেশ, ঘূর্ণিঝড়, খরা, অনাবৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপে ফসলহানি ও কর্মজীবী মানুষের কর্মহীনতা ইত্যাদি কারণে খুলনা অঞ্চল ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে দুর্ভিক্ষপীড়িত হয়েছে। এ এলাকায় ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য কিছু দুর্ভিক্ষ হলো :

দুর্ভিক্ষ (১৭৬৯-৭০)

১৭৬৯-৭০ সালে তৎকালীন খুলনা জেলায় মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সে সময়ে টাকায় ১০ সের চাল বিক্রি হতো। (টাকার মূল্যমান অনেক বেশি ছিল)

দুর্ভিক্ষ (১৮৯৭)

১৮৯৫ সালের জলোচ্ছ্বাসে খুলনার উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ত পানি প্রবেশ করে। পরবর্তী বছরে মৌসুমি বৃষ্টিপাত কম হয় ফলে লবণ পানি ধুয়ে যেতে না পারায় আমন ধানের উৎপাদন ব্যাহত হয়। আগের বছরের জলোচ্ছ্বাসজনিত খাদ্যঘাটতির সাথে এই ফসলহানি যোগ হওয়ায় ১৮৯৭ সালে পাইকগাছা থানার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তৎকালীন কালেক্টর মি. ডব্লুউ এইচ ভিনসেন্ট প্রদত্ত দুর্ভিক্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণমতে এই তথ্য পাওয়া যায়।

দুর্ভিক্ষ (১৯২১)

১৯২০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে জেলার ফসলাদি বিনষ্ট হয় এবং বেড়ি বাঁধ ভেঙে আবাদি জমিতে লোনাপানি প্রবেশ করে। এরপর ১৯২১ সালে খরার দরুন দুবার ফসলহানি ঘটে। এ জন্য জেলায় প্রকট খাদ্যাভাব দেখা দেয়। সরকারিভাবে

[১] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ- ৩০-৩৬ এবং জেলা প্রশাসন কার্যালয়, খুলনা।

দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করা না হলেও প্রায় আট মাস পর্যন্ত খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য ত্রাণসামগ্রী সরবরাহ করতে হয়।

দুর্ভিক্ষ (১৯৪৩) ১৯৪২ সালে জেলার ওপর দিয়ে এক মারাত্মক সাইক্লোন বয়ে যায়। এতে জেলায় ব্যাপক শস্যহানি ঘটে। ফলে ১৯৪৩ সালে জেলায় খাদ্যঘাটতি দেখা দেয়। এ সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। জাপান বার্মা দখল করে এবং জাপানি সৈন্যবাহিনী চট্টগ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থান গ্রহণ করে। অন্যদিকে আসামের পার্বত্য অঞ্চলেও যুদ্ধ চলে, এর ফলে দেশের সকল যানবাহন ও প্রশাসন যুদ্ধসংক্রান্ত কাজে ব্যস্ত থাকায় খাদ্য আমদানি করা সম্ভব হয়নি। তা ছাড়া কৃষিকাজ অপেক্ষা সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন কাজকর্মে অধিক মজুরি পাওয়া যেত বলে বহু শ্রমিক কৃষিকাজ ছেড়ে সামরিক বাহিনীর নানা কাজে শ্রমিক হিসেবে যোগদান করে। এসব কারণে ১৯৪৩ সালে (বাংলা ১৩৫০ সনে) এ জেলাসহ সমস্ত বাংলাদেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং একই সময়ে কলেরা ও বসন্তের প্রকোপে সমগ্র দেশে বিশ থেকে পঁচিশ লাখ লোকের প্রাণহানি ঘটে। সে সময় চালের মূল্য ২০ টাকা হতে ৮০ টাকায় ওঠে। এ দুর্ভিক্ষে খুলনা জেলার প্রায় ৩% লোক মারা যায়।

বন্যা খুলনা জেলা মূলত পদ্মা নদীর অববাহিকায় অবস্থিত। শতবর্ষ আগে গঙ্গা নদীর পানির প্রায় সবটাই জেলার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হতো। পরবর্তীকালে নদী আরও পূর্বদিকে সরে যায়। বিভিন্ন সময়ে পদ্মা নদীর স্ফীতির কারণে জেলায় বন্যা দেখা দেয়। তবে সাগর সান্নিধ্যের কারণে বন্যার পানি সহজেই সাগরে পৌঁছে যায় বলে বন্যার ব্যাপকতা সাধারণভাবে এখানে তীব্রতর হয় না। নদী স্ফীতি ছাড়াও অতি বর্ষণের কারণে জেলায় বন্যা দেখা দিয়ে থাকে।

বন্যা (১৮৭১) ১৮৭১ সালে মে ও জুন মাসে প্রবল বর্ষণের ফলে জেলায় বন্যা দেখা যায়। এ বন্যার দরুন জেলার পূর্ব ও উত্তরপূর্বাংশে আমন ফসলের মারাত্মক ক্ষতি হয়। ফলে বন্যাকবলিত এলাকায় চালের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং এতে জনসাধারণকে অবর্ণনীয় অভাব অনটন ও কষ্ট সহ্য করতে হয়।

বন্যা (১৯৭০) ১৯৭০ সালে অবিরাম ৩৬ ঘণ্টার বর্ষণে খুলনা শহরে ১৩ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত ঘটে। এ বৃষ্টিপাতে শহরতলীর সকল নিম্ন এলাকা ডুবে যায়। দুর্যোগে গিলাতলা শরণার্থী কলোনি সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বন্যা (১৯৭৮) অতি বর্ষণজনিত কারণে ১৯৭৮ সালে খুলনা জেলার পাইকগাছা, ডুমুরিয়া এবং দাকোপ থানায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। বন্যায় অনেক ঘরবাড়ি বিনষ্ট হয় এবং বিপুলসংখ্যক গবাদিপশু মারা যায়।

বন্যা (১৯৮১) ১৯৮১ সালের মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে খুলনা অঞ্চলে অতিবৃষ্টির ফলে ডুমুরিয়া ও ফুলতলা থানায় প্রবল বন্যা হয়। এর ফলে বিপুল পরিমাণ ফসল বিনষ্ট ও বহু গবাদিপশু মারা যায়।

বন্যা (১৯৮৭-৮৮)

১৯৮৭-৮৮ সালে প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ পরপর দুবছর বন্যার করাল গ্রাসে নিপতিত হয়। দেশের প্রায় ৭০% এলাকা এতে প্লাবিত হয়। খুলনা এলাকা ১৯৮৭ সালের বন্যায় অন্যান্য জেলার মতো ততটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। ১৯৮৮ সালের বন্যায় খুলনা জেলার উত্তরাঞ্চলের ফুলতলা ও তেরখাদা উপজেলা কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বন্যা (১৯৯৮)

১৯৯৮ সালে সমগ্র বাংলাদেশের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ বন্যার করাল গ্রাসে পতিত হয়। খুলনা জেলার তেরখাদা, পাইকগাছা, দাকোপ ও কয়রা উপজেলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়।

ঘূর্ণিঝড়

সমুদ্রউপকূলে অবস্থিত বলে সমুদ্রবায়ুবাহিত আর্দ্রতার আধিক্য এবং বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপপ্রসূত ঘূর্ণিঝড়ে খুলনা অঞ্চল আক্রান্ত হয়ে থাকে। খুলনা অঞ্চলে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড়সমূহের বর্ণনা দেওয়া হলো:

ঘূর্ণিঝড় (১৮৬৯)

১৮৬৯ সালে ১৬ মে এ অঞ্চলে ভয়ানক ঘূর্ণিঝড় হয় এবং সে সময়ে পশুর ও হরিণঘাটা নদীপথে প্রবল জলোচ্ছ্বাস ও সামুদ্রিক জোয়ার প্রবেশ করে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে নিম্নাঞ্চলের বহু ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়, ফসল বিনষ্ট হয়, খাদ্য গুদাম নষ্ট হয়, গবাদিপশু ভেসে যায় এবং বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটে।

ঘূর্ণিঝড় (১৮৭৬)

১৮৭৬ সালে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট একটি ঘূর্ণিঝড় প্রবল বেগে খুলনা অঞ্চলের ওপর আঘাত হানে। ঘূর্ণিঝড়ে জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ঘূর্ণিঝড়ের পর কলেরার প্রার্দুভাব দেখা দিলে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

ঘূর্ণিঝড় (১৯০৯)

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কাছে সৃষ্ট নিম্নচাপ হতে উদ্ভূত একটি ঘূর্ণিঝড় ঘণ্টায় প্রায় ৭৭ মাইল বেগে ১৯০৯ সালের ১৬ অক্টোবর খুলনা উপকূল অতিক্রম করে। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের ফলে জেলায় সকল নদনদী ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ প্লাবিত হয়। এ ঝড় ও প্লাবনে তৎকালীন খুলনা জেলার ৬৯৮ জন মানুষ প্রাণ হারায় বলে জানা যায়। এ ছাড়া এ প্রাকৃতিক দুর্যোগে খুলনা অঞ্চলের প্রায় ৭০,৬৫৪টি গবাদিপশু মারা যায়।

ঘূর্ণিঝড় (১৯১৯)

১৯১৯ সালের ২ সেপটেম্বর সকাল ৯টায় বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় খুলনার উপকূলে আঘাত হানে। এ ঝড় বেলা ৪ টার দিকে জেলার দক্ষিণভাগের কৃষি অঞ্চল অতিক্রম করে এবং রাত ৯টার সময় জেলার উত্তরাংশে পৌঁছে। ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসও ঘটে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ ৪৩২ জন মানুষ ও ২৮,০২৯টি গবাদিপশু প্রাণ হারায়। ১৯১৯ সালের ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১৯০৯ সালের ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অপেক্ষা কম ছিল বলে জানা যায়।

ঘূর্ণিঝড় (১৯৬১) ১৯৬১ সালের ৯ মে গভীর রাতে খুলনা জেলার ওপর দিয়ে ১০০ মাইল বেগে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় প্রবাহিত হয়। সকাল ৯টা পর্যন্ত ঝড়ের প্রকোপ অপরিবর্তনীয় থাকে। ঘূর্ণিঝড়ের সময় উপকূলবর্তী এলাকায় প্রবল সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস প্রবাহিত হয়। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে অসংখ্য লোক মারা যায়, বিপুল গবাদিপশু প্রাণ হারায় এবং লাখ লাখ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়। ঘূর্ণিঝড়ের পর দুর্যোগকবলিত এলাকা প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে।

ঘূর্ণিঝড় (১৯৬৫) ১৯৬৫ সালের ১১ ও ১২ মে তারিখে প্রায় ১০০ মাইল বেগে খুলনা ও অন্যান্য উপকূলীয় জেলাসমূহের ওপর দিয়ে মারাত্মক ঘূর্ণিঝড় প্রবাহিত হয়। এই ঝড়ে প্রাণহানির সংবাদ জানা না গেলেও ঝড়ের ফলে ঘরবাড়ি ও উদ্ভিদকুলের অপরিসীম ক্ষতিসাধিত হয়। ঝড়ের সময় প্রচুর লবণাক্ত পানি উপকূলীয় কৃষি জমিতে প্রবেশ করে। এ জন্য বৃষ্টির পানিতে জমির লবণাক্ততা ধুয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয়নি। ঘূর্ণিঝড়ে এ অঞ্চলের বিপুল পরিমাণ শস্য ও ধনসম্পদ নষ্ট হয়।

ঘূর্ণিঝড় (১৯৬৬) ১৯৬৬ সালের ১ অক্টোবর খুলনা, নোয়াখালী, বাকেরগঞ্জ, চট্টগ্রাম এবং কুমিল্লা জেলাসমহে প্রায় ৭০ মাইল বেগে প্রবাহিত প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত হয়। এ ঘূর্ণিঝড়ে সারা দেশের ২,৭২৭ বর্গমাইল এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে সমগ্র দেশে প্রায় ১৫ লাখ লোক সীমাহীন ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ঘূর্ণিঝড়ে খুলনা অঞ্চলের কোনো ব্যক্তির প্রাণ হারানোর তথ্য জানা না গেলেও গবাদিপশু, বৃক্ষাদি ও বিষয়সম্পত্তি নষ্ট হয়। এ ছাড়াও ঝড়ের ফলে জেলার উপকূলে প্রায় ২৩৮ মাইল বাঁধ ভেঙে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় কোটি টাকা।

ঘূর্ণিঝড় (১৯৭০) ১৯৭০ সালে খুলনা জেলা পরপর দুবার ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রথমবার ২৩ অক্টোবর তারিখে ৬০ থেকে ১০০ মাইল বেগে প্রবল বর্ষণসহ ঘূর্ণিঝড় হয়। ঝড়ে প্রাণহানির সংবাদ জানা না গেলেও প্রচুর পরিমাণ শস্য ও বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হয় ও গাছপালা উপড়ে পড়ে।

একই বছর ১২ ও ১৩ নভেম্বর তারিখে বয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝড়টি ছিল প্রবল ও ভয়ংকর। খুলনা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সমগ্র উপকূল প্রলয়ংকরী এই ঝড়ে আক্রান্ত হয়। প্রায় ১৩০ মাইলের ভিতর ঝড়ের তাণ্ডবলীলা ঘটে। তৎকালীন খুলনা অঞ্চলের হারিণঘাটা, বলেশ্বর তীরবর্তী এলাকা এবং উপকূলীয় দ্বীপাঞ্চল অস্বাভাবিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঝড়ের সাথে সাথে প্রায় ১৬ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাসও দেখা দেয়। স্মরণকালের ভয়ংকরতম এই দুর্যোগে বিপুলসংখ্যক মানুষের প্রাণহানিসহ শস্য, গবাদিপশু ও সম্পদের প্রভূত ক্ষতিসাধিত হয়।

ঘূর্ণিঝড় (১৯৮৮) ১৯৮৮ সালের ২৯ নভেম্বর খুলনা এলাকায় একটি ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় হয়। ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রে বায়ুর গতি ছিল ঘণ্টায় ১৬০ কিলোমিটার। জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা ছিল প্রায় ১৫ ফুট। বৃহত্তর খুলনায় এই ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ৫,৭০৮

জন মানুষ মারা যায়। এই ঝড়ে ১৫,০০০টি হরিণ, ৯টি রয়েল বেঙ্গাল টাইগার এবং ৬৫,০০০ পশু মারা যায়। এ ছাড়াও কোটি কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয়।

ঘূর্ণিঝড় (১৯৯১)

১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল বাংলাদেশের ওপর দিয়ে শতাব্দীর ভয়াবহতম যে ঘূর্ণিঝড়টি বয়ে যায় তার প্রভাবে খুলনা এলাকাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশের আবহাওয়া বিভাগ কর্তৃক চট্টগ্রাম এলাকার জন্য ১০ নম্বর মহাবিপদসংকেত এবং খুলনার জন্য আট নম্বর মহাবিপদসংকেত দেওয়া হয়েছিল।

ঘূর্ণিঝড় সিডর (২০০৭)

অতি মারাত্মক ঘূর্ণিঝড় সিডর, (Very Severe Cyclonic Storm, Sidr) হচ্ছে ২০০৭ সালে বঙ্গোপসাগর এলাকায় সৃষ্ট একটি ঘূর্ণিঝড়। ২০০৭ সালে উত্তর ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে এটি ৪র্থ নামকৃত ঘূর্ণিঝড়।[২] এটির আরেক নাম ট্রপিক্যাল সাইক্লোন ০৬বি (Tropical Cyclone 06B)। শ্রীলংকান শব্দ 'সিডর' বা 'চোখ'-এর নামে এর নামকরণ করা হয়েছে। ক্যাটাগরি ৫ মাত্রার ঘুর্নিঝড় সিডর আঘাত হেনে খুলনা ও তৎসংলগ্ন এ এলাকার বিস্তীর্ণ উপকূলে।। ১৫ নভেম্বর সকাল পর্যন্ত বাতাসের বেগ ছিল ঘণ্টায় ২৬০কি.মি.। ৩০৫ কি.মি./ঘণ্টা বেগে দমকা হাওয়া বইছিল। এ কারণে একে 'সাফিরসিম্প-সালে' স্কেল অনুযায়ী ক্যাটাগরি মাত্রার ঘূর্ণিঝড় আখ্যা দেওয়া হয়। ঝড়ের প্রভাবে সারা দেশের প্রায় ৯,৬৮,০০০টি ঘরবাড়ি ধ্বংস ও ২,১০,০০ হেক্টর জমির ফসল বিনষ্ট হয় এবং ২,৪২,০০০টি গৃহপালিত পশু ও হাঁস-মুরগি মারা যায়। সিডরের আঘাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনভূমি সুন্দরবন। ১৮ নভেম্বর সন্ধ্যা পর্যন্ত সরকারিভাবে ২,২১৭ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়। বাংলাদেশ সরকার এ ঘটনাকে জাতীয় দুর্যোগ বলে ঘোষণা করেছিল।

সিডর পরবর্তী ত্রাণ তৎপরতা

ঝড়ের পরপরই বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ৫টি জাহাজ খাদ্য, ওষুধ এবং ত্রাণসামগ্রীসহ সর্বাধিক ঘূর্ণিঝড়কবলিত এলাকায় পৌঁছে যায়। ইউরোপীয় কমিশন বাংলাদেশকে ৫.১ মিলিয়ন ও ইউএসএইড ২.৪ মিলিয়ন মূল্যের ত্রাণসামগ্রী প্রদান করে। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনাইটেড স্টেটস নেভি প্রায় ৩,৫০০ জন নৌসেনা ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী উদ্ধার কার্যক্রমে সহায়তা করে। অন্যান্য সংস্থাও সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। ওয়ার্ল্ড ভিশন ২০,০০০ গৃহহীন লোকজনকে গৃহ নির্মাণে সাহায্যের জন্য স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণ করে। রেডক্রস উদ্ধার তৎপরতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দুর্গত এলাকায় উদ্ধার তৎপরতা চালানোর জন্য ইউএসএ সরকার ইউএসএস এসেক্স ও ইউএসএস কিয়ারসার্জ নামে দুটি নৌযান বাংলাদেশে প্রেরণ করে। তাছাড়া ঘূর্ণিঝড় দুর্গতদের সাহায্যের জন্য জরুরিভিত্তিতে ২১ লাখ ডলার অর্থ সহায়তা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। ফিলিপাইন সরকার বাংলাদেশে ত্রাণতৎপরতায় সাহায্যের জন্য মেডিকেল টিম প্রেরণ করে। পোপ বেনেডিক্ট (ষোড়শ) রবিবারের প্রার্থনায় বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড়

[২] জেলা প্রশাসন, খুলনা।

দুর্গতদের সাহায্যের জন্য ত্রাণসহ সবরকম সাহায্যের আহবান জানান। ইউএনডিপি, ইউনিসেফ, যুক্তরাজ্য সরকার, ইউএসএইড, ইসলামিক রিলিফ এবং স্পেন ৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সাহায্য প্রদান করে। ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম দুর্গত মানুষের জন্য ১০,০০০ মেট্রিক টন চাল এবং ২০০ টন উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ বিস্কুট সাহায্য প্রদান করে।

ঘূর্ণিঝড় 'আইলা' 'আইলা' হলো ২০০৯ সালে উত্তর ভারত মহাসাগরে জন্ম নেওয়া দ্বিতীয় ঘূর্ণিঝড়। ঘূর্ণিঝড়টি জন্ম নেয় ২১ মে, ভারতের কলকাতা থেকে ৯৫০ কিলোমিটার (৫৯০ মাইল) দক্ষিণে। প্রায় তিনশ কিলোমিটার ব্যাসবিশিষ্ট্য এই ঘূর্ণিঝড়টি আঘাত হানে ২৫ মে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ ও ভারতের দক্ষিণ-পূর্বাংশে। 'আইলা' শব্দের অর্থ ডলফিন বা শুশুকজাতীয় জলচর প্রাণী। নামটি এই ঘূর্ণিঝড়ের জন্য নির্ধারণ করেন জাতিসংঘের এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের আবহাওয়াবিদদের সংস্থা 'ইউএন এস্কেপ'-এর (UN Escape) বিজ্ঞানীরা। সিডরের মতই আইলা প্রায় ১০ ঘণ্টা সময় নিয়ে উপকূল অতিক্রম করে, তবে পরবর্তী সময়ে বাতাসের বেগ ৮০-১০০ কিলোমিটার হয়ে যাওয়ায় ক্ষয়ক্ষতি, সিডরের তুলনায় কম হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে খুলনা ও সাতক্ষীরায় ৭১১ কিলোমিটার বেড়ি বাঁধ বিধ্বস্ত হয়। খুলনার দাকোপ ও কয়রা উপজেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল লোনা পানিতে তলিয়ে যায়। আইলার আঘাতে সারা দেশে প্রায় ২,০০,০০০ একর কৃষিজমি লোনা পানিতে তলিয়ে যায়, ৯৭ হাজার একরের আমন ক্ষেত সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়, কাজ হারায় ৭৩,০০০ কৃষক ও কৃষি-মজুর। পর পর দুই মৌসুম কৃষিকাজ না হওয়ায় প্রায় ৮,০০,০০০ টন খাদ্য ঘাটতিসৃষ্টি হয়। ঘূর্ণিঝড়ের ফলে দাকোপ উপজেলার ঢাকী নদীর তীর ও বাঁধ ভেঙে যায়।

সারণি-১৩৫

দুর্যোগ আইলাকবলিত উপজেলা, সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন

উপজেলা	সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন	ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যা	জীবনহানি	ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবড়ি	ক্ষতিগ্রস্ত ফসলি জমি (হে.)	গবাদি পশু হানি	ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য ঘের/পুকুর
দাকোপ	সুতরখালী, কামারখোলা, বাণীশান্তা, তিলডাংগা	২২,০০০	৯৪,০০০	০৪	৪৩,৫০০	৬,৭২০	১০,২১১	৪,৮৬১
কয়রা	দ.বেদকাশী, উ. বেদকাশী, মহেশ্বরীপুর, কয়রা সদর, মহারাজপুর, বাগালী	২৫,২৫০	৯৬,৮০০	৫৩	৫৪,৬৩০	২,০০৮	১৩,৫৬২	১০,৩৬৪

তথ্যসূত্র: UN Joint Aila Assessment, 2009.

সারণি-১৩৬

ঘূর্ণিঝড় আইলা পরবর্তী ত্রাণ বিতরণ

আইলা পরবর্তী ত্রাণ তৎপরতা

২৫ মে, ২০০৯ তারিখে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় 'আইলা' পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রমের অধীনে বিতরণকৃত ত্রাণসামগ্রী:

১।	শাড়ি	:	৫১৫০ পিস
২।	লুঙ্গি	:	২০০০ পিস
৩।	হারিকেন	:	৪২০০টি
৪।	তাঁবু	:	৭২৫টি
৫।	জি আর- চাল	:	৬,২০৭.১৪৫ মে.টন
৬।	জি আর- টাকা	:	২,০৮,১০,৩১১/-টাকা (শুকনা খাদ্য ক্রয় ব্যয়সমূহ
৭।	গৃহনির্মাণ বাবদ- টাকা	:	৮২,৬৫,১৯,০০০/- টাকা
৮।	ত্রাণ সামগ্রী পরিবহণ টাকা	:	৭,৬০,০০০/- টাকা
৯।	চিড়া (কেজি)	:	৮০০ কেজি
১০।	গুড় (কেজি)	:	৫০০ কেজি
১১।	পানি (লিটার)	:	১০,০০০ লিটার
১২।	তারপোলিন	:	২,০০০টি
১৩।	সৌদি প্যাকেট	:	২,০০০টি
১৪।	কম্বল	:	১৫,০৭৫টি
১৫।	বিশুদ্ধ পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য	:	
	ক) গাজী ট্যাংক	:	২৭টি (৫০০ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন)
	খ) মাটির মটকা	:	১০০টি (১০০ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন)
১৬।	নিরাপদ খাবার পানি বিতরণ ব্যয়	:	৪৭,০০,০০০/- (সাতচল্লিশ লাখ) টাকা দৈনিক ৫৫,০০০ লি. হিসেবে ৭৫ দিনের জন্য

(০৮.০৬.২০১০ তারিখ শুরু হয়ে ৩০.০৬.২০১০ তারিখ পর্যন্ত ২৩ দিন ১২,৬৫,০০০ লিটার পানি বিতরণ করার পর অর্থবছর শেষ এবং বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ায় পানি বিতরণ করা হয়নি।)

১৭। ভিজিএফ কার্ড :

উপজেলার নাম	কার্ড সংখ্যা		মন্তব্য
	সেপটেম্বর'০৯ হতে জুন'১০ পর্যন্ত	জুলাই'১০ হতে সেপটেম্বর'১০ পর্যন্ত	
(ক) দাকোপ	১০,৫০০	১০,৬০০	প্রতিমাসে প্রতিকার্ডে ২০ কেজি হারে চাল বিতরণ করা হয়েছে
(খ) কয়রা	২৭,৩১০	২৭,৪০০	
মোট	৩৭,৮১০	৩৮,০০০	

গৃহনির্মাণ খাতে ২টি উপজেলায় প্রতি পরিবারকে ২০২৭ টাকা হারে কয়রায় ৪০০ ও দাকোপে ৬০০ পরিবারকে সরকারিভাবে সহায়তা করা হয়।

ঘূর্ণিঝড়ের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব

জমিতে লবণাক্ততা বাড়ার কারণে স্থানীয় কৃষি ব্যবস্থা ব্যাহত হয়ে তিনফসলি জমি একফসলিতে পরিণত হয়েছে। আইলা ও সিডরের ফলে কৃষিজমিতে লবণাক্ত পানির প্রবেশ ঘটেছে। এর ফলে খুলনা জেলায় ২০০৮-২০১০ সালে

ধানি জমি কমে গেছে ২০০০০ হেক্টর। প্রতিবছর ১-১.১৫ হাজার হেক্টর চাষ অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে। লবণাক্ত এলাকায় ফসলের গড় উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে। বসতবাড়িতে ফল ফসলাদি উৎপাদন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। মাঠে ঘাস না থাকায় গবাদিপশুর সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে কমে যাচ্ছে। লবণ পানির কারণে মাটির গঠন পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। মাটির উপরিভাগে লবণ বৃদ্ধি পেয়ে জমি অনুর্বর হয়ে যাচ্ছে ও ভূগর্ভস্থ পানির স্তরেও লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিনষ্ট হয়েছে যা এখন পর্যন্ত পুরোপুরি ঠিক করা সম্ভব হয়নি। (তথ্যসূত্র উপ-পরিচালক, কৃষি অধিদপ্তর, খুলনা)

কৃষি বিভাগ নিয়মিত কৃষক সভার মাধ্যমে আগাম বোরো ধান চাষের পরামর্শ প্রদান করছে। স্লুইস গেট মার্চ মাস পর্যন্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জমিতে পর্যাপ্ত জৈবসার ব্যবহার বৃদ্ধির পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া বর্ষাকালে নদীর স্বাদু পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। লবণসহিষ্ণু ব্রি ধান-৪৭ ও বিনা-৮ সহ অন্যান্য লবণসহিষ্ণু জাত চাষের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। লবণের প্রভাব হ্রাসে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা নেওয়া বিবেচিত হয়েছে।

লবণের প্রভাব হ্রাসে করণীয়

নতুন লবণসহিষ্ণু উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান, গম ইত্যাদির বীজ সরবরাহ করা। অন্যান্য ফসলের লবণসহিষ্ণু জাত উদ্ভাবনে গবেষণা বৃদ্ধি করা। লবণাক্ততার বৃদ্ধিজনিত ফসল উৎপাদন হ্রাসের কারণে যেসব মানুষ কৃষিকাজ ছেড়ে দিচ্ছে তাদের ভর্তুকি প্রদান ও প্রেষণার মাধ্যমে কৃষিতে নিয়োজিত থাকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

খুলনা জেলার আপদসমূহ

কৃষিনির্ভর এ জেলায় যেমন প্রকৃতিসৃষ্ট আপদ রয়েছে তেমনই মানবসৃষ্ট আপদও রয়েছে। স্থানীয় সাধারণ জনগণের মতামতের ওপর ভিত্তি করে বিদ্যমান সকল আপদের মধ্য থেকে নিম্নবর্ণিত ১২টি আপদ বাছাই করা হয়েছে। এলাকাবাসী মনে করে এই ১২টি আপদের ফলে প্রতিবছর তাদের সর্বাধিক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং দিন দিন এর প্রভাব তীব্রতর হচ্ছে। সুতরাং এখন থেকে বিলম্ব না করে যদি কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া না হয় তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আরও অমানবিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে।

জেলার আপদ সমূহ

ক্রমিক	আপদ সমূহ	ক্রমিক	আপদ সমূহ
০১	ঘূর্ণিঝড়	০৭	অনাবৃষ্টি
০২	নদীভাঙন	০৮	শিলাবৃষ্টি
০৩	লবণাক্ততা	০৯	টর্নেডো
০৪	জলোচ্ছাস	১০	কালবৈশাখি
০৫	জলাবদ্ধতা	১১	ফসলে পোকার আক্রমণ
০৬	অতিবৃষ্টি	১২	চিংড়ি ভাইরাস

তথ্যসূত্র: জেলা অফিস, খুলনা, ২০১৪।

বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ভবিষ্যৎ চিত্র বর্ণনা:

ঘূর্ণিঝড়

খুলনা জেলা ঘূর্ণিঝড়কবলিত এলাকা। প্রতিবছর ভাদ্র মাস হতে অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে ঘূর্ণিঝড় এই এলাকায় আঘাত হানে। ফলে এলাকায় কৃষি, মৎস্য, অবকাঠামো ও যোগাযোগ প্রভৃতি খাতের ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হয়। ধারণা করা হয় যে, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করছে।

নদীভাঙন

খুলনা জেলায় দাকোপ, বটিয়াঘাটা, কয়রা, ডুমুরিয়া উপজেলা ও খুলনা সদরে নদীভাঙন বেশি। ডুমুরিয়া উপজেলার খর্নিয়া ব্রিজের উত্তরপার্শ্বে খর্নিয়া হতে শোলগাতিয়া রাস্তাটিতে প্রতিবছর নদীভাঙন অব্যাহত থাকে। নদীভাঙ্গান আষাঢ় হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত হয়। ইতোমধ্যে এলাকার কৃষিফসল, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, গাছপালা ব্যাপকহারে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

লবণাক্ততা বৃদ্ধি

খুলনা জেলায় পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি একটি মারাত্মক আপদ। পানিতে লবণাক্ততার মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৌষ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত লবণাক্ততার মাত্রা ব্যাপক থাকে। বর্ষার সাথে সাথে লবণাক্ততার মাত্রা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। শুষ্ক মৌসুমে লবণাক্ততা কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে থাকে। লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে এলাকায় খাবার পানির সংকট দেখা দেয়। সমূদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে নদীর পানির লবণাক্ততা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলত চিংড়ি ঘেরের মালিকেরা চিংড়ি চাষের জন্য এলাকায় সাগরের পানির অনুপ্রবেশ ঘটায়। তা ছাড়া পর্যাপ্ত বেড়িবাঁধ না থাকায় জলোচ্ছাসের সময় এলাকা প্লাবিত হয়ে লবণাক্ত পানি প্রবেশ করে। দিন দিন লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে বোরো ও আউশ ধান চাষ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সাথে সাথে ফলদ, বনজ সম্পদ ও খাবার পানির সংকট দেখা দিচ্ছে। এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে শুষ্ক মৌসুমে কৃষিব্যবস্থা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

জলোচ্ছ্বাস

খুলনা জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলো হলো- রূপসা, ভৈরব, হরিণা, পাঙ্গাশিয়া, কালিন্দী, বেতনা ও মালঞ্চ ইত্যাদি। এ সমস্ত নদীর জোয়ারের পানি মাঝে মাঝে এলাকাতে বন্যা ঘটায়। বন্যা কৃষি, মৎস্য ও অন্যান্য সম্পদের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে থাকে। জলোচ্ছ্বাসের সময় ফসলি জমিতে লবণ পানি অনুপ্রবেশ করার ফলে ফসলে মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়। প্রতিবছর জলোচ্ছ্বাস হলেও ১৯৮৮, ২০০৭ ও ২০০৯ সালের জলোচ্ছ্বাস ছিল সবচেয়ে ব্যাপক। তা ছাড়া, নদীর নাব্যতা হ্রাসের কারণেও এলাকায় জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি

খুলনা জেলার অধিবাসীদের অভিমত, এ এলাকার বৃষ্টিপাতের ধারার পরিবর্তন হচ্ছে। খুলনা জেলায় কয়েক বছর আগেও আষাঢ় শ্রাবণ মাসে প্রচুর বৃষ্টিপাত হতো, কিন্তু বর্তমানে তেমন বৃষ্টিপাত আর হয় না। খুলনা আবহাওয়া অফিস সূত্র অনুযায়ী, ২০১৪ জুনের খুলনায় বৃষ্টিপাত হয়েছে মাত্র ২১১ মিলিমিটার। যা গত

কয়েক বছরের তুলনায় অনেক কম। ২০১৩ সালে এ সময়ে খুলনায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ৩৮২ মিলিমিটার। আর ২০10 সালের জুনে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ২৮৭ তবে মাঝে মধ্যে অতিবর্ষণে কাঁচা ঘরবাড়ি, কৃষি জমি, মৎস্য ঘের ও রাস্তাঘাটের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়।

শিলাবৃষ্টি সাম্প্রতিককালে শিলাবৃষ্টির ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিলাবৃষ্টিতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। ২০১৩ সালে খুলনা জেলার ওপর দিয়ে শিলাবৃষ্টি বয়ে যায়। সেই শিলাবৃষ্টিতে ডুমুরিয়া উপজেলার ২ জনের মৃত্যু হয়।

জলাবদ্ধতা ডুমুরিয়ার, চকমথুরাবাদ ও চকহাসানখালি বিলের প্রায় ২৫০ একর জমিতে প্রতিবছর আমন আবাদ হয়ে থাকে। কিন্তু টানা বৃষ্টিতে এখানে সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতার। বীজতলা ও ক্ষেতে পানি থাকায় চাষিরা আমন আবাদ শুরু করতে পারে না। একই অবস্থা জেলার বটিয়াঘাটা, রূপসা, দাকোপ ও কয়রা উপজেলায়।

কালবৈশাখি ঝড় খুলনা জেলায় বিগত কয়েক বছর আগে কালবৈশাখির ঝড় হতো ২/৩ বছর পরপর। কিন্তু ২০০4 সাল থেকে প্রতিবছর কালবৈশাখি ঝড়ের আঘাত হানছে। এতে আম, লিচুসহ অন্যান্য কৃষি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়।

ফসলে পোকার আক্রমণ খুলনা জেলায় সাধারণত ফসলে মাছি পোকা, বিছা পোকা, জাব পোকা, লাল কুমড়া পোকা, পিঁপড়া, ফল ছিদ্রকারী পোকা, মাজরা, উইপোকা, পাতা ছিদ্রকারী পোকা, মশার মোজাইক ভাইরাস, মিলিবাগ ও গান্ধী পোকা ইত্যাদি পোকার আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। কীটনাশক প্রয়োগ করেও আজকাল অনেক ক্ষেত্রেই এ সব পোকামাকড় দমন করা যাচ্ছে না।

চিংড়ি ভাইরাস খুলনা জেলার মানুষের প্রধান আয়ের অন্যতম উৎস চিংড়িচাষ। কিন্তু চিংড়ি ভাইরাসের কারণে চিংড়িচাষ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রফতানি পণ্য এই চিংড়ির শতকরা ৮০ ভাগই উৎপাদিত হয় বাগেরহাট-খুলনা-সাতক্ষীরা অঞ্চলে যা থেকে প্রতিবছর প্রায় চার হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়।

খুলনা জেলার ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাব পরিলক্ষিত হয় তাই মাঠ ঘাট শুকিয়ে চৌচির হয়ে যায় আর বিপদাপন্ন হয় এ জেলার জনগোষ্ঠী, প্রাণিকুল, মৎসসম্পদ ও অবকাঠামো। আবার আকস্মিক বন্যায় ভেসে যায় কৃষিফসল, প্রাণী ও অবকাঠামো। আবার কখনো, নদীভাঙনে গৃহহারা হয় রূপসা, ভৈরব, হরিণা, পাঞ্জাশিয়া, কালিন্দী, বেতনা ও মালঞ্চ নদীর তীরবর্তী মানুষ।

খুলনা জেলার খরার প্রবণতা বেশি না হলেও বছরজুড়েই বিভিন্ন আপদ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। চৈত্র মাস থেকেই খরার প্রবণতা বাড়তে থাকে এবং বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে তীব্ররূপ ধারণ করে। মাঠ ঘাট শুকিয়ে যায়, অনেক

টিউবয়েলে পানি থাকে না। এ সময় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যেতে থাকে তাই শুধু গভীর নলকূপ ছাড়া পানি উত্তোলন সম্ভব হয় না। জেলার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত রূপসা, ভৈরব, হরিণা, পাঙ্গাশিয়া, কালিন্দী, বেতনা ও মালঞ্চ নদীর পানি হঠাৎ বন্যা বা জলোচ্ছ্বাসে বেড়ে গিয়ে নদীসংলগ্ন এলাকা প্লাবিত করে। তা ছাড়া বৈশাখ থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত যে কোনো ঘূর্ণিঝড়, কালবৈশাখি ঝড় আঘাত হানতে পারে। এ ছাড়া সাইক্লোনের হুমকি তো রয়েছেই। টেবিলের মাধ্যমে আপদের মৌসুমি দিনপঞ্জি তুলে ধরা হলো:

ক্র.নং	আপদসমূহ	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১	ঘূর্ণিঝড়	■				■	■	■				■	■
২	নদীভাঙন				■	■	■	■	■				
৩	লবণাক্ততা	■	■									■	■
৪	জলোচ্ছ্বাস				■	■	■	■	■				
৫	জলাবদ্ধতা					■	■	■	■				
৬	অতিবৃষ্টি					■	■	■					
৭	অনাবৃষ্টি		■	■	■	■							
৮	শিলাবৃষ্টি	■	■	■									■
৯	টর্নেডো	■	■			■	■	■			■	■	■
১০	কালবৈশাখি	■	■										
১১	ফসলে পোকার আক্রমণ	■								■	■	■	■
১২	চিংড়ি ভাইরাস	■	■			■	■	■	■				

(তথ্যসূত্র: মাঠপরিদর্শন, ২০১৪)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

দুর্যোগপ্রবণ জেলা হিসেবে খুলনা জেলা ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, কালবৈশাখি, নদীভাঙনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে এ অঞ্চলের মানুষকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এতে বিশেষত এই জেলার উপকূলীয় দাকোপ, পাইকগাছা, কয়রা, রূপসা, বটিয়াঘাটা উপজেলার দরিদ্র জনগণের কষ্ট বেড়েছে। বিগত চার বছরে বর্তমান সরকার এ জেলার সার্বিক কল্যাণার্থে ও

জনগণের দুঃখদুর্দশা লাঘবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রতিবছর বর্ধিত আর্থিক, মেধাসম্পদ, প্রযুক্তির প্রসারসহ বিবিধ সম্পদের নিয়মিত প্রবাহ নিশ্চিত করেছে। এতে দুর্যোগ ক্ষয়ক্ষতি কমানোসহ খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে তথা দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকারের দৃঢ় ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে।

স্ট্রাকচারাল দুর্যোগ প্রস্তুতি (Hardware activities)

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ

প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিশেষত ঘূর্ণিঝড়ের সময় খুলনা জেলার নদীসংলগ্ন উপকূলীয় উপজেলাগুলোতে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলো অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। ২০০৯ সালের তথ্য অনুযায়ী ১২৫টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মিত ছিল। এ সকল ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলো সরকারি রাজস্ব তহবিল এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় নির্মাণ করা হয়েছে।

১৯৯৭ সালের ১৯ মে কক্সবাজার জেলাসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত হওয়ায় বহু পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়ে। তদানীন্তন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওই এলাকা পরিদর্শনে যান। তিনি মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েন এবং সকল গৃহহীন পরিবারসমূহকে পুনর্বাসনের তাৎক্ষণিক নির্দেশ দেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালে ‘আশ্রয়ণ’ নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত তিন (০৩) টি ফেজে আশ্রয়ণ প্রকল্প (৯১৯৭ - ২০০২), আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ - ২) (২০০২ - ২০১০), আশ্রয়ণ - ২ প্রকল্প (২০১০ - ২০১৭) ১৭৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ১,৪০,১২৮টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়, তন্মধ্যে আশ্রয়ণ - ২ প্রকল্পের মাধ্যমে ৮৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৪,২১৫টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। বর্ণিত প্রকল্পের সাফল্য ও ধারাবাহিকতায় ২০১০-২০১৭ (সংশোধিত) মেয়াদে ৫০,০০০ গৃহহীন, ছিন্নমূল পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সারা দেশে গ্রামাঞ্চলে ব্যারাক হাউজ এবং বিভাগীয় সদর ও রাজউক, বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন এলাকা, জেলা ও উপজেলা সদর এবং পৌরসভা এলাকায় বহুতল ভবন নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আশ্রয়ণ প্রকল্প

পুনর্বাসিত ভূমিহীন, গৃহহীন, দুর্দশাগ্রস্ত ও ছিন্নমূল পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে ভূমির মালিকানা স্বত্বের দলিল/কবুলিয়ত সম্পাদন, রেজিস্ট্রি ও নামজারি করে দওয়া হয়। পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের জন্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, মসজিদ নির্মাণ, কবর স্থান, পুকুর ও গবাদিপশু প্রতিপালনের জন্য সাধারণ জমির ব্যবস্থা করা হয়। পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন উৎপাদনমুখী ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের জন্য ব্যবহারিক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ দান এবং প্রশিক্ষণ শেষে তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়। প্রকল্পগ্রামে বসবাসরত উপকারভোগীদের (যেমন: নাম/স্বামীর নাম, সন্তান সংখ্যা, ঋণ ইত্যাদি) এবং প্রকল্পগ্রামের তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য ডাটাবেইজ প্রণয়ন করা হয়েছে, ডাটাবেইজের ঠিকানা (http://ashrayandbpmo. gov.bd/)।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

- ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল,অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন
- ঋণ প্রদান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহে সক্ষম করে তোলা
- আয়বর্ধক কার্যক্রম সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ

আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত প্রধান প্রধান কার্যাবলি নিম্নরূপ:

- প্রকল্প বাছাই;
- ভূমি উন্নয়ন;
- ব্যারাক নির্মাণ;
- উন্মুক্ত পদ্ধতিতে উপকারভোগী বাছাই;
- ভিজিএফ (VGF) প্রদান (ব্যারাকে ওঠার পরবর্তী তিন মাস);
- প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ঋণ প্রদান;
- বৃক্ষ রোপণ
- ঘাটলা ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ;
- টিউবওয়েল স্থাপন;

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প: আশ্রয়ণ প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় আশ্রয়ণ-২ (জুলাই ২০১০-জুন ২০১৭) নামে একটি প্রকল্পের কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পে ঘূর্ণিঝড়, সিডর, আইলা আক্রান্ত এলাকার জন্য পাকা ব্যারাক, অন্যান্য অঞ্চলের জন্য সেমি-পাকা ব্যারাক এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও রীতিনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশেষ ডিজাইনের গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

সারণি-১৩৭

খুলনা জেলার আশ্রয়ণ প্রকল্পের তথ্যাদি

(ক) আশ্রয়ণ প্রকল্পের তথ্য (জানুয়ারি, ২০১৭)

ক্র.নং	জেলা	উপজেলা	প্রকল্পের নাম	ব্যারাক সংখ্যা	পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা	খালি ইউনিট-এর সংখ্যা	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮
১	খুলনা	পাইক গাছা	দেবদুয়ার আশ্রয়ণ প্রকল্প	১৫টি	১৫০টি	৬০টি	৬০টি পরিবার অন্যত্র চলে গেছে।
২	”	”	বাইশারাবাদ আশ্রয়ণ প্রকল্প	০৬টি	৬০টি	১৫টি	১৫টি পরিবার অন্যত্র চলে গেছে।
৩	”	”	গড়ইখালী আশ্রয়ণ প্রকল্প	০৫টি	৫০টি	খালি নেই	-
৪	”	ডুমুরি য়া	চুকনগর আশ্রয়ণ প্রকল্প	০৪টি	৪০টি	খালি নেই	-
৫	”	তেরখা দা	ধানখালী আশ্রয়ণ প্রকল্প	১০টি	১০০টি	১৪টি	১৪টি পরিবার অন্যত্র চলে গেছে।
৬	”	”	বসুন্দরীতলা আশ্রয়ণ প্রকল্প	০৬টি	৬০টি	১০টি	১০টি পরিবার অন্যত্র চলে গেছে।
৭	”	”	খড়বড়িয়া আশ্রয়ণ প্রকল্প	০৫টি	৫০টি	০৬টি	০৬টি পরিবার অন্যত্র চলে গেছে।
৮	”	”	হাড়িখালী-১ আশ্রয়ণ প্রকল্প	০৮টি	৮০টি	২৬টি	২৬টি পরিবার অন্যত্র চলে গেছে।
৯	”	”	হাড়িখালী-২ আশ্রয়ণ প্রকল্প	০৮টি	৮০টি	৩০টি	৩০টি পরিবার অন্যত্র চলে গেছে।
১০	”	”	হাড়িখালী-৩ আশ্রয়ণ প্রকল্প	০৮টি	৮০টি	৩০টি	৩০টি পরিবার অন্যত্র চলে গেছে।
১১	”	”	কামারোল আশ্রয়ণ প্রকল্প	০৪টি	৪০টি	১০টি	১০টি পরিবার অন্যত্র চলে গেছে।
১২	”	”	আটলিয়া আশ্রয়ণ প্রকল্প	০৩টি	৩০টি	১৩টি	১৩টি পরিবার অন্যত্র চলে গেছে।
১৩	”	”	মল্লিখপুর আশ্রয়ণ প্রকল্প	০৪টি	৪০টি	১৫টি	১৫টি পরিবার অন্যত্র চলে গেছে।
১৪	”	বটিয়া ঘাটা	ভান্ডারকোট আশ্রয়ণ প্রকল্প	১৫টি	১৫০টি	৩০টি	৩০টি পরিবার অন্যত্র চলে গেছে।

ক্র.নং	জেলা	উপজেলা	প্রকল্পের নাম	ব্যারাক সংখ্যা	পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা	খালি ইউনিট-এর সংখ্যা	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮
১৫	”	”	ভাদাইলবুনিয়া আশ্রয়ণ প্রকল্প	০৭টি	৭০টি	১০টি	১০টি পরিবার অন্যত্র চলে গেছে।
১৬	”	দাকোপ	বারুইখালী আশ্রয়ণ প্রকল্প	১০টি	১০০টি	০৯টি	০৯টি পরিবার অন্যত্র চলে গেছে।
১৭	”	রূপসা	গোয়ালবাড়ী চর আশ্রয়ণ প্রকল্প	১৮টি	১৮০টি	২০টি	১টি ব্যারাক পুড়ে গেছে। ১৭টি ব্যারাকের মধ্যে ২০টি ঘর খালি।
১৮	”	কয়রা	বাগালী আশ্রয়ণ প্রকল্প	১৬টি	৮০টি	খালি নেই	-
		মোট=	**১৮টি আশ্রয়ণ প্রকল্প**	**১৫২টি**	**১৪৪০টি**	**২৯৮টি**	-

(খ) আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) সংক্রান্ত তথ্য (জানুয়ারি, ২০১৭)

ক্রঃনং	**জেলা**	**উপজেলা**	**প্রকল্পের নাম**	**ব্যারাক সংখ্যা**	**পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা**	**খালি ইউনিট-এর সংখ্যা**	**মন্তব্য**
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮
১	খুলনা	পাইকগাছা	চাঁদখালী আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)	০৬টি	৬০টি	খালি নেই	-
২	”	”	সরল আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)	০৫টি	৫০টি	খালি নেই	-
৩	”	”	গড়ইখালী আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)	০৯টি	৯০টি	খালি নেই	-
৪	”	”	হেতালবুনিয়া আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)	০৪টি	৪০টি	খালি নেই	-
৫	”	”	চর কপোতাক্ষী আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)	০৮টি	৮০টি	খালি নেই	-
৬	”	”	বিল পরানমালী আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)	০৫টি	৫০টি	খালি নেই	-

৭	”	”	রাড়ুলী খেয়াঘাট আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)	০৫টি	৫০টি	খালি নেই	-
৮	”	”	আলাকদিয়া আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)	০৫টি	৫০টি	খালি নেই	-
৯	”	”	কুমখালী আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)	০৬টি	৬০টি	খালি নেই	-
১০	”	”	নূরপুর আমিরপুর আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)	০৬টি	৬০টি	খালি নেই	-
১১	”	”	পুটিমারী আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)	০৯টি	৯০টি	খালি নেই	-
১২	”	”	পতন আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)	০৯টি	৯০টি	খালি নেই	-
১৩	”	”	হাছিমপুর আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)	০৬টি	৬০টি	খালি নেই	-
১৪	”	”	হরিখালী চক আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)	০৪টি	৪০টি	খালি নেই	-
১৫	”	”	কলমিবুনিয়া আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)	০৫টি	৫০টি	খালি নেই	-
১৬	”	”	বেতনবুনিয়া আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)	-	-	-	ব্যারাক নির্মাণ কাজ চলছে
১৭	”	ডুমুরিয়া	ভান্ডারপাড়া আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)	২৬টি	২৬০টি	খালি নেই	-
১৮	”	”	খাজুরা আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)	০৮টি	৮০টি	খালি নেই	-
১৯	”	”	চুকনগর আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)	০৪টি	৪০টি	খালি নেই	-
২০	”	”	মিকশিমিল আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)	০৪টি	৪০টি	খালি নেই	-
২১	”	তেরখাদা	কামারোল আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)	১৩টি	১৩০টি	৬৮টি	বসবাসের অনুপযোগী
২২	”	কয়রা	আমাদী আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)	২৩টি	২৩০টি	২০০টি	বসবাসের অনুপযোগী

২৩	”	দিখলিয়া	চন্দনীমহল আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)	৩০টি	১৫০টি	খালি নেই	-
		মোট=	**২৩টি আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)**	**২০০টি**	**১৮৫০টি**	**২৬৮টি**	-

(গ) আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের তথ্য (জানুয়ারি, ২০১৭)

ক্র. নং	জেলা উপজেলার নাম	আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের নাম/ সংখ্যা	জমির পরিমাণ (একর)	ব্যারাক সংখ্যা	পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা	কতটি পরিবার পুনর্বাসন করা যাবে	ফাঁকা ব্যারাকের সংখ্যা	মোট	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০
১.	কয়রা	বাগালী আশ্রয়ণ-২		১৬	৩০	৫০	৫০	৮০	
২.	দিঘলিয়া	চন্দনীমহল আশ্রয়ণ-২		৩০	১৫০	-	-	১৫০	
৩.	পাইকগাছা	বেতবুনিয়া আশ্রয়ণ-২		১৪	৭০	-	-	৭০	
৪.	**মোট**	**প্রকল্প- ০৩**	**১৬.৩০**	**৬০**	**২৫০**	**-**	**-**	**৩০০**	

এ সংক্রান্ত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তথ্যাদি:

ক্র. নং	প্রকল্পের শ্রেণিবভাগ	বাস্তবায়িত প্রকল্প	পরিবার পুনর্বাসন	ঋণ বিতরণ
০১	আশ্রয়ন প্রকল্প	১৭টি	১,৪৫০টি	৯৬,৪৪,৫০০/-
০২	আশ্রয়ন ফেইজ-২	২১টি	১,৭৪০টি	৯৮,৫৩,৫০০/-
০৩	আশ্রয়ন-২	০৫টি	৪৪৫টি	৪৫,৪২,০০০/-
খুলনা	মোট =	৪৩টি	৩,৬৩৫টি	২,৪০,৪০,০০০/-

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে ওয়াশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রতিবছর বাড়ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এই সমস্ত দুর্যোগে প্রধান যে সমস্যা তা হলো সুপেয় খাবার পানি। বন্যার পর যখন সমস্ত নলকূপ অকেজো হয়ে পড়ে তখন মানুষ এসব পুকুরের পানি ব্যবহার করে থাকে। এজন্য সরকার পাইকগাছা, কয়রা ও ডুমুরিয়া উপজেলায় ১৭টি পুকুর খননের কাজ হাতে নিয়েছে যার মধ্যে ৫টির কাজ শেষ হয়েছে এবং বাকিগুলোর কাজ চলছে।

ল্যাট্রিন

দুর্যোগের সময় পয়ঃনিষ্কাশন একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এসময় বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। সরকারি ও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ওয়াশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাস ও মানুষের সুস্থ জীবনযাপনের উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। ইউনিসেফ ও ব্রাক খুলনা জেলার তেরখাদা, ডুমুরিয়া, বটিয়াঘাটা, পাইকগাছা ও কয়রা উপজেলায় ৪৩৩৭টি ল্যাট্রিন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

পিএসএফ প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিশেষত ঘূর্ণিঝড়ের সময় খুলনা জেলার নদীসংলগ্ন উপকূলীয় উপজেলাগুলোতে খাবারের পানির ব্যাপক সমস্যা দেখা দেয়। তখন মানুষ পুকুর ও নদীর পানির ওপর নির্ভর হয়ে পড়ে। পুকুরের পানি পিএসএফের মাধ্যমে বিশুদ্ধ করে দুর্যোগকবলিত এলাকাগুলোতে সরবরাহ করা হয়।

বৃষ্টির পানি ধারক প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিশেষত ঘূর্ণিঝড়ের সময় খুলনা জেলার নদীসংলগ্ন উপকূলীয় উপজেলাগুলোতে খাবারের পানির অভাব পূরণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে খুলনা জেলার পাইকগাছা, কয়রা, দাকোপ, বটিয়াঘাটা ও খুলনা সদরে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার জন্য ২১৩৪টি ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জরুরি ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জরুরি ত্রাণ সহায়তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেখানে খুলনা জেলা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এই কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। দুর্যোগকালীন ও পরবর্তী সময়ে সরকারি বিভিন্ন মজুত থেকে আপৎকালীন মোকাবেলা করা হয়। জরুরিভাবে চাল, নগদ টাকা, ঢেউটিন, কাপড় ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও ব্যক্তিপর্যায়েও জরুরি ত্রাণ সহায়তার মাধ্যমে জরুরি অবস্থা মোকাবেলা করা হয়।

সামাজিক নিরাপত্তা কার্যত্রম ভিজিডি ইউপি ওয়ার্ড কমিটি ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে একদিন স্ব-ওয়ার্ডের সকল মহিলাদেরকে জড়ো করবে। ওইদিন যদি অন্তত ৫০০ মহিলা জড়ো হয় তবে প্রত্যেকের সাক্ষাতকার নিতে হবে, নির্ধারিত ফরমে তাদের ঠিকানাসহ বিস্তারিত লিখতে হবে। সে ৫০০ জন থেকে ওই ওয়ার্ডের জন্য বরাদ্দকৃত মহিলা ওয়ার্ড কমিটি বাছাই করবেন। বাছাই করে ইউনিয়নের ভিজিডি কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন। ইউপি ভিজিডি (Valnerable group Development) কমিটি চূড়ান্ত অনুমোদন দিবে। দুঃস্থ নারী, স্বামী পরিত্যক্তা, বিধবা, পঙ্গু স্বামী এধরনের নারীরা এবং ১৫ শতাংশের কম জমি যাদের এতে তারা অগ্রাধিকার পাবে। ভিজিডি সুবিধা পাবে শুধু মহিলারা।

টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা

ভিজিএফ ভিজিএফ (Valnerable group feeding) ও ভিজিডি উভয়ের নিয়ম প্রায় একই। তবে ভিজিএফ কার্ড নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য বিবেচ্য।

জিআর জি আর (Government Relief) অর্থ সরকারি ত্রাণ। দেশে বন্যা, ঝড় ইত্যাদি দুর্যোগেকবলিত হলে এবং দেশের দুঃস্থ ও হতদরিদ্রকে এই ত্রাণ দেওয়া হয়। তা ছাড়া অবকাঠামো নির্মাণ ও স্বল্প সুদে লোন দিয়ে সমাজের শিক্ষিত বেকারদের কাজের ব্যবস্থা করে থাকে।

টিআর টিআর অর্থ টেস্ট রিলিফ। এটি একটি সরকারি প্রকল্প। ১৯৭৫ সালে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে। প্রতিবছর এই প্রকল্পটি ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার মাধ্যমে বন্যা ও সাইক্লোনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক

দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদেরকে সাহায্য করে থাকে এবং পুনর্বাসন ও কর্মক্ষেত্রের ব্যবস্থা করে থাকে।

কাবিখা কাবিখা অর্থ কাজের বিনিময়ে খাদ্য। এটি একটি সরকারি প্রকল্প। উপজেলার প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার মাধ্যমে উপজেলা চেয়ারম্যানের অনুমতিসাপেক্ষে এই প্রকল্পের অর্থ বণ্টন হয়। এই প্রকল্পটি এলাকায় রাস্তাঘাট, স্কুলকলেজ, মন্দির, মসজিদ নির্মাণসহ বিভিন্ন কাজ করে থাকে।

কাবিটা কাবিটা অর্থ কাজের বিনিময়ে টাকা। এটিও একটি সরকারি প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে রাস্তাঘাট, মসজিদ, মন্দির, স্কুলকলেজ ও মাঠে মাটি ভরাটসহ বিভিন্ন উন্নয়নমুলককাজ করে থাকে।

অধ্যায়-১৮

স্থানান্তর, অভিবাসন ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান

স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাস করার উদ্দেশ্যে মানুষের একস্থান হতে অন্যস্থানে গমনকে অভিবাসন বলা হয়। অভিবাসন এক দেশ হতে অন্য দেশে অথবা দেশের অভ্যন্তরেও একস্থান হতে অন্য স্থানে, অনেক দূরে বা কাছাকাছি হতে পারে। তবে গন্তব্যস্থলে বসবাস করার উদ্দেশ্য না থাকলে এ ধরনের স্থানান্তরকে অভিবাসন বলা যাবে না।

উন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের মাঝে বিভিন্ন কর্মচাহিদা পূরণ করতে প্রায় ২৫ কোটির বেশি মানুষ আন্তর্জাতিক অভিবাসী হিসেবে স্বদেশ ছেড়ে অন্য দেশে বাস করছে বা কাজ করছে।

বাংলাদেশের মতো নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে অভিবাসী নাগরিকরা স্বদেশে বৈদেশিক মুদ্রা (Remittance) প্রেরণের মাধ্যমে কেবল অর্থনীতিতেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে না, দীর্ঘ মেয়াদে তারা অভিবাসী রাষ্ট্রে বাংলাদেশের পরিচিতি তুলে ধরছে এবং জীবনের নানামুখী ক্ষেত্রে নতুন কিছু অর্জন করে তা দেশে ফিরে প্রয়োগ করছে।

খুলনা জেলায় অভিবাসন

খুলনায় মূলত অভ্যন্তরীণ অভিবাসনই মুখ্য। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে খুলনা জেলায় অভ্যন্তরীণ অভিবাসন ঘটে থাকে। উপকূলবর্তী অঞ্চল হিসেবে খুলনা জেলার কয়রা, দাকোপ, পাইকগাছা, বটিয়াঘাটা এবং রূপসা উপজেলার দরিদ্র শ্রেণির মানুষের খুলনা শহরে আগমন এবং পরবর্তী সময়ে স্থায়ীভাবে অবস্থান এ এলাকার জন্য খুবই স্বাভাবিক। বিশেষ করে ২৫ মে ২০০৯ ঘূর্ণিঝড় আইলা’র প্রবল ছোবলের পর অভিবাসনের মাত্রা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি এড়াতে এবং উন্নতমানের জীবনযাপনের লক্ষ্যে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারও শহরমুখী। এ এলাকায় প্রকৃতির বৈরী আচরণ, আয়ের স্বল্পতা, লবণাক্ততার প্রকোপ, আবাদি জমি হ্রাস পাওয়া, উৎপাদন কমে যাওয়া, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, কর্মসংস্থানের অভাব, সুচিকিৎসার অভাব, ছেলেমেয়ের জন্য মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব প্রভৃতি থেকে মুক্তি লাভের আশায় মূলত সাধারণ মানুষ শহরমুখী।

Socio-economic and Demographic Report, 2011 অনুযায়ী ২০০৬-২০১০ সাল পর্যন্ত খুলনা জেলায় অভ্যন্তরীণ অভিবাসীর সংখ্যা মাত্র ৫৮,৪৯০ জন যার মধ্যে শহর থেকে শহরে ২১%, শহর থেকে গ্রামে ৩%, গ্রাম থেকে গ্রামে ৩৫.৭% এবং গ্রাম থেকে শহরে ৪০.২%। কিন্তু সর্বনাশা আইলা’র

আঘাতের পর খুলনা জেলার কেবল কয়রা ও দাকোপ উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন থেকে ১ বছরে স্থানান্তরিত হয়েছে ৭৬,০০০ লোক।[১]

খুলনাঞ্চলের অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের পটভূমি:

Climate Risk Indices of German Watch, Maple Croft, World Bank, UNDP এবং Dr. Caroline Sullivan-এর মতে, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম।[২] UNDP-এর রিপোর্ট অনুযায়ী সাইক্লোন ও বন্যার দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে যথাক্রমে ১ম ও ৬ষ্ঠ স্থান দখল করে নিয়েছে।[৩] উক্ত প্রতিবেদনসমূহ বিশ্লেষণে দেখা যায়, সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে নিম্নচাপ ও ঘূর্ণিঝড় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা আশঙ্কা করছেন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা যদি ৪ মি. বৃদ্ধি পায় তাহলে বাংলাদেশের প্রায় ২ কোটি লোক বাধ্য হয়ে স্থানান্তরিত হবে।[৪] বিশ্ব উষ্ণতার এই ক্রমবিকাশ যদি হ্রাস করা না যায়, তাহলে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ১৭% উপকূলবর্তী অঞ্চল জলমগ্ন হবার সম্ভাবনা রয়েছে।[৫] সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অভিবাসন দৃশ্যের ক্রমাবনতি হতে পারে এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা Oxfam-এর প্রাক্কলন অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ৬ লাখ লোক স্থানচ্যুত হবে।

ঘূর্ণিঝড় আইলা ২৫ মে ২০০৯ সালে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে আঘাত হানে। এর মাত্র ১৮ মাস আগে ১৫ নভেম্বর ২০০৭ সালে দেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে সিডরের আক্রমণ ছিল আরও ভয়াবহ। আইলাতে মৃতের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৯৩ জন। কিন্তু অবকাঠামো, ঘরবাড়ি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আবাদযোগ্য জমি ও ফসল এবং সার্বিক জীবনযাত্রার যে ক্ষতি হয়েছে তা দীর্ঘমেয়াদি। খুলনা জেলার কয়রা ও দাকোপ এবং সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর ও আশাশুনি উপজেলা আইলাতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সাইক্লোন আইলা উত্তর অভিবাসন:

একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় মে-জুন ২০০৯ এর মধ্যবর্তী সময়ে প্রায় ৮৮,০০০ লোক আইলাদুর্গত এলাকা থেকে অনত্র চলে যায়।[৬] খুলনার স্থানীয় দৈনিক পূর্বাঞ্চলের ২২ আগস্ট, ২০০৯-এর প্রতিবেদনে দেখা যায় কমপক্ষে ১,২৫,০০০ লোক স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে তারা সাতক্ষীরা,

---

[১] Humanity Watch, Khulna: July 2010.

[২] S. Harmelling (2010). Global Climate Risk Index 2010, German Watch.

[৩] UNDP (2004) A Global Report: Reducing Disaster Rise: A Challenge for Development.

[৪] Foundation for the Future, Washington: December 2008.

[৫] Stern Review on the Economics of Climate Change, London, October 2006.

[৬] K. Roy et al 2010.

পাইকগাছা, ডুমুরিয়া এবং বটিয়াঘাটা উপজেলা সদরে আশ্রয় নেয়। কিন্তু এক থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে তারা খুলনা ও যশোরে গমন করে। তৃতীয় পর্যায়ে তারা রাজধানী শহর ঢাকা, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম শহরে ছড়িয়ে পড়ে।[৭] খুলনা সিটি করপোরেশন সূত্রে জানা যায়, প্রায় ১৫,০০০ লোক তাদের আশ্রয় শিবিরে অবস্থান করে এবং তারা রিকশাচালক ও দিনমজুর হিসেবে কাজ শুরু করে। খুলনা শহর এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকা যেমন: বটিয়াঘাটা, রূপসা এবং ডুমুরিয়ার প্রায় ৪১টি বস্তিতে আইলা বিধ্বস্ত এলাকার মানুষ অবস্থান নেয়।

অভিবাসনের কারণসমূহ Humanity Watch-এর জরিপ :

Humanity watch-এর Campaign for Sustainable Rural Livelihoods (CSRL)-এর এক জরিপে দেখা যায়, আইলায় ৭৪.৪% বসতঘর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তাদের ভিটাবাড়ি ও চাষের জমি লবণাক্ত পানিতে ডুবে যায়। ১১.৬% যাদের কেবল ভিটাবাড়ি ছাড়া আর কিছুই ছিল না তা সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমনকি ৭.৯% লোকের বসবাস করার মতো নিজস্ব কোনো জমিজমা ছিল না। বসতঘর এবং ভিটাবাড়ি ছাড়া আর কিছু ছিল না এমন অভিবাসীর সংখ্যা ১২.৬%। কাজের সুযোগ না থাকায় খাদ্যাভাবে এলাকা ছেড়েছেন ১৭.২%। সর্বোপরি, আইলা পরবর্তীকালে বাঁধে অবস্থানকালীন মহিলা ও যুবতী মেয়েদের নিরাপত্তাজনিত কারণে এলাকা ত্যাগ করেছেন ২.৮% লোক।

অভিবাসনের শিকার এমন লোকের মধ্যে হিউম্যানিটি ওয়াচের জরিপে দেখা যায়, ৪৮.৭% হতদরিদ্র শ্রেণির, ২৯.৪% দরিদ্র শ্রেণির, ৮.৩% নিম্নমধ্যবিত্ত, ৬.১% মধ্যবিত্ত, ৫.৭% উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং ১.৮% ধনীক শ্রেণিভুক্ত।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান

বিপুল জনশক্তি অধ্যুষিত বাংলাদেশের বেকারত্ব দূরীকরণ ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বৈদেশিক কর্মসংস্থান আমাদের জন্য একটি বিরাট সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। প্রবাসী কর্মীগণ তাদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দেশে প্রেরণ করে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে শক্তিশালী করছে। প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্স দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অপরিসীম অবদান রাখছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিটেন্স প্রবাহ

জেলা জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর তথ্য মতে, ১৯৭১ থেকে জুন ২০১৪ পর্যন্ত এ জেলা থেকে বিদেশগমনকারী কর্মীর সংখ্যা ১৯,৮৮৮ জন, তন্মধ্যে পুরুষ ১৭,৫৫৫ জন এবং মহিলা ২,৩৩৩ জন। জাতীয়পর্যায়ের তুলনায় তা খুব নগণ্য। বৈধ প্রবাসীর সংখ্যা ৮৫ লাখের তুলনায় এটি মাত্র ০.২৩ শতাংশ। আবার পুরুষ ও মহিলার হার যথাক্রমে ৮৮.২৬ এবং ১১.৭৭ শতাংশ।

---

[৭] Coastal Campaign Group for Sustainable Rural Livelihoods, Khulna: 14 November 2009.

বৈদেশিক কর্মসংস্থানে কম যাওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে: ১) ইংরেজি ভাষা না জানা, ২) সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষা না জানা, ৩) কারিগরি জ্ঞানের অভাব, ৪) দক্ষতার অভাব ৫) আগ্রহের অভাব।

খুলনা জেলা জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মতে, এ জেলার প্রবাসীকর্মীরা শ্রমিক, ড্রাইভার, ওয়েটার, প্লাম্বিং, ইলেকট্রিশিয়ান, রড বাইন্ডার, রাজমিস্ত্রি, কার্পেন্টার, কুক, মালি, ক্লিনার, হাউস কিপার, গৃহকর্মী, নার্স, বেবি সিটার, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি পেশায় নিয়োজিত।

সারণি-১৩৮

এক নজরে খুলনা জেলার জনশক্তি রফতানির চিত্র

(২০০৫ হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত)

সাল	পুরুষ	মহিলা	মোট সংখ্যা
২০০৫	৫৮০	৮০	৬৬০
২০০৬	৯২০	৯১	৯৯৩
২০০৭	২৮৮৮	১৪১	৩০২৯
২০০৮	৩৬২৮	১৫৮	৩৭৮৬
২০০৯	১৮৫৬	১৬৫	২০২১
২০১০	১৫৭৯	২৩৭	১৮১৬
২০১১	১৮৫২	২৩১	২০৮৩
২০১২	২২৪৯	৩৪২	২৫৯১
২০১৩	১১৭৯	৪৪৩	১৬২২
২০১৪	১৪৬৩	৯১৫	২৩৭৮
২০১৫	১৩৮৩	১৪২৫	২৮০৮
২০১৬	১৯৯২	১৬১২	৩৬০৪
সর্ব মোট	২,২০,৮৮৬	২৮০৮০	২,৪৮,৯৬৭

সূত্র: জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, খুলনা।

এ পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, ২০০৫- ২০১২ পর্যন্ত খুলনা জেলা থেকে জনশক্তি রফতানির মোট সংখ্যা হচ্ছে ১৬,৯৭৯ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১৫,৫৩৪ জন এবং মহিলা ১৪৪৫ জন। পুরুষ ও মহিলার হার হচ্ছে যথাক্রমে ৯১.৪৮% এবং ৮.৫২%। এই হার থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ জেলায় মহিলাদের মধ্যে বিদেশে কাজ করার প্রবণতা এখনও কম। অন্যদিকে পুরুষের হার অগ্রগণ্য।

আবার বছরভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, ২০০৮ সালে সর্বোচ্চ জনশক্তি রফতানি হয়েছে ৩,৭৮৬ জন, ২০০৭ সালে ৩,০২৯ জন, ২০১২ সালে ২৫৯১ জন, ২০১১ সালে ২,০৮৩ জন, ২০০৯ সালে ২,০২১ জন, ২০১০ সালে ১,৮১৬ জন, ২০০৬ সালে ৯৯৩ জন এবং ২০০৫ সালে ৬৬০ জন। এতে দেখা যাচ্ছে, সরকারের নানামুখী গঠনমূলক কর্মউদ্যোগের প্রেক্ষিতে ২০০৯ সাল থেকে বর্তমান বছরগুলোতে জনশক্তি রফতানি ব্যাপকহারে বেড়েছে। তবে পুরুষ ও

মহিলাদের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে যে, মহিলা জনশক্তি রফতানির হার অত্র জেলায় স্থবির অবস্থায় রয়েছে।

জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, খুলনার সূত্রমতে, জুন ২০১৪ পর্যন্ত দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ বাবদ ক্ষতিপূরণ/সাহায্য প্রাপ্তির পরিমাণ হচ্ছে লাশ পরিবহণ ও দাফন ৫৬ জন, টাকার পরিমাণ- ১২,০০,০০০/= আর্থিক অনুদান- ৫৩ জন, টাকার পরিমাণ হচ্ছে ১,৩৮,১৮,৪৯৮.৮০ এবং মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ ৫৫ জন এবং টাকার পরিমাণ হচ্ছে ৩৯,৬২,৫৯৯.০৬।

অধ্যায়-১৯

বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষতা আমাদের জীবনকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত করেছে। উন্নত বিশ্বের সাথে উন্নয়নের আনুপাতিক হার বজায় রাখতে বাংলাদেশেও তথ্যপ্রযুক্তির প্রচার ও প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ চলছে। বাংলাদেশ সরকার গঠন করেছে নতুন মন্ত্রণালয়- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়-তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা। দেশের আনাচেকানাচে প্রযুক্তির সুবিধা পৌঁছে দিতে সরকার বদ্ধপরিকর। খুলনা জেলাও এর ব্যতিক্রম নয়। মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটের অবাধ প্রচলন খুলে দিয়েছে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত। আজ জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষও তথ্যপ্রযুক্তি সেবার বাইরে নয়। সুরখালি বা বানিশান্তার মতো অঞ্চলে ইন্টারনেট সেবার প্রসার ঘটেছে। দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যার সহজ সমাধানের পাশাপাশি জেলার দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট সেবার বিস্তার দুর্যোগ ক্ষতির ঝুঁকি অনেকাংশে কমিয়ে এনেছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া

বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি উদ্যোগের মধ্যে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এতোদ্দেশ্যে খুলনা জেলাকে ডিজিলাইজেশন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হলো:

ক) খুলনা জেলার সকল কর্মচারীর জন্য Emlployee Manangement Information System-EMIS-এর মধ্য, কর্মচারীদের কর্মকালীন অবস্থাসহ সামগ্রিক তথ্য অতি দ্রুত জানার ফলে বদলিসহ সামগ্রিক কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

খ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়কে সম্পূর্ণ সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে। যার ফলে অফিসের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয়েছে।

গ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সকল কম্পিউটার, ল্যাপটপ, অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসে ল্যান্ড কানেকশন ও ওয়াইফাইয়ের মাধ্যমে উচ্চ গতির ইন্টারনেট সংযোগের আওতায় আনা হয়েছে। যার ফলে ই-ফাইল (নথি) সহ সকল কার্যক্রমের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

ন্যাশনাল, জেলা ও উপজেলা, ওয়েব পোর্টাল

ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টালের আওতায় বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন ওয়েব পোর্টাল খুলনা জেলার সরকারি কর্মকাণ্ড ও সেবা জনমানুষের দোরগোড়ায় এনে দিয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে খুলনা জেলায় ‘এ টু আই’ প্রকল্পের আওতায় পোর্টালসমূহ এবং ই-সার্ভিস সিস্টেম ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। জেলার সব সরকারি অফিস পোর্টাল ব্যবহার করে তাদের সেবার বর্ণনা এবং ক্ষেত্রবিশেষে

অনলাইন সেবা প্রদান করে। এসব পোর্টালে নিয়মিত প্রয়োজনীয় তথ্য আপলোড ও হালনাগাদ নিশ্চিত করতে প্রতিমাসে জেলা, উপজেলা ও থানাপর্যায়ে সভা আহ্বান করে অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসেবে এটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিগত ১০-০৯-২০১৪ তারিখে এ টু আই কর্তৃক পাঠানো প্রতিবেদন অনুযায়ী খুলনা জেলা পোর্টালে ৯৭% তথ্য আপলোড হয়েছে এবং একই প্রতিবেদনের হিসাব অনুযায়ী উপজেলা ও ইউনিয়ন পোর্টালে তথ্য আপলোডের হার দেখানো হলো-

সারণি-১৩৯[১]

উপজেলা ও ইউনিয়ন পোটাল তথ্য

ক্র. নং	উপজেলা	উপজেলা পোর্টালে তথ্য আপলোডের হার	ইউনিয়ন পোর্টালে তথ্য আপলোডের হার
১	রূপসা	৯৯%	৯৬%
২	তেরখাদা	৯৪%	৮৩%
৩	দিঘলিয়া	৯৯%	৯৮%
৪	ফুলতলা	৯৪%	৯১%
৫	ডুমুরিয়া	১০০%	৯৬%
৬	বটিয়াঘাটা	৯৮%	৬৯%
৭	দাকোপ	৭৬%	৬৩%
৮	পাইকগাছা	৯৯%	৯২%
৯	কয়রা	৯৭%	৭৭%

রিপোর্টটিতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আপলোড ও হালনাগাদকরণে জেলা ও অধিকাংশ উপজেলার অগ্রগতি বেশ আশাব্যঞ্জক। জেলা ও উপজেলাপর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে পিছিয়ে থাকা পোর্টালগুলোর তথ্য হালনাগাদ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার

এ টু আই প্রকল্পের আওতায় শুরু হওয়া ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র এখন ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার নামে পরিচিত। খুলনা জেলার মোট ৯টি উপজেলার ৬৮টি ইউনিয়নের প্রত্যেকটিতে সেন্টারটি চালু আছে। জন্মনিবন্ধন, ছবি তোলা, কম্পোজ করা, পরীক্ষার ফলাফল, ফটোকপি, অনলাইনে বিভিন্ন ধরনের আবেদন, কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, স্ক্যানিং, ই-মেইল, জি টু জি পদ্ধতিতে বিদেশ গমনের জন্য আবেদন ইত্যাদিসহ নিত্যকার অতি প্রয়োজনীয় সব কাজ এখন ডিজিটাল সেন্টারে হয়। সেন্টারগুলোতে সেবা দানের পাশাপাশি বেকার যুবকদের কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান করা হচ্ছে। এগুলোতে উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করে প্রতিটি সেন্টারে একজন মহিলা এ একজন পুরুষকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিমাসে সেবা দিয়ে তারা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে। এতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির সাথে

[১] জেলা প্রশাসন, খুলনা।

সাথে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও উপার্জনের মাধ্যমে পরিবারে অবদান রাখায় নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা হচ্ছে। নিচে ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের ২০১৪ সালের সেপটেম্বর মাসের উপজেলাভিত্তিক আয়ের তালিকা দেওয়া হলো:

সারণি-১৪০

ডিজিটাল সেন্টারের আয়

ক্র. নং	উপজেলা	নিবন্ধনকৃত ইউনিয়নের সংখ্যা	মোট আয় (টাকা)	মোট সেবাগ্রহীতা (জন)
১	দিঘলিয়া	৬	৬৬,৯৯৪	১,৩৩৬
২	কয়রা	৭	৬২,৯৩৭	১,৬৫৭
৩	পাইকগাছা	১০	৯৪,৯৫১	৯৬৯
৪	ফুলতলা	৪	১৫,৪১২	৫০৩
৫	রূপসা	৫	২৩,৮৭৩	৬২১
৬	বটিয়াঘাটা	৭	১,২৮,৬৮০	৩,২৭২
৭	দাকোপ	৯	৩১,৭৮৬	৮২৩
৮	ডুমুরিয়া	১৪	১০,৯০,১৬৬	৮,৬৬২
৯	তেরখাদা	৬	২৫,৬১৪	১,১৮৭

উদ্যোক্তাদের উপকরণ প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দান করে যুগোপযোগী সেবা প্রদান করা হচ্ছে। জেলার নিভৃত অঞ্চলগুলোতে আধুনিক ও দ্রুততম সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারগুলোকে আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম মূল্যায়ন ও বরাদ্দ প্রদানে সংশ্লিষ্ট ডিজিটাল সেন্টারের কার্যক্রম বিবেচনা করা হয়।

ভূমি ব্যবস্থাপনায় ডিজিটালাইজেশন

জমির পর্চা উত্তোলনে গ্রাহক ভোগান্তির অবসান ঘটাতে পর্যায়ক্রমে জেলার সকল ভূমির খতিয়ান অনলাইনে অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া চলছে। প্রক্রিয়া সমাপ্ত হলে অনলাইনে ফর্ম পূরণ করে ঘরে বসেই জমির পর্চা পাওয়া যাবে। এছাড়া বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক লাইসেন্স প্রদানের প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজেশনের আওতায় আনতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক খুলনায় জেলাপর্যায়ে ২৭টি ও উপজেলা পর্যায়ে ৫০টি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ২০১৪ সালের আগস্ট মাসে ক্লাস গ্রহণের তথ্য:

সারণি-১৪১

মাল্টিমিডিয়া ক্লাস নেওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

পর্যায়	মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম আছে এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শতকরা হার
মাধ্যমিক	৪০৬	২৮১	৬৯%
প্রাথমিক	৩০	২৯	৯৭%

কম্পিউটার বিষয়ে মৌলিক প্রশিক্ষণের জন্য জেলায় প্রায় ৫০০ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। সবচেয়ে বেশি আছে ডুমুরিয়া উপজেলায়। এসব কেন্দ্রে ই-মেইল, কম্পোজ, মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড , এক্সেল ইত্যাদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় ফ্রি ল্যান্সিং বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজন করা হয়।

খুলনায় স্কুলপর্যায়ের পাঠ্যবই থেকে শুরু করে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম সাধিত হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তির শিক্ষার প্রসারের জন্য। তথ্যপ্রযুক্তি প্রসারের ফলে, মানুষের জীবনযাত্রার যেমন মানোন্নয়ন ঘটেছে, তেমনি মানুষের জীবন হয়েছে সহজ থেকে সহজতর। খুলনা জেলাতে তথ্যপ্রযুক্তি প্রসারের লক্ষ্যে এই জেলার বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোতে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া জেলার সাধারণ মানুষের কাছে তথ্যপ্রযুক্তি সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য খুলনা জেলা তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে।

সফটওয়্যার ফার্মসমূহ

বর্তমানে খুলনা তথ্যপ্রযুক্তি খাতে যে অগ্রগতি হয়েছে তা খুলনায় অবস্থিত সফটওয়্যার নির্মাণ ফার্মের কার্যক্রম দেখলেই বোঝা যায়। প্রয়োজনীয় সব সফটওয়্যার নির্মাণ করে দেশকে যেমন আধুনিকতার ছোঁয়া দিচ্ছে তেমনি এসব সফটওয়্যার বিদেশে রফতানি করে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হয়েছে। খুলনা জেলার কিছু সফটওয়্যার কোম্পানি হলো প্রাণন প্রাইভেট লিমিটেড (www.pranon.com), খুলনা সফট (khulnasoft.com), ইন্নভা সফট (www.innovasoft.in), ড্রিম সফট, W3 ইঞ্জিনিয়ারস (w3engineers.com), এবি কোডার (abcoder.com)।

হার্ডওয়্যার মার্কেট

খুলনা জেলাতে ডাকবাংলো মোড়ে অবস্থিত জলিল মার্কেটে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার সরঞ্জামাদি ক্রয়ের বিভিন্ন দোকান রয়েছে। এটি খুলনা জেলাতে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার সরঞ্জামাদি প্রাপ্তির সবচেয়ে বড়ো মার্কেট। এখানে অবস্থিত দোকানগুলোর মধ্যে-মাক্সিম ইন্টারন্যাশনাল, আরিয়ানা সিস্টেম, কম্পিউটার গ্রাফিক্স, ইন্টারওয়েভ কম্পিউটার, ওয়ার্ল্ডকম, রেজিন টেকনোলজি, ইনটিজার কম্পিউটার, ফ্লোরা কম্পিউটার, কম্পিউটার সোর্স ইত্যাদি অন্যতম।

অনলাইন সেবা সুবিধা

সরকারিভাবে তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অনলাইনে বিভিন্ন তথ্যের সমাহার ঘটানো হয়েছে। সাধারণ মানুষ http:// www.khulna.gov.bd/ এই ঠিকানায় ঢুকে জেলা এবং প্রশাসনিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।

বিটিসিএল

সরকারিভাবে তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে বিটিসিএল বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করে থাকে। খুলনা টেলিফোন ভবন তিন তলা বিশিষ্ট একটি সুরম্য ভবন। এ ভবনেই ১৭,৬৪৯ ধারণক্ষমতাসম্পন্ন অত্যাধুনিক ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অবস্থিত। এ টেলিফোন এক্সচেঞ্জ থেকেই খুলনা মহানগরীর সিংহভাগ এলাকায় টেলিফোন এবং ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট (ADSL, Leased internet, DDN) সংযোগ দেওয়া হয়। রাত দিন ২৪ ঘণ্টা '১৮' ডায়াল করে টেলিফোনে অভিযোগ প্রদান করতে পারেন। বিটিসিএল-এর খুলনা শাখা প্রদত্ত বিভিন্ন সেবা ও ইন্টারনেট সম্পর্কিত তথ্য http://www. khulna.gov.bd /node/990347 এই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

ইন্টারনেট সুবিধা

জেলাতে প্রধান ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বিটিসিএল। জেলার অফিস আদালত ও বড়ো ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা বিটিসিএল প্রদান করে। এছাড়া খুলনা জেলাতে ইন্টারনেট সেবা প্রদানের জন্য কিছু প্রাইভেট কোম্পানি রয়েছে। গ্রামীণ ফোন, বাংলালিংক, রবি, এয়ারটেল, বাংলালায়ন, লিংক থ্রি, আকিজ ইত্যাদি বড়ো বড়ো কোম্পানির পাশাপাশি কিছু ছোটো কোম্পানি যথা- ম্যাক্সিম ইন্টারন্যাশনাল, আরিয়ানা সিস্টেম, কম্পিউটার গ্রাফিক্স, ইন্টারওয়েভ কম্পিউটার, ওয়ার্ল্ডকম, রেজিন টেকনোলজি, ইনটিজার কম্পিউটার ইন্টারনেট সেবা দিচ্ছে। দেশে 3G সেবা চালু আছে। 4G সেবা চালুর বিষয়ে ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান সরকারের উদ্যোগে এসব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

অধ্যায়-২০

বিশেষ পণ্য

বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জেলা হচ্ছে খুলনা। এই জেলায় দুই ধরনের বিশেষ পণ্য রয়েছে। যেমন-

১. ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পজাত বিশেষ পণ্য
২. কৃষিজাত বিশেষ পণ্য

ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পজাত বিশেষ পণ্য:

ইংরেজ শাসনামলে নীলকর সাহেবদের জুলুমের ফলে খুলনা জেলার প্রাচীন লবণ এবং গুড়শিল্প দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৫০ সালের আগে এখানে কোনো উল্লেখযোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। এ সময়ে কামার, কুমার, তাঁতি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক হাঁড়ি-পাতিল, থালা-বাসন, শাড়ি-চাদর প্রভৃতি পণ্য উৎপাদন করে স্থানীয় প্রয়োজন মেটাত।[২]

মোগল আমল থেকেই লবণ তৈরির অন্যতম প্রধানকেন্দ্র ছিল খুলনা। তখন কৃষকদের অন্যতম পেশা কৃষির পাশাপাশি লবণ শিল্প ছিল সম্পূরক পেশা। কৃষকগণই অবসর সময়ে লবণ প্রস্তুত করত। তাই এই শিল্পের সাথে কৃষির খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মোগল আমলে এ শিল্প রাজস্ব সংগ্রহের একটি বিশেষ উৎস ছিল। এ শিল্পের উন্নতির জন্য বাংলার নবাবগণ যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। নবাব আলিবর্দী খাঁর আমলে লবণের মূল্য কম ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভে লবণ চাষিরা আগের মতো সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। আর তখন থেকেই লবণ উৎপাদন ও ব্যাবসার ক্ষেত্রে ভীষণ অরাজকতা দেখা দেয়।[৩] **লবণ**

তবে বর্তমানে আবারও এই শিল্পের পুনরুজ্জীবন লক্ষ করা যাচ্ছে। বর্তমানে খুলনায় লবণ প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের কারখানা মোট ৬টি। একটি খুলনা সিটি করপোরেশন এলাকায় অবস্থিত। অন্য ৫টি রূপসা উপজেলায় অবস্থিত।[৪]

প্রাক-ব্রিটিশ আমল থেকেই খেজুরের গুড় উৎপাদন ছিল একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প। আজও খুলনা জেলার কয়েকটি উপজেলায় এর ব্যাপক বিস্তৃতি রয়েছে।

বর্তমানে খুলনা জেলার তিনটি স্থানে এই গুড় উৎপন্ন হয়। সবচেয়ে বেশি গুড় প্রসেসিং কারখানা আছে পাইকগাছা উপজেলায়। এই উপজেলায় ৫৩২টি গুড়

---

[২] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৩৮।
[৩] ওই, পৃ. ২৪০।
[৪] Khulna District Statistics, 2011, BBS, Dhaka, p. 59.

প্রসেসিং ইউনিট আছে। তেরখাদা উপজেলায় আছে ১১৫টি। খুলনা সিটি করপোরেশন এলাকায় আছে ২টি। বিষয়টি সারণিতে দেখানো হলো:

সারণি-১৪২

গুড় প্রসেসিং ইউনিটের সংখ্যা

উপজেলা/সিটি করপোরেশন এর নাম	গুড় প্রসেসিং ইউনিট
খুলনা সিটি করপোরেশন	২
পাইকগাছা	৫৩২
তেরখাদা	১১৫
মোট	৬৪৯

উৎস: খুলনা জেলা পরিসংখ্যান, ২০১১

তাঁত শিল্প খুলনা জেলায় তাঁত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কুটিরশিল্প। একটি সারণিতে তাঁত শিল্পের পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

সারণি-১৪৩

তাঁত শিল্পের সংখ্যা

উপজেলা/সিটি করপোরেশন এর নাম	কারখানার সংখ্যা	সক্রিয়	নিষ্ক্রিয়
ফুলতলা	৩০০	২৬০	৪০
ডুমুরিয়া	৪২০	৪২০	-
খুলনা সিটি করপোরেশন	২	২	-
মোট	৬৮২	৬৮২	৪০

উৎস: খুলনা জেলা পরিসংখ্যান, ২০১১

সারণি-১৪৪

খুলনা জেলার তাঁত শিল্পে কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা

উপজেলা/সিটি করপোরেশনের নাম	তাঁতের সংখ্যা	কর্মরত শ্রমিক			সর্বমোট
		পরিবার	পেশাদার	ভাড়াকৃত	
ডুমুরিয়া	৪২০	৯৩০	-	-	৯৩০
খুলনা সিটি করপোরেশন	২	৩	২	২	৭
ফুলতলা	২৬০	৩৭০	-	৫০	৪২০
মোট	৬৮২	১৩০৩	২	৫২	১৩৫৭

উৎস: খুলনা জেলা পরিসংখ্যান, ২০১১।

সারণিতে দেখা যাচ্ছে, ডুমুরিয়া উপজেলাতে ৪২০টি তাঁত শিল্প আছে। এই তাঁত শিল্পে ৯৩০টি পরিবার এখানে কাজ করে। খুলনা সিটি করপোরেশনে ২টি তাঁত শিল্প আছে। এখানে তিনটি পরিবার কাজ করে, তন্মধ্যে ২জন দৈনন্দিন এবং ২জন ভাড়া করা। মোট ৭ জন এখানে কাজ করে। ফুলতলা উপজেলায় ২৬০টি তাঁত শিল্পের কারখানা আছে। এখানে মোট ৩৭০টি পরিবার তাঁত শিল্পে নিয়োজিত। তন্মধ্যে ভাড়া করা ৫০টি পরিবার। মোট ৪২০ জন শ্রমিক এখানে নিয়োজিত। খুলনা জেলায় মোট তাঁত শিল্প আছে ৬৮০টি। ১,৩০৩টি পরিবার এ শিল্পে নিয়োজিত। এর মধ্যে নিয়মিত ২ জন এবং ৫২ জন ভাড়াটিয়া শ্রমিক। সর্বমোট ১,৩৫৭ জন শ্রমিক এখানে কর্মরত।

বাঁশ ও বেত শিল্প

খুলনা জেলার সবগুলো জেলাতে বাঁশ ও বেত সামগ্রী তৈরি হয়। এই শিল্পে বেশকিছু লোক নিয়োজিত। সারণিতে তা দেখানো হলো:

সারণি-১৪৫

খুলনা জেলার বাঁশ ও বেত শিল্পে কর্মরত শ্রমিকসংখ্যা

উপজেলা/সিটি করপোরেশনের নাম	ইউনিট	কর্মরত শ্রমিক		মোট
		পরিবার	ভাড়াকৃত	
বটিয়াঘাটা	১১৮	৩৫৪	০	৩৫৪
দাকোপ	৬৫	১৩০	০	১৩০
দিঘলিয়া	৪৪	১৫৪	০	১৫৪
ডুমুরিয়া	৫১০	৯৪০	০	৯৪০
খুলনা সিটি করপোরেশন	১১	১৭	২০	৩৭
কয়রা	৩৫	৭০	০	৭০
পাইকগাছা	১২৫	২৫০	১৫০	৪০০
ফুলতলা	১১৯	১৬৯	৩০	১৯৯
রূপসা	৪৩	১৩১	০	১৩১
তেরখাদা	১৭	৫১	০	৫১
মোট	১,০৮৭	২,২৬৬	২০০	২,৪৬৬

উৎসঃ খুলনা জেলা পরিসংখ্যান, ২০১১

সারণিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সবচেয়ে বেশি বাঁশ ও বেত শিল্প গড়ে উঠেছে ডুমুরিয়া উপজেলাতে। মোট ৯৪০টি পরিবার এ শিল্পে নিয়োজিত। অন্যান্য উপজেলাতেও এ শিল্প রয়েছে।

অন্যান্য কুটিরশিল্প পণ্য

এছাড়া অন্যান্য বিশেষ দ্রব্যের মধ্যে নলখাগড়া দিয়ে মাদুর ঝুড়ি তৈরির ব্যাপক প্রচলন আছে। শীতের সময়ে এসব মাদুর শিল্পের কারিগররা গভীর সুন্দরবন এলাকা থেকে প্রচুর পরিমাণে নলখাগড়া সংগ্রহ করে নিয়ে এসে বাড়িতে বসেই তারা বিভিন্ন আকারের ঝুড়ি তৈরি করে। সুন্দরবন এলাকার আশেপাশে এসব

ঝুড়ি, মাদুর তৈরির একটা ছোটোখাটো সম্প্রদায় রয়েছে। সুন্দরবন এলাকায় গোলপাতা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। গোলপাতাকে 'গরিবের ঢেউটিন' বলে। খুলনা অঞ্চলে এ পাতার প্রচুর চাহিদা রয়েছে। স্থানীয় লোকজনদের প্রত্যেকের ঘরের ছাউনি এই গোলপাতা দিয়ে নির্মিত। সুন্দরবন থেকে মধু, মৌমাছি ও মোম সংগ্রহ করা হয়। বিভিন্ন জলাভূমি, খালবিল ও সমুদ্রউপকূল থেকে প্রচুর পরিমাণে ঝিনুক সংগ্রহ করে পুড়িয়ে চুনে পরিণত করা হয়। পান খাওয়ার কাজে চুন ব্যবহৃত হয়। দালানবাড়ি চুনকাম করার জন্য প্রচুর চুন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়া নারিকেলের ছোবড়া, ইট, হাড় ইত্যাদিও খুলনা জেলার বিশেষ দ্রব্য। নারিকেলের ছোবড়া দিয়ে বিভিন্ন আসবাবপত্র তৈরি করা হয়।

অধ্যায়-২১

প্রাকৃতিক সম্পদ

খুলনা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এক জেলা। খুলনা জেলার প্রাকৃতিক সম্পদ হলো খুলনার নদনদী, মৃত্তিকা, খনিজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ ও বনজ সম্পদ। খুলনা জেলার সবচেয়ে বড়ো প্রাকৃতিক সম্পদ হচ্ছে সুন্দরবন।

ভূপ্রকৃতি অনুসারে খুলনা জেলাকে ৪টি পৃথক এলাকায় বিভক্ত করা যায়। উত্তর-পশ্চিমাংশের ভূমি স্বাভাবিক প্লাবন সীমারেখা থেকে বেশ উঁচু। এখানে জনবসতি খুব ঘন এবং সর্বত্র খেজুর, তাল, আম ও অন্যান্য গাছপালায় পরিপূর্ণ। উত্তর-পূর্বদিকে নিম্নভূমি এবং ছোটো বড়ো অসংখ্য জলাশয় রয়েছে। এখানে জনবসতি তেমন ঘন নয়। এ অঞ্চলে সাধারণত ডিসেম্বর থেকে জুন মাস পর্যন্ত নদীর পানি লোনা থাকে। কিন্তু বর্ষাকালে বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে অধিক পানি প্রবাহের ফলে এই লবণাক্ততা নিম্ন দিকে অনেক দূর পর্যন্ত সরে যায়। খুলনা জেলার মধ্যবর্তী এলাকার ভূমিও নিচু। বর্তমানে এ অঞ্চল ঘনবসতি ও এখানে কৃষিকাজ বৃদ্ধি পেয়েছে। জেলার মধ্যবর্তী অঞ্চলে পুকুরের সংখ্যা অনেক। জেলার সর্বদক্ষিণে সমুদ্রতীরে বহু জলাভূমি ও বিল রয়েছে। সুন্দরবন এই এলাকায় অবস্থিত। জেলার দক্ষিণের প্রায় অর্ধেকাংশজুড়ে কর্দমাক্ত লোনা পানির জোয়ারভাটা এলাকায় সুন্দরবনের অবস্থান। জেলার মূল ভূখণ্ড থেকে বন এলাকা আলাদা।

খনিজ সম্পদ

খুলনা জেলার উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদ হচ্ছে পিট কয়লা। এই জেলার তেরখাদা উপজেলায় উন্নতমানের পিট কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। এখানে পিট কয়লার স্তর ০.২৫ মিটার থেকে ৩ মিটার পুরু। অনুমান ৩৮.৮৫ বর্গকিলোমিটারের বেশি এলাকায় এই পীট কয়লা মজুত আছে। এই পিট কয়লা মজুদের পরিমাণ ৮০ মিলিয়ন টন (ভেজা পিট)। এ পিট জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের উপযোগী বলে প্রমাণিত।[১]

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক খুলনা জেলায় ১৯৯৩ পর্যন্ত আবিষ্কৃত খনিজ সম্পদের প্রাপ্তিস্থান ও মজুতের পরিমাণ দেওয়া হলো:

সারণি-১৪৬

খুলনা জেলার খনিজ তথ্য

খনিজের নাম	এলাকার নাম ও অবস্থান	মজুতের পরিমাণ
পিট কয়লা	খেলা মৌজা, তেরখাদা	৮০ মিলিয়ন মেট্রিক টন

[১] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত: পৃ. ৮।

বনজ সম্পদ খুলনার শতকরা ৯০ ভাগ বনজসম্পদই সুন্দরবনে অবস্থিত। এছাড়া খুলনার গ্রামাঞ্চলে বাড়ির আঙিনায় পরিবারভিত্তিক সৃজিত বন এবং সরকারের সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিতে সৃজিত সামাজিক বনই প্রধান।

পারিবারিক ও সামাজিক বন সামাজিক বন বিভাগ, বাগেরহাটের আওতাধীন খুলনা জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সৃজিত বাগানের তথ্যাদি নিচে দেওয়া হলো:

অর্থবছর	উপজেলা	বাগানের পরিমাণ	প্রকল্পের নাম	বাগানের ধরন
২০০৪-০৫	ফুলতলা, রূপসা, দিঘলিয়া, তেরখাদা	২৫ সিডলিং কিলোমিটার	এফএসপি	স্ট্রিপ বাগান
২০০৫-০৬	রূপসা, দিঘলিয়া, তেরখাদা	২৮ সিডলিং কিলোমিটার	এফএসপি	স্ট্রিপ বাগান
২০০৬-০৭	-	০	-	-
২০০৭-০৮	-	-	-	-
২০০৮-০৯	ডুমুরিয়া	৭ কিলোমিটার	অনুন্নয়ন	স্ট্রিপ বাগান
২০০৯-১০	সকল উপজেলা	৫৪ সিডলিং কিলোমিটার	সিডর কর্মসূচি, অনুন্নয়ন	স্ট্রিপ বাগান, বাঁধ বাগান
২০১০-১১	বটিয়াঘাটা, পাইকগাছা, কয়রা, দিঘলিয়া, রূপসা	৪১ কিলোমিটার	সিডর পরবর্তী বনায়ন কর্মসূচি	সওজ,বাঁধ বাগান, সংযোগ সড়ক
	কয়রা, পাইকগাছা, দাকোপ, ডুমুরিয়া, বটিয়াঘাটা, রূপসা, ফুলতলা, তেরখাদা	বাঁধ ও সংযোগ সড়কে ৪৩০ কিলোমিটার	পাউবোর বাঁধ ও বাঁধসংলগ্ন চর বনায়ন প্রকল্প	বাঁধে স্ট্রিপ ও বাঁধ বাগান
		বাঁধ সংলগ্ন চরে ১২৭.৫ হেক্টর		কেওড়া, ছৈলা, গোলপাতা বাগান
২০১১-১২	সদর উপজেলা, রূপসা, তেরখাদা, কয়রা, পাইকগাছা, দাকোপ	৫০ সিডলিং কিলোমিটার	সিডর পরবর্তী বনায়ন কর্মসূচি	সওজ, বাঁধ,সংযোগ সড়ক বাগান
		১৫০ সিডলিং কিলোমিটার	পাউবোর বাঁধ ও বাঁধসংলগ্ন চর বনায়ন প্রকল্প	বাঁধ বাগান
২০১২-১৩	কয়রা, সিটি করপোরেশন এলাকা	১৬ কিলোমিটার	অনুন্নয়ন	সংযোগ, কেডিএ বাগান
২০১৩-১৪	কয়রা	৩৫.০ কিলোমিটার	দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প	বাঁধ বাগান

অর্থবছর	উপজেলা	বাগানের পরিমাণ	প্রকল্পের নাম	বাগানের ধরন
২০১৪-১৫	বটিয়াঘাটা, ডুমুরিয়া, দাকোপ	৬.০ কিলোমিটার ২২.০০ কিলোমিটার ১২.০০ কিলোমিটার	অনুন্নয়ন SDBC	সংযোগ ও বাঁধ
২০১৫-১৬	তেরখাদা	১২.০০ কিলোমিটার	অনুন্নয়ন	বাঁধ বাগান

সূত্র: সামাজিক বন বিভাগ, বাগেরহাট

সুন্দরবনের অতীত ইতিহাস

প্রাচীনকাল থেকেই সুন্দরবনের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইতিহাসবিদগণ মনে করেন প্রায় দুই হাজার বছর আগে গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকায় সুন্দরবনের সৃষ্টি হয়। ‘নিকোলাস পাইমেন্টা’ নামীয় একজন মিশনারির ভ্রমণ কাহিনিতেও সুন্দরবনের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

মোগল আমল থেকেই সুন্দরবনকে স্থানীয় রাজাদের নিকট পত্তন বা ইজারা দেওয়া হতো। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে স্থানীয় রাজাগণ বনজদ্রব্য রফতানির ওপর কর ধার্য করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মোগল সম্রাটের নিকট হতে ১৭৫৭ সালে সুন্দরবনের স্বত্ব লাভ করে এবং ১৭৬৪ সালে সার্ভেয়ার জেনারেল কর্তৃক জরিপপূর্বক মানচিত্র তৈরি করে। কাঠ রফতানির মাধ্যমে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যে প্রথম সুন্দরবনকে ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হয়। ব্রিটিশ শাসনের শুরুতে চাষাবাদ ও বসতি স্থাপনের জন্য সুন্দরবনের অনেক ভূমি পত্তন দেওয়ার প্রথা বাতিল করা হয়। ব্রিটিশ শাসনামলে সুন্দরবনকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী যে অংশে গাছপালা কম ছিল সে অংশটুকু স্থানীয় ভূস্বামীদের ব্যবহারের জন্য সুন্দরবনের পাশ পর্যন্ত সীমানা চিহ্নিত করে দেওয়া হয় এবং অপর অংশ স্থায়ীভাবে সুন্দরবন হিসেবে রেখে দেওয়া হয়। বেঙ্গল বন বিভাগ স্থাপনের পর ১৮৬০ সাল হতে ধারাবাহিকভাবে সুন্দরবনকে ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হয়। বন আইন-১৮৬৫ মোতাবেক ১৮৭৫-১৮৭৬ সালে সুন্দরবনকে সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৮৬৯ সালে সুন্দরবনকে জেলা প্রশাসনের নিকট হতে খুলনা শহরে নবসৃষ্ট বন ব্যবস্থাপনা বিভাগের নিকট ন্যস্ত করা হয়। Messrs Ritchie, Richards and Martin কর্তৃক সুন্দরবনের নদীসমূহকে একটি তালিকার আওতায় আনা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় এ অঞ্চলের পানি প্রবাহের বিভিন্ন জরিপ করা হয়।

Lt. Prinsep কর্তৃক ১৮২১-২৩ সালে হুগলি হতে যমুনা নদী পর্যন্ত বন ও কৃষি জমির সীমানা জরিপ করা হয়। পরবর্তীকালে ১৮২৯ সাল পর্যন্ত Lt. Hodges আগের জরিপের ধারাবাহিকতায় বলেশ্বর নদী পর্যন্ত সীমানা জরিপ চলমান

রাখেন। এর ০২ বছর পরে তিনি নিজের এবং Lt. Prinsep-এর জরিপ অনুযায়ী ০.৫ ইঞ্চি সমান ০১ মাইল স্কেলে ০১ টি ম্যাপ তৈরি করেন। Captain Smyth ১৮৫০ সাল পর্যন্ত Prinsep and Hodges-এর সীমান্ত লাইন সংরক্ষণ করেন। ১৮৫১-৫৫ সালে ২৪-পরগনা জেলা এবং ১৮৫৫-৫৯ সালে বৃহত্তর খুলনা জেলার রাজস্ব জরিপ করা হয়। পূর্ববর্তী জরিপসমূহের বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক ১৮৭৩ সালে Major James Ellison কর্তৃক সুন্দরবনের একটি ০.২৫ ইঞ্চি সমান ০১ মাইল স্কেলে পূর্ণাঙ্গ ম্যাপ তৈরি করা হয়।

সুন্দরবনের গুরুত্ব সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য ১৮৬৩ সাল হতে ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত বহু ব্রিটিশ বন কর্মকর্তা সুন্দরবন পরিদর্শন করেন। উক্ত বন কর্মকর্তাগণ সুন্দরবনকে সংরক্ষণ ও গাছ আহরণের বিষয়ে আইন প্রণয়নের সুপারিশ করেন। তারা সুন্দরবন হতে আহরিত গাছসমূহ বাণিজ্যিকভাবে রফতানির সময় প্রধান প্রধান নদীতে শুল্ক ফাঁড়ি স্থাপনপূর্বক রফতানিযোগ্য বনজ দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও রাজস্ব আদায়ের সুপারিশ করেন। ১৮৭৫-৭৬ সালে বন বিভাগ ২২টি টোল স্টেশনের মাধ্যমে ৩২,৭২২.০০ টাকা রাজস্ব আদায় করেন।

বঙ্গ প্রদেশের জরিপ বিভাগ কর্তৃক ১৯০৫ হতে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত সুন্দরবন পুনরায় জরিপ করা হয় এবং ১৯০৯ সালে ০১ ইঞ্চি সমান ০১ মাইল স্কেলে ম্যাপ তৈরি করা হয়। ভাঙন এবং জেগে ওঠা ভূমি জরিপ করার জন্য স্থানীয় জরিপকারীদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। হালনাগাদ কার্যকরী পরিকল্পনা প্রস্তুত করার সময় ১৯২৪ সালে সর্বশেষ ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়। ১৯৫৮-৫৯ সালে Aerial Photographs ও মাঠ জরিপের সমন্বয়ে কানাডার ফরেস্টাল ফরেস্ট্রির ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ কর্তৃক সুন্দরবনে আরও একটি জরিপ করা হয়। উক্ত জরিপের ম্যাপ ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়।

১৮৭৫-৭৬ সালের সংরক্ষিত বন ঘোষণার সূত্র ধরে সমগ্র সুন্দরবন পুনরায় ১৯১৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি সংরক্ষিত বনভূমি হিসেবে ঘোষিত হয় যা ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ তারিখে কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়।

সুন্দরবনের বনজসম্পদ

সুন্দরবনের গাছপালার অধিকাংশই ম্যানগ্রোভ ধরনের এবং এখানে রয়েছে বৃক্ষ, লতাগুল্ম, ঘাস, পরগাছা এবং আরোহী উদ্ভিদসহ নানা ধরনের উদ্ভিজ্জ। অধিকাংশই চিরসবুজ হওয়ার কারণে এদের সবার শারীরবৃত্তিক ও গঠনগত অভিযোজন কমবেশি একই রকম। অধিকাংশ বৃক্ষের আছে উর্ধ্বমুখী শ্বাসমূল, যার সাহায্যে বাতাস থেকে সরাসরি অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে। এ বনের প্রধান বৃক্ষ প্রজাতি সুন্দরী এবং গেওয়া। ১৯০৩ সালে ডি প্রেইন সুন্দরবনের গাছপালার ওপর লিখিত তাঁর গ্রন্থে ২৪৫ গণের অধীনে ৩৩৪টি উদ্ভিদ প্রজাতি লিপিবদ্ধ করেছেন; এর মধ্যে ১৭টি ফার্নজাতীয়, ৮৭টি একবীজপত্রী এবং অবশিষ্ট ২৩০টি দ্বিবীজপত্রী। প্রজাতিগুলোর মধ্যে ৩৫টি শিমগোত্রীয়, ২৯টি তৃণজাতীয়, ১৯টি হোগলাজাতীয় এবং ১৮টি সিজজাতীয় উদ্ভিদ অন্তর্ভুক্ত। আজ পর্যন্ত জানা প্রায় ৫০টি প্রকৃত ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে কেবল সুন্দরবনেই

আছে ৩৫টি প্রজাতি। অধিকাংশ ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ চিরসবুজ, খাটো, গুল্মজাতীয় অথবা লম্বা বৃক্ষজাতীয়। এদের অনেকেই বনের তলদেশ খালি না রেখে সাধারণত দলবদ্ধভাবে জন্মায়।

সুন্দরবনের দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকার লবণাক্ত পানির বনভূমিতে গেওয়া, গরান, কেওড়া, ওড়া, পশুর, বাইন এবং অন্যান্য উদ্ভিদ প্রধান। হেন্দালও এ এলাকার অন্যতম প্রধান উদ্ভিদ প্রজাতি। বনের মধ্যভাগে ম্যানগ্রোভ বনের বৈশিষ্ট্যমূলক বৃক্ষ প্রজাতির প্রাধান্য বেশি। খুলনা ও বাগেরহাট জেলার দক্ষিণ অংশের অধিকাংশ এলাকা পরিমিত লবণাক্ত পানির বনে ঢাকা, আর এখানকার মুখ্য উদ্ভিদ প্রজাতি সুন্দরী।

প্রায় সব খালের পাড়েই ঘনভাবে জন্মে নিপা পাম বা গোলপাতা। পশুর, হরিণঘাটা এবং বুড়িশ্বর নদী দিয়ে প্রবাহিত প্রচুর স্বাদুপানি লবণাক্ততা কিছুটা হ্রাস করে পার্শ্ববর্তী এলাকায় সহনীয় স্বাদুপানির বন এলাকা গড়ে তুলেছে। সুন্দরবনে স্পষ্টত কিছুটা উদ্ভিদপর্যায় লক্ষ করা যায়, যেখানে নবগঠিত ভূমিতে কতক অগ্রগামী প্রজাতি, যেমন আরালি, ও বুনো ধানের পরে জন্মায় বাইন, কেওড়া এবং খুলশী। দ্বিতীয় উদ্ভিদ পর্যায়ে আছে গরান, গেওয়া, তুনশা, সুন্দরী, পশুর এবং ঝানা। টাইগার ফার্ন জন্মে লবণাক্ত ও কম লবণাক্ত এলাকায় প্রায় ভূমি ঘেঁষে। গা-ঢাকা দেওয়ার জন্য বাঘ এসব ঝোপ ব্যবহার করে।

সুন্দরবনের বৃক্ষ

সুন্দরবনে শতাধিক প্রজাতির গাছ আছে। তারমধ্যে যেগুলো অধিক পরিচিত সেগুলোর নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

দেশি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
১. সুন্দরী	Heritiera minor
২. গরান	Ceriops roxburghiana
৩. গোলপাতা	Nipa fruticans
৪. কেওড়া	Sonneratia apetala
৫. গাব	Diospyros cmbryopteris
৬. কড়ই	Albizia procera
৭. রেনট্রি	Enterolobium saman
৮. করন্ডা	Pon gamia pinnata
৯. বট	Ficus benghalensis
১০. কাকড়া	Bruguiera gymnorrhiza
১১. আমুর	Amoora cucullata
১২. আম	Mangifera indica
১৩. কাঁঠাল	Artocarpus integrifolia
১৪. বনজাম	Engcinia funticosa
১৫. তাল	Borassus flabellifer
১৬. খেজুর	Phoenix sylvestris
১৭. বাইন	Avicennia officinalis

দেশি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
১৮. ডাইষা	Afzelia bijuga
১৯. উলা	Bibiscus tilliaceus
২০. ডাবুর	Carbora manghas
২১. ধুন্দল	Xylocarpus granatum
২২. গর্জন	Rhizophora mucronata
২৩. গোরিয়া	Kandelia rheedii
২৪. হেতাল	Phoenix paludosa
২৫. হাড়গজা	Acanthus ilicifolius
২৬. হোগলা	Typha elephantina
২৭. জীর	Ficus sp.
২৮. কাকুড়া	Bruguiera gymnorhiza
২৯. কেওয়াকাটা	Pandanus foetidus
৩০. খোলশি	Aegiceras majus
৩১. কৃপা	Lumnitzera racemosa
৩২. কুমিয়া	Barringtonia recemosa
৩৩. নল ঘাস	Orunde Karka Syr. Phragmites Karka
৩৪. নোনা ঝাউ	Tamarix gallica
৩৫. ওকরা	Sonneratia acida
৩৬. পশুর	Xylocarpus moluccensis
৩৭. সাদা বাইন	Aviennia alba
৩৮. সিংড়া	Cynometra ramiflora
৩৯. সুন্দরীলতা	Brownlowia lanceolata
৪০. উলু	Saccharum cylindruicum
৪১. গেওয়া	Excoearia agallocha
৪২. গিলা	Derris trifoliata

উৎসঃ এক নজরে সুন্দরবন, বিশেষ সংকলন, সুন্দরবন বিভাগ, খুলনা, ১৯৮৯

সুন্দরবনের প্রাণিসম্পদ

সুন্দরবনে নানা প্রাণীর বাস। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রয়েল বেঙ্গাল টাইগারের আবাস এখানেই। অধিকন্তু এ বনভূমিতে আছে প্রায় ৫০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৩২০ প্রজাতির আবাসিক ও পরিযায়ী পাখি, প্রায় ৫০ প্রজাতির সরীসৃপ, ৮ প্রজাতির উভচর এবং প্রায় ৪০০ প্রজাতির মাছ। রয়েল বেঙ্গাল টাইগার ছাড়া সুন্দরবনের উল্লেখযোগ্য স্তন্যপায়ীপ্রাণির মধ্যে রয়েছে চিত্রা হরিণ, মায়া হরিণ, রেসাস বানর, বন বিড়াল, লিওপার্ড, সজারু, উদ এবং বন্য শূকর। হরিণ ও বন্য শূকর বাঘের প্রধান শিকার।

সুন্দরবন নানাবিধ পাখির এক অপরূপ আবাসস্থান। এখানে বসবাসকারী অধিকাংশ পাখিই স্থানীয় বা আবাসিক, প্রায় ৫০ প্রজাতি অনাবাসিক বা পরিযায়ী এবং এদের অধিকাংশই হাঁসজাতীয়। বক, সারস, হাড়গিলা, কাদা-

খোঁচা, লেনজা ও হট্টিটিসহ অসংখ্য উপকূলীয় পাখি এখানকার নদীনালার ধারে বিচরণ করে। সমুদ্র এবং বড়ো বড়ো নদীর উপকূলভাগে দেখা যায় বহু প্রজাতির গাংচিল, জল কবুতর, টার্ন ইত্যাদি। এ বনে মাছরাঙা আছে ৯ প্রজাতির। পাখি সম্পদে উৎকর্ষ সুন্দরবনে কাঠঠোকরা, ভগীরথ, পেঁচা, মধুপায়ী, বুলবুল, শালিক, ফিঙে, বাবুই, ঘুঘু, বেনে বৌ, হাঁড়িচাঁচা, ফুলঝুরি, মুনিয়া, টুনটুনি ও দোয়েলসহ রয়েছে নানা ধরনের ছোটো ছোটো গায়ক পাখি।

প্রায় ৫০ প্রজাতির সরীসৃপের মধ্যে সুন্দরবনের সবচেয়ে বড়ো সদস্য মোহনার কুমির; এদের কোনো কোনোটির দৈর্ঘ্য হয় প্রায় ৭ মিটার। ম্যানগ্রোভ পরিবেশে এক সময় এদের প্রচুর দেখা গেলেও এখন সেখানে এদের সংখ্যা মাত্র ২৫০ বলে মনে করা হয়। গুঁইসাপসহ টিকটিকি জাতীয় সরীসৃপ, কচ্ছপ এবং সাপের উপস্থিতি সন্তোষজনক। সাপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজগোখরা, রাসেলস ভাইপার, অজগর এবং কয়েক প্রজাতির সামুদ্রিক সাপ।

সুন্দরবনে ৮ প্রজাতির উভচর প্রাণী রয়েছে। সবুজ ব্যাঙ বেশি দেখা যায় চাঁদপাই এলাকায়। এ বনাঞ্চলের অন্যান্য উভচরের মধ্যে রয়েছে স্কিপার ফ্রগ, ক্রিকেট ফ্রগ, গেছোব্যাঙ এবং সাধারণ কুনোব্যাঙ।

সুন্দরবনের নদীনালা ও অন্যান্য জলাশয়গুলোতে বাস করে প্রায় ৪০০ প্রজাতির মাছ; এর মধ্যে একদিকে যেমন আছে পানির বিভিন্ন স্তরের বিচরণশীল মাছ, অন্যদিকে আছে পানির তলদেশে বাস করে এমন কিছু প্রজাতি। অনেক মাছ ম্যানগ্রোভ পরিবেশের জলাশয়কে ব্যবহার করে তাদের প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে। মাছের খামার স্থাপন বা মাছ চাষ করার অনুমতি নেই সুন্দরবনে। সমগ্র এলাকাতেই মাছ আহরণ কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রিত হয় বনবিভাগ কর্তৃক।

অমেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে কতিপয় মোলাস্কা এবং ক্রাসটেসিয়ান গুরুত্বপূর্ণ মৎস্যসম্পদ হিসেবে বিবেচিত। অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতিগুলোর মধ্যে তালিকাবদ্ধ হয়েছে প্রায় ২০ প্রজাতির চিংড়ি, ৮ প্রজাতির লবস্টার, ৭ প্রজাতির কাঁকড়া, কয়েক প্রজাতির শামুক এবং ৬ প্রজাতির ঝিনুক। চিংড়ির মধ্যে বাগদা চিংড়ি ও হরিণা চিংড়ি এবং কাঁকড়ার মধ্যে মাড ক্র্যাব বাণিজ্যিকভাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ। সুন্দরবনের কীটপতঙ্গের বৈচিত্র্য সীমাহীন। এখানকার অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি মৌমাছি। স্থানীয়ভাবে পরিচিত মৌয়ালদের পেশা মধু সংগ্রহ করা। তাঁরা বন বিভাগের অনুমতি নিয়ে ফুলের মৌসুমে তিন চার মাস বন থেকে মধু সংগ্রহ করে। সুন্দরবনে মাকড়সার প্রাচুর্য রয়েছে। এখান থেকে ২২টি গোত্রের অধীনে প্রায় ৩০০ প্রজাতির মাকড়সা তালিকাবদ্ধ হয়েছে।

সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী

উভচর প্রাণী

দেশি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
১. কটকটি ব্যাঙ	*Rana Limnocharis*
২. ভের ব্যাঙ	*Rana tytleri*
৩. গেছো ব্যাঙ	*Rhacophorus maculatus*
৪. লাল ব্যাঙ	*La rubra*
৫. চিনা ব্যাঙ	*M. ornate*
৬. কুনো ব্যাঙ	*Bufo melanostictus*

কুমির

দেশি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
১. লবণ পানির কুমির	*Crocodylus porosus*
২. মেছ কুমির	*C. palustris*
৩. ঘড়িয়াল	*Gavialis gangeticus*

কচ্ছপ

দেশি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
১. বিড় সমুদ্র কচ্ছপ	*Lepidochelys olivacea*
২. বাটাগুড় থেরাপিন	*Batagur baska*
৩. সবুজ কচ্ছপ	*Chelonia mydas*
৪. পুকুর ক্যাঠা	*Kachuga tecta*
৫. উপকূলীয় কচ্ছপ	*Pelochelys bibroni*
৬. হলুদ কচ্ছপ	*Morenia ocellata*
৭. তিনাসির কচ্ছপ	*Tricannata*

টিকটিকি

দেশি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
১. দেওয়াল টিকটিকি	*Hemidactylusa flaviviridis*
২. তকমক	*Gecko*
৩. বাঘা তকমক	*Eublepharis fasciolatus*
৪. বড়ো গুঁইসাপ	*Varanus bengalensis*
৫. গড়ান গুইল	*V. salvator*
৬. হলুদ গুঁইসাপ	*V. flavescens*
৭. আনজিন	*Mabuya dissimilis*
৮. কাকলাশ	*Calotes versicolor*

নির্বিষ সাপ

দেশি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
১. অন্ধকেঁচো সাপ	*Typlops*
২. অজগর সাপ	*Python molurus*
৩. টগা সাপ	*Dendrolepis tristis*
৪. পাখিঠোঁট সাপ	*Dryophis nasutus*
৫. ঘরগিন্নি সাপ	*Lycodon aulicus*
৬. দাঁড়াশ/ধামগা সাপ	*Ptyas mucosa*
৭. আড়বেঁকি সাপ	*Elaphe radiate*
৮. কুঁকড়ি সাপ	*Oligodon cinereus*
৯. জল ডোরা সাপ	*Xenochrophis piscator*
১০. জল বোড়া সাপ	*Amphiesma stolata*
১১. পানি সাপ	*Enhydris enhydris*
১২. কুকুমুষি সাপ	*Cerberus rynchops*
১৩. ফিতা সাপ	*Acrochordus granulatus*

বিষধর সাপ

দেশি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
১. সাধারণ শঙ্খীনি	*Bungarus caeruleus*
২. ডোরা শঙ্খীনি	*B. fasciatus*
৩. কালো শঙ্খীনি	*B. lividus*
৪. গোখরা শঙ্খীনি	*Naja naja*
৫. রাজগোখরা শঙ্খীনি	*Ophiophagus hannah*

সামুদ্রিক সাপ

দেশি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
১. বর্শিনাক সমুদ্র সাপ	*Enhydrina schistosa*
২. গড়ান সমুদ্র সাপ	*Hydrophis obscurus*
৩. আঞ্জুঁরী সমুদ্র সাপ	*H. cyanocinctus*
৪. কালো ডোরা সাপ	*H. nigrocinctus*
৫. মাথা সরু সাপ	*H. cantoris*
৬. হলুদ পেট সমুদ্র সাপ	*Pelamis platurus*
৭. চন্দ্রবোড় সাপ	*Vipera ursinii*
৮. তিলা বোড়া সাপ	*Trimeresurus gramineus*
৯. ডোরা সমুদ্র সাপ	*H. fasciatus*

স্তন্যপায়ী প্রাণী

১. বাদুড়	*Pteropus giganteus*
২. ভ্যাম্পায়ার	*Megaderma lyra*
৩. ইঁদুরলেজ বাদর	*Rhinopoma hardwickii*
৪. পাতা বাদুর	*Hipposideros bicolor*
৫. হলুদ চামচিকা	*Scotophilus heathi*
৬. ছোটো হলুদ চামচিকা	*Scotophilus temmincki*
৭. সাধারণ বানর	*Macacus mulataa*
৮. সাধারণ উদ	*Mulatta*
৯. মোলায়েমদেহী উদ	*W. Perspicullata*
১০. ছোটো গন্ধগকুল	*Veverricula indica*
১১. তাল গন্ধগকুল	*Paradoxurus hermaphroditus*
১২. খাটাশ	*Viverra zibetha*
১৩. জঙ্গালি বিড়াল	*Felis chaus*
১৪. বাঘা বিড়াল	*F. bengalensis*
১৫. মেছো বিড়াল	*F. viverrinus*
১৬. চিতা বাঘ	*Panthera pardus*
১৭. বড়ো বাঘ	*P. tigris*
১৮. বন্য শূকর	*Sus scrofa*
১৯. মায়া হরিণ	*Munticus muntjak*
২০. চিত্রা হরিণ	*Axis axis*
২১. বাদামী কাঠবিড়াল	*Callosciurus pygerythrus*
২২. সজারু	*Hystrix hodgsoni*
২৩. কালো ইঁদুর	*Rathus rathus*
২৪. লেংটি ইঁদুর	*Mus musculus*
২৫. ছোটো ধাড়ী ইঁদুর	*Bandicota bengalensis*
২৬. বড়ো ধাড়ী ইঁদুর	*B, indica*
২৭. মেঠো ইঁদুর	*Mus booduga*
২৮. গেছো ইঁদুর	*Vandeleuria oleracea*
২৯. নীল তিমি	*Balaenoptera musculus*
৩০. শুশুক	*Platanista gangetica*
৩১. দাঁড়াবিহীন শুশুক	*Neomeris Phocaenoides*
৩২. চওড়া চঞ্চু ডলফিন	*Peponocephala electra*
৩৩. সাধারণ ডলফিন	*Delphinus delphis*
৩৪. ডলফিন	*Orcella brevirostris*

সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রজাতির পাখি

স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
১. কানী বক	*Ardeola grayii*
২. গোবক	*Bubulcus ibis*
৩. ছোটো বক	*Egretta garzetta*
৪. কাদাখোঁচা, চাগা	*Gallinago stenura*
৫. বাটানে	*Pluvialis dominica*
৬. ডুবুরি	*Podiceps rufficollis*
৭. কোদালি বক	*Platalea leucordia*
৮. বাজ	*Accipiter trivirgatus*
৯. বৃহৎ ঈগল	*Acuila heliaca*
১০. বড়ো বাজ	*Acquila heliaca*
১১. জলার চিল	*Circus aeruginosus*
১২. সাদা চিল	*Elanus caeruleus*
১৩. শকুন	*Gyps bengalensis*
১৪. সাদা ঈগল	*Haliaeetus leucogaster*
১৫. লাল চিল	*Haliastur Indus*
১৬. মাছমোড়ল	*Ichthyophaga ichthyactus*
১৭. ভুবন চিল	*Milvus migrans*
১৮. মেছো ঈগল	*Pandion haliaetus*
১৯. রাজ শকুন	*Sarcogyps calvus*
২০. ছোটো মাছরাঙা	*Alcedo atthis*
২১. বুনো মাছরাঙা	*Ceyxerithacus*
২২. পাকড়া মাছরাঙা	*Ceryle lugubris*
২৩. লাল মাছরাঙা	*Halcyon coromanda*
২৪. মাছরাঙা	*Halcyon smyrnensis*
২৫. ধূসর বক	*Ardea cinerea*
২৬. বেগুনি বক	*Ardea purpurea*
২৭. সবুজ বক	*Ardeola striatus*
২৮. কালো বক	*Ixobrychus flavicollis*
২৯. বড়ো বক	*Egretta alba*
৩০. চেঙগা	*Recurvirostra avosetta*
৩১. হাড়গিলা	*Leptoptilos dubius*
৩২. মদন টাক	*Leptoptilos javinicus*
৩৩. চিটা ঘুঘু	*Streptopelia chinensis*

স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
৩৪. ঘুঘু	*Streptopelia tranquebarica*
৩৫. জংলা ঘুঘু	*Streptopeiia tranquebarica*
৩৬. ঘরিয়াল	*Treron bicinctus*
৩৭. হড়িয়াল, বটকল	*Treron phoenicopterus*
৩৮. ছোটো হরিয়াল	*Treron pompadora*
৩৯. কুটুম পাখি, হাঁড়িচাঁষা	*Dendrocitta vagabunda*
৪০. পাপিয়া	*Clamator jacobinus*
৪১. বউ কথা কও	*Cuculus micropterus*
৪২. সবুজকোকিল	*Eudynamus scolopaceus*
৪৩. আবাবিল	*Hirundo daurica*
৪৪. আবাবিল	*Hirundo rustica*
৪৫. ফটিক জল	*Aegithina tiphia*
৪৬. গাঙচিল	*Chlidonias hybrida*
৪৭. গাঙচিল	*Gelochelidon nilotica*
৪৮. গাঙ্গা কৈতর	*Larus brunnicephalus*
৪৯. পাটিকাট	*Rhynchops albicollis*
৫০. গাঙচিল	*Sterna acuticauda*
৫১. দোয়েল	*Copsychus saularis*
৫২. টুনটুনি, টুনি	*Orthotomus sutorius*
৫৩. নীল টুনি	*Nectarinia asiatica*
৫৪. পানকৌড়ি	*Phalacrocorax fuscicollis*
৫৫. বনমোরগ, মুরগি	*Gallus gallus*
৫৬. পাকরা কাঠঠোকরা	*Picoides mahrattensis*
৫৭. পাকরা কাঠঠোকরা	*Picoides macei*
৫৮. বন কাঠঠোকরা	*Picoides nanus*
৫৯. কাঠঠোকরা	*Dinopium benghalense*
৬০. মেঠো কাঠঠোকরা	*Jynx torquilla*
৬১. লালচে কাঠঠোকরা	*Micropternus brachyurus*
৬২. খুদে কাঠঠোকরা	*Picumnus innominatus*
৬৩. বাবুই	*Ploceus bengalensis*
৬৪. বাবুই	*Ploceus manyar*
৬৫. বাবুই	*Ploceus philippinus*
৬৬. টিয়া	*Psittacula finschii*
৬৭. বুলবুলি	*Pycnonotus cafer*
৬৮. হুতুমপ্যাঁচা	*Bubo zeylonensis*

স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
৬৯. শালিক	*Acridotheres fuscus*

উৎস: এক নজরে সুন্দরবন, বিশেষ সংকলন, সুন্দরবন বিভাগ, খুলনা, ১৯৮৯।

বিলুপ্ত প্রায় প্রাণী (Critically Endangered Animals)

ক্রমিক নং	স্থানীয় নাম	ইংরেজি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
০১	রাম কাছিম/বড়ো কাইট্যা	River Terrapin	*Batagur baska*
০২	আদি কড়ি কাইট্যা	Red-crowned Roofed Turtle	*Kachuga kachuga*
০৩	শকুন	White-rumped Vulture	*Gyps bengalensis*

বিপন্ন প্রাণী (Endangered Animals)

ক্রমিক নং	স্থানীয় নাম	ইংরেজি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
০১	ডিবা কাছিম	Three Striped Roofed Turtie	*Kachuga dhongoca*
০২	সবুজ সামুদ্রিক কাছিম	Green Turtle	*Chelonia mydas*
০৩	জলপাই রঙা সামুদ্রিক কাছিম	Olive Ridley Turtle	*Lepidochelys olivacea*
০৪	সিম কাছিম	Narrow-headed Softshell Turtle	*Chitra indica*
০৫	জাতা কাছিম	Cantor's Softshell Turtle	*Pelochelys cantoril*
০৬	স্পুন-বিলড স্যান্ড পাইপার	Spoon-billed Sandpiper	*Calidris pygmeus*
০৭	নর্ডম্যান্স গ্রীনশক	Nordmann's Greenshank	*Tringa guttifer*
০৮	হাড়গিলা	Greater Adjutant	*Leptoptilos dubius*
০৯	বাঘ	Panthera tigris	*Panthera tigris*
১০	শুশুক/শিশু	Ganges River Dolphin	*Platanista gangetica*

বিপদাপন্ন প্রাণী (Vulnerable Animals)

ক্র. নং	স্থানীয় নাম	ইংরেজী নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
০১	কালা চিত্রা কাছিম	Black Spotted Pond Turtle	*Geoclemys hamiltonii*
০২	কালি কাছিম/কাইট্যা	Crowned River Turtle	*Hardella thurjii*
০৩	হলুদ কাইট্যা	Indian Eyed Turtle	*Morenia petersi*
০৪	খালুয়া কাছিম	Ganges Softshell Turtle|	*Aspideretes gangeticus*
০৫	ধুম কাছিম	Peacock-marked Softshell Turtle	*Aspideretes hurum*
০৬	বাইল্যা হাঁস	Masked Finfoot	*Heliopais personata*
০৭	গাঙচোষা/পানি কাটা	Indian Skimmer	*Rynchops albicollis*
০৮	বড়ো গুটি ঈগল	Greater Spotted Eagle	*Aquila clanga*
০৯	কুড়া/ কোড়াল ঈগল	Pallas's Fish Eagle	*Haliaeetus leucoryphus*
১০	মদনটাক/মদনচোর/ হারং	Lesser Adjutant	*Leptoptilos javanicus*
১১	বাদামি কাঠবিড়ালি	Irrawaddy Squirrel	*Callosciurus pygerythrus*
১২	মেছো বাঘ	Fishing Cat	*Felis viverrina*

সূত্র: IUCN Red list, 2008.

সুন্দরবনের বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা সুন্দরবনে সুদূর অতীত হতেই বন্যপ্রাণী বিশেষ করে বাঘ এবং হরিণ শিকার করা হচ্ছে। মোগল ও ব্রিটিশ আমলে রাজকীয় প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং সৌখিন শিকারীগণ বাঘ ও হরিণ শিকার করত। পরবর্তীকালে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে অর্থনৈতিক কারণে চোরাইভাবে চামড়ার জন্য বাঘ এবং চামড়া ও মাংসের জন্য হরিণ শিকার ব্যাপক আকার ধারণ করে। এ অবস্থায় বাঘ এবং হরিণের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পায়। বর্তমানে এসমস্ত চোরাই শিকারি ও চোরাই কারবারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

বন্যপ্রাণী অভয়াশ্রম সুন্দরবনে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য ১,৩৯,৭০০.০ হেক্টর বনভূমি নিয়ে ০৩টি বন্যপ্রাণী অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৯ সালের ০৪ ফেব্রুয়ারি অভয়াশ্রমগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে এগুলো উদ্বোধন করেন। সেখানে গাছ, মাছ ও সকল প্রকার

বন্যপ্রাণী আহরণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বন্যপ্রাণী ও মাছের বংশ বিস্তারের জন্য কোনো অবস্থাতেই বাধা সৃষ্টি বা পরিবেশ নষ্ট করা যাবে না। অভয়াশ্রমে অবৈধ প্রবেশ শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে।

সুন্দরবন অভয়াশ্রম

ক্র. নং	অভয়াশ্রমের নাম	কম্পার্টমেন্ট নং	বনভূমির পরিমাণ
০১	সুন্দরবন পূর্ব	৪,৫,৬ এবং ৭-এর আংশিক	৩,১২,২৭০হেক্টর
০২	সুন্দরবন দক্ষিণ	৪৩ এবং ৪৪	৩,৬৯,৭১০হেক্টর
০৩	সুন্দরবন পশ্চিম	৫৩,৫৪,৫৫ এবং ৪৯-এর আংশিক	৭,১৫,০২০হেক্টর
		সর্বমোট	১৩,৯৭,০০০হেক্টর

সুন্দরবনের বাঘ

বাঘ আমাদের জাতীয় প্রাণী ও বীরত্বের প্রতীক। বাংলাদেশে বর্তমানে বাঘের একমাত্র আবাসস্থল হচ্ছে সুন্দরবন। সারা বিশ্বে বন উজাড় ও শিকারি কর্তৃক বাঘ হত্যার ফলে বর্তমানে এই প্রাণীটি মহাবিপন্ন প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বাঘ পৃথিবীর মাত্র ১৩টি দেশে এখনও অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। এই ১৩টি বাঘ সমৃদ্ধ দেশকে Tiger Range Country বলা হয়। এগুলো হলো বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, চীন, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস, ভুটান, নেপাল ও রাশিয়া। বাঘের ৮টি উপজাতির মধ্যে ইতোমধ্যে বালিনিজ টাইগার, জাভানিজ টাইগার ও কাস্পিয়ান টাইগার বিশ্ব হতে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে বাঘের ৫টি উপজাতি কোনো রকমে টিকে আছে। এগুলো হলো: বেঙ্গল টাইগার, সাইবেরিয়ান টাইগার, সুমাত্রান টাইগার, সাউথ চায়না টাইগার এবং ইন্দো-চায়না টাইগার। বিশ্বে ১৯০০ সালে বাঘের সংখ্যা ছিল ১,০০,০০০টি এবং বর্তমানে বাঘের সংখ্যা মাত্র ৪,০০০টি। বাঘ বিশেষজ্ঞগণের মতে বাঘের সংখ্যা দ্রুত কমে যাওয়ার এই প্রবণতা চলমান থাকলে আগামী কয়েক দশকে পৃথিবী থেকে বাঘ হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। প্রায় অর্ধেকেরও বেশি বাঘ রয়েছে ভারতে। বাংলাদেশের সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ৩০০-৫০০ হতে পারে বলে বিভিন্ন সমীক্ষা হতে জানা যায়। বিশ্বব্যাপী বাঘের বিপন্নতা লক্ষ করে, প্রকৃতি হতে বাঘ বিলুপ্তি রোধকল্পে ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে Global Tiger Forum(GTF) প্রতিষ্ঠিত হয়। Global Tiger Forum হচ্ছে বাঘ অধ্যুষিত এবং বাঘ সংরক্ষণ বিষয়ে সহায়তাদানকারী দেশসমূহের আন্তর্জাতিক সংস্থা। Global Tiger Forum এর প্রথম General Assembly Meeting গত ১৮-২০ জানুয়ারি, ২০০০ সালে ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেখানে ১০ দফা কর্মপরিকল্পনায় বাংলাদেশ GTF এর সদস্যদেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সাম্প্রতিককালে বিশ্বব্যাপী বাঘ ও বাঘসমৃদ্ধ বনাঞ্চলসমূহ সংরক্ষণে সম্মিলিত উদ্যোগের সহায়তাদান করছে বিশ্বব্যাংক, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, USAID, GTI, GIZ ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থা।

GTI ও বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তা ও উদ্যোগে ২০১০ সালে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে অনুষ্ঠিত বাঘসমৃদ্ধ ১৩টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলনে বাঘ সংরক্ষণকে বেগবান করার জন্য ঘোষণাপত্র তৈরি হয়। উক্ত ঘোষণাপত্রের আলোকে প্রতিবছর ২৯ জুলাই বিশ্ব বাঘ দিবস পালিত হচ্ছে।

বাঘের গুরুত্ব বাঘ সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য, খাদ্য-শৃঙ্খল ও প্রতিবেশ চক্রের প্রধান নিয়ন্ত্রক। বনের প্রাকৃতিক বংশবৃদ্ধি যাতে ব্যাহত না হয় তার জন্য বাঘ তৃণভোজী প্রাণী যেমন হরিণ, শূকর, বানর ইত্যাদি শিকার করে বনের প্রতিবেশ চক্রকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বাঘ বন রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরী এবং তার নির্ধারিত আবাসস্থলে অন্য কোনো বাঘ বা মানুষের আনাগোনা সহ্য করে না। বাঘ একটি বনের জীববৈচিত্র্যের স্ট্যাটাস নিরূপণের ইন্ডিকেটর প্রজাতি। যে বনের অবস্থা ভালো সেখানে বাঘের সংখ্যা বেশি থাকে। বাঘ কমে যাওয়ার অর্থ বনাঞ্চলের অবস্থা বা বাঘের আবাসস্থল বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া। তাই মহাবিপদাপন্ন প্রজাতির বাঘ রক্ষার জন্য বিভিন্ন দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা সোচ্চার হয়ে উঠেছে। ইতোমধ্যে বাঘের আবাসস্থল হিসেবে বিবেচিত ১৩টি টাইগার রেঞ্জ দেশ বাঘ সংরক্ষণের জন্য National Tiger Recovery Program ও Global Tiger Recovery Program বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা করেছে। এখানে উল্লেখ্য, পৃথিবীর সর্বাধিক বাঘের সংখ্যা ভারতে (প্রায় ১৭০০টি) যা ৫৬টি বনাঞ্চলে ছড়িয়ে আছে।

বাঘ সংরক্ষণের গুরুত্ব বাঘ সুন্দরবনের Flagship হিসেবে কাজ করছে। সে জন্য বাঘ সংরক্ষণের অর্থ কেবলমাত্র একক প্রজাতি ব্যবস্থাপনা নয়; এর সাথে প্রয়োজন অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণী ব্যবস্থাপনা যাতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে বাঘের স্বাভাবিক আবাস, খাদ্য নিরাপত্তা এবং প্রজনন অব্যাহত থাকে। বনের উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণী (যেগুলো বাঘের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়) এ গুলো যেভাবে প্রয়োজনীয় পরিবেশে যথাযথ সংখ্যায় বেঁচে থাকতে পারে এমন ব্যবস্থাগ্রহণই বাঘের ব্যবস্থাপনা হিসেবেই বিবেচিত হয়। এ জন্য বাঘকে Protection Dependent Species বলা হয়ে থাকে।

বিগত ২৮-২৯ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে থাইল্যান্ডের হুয়া হিন এ মন্ত্রী পর্যায়ের নীতিনির্ধারণী সভা 'The First Asian Ministerial Conference on Tiger Conservation' অনুষ্ঠিত হয়। এই কনফারেন্সের ঘোষণাকে সংক্ষেপে Hua Hin Declaration on Tiger Conservation নামে অভিহিত করা হয়। এই যৌথ ঘোষণায় প্রতিটি দেশে মহাবিপন্ন বাঘ ও বাঘের আবাসস্থল সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক বনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করে পরিবর্তিত বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলা করার জন্য টেকসই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অনুরোধ জানানো হয়।

বাঘের বর্তমান অবস্থা শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের সুন্দরবনে এখনও প্রায় ৩০০-৫০০টি বাঘ টিকে আছে বলে বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়। ২০০৪ সালে UNDP,

বাংলাদেশ ও ভারতের বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় বাঘের পদচিহ্নের ওপর ভিত্তি করে একটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। উক্ত জরিপে বাঘের সংখ্যা ৪৪০টি নির্ধারণ করা হয়। তার মধ্যে পুরুষ বাঘ ১২১টি, মা বাঘিণী ২৯৮টি ও বাচ্চা ২১টি ছিল। তবে ২০১৫ সালে বাঘের পায়ের ছাপ ও বিচরণের অন্যান্য তথ্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে পরিচালিত জরিপে জানা যায় বাংলাদেশে সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা এখন ১০৬টি।

বাঘ সংরক্ষণের গৃহীত পদক্ষেপ

সরকার ইতোমধ্যে সুন্দরবনের বিপন্ন বাঘ সংরক্ষণের জন্য নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

১) বাঘ নিধন ও হরিণ শিকার বন্ধের জন্য অধিকতর শাস্তির বিধান রেখে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ বিগত জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে এবং উক্ত আইনের ৩৬ ধারায় বাঘ শিকারি বা হত্যাকারী জামিন অযোগ্য হবেন এবং সর্বোচ্চ ৭ বছর এবং সর্বনিম্ন ২ বছর কারাদণ্ড এবং ১ (এক) লাখ থেকে ১০ (দশ) লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

২) বাঘ সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক সংস্থা GTI-এর সহায়তায় National Tiger Recovery Program প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩) বন বিভাগ কর্তৃক Zoological Society of London ও Wild Team এর সহায়তায় Bangladesh Tiger Action Plan (2009-2017) প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪) বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে সুন্দরবনসহ সারা দেশে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য Strengthening Regional Co-operation for Wildlife Protection প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। বাঘসহ অন্যান্য বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য এ প্রকল্পের লোকজন কাজ করে যাচ্ছে। সুন্দরবনসংলগ্ন এলাকায় অসুস্থ বাঘকে সেবাদানের জন্য খুলনায় একটি Wildlife Rescue Centre স্থাপন করার কাজ এগিয়ে চলেছে।

৫) স্থানীয় জনসাধারণকে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করার জন্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সহায়তায় SEALS (Sundarban Environmental and Livelihood Security) প্রকল্প ও USAID-এর সহায়তায় IPAC (Integrated Protected Area Co-Management) ও CREL (Climate Resilent Ecosystems and Livelihoods) প্রকল্পের মাধ্যমে সুন্দরবনের আশেপাশের উপজেলাপর্যায়ে ৪টি CMC (Co-management committee) গঠন করা হয়েছে।

৬) বন্যপ্রাণী দ্বারা নিহত বা আহত মানুষের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর আলোকে সেপটেম্বর ২০১২ হতে জুলাই ২০১৪ পর্যন্ত বাঘের

আক্রমণে নিহত ব্যক্তির পরিবারকে ১ লাখ ও আহত ব্যক্তির পরিবারকে ৫০ হাজার করে মোট ৫৩টি পরিবারের মধ্যে ৪৮ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

৭) বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে উভয় সুন্দরবনের বাঘ সংরক্ষণ, বাঘ ও শিকারি প্রাণী পাচার বন্ধ, দক্ষতা বৃদ্ধি, মনিটরিং ইত্যাদির জন্য একটি প্রটোকল ও একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে।

৮) বাংলাদেশে ২০১০ সাল থেকে প্রতিবছর ২৯ জুলাই বিশ্ব বাঘ দিবস পালিত হচ্ছে। দিবসটির মাধ্যমে বাঘ রক্ষার গুরুত্ব প্রচার আশানুরূপ অগ্রগতি অর্জন করেছে।

সুন্দরবনের প্রশাসনিক এলাকা সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চল বাংলাদেশ বন অধিদপ্তরের খুলনা অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণাধীন। এ অঞ্চলের আওতায় দুটো বন বিভাগ রয়েছে, এগুলো ‘সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগ’ ও ‘সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগ’ নামে পরিচিত। উক্ত বন বিভাগ দু’টির সদর দপ্তর যথাক্রমে খুলনা ও বাগেরহাটে অবস্থিত।[২] দু’টি বন বিভাগের অধীনে ৪টি ফরেস্ট রেঞ্জ (শরণখোলা, চাঁদপাই, খুলনা ও সাতক্ষীরা), ১৭টি স্টেশন এবং ৭২টি টহল ফাঁড়ি/ক্যাম্প বিদ্যমান। বর্তমানে ৯৯৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী বিভিন্ন পদে সুন্দরবনে কর্মরত আছেন। খুলনা রেঞ্জের আয়তন ৩,৯৮,৫৪০ একর যা খুলনা জেলার তিনটি উপজেলা যথাক্রমে দাকোপ, পাইকগাছা ও কয়রা উপজেলা নিয়ে গঠিত।[৩]

বিশ্ব ঐতিহ্য তিনটি অভয়ারণ্যকে ১৯৯৭ সালে ৬ ডিসেম্বর জাতিসংঘের ইউনেস্কো কমিশন উদ্ভিদ ও প্রাণিবৈচিত্র্য উন্নয়ন ও সংরক্ষণে সহযোগিতার জন্য কনভেনশনের ক্যাটাগরি ২ ও ৪-এর আওতায় পৃথিবীর ৭৯৮তম বিশ্বঐতিহ্য এলাকা বলে ঘোষণা করে। এই এলাকার পরিমাণ ১,৩৯,৭০০ হেক্টর যা সমগ্র সুন্দরবনের প্রায় ২৩%। অভয়ারণ্য এলাকায় সকল প্রকার কার্যক্রম এবং শিকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

সুন্দরবনের অর্থনীতি সুন্দরবনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণিকুল বাংলাদেশের অমূল্য সম্পদ। সুন্দরবন বাংলাদেশের শুধু বেকার সমস্যারই সমাধান করে না, রাজস্বের উৎসও বটে। পরিবেশ সংরক্ষণে সুন্দরবনের গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুন্দরবনের বহুমুখী উৎস এবং এর নানাবিধ অবদান বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালন করে। সুন্দরবনের সংরক্ষণমূলক ভূমিকা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ বন উপকূলভাগের ভূমিক্ষয়রোধ করে, উপকূলীয় এলাকা পুনরুদ্ধার করে এবং নদীবাহিত পলি স্তরীভূত করে উপকূলীয় এলাকা সম্প্রসারণ করে। এর মোহনা অঞ্চল বহু ধরনের মাছের প্রজননকেন্দ্র। সুন্দরবনের বনসম্পদকে কেন্দ্র করে কয়েকটি শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য

[২] আবদুশ শাকুর, পূর্বোক্ত: পৃ-৬।
[৩] ওই, পৃ. ১২০।

খুলনার নিউজপ্রিন্ট মিলস এবং হার্ডবোর্ড মিলস; প্রথমটির কাঁচামাল গেওয়া এবং দ্বিতীয়টির সুন্দরীবৃক্ষ। উদ্ভিদনির্ভর অন্যান্য শিল্প-কারখানার মধ্যে রয়েছে দিয়াশলাই ও নৌকা তৈরির কারখানা। এ বনভূমি জ্বালানি, ট্যানিন, ঘরের ছাউনি তৈরির উপকরণ, কাঠজাত দ্রব্য, ভেষজ উদ্ভিদ এবং পশুখাদ্যের অন্যতম প্রধান উৎস ও জোগানদার। দেশের বেশিরভাগ মধু ও মোম সংগৃহীত হয় সুন্দরবন থেকেই।

সুন্দবনের সুন্দরী, পশুর, ধুন্দল, কেওড়া, কাকড়া, বাইন প্রভৃতি গাছের তৈরি আসবাবপত্র আজ অতি মূল্যবান সম্পদে পরিণত হয়েছে এবং এর চাহিদা দিন দিন ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুন্দরী, পশুর ও ধুন্দল কাঠ অত্যন্ত ভারী, টেকসই এবং মূল্যবান। বর্তমানে ১ ঘনফুট পশুর কাঠের বাজার মূল্য প্রায় ৩০০০ টাকা এবং সুন্দরী ২০০০ টাকা থেকে ২৫০০ টাকা পর্যন্ত।

সারণি-১৪৭

সুন্দরবনের রাজস্ব আয় (২০০৬ হতে ২০১০-১১)

বছর	আয় (টাকায়)
২০০৬-২০০৭	২,৬৯,৮৯,৫৭৭.৪৭
২০০৭-২০০৮	৩,২৯,১২,১৮০.৭০
২০০৮-২০০৯	২,২৩,০০,৮৪৯.২৯
২০০৯-২০১০	২,৪২,৯৩,২২০.৪৯
২০১০-২০১১	৩,০০,৭৪,৮৪৮.৭০

Source: Sundarbans Environmental and Livelihoods Security (SEALS) Project

সুন্দরবনে বিভিন্ন প্রকার সাদা মাছ ও সামুদ্রিক মাছ পাওয়া যায়। শুঁটকি মাছ ও তাজা মাছ বিদেশে রফতানি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা হয়। প্রকৃতির দেওয়া সুন্দরবনের এ রুপালী সম্পদ আমাদের জাতীয় অর্থনীতির জন্য খুবই দরকারি সহজলভ্য প্রোটিন। বাগদা ও গলদা চিংড়ি সুন্দরবনের বিশেষ মাইনর প্রডাক্টস। সুন্দরবন বনাঞ্চল ও সন্নিহিত এলাকা হতে বছরে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার চিংড়ি বিদেশে রফতানি করা হয়ে থাকে। সুন্দরবন হতে প্রায় ২৫-৩০ কোটি চিংড়ি পোনা সংগ্রহ করে এ অঞ্চলের ঘেরে চাষ করা হয় যা সুন্দরবনেরই অবদান।

সুন্দরবনের কাঁকড়া অতি নামকরা মূল্যবান অর্থনৈতিক সম্পদ। কিং ক্রাব বিদেশে রফতানি করা হয় যা হতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। এগুলো ওজনে এক কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। স্থানীয় বাজারে প্রতিকেজি কাঁকড়ার মূল্য ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত। কাঁকড়া হতে খুলনা বিভাগে বছরে ১০ লাখ

টাকার বেশি রাজস্ব অর্জিত হয় এবং কাঁকড়া ধরার কাজে অনেক লোক নিয়োজিত থাকে।

সুন্দরবনের ইকোট্যুরিজম প্রমোদভ্রমণের জন্য পর্যটকদের এক আকর্ষণীয় স্থান সুন্দরবন। এখানকার করমজল, শেখেরটেক টেম্পল, কটকা, হিরণ পয়েন্ট (সাধারণভাবে নীলকমল নামে পরিচিত), দুবলার চর এবং টাইগার পয়েন্টে (কচিখালী) প্রতিবছর পর্যটকদের প্রচুর সমাগম ঘটে। কটকার অনবদ্য প্রাকৃতিক দৃশ্য পর্যটকদের দারুণভাবে আকর্ষণ করে। সুন্দরবনের বন্যপ্রাণী ভ্রমণকারীদের জন্যও অতি আকর্ষণীয়। এখানে বনবিভাগ পরিচালিত একটি ডাকবাংলো এবং একটি পর্যবেক্ষণ টাওয়ার আছে। হিরণ পয়েন্টেও আছে পর্যটকদের জন্য অতিথি ভবন এবং একটি পর্যবেক্ষণ টাওয়ার। দুবলার চর একটি ছোটো দ্বীপ, এর সমুদ্রসৈকত অতি মনোরম। সুন্দবনের আরেকটি আকর্ষণ হলো মাছ ধরার কর্মকাণ্ড, যা প্রতিবছর মধ্য-অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত চলে। প্রতিবছর হাজার হাজার দেশি-বিদেশী পর্যটক এখানে বেড়াতে আসে। প্রতিবছর পর্যটন খাতে এ বন থেকে শত শত কোটি টাকা আয় হয়, কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয়।

সারণি-১৪৮

বছরভিত্তিক সুন্দরবনে পর্যটকদের আগমন (২০০৬ - ২০১৬)

বছর	বাংলাদেশি পর্যটক	বিদেশি পর্যটক	মোট পর্যটক
২০০৬-২০০৭	১১,৫০৪	৫৭	১১,৫৬১
২০০৭-২০০৮	১১,৫২১	১৩২	১১,৬৫৩
২০০৮-২০০৯	১৭,০৩৩	৭০	১৭,১০৩
২০০৯-২০১০	১৯,১৯৪	২৮৩	১৯,৪৭৭
২০১০-২০১১	৩১,১৭৯	২১৩	৩১,৩৮৯
২০১১-২০১২	৪২,৮০৫	৬৪৭	৪৩৪৫২
২০১২-২০১৩	২৯,১০৩	৫২০	২৯৬২৩
২০১৩-২০১৪	২৪,৬০০	১৯৭	২৪৭৯৭
২০১৪-২০১৫	১৯,৯১৬	২২৭	২০১৪৩
২০১৫-২০১৬	৩১,২১১	২৩৩	৩১৪৪৪

Source: Sundarbans Environmental and Livelihoods Security (SEALS) Project

২০১২-১৩ অর্থবছরে সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগে মোট পর্যটক ছিল ২৯৬২৩ জন এবং রাজস্ব আদায় হয়েছে ৯৫,০৪,৮৩৫ টাকা যা ২০০৯-১০ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ১৯,৪৭৭ জন এবং ১৭,৮৪,১৭৮ টাকা। ১৯১৪-১৫ অর্থবছরে দেশি পর্যটক ১৯,৯১৬ জন, বিদেশি পর্যটক ২২৭ জন এবং রাজস্ব আয় ৪২,৯০,১৮৮ টাকা।

সারণি-১৪৯

ইকোট্যুরিজম হতে সুন্দরবনের আয়

বছর	আয় (টাকায়)
২০০৬-২০০৭	৭,৩৪,০৪৪.০০
২০০৭-২০০৮	৫,৬১,৫২০.০০
২০০৮-২০০৯	১১,৭৫,১৮০.০০
২০০৯-২০১০	১৭,৮৪,১৭৮.০০
২০১০-২০১১	৩০,৭০,৮২০.০০
২০১১-২০১২	৪৯,৭৪,৬৬০.০০
২০১২-২০১৩	৯৫,০৪,৮৩৫.০০
২০১৩-২০১৪	৪৪,১৭,৭৭০.০০
২০১৪-২০১৫	৪২,৯০,১৮৮.০০
২০১৫-২০১৬	৭২,৮৭,৯৪০.০০

Source: Sundarbans Environmental and Livelihoods Security (SEALS) Project

সুন্দরবনে কর্মসংস্থান

প্রতিনিয়ত সুন্দরবনে মাছ ধরা, চিংড়িপোনা, গোলপাতা, গরান, মধু, কাঁকড়া প্রভৃতি সংগ্রহ কাজে এবং পরিবহণে প্রায় ১০ লাখ লোক নিয়োজিত থাকে বলে এটি স্থানীয় কর্মসংস্থানের একটি বড়ো ক্ষেত্র। সুন্দরবন দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করে। এখানে হাজার হাজার দুঃস্থ নারী-পুরুষ, অনাথ ও অসহায় জনগোষ্ঠী চিংড়িপোনা সংগ্রহের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। ফলে এলাকার ভিক্ষাবৃত্তি ও সামাজিক অস্থিরতা অনেকটা দূর হয়েছে এবং সামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে।

অধ্যায়-২২

জীবন ও জীবিকা

কৃষিনির্ভর অর্থনীতির এই দেশের মানুষের প্রধান পেশা কৃষি। খুলনা জেলাও এর ব্যতিক্রম নয়। এই জেলার অধিবাসীদের জীবিকা তাই বহুলাংশে কৃষিনির্ভর। বর্তমানে এখানকার প্রধান পেশাসমূহের মধ্যে রয়েছে কৃষি, মৎস্যচাষ, প্রাকৃতিক মৎস্য আহরণ, বিভিন্ন প্রকার শিল্প উৎপাদন ও এতদসংক্রান্ত ব্যাবসা। এছাড়াও রয়েছে আমদানি-রফতানি, চাকরি, আইনপেশা, সাংবাদিকতা, নির্মাণ, পরিবহণ, কলকারখানা ইত্যাদির কাজ।

অতীতের শুমারিগুলো থেকে দেখা যায় যে, এ অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণভাবে কৃষিনির্ভর ছিল। ১৯০১ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায় কৃষি আয়ের ওপর নির্ভরশীল ছিল ৭৭% লোক। ১৯৫০ সালের পরে শিল্পায়ন শুরু হলে কৃষি বহির্ভূত আয়ের ওপর মানুষের নির্ভরতা বাড়তে থাকে। আগে সাধারণ মানুষের আয়ের মধ্যে কৃষি বহির্ভূত আয় ছিল অতি সামান্য। এগুলোর মধ্যে ছিল বাঁশ-বেতের কাজ, লবণ, গুড়-চিনি প্রস্তুত, গোলপাতার কাজ, মাদুর তৈরি, নৌকা তৈরি, কাপড় তৈরি, মৃৎ শিল্পের কাজ, কর্মকারের কাজ, স্বর্ণকারের কাজ ইত্যাদি।

১৯৫১ সালের হিসাবে দেখা যায় যে বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত মোট শ্রমিকসংখ্যা ছিল ৬,২৭,৮৮৫ জন যাদের মধ্যে ৫,২৩,২৩২ জন ছিল কৃষিশ্রমিক। পঞ্চাশের দশকে লোকসংখ্যা ও শিল্পায়ন দুটোই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এতদসত্ত্বেও ১৯৬১ সালের শুমারিতে দেখা গেছে এখানের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক কৃষিজীবী। এদের পরেই জেলে বা মৎস্যজীবীদের স্থান। তারপরে রয়েছে সুন্দরবন থেকে জীবিকা আহরণকারীদের স্থান। তখন মোট শ্রমশক্তির এক ক্ষুদ্রাংশ ছিল অকৃষিজীবী। এসময়ে ৭৯.৭% লোক কৃষিজীবী এবং ২০.৩% লোক অকৃষিজীবী ছিল। অকৃষি পেশার উৎস ছিল পশু পালন, বাগান ও বাণিজ্যিক দুগ্ধ খামার, রেশমগুটি উৎপাদন, মধু আহরণ ইত্যাদি। ষাটের দশকে শিল্পায়নের বৃদ্ধি ঘটলে অকৃষি থেকে আয়ের উৎস বাড়তে থাকে এবং তা হয় বেশি শহরভিত্তিক। এসময় ব্যাবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং শিল্প ও ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ১৯৭৪ সালে কর্মরত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৬৯.৩% কৃষিকাজে, ৩০.৭% অকৃষি কাজে নিয়োজিত ছিল। এদের ৪২.৫৯% গ্রামে এবং ৪৬.৪১% শহরে বসবাস করত। ১৯৮১ সালে কৃষিকাজে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৫২.১% যার শহরাঞ্চলে ৯.৬%, অকৃষিজীবীর সংখ্যা বেড়ে হয় ৪৩.৪%। এসময়ে খুলনার পার্শ্ববর্তী মৌজাসমূহ থেকে মানুষ কৃষি পেশা ত্যাগ করে অকৃষি পেশা গ্রহণ করে। ১৯৮১ সালের আদমশুমারি প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৭৮ সালে জেলায় ১,৭০৩টি কুটিরশিল্প ছিল। ১৯৮২-৮৩ সালে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত ছিল ৫২,৮৯৫ জন লোক।

২০১১ এর জেলা পরিসংখ্যান অনুযায়ী খুলনা জেলার ৯টি উপজেলা ও সিটি করপোরেশনে কৃষি হোল্ডিং ছিল মোট হোল্ডিংয়ের ৪১.৩১ %। এখানে উল্লেখ্য যে, ২০০৮ সালে সিটি করপোরেশনে কৃষি হোল্ডিং ছিল সবচেয়ে কম।

কৃষি সামগ্রিকভাবে খুলনা জেলার অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা কৃষি। প্রকৃতির দানে পুষ্ট এই জেলার মানুষ স্বল্প পরিশ্রমে সারা বছর ধান, পাট, ফলমূল ও শাকসবজি উৎপাদন করে থাকে। বিভিন্ন প্রকার শাকসবজি, ধান, গম, পাট, আম, জাম, কলা, কাঁঠাল, পেয়ারা, নারকেল, পান, সুপারি, ইত্যাদি প্রধান উৎপাদিত ফসল। এই সকল উৎপাদিত কৃষি পণ্যের মাধ্যমে তারা পারিবারিক ব্যয় সংকুলান করে।

২০১১-এর জেলা পরিসংখ্যান অনুযায়ী খুলনা জেলার মোট ৯টি উপজেলা ও সিটি করপোরেশনে ৩,৫৬,১৮৭টি কৃষি হোল্ডিং ছিল যা মোট হোল্ডিংয়ের ৪১.৩১ %। কৃষি শ্রমিকসংখ্যা ছিল ১,৪৪,৩৫০ জন।

১৯৫১ সালে এখানে কৃষিজীবীর সংখ্যা ছিল ৫,২৪,৮৪০ জন। সরাসরি কৃষি উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল ছিল ৫২,৩২৩ জন। ১৯৬১ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৬,০৪,২৯৬ জন। ১৯৮১ সালের শুমারিতে দেখা যায় মোট শ্রমশক্তির ৪৮.৫৬% কৃষিজীবী। ১৯৮৩-১৯৮৪ সালের শুমারিতে পাওয়া যায়, জেলার সমগ্র হোল্ডিংয়ের ৭৬.৪% কৃষিখানা এবং জনসংখ্যার ৪৪.৫% কৃষি শ্রমিক পরিবার ছিল। ১৯৮৭ সালে কৃষিশ্রমিক পরিবার ছিল ১,৪৪,৩৫০টি। ক্ষুদ্র কৃষিজীবীদের অনেকেই জমি ও আয়ের স্বল্পতা হেতু অন্যের জমিতে কৃষিশ্রমিকে রূপান্তরিত হয়। ১৯৮৭ সালের হিসাব অনুযায়ী ৫৬.৬% ছিল কৃষি কাজে নিয়োজিত; ১১.৬ লাখ শ্রমশক্তির মধ্যে ৬.৬ লাখ।

১৯৯৬ সালে ৬,১১৫টি বড়ো কৃষি, ৩৩,০৮৯টি মধ্যম কৃষি ও ১,০৫,৬২৬টি ক্ষুদ্র কৃষিজীবী পরিবার ছিল। ২০০৮-এর কৃষিশুমারি অনুযায়ী মোট কৃষি গৃহস্থালির সংখ্যা (হোল্ডিং) ছিল ৩,৫৬,১৪৭টি। ২০০৮ সালে এই জেলায় মোট হোল্ডিং সংখ্যা ছিল ৫,০২,৮৩৫টি। তার মধ্যে কৃষি হোল্ডিং ছিল ২,০৭,৭৪৩টি এবং অ-কৃষি হোল্ডিং ২,৯৫,০৯২টি।[১] ২০১১ সালের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় ৫,০৩,০০০টি কৃষি পরিবার (৪১.৩১%) ছিল।

কৃষকেরা চাষাবাদের পাশাপাশি গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন করে। ১৯৮৪-৮৫ সালে মোট কৃষি হোল্ডিংয়ের প্রায় অর্ধেকের মতো গবাদিপশু ছিল। ২০১১ সালে খুলনায় ২,২০৬টি পোল্ট্রি ফার্ম, ৯২১টি ডেয়ারি ফার্ম ছিল। ২০১১ এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০৮ সালে ৪,০৯,২৫৯ জন হাঁস-মুরগি ও ১৮,৪৭৭টি পরিবার গবাদিপশু পালন করত। ১১,৮৬৯টি বাড়িতে অন্তত:পক্ষে প্রতিটিতে ১

[১] B.B.S Statistical Yearbook of Bangladesh. 2012. P. 128.

হতে ৩টি গবাদিপশু ছিল এবং ৫,০৯৪টি পরিবারের ছিল প্রতিটিতে ৯টির অধিক গবাদি পশু, যা ছিল তাদের উপার্জনের প্রধান উৎস। জেলার ডুমুরিয়া, কয়রা, পাইকগাছা ও দাকোপ থানার অধিকাংশ পরিবার পশু পালন ও দুগ্ধ উৎপাদন কাজের সাথে সম্পৃক্ত। এ ছাড়াও ছাগল, ভেড়া, মৌমাছি, হাঁস-মুরগি ইত্যাদি পালনের মাধ্যমে এই জেলার অনেকের আয়ের সংস্থান হচ্ছে। ২০১১ এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এ সময়ে ১,৮২,০৪৬টি পরিবার হাঁস-মুরগি পালন করত। কৃষকেরা কৃষির পাশাপাশি জমিতে মাছচাষ করে থাকে। এছাড়াও অবসর সময়ে তারা নানা প্রকার হাতের কাজ করে বাড়তি অর্থ উপার্জন করে থাকে।

মৎস্য আহরণ ও মৎস্য চাষ

মৎস্য আহরণ ও মৎস্যচাষ এই জেলার সাধারণ মানুষের জীবিকার অন্যতম উৎস। প্রচুর নদী, খাল ও বিল থাকার কারণে বিশাল মৎস্য সম্পদের অধিকারী এই জেলার মানুষ। মাছের প্রাচুর্য খুলনার অধিবাসীদের বড়ো এক অংশ মাছ চাষ, মাছ ধরা, মাছের ব্যাবসা ইত্যাদি পেশাকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত হয়েছে। এখানে অসংখ্য নদীনালা, হাওর, খাল, বিল, পুকুর, ডোবা, থেকে পাওয়া যায় বিপুল পরিমাণ মাছ। জেলে ও মাছ চাষিরা দেশের অভ্যন্তরস্থ এই নদী, বিল, হাঁওড়, পুকুর ইত্যাদি থেকে ৫,৬০,৯২০ মেট্রিক টন মাছ আহরণ করে। ১৯৯৬ সালে শুধু মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত ছিল ৪২,০০০টি জেলে পরিবার। ২০১১-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০৯-২০১০ সালে এদের সংখ্যা ছিল ২৯,৬৫৬ জন এবং ২০১০-২০১১ সালে এই জেলার ৩৮,৬৬৯টি পুকুর, ৩৬টি দিঘি ও অন্যান্য জলাশয় (৭১,৮৯০ হেক্টরজুড়ে) থেকে ৩০,৩৭০ জন মাছচাষি জীবিকার অন্বেষণ করেছে। উপকূলীয় অঞ্চলে মাছের ঘেরে লবণাক্ত পানি প্রবেশ করিয়ে বাগদা চিংড়ির চাষ হয়। জেলার কয়রা ও পাইকগাছাতে বেশি মাছ ও মাছের পোনা উৎপাদন হয়ে থাকে। দিঘি ও পুকুরে মাছচাষ ছাড়াও ধানখেত ও চাষের জলাভূমিতে উৎপাদন হয় প্রচুর মাছ যা এই অঞ্চলের কৃষির অনন্য বৈশিষ্ট্য। নদী, নদীর মোহনা ও সমুদ্র থেকে আসে প্রচুর মাছ। সৌভাগ্যের আশায় জেলেরা গভীর সমুদ্রে চলে যায় ট্রলার নিয়ে। তবে সেখানে প্রায়শ তারা ঝড় আর জলদস্যুদের উৎপাতের শিকার হয়। খুলনার উপকূলীয় এলাকা ও চরাঞ্চলে গড়ে উঠেছে এদের বিশাল বসতি। আহরিত মাছ সংরক্ষণের জন্য ৩,০০০ মে.টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ১টি হিমাগার রয়েছে যা মাছ ব্যাবসাকে গতিশীল রেখেছে।

মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মৎস্য রফতানি

মাছ এখানে একটি অর্থকরী সম্পদ। মাছ চাষিরা ৫০,৫১৭.৬০ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন প্রকার চিংড়ি ও সাদা মাছ চাষ করে এবং উৎপাদন করে ৩৫,৭৭৫ মেট্রিক টন মাছ। দেশের বেশিরভাগ চিংড়ি চাষের ক্ষেত্র এই জেলাতেই। অনেক অনাবাদি জমি ব্যবহৃত হচ্ছে চিংড়িচাষে। ফলে অবসান হয়েছে বেকারত্বের, আসছে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা। চিংড়িসহ সাদা মাছ হিমায়িত খাদ্য হিসেবে বিদেশে রফতানি হয়। মৎস্য দেশের ২য় বৃহত্তম রফতানি খাত হিসেবে পরিগণিত। এখানে স্বাধীনতাপূর্ব হতে ২০০5 সাল পর্যন্ত ৭৪টি হিমায়িত খাদ্য

প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপিত হয়।[২] চিংড়ি মাছের মাথা ফেলে দিয়ে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। এই কাজের মাধ্যমে স্থানীয় অনেক দরিদ্র ও অসহায় নারী বেঁচে থাকার অবলম্বন খুঁজে পেয়েছে। মাছের ফেলে দেওয়া মাথা আবার বিক্রি করা হয়।

মধু ও অন্যান্য দ্রব্য সংগ্রহ সুদূর অতীত হতে সুন্দরবন এই জেলার মানুষের বিভিন্ন প্রকার শিল্প ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উৎস। এই জেলার বিশেষত দক্ষিণাঞ্চলের মানুষেরা নদী, বিল ও খাল থেকে মাছ সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এখানে লোকের মাছ ছাড়াও কাঠ, মোম, মধু সংগ্রহ করতে তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলে। মধু সংগ্রহকারী মৌয়ালরা বছরে একটা নির্দিষ্ট সময়ে দল বেঁধে মধু সংগ্রহের কাজে যায়। এই কাজের সময় তারাই বেশি মানুষখেকো বাঘের শিকার হয়। এই বন থেকে মৌওয়ালিরা বছরে ১৮৮ মে. টন মধু আহরণ করে।[৩] সুন্দরবন থেকে জীবিকা সংগ্রহকারী অনেকে পুরুষানুক্রমে বাঘের আহার হয়েছে। বাওয়ালি ও কাঠুরেরা সারা বছর এখান থেকে কাঠ সংগ্রহের কাজ করে। সুন্দরবনের নদী ও খাল থেকে চিংড়ি পোনা সংগ্রহ করে দরিদ্র ও দুস্থ নারী- পুরুষেরা জীবিকার সন্ধান করছে। সুন্দরবন থেকে সংগৃহীত কাঠ ও আরও অনেক কিছু বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছে। খুলনার নিউজপ্রিন্ট মিল গড়ে উঠেছে গেওয়া কাঠের কাঁচামালের ওপর ভিত্তি করে। কাঠ ও গোলপাতা আজও প্রাথমিকভাবে আসবাব তৈরির কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। গরান কাঠ ঘরের শক্ত খুঁটি বানানোর কাজে লাগে।

অকৃষি পেশা ১৯০১ সাল থেকে খুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এবৃদ্ধির কারণগুলোর মধ্যে ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আতঙ্ক ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গার কারণে কলকাতা ছেড়ে মানুষের খুলনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ। শতাব্দীর মধ্যভাগে খুলনায় শিল্পায়ন শুরু হলে সাধারণ স্বল্প আয়ের মানুষ খুঁজে পায় জীবিকার নতুন উৎস। এখানে স্থাপিত হয় অনেকগুলো পাটকল, নিউজপ্রিন্ট মিল, শিপইয়ার্ড, চালনা বন্দর ইত্যাদি। ১৯৬১ ও ১৯৭৪ সালের শ্রমশক্তির তুলনা করলে দেখা যায় যে, কৃষি ও কৃষিসংশ্লিষ্ট পেশা ব্যতীত অন্য সকল পেশায় শ্রমশক্তি বেড়েছে। তন্মধ্যে উৎপাদন ও পরিবহণ খাত এবং কারিগরিসহ অন্যান্য খাতে বেড়েছে সবচেয়ে বেশি।

খুলনায় বর্তমানে জীবিকার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে অনেক মানুষ। বিভিন্ন কারণে তারা গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। এর পিছনের কারণগুলো হলো কৃষি জমির সংকোচন ও ক্রমবিভাজন, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, নদীভাঙন, সাইক্লোন, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জনসংখ্যা বৃদ্ধিসহ সামাজিকভাবে মহাজন শোষকশ্রেণির চাপের কারণে কৃষকদের জমি, ভিটেমাটি হারানো ইত্যাদি।

---

[২] শিল্পায়নে খুলনা, বিসিক, খুলনা, ২০০৭. পৃ. ৩৬।

[৩] ওই, পৃ. ১৬।

সময়ের সাথে সাথে গ্রাম ও শহরে পেশার ধরনে পরিবর্তন এসেছে। প্রশাসনিক কেন্দ্র হওয়ায় এখানে সৃষ্টি হয়েছে অনেক নতুন কর্ম ও পেশার, বৃদ্ধি পেয়েছে জীবন ও জীবিকার উদ্দেশ্যে শহরে পাড়ি জমানো ভাগ্যান্বেষী মানুষের, সেই সাথে ব্যাবসা ও অকৃষি পেশার।

শিল্প উৎপাদন

খুলনা দেশের অন্যতম শিল্পাঞ্চল, একসময় এর মিলগুলো কর্মসন্ধানী মানুষের কর্মের অবারিত ক্ষেত্র ছিল। বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে যখন শিল্পায়ন ঘটে তখন প্রচুর মানুষ এখানে অভিবাসিত হয়। প্রচুর কাঁচামাল ও যোগাযোগের সুবিধা নিয়ে ভৈরব ও রূপসা নদীর তীরে দাঁড়ানো মিলগুলো অধিকাংশই জেলার খালিশপুর, দৌলতপুর, শিরোমণি ও রূপসায় অবস্থিত। ১৯৮৩ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের ২২% পাটকল এবং ২৩% কর্মরত শ্রমিক এবং ১৯৮৩-৮৪ কৃষি শুমারি অনুযায়ী দেশের ৬.৮% কুটিরশিল্প এখানে ছিল।

এখনো এই মিল কলকারখানাগুলো অনেক শ্রমিক ও পেশাজীবী মানুষের আয় ও কর্মসংস্থানের উৎস। ২০০৭-এ বিসিকের রিপোর্ট অনুযায়ী খুলনায় ২১ টি ভারী শিল্প কারখানা, ১১টি জুটমিল, ৬টি সি ফুড ও ৩টি স্টিল মিল ছিল। এখানে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি বন্ধ ছিল যার কয়েকটি আবার চালু হয়েছে। বন্ধ থাকার কারণে অনেক শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে যার ফলে ২০০৫ সালে শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮,৫০২ জন। কয়েকটি মিল চালু হওয়ার পরে ২০১১ সালে শ্রমিকসংখ্যা হয় ২৯,৭২৮ জন। ২০১১ জেলা রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমানে আছে ১১টি জুটমিল, ৩টি স্টিল মিল ও অন্যান্য ৬৪টি মিল। এই ১১টি মিলে তাঁত বসানো আছে ৫,৮৮৫টি। মিলগুলোতে কর্মরতদের মধ্যে ৬,৯৪১ জন স্থায়ী এবং ২,২৮৭২ জন বদলি বা অস্থায়ী শ্রমিক। পাটকলের অধিকাংশ শ্রমিক অস্থায়ী (বর্তমানে কোনো কোনো কারখানায় 'নো ওয়ার্ক নো পে') ভিত্তিতে কাজ করছে। খুলনা সিটি করপোরেশনে আছে ৭টি পাটকল। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে পাট সংগ্রহ করে এখানে গুদামজাত করা হয়। তাই পাটের মৌসুমে পাটের কাজ করে পরিবারের খরচ চালায় অনেক দরিদ্র পরিবার। এই সকল মিলে প্রধানত চট, বস্তা, সুতা ইত্যাদি তৈরি হয়। পাটের গুদামে ছুটা শ্রমিকরা পাট বাছাই, পাটের গোড়া কাটা ও পাটের দড়ি বানানোর কাজ করে অর্থ উপার্জন করে। জেলায় মোট ৩৪,২৫৩ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার ১৬৭টি পাটের গুদাম আছে।

এখানে নিউজপ্রিন্ট মিলে নিউজপ্রিন্ট কাগজ ছাড়াও মেকানিক্যাল প্রিন্ট, বুকপ্রিন্ট, র‍্যাপার, ম্যাচ-পেপার তৈরির কাগজ ইত্যাদি তৈরি হয়। হার্ডবোর্ড মিলে খেলনা, হালকা আসবাব, বাক্স, প্যাকেট ইত্যাদি তৈরি হয়। রূপসা থানার লবণচরা এলাকায় শিপইয়ার্ডে বিভিন্ন প্রকার নৌযানের নকশা ও নৌযান বানানো হয়। তৈরি যান হিসেবে মটর লঞ্চ, পোর্ট ফেরি, কার্গো, অয়েল ট্যাংকার, কার্গো লঞ্চ, সাধারণ জাহাজ, যুদ্ধ জাহাজ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সেগুলো মেরামতের কাজও এখানে হয়। বাংলাদেশ ক্যাবল ইন্ডাস্ট্রিতে টেলিফোনের তার, প্রাইমারি ক্যাবল, সাবমেরিন ক্যাবল, ড্রপ অয়ার, অপটিকাল ফাইবার তৈরি হয় যা বর্তমান তথ্য ও প্রযুক্তির যুগে একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। স্টিল মিলে বানানো হয় সাধারণ দ্রব্য পরিবহণের জন্য বিভিন্ন ভ্যানগাড়ি, সিটি করপোরেশনের ময়লার গাড়ি।

মাঝারি শিল্প খুলনা জেলার বিরাট এক অংশের মানুষের কর্মের সংস্থান হচ্ছে মাঝারি এবং ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পের মাধ্যমে। মাঝারি শিল্পের মধ্যে এখানে আছে লবণ কারখানা, সুজি ও আটার কারখানা, বেকারি, রাইস মিল, বরফ কল, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র ও ড্রাইসেল তৈরির কারখানা। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের আওতায় গড়ে উঠেছে অনেক ফ্লাওয়ার মিল, বরফ কল, আইসক্রিম মিল, মাছের ঘের ও হ্যাচারি, চিংড়ি ঘের, হাঁস-মুরগির খামার, দুগ্ধ খামার, গুড় ও বিভিন্ন খাদ্যজাত দ্রব্য তৈরি, পোশাক, উলেন সোয়েটার, লেপ-তোশক, মশারি তৈরি, ব্লক বাটিক, এমব্রয়ডারি, জরি সুতা, জুতা স্যান্ডেল, মাদুর, ছাতার বাট, হাড় ও শিংয়ের লাঠি, লেদার হ্যান্ডিক্রাফটস, ওয়াশিং সোপ ও ডিটারজেন্ট, বিশুদ্ধ পানি, ক্যামিক্যালস, বেবি বাইসাইকেল, প্রিন্টিং ও প্যাকেজিং, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ইত্যাদি তৈরি, ওয়ার্কসপ, ওয়েল্ডিং ওয়ার্কসপ, প্রকৌশল ইত্যদি বিষয়ক কারখানা। এই প্রকারে এখানে গড়ে উঠেছে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের ১৪,৯৯৯টি ইউনিট যাতে নিয়োজিত আছে ২৯,৭২৮ জন কর্মী। এখানকার মানুষেরা তাই বিভিন্ন প্রকার ব্যাবসাকে জীবিকার মাধ্যম হিসেবে বেছে নিতে পেরেছে। খুলনায় কুটিরশিল্পের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও শ্রমিকদের জীবন যাত্রার মান বাড়ানোর জন্য দৌলতপুরের শিরোমণিতে শিল্পনগরী স্থাপন করা হয়েছে।

কুটিরশিল্প ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের এই পেশায় অধিকাংশই আসে পারিবারিকভাবে। তাই দেখা যাচ্ছে এখানে ৯,১৩২ জনের মধ্যে ৭,৪৮০ জনই পারিবারিক সদস্য, বাকিরা ভাড়ায় কাজ করে অস্থায়ীভাবে। কুটিরশিল্পের কাজ সাধারণত পারিবারিক সদস্যদের অপ্রধান পেশা হয়ে থাকে। এতে কোনো একটি বা দুটি পরিবারের লোকেরা অবসর সময়ে বাড়িতে বসে নিজহাতে দ্রব্যাদি তৈরি করে থাকে।

এখানে মৃৎ শিল্প একটি প্রাচীন শিল্প। আজও কৃষি এবং গৃহস্থালির কাজে মাটির তৈরি জিনিসপত্র ব্যবহার হয়ে থাকে। নিম্নবর্ণের হিন্দু যারা এই পেশায় নিয়োজিত ছিল তারা পাল বংশ নামে আখ্যায়িত, এদেরকে কুমারও বলা হয়ে থাকে। মাটির হাঁড়ি, কলসি, মূর্তি ও বিভিন্ন রং-বূপার পাত্র, থালা বাসন, টব, পুতুল, খেলনা, শোপিস ইত্যাদি তৈরি এদের কাজ। গ্রামাঞ্চলে মাটির তৈরি দ্রব্যের চাহিদা বেশি। বর্তমানে এই জেলার বিভিন্ন থানায় ২,৫৫২টি ইউনিটে মাটির শিল্পের কাজ হচ্ছে, যদিও এদের সংখ্যা অতীতের তুলনায় অনেক কমে গেছে।

এই জেলায় প্রাচীনকাল থেকে হয়ে আসছে কর্মকার ও স্বর্ণকারের কাজ। কর্মকার উত্তপ্ত লোহা পিটিয়ে বিভিন্ন ছোটো খাটো হাতিয়ার ও কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি করে থাকে যেমন: কোদাল, কুড়াল, শাবল, দা, খোন্তা, নিড়ানি, ছুরি, চাকু ইত্যাদি।। স্বর্ণকাররা স্বর্ণালংকার বানিয়ে ও সুদে অর্থ ঋণ দিয়ে অর্থ আয় করে থাকে।

এই জেলায় অতীতকাল হতে হয়ে আসছে বাঁশ ও বেতের কাজ। পাকা বেত ও বাঁশ সহজে নষ্ট হয় না। বেত দিয়ে তৈরি হয় অনেক সুন্দর সুন্দর, টেকসই ও হালকা ফার্নিচার, খেলনা, দোলনা, চেয়ার, খাট, বইয়ের তাক এবং গৃহস্থালির জন্য ব্যবহার্য অনেক দ্রব্য। গৃহস্থালি কাজের জন্য বাঁশের তৈরি দ্রব্যের অনেক চাহিদা। বাঁশ চিকন করে চিরে নিয়ে তা দিয়ে ঝুড়ি, ডালা, জালি, নৌকার লগি ও বিভিন্ন অংশ বানানো হয়। সরাসরি প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি এসকল জিনিস পরিবেশবান্ধব। বর্তমানে এই পেশার ১,০৮৭টি ইউনিট আছে যেখানে ২,৪৬৬ জন কর্মী কাজ করে।

ফুলতলা ও ডুমুরিয়ায় রয়েছে তাঁতপল্লি। সেখানে কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছে সহস্রাধিক মানুষ; পারিবারিকভাবে ১,৩০৩ জন আর ভাড়াটে শ্রমিক হিসেবে ৫২ জন, মোট ১,৩৫৭ জন শ্রমিক। ফুলতলায় আছে ৩০০টি তাঁত ফ্যাক্টরি (বর্তমানে কার্যকর আছে ২৬০) এবং ডুমুরিয়াতে ৪২০টি। এই জেলার ডুমুরিয়াতে তুলনামূলকভাবে কুটিরশিল্পের কাজ বেশি হয়। এখানে কুটিরশিল্পের ১,৮৯০টি ইউনিট আছে যার মধ্যে ৪২০টি তাঁত, ৮১৫টি হ্যান্ডি, ১,২৩৬টি তুষ ছাড়ানো মেশিন, ২,২৬০টি মৃৎ ও ৩১২টি অন্যান্য কুটিরশিল্প রয়েছে। এখানের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরিবার বাঁশ ও বেতের কাজের সাথে জড়িত। এখানের সকল ইউনিট মিলে কাজে নিয়োজিত আছে ৬,৬৬০জন শ্রমিক। দিঘলিয়াতে ৩টি জুট মিল বাদেও আছে ২৩টি রাইস মিল, ১,৩৬০টি ধানের তুষ ছাড়ানোর মেশিন, ৪৪টি হ্যান্ডি ও ৩২টি মৃৎ শিল্পের কুটির আছে।

সারণি-১৫০

উপজেলাভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সংখ্যা

উপজেলা/সিটি করপোরেশন	বিভিন্ন প্রকারের কুটিরশিল্প সংখ্যা								
	তাঁত বুনন	হ্যান্ডি/ টুকিটাকি জিনিস	ধান ভাঙানো	গুড়	বিড়ি	লবণ	মাছ শুঁটকি	মৃৎ	অন্যান্য
বটিয়াঘাটা	০	১৩৩	৩৫৯৪	০	৪	০	০	২৬	১২০
দাকোপ	০	০	৩০	০	০	০	০	০	০
দিঘলিয়া	০	৪৪	১,৩৬০	০	০	০	০	৩২	০
ডুমুরিয়া	৪২০	৮১৫	১,২৩৬	০	০	০	০	২,২৬০	৩১২
খুলনা সিটি	২	১৪	৩৪	২	০	১	১	০	১৫
কয়রা	০	০	৫২	০	০	০	২৫	৩	০
পাইকগাছা	০	০	১৩৩	৫৩২	০	০	৩৭	১২০	৫০০

উপজেলা/সিটি করপোরেশন	বিভিন্ন প্রকারের কুটিরশিল্প সংখ্যা								
	তাঁত বুনন	হ্যান্ডি/ টুকিটাকি জিনিস	ধান ভাঙানো	গুড়	বিড়ি	লবণ	মাছ শুঁটকি	মৃৎ	অন্যান্য
ফুলতলা	২৬০	০	১,৪৯৬	০	০	০	০	৩	০
রূপসা	০	০	২৭	০	১	৫	০	৭৮	৬২
তেরখাদা	০	০	১৭০	১১৫	০	০	০	০	০
মোট	৬৮২	১৯৩১	৮,১৩২	৬৪৯	৫	৬	৬৩	২,৫২২	১০০৯

Source: B.B.S. District Statistics, Khulna, 2011. p .59.

এই জেলাতে ধান ভাঙানো অর্থাৎ ধান মাড়ানো ও তুষ ছাড়ানোর কাজ করে উপার্জন করছে বেকার ও দক্ষ বা প্রশিক্ষণবিহীন বড়ো এক জনগোষ্ঠী যাদের অধিকাংশই নারী। এখানের অটো, সেমি অটো এবং সাধারণ রাইস মিলে ৮১৩২টি ধান ভাঙানোর মেশিন আছে যাতে ১,০২৫ জন পুরুষ ও ২,৪৮২ জন মহিলার জীবিকার সংস্থান হচ্ছে। ২০১১ সালের জেলা পরিসংখ্যান হিসাব অনুযায়ী এই জেলায় আটার মিল আছে ১১৫টি, এতে ৩০২ জন লোক (পারিবারিক ভাবে এবং ভাড়ায়) কাজ করছে।

বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ এই জেলায় অনেক কাঠের কাজ হয়। সাধারণ বনজ বৃক্ষ বাদেও সুন্দরবনের বহু বৃক্ষ এর কাঁচামাল জোগান দেয়। ২০১১-এর পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, খুলনার প্রতিটি উপজেলায় কাঠের ফার্নিচার বানানোর দোকান আছে। এসকল দোকানে নিত্যপ্রয়োজনীয় ও ঘর সাজানোর সৌখিন আসবাবপত্র যথা- কাঠের খাটপালঙ্ক, আলমারি, ওয়ারড্রোব, ড্রেসিং টেবিল, পড়ার টেবিল ইত্যাদি বানানো হয়। এখানে এরকম ৬৪৫টি দোকানে ২,১৪৮ জন কাঠমিস্ত্রি ও মালিক শ্রমরত আছে। এই শিল্পের সাথে জড়িত অপর শিল্প কাঠ চেরায়ের ২৫৫টি স' মিলে কাজ করছে ১,৫৬৩ জন শ্রমিক-কর্মচারী।

খুলনা জেলায় বিভিন্ন প্রকার ছাপার কাজের জন্য গড়ে উঠেছে ৭৭ টি প্রিন্টিং প্রেস, কাজে নিয়োজিত আছে ৭৪৫ কর্মী। এখানে প্লাস্টিক সামগ্রীর ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। এর চাহিদার কিছুটা পূরণ করছে ৪টি প্লাস্টিক কারখানা যেখানে ৬১ জন লোক কাজ করছে।

এখানে জীবিকা অর্জনের জন্য কুটিরশিল্পের একটি বড়ো খাত পোশাক তৈরি। এর জন্য ২,৮৩৫টি দোকানে স্থানীয়ভাবে ৫,৮৮৩ জন কাটার মাস্টার ও দর্জি কাজ করছে। উল্লেখ্য যে, এই জেলায় কোনো গার্মেন্টস শিল্প ও ব্যাবসায়ী নেই।

জেলায় কুটিরশিল্পের বাইরে রয়েছে অনেক স্টিল ও লোহার রডের তৈরি আসবাবপত্রের দোকান। আসবাবপত্র বাদেও বিভিন্ন লোহার কারখানায় লোহা দিয়ে তৈরি হয় বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্য। এখানে খাদ্যজাত দ্রব্য তৈরির মাধ্যমে আয়ের সংস্থান করছে অনেক লোক। অতিথি আপ্যায়ন, নাস্তা ও টিফিন এর

জন্য বিভিন্ন প্রকার বিস্কুট, কেক ছাড়াও চিড়া, মুড়ি, গুড়, চানাচুর, জ্যাম-জেলি, কেক, মিষ্টান্ন ও দুগ্ধজাত খাদ্যসামগ্রী তৈরি হয় বেকারি ও কুটিরশিল্প কারখানায়। এখানে কেক, বিস্কুটের ৪৯টি বেকারি রয়েছে যেখানে ৩৫৩ জন শ্রমিক ও মালিকের আয়ের সংস্থান হয়। এখানে হোটেল ও রেস্তোরাঁর ব্যাবসাও অনেক মানুষের রুজির জোগান দিচ্ছে। ২০০২-০৩ অর্থনৈতিক শুমারি অনুযায়ী এই কাজে জড়িত ছিল ১১,৪১১ জন এবং ২০১১ সালের জেলা পরিসংখ্যান হিসাবে এখানে ১,২১৫টি হোটেল এবং রেস্তোরাঁ আছে বলে জানা যায়। এখানে আরও আছে আটা-ময়দা, তেল, প্রক্রিয়াজাত মশলা, মাছ-শুঁটকি, কুমড়ো বড়ি, জর্দা, বিড়ি, গুল ইত্যাদি তৈরির সাথে জড়িত কর্মী। এখানে আটা-ময়দা তৈরির জন্য ১১৫টি কলে ৩০২ জন এবং বিভিন্ন প্রকার তেলের স্থানীয় চাহিদা মেটাতে ৬৯টি তেলের মিলে ১৯৯ জনের কাজের হিসাব পাওয়া যায়। বিড়ি বানানোর ৫টি কারখানায় আরও কিছু লোকের জীবিকার উপায় হচ্ছে। এ জেলায় ব্রিটিশআগে সময়ের ঐতিহ্য হিসেবে গুড় ও লবণ তৈরির কাজ এলাকাবাসী ধরে রেখেছে।

লবণ উৎপাদন

লবণ শিল্পের ইতিহাস ব্রিটিশপূর্ব সময়ের। তখন রায়েরমহল নামক স্থানে লবণ উৎপাদিত হতো। অতীতে লবণ প্রস্তুত ও এর ব্যাবসা ছিল লাভজনক। ব্রিটিশ শাসনকালে এর উৎপাদন ও ব্যাবসার অবনতি ঘটে। কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে কৃষকেরা মাটির লবণাক্ত স্তর সংগ্রহ করে অনুস্রাবণ পদ্ধতিতে লবণ তৈরি করে। তবে এই লবণ ভোজ্য লবণের মতো পরিশুদ্ধ নয়। এটি এখন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরির জন্য কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে এখানে ৬টি লবণ কারখানা আছে যেগুলো ভোজ্য লবণের চাহিদা মেটাচ্ছে।

গুড় উৎপাদন

প্রকৃতির আশীর্বাদপুষ্ট এই জেলায় আখ, তাল ও খেজুরের রস প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। কৃষকেরা এই রস জ্বাল দিয়ে ঘনীভূত করে গুড় উৎপাদন করে এবং তা সারা বছর রেখে খাওয়ার জন্য সুবিধামতো আকার দিয়ে শুকনা ও শক্ত পাটালি প্রস্তুত করে। খেজুরের গুড় তৈরির জন্য বর্ষার শেষে কৃষকেরা বিশেষ কায়দায় খেজুরের গাছ কেটে মাটির পাত্রে রস সংগ্রহ করে জ্বাল দেয় (সাধারণত ধানের খড় কুটা ব্যবহৃত হয়)। এই গুড় ও পাটালির চাহিদা ব্যাপক। এই জেলায় ৬৪৯টি গুড় তৈরির ক্ষেত্র রয়েছে।

মাছ সংরক্ষণ

জেলে ও মাছ চাষিদের সংগৃহীত অতিরিক্ত মাছ সংরক্ষণের শেষ উপায় হচ্ছে মাছ শুঁটকি করা। এই কাজের সাথে জড়িত কৃষক, জেলে ও ব্যাবসায়ীরা সাধারণত রৌদ্রে শুকিয়ে, লবণে ভিজিয়ে এবং কৃত্রিম উপায়ে তাপ দিয়ে মাছ শুঁটকি বানায়। কোনো কোনো মাছকে পরিষ্কার না করেই রৌদ্রে ফেলে শুকায়, আবার চিংড়ির ক্ষেত্রে রফতানির উদ্দেশ্যে তা সিদ্ধ করে, খোসা ছড়িয়ে শুকায়। ইলিশ মাছ লবণে ভিজিয়ে সংরক্ষণ করে। সুন্দরবনের দুবলার চরে আহরিত প্রচুর মাছ শুঁটকি করা হয় এবং তা বিদেশেও রফতানি হয়; বর্তমানে ৬৩টি

মাছ শুঁটকি করার কেন্দ্র আছে। এই সকল কাজে নিযুক্ত শ্রমিক, উৎপাদনকারী, বিপণনকারী, ব্যাবসায়ী সকলে মিলে জীবিকার সন্ধান করছে।

চিংড়িঘেরে প্রচুর বাগদা ও গলদা পোনার প্রয়োজন হয়। দক্ষিণাঞ্চলের অনেক দরিদ্র পুরুষ ও নারীরা পার্শ্ববর্তী নদী থেকে চিংড়ির পোনা সংগ্রহ করে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করছে। এছাড়াও মাছের হ্যাচারিতে মাছের পোনা উৎপাদনের সাথে জড়িত আছে এই জেলার অনেক মানুষ। মাছের ঘেরে কাঁকড়ারও চাষ করা হয়। ঘের বাদেও অন্য জলাশয় থেকে কাঁকড়া, ব্যাঙ ইত্যাদি সংগ্রহ করে অনেক হতদরিদ্র মানুষ অর্থ উপার্জন করছে।

অন্যান্য পেশা ভবন ও রাস্তাঘাট নির্মাণের প্রয়োজনে গ্রাম ও মফস্বল এলাকাতে গড়ে উঠেছে অনেক ইটভাটা। সেখানে কাজ করছে অনেক মানুষ। ২০১১-এর পরিসংখ্যানে এখানে গড়ে ওঠা ২১৭টি ইট ভাটার হিসাব পাওয়া যায়।

খুলনায় শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি। এখানে শিল্পের উৎপাদনের পাশাপাশি মজুরিভোগী শ্রমিকের উপস্থিতিও বেড়েছে। গ্রাম থেকে আসা ভূমিহীন কৃষকেরা কারখানার শ্রমিক, জোগালি, মুটেমজুর ইত্যাদি স্বল্প মজুরির কাজে যোগ দেয়। কলকারখানায় শ্রম বাদেও অন্যত্র দিনমজুরি, রিকশাচালনা, নৌকার মাঝির কাজ, কুলিগিরি ইত্যাদি কাজ করে বেঁচে থাকার প্রয়াস করছে। এদের মধ্যে অনেক নতুন মুখের আবির্ভাব ঘটেছে যারা দক্ষিণাঞ্চলের ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ আইলার প্রত্যক্ষ আঘাতের শিকার। এছাড়াও লবণাক্ততার কারণে ফসলহীন অঞ্চলের ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকেরা এবং বন্ধ কল কারখানার অনন্যোপায় শ্রমিকেরা জীবিকার জন্য নানা ধরনের কায়িক পরিশ্রম করছে। এদের মধ্যে আছে ১০,৭০৭ জন রিকশাচালক যাদের সংখ্যা ২০০২-০৩ এ ছিল ৬,২৮৭ (রেজিস্টার্ড)। আরও আছে ১৩,৪৪০ জন ভ্যান চালক, ১,৪৩৯ জন অটোরিকশা ও ইজিবাইকের চালক। পরিবহণ ও যোগাযোগের কাজে খুলনার রাস্তায় চলাচল করে ছোটোখাটো পরিবহণ ১,০৬২টি টেম্পু, ১,৮৬৬টি নছিমন-করিমন। এসবের কোনো কোনোটিতে ড্রাইভারের সাথে একজন হেলপারও থাকে।

এসব কারণে শিল্প ও বাণিজ্যনগরী খুলনায় বিস্তৃত হয়েছে বিভিন্ন প্রকার ব্যাবসা কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের পাশাপাশি বিপণন ও সরাসরি ভোক্তার নিকট পর্যন্ত পৌঁছানোর সাথে জড়িত থেকে জীবিকা নির্বাহ করছে এই জেলার অনেক মানুষ। ২০০২-০৩ শুমারি অনুযায়ী এইরূপ তৈরি, উৎপাদন ও প্রস্তুতকরণের সাথে জড়িত ছিল ৫০,৯২০ জন এবং পাইকারি ও খুচরা ব্যাবসায় ছিল ৯০,৯৫৭ জন। এসবের সাথে জড়িত পরিবহণ, গুদামজাতকরণ ও যোগাযোগ সেক্টরে ছিল ৫,৭৬৮ জন। এখানে খাদ্য, পাট, সার ইত্যাদি গুদামজাত করার জন্য ১৬০,৬৭৭ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ১৭৮টি গুদাম।

৪,৩৮৯.১১ বর্গকিলোমিটার আয়তনের খুলনা জেলার শহরে শহরে বিস্তৃত দোকানপাটে চলছে ছোটো-বড়ো নানাবিধ ব্যাবসা। রয়েছে আধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রপাতির ব্যাবসা-টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, ওভেন, কম্পিউটার, মোবাইল ইত্যাদির শোরুম। আছে মটরসাইকেল, বাইসাইকেলের শোরুম এবং রেন্ট কারের ব্যাবসা। আছে তৈরি পোশাক এবং ছিটকাপড়ের দোকান। বিদ্যুৎ ঘাটতিতে ব্যবহারের জন্য আইপিএস ব্যাটারি সরবরাহের ৫৯টি প্রোভাইডার আছে। বৃদ্ধি পেয়েছে বিভিন্ন প্রসাধন ও সাজ-সজ্জা সামগ্রীর দোকান। যার চাহিদা আধুনিক রূপসচেতন ফ্যাশানপ্রিয় সকল বয়সি নারীদের কাছে অগ্রগণ্য। বর্তমানে পুরুষেরাও কমবেশি রূপসচেতন। এর জন্য গড়ে উঠেছে উভয়ের জন্য বিউটি পার্লার। নগরবাসী ব্যস্ত মানুষদের দৈনন্দিন কেনাকাটার জন্য গড়ে উঠেছে মিনাবাজার এবং সেফ অ্যান্ড সেভের মতো ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। এছাড়া রয়েছে সাধারণ হাট ও বাজারে কাঁচা মাছ, মাংস, ও শাকসবজি ব্যাবসায়রত অনেক লোক। এসব ব্যাবসার জন্য রয়েছে যথাক্রমে ২৩৭টি প্রাত্যহিক বাজার, ১৫৫টি সাপ্তাহিক বাজার ও ৪৫টি গ্রোথ সেন্টার।

সারণি-১৫১

উপজেলাভিত্তিক বিক্রয়, উৎপাদন ও সেবা কেন্দ্র

সিটি করপোরেশন/ উপজেলা	গ্রোথ সেন্টার	হাটবাজার	পোল্ট্রিফার্ম	ডেইরিফার্ম	বাণিজ্যিক	হর্টিকালচার	ইট ভাটা	ডেকোরেটর
বটিয়াঘাটা	৩	৩৪	২০০	২৯	৭	০	৩	১২
দাকোপ	৭	১৩	৫০০	২৩	২	০	১	৯
দিঘলিয়া	৩	১৭	১২৫	১৫৪	১৭	০	৩	২৩
ডুমুরিয়া	৮	৫৪	৩৫৩	১৩৬	১০	০	১৭	৪০
সিটি করপোরেশন	০	২৭	২৭০	১৪৯	১১	২	০	৫৪
কয়রা	৫	২৯	৩৩	৪	৫	০	৪	১৬
পাইকগাছা	৭	৩৮	২৪৭	৪০	৮৯	১	৬	২৩
ফুলতলা	২	৪	১৭৬	১৩৪	৫৫০	০	৬	১০
রূপসা	৬	২১	১৫৯	৮৭	১৭	০	৪২	১৯
তেরখাদা	৪	২৪	১৪৩	১৬১	১	০	৪	১১
মোট	৪৫	২৬১	২,২০৬	৯২১	৭০৯	৩	৮৬	২১৭

Source : B.B.S. District Statistics, Khulna, 2011. p. 23.

আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তির যুগে বিভিন্ন প্রকার প্রযুক্তি ও ইন্টারনেটের ব্যাবসা বৃদ্ধি পেয়েছে এই জেলাতে। যত্রতত্র দেখা যায় ফটোকপির মেশিন ও কম্পিউটারসহ দোকান। আছে ডিশলাইনের ব্যাবসা। ২০১১ সালে ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য ১১২টি সাইবারক্যাফের হিসাব পাওয়া যায়।[8]

---

[8] District Statistics, Khulna, 2011. p.22.

বিভিন্ন প্রকার শ্রমিকের মজুরি ২০১১ সালে একজন কৃষি শ্রমিকের দিনপ্রতি মজুরি পুরুষ-১৮০ টাকা, মহিলা-১৫০ টাকা এবং শিশু শ্রমিক-৮০ টাকা ছিল। সেই সময়ে সাধারণ মানের চাল ছিল কেজি প্রতি ২৫ টাকা। এতে ৫ সদস্যের পরিবারের জন্য জনপ্রতি ৬০০ গ্রাম হিসেবে ৩ কেজি চাল কিনতে লাগত ৭৫ টাকা, তার হাতে রয়ে যেত ১০৫ টাকা যা দ্বারা সে তার অন্যান্য চাহিদাগুলো মেটাতে পারত। তবে শ্রমবাজারে জনসংখ্যা বিচারে কোনো শ্রমিকের চাহিদা নিয়মিত নয় বিধায় তাদের জীবনের চাকা ঘোরানো অনেক কঠিন হয়ে যায়।

সারণি-১৫২

কৃষি শ্রমিকের গড় মজুরি (২০১১)

(মূল্য-টাকায়)

উপজেলা	পুরুষ	মহিলা	শিশু (১৫ বছর বয়সের নিচে)
বটিয়াঘাটা	২৫০	২০০	৬০
দাকোপ	২৫০	১৭০	০
দিঘলিয়া	২৪০	১৫০	১০০
ডুমুরিয়া	২১০	১২০	৫০
সিটি করপোরেশন	২৬০	১৮০	৯৬
কয়রা	১৯০	১২৫	১০০
পাইকগাছা	২২০	১২০	৯০
ফুলতলা	২০০	১৭৫	১০০
রূপসা	২২৫	১৫০	১০০
গড়	১৮০	১৫০	৮০

Source: District Statistics, Khulna, 2011. P. 103.

অন্যদিকে একই সময়ে অকৃষি খাতে একজন কুলির গড় মজুরি ছিল ২০০ টাকা। বাগানের মালি ২৫০ টাকা এবং মহিলা ও শিশু শ্রমিক যথাক্রমে ১৫০ ও ৮০ টাকা পেত। সারণিতে একজন অ-কৃষি শ্রমিকের ২০১১ সালে প্রাপ্ত গড় মজুরি দেখানো হলো:

সারণি-১৫৩

অকৃষি শ্রমিকের গড় দৈনিক মজুরি ২০১১

(মজুরি টাকায়)

উপজেলা/সিটি করপোরেশন	কুলি	বাগান পুরুষ শ্রমিক	বাগান মহিলা শ্রমিক	অন্যান্য শ্রমিক বয়স্ক	অন্যান্য শ্রমিক শিশু
বটিয়াঘাটা	২৫০	২৫০	২০০	২৫০	১০০
দাকোপ	২৫০	২২০	১৫০	২৫০	১২০
দিঘলিয়া	২০০	২২০	১২০	২৪০	১২৫
ডুমুরিয়া	২০০	২০০	১২০	২০০	১০০

উপজেলা/সিটি করপোরেশন	কুলি	বাগান পুরুষ শ্রমিক	বাগান মহিলা শ্রমিক	অন্যান্য শ্রমিক বয়স্ক	অন্যান্য শ্রমিক শিশু
খুলনা সিটি করপোরেশন	২৫০	২৫০	২০০	২৫০	১০০
কয়রা	৩০০	২০০	১২০	২০০	১০০
পাইকগাছা	৩০০	২২০	১২০	২০০	৯০
ফুলতলা	২৫০	২৫০	২০০	২৫০	১০০
রূপসা	৩০০	২৫০	১৫০	২৫০	১০০
গড়	**২০০**	**২০০**	**১৫০**	**২০০**	**৮০**

Source : District Statistics, Khulna, 2011.p.103.

অন্যান্য অকৃষি শ্রমিকদের মধ্যে একজন তাঁতি ২৫০ টাকা, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ৩৫০ টাকা, পাইপমিস্ত্রি ৩০০ টাকা, মুটে (কুলি) ২০০ টাকা, বাগানের মালি ২০০ টাকা মজুরি পেত।

২০১১-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিভিন্ন নির্মাণ শ্রমিকের গড়মজুরি যথাক্রমে মাসিক ৩০০ টাকা, জোগালি ২০০ টাকা, তাঁতি ২৫০ টাকা, রঙ মিস্ত্রি ৩০০ টাকা, বিদ্যুতের মিস্ত্রি ৩৫০ টাকা এবং প্লাম্বার মিস্ত্রি ৩০০ টাকা। প্রায় সব উপজেলায় একই হলেও মেট্রোপলিটন সিটি ও দিঘলিয়াতে রাজমিস্ত্রি ও জোগালির মজুরি ৫০ টাকা বেশি ছিল।

সারণি-১৫৪

নির্মাণ শ্রমিকের গড় মজুরি (২০১১)

(মূল্য টাকায়)

উপজেলার নাম	শ্রম					
	রাজমিস্ত্রি	জোগালি	তাঁতি	রং মিস্ত্রি	ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রি	পাইপ মিস্ত্রি
বটিয়াঘাটা	৩০০	২৫০	৩০০	২৫০	৩০০	৩০০
দাকোপ	৩০০	২০০	৩০০	২৫০	২৫০	৩০০
দিঘলিয়া	৩৫০	২৫০	৩০০	৩০০	৪২৫	৩৫০
ডুমুরিয়া	৩০০	২০০	২৫০	৩০০	৩০০	২৫০
সিটি করপোরেশন	৩৫০	২৫০	৩৫০	৩৫০	৩৮০	৩৫০
কয়রা	৩০০	২৩০	২৫০	২৫০	৩০০	২৫০
পাইকগাছা	৩০০	২০০	৩০০	৩০০	৩৫০	৪০০
ফুলতলা	৩০০	২০০	২০০	২০০	২৫০	৩০০
রূপসা	৩০০	২০০	৩০০	২৫০	৪০০	৪০০
গড়	**৩০০**	**২০০**	**২৫০**	**৩০০**	**৩৫০**	**৩০০**

Source : District Statistics, Khulna, 2011.p.102.

নির্মাণ এবং অকৃষি শ্রমিকের কাজ শহরেই বেশি। শহরের জীবন যাত্রার ব্যয় গ্রাম অপেক্ষা অনেক বেশি। উপরন্তু তাদের কাজ পাওয়াটাও বিভিন্ন মৌসুম ও উন্নয়ন কার্যক্রমের ওপর নির্ভরশীল। তাই অনিশ্চিত আয়ের পেশার সাথে থাকে তাদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

চাকরি খুলনা জেলা প্রশাসনিক কেন্দ্র হওয়ায় বর্ধিত হয় জীবন জীবিকার উৎস বিভিন্ন চাকরি ও পেশার আওতা বর্ধিত হয়। ২০১১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এখানে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক পেশার সাথে জড়িত ছিল কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন ২৪০ কৃষিকর্মী, ১২২ গবাদিপশুকর্মী, ৫২ মৎস্যকর্মী, ১০৮ পয়ঃবিষয়ককর্মী, ৮৩৯ পরিবার পরিকল্পনাকর্মী, ২৬ শস্য সংরক্ষণ কর্মী এবং ১,৬৪৮ জন প্রশিক্ষিত ধাত্রী। এখানে ৩৮৯টি সরকারি অফিস, ১৬৭টি ডাক অফিস, ৭৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, ৬২টি প্রাইভেট ব্যাংক শাখা, ২০১টি এনজিও অফিস, ৭টি ফায়ার ব্রিগেড স্টেশন, ৭০টি পুলিশ ফাঁড়ি ও স্টেশন, ৩৭টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে কর্মরত আছে এই জেলা ও অন্যান্য জেলা থেকে আগত খুলনায় চাকরিরত পেশাজীবী মানুষ। এখানে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ শাখায় ২০০২-০৩ সালের অর্থনৈতিক শুমারি অনুযায়ী কর্মরত ছিল ১,০৮৪ জন। ব্যাংক, বীমা ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ছিল ৬,৭৬৯ জন। আবাসন ও ভাড়া খাতে ছিল ১,৮৫০ জন, জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা বিভাগে ৮,৭৮৭ জন, নির্মাণে ২৮৭ জন এবং শিক্ষায় ছিল ১,৪৫৩ জন।

এখানে সরকারি, রেজিস্টার্ড ও প্রাইভেট মিলে মোট ১,১৪৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে এবং এতে শিক্ষক রয়েছেন ৪,১২৩ জন। ১৭৪টি কিন্ডার গার্টেন স্কুলে শিক্ষকতা করে ৯১১ জন শিক্ষক। সরকারি এবং বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলে ৫,০৯০ জন লোক শিক্ষকতা করেন। বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন ২,৫১৫ জন এবং বিভিন্ন মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন ২,৭৪১ জন।

সরকারি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, প্রাইভেট ক্লিনিক ও ডায়গনস্টিক সেন্টারগুলোতে ৫১৮ জন চিকিৎসক, ৮৪৭ জন সেবিকা, ৪০৭ জন টেকনিশিয়ান ও অন্যান্য ১,৫৫৫ জন কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছে। জেলার ১৫১টি কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্য সহকারীসহ অন্যান্য পদে কর্মরত রয়েছে ৮১৫ জন। উপজেলা ও সিটি করপোরেশনে চিকিৎসাসেবা দিচ্ছেন এমবিবিএস, এলএমএফ, আইয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মিলে ১,৩৫৬ জন। ২০০২-০৩ সালে স্বাস্থ্য ও জনসেবামূলক কাজে ছিল ৪,৮০৬ জন এবং ব্যক্তি, সমাজ ও সম্প্রদায়গত সেবার কাজে ছিল ১৪,৪৩৮ জন।

সারণি-১৫৫

গ্রাম ও শহরে নারী পুরুষের পেশাভিত্তিক কর্মসংখ্যা ও হার (১৯৭৪)

অঞ্চল	১০ ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক	কারিগরি ও অনুরূপ পেশাজীবী	প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা	কেরানি	বিক্রয় কর্মী	চাকরি	কৃষি	উৎপাদন ও পরিবহণ
সমগ্র জেলা	**৯,৭৮,৯৪৩**	**২১,০৬১**	**১,৬৯১**	**১৩,৬৮০**	**৬৮,৫৭৬**	**২৪,৮৩১**	**৬,৭৮,২২৫**	**১,৭০,৮৭১**
পুরুষ	৯,৪৮,০৪৩	২০,১২৬	১,৬৮১	১৩,৫৮৫	৬৭,৮৭১	১৭,৯১২	৬,৬২,৫০০	১,৬৪,৩৬৮
মহিলা	৩০,৯০০	৯৩৫	১০	৯৫	৭০৫	৬,৯১৯	১৫,৭২৫	৬,৫১১
শহর								
মোট পুরুষ ও মহিলা	১,৫৯,৪২৭	৬,৬০০	১,২৮৯	৮,০৩২	৩২,৮৫৩	১৪,৩৬৮	১৫,৪৬০	৮০,৮২৬
পুরুষ	১,৫২,২৩২	৬,০২৭	১,২৭৯	৭,৯৭৫	৩২,৫৬৪	৯,৩৬৮	১৫,২৫৯	৭৯,৭৬০
মহিলা	৭,১৯৫	৫৭৩	১০	৫৭	২৮৯	৪,৯৯৯	২০১	১,০৬৬
গ্রাম								
পুরুষ ও মহিলা	৮,১৯,৫১৬	১৪,৪৬১	৪০২	৫,৬৪৮	৩৫,৭২৩	১০,৪৬৪	৬,৬২,৭৬৫	৯০,০৫৩
পুরুষ	৭,৯৫,৮১১	১৪,০৯৯	৪০২	৫,৬১০	৩৫,৩০৭	৮,৫৪৪	৬,৪৭,২৪১	৮৪,৬০৮
মহিলা	২৩,৭০৫	৩৬২	..	৩৮	৪১৬	১,৯২০	১৫,৫২৪	৫,৪৪৫

সূত্র; আবদুশ শাকুর, বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার, বৃহত্তর খুলনা, ১৯৯৬.পৃ. ১৬৭।

সময়ের সাথে গ্রাম ও শহরের পেশার ধরনে নির্দিষ্ট পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। স্বাধীনতার পরে ১৯৭৪ সালে, শহর অপেক্ষা গ্রামে জনসংখ্যা বেশি ছিল। এখানে কৃষি, বিক্রয়, কারিগরি ও অনুরূপ এবং উৎপাদন ও পরিবহণ ক্ষেত্রে বেশি কর্মী ছিল। অপরপক্ষে শহর অঞ্চলে প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিভাগে বেশি কর্মসুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল।

সারণি-১৫৬

বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত মানুষের সংখ্যা ও হার (১৯৭৪)

আয়ের প্রধান উৎসসমূহ	সংখ্যা	শতকরা হার
মোট	৩,৭৪,৮৪৮	১০০.০০
কৃষিকাজ	৯১,২৩৪	২৪.৩৪
পশুপালন	৯১৩	০.৩৪
বন সংরক্ষণ	১,৭১৯	০.৪৬
মৎস্য শিকার	৬,০৩৯	১.৬১
মৎস্যচাষ	২,০০১	০.৫৩
কৃষি শ্রমিক	৪১,১২৮	১০.৯৭
অ-কৃষি শ্রমিক	২৬,৫৫৫	৭.০৮
তাঁত শিল্প	৮৮৮	০.২৪
শিল্প	৬,০৯৭	১.৬৩
ব্যাবসা	৬২,৬১৩	১৬.৭০
হকার	১,৪৬২	০.৩৯
যানবাহন (অ-যান্ত্রিক)	১২,৪২৩	৩.৩১
যানবাহন (যান্ত্রিক)	২,৭৩৯	০.৭৩

আয়ের প্রধান উৎসসমূহ	সংখ্যা	শতকরা হার
নির্মাণকাজ	৫,৬৪১	১.৫০
ধর্মীয় পেশা	৮৪৪	০.২৩
চাকরি	৭৪,৩৮৭	১৯.৮৪
খাজনা/ কর/ রেমিট্যান্স	১,০৯৩	০.২৯
সেবাকর্ম স্ব-নিয়োজিত	২,১৪৯	০.৫৭
অন্যান্য	৩৪,৯২৩	৯.৩২

Source: B.B.S. Bangladesh Population Census.1991,Zila Khulna. P.xiv.

বর্ণিত সারণিতে দেখা যায় যে, উল্লিখিত সময়ে কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট পেশায় নিয়োজিত লোক ছিল ৩৮.১৫% এবং অকৃষি পেশায় ৬১.৮৫%। অর্থাৎ চাকরি, ব্যাবসা ও মজুরের কাজে মানুষের আয়ের সংস্থান হয়েছে বেশি। কৃষিকাজে নিয়োজিত মানুষের সংখ্যা বেশি। এরপরের অবস্থানে রয়েছে চাকরি ও অন্যান্য অ-কৃষি পেশার মানুষ। বিশ শতকের শেষ দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে কৃষি পেশায় কর্মী হ্রাস পায় এবং অকৃষিতে বেড়ে যায়।

সারণি-১৫৭

খুলনা জেলাবাসীর পেশাভিত্তিক বিন্যাস (২০০১)[৫]

ক্র. নং	সিটি করপোরেশন/ উপজেলা	কৃষি	চাকরিজীবী	শিল্প	ব্যাবসা	মাছচাষ	অন্যান্য
০১	কয়রা	৩৪,০৫০	৩,৮০০	১,২১০	১১,৩০০	৭,৭২০	৪,০৮০
০২	তেরখাদা	২২,৬০০	৩৩০	৩৫০	২,২০২	২,০০০	৪,৯৫০
০৩	ডুমুরিয়া	৫০,০০০	১২,৮৫০	২,০০০	১২,২০০	৩,৮০০	১৬,৫০০
০৪	দাকোপ	৩০,১৩০	৩,০০০	১,০১৩	৯,৬৫৩	৪,৪৩৭	৫,২৬২
০৫	দিঘলিয়া	২৮,০১০	১,৪৪০	৬৭৭	৭,২২০	৪৫০	৮,৮৪০
০৬	পাইকগাছা	৪০,৩০০	২,৬৮০	১,৫৯০	১৫,৪২০	৪,৫০০	৬,৮৩৫
০৭	ফুলতলা	১৫,৮০৬	৪,৩০১	৬৩৯	৫,২৩৮	৬২০	২,৬২২
০৮	বটিয়াঘাটা	২১,৪০৯	১,২৯০	৪৪৯	৫,১৮৬	৩৮০	১০,০০৪
০৯	রূপসা	১৫,৫০১	১০,৫০০	১,৫৪২	১০,১০০	১৭,৩০০	৬,১০০
১০	সিটি করপোরেশন		১,৫৩,৫০০	৫০,২৫০	১২,০০০	-	২০,৯০০
সর্বমোট-		২,৫৭,৮০৬	১,৯৩,৬৯১	৫৯,৭২০	১,৯০,৫১৯	৪১,২০৭	৮৬,০৯৩

উপর্যুক্ত সারণি থেকে একুশ শতকের গোড়ার দিকে খুলনা জেলায় কৃষির পাশাপাশি অন্যান্য পেশার ওপর নির্ভরশীল প্রবণতার দিকটি লক্ষ করা যায়। প্রথমত যে দিকটি লক্ষ করা যায় তা হলো সিটি করপোরেশনের মধ্যে কোনো কৃষি ও মৎস্যজীবী ছিল না। এর কারণ হিসেবে ধরা যায় শহরের অধিবাসীর আবাসন সংখ্যা বৃদ্ধি; কৃষিকাজ ও মৎস্য চাষের জন্য বাড়তি জমি না থাকা। দ্বিতীয় বিষয় হলো এখানে চাকরি ও শিল্প সেক্টরে কর্মজীবীর সংখ্যা সর্বোচ্চ।

[৫] শিল্পায়নে খুলনা, বিসিক, খুলনা, ২০০৭. পৃ. ২২।

সমগ্র জেলার বিচারে জেলার কৃষি, চাকরি এবং ব্যাবসা ১ম, ২য় ও ৩য় অবস্থানে রয়েছে। এগুলোর পরে শিল্পের অবস্থান।

অতীত শুমারি ও পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কৃষি এই জেলার আয়ের প্রধান খাত। কৃষির সাথে আয়ের আনুষঙ্গিক মাধ্যম হিসেবে রয়েছে হাঁস মুরগি ও গবাদিপশু পালন। কৃষির পর্যায়ভুক্ত গবাদিপশু ও মাছচাষ এখন লাভজনক। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী মাছ এই জেলার অধিবাসীদের জীবিকার একটি বড়ো ও সম্প্রসারণশীল ক্ষেত্র। এর উন্নয়নের জন্য চাষিদের সরকারি পর্যায়ে উৎসাহ ও সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। খুলনা জেলায় অকৃষি আয়ের মধ্যে চাকরি এবং ব্যাবসার পরিসর অধিক বিস্তৃত। কিছু শিল্পপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার ফলে এখানে জীবিকার ক্ষেত্র সংকুচিত হয়। বিপর্যয়ের মুখে পড়ে অনেক পরিবার। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও ঠেলে দিয়েছে অনেক পরিবারকে অনিশ্চিত জীবিকার দিকে, তাদেরকে করেছে ছিন্নমূল। বিভিন্ন প্রকার ব্যাবসা এবং পরিবহণের কাজ এখানে এমন অনেক কর্মহীন মানুষের জীবিকার জোগান দিচ্ছে।

অধ্যায়-২৩

খেলাধুলা

খেলাধুলার আয়োজন, নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের জন্য ১৯১০ সালে শহরের কয়েকজন ক্রীড়ামোদী ও সংগঠক উৎসাহ নিয়ে আইএফের ক্রীড়াবিধির আলোকে 'খুলনা জেলা ক্রীড়া সংস্থা' গঠন করে খেলাধুলার আয়োজন ও পরিচালনার অগ্রযাত্রা শুরু করেন।

ফুটবল

আমাদের দেশে ফুটবল খেলা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। যতদূর জানা যায়, বিশ শতকের প্রথমদিকে প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা খুলনার তরুণদের উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে এ খেলার চর্চা শুরু হয়। পরবর্তীকালে খুলনা জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে নিয়মিত ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে খুলনার ফুটবল অনুশীলনের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। সে সময় খুলনায় ০৪টি দল কলকাতায় অনুষ্ঠিত আইএফএ শিল্ডের খেলায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করত। ১৯৩৪ সাল হতে খুলনা ইউনিয়ন স্পোর্টিং ক্লাব, ১৯৩৫ সাল হতে টাউন ক্লাব ও মোহামেডান ক্লাব এবং ১৯৪২ সাল হতে মুসলিম ক্লাব কলকাতা মাঠে আইএফএ শিল্ড প্রতিযোগিতায় বেশ কয়েকবার অংশগ্রহণ করে। এই দশকের অনেক খেলোয়াড় তখন কলকাতার মোহনবাগান-ইস্ট বেঙ্গল-মোহামেডান-এরিয়ান ও স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলের আহবানে নিয়মিত খেলোয়াড় হিসেবে অংশগ্রহণ করতেন। সে সময়ের উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড়বৃন্দ হলেন মো. সবুর খান, রমেশ, সুনীল গড়গড়ি, অনিল গড়গড়ি, অজিত গড়গড়ি, অমল ভৌমিক, দেবু ঘোষ, কাশি মিত্র, শংকর ঘোষ, সাত্তার প্রমুখ। ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর আইএফএ শিল্ডে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ভাটা পড়লেও স্থানীয় ফুটবল লীগ প্রচন্ডভাবে জমে উঠেছিল। এসময় খুলনার অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান আসে খেলোয়াড়দের চাকরি ও আর্থিক নিরাপত্তার আশ্বাস নিয়ে এবং শিল্প কারখানাভিত্তিক কিছু ফুটবল টিম গড়ে ওঠে। যেমন: প্লাটিনাম জুবিলী জুট মিল্‌স ক্লাব, খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিল্‌স ক্লাব, খুলনা শিপইয়ার্ড ক্লাব ইত্যাদি। এ সময় খুলনায় ১০/১২ টি দল অংশগ্রহণ করত।

খুলনায় ফুটবলের সাম্প্রতিক যুগ শুরু হয় স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সাল হতে। স্বাধীনতার পর আরও কয়েকটি শিল্প কারখানা/প্রতিষ্ঠান নিজস্ব টিম গঠন করে। তাদের মধ্যে সোনালি জুট মিল্‌স ক্লাব, দাদা ম্যাচ, খুলনা টেক্সটাইল মিল্‌স ক্লাব, ক্রিসেন্ট জুট মিল্‌স ক্লাব, মোংলা বন্দর টিম, বিদ্যুৎ ক্লাব, ব্যাংকার্স ক্লাব অন্যতম। তখন ১৬টি (১৯৭৪-১৯৭৫) দল অংশগ্রহণ করত। কিন্তু শিল্প কারখানাসমূহ বন্ধ হওয়ার কারণে ওই সকল টিমসমূহের কার্যক্রম আশির ও নব্বইয়ের দশকে বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৭৬-১৯৭৭ সালে খুলনা জেলা ফুটবল দল জাতীয় যুব ফুটবলে এবং ১৯৮২ ও ১৯৯২ সালে শেরে বাংলা কাপ জাতীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। জেলায় নিয়মিত ডিএসএ কাপ (২০০৭ সাল হতে ডিএফএ) ফুটবল টুর্নামেন্ট (১৯৮৬-৮৭ সাল হতে চলমান); প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ, দ্বিতীয় বিভাগ ফুটবল লীগ ও তৃতীয় বিভাগ ফুটবল লীগ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এবং ২০০৫-০৬ সাল হতে প্রিমিয়ার বিভাগ ফুটবল লীগ চালু রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০০৭ সাল হতে খুলনা জেলা ক্রীড়া সংস্থার পরিবর্তে খুলনা জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে প্রিমিয়ার বিভাগ ফুটবল লিগ, প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগ, দ্বিতীয় বিভাগ ফুটবল লিগ ও তৃতীয় বিভাগ ফুটবল লিগ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বর্তমানে প্রিমিয়ার বিভাগ ফুটবল লিগে ০৮টি দল, প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগে ০৮টি দল, দ্বিতীয় বিভাগ ফুটবল লিগে ১৬টি দল এবং তৃতীয় বিভাগ ফুটবল লিগে ১৬টি দল অংশগ্রহণ করছে। প্রিমিয়ার বিভাগে ২০১৪-২০১৫ সালে অংশগ্রহণকারী ০৮ টি দল হলো- ইয়ং বয়েজ ক্লাব, উইনার্স ক্লাব, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, মহেশ্বর পাশা ক্লাব, খুলনা আবাহনী ক্রীড়া চক্র, টাউন ক্লাব, ব্রাদার্স ইউনিয়ন এবং বলাকা স্পোর্টিং ক্লাব।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে খুলনার ফুটবলে যারা নিজ নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাদের মধ্যে সালাম মুর্শেদী, শেখ আসলাম, কাজী আনোয়ার ও জসীম (জসি), রূমী, ছোটো জাহাঙ্গীর, আকরাম, দস্তগীর হোসেন নীরা, বীরেন দাস প্রমুখ অন্যতম।

ক্রিকেট স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে খুলনার ক্রিকেট অঙ্গনে ছিল অবাঙ্গালিদের প্রাধান্য। এ সময়ে খুলনা ক্লাব, মার্চেন্ট ক্লাব, মুসলিম স্পোর্টিং ক্লাব, খুলনা হিরোজ এবং আরও দুই একটি ক্লাবের মধ্যে ছুটির দিনে সার্কিট হাউস মাঠে প্রীতি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো। বাংলাদেশের স্বাধীনতার কিছু আগে খুলনা ক্রিকেট লিগ শুরু হলেও স্বাধীনতার পর ক্রিকেট অঙ্গনে স্থবিরতা নেমে আসে। ধীরে ধীরে নতুন করে দলগুলো সংগঠিত হতে থাকে। খুলনা জেলা ক্রীড়া সংস্থার তত্ত্বাবধানে ক্রিকেট লিগসমূহ অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে ০৮টি দল, ১ম বিভাগ ক্রিকেট লিগে ০৮টি দল, ২য় বিভাগ ক্রিকেট লিগ ১৬টি দল এবং তৃতীয় বিভাগে ১৬টি দল অংশগ্রহণ করছেন। তাছাড়া কোয়ালিফাইয়িং পর্বেও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রিমিয়ার ডিভিশনের দলসমূহ হলো: পঞ্চবিথি ক্রীড়াচক্র, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, বয়রা তরুণ সংঘ, নিরালা ইউনাইট ক্লাব, খালিশপুর ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংসদ, কপিলমুনি ক্রীড়া ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, খুলনা আবাহনী ক্রীড়া চক্র এবং কাশীপুর ক্রিকেট একাডেমি।

জাতীয় ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ন লিগে খুলনা জেলা ক্রিকেট দল ২০০৮-২০০৯, ২০০৯-২০১০ সালে এবং ২০১১-২০১২ মৌসুমে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আয়োজিত আন্তঃজেলা ক্রিকেট

প্রতিযোগিতায় খুলনা জেলা ক্রিকেট দল অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে ১৯৯৬-৯৭ এবং ২০০৫-০৬ মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন এবং অনূর্ধ্ব-১৮ বিভাগে ২০১১-১২ মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। উল্লেখ্য যে, অনূর্ধ্ব-১৮ বিভাগের ক্রিকেট খেলা একবার মাত্র অনুষ্ঠিত হয়েছেন। বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলে খুলনার ০২ জন খেলোয়াড় রয়েছে। এরা হলেন- আব্দুর রাজ্জাক (রাজ) এবং জিয়াউর রহমান জনি। এছাড়াও জাতীয় অনূর্ধ্ব উনিশ দলে অধিনায়ক হিসেবে মেহেদী হাসান রূমি দায়িত্ব পালন করছেন। এরআগে খুলনার ০৪ জন খেলোয়াড় বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলে ছিলেন, এরা হলেন শেখ সালাহ উদ্দিন (মৃত), কাজী মাঞ্জারুল রানা (মৃত), মো. মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু এবং মো. সেলিম।

মহিলারাও ক্রিকেটে পিছিয়ে নেই। খুলনা জেলা মহিলা ক্রিকেট দল জাতীয় মহিলা ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ন লিগে ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২, ২০১২-২০১৩ মৌসুমে পর পর ৩ বার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। উল্লেখ্য যে, এ টুর্নামেন্ট ২০১০-২০১১ মৌসুম হতে শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দলে খুলনার ০৬ জন মহিলা ক্রিকেটার রয়েছেন। এরা হলেন- ১। সালমা খাতুন (অধিনায়ক), ২। জাহানারা আলম (সহ অধিনায়ক), ৩। রুমানা আহমেদ, ৪। শায়লা সারমিন, ৫। শুকতারা রহমান ও ৬। ফাহিমা খাতুন। এছাড়া আরও ০৩ জন খেলোয়াড় অতিরিক্ত তালিকাভুক্ত আছেন।

বর্তমান সময়ে ক্রিকেটের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কাজ করে থাকে। জেলা ক্রীড়া অফিস কর্তৃক বিভিন্ন উপজেলায় তৃণমূল পর্যায়ের অনূর্ধ্ব ১৬ বছর বয়সের ছেলে-মেয়েদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। জেলা ক্রীড়া সংস্থা বিভিন্ন বয়স গ্রুপে অনূর্ধ্ব ১৪, ১৬, ১৭, ১৯ এসব বয়সের ছেলেদের প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। তাছাড়াও স্কুলভিত্তিক ছেলেদের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিকেএসপি. কর্তৃক প্রত্যেক বছর ১ বার প্রতি জেলাতে ভালো ও ৬ প্রতিভাবান খেলোয়াড় বাছাই করে থাকে। বি.সি.বি. কর্তৃক ও বিভিন্ন জেলাতে ক্রিকেট খেলার আয়োজন করে থাকে। এখানে ভালো করলে জাতীয় দলে সুযোগ লাভ করে থাকেন।

ভলিবল

ভলিবলেও খুলনা জেলার ঐতিহ্য ও সাফল্য রয়েছে। পাকিস্তান আমলে জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে ফুটবলের পরেই ছিল ভলিবলের অবস্থান। খুলনার প্রতিটি ক্লাব, কলেজ ও স্কুল প্রাঙ্গণে ভলিবল খেলা হতো। মূলত শীতকালে এ খেলা অনুষ্ঠিত হতো। খুলনায় ভলিবল উন্নয়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে জেলা ক্রীড়া সংস্থা। এ সংস্থার তত্ত্বাবধানে প্রথম বিভাগ ভলিবল লিগ নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আন্তঃজেলা ভলিবল প্রতিযোগিতায় খুলনা জেলা ভলিবল ০৪ বার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন এবং একাধিকবার আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এছাড়া আন্তঃজেলা যুব ভলিবল প্রতিযোগিতায় খুলনা জেলা দল ০২ বার আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

খুলনা জেলা মহিলা ভলিবল দল জাতীয় মহিলা ভলিবল চ্যাম্পিয়নস লিগে ১৯৮০ সাল হতে পর পর ১০ বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। এ সাফল্যের পেছনে কৃতী ভলিবল খেলোয়াড় জনাব আয়েজ খান ও তাঁর স্ত্রী মিসেস হোসনে আরা খানের অবদান উল্লেখযোগ্য। তাদের প্রশিক্ষণ, উৎসাহ ও আর্থিক সহযোগিতা এ সফলতার পেছনে বিরাট অবদান রেখেছে।

কাবাডি, হ্যান্ডবল ও বাস্কেটবল খুলনা জেলা ক্রীড়া সংস্থার তত্ত্বাবধানে প্রথম বিভাগ কাবাডি লিগ, হ্যান্ডবল লিগ ও বাস্কেটবল লিগ নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রথম বিভাগ কাবাডি লিগ ৩৯টি দল, হ্যান্ডবল লিগ ৪৮টি দল ও বাস্কেটবল লিগ ১৯টি দল রয়েছে। খুলনা জেলা কাবাডি দল ও বাস্কেটবল দল আন্তঃজেলা কাবাডি প্রতিযোগিতায় একাধিকবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

অ্যাথলেটিকস অ্যাথলেটিকসে খুলনার ঐতিহ্য রয়েছে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার তত্ত্বাবধানে নিয়মিতভাবে দৌড়, হাই জাম্প, লং জাম্প, বর্শা নিক্ষেপ, চাকতি নিক্ষেপ, গোলক নিক্ষেপ ইত্যাদি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

বয়সভিত্তিক জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় খুলনা জেলা ২০১০-২০১১ মৌসুমে ১টি স্বর্ণ, ২টি রৌপ্য ও ২টি ব্রঞ্জ; জাতীয় জুনিয়র (অনূর্ধ্ব-২০) অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় ২০১০-২০১১ মৌসুমে ৬টি স্বর্ণ, ৩টি রৌপ্য ও ২টি ব্রোঞ্জ; জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা ২০১১-২০১২ মৌসুমে ১টি স্বর্ণ, ২টি রৌপ্য ও ৪টি ব্রোঞ্জ এবং জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা ২০১২-২০১৩ মৌসুমে ২টি স্বর্ণ, ৫টি রৌপ্য ও ৪টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেছে।

অন্যান্য খেলাধুলা খেলাধুলার অন্যান্য শাখা বিশেষত ব্যাডমিন্টন, টেবিল-টেনিস, দাবা, বাস্কেট বল, হ্যান্ডবল, কাবাডি ইত্যাদি খেলার নিয়মিত অনুশীলন ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। খুলনার শতাধিক ক্লাব এক্ষেত্রে নিয়মিত অবদান রেখে চলেছে। ক্লাবগুলোর অধিকাংশই খুলনা জেলা ক্রীড়া সংস্থার অধিভুক্ত। জেলা ক্রীড়া সংস্থার তত্ত্বাবধানে এসব খেলার প্রথম বিভাগ লিগ পর্যায়ে দলসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রামীণ ও ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা আবহমান বাংলার ঐতিহ্যবাহী দেশীয় খেলাধুলাসমূহ খুলনার গ্রামাঞ্চলে বেশ জনপ্রিয়। গ্রামাঞ্চলের সর্বত্রই হাডুডু, দাড়িয়াবান্দা, গোল্লাছুট, কানামাছি, বৌচি, কুস্তি প্রভৃতি খেলার প্রচলন রয়েছে যা আমাদের লোকজ সংস্কৃতির ঐতিহ্য। তা ছাড়া অঞ্চলভিত্তিক নৌকাবাইচ, ঘোড়দৌড়, লাঠিখেলা, ষাঁড়ের লড়াই ইত্যাদির প্রচলন রয়েছে।

ঢালী খেলা সুন্দরবন এলাকায় ঢালী খেলা বেশ জনপ্রিয় ছিল; এখন এটি বিলুপ্তির পথে। দুদলে বিভক্ত হয়ে এ খেলা হয়। সুন্দরবনের পার্শ্বে ঢালী উপাধিকারী হিন্দু-মুসলিম বসতি বিদ্যমান। যারা ঢাল সড়কি দ্বারা যুদ্ধ করতে পারদর্শী ছিল, তাদেরকে ঢালী আখ্যা দেওয়া হতো। ঢালীরা সুন্দরবনের নদীনালায় মগ, পর্তুগিজ, জলদস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে দেশ রক্ষা করত। সে সময় ঢালীরা

নৌকায় ঢাল, সড়কি, তলোয়ার ইত্যাদি নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করত। গ্রামাঞ্চলে ঢালসড়কি খেলাকে ঢালী খেলা বলে। ঢালীদের এখন আর সেই প্রতাপ নেই।

জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব

খুলনা জেলার ০৪ জন ক্রীড়াব্যক্তিত্ব ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার লাভ করেছেন। এরা হলেন ১) শেখ আসলাম (ফুটবল), ২) সালাম মুর্শেদী (ফুটবল), ৩) মিলজার হোসেন (অ্যাথলেটিকস) এবং ৪) হোসানে আরা খান (ক্রীড়া সংগঠক)।

খেলার মাঠ

খুলনায় খেলাধুলার মাঠের সংখ্যা অত্যন্ত কম। গ্রামাঞ্চলে মূলত স্কুল মাঠ ও ফাঁকা স্থানে গ্রামীণ খেলাধুলা অনুষ্ঠিত হয়। শহরাঞ্চলের খেলাধুলাসমূহ মূলত খুলনা জেলা স্টেডিয়াম, বিকেএসপি আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাঠ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠ, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট) মাঠ, পল্লিমঙ্গাল স্কুল মাঠ ও রেলওয়ে মাঠসহ অন্যান্য মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়াও খুলনা সার্কিট হাউস মাঠ ও খালিশপুর মাঠে খেলাধুলার প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

খুলনা জেলা স্টেডিয়াম

খুলনা সিটি করপোরেশন এলাকায় রয়েছে ঐতিহ্যবাহী খুলনা জেলা স্টেডিয়াম যা মুলত খুলনা জেলার খেলাধুলার কেন্দ্রবিন্দু। এ স্টেডিয়ামের আসনসংখ্যা প্রায় ১২,১৩৫। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে এটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে এবং পুনর্নির্মাণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

শহীদ আবু নাসের স্টেডিয়াম

খুলনার ২য় স্টেডিয়ামটি হলো শহিদ আবু নাসের স্টেডিয়াম যা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। যার আসন সংখ্যাপ্রায় ১১,৮০০ জন। ২০০৪ সালে এ মাঠে যুব বিশ্বকাপের ৬টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৬ সালে ১ম একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় (বাংলাদেশ বনাম কেনিয়া)। একই বছর প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় (বাংলাদেশ বনাম জিম্বাবুয়ে)। ২০০৯ সালে ত্রিদেশীয় মহিলা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা। ২০১২ সালে দেশের ৭ম টেস্ট ভেন্যু হিসেবে এটি স্বীকৃতি লাভ করে।

ব্যায়ামাগার

খুলনা জেলা স্টেডিয়াম ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার অফিসসংলগ্ন ক্রীড়া সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন একটি ব্যায়ামাগার রয়েছে। বর্তমানে সেখানে ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, বাস্কেটবল, শরীর গঠন প্রভৃতির খেলা এবং অনুশীলন করা হয়।

খুলনা বিকেএসপি

তৃণমূলপর্যায় থেকে খেলোয়াড় তুলে আনার লক্ষ্যে খুলনা শহর হতে প্রায় ২০ কিলোমিটার পশ্চিমে খুলনা-ফুলতলা বাইপাস সড়কের পার্শ্বে ২০০৪ সালে বিকেএসপির ভব১ন নির্মাণ শুরু হয় এবং ২০০৮ সালে শেষ হয়। মোট ১৩ একর জমির ওপর স্থাপিত এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রয়েছে ৪ তলাবিশিষ্ট একটি প্রশাসনিক ভবন, ৫২ কক্ষবিশিষ্ট (চার তলা) ট্রেনিং হোস্টেল ও একটি জিমনেশিয়াম। অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি সম্প্রতি সেখানে ফুটবল ও ক্রিকেট মাঠ তৈরি করা হয়েছে।

মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স, সোনাডাঙ্গা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীনে আধুনিকসুবিধা সংবলিত 'মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স' নির্মাণের কাজ চলমান আছে। এতে আবাসিক সুবিধাসহ থাকবে জিমনেশিয়াম, সুইমিং পুল-তা ছাড়া ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, হ্যান্ডবল, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, ভলিবল ইত্যাদি খেলার মাঠসহ প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা থাকবে।

খুলনার ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়া সংগঠনসমূহ ১৯১০ সালে খুলনা শহরের কয়েকজন ক্রীড়ামোদী ও সংগঠক মিলে আইএফ-এর ক্রীড়াবিধির আলোকে খুলনা জেলা ক্রীড়া সংস্থা গঠন করেন। ক্রীড়া সংস্থার বিধানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদাধিকার বলে সভাপতি এবং ক্রীড়া সংগঠনের প্রতিনিধি দ্বারা সহ-সভাপতি, সম্পাদকসহ অন্যান্য পদ ও সদস্য নির্বাচিত হন। সরকারি অনুদান এবং বিভিন্ন সংস্থা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের স্পন্সরই প্রতিষ্ঠানটির প্রধান আর্থিক উৎস। জেলা ক্রীড়া সংস্থা গঠনকালের সংগঠকদের বা খেলোয়াড় দলগুলোর কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। এই শতকের পঞ্চাশ দশকে স্টেডিয়াম ও জেলা ক্রীড়া ভবন নির্মাণের আগে সংস্থার নিজস্ব কার্যালয় ছিল না। গঠনকাল থেকে যে যখন সংস্থার সম্পাদক হতেন তারই বাড়িতে কার্যালয়ের কাজ চলত বলে সঠিকভাবে কোনো কাগজপত্রাদি রক্ষিত হয়নি। বর্তমান সংস্থার মতে, গঠনকালীন কোনো রেকর্ডপত্র ক্রীড়া সংস্থা উত্তরাধিকার সূত্রে পানি। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, বাবু সতীসচন্দ্র নাগ, জনাব সামছুর রহমান (ভাইস চেয়াম্যান, পৌরসভা ও রেকর্ড বোর্ড), সুবীর দাসগুপ্ত, বিমল সেন, ব্রহ্মপদ সাহা, প্রতুল দাসগুপ্ত প্রমুখ বিভিন্ন সময়ে সংস্থার কর্মকর্তা ছিলেন। খুলনা জেলা ক্রীড়া সংস্থার এবং স্টেডিয়ামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন জনাব এম, এইচ চৌধুরী, (ইএসকিউ, সিএসপি) ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, খুলনা, তারিখ ১২/০৯/১৯৫৮ এবং স্টেডিয়ামটি উদ্বোধন করেন মেজর জেনারেল এন ওমরাও খান, মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, সাবেক পূর্বপাকিস্তান, তারিখ ০৩/০৬/১৯৫৯। বর্তমানে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জেলা প্রশাসক, খুলনা এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন জনাব কাজী শামীম আহসান (১৮/০২/২০০৮ সাল থেকে)।

খুলনা জেলা ক্রীড়া সংস্থার তত্ত্বাবধানে যে সকল খেলা/প্রতিযোগিতাসমূহ পরিচালিত হচ্ছে সেগুলো হলো: ১। ডিএসএ, কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, ২। প্রিমিয়ার/প্রথম বিভাগ/দ্বিতীয় বিভাগ/তৃতীয় বিভাগ ক্রিকেট লিগ, ৩। কোয়ালিফাইয়িং ক্রিকেট, ৪। অনূর্ধ্ব -১৩ ক্রিকেট লিগ, ৫। স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, ৬। প্রথম বিভাগ/কোয়ালিফাইয়িং কাবাডি লিগ, ৭। প্রথম বিভাগ হ্যান্ডবল লিগ, ৮। প্রথম বিভাগ ভলিবল লিগ, ৯। প্রথম বিভাগ বাস্কেটবল লিগ, ১০। প্রথম বিভাগ টেবিল টেনিস লিগ, ১২। প্রথম বিভাগ দাবা লিগ, ১৩। প্রথম বিভাগ ব্যাডমিন্টন লিগ এবং ১৪। অ্যাথলেটিকস। মাঝে মাঝে জুডো ও কারাতে প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য, ২০০৭ সাল হতে ফুটবল লিগ ও প্রতিযোগিতাসমূহ জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থা সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছে। ২০০৭ সালের আগে জেলা ক্রীড়া সংস্থার তত্ত্বাবধানে এসব ফুটবল লীগ/প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো।

ইউনিয়ন স্পোর্টিং ক্লাব

এটি খুলনার ১ম ক্লাব। জেলা ক্রীড়া সংস্থা গঠিত হবার দুবছর পর ১৯১২ সালে বাবু প্রমদা দাসগুপ্ত, জনাব শামছুর রহমান, শৈলেন বোস, বিনয় বোস প্রমুখ মিলে এ ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাকালের বা নিকটবর্তী সময়ের যে দু-চারজন খেলোয়াড়ের নাম জানা যায়, তারা হলেন নিহার বোস, খগেন ঘোষ, মন্মথ চ্যাটার্জি ও পাগলা গাঙ্গুলী প্রমুখ। এদের পরে যোগ দেন রবীন ঘোষ, অজিত গড়গড়ি, সুনীল গড়গড়ি, রমেশ মুখার্জি, রমেন রায়চৌধুরী, বড়ো নাগ, আ. গণি (কলকাতার পুলিশ কমিশনার), তদীয় ভ্রাতা আ. হামিদ (S.D.E, P.W.D.) বিশের দশকের মাঝামাঝি ইউনিয়ন স্পোর্টিং ক্লাব আইএফএ শিল্ডে কয়েক বছর অংশগ্রহণ করে এবং ক্লাবের অনেক খেলোয়াড় কলকাতায় বিভিন্ন দলে খেলে সুনাম অর্জন করে।

খুলনা টাউন ক্লাব

খুলনার ক্রীড়াঙ্গনে এক উজ্জ্বল নাম খুলনা টাউন ক্লাব। ১৯১৪ সালে কয়েকজন ক্রীড়ামোদী বিশেষ করে বাবু সতীশ নাগ, সুবীর দত্ত গুপ্ত, বিনোদ মুখার্জির উদ্যোগে এ ক্লাব গঠিত হয়। জানা যায়, টাউন ক্লাব প্রথম থেকেই সুগঠিত টিম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। দলের বিভিন্ন সময়ের খেলোয়াড়দের মধ্যে জটা মুখার্জি, ফেলা চ্যাটার্জি, জ্ঞান ভৌমিক, বলাই চ্যাটার্জি (বলরাম), হারু সেন, অমল ভৌমিক, স্যাম চ্যাটার্জি, নিহার রায়, শম্ভু মিত্র, জঙ্গল, সন্টু ও ফজলে হক প্রমুখ সুনাম অর্জন করেন। টাউন ক্লাবও নিয়মিত আইএফএ শিল্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত এবং টিমের অনেক খেলোয়াড় কলকাতায় বিভিন্ন টিমে খেলে সুনাম অর্জন করেছিল। মূলত ফুটবলকে প্রাধান্য দিয়ে গড়ে ওঠা ক্লাবটি এখন ক্রিকেট ও ভলিবল দলও গঠন করেছে। এ ক্লাব খুলনাঞ্চল হতে অনেক নামিদামি ফুটবলার তৈরি করেছে।

মোহামেডান ক্লাব

জনাব শামছুর রহমান (উকিল), মুন্সি খয়রাতুল্লাহ (কাব্য তরঙ্গমালা রচয়িতা), কাজী সাইফুদ্দিন (উকিল) ও জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মিলে ১৯১২ সালে 'খুলনা মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' নামে সাহিত্য-সংস্কৃতি ও মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বমূলক একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন ১৯১৭/১৮ সালের দিকে মোহামেডান ক্লাব নামে একটি ফুটবল টিম গঠন করে। মতান্তরে ইউনিয়ন স্পোর্টিং ক্লাবের খেলোয়াড় জনাব আ. গণি, আ. হামিদ ও ডা. আলী মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় মুসলিম খেলোয়াড়দের নিয়ে ১৯২৫-১৯২৬ সালের দিকে মোহামেডান ক্লাব গঠন করেন। ক্লাবে টুটপাড়া-শেখপাড়া-গোবরচাকা-বয়রা ও নদীর ওপারের দেওয়াড়া-শোলপুরের খেলোয়াড় নিয়ে টিম গঠিত হয়েছিল। মোহামেডান ক্লাব কয়েকবার আইএফএ খেলায় অংশগ্রহণ করে।

অ্যাথলেটিক ক্লাব বিশের দশকের শেষের দিকে টাউন ক্লাব হতে মতবিরোধের কারণে করে কয়েকজন খেলোয়াড় ডা. দ্বিজেন সেন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পূর্ণ চন্দ্র সেন ও শৈলেন দে প্রমুখের সহায়তায় অ্যাথলেটিক ক্লাব গঠন করেন। কিন্তু কয়েক বছর পর অ্যাথলেটিক ক্লাব বন্ধ হয়ে যায়।

মুসলিম স্পোর্টিং ক্লাব ১৯৩৮ সালে মোহামেডান ক্লাব খেলায় অংশগ্রহণ করা হতে বিরত থাকলে হাজী বোরহান উদ্দিন, কাকা রহিম বক্স, মইনুদ্দিন আহমেদ (সার্কেল অফিসার, সদর) ও চান মিয়ার উদ্যোগে এবং মোহামেডান ক্লাবের অধিকাংশ সদস্যের সমন্বয়ে খুলনা মুসলিম স্পোর্টিং ক্লাব গঠিত হয়। জানা যায়, ক্লাবের উদ্যোগীগণ পূর্বনামে ক্লাব উজ্জীবিত করে খেলায় অংশগ্রহণ করতে চাইলে জেলা ক্রীড়া সংস্থা মোহামেডান ক্লাবের কাছে বকেয়া পাওনা পরিশোধ অথবা নতুন নামে তালিকাভুক্তির উপদেশ দেন। তখন ক্লাব নতুন নামকরণ শ্রেয় মনে করে মুসলিম স্পোর্টিং ক্লাব নামে তালিকাভুক্ত করে। ১৯৪৪ সালে মুসলিম স্পোর্টিং ক্লাব আইএফএ শিল্ডে খেলায় অংশগ্রহণ করে। মুসলিম স্পোর্টিং ক্লাবের অনুপ্রেরণায় সহযোগী দল হিসেবে ১৯৪৭ সালে খুলনা 'মুসলিম হিরোজ' আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৪৬ সালে খুলনা হিরোজ স্বতন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলে ওই বছরই ইয়ং মুসলিম ক্লাব নামে অপর একটি সহযোগী টীম (বি-টিম) গঠিত হয়।

আবাহনী ক্রীড়াচক্র ১৯৭৪ সালে খুলনায় প্রতিষ্ঠিত হয় কিকার্স ক্লাব। এরপর তাৎকালীন সংসদ সদস্য ইলিয়াস আহমেদ, এসএম মোস্তফা রশিদী সুজাসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্বের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর পুত্র শেখ কামালের বিশেষ সহায়তায় ১৯৭৫ সালের ২০ জানুয়ারি খুলনা আবাহনী ক্রীড়াচক্র প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে খুলনা আবাহনী ক্রীড়াচক্র বিশেষত ফুটবল, ক্রিকেট, হ্যান্ডবল, ভলিবল, কাবাডি, বাস্কেটবল, দাবা, প্রভৃতি খেলায় বিশেষ অবদান রাখছে এবং সাফল্য পেয়ে আসছে। প্রতিষ্ঠার পর হতে এ দলটি জেলা ফুটবল লিগে ১৩ বার, প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগে ৩ বার এবং বাস্কেটবল লিগে ১৫ বার চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে।

উল্লেখযোগ্য ক্রীড়া সংগঠক যে সকল ব্যক্তি তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা খুলনার ক্রীড়াঙ্গনে বিশেষ অবদান রেখেছেন অথবা রেখে চলেছেন এরা হলেন:

১) অধ্যাপক কে এম হাসান (বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ও প্রথম সাধারণ সম্পাদক, খুলনা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা); ২) অধ্যাপক আব্দুর রহমান (বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক, জেলা/বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা); ৩) জনাব আয়েস খান (বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ও ভলিবল খেলোয়াড়); ৪) বেগম হোসনে আরা খান (বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ও ভলিবল খেলোয়াড়); ৫) বেগম ফেরদৌসী আলী (বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ও সাধারণ সম্পাদক, বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা); ৬) জনাব খান জহুরুল হক (বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ও অ্যাথলেট এবং দিঘলিয়া উপজেলাধীন ওয়াইএমএ ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা); ৭) জনাব

ইলিয়াস আহমেদ চৌধুরী (বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ও খুলনা আবাহনী ক্রীড়া চক্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা); ৮) জনাব এসএম মোস্তফা রশীদী সুজা (বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ও খুলনা আবাহনী ক্রীড়া চক্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা); ৯) জনাব হাসান রুমী (বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ও খেলোয়াড় এবং সাবেক সাধারণ সম্পাদক, জেলা ক্রীড়া সংস্থা); ১০) জনাব আব্দুস সাত্তার (বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ও খেলোয়াড়); ১১) অধ্যাপক মো. মনিরুজ্জামান ডন (বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ও খুলনা ব্রাদার্স ইউনিয়নের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা); ১২) জনাব শাহ আবুল কালাম (বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক, সাবেক মুসলিম স্পোর্টিং ক্লাব); ১৩) জনাব মহিউদ্দিন গোরা (বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ও খুলনা বয়েজ ক্লাব এর প্রতিষ্ঠাতা); ১৪) জনাব আজমল আহমেদ তপন (বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ও সভাপতি, ডিএফএ এবং সাবেক সাধারণ সম্পাদক, জেলা ক্রীড়া সংস্থা); ১৫) জনাব এস এম মূর্তজা রশীদি দারা (বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ও সাধারণ সম্পাদক, খুলনা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা); ১৬) জনাব কাজী শামীম আহসান (বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ও সাধারণ সম্পাদক, খুলনা জেলা ক্রীড়া সংস্থা) এবং আরও অনেকে।

অধ্যায়-২৪

গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা

খুলনা থেকে সংবাদপত্র প্রকাশের ইতিহাস প্রায় দেড়শ বছরের। *সমাজ দর্পণ'এর* হাত ধরে কালের পরিক্রমায় এতদাঞ্চলে নানা ঘাত-প্রতিঘাত, চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে সংবাদপত্র এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ে সক্রিয় থেকেছে।

১৯০৯ সালে *খুলনা* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদকের নাম জানা যায়নি। অনেকে মনে করেন খুলনার প্রথম ছাপাখানা *কমলা প্রেস* থেকে পত্রিকাটি ছাপা হতো। পত্রিকার ম্যানেজার ছিলেন অবনীমোহন চক্রবর্তী। তিনি 'নাংলা' ষড়যন্ত্র মামলার আসামি হয়ে বিচারে ৭ বছর কারাভোগ করেন। 'নাংলা' সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলায় অবস্থিত। ১৯০৯ সালের ১৬ আগস্ট নাংলা বাজারে মথুর পোদ্দারের বাড়িতে স্বদেশি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে একটি রাজনৈতিক ডাকাতি সংঘটিত হয়। পুলিশ প্রথমে এটা বুঝতে পারেনি। পরে অবশ্য পুলিশ তা বুঝতে সক্ষম হয়। অজিত কুমার নাগ (১৯২১-) বলেছেন, 'চতুর্দিকে তল্লাশি করে পুলিশ প্রথমে গ্রেফতার করে খুলনা পত্রিকার ম্যানেজার অবনীমোহন চক্রবর্তীকে'। *'খুলনা'* পত্রিকাটি বেশিদিন টেকেনি।

খুলনা থেকে ১৯০৯ সালে *খুলনাবাসী* পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সুনীল কুমার গুহ বলেছেন, খুলনা জেলার প্রথম এম.এ. ডিগ্রিপ্রাপ্ত বাগেরহাটের বাসাবাটী গ্রামের জমিদারতনয়, মহিলাকবি মানকুমারী বসুর জামাতা খুলনার উকিল বাবু চারুচন্দ্র নাগ কর্তৃক *খুলনাবাসী পত্রিকা প্রকাশিত হয়।*

আবার সতীশচন্দ্র মিত্র (১৮৭২-১৯৩১) বলেছেন, 'বর্তমান সময়ে যশোর হইতে *যশোর* পত্রিকা, খুলনা হইতে *খুলনাবাসী,* বাগেরহাট হইতে *জাগরণ* নামক কয়েকটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে।' এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় *খুলনাবাসী* সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হতো। আবুল কালাম শামসুদ্দিন (১৯৩৪-১৯৯১) বলেন *খুলনার'* প্রকাশক ও সম্পাদক গোপালচন্দ্র মুখার্জিকে বিপ্লবী আদর্শমূলক প্রকাশের জন্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হ্যামিল্টনের নির্দেশে খুলনা পুলিশ সুপার মি. শ্যালে (W.A.P. Salay) ২৮ জানুয়ারি, ১৯১০ সালে গ্রেফতার করেন ও *খুলনাবাসী* প্রেস (কমলা প্রেস) বাজেয়াপ্ত করেন। ১৯৩০ সালের ২৯ মে *খুলনাবাসী* পুনঃপ্রকাশিত হয়। তখন সম্পাদক ছিলেন মৃণাল ভূষণ ঘোষ এবং প্রকাশক ছিলেন নেপালচন্দ্র বসু। মতান্তরে যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন দৌলতপুরের সাহিত্যিক ডা. আবুল কাশেম (১৯২০-১৯৮৮) ও ভবতোষ স্মৃতিরত্ন। *খুলনাবাসী* পত্রিকার একটি প্রতিবেদনের অংশ বিশেষ হলো: 'খুলনায় বাঙ্গালার গভর্নর লর্ড হার্বার্ট ও খুলনা বালিকা বিদ্যালয়ে গভর্নর পত্নী লেডি মেরী হার্বার্ট এর আগমন ও পরিদর্শনের সময় গভর্নর পত্নী লেডি হার্বার্ট ছাত্রীগণের দাবি পূরণে আশ্বাস প্রদান করেন।'

১৯০৯ সালে খুলনা শহর থেকে *হুঙ্কার* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্পাদকের নাম জানা যায়নি। তবে, এই পত্রিকার মুদ্রাকর ছিলেন কালীচরণ বসু। এটি ছিল রাজনৈতিক পত্রিকা।

তিরিশের দশকে খুলনার একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে *মুক্তিদূত* প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ও সম্পাদক ছিলেন মনোরঞ্জন দত্ত।

তিরিশের দশকের শেষভাগে খুলনা থেকে *অভিযাত্রী* প্রকাশিত হতো। সম্পাদক ছিলেন অজিত কুমার চক্রবর্তী। প্রকাশক ছিলেন শরৎ কুমার হালদার।

১৯৪০ সালে খুলনা শহর থেকে *সপ্তর্ষী* প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন ধনঞ্জয় দাস।

১৯৪০ সালের ১৯ অক্টোবর ইংরেজি *ইস্ট ইন্ডিয়া* নামে একটি মেডিকেল জার্নাল প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন ডা. এনএল, সেন গুপ্ত।

১৯৫৩ সালে খুলনা থেকে *জনমত* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন শামসুর রহমান।

খুলনা থেকে *উইকলি ওয়েভ* ১৯৬৩ সালে ২০ জুন প্রকাশিত হয়।

১৯৬৯ সালের ২০ অক্টোবর খুলনা থেকে *অ্যালার্ম* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক কাজী ফারুক আহমেদ।

দৈনিক পত্রিকা

১৯৬৯ সালে খুলনা থেকে ইংরেজি *দি ডেইলি পিপলস অবজারভার* প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন লুৎফর রহমান জাহাঙ্গীর। তবে পত্রিকাটি বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি।

১৯৭১ সালে খুলনা থেকে *দি ডেইলি নিউজ* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন মঈন পায়ামী। পত্রিকাটিতে পাকিস্তানি শাসকদের পক্ষে সংবাদ ও নিবন্ধ লেখা হতো।

দৈনিক জনবার্তা ১৯৭৪ সালের ২০ মার্চ খুলনার পূর্বাণী মুদ্রণালয়, ৫, বাবুখান রোড থেকে ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়। *জনবার্তা* খুলনার প্রথম বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র। সম্পাদক ও প্রকাশক সৈয়দ সোহরাব আলী। বর্তমানে পত্রিকাটি বন্ধ আছে।

দৈনিক পূর্বাঞ্চল ১৯৭৪ সালে ৩৮, ইকবাল নগর মসজিদ লেন, খুলনা থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক লিয়াকত আলী। সাইজ: ৫৮ সে.মি. x ৪২ সে.মি.। প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল এক টাকা। পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা মরহুম আইনুল হক। ১৯৭৫ সালে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ ছিল। ১৯৭৬ সালে আবার *দৈনিক পূর্বাঞ্চল* প্রকাশিত হয়। সেই থেকে শুরু করে *দৈনিক পূর্বাঞ্চল* নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের মধ্যে সর্বাধিক প্রচারিত পত্রিকা *দৈনিক পূর্বাঞ্চল*। ৮০-এর দশকে পত্রিকাটি অফসেট মেশিনে ছাপা শুরু হয়।

তারপর কম্পিউটার ও আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে *দৈনিক পূর্বাঞ্চল* ছাপা হয়ে প্রকাশিত হতে থাকে। কয়েক বছর আগে মাঝে মাঝে রঙিন দৈনিক *পূর্বাঞ্চল* ছাপা হলেও ২০০২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে রঙিন *দৈনিক পূর্বাঞ্চল* নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমান প্রতি সংখ্যার মূল্য তিন টাকা। পত্রিকাটি পদ্মার এপারের শহর বন্দর থেকে শুরু করে সুদূর গ্রামের মানুষ খুব ভোরে পাঠ করার সুযোগ পাচ্ছে।

দৈনিক কালান্তর ১৯৭৪ সালে খুলনা থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ও প্রকাশক নূর মোহাম্মদ টেনা। ১৯৭৫ সালে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৯২ সালে পত্রিকাটি আবার প্রকাশিত হয়। এটি সম্পাদক নূর মোহাম্মদ টেনা কর্তৃক জনতা ছাপাখানা ৪৫, শেখপাড়া হতে মুদ্রিত।

১৯৭৭ সালে খুলনা থেকে *দৈনিক প্রবাহ* প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ও প্রকাশক আশরাফ-উল হক। পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক রূপসা প্রিন্টার্স হতে মুদ্রিত, ২নং রায়পাড়া ক্রস রোড খুলনা থেকে প্রকাশিত। বর্তমানে রূপসা প্রিন্টার্স ৩, কেডিএ এভিনিউ খুলনা থেকে মুদ্রিত হচ্ছে। প্রধান কার্যালয় ৩, কেডিএ, এভিনিউ খুলনা। ১৯৯২ থেকে *দৈনিক প্রবাহ* অফসেট ও কম্পিউটার মুদ্রণে ছাপা হচ্ছে।

১৯৭৮ সালে খুলনা থেকে *দৈনিক গণদেশ* প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ও সম্পাদক ছিলেন আহমদ আলী খান। প্রকাশিত হতো ৩১, ইকবালনগর মসজিদ লেন, খুলনা থেকে। পরবর্তী সময়ে সাগর প্রিন্টার্স ৫৫, খানজাহান আলী রোড, খুলনা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতো। পরে আহমদ আলী খান বিদেশে অবস্থানকালে প্রকাশকের দায়িত্ব পালন করেন আলেয়া আহমদ খান এবং সম্পাদক হন শেখ হারুনুর রশীদ।

১৯৭৮ সালে খুলনা থেকে *দি ডেইলি ট্রিবিউন* প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ফেরদৌসী আলী। প্রকাশক লিয়াকত আলী। মুদ্রাকর: লিয়াকত আলী, সনি প্রিন্টার্স, ৩৮, ইকবাল নগর মসজিদ লেন, খুলনা। ১৯৮৫ সালে *'দি ডেইলি ট্রিবিউন'* অফসেট মুদ্রণে ছাপা শুরু হয়। কয়েক বছর পরে পত্রিকাটি কম্পিউটার মুদ্রণ প্রকাশনা শুরু হয়। পত্রিকটি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। খুলনা, রাজশাহী ও বরিশাল বিভাগের মধ্যে বর্তমানে *'দি ডেইলি ট্রিবিউন'* একমাত্র নিয়মিত প্রকাশিত ইংরেজি পত্রিকা।

দৈনিক অনির্বাণ খুলনা থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালের ১৭ জুন। সম্পাদক ও প্রকাশক অধ্যাপক আলী আহমেদ। প্রকাশিত হয় ৪, মির্জাপুর রোড, খুলনা থেকে। পৃষ্ঠা-৪। নববই এর দশকে পত্রিকাটি কম্পিউটার ও আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ছাপা শুরু হয়।

১৯৮১ সালে খুলনা থেকে *ডেইলি মুসলিম ওয়ার্ল্ড* প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন সৈয়দ এ. কে. কবীর। প্রকাশিত হতো টুটপাড়া সেন্ট্রাল রোড,

খুলনা থেকে। ছাপা হতো প্রগতি প্রেস খুলনা থেকে। অফিস ছিল আপার খানজাহান আলী রোড, খুলনা। অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতো।

দৈনিক বিশ্বডাক ১৯৮২ সালে খুলনা থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন সৈয়দ এ. কে. কবীর। টুটপাড়া সেন্ট্রাল রোড খুলনা থেকে প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল এক টাকা। এটি ছাপা হতো বিশ্বডাক প্রেস থেকে।

১৯৮২ সালের ১৫ এপ্রিল *দৈনিক জন্মভূমি* প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন হুমায়ুন কবির বালু। দৈনিক জন্মভূমির প্রতিষ্ঠাতা আকতার জাহান রুমা। সম্পাদক কর্তৃক মধুমতি মুদ্রণালয়, ২০ খানজাহান আলী রোড থেকে মুদ্রিত, ১৫ ইকবাল নগর মসজিদ লেন থেকে প্রকাশিত হতো। ১৯৯৩ সাল থেকে *দৈনিক জন্মভূমি* কম্পিউটার ও আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ছাপা হতে শুরু করে। এখন জন্মভূমি প্রকাশনী লি. ১১০/১, ইসলামপুর রোড খুলনা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হচ্ছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের শহর, বন্দর ও গ্রামের মানুষ *দৈনিক জন্মভূমির* পাঠক। বর্তমানে দৈনিক *জন্মভূমি'র উপদেষ্টা* সম্পাদক সাধন ঘোষ, প্রধান সম্পাদক মনিরুল হুদা ও সম্পাদক ওয়াদুদুর রহমান পান্না দায়িত্ব পালন করছেন। প্রকাশক আসিফ কবীর।

দৈনিক বঙ্গবাণী খুলনা থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ সালের ১ জানুয়ারি। সম্পাদক ও প্রকাশক লুৎফুন নাহার মকবুল। প্রতিষ্ঠাতা আশরাফ উদ্দিন মকবুল। প্রকাশিত হয় ১১, পুলিশ লাইন, পূর্ব লেন, খুলনা থেকে। ১৯৮৬ সালের এপ্রিল থেকে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন শেখ আবু হাসান। প্রকাশক লুৎফুন নাহার মকবুল। প্যানোরমা প্রেস, ১৫, খানজাহান আলী রোড, খুলনা থেকে প্রকাশিত ও মুদ্রিত। বর্তমানে সম্পাদক ও প্রকাশক মোস্তাক আহমেদ মোবারকী। বতর্মান কার্যালয়- ১৪, আহসান আহমেদ রোড, খুলনা।

১৯৮৪ সালের ১ আগস্ট *'দি ডেইলী মেইল'* (ইংরেজি) প্রকাশিত হয়। সম্পাদক লুৎফুন নাহার মকবুল। প্রকাশিত হয় ১১, পুলিশ লাইন, পূর্ব লেন, খুলনা থেকে। ছাপা হতো আহসান আহমেদ রোডস্থ ঢাকা প্রেস, খুলনা থেকে। প্রতিষ্ঠাতা আশরাফ উদ্দিন মকবুল। পত্রিকাটি বেশিদিন চলেনি।

১৯৯২ সালের ৩ এপ্রিল *দৈনিক তথ্য* এসএম, নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় নাবিলা পাবলিশার্স বিকে রায় রোড, খুলনা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ১৯৯২ সালে *দৈনিক তথ্য* কম্পিউটার ও আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ছাপা শুরু হয়।

দৈনিক সদ্যখবর ১৯৯২ সালে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন বেগম আশরাফুন নেছা। মুকুল প্রিন্টিং প্রেস খুলনা থেকে মুদ্রিত।

১৯৯২ সালে *দৈনিক বিশ্ববার্তা* প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ও প্রকাশক মোহাম্মদ নূরুজ্জামান। ৯, খানজাহান আলী রোড, খুলনা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতো। পত্রিকাটি বেশি দিন চলেনি।

খুলনা জেলার দিঘলিয়া উপজেলা সেনহাটি থেকে *দিঘলিয়া বার্তা* প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালে। সম্পাদক ছিলেন আলতাফ হোসেন। সুবর্ণ ছাপাখানা খুলনা থেকে মুদ্রিত হতো। সাইজ : ট্যাবলয়েড। পত্রিকাটি দুটি সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার খুলনা সংস্করণ ১৯৯২ সালে খুলনা থেকে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে খুলনা সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে না। সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর মোহাম্মদ আতিকুল্লাহ খান মাসুদ। আঞ্চলিক মুদ্রণ ও প্রকাশনা কার্যালয়: জনকণ্ঠ ভবন, ৪৮, কেডিএ এভিনিউ, খুলনা।

দৈনিক হিজবুল্লাহ ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক মো. জাকির হোসেন। মাহমুদা খাতুন কর্তৃক ঢাকা প্রেস থেকে মুদ্রিত এবং ১৭ কেডিএ এভিনিউ খুলনা থেকে প্রকাশিত হতো।

দৈনিক পাঠকের কাগজ ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক এসএম, মোস্তফা রশিদী সুজা কর্তৃক ৫০, ইস্ট লিংক রোড, টুটপাড়া, খুলনা থেকে প্রকাশিত হতো। উত্তরণ প্রেস, ৫৭, ইসলামপুর রোড, খুলনা থেকে মুদ্রিত হতো। ১৯৯৩ সালে পত্রিকাটি কম্পিউটার ও আধুনিক প্রযুক্তিতে ছাপা শুরু করে। সম্পাদক খোদেজা রশিদী।

১৯৯৫ সালে *দৈনিক প্রবর্তন* সম্পাদক সৈয়দ সফি কর্তৃক সাতক্ষীরা প্রিন্টিং প্রেস, ফারাজীপাড়া থেকে মুদ্রিত ও মিউনিসিপ্যাল ট্যাংক রোড থেকে প্রকাশিত। বর্তমানে সম্পাদক মোস্তফা সরোয়ার। নূর প্রিন্টার্স থেকে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে পত্রিকাটি মুদ্রিত হচ্ছে। বর্তমান কার্যালয় ৩, সাউথ সেন্ট্রাল রোড, খুলনা।

১৯৯৫ সালে *দৈনিক যুগের সাথী* খুলনা থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন এসএম, নূর মোহাম্মদ দুলু। এটি প্রকাশিত হয় কেডি ঘোষ রোড, খুলনা থেকে।

দৈনিক শতকণ্ঠ ১৯৯৫ সালে খুলনা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন জাহাঙ্গীর হোসেন মঞ্জু।

১৯৯৬ সালে *দৈনিক আবিধারা* প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ও প্রকাশক মো. মাহবুবুর রহমান ২৫, সাউথ সেন্ট্রাল রোড, খুলনা থেকে প্রকাশিত ও নবযুগ ছাপাখানা ও প্রকাশনী, খুলনা থেকে মুদ্রিত হতো।

১৯৯৭ সালে *নতুন দৈনিক* সম্পাদক ও প্রকাশক নুরানী জ্যোতি কর্তৃক উত্তরণ প্রেস, খুলনা থেকে মুদ্রিত ও ২৬২, শেরে বাংলা রোড, খুলনা থেকে প্রকাশিত হয়। সাইজ: ট্যাবলয়েড।

১৯৯৭ সালে *দৈনিক সেবক* প্রকাশিত হয় ইকবাল নগর মসজিদ লেন খুলনা থেকে। সম্পাদক এস.এম. মারুফ হোসেন।

খুলনার প্রথম সান্ধ্য *দৈনিক রাজপথের দাবি* প্রকাশিত হয় ১৯৯৮ সালে। সম্পাদক ছিলেন আরা কবীর। এর প্রধান সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন হুমায়ুন কবীর বালু। মুদ্রণে আনন্দ অফসেট প্রেস, খুলনা। ১১০/১ ইসলামপুর রোড থেকে প্রকাশিত হয়। সাইজ: ট্যাবলয়েড।

দৈনিক সময়ের খবর পত্রিকাটির প্রকাশের তারিখ ৩ জুলাই, ২০০৯। প্রথম সম্পাদক মরহুম অ্যাডভোকেট কামরুল মুনীর। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক কাজী মোতাহার রহমান। প্রকাশক এসএম রিয়াজ মাহমুদ। সময় প্রকাশনী, ৫১, খানজাহান আলী রোড, খুলনা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।

দক্ষিণাঞ্চল প্রতিদিন দৈনিক পত্রিকাটির প্রকাশের তারিখ ১০ জুলাই, ২০১১। প্রকাশক ও সম্পাদক এসএম সাহিদ হোসেন। সাকিব অফসেট প্রেস ৪৮, খানজাহান আলী রোড, ইমান উদ্দিন কমপ্লেক্স, খুলনা থেকে পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত।

দৈনিক বাংলা খবর পত্রিকাটির সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি মিসেস তাহমিনা আহমেদ, প্রকাশক ও সম্পাদক শেখ জামাল ইউ আহমেদ, পত্রিকাটি খুলনা মহানগর থেকে প্রকাশিত।

দেশসংযোগ পত্রিকাটি প্রকাশকাল ২৬ মার্চ, ২০১৩। উপদেষ্টা সম্পাদক: আলহাজ তালুকদার আব্দুল খালেক। প্রকাশক ও সম্পাদক মুন্সি মো. মাহাবুব আলম সোহাগ। সাকিব অফসেট প্রেস, খানজাহান আলী রোড, খুলনা থেকে মুদ্রিত।

খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা থেকে বটিয়াঘাটা উপজেলা পরিষদের মুখপত্র *উপজেলা দর্পণ* প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালে। সম্পাদক অধ্যাপক এনায়েত আলী বিশ্বাস। ট্যাবলয়েড সাইজ। কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৭৮ সালে খুলনা থেকে সাহিত্য পত্রিকা *ভৈরবী* প্রকাশিত হয়। সম্পাদক লিয়াকত হোসেন রাজা। বাগেরহাট থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত হতো। পত্রিকাটির মাত্র কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

সাপ্তাহিক পত্রিকা

ষাটের দশকে খুলনা থেকে উর্দু সাপ্তাহিক *কওম* প্রকাশিত হতো। সম্পাদকের নাম জানা যায়নি।

ষাটের দশকে খুলনা থেকে আরও একটি *সাপ্তাহিক হটকেক* প্রকাশিত হয়। তবে পত্রিকাটি বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি। সম্পাদক ছিলেন নাজিম সেলিম বুলবুল।

১৯৭১ সালে *পয়গম* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ছিল সাপ্তাহিক। সম্পাদকের নাম জানা যায়নি। পত্রিকাটিতে পাকিস্তানি শাসকদের পক্ষে লেখা হতো বলে জানা যায়।

খুলনা বার্তা ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হতো। খুলনার সেকালের ব্যাবসায়ী প্রমথ নাথ দত্তের (কুরী) উল্লাসিনী সিনেমা হলের ভেতরে বাবু সুবোধ কুমার গুহর শক্তি প্রিন্টিং প্রেস হতে প্রকাশিত হতো খুলনা বার্তা। মুদ্রক ও প্রকাশক সম্পাদক ছিলেন বাবু শম্ভুনাথ রায়। পত্রিকাটি প্রচার সংখ্যা কত ছিল তার সঠিক কোনো তথ্য জানা যায়নি।

সাপ্তাহিক 'তাওহীদ' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫০ সালে। প্রথমে এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন আব্দুল ওহাব সিদ্দিকী (১৯০২-১৯৮৮)। এটি ছাপা হতো খুলনার মুসলিম আর্ট প্রেস থেকে। প্রকাশক ছিলেন সরদার আনসার আলী। পত্রিকাটি এলেম বকসের সৌজন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রকাশিত হতো প্রতি শুক্রবারে। প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল চার আনা।

খুলনা থেকে *সাপ্তাহিক দেশবার্তা* প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৩ সালে। সম্পাদক ছিলেন শরীফ আমজাদ হোসেন। পত্রিকার সংবাদের পাশাপাশি প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও বিজ্ঞাপন ছাপা হতো।

১৯৬৪ সালের ১৭ অক্টোবর খুলনা থেকে *সাপ্তাহিক দেশের ডাক* পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন লুৎফর রহমান জাহাঙ্গীর (১৯৩৭-১৯৯৮)। পত্রিকাটি খুলনা অঞ্চলে দারুণভাবে আলোড়ন তুলেছিল। ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনে পত্রিকাটি ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছিল। এছাড়া ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল পত্রিকাটি। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংখ্যার প্রথম পাতার অর্ধেকটা জুড়ে স্বাধীনতার পতাকা ছাপা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের পর পাকিস্তানি সেনারা দেশের ডাক পত্রিকার প্রেসটি পুড়িয়ে দিয়েছিল।

সাপ্তাহিক জনবার্তা প্রকাশিত হয় খুলনা থেকে ১৯৬৬ সালের ১৫ আগস্ট। সম্পাদক ও প্রকাশক সৈয়দ সোহরাব আলী। পত্রিকাটি তখন খুলনা অঞ্চলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। বর্তমানে *জনবার্তা* প্রকাশিত হচ্ছে না।

সাপ্তাহিক পূর্বাঞ্চল খুলনা থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালের ১ জানুয়ারি। সম্পাদক আলহাজ লিয়াকত আলী। পত্রিকাটিতে প্রগতিশীল বিভিন্ন লেখা প্রকাশিত হতো। বিশেষ করে ঊনসত্তরের গণআন্দোলনে পত্রিকাটি উল্লেখযোগ্য

অবদান রেখেছিল। এই পত্রিকাটির বিভিন্ন জেলা, মহকুমা ও থানাপর্যায়ে সংবাদদাতা ছিল। গ্রামের খবর খুব গুরুত্ব সহকারে ছাপা হতো। ছাপা হতো প্রগতিশীল উপ-সম্পাদকীয়। আরও ছাপা হতো কবিতা, গল্প, নিবন্ধ, প্রবন্ধ ইত্যাদি। *সাপ্তাহিক পূর্বাঞ্চল* বস্তুনিষ্ঠ সংবাদপত্র পরিবেশনের ক্ষেত্রে ছিল আপোশহীন।

সাপ্তাহিক বিশ্বডাক খুলনা থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালের ১১ ডিসেম্বর। সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ এ,কে, কবীর। পত্রিকাটি খুলনা অঞ্চলে বেশ আলোড়ন তুলেছিল।

১৯৬৯ সালে *সাপ্তাহিক গণবাণী* খুলনা থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন লুৎফর রহমান। পত্রিকাটি খুলনার মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা তুলে ধরতো।

১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে খুলনা থেকে *গণবার্তা* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ছিল সাপ্তাহিক। সম্পাদক ছিলেন এস, ওয়াজেদ আলী। পত্রিকাটি বেশ সুনাম অর্জন করেছিল।

১৯৬৯ সালে খুলনা থেকে *সাপ্তাহিক গণবাদী* প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন কবি নাসির উদ্দিন আহমেদ (১৯৩০-১৯৮৩)।

১৯৭১ সালের ১৬ জুন একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন খুলনা থেকে প্রকাশিত হয় *সাপ্তাহিক স্বদেশ।* পত্রিকাটি গোপনে ছাপা হতো। ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় বিলি হতো। সম্পাদক ছিলেন কিশোর কবি গোলাম সাবদার সিদ্দিকী। পত্রিকাটিতে মহান মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিভিন্ন সংবাদ, প্রবন্ধ ও নিবন্ধ ছাপা হতো।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন খুলনা থেকে প্রকাশিত ও মুজিবনগর থেকে প্রচারিত হতো *সাপ্তাহিক মুক্তি* নামে একটি পত্রিকা। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ ঈসা। পত্রিকাটি ছাপা হতো গোপনে। কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৭১ সালে খুলনা থেকে *সাপ্তাহিক ডাক দিয়ে যাই* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

১৯৭১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি খুলনা থেকে *সাপ্তাহিক কালান্তর* প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন নূর মহম্মদ টেনা (১৯৫২-)। পত্রিকাটি খুলনা থেকে প্রকাশিত হতো।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্যাগ ও আদর্শকে সামনে রেখে খুলনা থেকে *সাপ্তাহিক সনদপত্র* প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে। পত্রিকায় সংবাদ ও উপ-সম্পাদকীয় খুব গুরুত্ব সহকারে ছাপা হতো। তাছাড়া সাহিত্য বিষয়ক লেখাও

ছাপা হতো। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন তৎকালীন সংসদ সদস্য স. ম. বাবর আলী। বর্তমানে প্রকাশিত হচ্ছে না।

১৯৭২ সালের প্রথম দিকে *সাপ্তাহিক স্বকাল* খুলনা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ ঈসা (১৯৪৬-২০০১)। পত্রিকাটি বেশিদিন প্রকাশিত হতে পারেনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর *সাপ্তাহিক স্বকাল* পুনরায় প্রকাশিত হয়। বেশ কিছুদিন চলার পর তা বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে *সাপ্তাহিক স্বাধীনতা* প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ ঈসা।

১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি মধুমতি মুদ্রণালয়, খুলনা থেকে ইমান উদ্দিন সরদার কর্তৃক *সাপ্তাহিক জন্মভূমি* মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। সম্পাদক অধ্যাপক আলী আহমেদ (১৯৪৪-), সহ-সম্পাদক হুমায়ুন কবির বালু। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ এবং দাম ১০ পয়সা। ‘পত্রিকাটিতে দেশীয় ও স্থানীয় সংবাদ ছাড়াও সাহিত্য বিভাগ, কাগজ কলম কালি, *কিশোর বিভাগ, গড়বে যারা বাংলাদেশ, সংবাদ পর্যালোচনা* ইত্যাদি আকর্ষণীয় কলাম প্রকাশিত হয়।’

১৯৭২ সালে খুলনা থেকে *সোনার বাংলা* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ছিল সাপ্তাহিক। সম্পাদক ছিলেন দেবরঞ্জন দত্ত। পত্রিকাটি বেশি দিন চলেনি।

১৯৭২ সালে খুলনা থেকে *সাপ্তাহিক গণমুখ* প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির আয়ু ছিল খুবই কম। সম্পাদক ছিলেন তারেক উদ্দিন চৌধুরী।

১৯৭২ সালে খুলনা থেকে *ট্যারেঞ্জা* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ছিল ইংরেজি সাপ্তাহিক। সম্পাদক ছিলেন নূরুল ইসলাম মনু। ১৯৭৩ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৭২ সালে খুলনা থেকে ইংরেজি *সাপ্তাহিক প্যাট্রিয়ট* প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি বেশিদিন চলেনি। সম্পাদক ছিলেন এসএম, শামসুদ্দিন।

১৯৭২ সালে খুলনা থেকে ইংরেজি *সাপ্তাহিক ভয়েজ* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মো. ওয়াজেদ আলী।

১৯৭২ সালে খুলনা থেকে ইংরেজি *সাপ্তাহিক গণডাক* প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি বেশিদিন চলেনি। সম্পাদক ও প্রকাশকের নাম জানা যায়নি।

১৯৭২ সালে খুলনা থেকে *সাপ্তাহিক বাংলার ছবি* প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন আবু হেনা মোস্তফা কামাল।

১৯৭৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ৪নং কে,ডি, ঘোষ রোড খুলনা থেকে *প্রবাসী* প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন একেএম মুস্তাফিজুর রহমান। পত্রিকাটি ছাপা

হতো জনতা প্রেস, খানজাহান আলী রোড, খুলনা থেকে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৪। দাম ২০ পয়সা।

১৯৭৩ সালে খুলনা থেকে *জনতার মুখ* নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন শেখ হারুনুর রশীদ। বর্তমানে প্রকাশিত হচ্ছে না।

১৯৭৪ সালে ইংরেজি *সাপ্তাহিক দি মাদারল্যান্ড* খুলনা থেকে প্রকাশিত হয়। ছাপা হতো খুলনা মুসলিম স্কলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে। আর প্রকাশিত হতো খুলনার ১২, মির্জাপুর থেকে। সম্পাদক ছিলেন এমএইচ, খান।

১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে খুলনা থেকে *সাপ্তাহিক বিস্ফোরণ* প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ছিল প্রগতিশীল। বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সম্পাদক ছিলেন মাহবুব-উল আলম হিরণ।

কবি নাসির উদ্দিন আহমেদের সম্পাদনায় ১৯৭৫ সালে খুলনা থেকে *সাপ্তাহিক ছায়াপত্র* প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন আশরাফুন নেছা। সাইজ : ৮৪ সে.মি. × ৫৮ সে.মি.। পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কবি নাসিরউদ্দিন আহমদ। পরে সম্পাদক হন আশরাফুননেছা। এক পর্যায়ে সাপ্তাহিক ছায়াপথ ৩৪, খানজাহান আলী রোডস্থ নূর প্রিন্টার্স থেকে ট্যাবলয়েড সাইজে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতো। সম্পাদক ছিলেন মো. জাহাঙ্গীর খালেদ।

১৯৭৭ সালে অক্টোবর মাসে *দি পূর্বাঞ্চল উইকলী* প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ও প্রকাশক লিয়াকত আলী। এটি ছিল *সাপ্তাহিক পূর্বাঞ্চল*-এর ইংরেজী সংস্করণ। ছাপা হতো সনি প্রিন্টার্স, ৩৮, ইকবাল নগর মসজিদ লেন, খুলনা থেকে। পত্রিকাটি ছিল ট্যাবলয়েড সাইজ। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছিল।

সাপ্তাহিক রূপসা ১৯৭৯ সালে খুলনা থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক একেএম, মতিউর রহমান। পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক নবযুগ ছাপাখানা, খুলনা থেকে মুদ্রিত ও বিকে, ইস্ট লেন মৌলভীপাড়া, খুলনা থেকে প্রকাশিত। পরে খালিশপুর, খুলনা থেকে সম্পাদক কর্তৃক ঢাকা প্রেস থেকে প্রকাশিত ও মুদ্রিত। বর্তমানে পত্রিকাটি বন্ধ আছে।

সাপ্তাহিক পদধ্বনি ১৯৭৯ সালে খুলনা থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ও প্রকাশক সাঈদুর রহমান। প্রকাশিত হতো ৬০, আপার যশোর রোড, খুলনা থেকে।

সাপ্তাহিক অনির্বাণ খুলনা থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালের ১ জুন। সম্পাদক অধ্যাপক আলী আহমেদ। প্রকাশিত হয় ৪, মির্জাপুর রোড, খুলনা থেকে। *সাপ্তাহিক 'অনির্বাণ'* নিয়মিত প্রকাশিত হতো।

১৯৮০ সালে খুলনা থেকে *সাপ্তাহিক বিশ্ববার্তা* প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন মোহাম্মদ নুরুজ্জামান। নবযুগ ছাপাখানা ও প্রকাশনী, ৯, খানজাহান আলী রোড, খুলনা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হতো। বর্তমানে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় না।

সাপ্তাহিক খুলনা ১৯৮১ সালে খুলনা থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ও প্রকাশক সচিব জেলা পরিষদ, খুলনা। পত্রিকাটি ছাপা হয় উত্তরণ প্রেস, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা থেকে। এখন পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে না।

সাপ্তাহিক জনভেরী ১৯৮১ সালে খুলনা থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ও প্রকাশক এ.টি.এম. ইলাহী বক্স। প্রকাশিত হতো ১৬, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা থেকে। নবযুগ ছাপাখানা ও প্রকাশনী, ৯, খানজাহান আলী রোড থেকে মুদ্রিত। পরে সম্পাদক হন শরীফ শফিকুল হামিদ চন্দন।

সাপ্তাহিক প্রভাষক খুলনা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮২ সালে। সম্পাদক ছিলেন মাহবুব আলম হিরণ। ৩৩/২, আহসান আহমেদ রোড, খুলনা থেকে প্রকাশিত হতো। পত্রিকাটি বেশি দিন চলেনি।

সাপ্তাহিক উল্লোল ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক অধ্যক্ষ মনোজিৎ মণ্ডল। সম্পাদক কর্তৃক উল্লোল প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন থেকে মুদ্রিত ও ফায়ার সার্ভিস রোড, খুলনা থেকে প্রকাশিত হতো। পত্রিকাটি কয়েক বছর চলার পর বন্ধ হয়ে যায়।

সাপ্তাহিক বনানী ১৯৮৬ সালে খুলনার পাইকগাছা থেকে প্রকাশিত হয় ও পাইকগাছা ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক শেখ বেলাল উদ্দিন। সাইজ ট্যাবলয়েড।

সাপ্তাহিক বহুবচন ১৯৯২ সালে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন সাহারুজ্জামান মোর্তজা। খুলনার আইডিয়াল কেমিক্যাল অ্যান্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস বাবুখান রোড থেকে মুদ্রিত এবং ১৫ নং ভৈরব স্ট্র্যান্ড রোড খুলনা থেকে প্রকাশিত হতো। সাইজ : ট্যাবলয়েড। পরে সম্পাদক ছিলেন সাইফুল ইসলাম চৌধুরী। বর্তমানে পত্রিকাটি বন্ধ আছে।

১৯৯২ সালে খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলা থেকে *সাপ্তাহিক সুন্দরবন বার্তা* প্রকাশিত হয়। সম্পাদক মোস্তফা কামাল জাহাঙ্গীর। সাইজ : ট্যাবলয়েড। পত্রিকাটি বর্তমানে বন্ধ আছে।

সম্পাদক হারুন উর রশীদ কর্তৃক ১৯৯২ সালে কথা কলি প্রিন্টার্স ৫/১, লোয়ার যশোর রোড, খুলনা থেকে *সাপ্তাহিক মনন,* মুদ্রিত এবং ৪/১, টুটপাড়া ক্রস রোড খুলনা থেকে প্রকাশিত। সাইজ : ট্যাবলয়েড।

সাপ্তাহিক ন্যান্সী ১৯৯২ সালে প্রকাশিত হয়। প্রধান সম্পাদক সৈয়দা মাহমুদা শিরীন। সম্পাদক মো. সাইফুল ইসলাম চৌধুরী। মুদ্রণে প্রগতি প্রেস, ৬৫ ইসলামপুর রোড, খুলনা থেকে প্রকাশিত হতো। সাইজ: ট্যাবলয়েড। বর্তমানে পত্রিকাটি বন্ধ আছে।

সাপ্তাহিক গ্রামাঞ্চল ১৯৯২ সালে খুলনার খালিশপুর থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন আশরাফ উল কবীর বেলাল। বনলতা প্রিন্টিং প্রেস, খালিশপুর থেকে মুদ্রিত হতো।

১৯৯২ সালে খুলনার বাগমারা ঈদগাহ লেন থেকে *সাপ্তাহিক খুলনা বার্তা* প্রকাশিত হয়। মাসুদ প্রিন্টিং প্রেস, ৬/৫, ইসলামপুর রোড, খুলনা থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক ছিলেন শেখ শেফারুল ইসলাম।

সাপ্তাহিক ফলাফল ১৯৯৩ সালের ২৮ অক্টোবর সম্পাদক শেখ মোস্তাফিজুর রহমান কর্তৃক উত্তরণ প্রেস, ৫৭ ইসলামপুর রোড, খুলনা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সাপ্তাহিক সেবক ১৯৯৩ সালের ১৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়। সম্পাদক মারুফ হোসেন কর্তৃক ১৫ ইকবালনগর মসজিদ লেন, খুলনা থেকে প্রকাশিত ও মধুমতি মুদ্রণালয়, ১৮ ইসলামপুর রোড, খুলনা থেকে মুদ্রিত হতো।

১৯৯৩ সালের ২৬ মার্চ *সাপ্তাহিক সবুজকণ্ঠ* প্রকাশিত হয়। সম্পাদক অধ্যাপক মীর্জা নূরুজ্জামান কর্তৃক পূর্বা প্রিন্টার্স, খুলনা থেকে মুদ্রিত ও ৩১, ছোটো বয়রা মার্কেট রোড, খুলনা থেকে প্রকাশিত।

সাপ্তাহিক শিবসা ১৯৯৪ সালে সম্পাদক কাজী শাহনেওয়াজ কর্তৃক রূপসা স্ট্র্যান্ড রোড, খুলনা থেকে প্রকাশিত হতো।

এশিয়াঞ্চল প্রকাশকাল ১৯৯৪ সালের ১ জুলাই। সম্পাদক রেজাউল হক।

সাপ্তাহিক বনছায়া ১৯৯৫ সালে সম্পাদক আশরাফুল কবীর বেলাল কর্তৃক খালিশপুর থেকে প্রকাশিত ও মুদ্রিত হতো।

সাপ্তাহিক জনধ্বনি ১৯৯৫ সালে সম্পাদক সৈয়দ সফি কর্তৃক উত্তরণ প্রেস, খুলনা থেকে মুদ্রিত এবং মিউনিসিপ্যাল ট্যাংক রোড, খুলনা থেকে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪। সাইজ: ট্যাবলয়েড।

সাপ্তাহিক রাজপথের দাবি ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক আরা কবীর। হুমায়ুন কবির বালু কর্তৃক খুলনা থেকে মুদ্রিত ও ১১০/১ ইসলামপুর রোড, খুলনা থেকে প্রকাশিত। সাইজ: ট্যাবলয়েড।

১৯৯৬ সালে *সাপ্তাহিক খুলনার কণ্ঠ* সম্পাদক শেখ আবু আসলাম বাবু কর্তৃক আঞ্জুমান রোড, দৌলতপুর, খুলনা থেকে প্রকাশিত। সাইজ: ট্যাবলয়েড।

সাপ্তাহিক অনন্ত পিপাসা ১৯৯৬ সালে সম্পাদক শেখ মো. আজাদ করিম কর্তৃক পুরাতন যশোর রোড, খুলনা থেকে প্রকাশিত হয়। মুদ্রণে উত্তরণ প্রেস খুলনা।

সাপ্তাহিক তথ্য কেন্দ্র ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয় শরীফ আমজাদ রোড, দৌলতপুর, খুলনা থেকে। সম্পাদক ছিলেন শরীফ শফিকুল হামিদ চন্দন।

১৯৯৭ সালে খুলনা থেকে *সাপ্তাহিক কল্পনা* প্রকাশিত হয়। মুদ্রণে জাহান প্রিন্টিং প্রেস, খুলনা। সম্পাদক ছিলেন এম. আমিনুর রহমান।

সাপ্তাহিক গণআজাদী প্রকাশের তারিখ ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫। সম্পাদক মোক্তার আহমেদ। খুলনা মহানগর থেকে প্রকাশিত।

সাপ্তাহিক সত্যের সন্ধানে পত্রিকাটির সম্পাদক ও প্রকাশক অ্যাডভোকেট ফরিদ আহমেদ। প্রকাশের তারিখ-২৬ মার্চ, ২০০৯। পত্রিকাটি খুলনা মহানগর থেকে প্রকাশিত।

সাপ্তাহিক আজকের তথ্য পত্রিকা প্রকাশের তারিখ ২৭ অক্টোবর, ২০০৯। সম্পাদক ও প্রকাশক এসএম নজরুল ইসলাম। নির্বাহী সম্পাদক হুমায়ুন কবীর। পত্রিকাটি খুলনা মহানগর থেকে প্রকাশিত।

সাপ্তাহিক খুলনাঞ্চল প্রকাশ তারিখ-১ জানুয়ারি ২০১৩। প্রধান সম্পাদক মো. খবিরুজ্জামান। প্রকাশক মিজানুর রহমান মিল্টন। পত্রিকাটি অনির্বাণ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স থেকে মুদ্রিত ও ১৮ কেসিসি সুপার মার্কেট থেকে প্রকাশিত।

সাপ্তাহিক আমার গ্রাম পত্রিকাটির প্রকাশকাল ৩ জুলাই, ২০১১। প্রকাশক শেখ আহসান হাবিব। সম্পাদক এ কে হিরু। রূপান্তর প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, শেরে বাংলা রোড, খুলনা থেকে পত্রিকাটি নিয়মিত বের হচ্ছে।

সাপ্তাহিক সেরা খবর ২০০৫ সালে প্রকাশিত হয় খুলনা শহর থেকে। সম্পাদক ছিলেন ডা. গাজী মিজানুর রহমান।

১৯৯৯ সালে *সাপ্তাহিক খুলনার বাণী* প্রকাশিত হয়। সম্পাদক আব্দুল কাদের খান। মুদ্রণে জাহান প্রিন্টিং প্রেস, খুলনা। ১৩৮ স্যার ইকবাল রোড থেকে প্রকাশিত।

১৯৯৫ সালে *নতুন বাংলাদেশ* নামে একটি পত্রিকা খুলনা থেকে প্রকাশিত হয়। তবে পত্রিকাটি বেশিদিন চলেনি।

পাক্ষিক পত্রিকা

১৮৭১ সালে খুলনা থেকে *পাক্ষিক সমাজ দর্পণ* প্রকাশিত হয়। এটিই খুলনা জেলার প্রথম পত্রিকা। *পাক্ষিক সমাজ দর্পণ* প্রকাশ করেছিলেন তৎকালীন খুলনা মহকুমার স্কুলসমূহের উপ-পরিদর্শক যশোদানন্দন সরকার। ইনি ছিলেন এর পরিচালক। পত্রিকায় সমাজ, সাহিত্য, নীতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ এবং সমসাময়িক বিষয়ের আলোচনা ও সংবাদ থাকতো। *সমাজ দর্পণের* একটি সংখ্যায় জর্জ ক্যাম্পবেলকে বিদ্রূপ করা হলে যশোদানন্দন চাকরিচ্যুত হন।

তখন তিনি পত্রিকাটি স্থানান্তর করেছিলেন কলকাতায় এবং সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশ করেছিলেন। তবে সেটি বেশিদিন টিকে থাকেনি।

১৯৬৫ সালে খুলনা থেকে *পাক্ষিক আওয়াজ* প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন কাজী আব্দুল খালেক। পত্রিকাটিতে খবরের পাশাপাশি কবিতা, প্রবন্ধ ও নিবন্ধ ছাপা হতো।

পাক্ষিক নয়াদর্পণ প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে। পত্রিকাটির প্রকাশক ও সম্পাদক ছিলেন বেগম ফরিদা ইয়াসমিন। প্রকাশিত হতো ২৩/১, টিবি বাউন্ডারি রোড, খুলনা থেকে। বেশ কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের পর পাক্ষিক 'নয়াদর্পণ' বন্ধ হয়ে যায়।

পাক্ষিক ফজর ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক মো. জাকির হোসেন। প্রকাশক মো. ইকবাল। মুদ্রণে নবযুগ ছাপাখানা ও পাবলিকেশন, খুলনা। ৮, আলতাপোল লেন, খুলনা থেকে প্রকাশিত হয়। সাইজ: ট্যাবলয়েড।

পাক্ষিক গণমিছিল ১৯৯৯ সালের ৩০ অক্টোবর প্রকাশিত হয়। সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম বাচ্চু কর্তৃক পূরবী প্রিন্টার্স ২৬২, শেরে বাংলা রোড, খুলনা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতো। সাইজ: ট্যাবলয়েড।

মাসিক পত্রিকা

খুলনা বিদ্যাপীঠ প্রেস হতে নলিনী মোহন গুহর সম্পাদনায় প্রকাশিত হতো *মুক্তিমন্ত্র* পত্রিকা। উক্ত বিদ্যাপীঠ প্রেস কালীবাড়ী রোডস্থ ভৈরব নদের কূলসংলগ্ন গহনা নৌকা ঘাটের পাশে অবস্থিত ছিল। পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল তিরিশের দশকে। তবে বেশিদিন চলেনি। পত্রিকাটি মাসিক ছিল।

খুলনার দ্বিতীয় পত্রিকার নাম *মাসিক শিক্ষা দর্পণ*। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৫ সালে। দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্নের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল খুলনা থেকে (পৌষ, ১৩০১)। ব্রজেন্দ্রনাথ পত্রিকাটির প্রকাশ স্থান উল্লেখ করেননি। *'শিক্ষা দর্পন'* মুদ্রিত হতো চব্বিশ পরগণায়। কিন্তু প্রকাশিত হতো খুলনা থেকে। মুদ্রণ সংখ্যা ছিল এক হাজার, পৃষ্ঠা ছিল ৩২ (রয়েল সাইজ)। মূল্য ছিল এক আনা ছ'পাই।

খুলনায় তৃতীয় পত্রিকার নাম *মাসিক ঘোষক*। এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৫ সালে। তবে এই পত্রিকার সম্পাদকের নাম পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া কোনো প্রেসে ছাপা হতো তাও পাওয়া যায়নি। মুদ্রণ সংখ্যা- ৫৬০ কপি, পরে তা হ্রাস পেয়েছিল ৩৫০ কপিতে।

মাসিক তকবীর খুলনা থেকে প্রকশিত হয় ১৯৫০ সালে। সম্পাদক ছিলেন শরীফ আমজাদ হোসেন (১৯১২-১৯৮৭)। সংবাদের পাশাপাশি পত্রিকায় প্রবন্ধ, নিবন্ধ ছাপা হতো।

১৯৫৩ সালে খুলনা থেকে *মাসিক পাক পয়গাম* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটি ছিল মুসলিম লীগের মুখপত্র। সম্পাদক ছিলেন আব্দুল ওহাব সিদ্দিকী।

১৯৬৫ সালে *মাসিক সন্দ্বীপন* খুলনা থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হক। প্রগতিশীল প্রবন্ধ ও নিবন্ধ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হতো।

১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ *মাসিক বঙ্গজননী* খুলনা থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন এ,কে,এম, মুস্তাফিজুর রহমান। পত্রিকাটি বেশি দিন স্থায়ী হতে পারেনি।

খুলনা থেকে *শাহীন* নামে একটি মাসিক উর্দু পত্রিকা ষাটের দশকে প্রকাশিত হতো। পত্রিকাটি ছিল সাপ্তাহিক। সম্পাদকের নাম জানা যায়নি। ১৯৯০ সালে খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলা থেকে প্রকাশিত হয়। ছাপা হতো পাইকগাছার হক প্রিন্টিং প্রেস থেকে। সম্পাদক নিমাই চন্দ্র সরদার। সাইজ: ট্যাবলয়েড।

সুন্দরবন সমাচার প্রকাশিত হয় খুলনা থেকে ২০০০ সালে। সম্পাদক স্বপন গুহ। প্রকাশক নাজমুল আল ডেভিড। ফারুক আহমেদ বার্তা সম্পাদক ছিলেন।

প্রকাশের তারিখ এপ্রিল-জুন ২০০৩। খুলনা সিটি করপোরেশনের শিক্ষা স্ট্যান্ডিং কমিটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে *খুলনা সিটি করপোরেশন বার্তা* জনসংযোগ দপ্তর কর্তৃক মুদ্রিত।

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

১৯৯৮ সালে *খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্তা* প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ত্রৈমাসিক। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২।

১৯৭৪ সালে *ত্রৈমাসিক বিজ্ঞান পরিক্রমা* প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ছিল বিজ্ঞানবিষয়ক। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন স্বপন দাশ। ফকিরহাটের বেতাগা বিজ্ঞান সমিতির উদ্যোগে এটি প্রকাশিত হতো। প্রথমে ছাপা হতো খুলনার শহিদ স্মরণি প্রেস, ৬, মির্জাপুর রোড থেকে।

অনলাইন পত্রিকা

বর্তমান যুগে গণমাধ্যমের ধারণাতীত উৎকর্ষতায় অনলাইন পত্রিকার প্রসার, ব্যাপ্তি এবং পাঠকপ্রিয়তা ক্রমেই বাড়ছে। খুলনা জেলায় বেশ কিছু *অনলাইন পত্রিকা* গণমাধ্যমের বিকাশকে সমৃদ্ধ করেছে। উল্লেখযোগ্য অনলাইন পত্রিকার নাম নিম্নে বর্ণিত হলো:

খুলনা নিউজ ডট কম খুলনার বহুল প্রচারিত একটি অনলাইন পত্রিকা। ২০০৯ সালে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। পত্রিকাটির সম্পাদক মাহমুদ সোহেল।

টাইগার নিউজ টুয়েন্টিফোর ডট কম অনলাইন পত্রিকাটির সম্পাদক সামছুজ্জামান শাহীন। পত্রিকাটি নিয়মিত অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে।
গ্রিন বাংলা টুয়েন্টিফোর ডট *কম* অনলাইন পত্রিকাটি ২০১২ সালে প্রকাশিত হয়। এটির সম্পাদক ফজলে রাব্বী।

ইংলিশ খুলনা নিউজ ডট কম খুলনার একমাত্র ইংলিশ ভার্সন অনলাইন পত্রিকা। এর সম্পাদক মাহমুদ সোহেল।

নিউজবাংলা টুয়েন্টিফোর ডট নেট- এর সম্পাদকের নাম শহিদুল হক।

কম্যুউনিটি রেডিয়ো দেশে প্রথমবারের মতো চালু হওয়া *কম্যুউনিটি রেডিয়ো* স্থানীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য বিমোচন এবং স্থানীয় উন্নয়নে দারুণ ভূমিকা রাখছে। কমিউনিটির মানুষ এই গণমাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে তাদের নিজেদের সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরছেন। শুধু তাই নয়, সামাজিক নানা ইস্যুতে স্থানীয়পর্যায়ে স্থাপিত এই কম্যুউনিটি রেডিয়োগুলো ক্রমেই হয়ে উঠছে সংলাপ আয়োজনের চমৎকার ক্ষেত্র।

সুন্দরবন রেডিয়ো খুলনায় এমনি একটি রেডিয়ো'র নাম *সুন্দরবন রেডিয়ো* ৯৮.৮ কিলোহার্জ। সুন্দরবন রেডিয়ো সম্প্রচার হয় খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার আমাদি ইউনিয়ন থেকে। ১৭ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে সুন্দরবন রেডিয়ো কয়রা উপজেলা বাদেও সংলগ্ন উপজেলা পাইকগাছা, আশাশুনি ও দাকোপ উপজেলা পর্যন্ত কাভারেজে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে।

বাংলাদেশ বেতার খুলনা খুলনা-সাতক্ষীরা রোডে যা আজকের খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সেটিই এক সময়ে খুলনা বেতার কেন্দ্র ছিল যার ট্রান্সমিটার ছিল ১০ কিলোওয়াট শক্তিবিশিষ্ট। এর যাত্রা শুরু হয় ১৯৭০ সালের ৪ ডিসেম্বর। প্রথম আঞ্চলিক পরিচালক ছিলেন এম.ইব্রাহীম আখন্দ। সামছুর আলী বিশ্বাস ছিলেন প্রথম কর্মকর্তা। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন অনুষ্ঠান সংগঠক গোলাম কবির ও কাজী মাহমুদুর রহমান। অনুষ্ঠান প্রযোজকদের মধ্যে আরও ছিলেন মুন্সী আহসান কবির, আব্দুস সাত্তার শেখ ও শেখ ওয়ালিউর রহমান। অধিবেশন তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন মাহমুদ হাসান ও আব্দুর রহিম। সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক ছিলেন আব্দুল মালেক। কেন্দ্রের প্রথম ঘোষক-ঘোষিকা ছিলেন জহির সমশেরী, সুরাইয়া রোজী ও রেহানা আক্তার। সংবাদ অনুবাদক ও পাঠকদের মধ্যে ছিলেন জনাব লিয়াকত আলী, আহমদ আলী খান ও হুমায়ুন কবির বালু। প্রথম সংগীত প্রযোজক ছিলেন আব্দুল হামিদ চৌধুরী, সৈয়দ নূরুল ইসলাম মুফতি ও আব্দুল মজিদ। আর প্রথম নাট্য প্রযোজক সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন।

অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে খুলনা বেতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধুর আহবানে অনুপ্রাণিত হয়ে রেডিয়ো পাকিস্তান নামটি বর্জন করে স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে এবং সংগ্রামের ওপর রচিত গান প্রচার করতে থাকে। পাকিস্তান জিন্দাবাদ

ধ্বনির পরিবর্তে ‘জয়বাংলা’ ধ্বনি প্রচার করতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গল্লামারীস্থ বধ্যভূমিতে প্রতিদিন যে গণহত্যা সংগঠিত হয়, খুলনা বেতার তার নীরব সাক্ষী। গল্লামারী বেতার ভবনের পুলিশ ব্যারাক পাকিস্তানি সৈন্যরা দখল করে নিয়ে সেখানে ঘাঁটি স্থাপন করে। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ গ্লানিকর পরাজয়ের মুখে গল্লামারীস্থ বেতার ভবনে অবরুদ্ধ পাকিস্তানি সৈন্যরা বেতারের সব যন্ত্রপাতি ও সমস্ত টেপ বিনষ্ট করে দেয় এবং বেতারের ক্যাশ ভেঙে টাকা পয়সা চুরি করে নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে দেশ স্বাধীন হবার পর বাংলাদেশ বেতার, রংপুর থেকে একটি ১ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার এনে বাংলাদেশ বেতার, খুলনা কেন্দ্রের প্রচার কার্যক্রম শুরু হয়। অতঃপর উনিশে এপ্রিল ১৯৭৬ তারিখে একটি ১০ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার স্থাপন করা হয়। বর্তমানের ১০০ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারটি ২৮ এপ্রিল ১৯৮১ সালে স্থাপিত হয় এবং বয়রাস্থ বর্তমান বেতার ভবনটির উদ্বোধন হয় ১ জুলাই ১৯৭৯ সালে।

বাংলাদেশ টেলিভিশন, খুলনা কেন্দ্র

বাংলাদেশ টেলিভিশন খুলনা উপকেন্দ্রটি খুলনা শহরের খালিশপুরে ৫.০৬ একর জমির ওপর অবস্থিত। ৫০০ বর্গফুট উচ্চতাসম্পন্ন টাওয়ার এবং ১০ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন সাবস্টেশনটি ১১ মার্চ, ১৯৭৭ এই কেন্দ্রটির প্রচার এলাকা খুলনা উপকেন্দ্রের সম্প্রচার চতুর্দিকে ৮৩ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এই কেন্দ্রের অনুষ্ঠানমালা ১১নং চ্যানেলে সম্প্রচারিত হয়।

নতুন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সরকার থেকে কোনো অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ ছাড়াই বিটিভির বিদ্যমান বরাদ্দকৃত অর্থের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে কোনোরূপ নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয় না করে ঢাকা কেন্দ্রে অব্যবহৃত যন্ত্রপাতি খুলনায় স্থানান্তর করে ও উপকেন্দ্রের বিদ্যমান অবকাঠামো আংশিক সম্প্রসারণ করে বিটিভির কর্মকর্তাগণ খুলনার উপকেন্দ্রটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ টিভি কেন্দ্রে রূপান্তরের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সফল হয়েছেন। যন্ত্রপাতি বসানোর কাজ শেষ হওয়ার পর ১৬ মার্চ, ২০১৪ তারিখ স্বাভাবিক সম্প্রচার শেষে প্রকল্প পরিচালকের উপস্থিতিতে প্রাথমিকভাবে নতুন স্টুডিও থেকে সফলভাবে পরীক্ষামূলক সম্প্রচার করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিভিশন, খুলনা পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্র হিসেবে সম্প্রচারের জন্য প্রস্তুত।

সরকারি কার্যালয়/ প্রতিষ্ঠান

খুলনা আঞ্চলিক তথ্য অফিসের কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭৮ সালে। এতদঞ্চলে আগমনকারী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী বা এ পদমর্যাদার বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের সরকারি অনুষ্ঠানের নিউজ ও ফটোকাভারেজ এবং তা গণমাধ্যমে জনগণকে জানানোর লক্ষ্যেই মূলত এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটি তথ্য অধিদপ্তরের অধীন একটি অফিস। বর্তমানে অফিসটি আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্রুততম সময়ে সরকারি সেবা অর্থাৎ তথ্যসমূহ প্রকাশে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে এটি ২৭৭, খানজাহান আলী রোডের ৪তলা ভবনের দ্বিতীয় তলার ভাড়া বাড়িতে অবস্থিত।

জেলা তথ্য অফিস জেলা তথ্য অফিস সরকারের গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের একটি প্রচারধর্মী সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। জেলা তথ্য অফিস গ্রামীণ কৃষক, শ্রমিক, মহিলা এবং শিশুসহ দেশব্যাপী তৃণমূল পর্যায়ের সুবিধাবঞ্চিত এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে অনগ্রসর বিশাল জনগোষ্ঠীকে শিশু ও নারী শিক্ষা, টিকাদান কর্মসূচি, এইচআইভি-এইডস প্রতিরোধ, শিশু ও নারী অধিকার, স্যানিটেশন, মাদকের অপব্যবহার রোধ, জন্মনিয়ন্ত্রণ, বার্ড ফ্লু প্রতিরোধ, বৃক্ষরোপণ, নিরাপদ মাতৃত্ব, নারী পুরুষের বৈষম্যরোধ, আত্মকর্মসংস্থান, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধসহ সরকারের নানামুখী উন্নয়ন কর্মকান্ডের বিবরণী প্রচার করে থাকে। বর্তমানে ৪৫, টুটপাড়া সেন্ট্রাল রোডে খুলনা জেলা তথ্য অফিসের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

গণসংযোগ অধিদপ্তর ব্রিটিশ-ভারতে ১৯২৪ সালে জনগণকে স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন বিষয়ে সচেতন করার জন্য পাবলিক হেলথ ডিভিশনের অধীনে ডিস্ট্রিক পাবলিক রিলেশন অফিস সৃষ্টি করা হয়। তৎকালীন তথ্য বিভাগের আওতায় পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট নামে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংয়ে এ বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৬৮ সালে পাবলিক রিলেশন্স দপ্তরের কলেবর বাড়িয়ে প্রত্যেক জেলায় ১জন ডিস্ট্রিক পাবলিক রিলেশন অফিসারের পদ সৃষ্টি করা হয়। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায়ে জনগণকে সচেতন করার মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রমকে উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে বাংলাদেশ পরিষদ, বিএনআর মহিলা শাখাকে একত্রিত করে ১৯৭২ সালে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর গঠন করা হয়।

খুলনা প্রেসক্লাব প্রেসক্লাবকে বলা হয় সাংবাদিকদের দ্বিতীয় গৃহ। সাংবাদিকদের প্রাণকেন্দ্র প্রেসক্লাব। ঐতিহ্যবাহী খুলনা প্রেসক্লাব আজ ইতিহাসের সাক্ষী। এর অতীতও গৌরবোজ্জ্বল। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রেসক্লাবের জন্ম যেভাবে হয়েছে খুলনা প্রেসক্লাবের জন্মও এর ব্যতিক্রম নয়। কয়েকজন হাতেগোনা সাংবাদিক ১৯৫৯ সালে খুলনা প্রেসক্লাব স্থাপন করেন। সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য মরহুম জহুরুল হক সরদারের বাড়ির কক্ষ থেকে অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে, অনেক ঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়ে খুলনা প্রেসক্লাব বর্তমানে নিজস্ব ভবনে পদার্পণ করে সগৌরবে বৃহত্তম অবয়বে অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময়ের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সামাজিক, রাজনৈতিক, সংস্কৃতিগত ও খুলনার উন্নয়নে খুলনা প্রেসক্লাবের সদস্যদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। আজ খুলনা প্রেসক্লাব ঐতিহ্যবাহী গৌরবময় ধ্যানধারণার বাহক হিসেবে দেশবাসীর কাছে সুপরিচিত। গণতন্ত্র, সুশাসন, সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবাধিকার ও এতদঞ্চলের উন্নয়ন-অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এই প্রেসক্লাব।

খুলনা প্রেসক্লাব মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং ঐতিহ্যগত সংস্কৃতিকে ধারণের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে ‘স্বাধীনতার রক্ত সিঁড়ি’ শীর্ষক ১২৭ ফুট দীর্ঘ পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ ভাস্কর্য স্থাপন করে। এই টেরাকোটা ভাস্কর্য ৫২’র

ভাষা আন্দোলন থেকে ৭১'র এর স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজিত বর্বর পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান বিমূর্তরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। এর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাচ্ছে এবং সর্বস্তরের মানুষের কাছে তা মুক্তিযুদ্ধের শৈলী দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এটি উদ্বোধন করেন। সুযোগ-সুবিধার দিক দিয়ে এই প্রেসক্লাব জাতীয় প্রেসক্লাবের চেয়ে খুব বেশি পিছিয়ে নেই। এই প্রেসক্লাব শুরু থেকেই সাংবাদিকদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য এবং ভ্রাতৃত্ব বজায় রেখে একটি আধুনিক, নিরপেক্ষ ও সাধারণ মানুষের প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে খুলনা প্রেসক্লাবের স্থায়ী সদস্য সংখ্যা-৯৮জন এবং ইউজার সদস্যের সংখ্যা-২৭জন। খুলনা প্রেসক্লাবের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী খুলনায় দায়িত্বপালনকারী জেলা প্রশাসকগণ খুলনা প্রেসক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে মর্যাদা পেয়ে থাকেন। খুলনা প্রেসক্লাবের জন্মলগ্নে বিশেষ অবদান রাখার কারণে এই গঠনতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

খুলনা প্রেসক্লাব ভবনে পেশাজীবী সাংবাদিকদের সংগঠন খুলনা সাংবাদিক ইউনিয়ন (কেইউজে) এবং মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়ন-এর (এমইউজে) পৃথক পৃথক অফিস রয়েছে। এই দুটি প্রতিষ্ঠান পেশাজীবী সাংবাদিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও খুলনা প্রেসক্লাব ভবনে বিভাগীয় প্রেসক্লাব ফেডারেশনেরও অফিস রয়েছে।

উপজেলা প্রেসক্লাব

খুলনা মহানগরীর বাইরে খুলনা জেলার উপজেলা পর্যায়ে এখন বিভিন্ন পত্রপত্রিকার অনেক সাংবাদিক কর্মরত আছেন। এসব উপজেলার সবগুলোতেই প্রেসক্লাব রয়েছে। ১৯৮৫ সালে বটিয়াঘাটা, ১৯৯৭ সালে দাকোপ, ১৯৮০ সালে ডুমুরিয়া, ১৯৮৩ সালে তেরখাদা, ১৯৭৯ সালে ফুলতলা, ১৯৯০ সালে দিঘলিয়া, ১৯৮৪ সালে পাইকগাছা ও ১৯৯১ সালে কয়রা পাইকগাছা প্রেসক্লাব স্থাপিত হয়।

সাময়িক পত্র

তথ্যসূত্র: বৃহত্তর খুলনার একশ' একত্রিশ বছরের সাময়িক পত্র (১৯৭১-২০০২) (গবেষণাপত্র), লেখক: গোলাম মোস্তফা সিন্দাইনী।

স্মারক, সম্পাদক, এ কে হিরু, খুলনা প্রেসক্লাব, খুলনা। প্রকাশকাল: ১০ মে, ২০০২।

অধ্যায়-২৫

সমস্যা ও সম্ভাবনা

বিশ্বঐতিহ্য সুন্দরবন, হযরত খানজাহান আলীর পবিত্র পদচারণাধন্য বাগেরহাট এবং বঙ্গোপসাগর সন্নিহিত মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত খুলনা। একদিকে বিভাগীয় সদর, অন্যদিকে কাঁচামালের অফুরন্ত প্রাচুর্যের কারণে এখানে গড়ে উঠেছে অনেক বড়ো বড়ো শিল্প ও কলকারখানা। অদূরে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর 'মোংলা বন্দর'। বর্তমানে খুলনা শহর দেশের এগারোটি সিটি করপোরেশনের মধ্যে একটি। সব মিলিয়ে খুলনা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জনপদ, অপার সম্ভাবনাময় ভূখণ্ড। গৌরবান্বিত ঐতিহ্য নিয়ে আধুনিকতার ছোঁয়ায় খুলনা যেমন উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে তেমনি এর অগ্রযাত্রায় ছোটো-বড়ো নানা সমস্যা ও বাধার দুর্লঙ্ঘ্য দেওয়াল তৈরি করছে। এ সমস্ত সমস্যা নিম্নে দেওয়া হলো:

খুলনা শহরের সমস্যা:

অপরিকল্পিত নগরায়ন

খুলনা জেলার বিকাশকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। এর মধ্যে প্রথমপর্যায় হলো ১৮৮২ সাল থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত। এ সময় খুলনা জেলার জনসংখ্যা প্রায় স্থিতিশীল ছিল। জেলাশহর হিসেবে খুলনার গুরুত্বও ছিল কম। সাধারণ ছোটো জেলাশহরের মতোই ছিল এর পরিচিতি। তখন এটি সাধারণ জেলাশহর ও নদীবন্দর হিসেবেই গুরুত্ব পেত। এরপর কয়েকটি যুগান্তকারী ব্যাপার ঘটে যা এর লোকসংখ্যাকে হঠাৎ করে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। প্রথমত ভারত থেকে মোহাজেরদের আগমন এবং দ্বিতীয়ত শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠা এগুলোর মধ্যে অন্যতম। ১৯৪৭- এর পরে এর দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। ১৯৪৭-এর আগে এ এলাকা ছিল কলকাতা বন্দরের ওপর নির্ভরশীল। ১৯৪৭ সালের পর দেশের এ অঞ্চলে আর একটা বন্দর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ১৯৫০ সালের ১১ ডিসেম্বর ব্রিটিশ জাহাজ 'সিটি অব লিয়নস' নামক জাহাজের নোঙরের মাধ্যমে মোংলা বন্দরের সূচনা হয়। ১৯৫২ সালে মোংলা থেকে এটি খুলনা জেলার দাকোপের চালনায় স্থানান্তর করা হয়। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত তা পরিচিত ছিল চালনা অ্যাংকোরেজ নামে। পরে মোংলায় স্থানান্তরিত হয় এবং নাম দেওয়া হয় মোংলা বন্দর। এ বন্দরের সদর দফতর স্থাপিত হয় খুলনা শহরে। এতে খুলনা শহরের গুরুত্ব বেড়ে যায়। শহরটি পায় একটি আন্তর্জাতিক পরিচিতি। ১৯৬০ সালে খুলনাকে পৃথক বিভাগ ঘোষণা করা হয়। বিভাগের সদর দপ্তর স্থাপন করা হয় খুলনা শহরে। এতে এ শহর লাভ করে নতুন মর্যাদা।

১৯৬১ সালে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের গভর্নরের এক অর্ডিন্যান্স বলে শহরকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (KDA) নামের একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা গঠিত হয়। খুলনা শহর সম্প্রসারণের ইতিহাসে ঘটে নতুন যুগের সূচনা। KDA শুরুতেই পরিকল্পিত শহর গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি

মাস্টারপ্ল্যান তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। লন্ডনের বিখ্যাত শহর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান বা টাউন প্ল্যানিং কনসালটিং ফার্ম - 'মেসার্স মিনপ্রিও স্পেনসলে অ্যান্ড পি ডাব্লিউ ম্যাকফরলেন'কে দিয়ে এ পরিকল্পনা করানো হয়। এ মাস্টারপ্ল্যানের বাস্তবায়নকাল ধরা হয় ২০ বছর। এই কর্মযজ্ঞ শুরু হওয়ার ৫০/৫৫ বছর পর আজও পরিকল্পনার অন্তর্গত সব প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যায়নি। কেডিএর তথ্য অনুযায়ী, মাত্র এক চতুর্থাংশই বাস্তবায়িত হয়েছে। বাস্তবায়নের সবচেয়ে বড়ো বাধা ছিল লোকসংখ্যা ধারণাতীতভাবে বেড়ে যাওয়া, তহবিলের অভাব, যথাসময়ে মাস্টারপ্ল্যান মূল্যায়িত না হওয়া, বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ইত্যাদি। যখন এ পরিকল্পনা তৈরি করা হয় তখন শহরের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ১ লাখ ২৮ হাজার। ধরা হয়েছিল ২০ বছর পর অর্থাৎ ১৯৮১ সালে এই শহরের জনসংখ্যা দাঁড়াবে ২.৩৫ লাখে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় ১৯৭৪ সালেই শহরের জনসংখ্যা হয়ে যায় ৫.২২ লাখ। ১৯৫১ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত এই ২৪ বছরের খুলনা শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল সবচেয়ে বেশি। এত দ্রুত জনসংখ্যা এ পর্যায়ে এসে দাঁড়াবে তা তাদের পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব হয়নি। উপরন্ত উপর্যুক্ত মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন ছিল প্রচুর অর্থের। সদ্য স্বাধীন দেশে সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে প্রয়োজনীয় অর্থ তাদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব হয়নি। এটাও মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে একটা বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

ওই সময় এ প্লান তৈরি করা হয়েছিল ক্যাডেস্ট্রাল সার্ভের ওপর ভিত্তি করে। এতে বিস্তারিতভাবে কোথায় আবাসিক এলাকা হবে, কোথায় শিল্প এলাকা হবে, কোথায় শিল্প প্রতিষ্ঠান থাকবে তা সব দেখানো হয়েছিল মৌজা ম্যাপের ওপর ভিত্তি করে। তবে নগরপরিকল্পনায় এ পদ্ধতি এখন অচল। এখনকার নগর পরিকল্পনাবিদগণ স্ট্রাকচারাল প্ল্যানের ওপর ভিত্তি করে নগর পরিকল্পনা করেন। তা না হলে নগরায়নের ধারা ব্যাহত হয়। ওই সময় আরেক সমস্যা ছিল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। নগর উন্নয়নের ধারাকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে যৌথ কাঠামো চাই। প্রত্যেক শহরে সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত মিলিয়ে একাধিক সংস্থা নগর উন্নয়নের জন্য কাজ করে। ঢাকায় যেমন সিটি করপোরেশন, রাজউক, ওয়াসা, ডেসা প্রভৃতি। খুলনায় রয়েছে কেডিএ, সিটি করপোরেশন, পিডিবি, টেলিফোন সংস্থা প্রভৃতি। এদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব নগরায়নের ধারাকে ব্যাহত করে। সরকারের তরফ থেকে সমন্বয় সাধনের ঘাটতি ছিল। ওপরন্তু উপর্যুক্ত মহাপরিকল্পনাতেও এসব সংস্থার মধ্যে সমন্বিত কাজের প্রক্রিয়া সৃষ্টির উপরেও বিশেষ কোনো জোর দেওয়া হয়নি। গত ৫৩ বছরে খুলনা শহরের প্রথম মাস্টারপ্ল্যানের কোনো পরিবর্তন বা সংশোধন করা হয়নি। অথচ গত পাঁচ দশকে জনসংখ্যা বেড়েছে অস্বাভাবিক হারে।

জেলার জনজীবনে খুলনা শহরের প্রভাব খুব বেশি। কলকারখানা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস আদালত, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের কেন্দ্রসমূহ সবই খুলনায় অবস্থিত। বাইরে থেকে এসেছে মোহাজেররা, শিল্পাঞ্চলে জড়ো

হয়েছে শ্রমিক-কর্মচারী, রাস্তায়-বস্তিতে উপচে পড়েছে গ্রামের কর্মহীন আশ্রয়হীন দরিদ্র মানুষ। মানুষের আগ্রহ থাকে বড়ো কিংবা বিভাগীয় শহরে কর্ম বা আশ্রয় খোঁজায়। এ কারণে কাছাকাছি অন্যান্য উপজেলা শহরগুলোর তুলনায় খুলনা শহরের জনসংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গেছে। দেশের উন্নতির সহজ প্রচলিত মাপকাঠি হচ্ছে দেশের মোট জনসংখ্যার তুলনায় নগরায়িত জনসংখ্যার পরিমাণ। যে কোনো জেলা বা শহরের জনসংখ্যাকে বাড়তে হবে পরিকল্পিতভাবে, জাতীয় অর্থনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, ধাপে ধাপে। তবে এখানে তা ঘটেনি। তাই সেখানে বর্ধিত জনসংখ্যার উপযোগী পরিকাঠামো তৈরি হয়নি, বাড়েনি গৃহসংস্থানসহ অন্যান্য নাগরিক সুযোগ-সুবিধা। তাই নগরবাসী বা জেলাবাসী বিভিন্ন ধরনের ভৌত ও সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। মহাপরিকল্পনাও তাল মেলাতে না পেরে মুখ থুবড়ে পড়েছে।

রাস্তাঘাটের গুরুত্ব অপরিসীম। শহরে বা জেলায় বসবাসের স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌন্দর্য অনেকাংশে নির্ভর করে রাস্তাঘাটের ওপর। জেলা স্থাপনের শুরুতে শহরের সঙ্গে বাইরের সড়ক যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল যশোর রোড। এটি একটি ঐতিহ্যবাহী সড়ক। আর ছিল হাতেগোনা কয়েকটি অভ্যন্তরীণ রাস্তা। পরে শহর যত বড়ো হয়েছে রাস্তা তত বেড়েছে। তবে এসব রাস্তা পরিকল্পিতভাবে তৈরি হয়নি। জনসাধারণের স্বাভাবিক হাঁটাচলার মধ্য দিয়ে রাস্তা তৈরি হয়েছে। পরে তাকে পাকা করা হয়েছে। দু-একটি রাস্তা পরিকল্পিতভাবে তৈরি হলেও দেশের তৃতীয় বৃহত্তম নগরীর সঙ্গে তা মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। মোট ৪৫.৬৫ বর্গকিলোমিটার আয়তনবিশিষ্ট নগরীতে মোট ৮৮৪টি রাস্তা রয়েছে। এগুলোর মোট দৈর্ঘ্য ২৭৯.৪৪ কিলোমিটার। এর মধ্যে কাঁচা রাস্তা ৩২.৭৯ কি.মি.। যে কোনো নগরীর মোট আয়তনের ২৫ শতাংশ রাস্তা থাকা উচিত। কিন্তু খুলনা শহরে রাস্তা আছে বেশি হলে ৫/৬ শতাংশ। এদিকে শহরে যানবাহনের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। প্রতিবছর প্রচুর নতুন যানবাহন রাস্তায় নামছে। তবে সেসব যানবাহনের বিপরীতে রাস্তার পরিমাণ মোটেই বাড়ছে না। তারপর সেসব রাস্তাতেও রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা। যেমন ফুটপাত হকারের দখলে চলে যাওয়া, রিকশার সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি, ট্রাফিক ব্যবস্থার অবনতি, যেখানে সেখানে গাড়ি পার্কিং প্রভৃতি।

শহরের আবাসন সমস্যা

খুলনা জেলার বড়ো একটি সমস্যা হচ্ছে আবাসন সমস্যা। পরিকল্পিত আবাসন ব্যবস্থা না থাকায় যত্রতত্র বসতবাড়ি নির্মাণ করে বর্তমান জনসংখ্যার চাপ সামলানোর চেষ্টা চলছে। এছাড়া ভাসমান মানুষের চাপে বাড়ছে বস্তির সংখ্যা। প্রকৃত বস্তি তো আছেই- তারপর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ ও আবাসন ব্যবস্থার প্রত্যাশিত সম্প্রসারণ না ঘটায় কিছু ঘিঞ্জি এলাকা ক্রমশ রূপ নিচ্ছে আধুনিক বস্তিতে। ফলে যত দিন যাচ্ছে ততই ঘটছে 'আধুনিক বস্তি' সম্প্রসারণ। এতে পরিবেশের ওপর যেমন বিরূপ প্রভাব পড়ছে তেমনি নগরের সৌন্দর্যহানি ঘটছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, খুলনা শহরে গৃহায়ন সমস্যা সমাধানের জন্য অবিলম্বে ২৫ হাজার হাউজিং ইউনিট গড়ে তোলা দরকার। শহরে গড়ে ওঠা

বাণিজ্যিক এলাকাও বর্তমানে স্থানাভাবে ভারাক্রান্ত। বর্ধিষ্ণু এ মহানগরীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের চাহিদা মেটানোর জন্য নতুন বাণিজ্যিক এলাকা গড়ে তোলা জরুরি। সঙ্গে সঙ্গে চাই শিক্ষাপ্রকল্প, স্বাস্থ্য প্রকল্প, পার্ক, খেলার মাঠ, ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণ, লেক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রভৃতি নির্মাণের কর্মসূচি।

শহরের ড্রেনেজ ব্যবস্থা খুলনা শহরের ড্রেনেজ ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ। সামান্য বৃষ্টি হলেই নগরী বা খুলনা জেলার আশেপাশে বিভিন্ন স্থানে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে।

সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অভাব আধুনিকযুগে নগর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও দক্ষ প্রশাসন। নগর যত সম্প্রসারিত হয় সমস্যা তত বেশি হয়। খুলনা শহরও ব্যতিক্রম নয়। এর কারণ, সুচিন্তিত পরিকল্পনার অভাব ও প্রশাসনিক অদক্ষতা। বর্তমানে খুলনা মহানগরীর লোকসংখ্যা তেইশ লক্ষাধিক। শহরের আয়তন মাত্র ৪৫.৬৫ বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে শহর এলাকা ধরা হয় ৩৯ বর্গ কি.মি. এবং বাকি ৬.৬৫ বর্গকিলোমিটার চিহ্নিত করা হয় শহরতলী হিসেবে। এখানকার নাগরিকেরা মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত। অতি প্রশস্ত রাস্তাঘাট, প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাড়িঘর, অত্যাধুনিক পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, উপযুক্ত ফুটপাত, ওভারব্রিজ, ফ্লাইওভার, জনগণের জন্য সুষ্ঠু যাতায়াত ব্যবস্থা, উন্নত ধরনের বিপণিকেন্দ্র, আধুনিক আলোর ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত গণশৌচাগার, সর্বত্র আবর্জনা ও দুর্গন্ধমুক্ত পরিবেশ, পর্যাপ্ত পরিমাণ উন্মুক্ত স্থান, পার্ক, জনগণের সামর্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিনোদন ব্যবস্থা, সব ধরনের শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ, চিকিৎসার জন্য আধুনিক হাসপাতাল, ক্লিনিক প্রভৃতি একটি আধুনিক আদর্শ শহরের অপরিহার্য উপাদান। এসব বিষয় নিশ্চিতকরণে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

বস্তি সমস্যা বস্তি সমস্যা খুলনা মহানগরীর এক প্রধান সমস্যা। সমাজে আয় এবং বণ্টনের ব্যবস্থা যেসব দেশে চূড়ান্ত অসম পর্যায়ে পর্যবসিত সেখানেই বস্তির প্রাধান্য। বাংলাদেশের প্রধান তিনটি শহর- ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা। এর মধ্যে ঢাকা চট্টগ্রামের মতো খুলনা শহরেও ব্যাপকভাবে বস্তির বিস্তার রয়েছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত ‘বস্তি শুমারি’ ১৯৮৬ অনুযায়ী খুলনা শহরে বস্তিবাসীর সংখ্যা ছিল ২৪,৫৬৩ জন, ১৯৯৭ সালের বস্তি শুমারি অনুসারে বস্তিতে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা ছিল ১৮,১৮৪ জন এবং ২০১৪ সালের বস্তি শুমারি অনুযায়ী খুলনা শহরে মোট বস্তির সংখ্যা ১,১৩৪টি। এতে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা ২০,৬৫৮ জন। খুলনা শহরের বস্তিগুলো হলো- রূপসা বস্তি, উত্তর মুজগুন্নি বস্তি, শেখপাড়া মেইন রোড বস্তি, শহিদ আব্দুল সড়ক বস্তি, মুন্সিপাড়া কলাবাগান বস্তি, বয়রা সড়ক ভবন বস্তি, কদমতলা রেলওয়ে বস্তি, মক্কী মসজিদ রোড বস্তি, ক্রিসেন্ট কাঁচা লাইন বস্তি, ক্রিসেন্ট সুগন্ধা কলোনি বস্তি, প্লাটিনাম গেট রেলওয়ে বস্তি, বাইতিপাড়া বস্তি, কাশিপুর বস্তি, তেঁতুলতলা বস্তি, জোড়াগেট বস্তি, জোড়াগেট কাঁচাবাজার বস্তি, শেখপাড়া বস্তি, গোবরচাকা বস্তি, আলমনগর বস্তি, সোনাডাঙ্গা বস্তি, বাগানবাড়ী বস্তি,

খালিশপুর ৩নং খ্যামা বস্তি, খালিশপুর ১ নং খ্যামা বস্তি প্রভৃতি। বাংলাদেশের উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BIDS) এর মতে, খুলনা শহরের বস্তিবাসীর মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ বৃহত্তর খুলনা ও তৎসংলগ্ন এলাকার মানুষ। বাকি অন্যান্য স্থানের। এদের মধ্যে অধিকাংশেরই আদি নিবাস বরিশালে। বস্তিবাসীরা নাগরিক সুবিধাবঞ্চিত।

নদীভাঙন

খুলনা জেলার এক বড়ো সমস্যা নদীভাঙন। ভৈরব নদের অব্যাহত ভাঙনে বড়োবাজারসহ শহরের এক বিস্তীর্ণ এলাকা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে তা রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। বড়ো বাজারের বহু দোকানপাট ইতোমধ্যে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। যা টিকে আছে তাও মারাত্মক হুমকির মুখে।

নদীনদীর নাব্যতা হ্রাস

এ জেলায় বর্তমানে নদনদীগুলোকে বহমান রাখাই প্রধান চ্যালেঞ্জ। জেলার মরা নদনদীগুলো নৌচলাচলে কোনো প্রকার সাহায্য করে না বরং এগুলো ভরাট হয়ে যাওয়ায় খাসজমি হিসেবে বেদখলের অশুভ তৎপরতা চোখে পড়ার মতো। মরা নদনদীগুলোকে বহমান করার লক্ষ্যে দুরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রথমত, নদীর দুই তীরে বাঁধ নির্মাণ করে মধ্যবর্তী স্পিল এলাকা বা প্রবাহ পথের পরিসর বৃদ্ধি করে অথবা বহমান কোনো নদীর সাথে মরা নদী যুক্ত করে জেলায় নদনদীর উন্নয়ন করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, জোয়ারের পানি নদী অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে নদীকে যান চলাচলের উপযোগী করা যেতে পারে, তবে এতে কৃষি জমিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধির ঝুঁকি থেকে যায়। মরা খাল বা নতুন খাল খনন নদীগুলোকে বহমান রাখার বিকল্প উপায়। নাব্যতা হ্রাস পাওয়া নদনদীগুলোর ড্রেজিং করে নাব্যতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। নদনদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করা গেলে জেলার কেন্দ্রে ও পশ্চিমভাগে লবণাক্ত জোয়ার প্রতিরোধ এবং পূর্বাংশে জলাবদ্ধতার প্রকট সমস্যা সহজে সমাধান করা যাবে।

রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল

খুলনায় একটা রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (EPZ) তথা রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল গঠনের দাবি দীর্ঘদিনের। খুলনায় রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (EPZ) স্থাপনের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান। ১৯৮০ সালে আইন পাসের মাধ্যমে প্রথম রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল স্থাপন করা হয় চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামের সাফল্যের পর দ্বিতীয় রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (EPZ) মোংলায় স্থাপন করা হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ওই সময় তা বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। খুলনার দাবিকে উপেক্ষা করে ঢাকা ও চট্টগ্রামে একাধিক রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (EPZ) স্থাপন করা হয়েছে। খুলনা বঞ্চিত রয়ে গেছে। বর্তমানে এ বিষয়ে যে যৎকিঞ্চিৎ আশার আলো দেখা যাচ্ছে তা হলো ১৯৯৮ সালের ২৩ মে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মোংলায় রফতানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। খুলনা শহর থেকে ৪২ কি.মি. দক্ষিণে পশুর নদীর তীরে পরিকল্পনাধীন এ রফতানি প্রক্রিয়াকরণ

অঞ্চল (EPZ) এর জমির পরিমাণ ৪৬০ একর। এতে শিল্প প্লট হবে ১৬২টি। তবে এর কাজ এখনও শেষ হয়নি।

সুপেয় পানির অভাব দাকোপ, কয়রা ও পাইকগাছা উপজেলায় সুপেয় পানির তীব্র সংকট রয়েছে। লবণাক্ততার ক্রমবৃদ্ধি এ সমস্যা আরও প্রকট করে তুলেছে। পানির চাহিদা অগভীর নলকূপ থেকে কোনোমতে পূরণ হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় নলকূপের পানিতে মাত্রাতিরিক্ত লবণাক্ততা থাকায় তা পানের উপযোগী নয়।

পর্যটন সমস্যা বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন ভ্রমণের একমাত্র মাধ্যম নৌযান। এখনও একে সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্কের মধ্যে আনা সম্ভব হয়নি। ভ্রমণকারীদের সহায়তা করার জন্য পর্যটন করপোরেশনের কোনো দপ্তরও খুলনায় স্থাপন করা হয়নি। এ কারণে সুন্দরবনে প্রত্যাশার চেয়ে কম পর্যটক ভ্রমণ করেন। সুন্দরবনকে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করতে গেলে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় সুবিধাসহ আবাসিক সুযোগ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও বন্যপ্রাণি পর্যবেক্ষণের পর্যাপ্ত সুবিধা ইত্যাদি। এ বনের উৎপত্তি, আয়তন, নামকরণ, বৃক্ষ-বৈচিত্র্য, ভূ-প্রকৃতি, জীবজন্তু, মৎস্যসম্পদ, নদী-নালা বিষয়ে অনেক কিছু জানার আছে যা পর্যটকদের ভ্রমণোপলব্ধির জন্য খুবই জরুরি। শুধু বিষয় অভিজ্ঞতাই নয় বিদেশিদের বোঝানোর জন্য রাখতে হবে বিদেশি ভাষায় অভিজ্ঞ দক্ষ গাইড। তাহলেই কেবল সুন্দরবন হয়ে উঠতে পারবে পর্যটকদের কাছে মোহনীয় ও আকর্ষণীয় এবং বিশ্বের পর্যটন মানচিত্রে বাংলাদেশ লাভ করবে এক লোভনীয় গন্তব্যস্থল।

বিবিধ সমস্যা ১) ঢাকার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, ২) পরিবেশ, শব্দদূষণ ও বায়ুদূষণ সমস্যা, ৩) লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা, ৪) প্রাকৃতিক গ্যাসের অভাব, ৫) অপরিকল্পিত নগরায়ণ, ৬) মৃত শিল্পনগরী, ৭) উন্নত ও আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, ৮) বিশ্বমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব, ৯) দারিদ্র্য ও বৈষম্যবৃদ্ধি, ১০) আধুনিক নগরায়ণের সুযোগ-সুবিধার অভাব, ১১), অবৈজ্ঞানিক ও অপরিকল্পিত চিংড়িচাষ, ১২) তথ্যপ্রযুক্তির বিস্তারে ধীরতা, ১৩) খুলনার সমস্যা উত্তরণে গবেষণার অভাব, ১৪) বিমানবন্দরের অভাব, ১৫) দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের অভাব, ১৬) বিদ্যুতের সমস্যা ও ১৭) উন্নত রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব।

সম্ভাবনা খুলনা জেলার উন্নয়নের সম্ভাবনা অপরিসীম। প্রস্তাবিত পদ্মা সেতু বাস্তবায়িত হলে রাজধানী ঢাকার সঙ্গে খুলনার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে। অন্যান্য বিভাগীয় শহর থেকে সবচেয়ে কম দূরত্ব হবে ঢাকার সঙ্গে খুলনার। মাত্র তিন থেকে সাড়ে চার ঘণ্টায় খুলনা থেকে ঢাকায় যাওয়া-যাবে। মোংলা বন্দর সচল ও গতিশীল হবে। তখন বন্দরকেন্দ্রিক ব্যাবসা এ অঞ্চলে উন্নয়নের নতুন যুগের সূচনা করবে।

চিংড়িচাষ ও চিংড়ি রফতানি

খুলনা শহরের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে হিমায়িত খাদ্য তথা মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানাগুলো একটা বড়ো স্থান দখল করে আছে। বর্তমানে এগুলোর সংখ্যা প্রায় ৩৫/৪০টি। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলো পালন করছে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। হিমায়িত খাদ্য তথা মৎস্যজাত পণ্য বর্তমানে দেশের একটা উল্লেখযোগ্য রফতানিপণ্য। শতকরা ১০০ ভাগ রফতানিমুখী এ শিল্প সম্পূর্ণ দেশজ কাঁচামালনির্ভর। রফতানি বাণিজ্যে এর স্থান চতুর্থ। এই হিমায়িত খাদ্যের ৯০ ভাগই চিংড়ি। চিংড়ি আজ আর শুধু চিংড়ি নয় তা আজ সাদা সোনা। আজ দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ রূপালি ডলার। একমাত্র চিংড়ি রফতানি করেই বর্তমানে দেশে আসছে কোটি কোটি টাকা। এক হিসেব থেকে জানা যায়, মোট জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় সাড়ে তিন ভাগ এবং রফতানি আয়ের মোট ১২ শতাংশ আসে এ খাত থেকে। এ খাতের প্রধান স্থানজুড়ে রয়েছে চিংড়ি।

চিংড়ি রফতানির ক্ষেত্রে দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় খুলনার ভূমিকা অগ্রগণ্য। সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে খুলনা চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রেও পথিকৃৎ। বর্তমানে রফতানিযোগ্য চিংড়ির প্রায় ৭৫ ভাগই উৎপাদিত হয় বৃহত্তর খুলনায়। বর্তমানে দেশে প্রায় ১ দশমিক ১৫ লাখ হেক্টর জমিতে চিংড়ির চাষ হচ্ছে বলে জানা যায়। বৃহত্তর খুলনা জেলাতেই ৬৫ হাজার হেক্টর জমিতে চিংড়ির চাষ হচ্ছে। এখানে রয়েছে চার হাজারেরও বেশি ঘের।

হিমায়িত খাদ্য প্রক্রিয়াজাত কারখানাগুলোর মধ্য দিয়ে অলিখিতভাবে খুলনায় এক একটা চিংড়ি শিল্প অঞ্চল গড়ে ওঠে। শুধু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন নয় স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও এ শিল্পের অবদান অনেক বেশি। বর্তমানে চিংড়ি উৎপাদনের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি হলো আধানিবিড় (সেমি ইনটেনসিভ) পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে চিংড়িচাষ করে উৎপাদন অনেক বাড়ানো সম্ভব। এতে জায়গাও লাগে খুব কম। বর্তমানে এ পদ্ধতি সারা বিশ্বে খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। পৃথিবীর অধিকাংশ চিংড়ি উৎপাদনকারী দেশে এ পদ্ধতিতে চিংড়িচাষ হচ্ছে। খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরার অনেক ঘের মালিক এ পদ্ধতিতে চিংড়িচাষ করছেন। এতে মাছও পাওয়া যাচ্ছে প্রচুর, প্রায় ২৫/৩০ গুণ।

উপকূলীয় অঞ্চলে লোনা পানির মাছ ও চিংড়ির গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য খুলনার পাইকগাছায় মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ-এর অধীন একটা গবেষণা উপকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। উক্ত কেন্দ্রে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি গবেষণার কাজও করা হচ্ছে। এর উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত হয়েছে মেরিন বায়োলজি ডিসিপ্লিন। এই বিশ্ববিদ্যালয় চিংড়িচাষের ওপর আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা বিস্তার করে দক্ষ জনশক্তি তৈরিসহ নতুন নীতিপদ্ধতি আবিষ্কারের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার চেষ্টা করছে।

চিংড়িচাষের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও এ-সংক্রান্ত নানাবিধ কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য ঢাকায় মৎস্যভবনে একটি কেন্দ্রীয় সেল এবং খুলনা ও কক্সবাজারে দুটি আঞ্চলিক চিংড়ি বিষয়ক সেল গঠন করা হয়েছে। মোটকথা চিংড়ি চাষ ও তার প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা খুলনায় ব্যাবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা করেছে। এই অমিত সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহার খুবই জরুরি।

মোংলা বন্দরের সম্ভাবনা

খুলনা শহর থেকে ৪৫ কিলোমিটার দক্ষিণে বাগেরহাট জেলার মধ্যে মোংলা ও পশুর নদীর সংগমস্থলে মোংলা বন্দর অবস্থিত। নৌপথে মোংলাকে রাজধানীর কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার জন্য ১৯৭০-৭২ সালে মোংলা-ঘষিয়াখালি খাল কাটা হয়। এতে মোংলা, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের নৌ-দূরত্ব ২২৫ মাইল থেকে ১৭০ মাইলে নেমে আসে। স্থলপথে দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে মোংলার কোনো যোগাযোগ ছিল না। মোংলা থেকে মালামাল খুলনা নেওয়ার একমাত্র মাধ্যম ছিল নৌপথ। এতে সময় লাগতো অনেক বেশি, প্রায় ৬/৭ ঘণ্টা। এ অসুবিধা দূরীকরণার্থে এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)-এর সাহায্যে নির্মাণ করা হয় খুলনা-মোংলা মহাসড়ক। এ সড়ক এক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা করে। এতে খরচও পড়েছে অনেক কম। ফলে মোংলা বন্দরের গুরুত্বও অনেক বেড়ে গেছে। রূপসা সেতুর কারণে এ বন্দর আরও সম্ভাবনাময় হয়ে উঠেছে। ঢাকা-মাওয়া সড়ক হওয়াতে ঢাকার সঙ্গে মোংলার দূরত্ব অনেক কমে গেছে। প্রস্তাবিত পদ্মাসেতু বাস্তবায়িত হলে ঢাকা থেকে মোংলায় যেতে সময় লাগবে মাত্র ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা। এটা হলে এ বন্দরের গতিশীলতা আরও বাড়বে। উন্নয়ন ও যোগাযোগের যুগপৎ এক নীরব বিপ্লব এখানে সংঘটিত হবে।

পদ্মা সেতু বাস্তবায়িত হলে দক্ষিণাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার যেমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে, তেমনি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও বহুগুণে বেড়ে যাবে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ও ভারত সমুদ্রপথে পণ্য আমদানি-রফতানির বিষয়ে একমত হয়েছে। এক্ষেত্রে চট্টগ্রামের চেয়ে মোংলা বন্দরই হবে অধিক সুবিধাজনক। একই সঙ্গে আঞ্চলিক ট্রানজিট বাস্তবায়িত হলে নেপাল ও ভুটান মোংলা বন্দর দিয়ে তাদের পণ্য আনা-নেওয়া করতে পারবে। স্থলবেষ্টিত দেশ দুটি বর্তমানে পণ্য আমদানি-রফতানির জন্য শুধু ভারতীয় সমুদ্রবন্দরই ব্যবহার করে থাকে।

দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও বাণিজ্যিক লেনদেনের সুবিধার জন্যই দেশের দ্বিতীয় সমুদ্রবন্দরটি সচল রাখা এবং এর উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা জরুরি। ইতোমধ্যে মোংলা বন্দরের অবকাঠামো উন্নয়নে বহুমুখী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

মোংলা বন্দরের বর্তমান উদ্যোগ

০১.	বর্তমান জনবল	১২৬৩ জন	
০২.	বার্দিং সুবিধা:		
	নিজস্ব জেটি	৬টি	
	মুরিং সুবিধা	৭টি	
	প্রাইভেট জেটি	৭টি	
	অ্যাকোরেজ সুবিধা	১৫টি	
০৩.	কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি:		
	স্ট্যাডেলা ক্যারিয়ার	৬টি	
	ফর্ক লিফট	১৮টি	
	ডক সাইড	৩টি	
	টার্মিনাল ট্রাক্টর অ্যান্ড ট্রেইলর	১৬টি	
	মোবাইল ক্রেন	৬টি	
	বীচ স্ট্র্যাকার	৬টি	
০৪.	সহায়ক জাহাজ:		
	টাগ বোট	৩টি	
	ফায়ার ফাইটার টাগ	১টি	
	পাইলট লঞ্চ	৩টি	
	পাইলট ডেসপাচ লঞ্চ	৪টি	
	সার্ভে ভ্যাসেল	২টি	
	মুরিং বোট	৪টি	
	বয়া টেন্ডার ভ্যাসেল	১টি	
	হাইস্পিড বোট	২টি	
	ওয়াটার বার্জ	৩টি	
	ড্রেজার	২টি	
	ক্রেন বোট	২টি	
	টাগ বোট	২টি	
	হাউজ বোট	২টি	
০৫.	গুদামজাতকরণ সুবিধা:		
	ট্রানজিট শেড	৪টি	
	ওয়ার হাউজ	২টি	
	কন্টেইনার ইয়ার্ড	৪টি	
	কার ইয়ার্ড	২টি	
০৬.	পরিচালক কার্যক্রম:		
	জাহাজ হ্যান্ডলিং	৪৮২টি	
	মোট কার্গো হ্যান্ডলিং	৫৭.৯৬ মে. টন	(১৫.৮৭% বৃদ্ধি)
	আমদানি	৫৭.০৯ মে. টন	(২৭.৯৯% বৃদ্ধি)
	রফতানি	০.৮৭	(১৩.৮৬% হ্রাস)
	কন্টেইনার হ্যান্ডলিং	৪১৯৫৩ টি ইউজ	(০.৪৪% হ্রাস)
	গাড়ি হ্যান্ডলিং	১৫৫৫২ টি	(৩৬.৪৭% বৃদ্ধি)
	রাজস্ব আয়	১৯৫.২৩ কোটি টাকা	(১৪.৭৩% বৃদ্ধি)
	রাজস্ব ব্যয়	১৩০.৮২ কোটি টাকা	(১৯.৪৭% বৃদ্ধি)
	নিট সুনাফা	৬৪.৪১ কোটি টাকা	(৬.১৩% বৃদ্ধি)

পশুর নদীর নাব্যতা বাড়ানোর কাজ চলছে। একটি বন্দরের প্রতি দেশি-বিদেশি ব্যাবসায়ীরা তখনই আগ্রহ দেখাবেন, যখন স্বল্প সময়ে তাদের পণ্য খালাস ও পরিবহণের সুযোগ পাবেন। অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে ২০০৯ সাল থেকে এ বন্দর দিয়ে গাড়ি আমদানিও শুরু হয়েছে। এতে কিছুটা হলেও চট্টগ্রাম বন্দরের ওপর চাপ কমছে।

পর্যটনের সম্ভাবনা পর্যটন শিল্পে খুলনার রয়েছে এক বিরাট সম্ভাবনা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত বাংলাদেশের বহু উচ্চারিত জনপদের নাম খুলনা। ঐতিহাসিক নিদর্শনাদিও এখানে রয়েছে প্রচুর। এসব দিক দিয়ে দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় খুলনার অবস্থান স্বতন্ত্র। এর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করার মতো নানা ধরনের পর্যটন সম্পদ। খুলনা শহরকে বলা যেতে পারে এসব পর্যটন কেন্দ্রের প্রবেশদ্বার।

সুন্দরবনের কথা প্রথমে আসে। খুলনা শহর এ সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার। দেশি-বিদেশি পর্যটকদের তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো স্থান এই সুন্দরবন। বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার ২ হাজার ৬৮৮ বর্গমাইল এলাকাজুড়ে এ বন বিস্তৃত। এ বন প্রাকৃতিক সম্পদের অফুরন্ত উৎস। এটি পৃথিবীর একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট। উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের পাশাপাশি প্রাণীবৈচিত্র্যেরও অভূতপূর্ব সমাহার ঘটেছে এখানে। এ বনে রয়েছে ৩৫ প্রজাতির সরীসৃপ, ২৭০ প্রজাতির পাখি এবং ৪২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী। সুন্দরবনের সর্বাধিক আকর্ষণীয় প্রাণী বাঘ যা শিকার-ক্ষিপ্রতা ও রাজকীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য সারা বিশ্বে ‘রয়েল বেঙ্গল টাইগার’ নামে পরিচিত। ক্যাঙ্গারু বললে যেমন মানসপটে অস্ট্রেলিয়ার ছবি ভেসে ওঠে, উটপাখী বললে যেমন মরুময় পরিবেশের কথা মনে পড়ে, তেমনি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের নাম উচ্চারণ করলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে বাংলাদেশের কথা। এ বনের নৈসর্গিক সৌন্দর্যকে মহিমান্বিত করেছে সুদৃশ্য চিত্রা হরিণের উপস্থিতি। আর রয়েছে বৃক্ষাচ্ছাদিত নয়নাভিরাম দৃশ্যপট, সবুজের সমারোহ। অর্থাৎ সব মিলিয়ে সুন্দরবন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক বিরল লীলাভূমি, অন্তহীন রহস্যের আঁধার।

সুন্দরবন বাংলাদেশের এক অনন্য পর্যটন। সুদীর্ঘ ব্যাকুলতা নিয়ে দেশ বিদেশের অসংখ্য পর্যটক ও সুন্দরবনের নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগের জন্য শত সহস্র মাইল পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে আসেন। শুধু সুন্দর বলেই নয়, এর আকর্ষণের আরও একটা দিক রয়েছে। তা হলো এর ধ্যানমৌন নির্জনতা। আজ সারা বিশ্ব জুড়ে পর্যটকদের মধ্যে এক নতুন প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। এদের মধ্যে অনেকে আজ চিরাচরিত পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে যেতে চান না। তারা চান একাকিত্ব-যেখানে লোকের ভিড় নেই, আছে নিরুপদ্রবে ধ্যানমৌন শান্ত গম্ভীর নৈসর্গিক দৃশ্য অবলোকনের সুযোগ। সুন্দরবন দিতে পারে সেই অপার রহস্যের সন্ধান।

শুধু সৌন্দর্য নয়- পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যের জন্যও সুন্দরবন সুবিখ্যাত। উদ্ভিদ ও প্রাণিকূলের ব্যাপক বৈচিত্র্য। এত বিচিত্র ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর একই স্থানে

সহাবস্থান পৃথিবীর খুব কম বনেই চোখে পড়ে। সুন্দরবনের পরিবেশ, প্রতিবেদন ও জীববৈচিত্র্য শুধু বাংলাদেশের জন্যই নয়, সারা বিশ্বের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। তাই বলা হয় পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের জন্য সুন্দরবন হতে পারে অন্যতম জীবন্ত গবেষণাকেন্দ্র।

শিল্পে পুনরুত্থান

খুলনা জেলার বন্ধ শিল্পকারখানাগুলো সচল হলে এ এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক জীবনমান উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব। বন্ধ পাটকল, নিউজপ্রিন্ট ও হার্ডবোর্ড মিল পুনরায় চালু হলে অর্থনৈতিক উত্তরণে তা সহায়ক হবে। এছাড়া দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরিসহ অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালু হলে এসব কল-কারখানার শ্রমিকদের উন্নয়নের পাশাপাশি সরকারি সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবহারও সম্ভব হবে।

জেলা গেজেটিয়ার প্রণয়নসংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ

(গত ২৫/০৮/২০১৪ তারিখে গঠিত)

প্রধান উপদেষ্টা: মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

উপদেষ্টা:
সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ।
সিনিয়র সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।
সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ।
সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।
সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।
সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়।
সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

জেলা গেজেটিয়ার প্রণয়নসংক্রান্ত সম্পাদনা পরিষদ

(গত ২৫/০৮/২০১৪ তারিখে গঠিত)

প্রধান সম্পাদক: ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

নির্বাহী সম্পাদক: জনাব মো: নজিবুর রহমান, সচিব।

যুগ্ম-নির্বাহী সম্পাদক: সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

সদস্য:

১। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মনোনিত প্রতিনিধি।
২। মহাপরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
৩। যুগ্ম-সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
৪। যুগ্ম-সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।
৫। যুগ্ম-সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৬। যুগ্ম-সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৭। যুগ্ম-সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৮। যুগ্ম-সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৯। যুগ্ম-সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ।
১০। যুগ্ম-সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
১১। যুগ্ম-সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
১২। যুগ্ম-সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
১৩। যুগ্ম-সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
১৪। যুগ্ম-সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
১৫। যুগ্ম-সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
১৬। যুগ্ম-সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
১৭। যুগ্ম-সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১৮। যুগ্ম-সচিব, পরিবেশ ও বনমন্ত্রণালয়।
১৯। যুগ্ম-সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
২০। যুগ্ম-সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।
২১। যুগ্ম-সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

(৩–২১: মনোনিত প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিবের নিচে নয়))

২২। যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন),পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।
২৩। মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি।
২৪। জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি
(২জন মনোনিত প্রতিনিধি)।
২৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।
২৬। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর।
২৭। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
২৮। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।
২৯। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
৩০। প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩১। প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৩২। প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩৩। প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩৪। প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩৫। প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩৬। প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, আগারগাঁও, ঢাকা।

৩৭। প্রতিনিধি, ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই), মতিঝিল, ঢাকা।

৩৮। প্রতিনিধি, BRAC University

৩৯। মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা।

৪০। প্রতিনিধি, NGO Foundation.

সদস্যসচিব: উপ-সচিব (উন্নয়ন), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

যাদের অবদানে এ গেজেটিয়ার প্রণীত

পরামর্শক: ড. মো. হাফিজুর রহমান ভূঞা
অতিরিক্ত সচিব (অব.)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অধ্যায় নং	অধ্যায়ের নাম	নাম ও ঠিকানা
১	ভূ-প্রকৃতি ও পরিবেশ	ড: অনির্বাণ মোস্তফা প্রফেসর, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা
		জনাব ইমরান কামাল সহকারী অধ্যাপক, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
		কাজী হুমায়ুন কবীর সহকারী অধ্যাপক, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
		ড. দিলীপ কুমার দত্ত প্রফেসর, ইনভারমেন্টাল সায়েন্স ডিসিপ্লিন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
		জহির উদ্দিন আহমেদ বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, খুলনা
২	ইতিহাস	জনাব শেখ আব্দুল কাইয়ুম বীর মুক্তিযোদ্ধা ও চেয়ারপার্সন নাগরিক ফোরাম, খুলনা।
		জনাব ইমরান কামাল সহকারী অধ্যাপক, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
৩	অধিবাসী, সমাজ ও সংস্কৃতি	প্রফেসর সাধন রঞ্জন ঘোষ প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সরকারি বিএল. কলেজ, খুলনা
		স্বপন কুমার গুহ নির্বাহী পরিচালক ‘রূপান্তর’
		তুহিন রায় সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান ডিসিপ্লিন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
৪	জনপ্রশাসন	দীপংকর বিশ্বাস অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), খুলনা
৫	ভূমি রাজস্ব ও ব্যবস্থাপনা	মো. সাখাওয়াৎ হোসেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, খুলনা
		রাজিব কুমার রায় সহকারী কমিশনার

অধ্যায় নং	অধ্যায়ের নাম	নাম ও ঠিকানা
৬	কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	কাজী আনিসুজ্জামান উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
		ডা. মো. নিজাম উদ্দিন জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, খুলনা
		প্রফুল্ল কুমার সরকার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, খুলনা
		কৃষিবিদ বুধদেব সেন অতিরিক্ত উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, খুলনা
৭	অর্থনৈতিক অবস্থা	ড. মেহেরউননেসা বেগম প্রভাষক সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, রূপসা, খুলনা
		বেনজীর আহম্মেদ টিপু সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ চরমুগরিদ মহাবিদ্যালয়, মাদারীপুর
		শেখ নাছিমা রহমান সহযোগী অধ্যাপক ইংরেজী বিভাগ আযম খান সরকারি কমার্স কলেজ, খুলনা
৮	যোগাযোগ ব্যবস্থা	মো. দেলোয়ার হোসেন মজুমদার নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, খুলনা
		মো. আলিউল হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, খুলনা
৯	শিল্প, ব্যাবসাবাণিজ্য	পারভীন সুলতানা সহ. অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ আলহাজ্ব সারোয়ার খান ডিগ্রি কলেজ, দিঘলিয়া, খুলনা।
		আসিফ আলতাফ সহ. অধ্যাপক, আলহাজ সারোয়ার খান ডিগ্রী কলেজ, দিঘলিয়া, খুলনা।
১০	স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ও জনস্বাস্থ্য	শেখ আব্দুল মান্নান নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর, খুলনা
		ড. খ.ম. রেজাউল করিম সহকারী অধ্যাপক, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ সরকারী বিএল কলেজ, খুলনা
		ডাঃ শেখ সুফিয়ান রুস্তম মেডিকেল অফিসার, খুলনা
		ডাঃ মো. আ. মান্নান শেখ সহকারী পরিচালক, জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস খুলনা

অধ্যায় নং	অধ্যায়ের নাম	নাম ও ঠিকানা
১১	শিক্ষা	সুশান্ত সরকার অবসরপ্রাপ্ত সহযোগী অধ্যাপক খুলনা সরকারি মহিলা কলেজ
		শংকর কুমার মল্লিক সহযোগী অধ্যাপক, সরকারি বিএল কলেজ খুলনা
১২	ভাষা ও সাহিত্য	প্রফেসর অচিন্ত্য কুমার ভৌমিক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ
		প্রফেসর সাধন রঞ্জন ঘোষ প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সরকারি বি.এল. কলেজ, খুলনা
		গোলাম মোস্তফা সিন্দাইনী সহকারী অধ্যাপক (অব.), বাংলা খুলনা আলিয়া কামিল মাদ্রাসা
		প্রফেসর সাধন রঞ্জন ঘোষ প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সরকারি বিএল কলেজ খুলনা
১৩	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	হাবিবুল হক খান উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, খুলনা
		মো. নুরুজ্জামান জেলা সমবায় অফিসার, খুলনা
১৪	ঐতিহাসিক স্থান ও এলাকা এবং স্থাপত্য	ড: অনির্বাণ মোস্তফা প্রফেসর, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা
		মুহাম্মদ মিঝানুর রহমান হাওলাদার উপ-পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) বিবিএস
১৫	ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ	জনাব শেখ আব্দুল কাইয়ুম বীর মুক্তিযোদ্ধা ও চেয়ারপার্সন, নাগরিক ফোরাম, খুলনা
		জনাব ইমরান কামাল সহকারী অধ্যাপক, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
১৬	খাদ্য ও পুষ্টি	ড. মো. সারোয়ার জাহান অধ্যাপক, অ্যাগ্রোটেকনোলজি ডিসিপ্লিন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
		মোসাম্মাৎ রওশন আরা সহযোগী অধ্যাপক, সমাজ বিজ্ঞান ডিসিপ্লিন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যায় নং	অধ্যায়ের নাম	নাম ও ঠিকানা
		ড. খ. ম. রেজাউল করিম সহকারী অধ্যাপক, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ সরকারী বিএল কলেজ, খুলনা
		ফারহানা হক সহকারী অধ্যাপক, পরিবেশ বিজ্ঞান খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
১৭	দুর্যোগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পুনর্বাসন	মো. মনিরুল ইসলাম উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, খুলনা।
		সচ্চিদানন্দ বিশ্বাস সহকারী পরিচালক, সুশীলন, খুলনা।
১৮	অভিবাসন ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান	মুহাম্মদ মিঝানুর রহমান হাওলাদার উপ-পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) বিবিএস
		মো. আশরাফ হোসেন সিইও, জাহানাবাদ ক্যান্টনমেন্ট, খুলনা
১৯	বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	ড. কাজী শাহ নেওয়াজ রিগব অধ্যাপক, কম্পিউটার সায়েন্স ডিসিপ্লিন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
		রাগিব শাকিল রাফি প্রভাষক, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
		এমএ কাইয়ুম অধ্যক্ষ, ইলাক্স, খুলনা
২০	বিশেষ পণ্য	ড. বিশ্বাস শাহিন আহম্মদ সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ সরকারী বিএল কলেজ, খুলনা
২১	প্রাকৃতিক সম্পদ	অধ্যাপক আনোয়ারুল কাদির নির্বাহী পরিচালক, সুন্দরবন একাডেমি, খুলনা।
		ড. বিশ্বাস শাহিন আহম্মদ সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ সরকারী বিএল কলেজ, খুলনা।
২২	জীবন ও জীবিকা	ড. মেহেরউননেসা বেগম সহকারী অধ্যাপক সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, রূপসা, খুলনা
		শেখ নাছিমা রহমান সহযোগী অধ্যাপক ইংরেজী বিভাগ আযম খান সরকারি কমার্স কলেজ, খুলনা

অধ্যায় নং	অধ্যায়ের নাম	নাম ও ঠিকানা
২৩	খেলাধুলা	আবু দাউদ মো. গোলাম মোস্তফা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) খুলনা
২৪	গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা	আলহাজ্ লিয়াকত আলী সম্পাদক, দৈনিক পূর্বাঞ্চল
		মকবুল হোসেন মিন্টু দৈনিক যুগান্তর, খুলনা
		জিন্নাত আরা আহম্মেদ সিনিয়র তথ্য অফিসার, পিআইডি, খুলনা
		ফারুক আহমেদ সভাপতি, খুলনা প্রেস ক্লাব
২৫	সমস্যা ও সম্ভাবনা	ড. বিশ্বাস শাহিন আহম্মদ সহকারি অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ সরকারী বিএল কলেজ, খুলনা
	ক.পরিশিষ্ট খ.তথ্যসূত্র গ.গ্রন্থপঞ্জি	মো. মীর হোসেন যুগ্ম-পরিচালক, বিভাগীয় পরিসংখ্যান অফিস খুলনা

নির্ঘন্ট

অ

অনুশীলন সমিতি, ৪৫
অন্যান্য লোকশিল্প, ২১০
অবকাশ গণগ্রন্থাগার, ৬২
অভিবাসন, ৫৯, ৪০৩
অ্যাজাক্স জুট মিলস্ লিমিটেড, ১৫৯
অ্যান্ডারসন, ৪২
অ্যাবানডন্ড প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট বোর্ড, ১১৫
অ্যালপাইন-আদি-অস্ট্রেলীয়, ৫২

আ

আইটিমেলা, ২২৪
আইয়ুব খান, ৪৯, ৩১৯, ৩৫২
আওয়ামী মুসলিম লীগ, ৩৪৬, ৩৫০
আজিমউস-শান, ৩৯
আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, ৮০, ৩২৮
আদমশুমারি, ২, ৫৩, ১৫২, ১৫৩, ৪৪১
আদর্শগ্রাম, ১১৪
আদি-অস্ট্রেলীয়, ৫২
আবাসনমেলা, ৫৭
আয়মা, ১০৮
আয়ুর্বেদিক ওষুধ, ২৪০
আরশ নগরের মসজিদ, ৬১
আরিয়ানা সিস্টেম, ৪১২, ৪১৩
আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া, ৯১
আলাইপুরের ফতেপুরের গড়, ৬১
আলিপুর বোমা হামলা, ৪৬
আলিবর্দি খাঁ, ৪০
আশ্রয়ণ, ১১৪, ৩৯৪
আসল তুমার জমা, ৯৩
আসাদ এভিনিউ, ৪৮

ই

ইউএনডিপি, ৩৮৮
'ইউএন এস্কেপ', ৩৮৮
ইউএসএস এসেক্স, ৩৮৭
ইউএসএস কিয়ারসার্জ, ৩৮৭
ইউনাইটেড স্টেটস নেভি, ৩৮৭
ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, ৪১০, ৪১১
ইউনেস্কো, ২০, ৪৩৬
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ৪৩৩
ইউসুফপুর জমিদারি, ৯৬, ১০৫
ইকোলজিক্যাল ক্রিটিক্যাল এলাকা, ২১
ইকোসিস্টেম, ৩০
ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি, ৩৫
ইজারা, ৯৭, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ৪২১
ইৎসিং, চির বিবরণী, ৩২
ইন্টারওয়েব কম্পিউটার, ৪১২, ৪১৩
ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ট্রেডিং করপোরেশন, ২০৩
ইন্ডিকেটর প্রজাতি, ৪৩৪
ইন্দো-চায়না টাইগার, ৪৩৩
ইব্রাহীম শেঠ, ২০৩
ইয়াহিয়া খান, ৪৯, ৩৫৬, ৩৫৭
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ৪০, ৯৫, ৪২১
ইস্টার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে, ৭৪

ঈ

ঈদমেলা, ৫৮

উ

উইকলি ওয়েভ, ৪৭০
উইনার্স ক্লাব, ৪৬০
উইলিয়াম হেনরি সেনিড রেইনে, ৪৩
উইলিয়াম রেইনে, ৭৪
উড ডেসপ্যাচ, ২৫৫
উদ, ৪২৪
উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল আম, ১২২
'৬৯, এর গণআন্দোলন ও ৭০, এর নির্বাচন, ৩৫৪, ৩৫৭
উপকূলীয় বেড়িবাঁধ, ১৩৮
উপজেলা দর্পণ, ৪৭৪
উপ-মধ্যস্বত্ব, ১০৬
উফশী জাত, ১১৮, ১২৩
উমেশচন্দ্র লাইব্রেরি, ৬২
উলুখড়, ৫৮

এ

একটি বাড়ি একটি খামার, ৩২৫, ৩২৮
এফ.সি. হার্স্ট, ১০৯
এলএসএস ও ম্যালি, ১৪৭
এলাহাবাদ শিলালিপি, ৩১
এস.এ.জি. শ্যা, ৭৪
এসএল শেঠীয়া, ১৯৪

ও

ওয়ারেন হেস্টিংস, ৪১
ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম, ৩৮৮
ওয়ার্ল্ড ভিশন, ৩৮৭
ওয়ার্ল্ডকম, ৪১২, ৪১৩
ওসাত তালুক, ১০৬, ১০৭
ওসাত হাওলা, ১০৬
ওসাত হাওলাদার, ১০৭

ঔ

ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা, ২৫৫, ২৫৭

ক

ককেশীয়, ৫১
কটকা, ২৮, ১৬৬, ৪৩৮
কপালকুন্ডলা, ৩৩৫
কপিলমণি জেসি হাসপাতাল, ২২৮
কপিলমুনি ক্রীড়া ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৪৬০
কপিলমুনি, ৩৪, ২১৩
কমিউনিটি ক্লিনিক, ৯১, ১৭২
কম্পিউটার গ্রাফিক্স, ৪১২, ৪১৩
কয়রা থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ২২৭
করতোয়া নদী, ৩৬
করমজল, ৪৩৮
কর্ণসুবর্ণ, ৩১
কলকাতা বন্দর, ৪৮৯
কলেরা, ২৪০
কান্যকুব্জ, ৩৩৯
কাবাডি, ৬৩, ৪৬২, ৪৬৪
কার্বন নিঃসরণ, ২৯
কালো মানিক, ৬
কাশীপুর ক্রিকেট একাডেমি, ৪৬০
কাস্পিয়ান টাইগার, ৪৩৩
কিংসফোর্ডের গাড়ি, ৪৬
কিকার্স ক্লাব, ৪৬৬
কিসমত খুলনা, ১, ৪৩
কুটির শিল্প, ২০৭
কুতুব মিনার, ৩১
কুমার পাল, ৩৩
কুমির, ২৮, ৪২৬
কৃষক প্রজা পার্টি, ৪৭
কৃষিমেলা, ৫৭, ২২৪
কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, ২৮৩, ২৯৫
কেন্দ্রীয় জেল হাসপাতাল, ২২৮
কোমলপাল, ৩৫
কোয়ার্টজ, ৪, ৬
কোরফা, ১০৮
ক্যাপ্টেন স্মিথ, ১০৯, ৪২২
ক্যাপ্টেন হাগ মরিসন, ৯৮
ক্রিকেট ফ্রগ, ৪২৫
ক্লড রাসেল, ৯৭
ক্ষুদিরাম, ৪৬

খ

‘খ’ তফসিলভুক্ত সম্পত্তি, ১১৫
খরিপ ২, ১২১
খর্নিয়া ব্রিজ, ৩৯১
খলিফাতাবাদ, ৩৭, ৯৩, ৯৪
খান এ সবুর, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫৭, ৩৬২
খান জাহান আলী (রা.), ৩৬, ৬২, ৭৩, ৯৩, ৩৩১
খান সাহেব শামসুর রহমান, ৪৭
খানাবাড়ি, ১০৮
খারিজা তালুক, ৯৭
খালসা, ৯৪
খালিশপুর শিল্প, ৫০
খুলনা আবাহনী ক্রীড়া চক্র, ৪৬০
খুলনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেডিং করপোরেশন, ২০৩
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ৫৮, ৪৮৯
খুলনা জাদুঘর, ৩৩৩

খুলনা জেলা ক্রীড়া সংস্থা, ৪৫৯, ৪৬৪, ৪৬৭
খুলনা টাউন ক্লাব, ৪৬৫
খুলনা টেক্সটাইল মিলস্ ক্লাব, ৪৫৯
খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলস্ ক্লাব, ৪৫৯
খুলনা বিকেএসপি, ৪৬৩
খুলনা বিভাগ, ২, ৪৩, ৭২
খুলনা মহকুমা, ১, ৭৩, ৪৮১
খুলনা মহানগরী, ৩৩৩, ৪৮৭, ৪৯২
খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ৮৬, ২২৮, ৩৩২
খুলনা মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন, ৪৭, ৪৬৫
খুলনা শিপইয়ার্ড ক্লাব, ৪৫৯
খুলনা শিশু হাসপাতাল, ২২৮
খুলনা সিটি করপোরেশন, ৭১, ১৫৭, ১৭১, ২০৫, ২০৯, ৪১৭, ৪৫৩, ৪৬৩
খেলাফত আন্দোলন, ৪৬
'খোদকাস্ত' রায়ত, ১০৮

গ

গঙ্গারিডি, ৩১, ৫৫
গণবার্তা, ৪৭৬
গন্ডার, ২৩
গভর্নর, ৪০, ৪৬৯
গরান বিলুয়া অবক্ষেপ, ৪
গল্লামারী বেতার ভবন, ৪৮৫
গল্লামারী, ৩৩৪
গাঁতি, ১০৬
গুচ্ছগ্রাম, ১১৪
গেরিলা যুদ্ধ, ৫০
গোপালভোগ, ১২২
গোলপাতা, ৫৮, ১৫৮, ১৬৫, ২২৩, ৩৩১, ৪১৮, ৪২৩
গ্লোবাল টাইগার ফোরাম (জিটিএফ), ৪৩৩
গ্লোবাল টাইগার রিকভারী প্রোগ্রাম, ৪৩৪
গৌড়রাজ্য, ৩৩
গ্রাম, ৩১৭, ৪৫৫

ঘ

ঘূর্ণিঝড় (১৯০৯), ৩৮৫
ঘূর্ণিঝড় 'আইলা' , ৩৮৮
ঘূর্ণিঝড় সিডর (২০০৭), ৩৮৭
ঘূর্ণিঝড়, ২০, ৪৯, ১৬৬, ২৫৭, ৩৮৫
ঘের, ৬১
ঘোড়দৌড়, ৬৩, ২২৪, ৪৬২

চ

২৪ পরগনা, ৭৩, ৯৭, ১০৩
চন্ডাল, ৫১
চন্দ্রগুপ্ত, ৩১
চাঁচড়ার জমিদার পরিবার, ১০৪
চার লেনবিশিষ্ট অ্যাপ্রোচ সড়ক, ১৮৪
চার্লস গ্রান্ট, ২৫৫
চালনা (মোংলা), ৩৩৪
চিংড়ি ভাইরাস, ২৮৩
চিংড়ি রফতানি, ২১৩, ৪৯৫, ৪৯৬
চিতাবাঘ, ২৩
চিত্রা হরিণ, ২৭, ৪২৪
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ৪২, ৯৬, ৯৭
চুই ঝাল, ৩৭৬
চেরাগি, ১০৮
চৌয়ারি, ঘর, ১৫২

ছ

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, ৪০, ৯৫
ছোঁয়াচে রোগ, ২৪৪, ২৪৭

জ

জন উডবার্ণ, ২২৭
জনশক্তি রফতানি, ৪০৬
জমা কামিল তুমারি, ৯৪
জমিদার কিরণ রায়চৌধুরী, ৬২
জমিদারি, ৯৫, ৯৭, ১০৩, ১০৫
জমিদারের সৃষ্টি, ৯৫
জমির জলাবদ্ধতা, ১৩৬
জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ শীর্ষক কর্মসূচি, ৭০
জলদস্যু, ৩৯, ৪৯, ৪৪৩, ৪৬২

জলোচ্ছ্বাস, ৫, ২০, ৪৯, ৩৮৫
জাগরণ, ৪৬৯
জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা, ৪৬২
জাভানিজ টাইগার, ৪৩৩
জাহিদ স্মৃতিভবন, ৬২
জি. ই. মান্যুয়াল ১৯৫৮, ১১৩
জিডিপি, ২০৭
জে.ই.গ্যাস্ট্রেল, ১০৯
জেনারেল হাসপাতাল, ২২৭, ৩৩২
জেমস ওয়েস্টল্যান্ড, ৪১, ৯৬, ১৫১
জেমস গ্রান্ট, ৯৯
জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, খুলনা, ৮১, ৮২
জেলা প্রশাসন, ৩৩৩
জোড়া শিব মন্দির, ৩৩৫
জোয়ারভাটা, ৫, ৮, ১৩, ২০, ২১
জৌনপুরের কেরামত আলী, ৪৪

ট

টাইগার রেঞ্জ কান্ট্রি, ৪৩৩
টাউন ক্লাব, ৪৬০, ৪৬৫
টিলম্যান হেংকেল, ৪২, ৭৩, ৯৭
টেকসই পরিকল্পনা, ৪৩৪
টেম্পল, ৪৩৮
টেরাকোটা, ২০৯, ২৯৪, ৪৮৬
টোডরমল, ৫১, ৯৩
ট্রাভেলিয়ন, ২৫৫

ড

ড. মো. শহীদুল্লাহ, ৩০৯
ডামব্রেলি, ৩৭
ডি প্রেইন, ৪২২
ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, ৩১৮, ৩১৯
ডেইলি মুসলিম ওয়ার্ল্ড, ৪৭১
ডোন, ১২০
ডোরাকাটা বাঘ, ২৩

ত

তথ্যপ্রযুক্তি, ৪০৯, ৪১২
তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া, ৪৪
তাঁত পল্লি, ৪৪৭
তাঁত শিল্প, ২১০, ৪১৭
তাম্রযুগ, ৩১
তাম্রশাসন, ৩২, ৩৪
তালিমপুর, ৪৩
তালুক, পত্তনি, ইজারা ও গাঁতি, ১০৫, ১০৬
তিয়র রাজা, ৩৪
তিস্তা, ৩৬
তুর্কি খেলাফত, ৪৬
তৃতীয় বিগ্রহপাল, ৩৩
ত্রৈমাসিক বিজ্ঞান পরিক্রমা, ৪৮৩

থ

থাক ও রাজস্ব জরিপ, ১০৯
থাকবাস্ত, ১০৯

দ

‘দানবীর’ হাজী মুহাম্মদ মহসিন, ১০৫
‘দি ডেইলী মেইল’, ৪৭২
‘দুর্জয়, ৭১’, ৩৭১
দক্ষিণডিহি, ২২৪, ৩৩৭, ৩৪০
দর, পত্তনি ও সে, পত্তনি, ১০৭, ১০৮
দরপত্তনি, ১০৬
দলিল/কবুলিয়ত, ৩৯৫
দশসালা বন্দোবস্ত, ৯৬
দাড়িয়াবান্দা, ৩০৯, ৪৬২
দাবা, ৪৬২, ৪৬৬
দাবি দিবস, ৩৫২
দায়েমি (Daimi) বন্দোবস্ত, ৯৭
দি ডেইলি ট্রিবিউন, ২৯৬, ৪৭১
দি ডেইলি নিউজ, ৪৭০
দি ডেইলি পিপলস অবজারভার, ৪৭০
দি পূর্বাঞ্চল উইকলি, ৪৭৮
দিঘলিয়া উপজেলা, ৪৭৩
দিঘলিয়া বার্তা, ৪৭৩
দিনাজপুর, ৩৬
দুর্গাপূজা, ৫৭, ৫৯
দেওয়ানি আদালত, ৯৯

দেওয়ানি, ৪০, ৪১
দেবোত্তর, ১০৮
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, ৪৬
দৈনিক পত্রিকা, ৪৭০-৪৭৪
দৌলতপুর হিন্দু একাডেমি, ৪৫
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ৩৮৪
দ্বৈতশাসন, ৪০
দ্রাবিড় মুন্ডা নরগোষ্ঠী, ৫২

ধ
ধাঁধাঁ ও হেঁয়ালি, ৩১০, ৩১২
ধুমঘাটের নৌযুদ্ধ, ৩৮
ধ্বনিতত্ত্ব, ২৮৩

ন
'নেগ্রিটো' বা নিগ্রোবটুজন, ৫৩
'নাংলা' ষড়যন্ত্র মামলা, ৪৬৯
নকশিকাঁথা শিল্প, ২০৯
নছিমন-করিমন, ৪৫০
নতুন বাংলাদেশ, ৪৮১
নদীয়া, ৩৫
নবরত্ন, ৩৭
নবাব আলীবর্দী খাঁ, ১৮৯
নবাব স্যার সুলিমুল্লাহ, ৪৬
নয়াবাদ, ১, ৪৩, ৭৭
নসরত শাহ, ৩৭
নাট্যদল, ৬৪
নানকর জমি, ১০৮
নামজারি, ৩৯৫
নিগ্রীয়, ৫১
নিম ওসাত হাওলা, ১০৬
নিম হাওলা, ১০৬
নিম হাওলাদার, ১০৭
নিষ্কর জমি, ১০৮
নিষ্করভোগী, ১০৮
নীল কারখানা, ৪২
নীল কুঠিয়াল, ১
নীলকমল, ৪৩৮
নূরউল্যা খাঁ, ৩৯
নৌকাবাইচ, ৬৩, ৪৬২
ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট, ১৪৪
ন্যাশনাল টাইগার রিকভারী প্রোগ্রাম, ৪৩৪

প
পঞ্চব্রাহ্মণ, ৩৩৯
পঞ্চানন কুশারী, ৩৪০
পত্তনি তালুক, ১০৭
পত্তনি বিক্রয় আইন, ১০৭
পত্তনি, ১০৬
পদ্মা সেতু, ১৭৩, ১৮৪, ৪৯৪, ৪৯৬
পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, ৪৯২
পরিত্যক্ত সম্পত্তি, ১১৫
পরিবেশগত শরণার্থী, ৩০
পরিযায়ী পাখি, ৪২৪
পর্যটক, ৪৩৮
পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ৪১২
পশুর, ৪২৩, ৪৩৭
পহেলা বৈশাখ, ৬৪, ২২৪, ৩৭৭, ৩৭৮
পাঁচসালা বন্দোবস্ত, ৯৫
'পাইকাস্ত' রায়ত, ১০৮
পারশে, ৬১, ১৩৯
পিট কয়লা, ৪১৯
পিসি রায়ের বাড়ি, ৩৩৯
পুর্তগিজ জলদস্যু, ৩৯
পূজাপার্বণ, ২২৪
পেরিপ্লাস, ৩১
পেসমেকার (হার্ট ব্যাটারি), ২৩২
পোদ, ৫১, ৫৩
পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়, ৫১
প্যাডেল থ্রেসার, ১৩৪
প্রতাপাদিত্য রায়, ৩৭, ৩৮
প্রফুল্ল চাকী , ৪৬
প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ, ৪৯
প্রাকৃতিক বাঁধ, ৪, ৮
প্রাকৃতিক ভারসাম্য, ২০, ১৬৬
প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শিক্ষাব্যবস্থা, ২৫৫
প্রাণিবৈচিত্র্য, ৪৩৬

প্রাণিসম্পদ বিভাগ, ১৪৩
প্লাটিনাম জুবিলি জুট মিলস লিমিটেড, ১৫৯
প্লাস্টিক কারখানা, ১৬১, ৪৪৮
প্রোটেকশন ডিপেন্ড স্পাইসেস, ৪৩৪

ফ

ফলমাউথ, ১
ফতেহাবাদ, ৯৪
ফরায়েজি আন্দোলন, ৪৩, ৪৪
ফরেস্ট রেঞ্জ, ৪৩৬
ফরোয়ার্ড ব্লক, ৪৬
ফাতেমা জিন্নাহ, ৩৫১, ৩৫৩
ফিরিঙ্গি জলদস্যু, ৩৯
ফুলতলার দক্ষিণ ডিহিতে রবীন্দ্রনাথের শ্বশুর বাড়ি, ৬১
ফেরোমোন ট্র্যাপ, ১২৩
মির্জা মুহাম্মদ সালাউদ্দিন ফৌজদার, ১০৫
ফৌজদার, ৩৮, ৩১৭

ব

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ৪৯, ৫০, ২৫৯, ৩৫৬, ৪৬৬
বঙ্গভঙ্গ, ৪৪, ৪৫
বঙ্গোপসাগর, ১, ১৩, ১১৭, ৩৮৭, ৪৮৯
বন্য শূকর, ৪২৪
বন্যপ্রাণী, ১৬৫, ৪২৬, ৪৩২
বন্যপ্রাণীর অভয়াশ্রম, ২০
বন্যমহিষ, ২৩
বন্যা, ৩৮৪
বয়রা তরুণ সংঘ, ৪৬০
বর্ধমান, ৩১, ৩৯, ১০৭
বলাকা স্পোর্টিং ক্লাব, ৪৬০
বল্লাল সেন, ৩৫
বাঁশ ও বেত শিল্প, ৪১৭
বাঁশফোড়, ৫২
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, ৪১১
বাংলাদেশ টাইগার এ্যাকশন প্ল্যান (২০০৯, ২০১৭), ৪৩৫
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা, ৪৮৫
বাইন, ২৩, ১৬১, ৪২৩, ৪৩৭
বাক্যতত্ত্ব, ২৮৩
বাগদা, ১৩৯, ১৬১, ৪৩৭, ৪৫০
বাগদি, ৫১
বাগেরহাট, ৪৩, ৭৩, ৯৭, ১১০, ১৪৭, ২৪৫, ৩৬০
বাঘের বর্তমান অবস্থা, ৪৩৪, ৪৩৫
বাণিজ্যমেলা, ২২৪
বাদাবন, ৫১, ৩০৮
বানর, ২৮, ২৯
বারুণীমেলা, ৫৮
বারাণসী, ৩৮
বারো ভূঁইয়া, ৩৭
বারো আড়িয়ার অপারেশন, ৩৬৪
বালিনিজ টাইগার, ৪৩৩
বাহারাম শাহ, ৩৬
বিক্রমপুর, ৩৪
বিজয় সেন, ৩৪, ৩৫
বিজয়পুর, ৩৫
বিনা ধান, ১২৪
বিপ্লবী চারুচন্দ্র বসু, ৪৬
বিল বাসুখালি, ১৩৮
বিলডাকাতিয়া, ১৩৯
বিলুপ্ত প্রায় প্রাণী, ৪৩১
বিশ্বঐতিহ্য, ৪৩৬
বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিনের সমাধিসৌধ, ৩৪২, ৩৬৬
বৃক্ষমেলা, ৫৭, ২২৪
বৃহৎ পুঁজিপতি আইন ১৮৫৩, ১০১
বৃহত্তর বাংলা, ৪৭
বেঙ্গল টাইগার, ৪৩৩
বেজি, ২৪
বেড়িবাঁধ, ৩৯১
বেবিংটন মেকলে, ২৫৫
বৈশাখিমেলা, ৫৮, ২২৪
বৌচি, ৪৬২
ব্রহ্মোত্তর, ১০৮
ব্রিটিশ রাজস্ব ব্যবস্থা, ৯৫, ৯৬

ভ
ভরত ভায়নার স্তূপ, ৬১
ভাগীরথী, ৮, ৩১
ভারতীয় কংগ্রেস, ৪৭
ভারতীয় স্বাধীনতা আইন, ৪৭
ভিক্টোরিয়া কলেজ, ২৬৯
ভীল, ৫২
ভূতাত্ত্বিক জরিপ, ৪১৯
ভূতের বিল, ১৩৮
ভূপ্রকৃতি, ১১
ভূমি অনুদান আইন, ১০১
ভূমি বন্দোবস্ত, ১১৪
ভূমিরাজস্ব, ৯৩
ভূমিহীন, ১১৪, ৩৯৫
ভৈরবী, ৪৭৪
ভোজবর্মা, ৩৪
ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প, ১৪৩

ম
মঙ্গোলীয়, ৫১
মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৪৯৫
মৎস্যজীবী, ৫১, ৪৫৬
মধ্যস্বত্বাধিকারী, ১০৬, ১০৯
মন্নুজান, ১০৫
মলাঙ্ক, ২৩
মসজিদকুর মসজিদ, ৬৩
মসলিন, ৩১
মহকুমা, ৫৩, ৪৩, ৭৩, ১৪৪, ৩১৭
মহত্তরণ, ১০৮
মহল্লাদার, ৩১৭
মহসিন উদ্দিন ওরফে দুদু মিয়া, ৪৩
মহাত্মা গান্ধী, ৪৬
মহামারি প্রতিষেধক, ২৪২
মহারাজা, ৩২, ৩৩৯
মহেশ্বর পাশা ক্লাব, ৪৬০
মাইক্রোক্রেডিট, ৩২৮
মাওলানা মোহাম্মদ আলী, ৪৬
মাওলানা শওকত আলী, ৪৬
মাছরাঙা, ২৩, ৪২৫
মাড়াই কল, ১৫৩
মাধব সিং, ১০৪
মায়া হরিণ, ২৪, ৪২৪, ৪২৮
মারকুইস কর্নওয়ালিশ, ৯৬
মারাঠা বর্গি, ৪০
মার্গারেট, ৪২
মালঞ্চি, ১৯০
মাসিক পত্রিকা, ৪৮২-৪৮৩
মাস্টার দা সূর্যসেন, ৪৬
মাস্টারপ্ল্যান, ৪৯০
মাহমুদ শাহ, ৩৬
মাহমুদাবাদ, ৩৭, ৯৪
মাহিন্দার, ১৯০
মিডল ভারনাকুলার স্কুল, ২৬৪
মুকাররারি, ১০৬
মুড়লি, ৪১
মুন্ডা, ৫২
মুসলিম লীগ, ৪৫
মুসলিম হিরোজ, ৪৬৬
মৃৎশিল্প, ২০৯
মেজর জেমস এলিসন, ৪২২
মেগাস্তিনিস, ৫৫
মেসার্স রীচি, ৪২১
মেদিনীপুর, ৩৯
মেসার্স মিনপ্রিও স্পেনসলে অ্যান্ড পি ডাব্লিউ ম্যাকফরলেন, ৪৯০
মোংলা বন্দর, ৪৮৯, ৪৯৪
মোঙ্গালীয় নরগোষ্ঠী, ৫২
মোহনা, ১৩, ৯৭, ৪৩৬, ৪৪৩
মোহাজের, ৫৫, ১৫১, ৪৯০
মৌজা, ৪৩, ৯২, ৯৯, ৩১৭
মৌয়াল, ৪২৫, ৪৪৪
মৌরসি, ১০৬
মৌলভি বেলায়েত আলী, ৪৪
ম্যানগ্রোভ, ১১৭, ৩৮৭, ৪২২
ম্যালেরিয়া জীবাণু , ২৪৪

য
যশোবর্মা, পাল ও চন্দ্র বংশ, ৩৩

যশোর, ৩৬, ৪৩, ৭৩, ৯৬, ৩৩২, ৪৬৯
যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা, ৩৫১
যুক্তফ্রন্ট, ৩৫১
যৌথ পরিবারপ্রথা, ৫৮

র

রবীন্দ্র স্মৃতি জাদুঘর, ৩৩৭
রয়েল বেঙ্গল টাইগার, ২৩, ২৪, ২৭, ৩৮৭, ৪২৪, ৪৭৮
রহিম উল্লাহ, ৪৩
রাজবংশী, ৫২
রাজস্ব জরিপ, ১০৯, ৪২২
রাজা টোডরমল, ৯৩
রাজা রামচন্দ্রক, ৩৮
রাড়ুলি, ৬২
রানী স্যালুট, ৬১
রামপাল, ৩৩, ৩৪, ৩৪১
রায়তিস্বত্ব, ১০৬
রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০, ১০৯
রিচার্ড অ্যান্ড মার্টিন, ৪২১
রিচার্ড রক, ৯৬
রিচার্ড রোকে, ৭৩
রিপোর্ট অন দি ডিসট্রিক্ট অব যশোর, ৪১
রূপলাল সাহার খাল, ৪২
রূপকল্প ২০২১, ৪০৯
রূপদিয়াত, ৪২
রুপালী সম্পদ, ৪৩৭
রেজিন টেকনোলজি, ৪১৩
রেভিনিউ সুপারভাইজার, ৯৫
রেমিটেন্স, ৪০৫
রেসাস বানর, ৪২৪

ল

লক্ষ্মণ সেন, ৩৫
লাঠিখেলা, ২২৪, ৪৬২
লিওপার্ড, ৪২৪
লিংক থ্রি, ৪১৩
লেন, ৯৫
লেফটেন্যান্ট ডব্লিউ. ই. মরিসন, ৯৮
লেফট., ৪২১
লেফট. প্রিনসেপ, ৪২১

শ

শেখ আবু নাসের, ৩৬৮
স্টেডিয়াম, ৬৩, ৩৬৮, ৪৬৩
হাসপাতাল, ২২৮, ২৩১, ২৩২
শহিদ হাদিস পার্ক, ২২৪, ৩৭১
শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ, ৩৬
শায়েস্তা খাঁ, ৩৮
শালক, ৩৮
শাহাব উদ্দিন তালিশ, ৩৯
শিরোমণি, ২০২, ৩৫৯, ৩৬২, ৩৬৬
শিলাবৃষ্টি, ৩৮৩
শিলালিপি, ৩২, ৩৭
শুঁটকি, ৪৪৯
শেখ আফজালের মাজার ও ঢিবি, ৩৪৩
শেখ তৈয়ুবুর রহমান পাবলিক লাইব্রেরি, ৬২
শেখ হাসিনা, ৬২, ৬৭, ২৩১, ২৩৪, ২৫৮, ৩২৫, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৯৪, ৪০৯, ৪৩২, ৪৮৭, ৪৯৩
শেখ হাসিনা জাদুঘর, ৬২
শেখেরটেক টেম্পল, ৪৩৮
শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, ৪৭, ৩৫১
শোত্রীয় ব্রাহ্মণ, ৩৩৯
শ্রী অরবিন্দ, ৪৬
শ্রীহরি, ৩৭

ষ

ষাঁড়ের লড়াই, ৬৩, ৪৬২

স

সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল, ২২৭
সংস্কৃত টোল, ২৫৮
সতীশ চন্দ্র মিত্র , ৫১, ৩৩৮
সদর হাসপাতাল, ৮৭, ২২৭, ২৪৮
সপ্তর্ষী, ৪৭০
সবার জন্য বিদ্যুৎ, ৩৩০

সমবায় অধিদপ্তর, ২২৩
সমাজদর্পণ, ৪৬৯, ৪৮২
সম্রাট আওরঙ্গজেব, ৩৯
সম্রাট আলেকজান্ডার, ৩১
সরকার 'মুরাদখানা', ৯৪
সরকারি মহিলা কলেজ, ২৬৯
সাইবেরিয়ান টাইগার, ৪৩৩
সাইমন কমিশন, ৪৬
সাউথ চায়না টাইগার, ৪৩৩
সাতগাঁও, ৩৬, ৯৪
সাপ, ২৪, ৪২৫, ৪২৭
সাপ্তাহিক পত্রিকা, ৪৭৪-৪৮১
সামলবর্ম, ৩৪
সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, ৩২৯
সামুদ্রিক সাপ, ৪২৫, ৪২৭
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৫১
সার্কাস, ৬৪
সার্কেল অফিসার, ৭৫, ৩২৩
সার্জেন্ট কমিটি (১৯৪৪), ২৫৫
সিটি করপোরেশন, ৩৩১, ৪৯০
সিপাহী বিদ্রোহ, ৪৪
সুন্দরবন অভয়াশ্রম, ৪৩৩
সুন্দরবন রেডিয়ো, ৪৮৪
সুন্দরবন সমাচার, ৪৮৩
সুন্দরবন, ২৩, ৪১, ৫১, ৭৪, ৯১, ৯৮, ১৬৫, ,৪১৭, ৪৩৮
সুন্দরবনের Flagship, ৪৩৪
সুন্দরবনের ইকোট্যুরিজম, ৪৩৮, ৪৩৯
সুন্দরী, ২৩, ১৬৫, ৪২৩, ৪৩৭
সুভাষচন্দ্র বসু, ৪৬
সুমাত্রান টাইগার, ৪৩৩
সূর্যের হাসি ক্লিনিক-পি কে এস, ২৩৭, ২৩৮
সেউতি, ১২০
সেগাঁতি, ১০৬
সেনহাটি, ১৪৮, ২৯২
সে, পত্তনি, ১০৭
সেলিমাবাদ পরগণা, ১০৬
সৈয়দ আফজাল কাহুত, ৪৮
সৈয়দ আহমদ বেরেলভী, ৪৪
সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ৫০
সৈয়দপুর জমিদারি, ৯৬
সৈয়দপুর এস্টেট, ১০৫
সৈয়দপুর ট্রাস্ট, ৯৬
সোনার বাংলা, ৪৭৭
স্কিপার ফ্রগ, ৪২৫
স্টার জুট মিলস্ লিমিটেড, ১৫৯
স্টেস্টিং (রিং), ২৩২
স্তন্যপায়ী, ২৩, ৪২৮
স্বরাজ আন্দোলন, ৪৫
স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, ২৯৫, ৩৫৮
স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি, ৬৯
স্যার জেমস ওয়েস্টল্যান্ড, ৪১, ৯৬

হ

হরিণ, ২৭, ২৮
হস্ত শিল্পমেলা, ২২৪
হাঁস প্রজনন খামার, ৮২
হাওলাদার, ১০৭
হাঙর, ২৪
হাজী শরীয়তউল্লাহ, ৪৩
হাটবাজার, ১০৯
হান্টার রিপোর্ট (১৮৮২), ২৫৫
হারবার্ট রিজলি, ৫২
হার্ডবোর্ড মিল, ১৫৯, ৪৪৯
হিন্দু কলেজ, ২৫৬
হিমসাগর, ১২২
হিরণ পয়েন্ট, ৪৩৮
হুগলি, ৩৯
হুয়া হীন ডিকলারেশন অন টাইগার কনজারভেশন, ৪৩৪
হেংকেলের তালুক, ৪১, ৯৭
হেমন্ত সেন, ৩৫
হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী, ৪৭

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১

নবম জাতীয় সংসদে খুলনা জেলার মাননীয় সংসদ সদস্যগণের তালিকা:

ক্রমিক নং	নির্বাচনী এলাকার নাম	সংসদ সদস্যগণের নাম
১।	৯৯ খুলনা-১	জনাব ননী গোপাল মণ্ডল
২।	১০০ খুলনা-২	জনাব নজরুল ইসলাম মঞ্জু
৩।	১০১ খুলনা-৩	বেগম মন্নুজান সুফিয়ান সাবেক প্রতিমন্ত্রী শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৪।	১০২ খুলনা-৪	মোল্যা জালাল উদ্দিন
৫।	১০৩ খুলনা-৫	জনাব নারায়ণচন্দ্র চন্দ
৬।	১০৪ খুলনা-৬	জনাব মো. সোহরাব আলী সানা

দশম জাতীয় সংসদে খুলনা জেলার মাননীয় সংসদ সদস্যগণের তালিকা:

ক্রমিক নং	নির্বাচনী এলাকার নাম	সংসদ সদস্যগণের নাম
১।	৯৯ খুলনা-১	জনাব পঞ্চানন বিশ্বাস
২।	১০০ খুলনা-২	জনাব মুহাম্মদ মিজানুর রহমান
৩।	১০১ খুলনা-৩	বেগম মন্নুজান সুফিয়ান
৪।	১০২ খুলনা-৪	জনাব এসএম মোস্তাফা রশিদী সুজা
৫।	১০৩ খুলনা-৫	জনাব নারায়নচন্দ্র চন্দ মাননীয় মন্ত্রী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৬।	১০৪ খুলনা-৬	জনাব শেখ মো. নূরুল হক

পরিশিষ্ট-২

খুলনা সিটি করপোরেশনের মেয়রগণের তালিকা:

ক্রমিক নং	মেয়রের নাম	মেয়াদকাল
১।	জনাব তালুকদার আবদুল খালেক	১৪/০৯/২০০৮ হতে ০৯/০৫/২০১৩
২।	জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	২৫/০৯/২০১৩ হতে ০২/১১/২০১৫

পরিশিষ্ট-৩

বিভাগীয় কমিশনারবৃন্দ, খুলনা বিভাগ

ক্রমিক নং	নাম	হতে	পর্যন্ত
১.	জনাব এস. মনজুর-ই-ইলাহী	০১-১০-১৯৬০	১২-০৪-১৯৬১
২.	জনাব আলী আহমদ	১২-০৪-১৯৬১	৩১-০১-১৯৬৪
৩.	জনাব একেএম আহসান	৩১-০১-১৯৬৪	০২-১০-১৯৬৪
৪.	জনাব এম কেয়ামত আলী	০২-১০-১৯৬৪	২১-১২-১৯৬৫
৫.	জনাব আবুল এহসান	২১-১২-১৯৬৫	২৬-১২-১৯৬৬
৬.	জনাব এ এম ফয়জুর রহমান	০৯-০১-১৯৬৭	০৮-০৭-১৯৬৯
৭.	জনাব কফিল উদ্দনি মাহমুদ	০৮-০৭-১৯৬৯	০৭-০২-১৯৭০
৮.	জনাব সুলতানুজ্জামান খান	০৭-০২-১৯৭০	২৫-০১-১৯৭১
৯.	জনাব জমশের উদ্দিন আহমদ (ভারপ্রাপ্ত)	২৫-০১-১৯৭১	৩১-০৫-১৯৭১
১০.	জনাব হাছানুজ্জামান	৩১-০৫-১৯৭১	২৯-০৩-১৯৭২
১১.	জনাব এএনএম শামসুল আলম (ভারপ্রাপ্ত)	২৯-০৩-১৯৭২	১৫-০১-১৯৭৪
১২.	জনাব জমির উদ্দিন আহমেদ	১৫-০১-১৯৭৪	১১-০৮-১৯৭৫
১৩.	জনাব মনজুর-উল-করিম	১৪-১০-১৯৭৫	০২-০১-১৯৭৬
১৪.	জনাব এ, এন, এম ইউসুফ	১৯-০১-১৯৭৬	১৯-০৭-১৯৭৬
১৫.	জনাব এ জেড, এম নাছির উদ্দিন	০৪-০৮-১৯৭৬	২৫-০৬-১৯৭৯
১৬.	জনাব আবু হেনা	০২-০৭-১৯৭৯	১৭-০৩-১৯৮১
১৭.	জনাব মোহাম্মদ ইনামুল হক	১৭-০৩-১৯৮১	০২-০২-১৯৮৩
১৮.	জনাব মোহাম্মদ রফিউল করিম	০৭-০২-১৯৮৩	৩০-১২-১৯৮৩
১৯.	জনাব নুরুদ্দীন আল মাসুদ	১৭-০১-১৯৮৪	১১-০৯-১৯৮৬
২০.	জনাব মোহা. নুরুল ইসলাম	১৬-০৯-১৯৮৬	১৩-০৭-১৯৮৮
২১.	জনাব আবদুর রহিম চৌধুরী	১৫-০৭-১৯৮৮	৩০-০৩-১৯৯০
২২.	জনাব একেএম ফজলুল হক মিঞা	০৫-০৪-১৯৯০	২৬-০৫-১৯৯১
২৩.	জনাব আমির উদ্দিন চৌধুরী	১৯-০৬-১৯৯১	২৬-০১-১৯৯২
২৪.	জনাব দিলীপ কুমার বিশ্বাস (ভারপ্রাপ্ত)	২৬-০১-১৯৯২	২৭-০৪-১৯৯২
২৫.	জনাব আবদুল মুক্তাদির চৌধুরী	২৭-০৪-১৯৯২	০১-১২-১৯৯৫
২৬.	জনাব কেএমনাজমুল আলম সিদ্দিকী	০১-১২-১৯৯৫	১২-০৮-১৯৯৬
২৭.	জনাব এস এম শামসুল আলম	১২-০৮-১৯৯৬	২০-০১-১৯৯৮
২৮.	জনাব মুহম্মদ আবুল কাশেম	২৫-০১-১৯৯৮	১০-০৪-২০০০
২৯.	জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের	২৪-০৪-২০০০	০৩-০৪-২০০১
৩০.	জনাব হেমায়েত উদ্দিন তালুকদার	০৭-০৫-২০০১	৩১-০৭-২০০১
৩১.	জনাব জামাল উদ্দিন আহমেদ	৩১-০৭-২০০১	০৬-১২-২০০১
৩২.	জনাব হাফিজুর রহমান (ভারপ্রাপ্ত)	০৬-১২-২০০১	২৪-০৪-২০০২
৩৩.	জনাব মো. নাজমুল আহসান	২৪-০৪-২০০২	০৯-০৯-২০০৪
৩৪.	জনাব মোহাম্মদ আলিমুশ্বান	০৪-১০-২০০৪	১২-০৮-২০০৫
৩৫.	জনাব মো. আব্দুল মালেক	২০-০৮-২০০৫	১৮-১১-২০০৬
৩৬.	জনাব মো. মাহফুজুল হক	১৮-১১-২০০৬	১৯-১১-২০০৬
৩৭.	জনাব কবির মো. আশরাফ আলম, এনডিসি	১৯-১১-২০০৬	১৫-০৫-২০০৭
৩৮.	জনাব মো. ইউনুসুর রহমান	১৫-০৫-২০০৭	০৭-০৬-২০১০

ক্রমিক নং	নাম	হতে	পর্যন্ত
৩৯.	জনাব মো. মশিউর রহমান	০৭-০৬-২০১০	২৬-০৬-২০১২
৪০.	জনাব মো. গাউস (ভারপ্রাপ্ত)	২৬-০৬-২০১২	৩০-০৬-২০১২
৪১.	জনাব মো. আব্দুল জলিল	০১-০৭-২০১২	২৮-০৬-২০১৪
৪২.	জনাব মো. আবদুস সামাদ	২৯-০৮-২০১৪	বর্তমান

পরিশিষ্ট-৪

খুলনার জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কালেক্টর ও জেলা প্রশাসকবৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম	হতে	পর্যন্ত
১.	জনাব জেএস ট্রেনর	২৮-০১-১৯৪৭	২২-০১-১৯৪৮
২.	জনাব এএ খান	২৩-০১-১৯৪৮	২৮-০৮-১৯৪৮
৩.	জনাব এএইচ চৌধুরী	২৮-০৮-১৯৪৮	১৯-০২-১৯৪৯
৪.	জনাব এএম সলিমুল্যা	২০-০২-১৯৪৯	০৩-০৪-১৯৫০
৫.	জনাব কিউ ইসলাম	০৪-০৪-১৯৫০	০৫-০৯-১৯৫২
৬.	জনাব আর পি সেখ	১৪-১০-১৯৫২	০৩-০৫-১৯৫৩
৭.	জনাব এ কিউ আনসারী	০৪-০৫-১৯৫৩	০৮-০৬-১৯৫৪
৮.	জনাব আজিজ উল্লা হাসান	১৯-০৯-১৯৫৪	২৩-০৪-১৯৫৫
৯.	জনাব আইএ ইমতেয়াজী	২৪-০৪-১৯৫৫	১৯-০২-১৯৫৬
১০.	জনাব এসএম শফিউল আযম	০১-০৩-১৯৫৬	২৪-০৩-১৯৫৭
১১.	জনাব আবুল এহসান	২৫-০৩-১৯৫৭	০৯-০১-১৯৫৮
১২.	জনাব এমএইচ চৌধুরী	১০-০১-১৯৫৮	১১-১০-১৯৬০
১৩.	জনাব ডাবলু এ খান	১৩-১১-১৯৬০	০৪-০৭-১৯৬২
১৪.	জনাব ওএম কারনি	০৫-০৭-১৯৬২	০২-০৪-১৯৬৩
১৫.	জনাব এসএম আহমেদ	০৩-০৪-১৯৬৩	১০-০৭-১৯৬৩
১৬.	জনাব মফতুন আহমেদ	১১-০৭-১৯৬৩	১৪-১২-১৯৬৪
১৭.	জনাব এম, ইদ্রিস	১৫-১২-১৯৬৪	০৮-০৯-১৯৬৬
১৮.	জনাব ডাবলু এ, চৌধুরী	১২-০৯-১৯৬৬	১৯-০৭-১৯৬৯
১৯.	জনাব ইনাম আহমেদ চৌধুরী	২০-০৭-১৯৬৯	০১-০৩-১৯৭১
২০.	জনাব একেএম নুরুল ইসলাম খান	০২-০৩-১৯৭১	১২-০৭-১৯৭১
২১.	জনাব রশিদ-উল-হাসান	২১-০৭-১৯৭১	১৮-১২-১৯৭১
২২.	জনাব কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী	১৮-১২-১৯৭১	২৩-০১-১৯৭২
২৩.	জনাব আবু হেনা	০৯-০২-১৯৭২	২৫-০১-১৯৭৩
২৪.	জনাব এমএ রহমান	২৫-০১-১৯৭৩	২১-০১-১৯৭৪
২৫.	জনাব নুরুদ্দীন আল মাসুদ	২১-০১-১৯৭৪	২১-০৪-১৯৭৫
২৬.	জনাব সাইফ উদ্দিন আহমেদ	০৫-০৫-১৯৭৫	১৯-০৯-১৯৭৫
২৭.	জনাব আবু হাসনাত মোফাজ্জল করিম	২১-০৯-১৯৭৫	০৪-০৮-১৯৭৬
২৮.	জনাব মাশফেকুর রহমান	০৫-০৮-১৯৭৬	০৪-০৩-১৯৭৭
২৯.	জনাব কাজী লুৎফুল হক	০৪-০৮-১৯৭৭	২৮-১০-১৯৭৮
৩০.	জনাব মো. নুরুল ইসলাম	২৮-১০-১৯৭৮	১৭-০৬-১৯৮২
৩১.	জনাব আব্দুর রহিম চৌধুরী	১৭-০৬-১৯৮২	০৮-০৬-১৯৮৫
৩২.	জনাব একেএম ফজলুল হক মিয়া	১৬-০৬-১৯৮৫	০২-১০-১৯৮৭
৩৩.	জনাব আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী	২৮-১০-১৯৮৭	০৯-০৭-১৯৯০
৩৪.	জনাব আসাদু-উজ-জামান ভূঁইয়া	০৯-০৭-১৯৯০	০৪-১০-১৯৯২
৩৫.	জনাব কাজী রিয়াজুল হক	০৪-১০-১৯৯২	২৮-১১-১৯৯৫
৩৬.	জনাব মো. মুজিবর রহমান	২৬-১১-১৯৯৫	২২-০৪-১৯৯৬
৩৭.	জনাব ইফতিখার আহমদ	২২-০৪-১৯৯৬	০৩-০১-১৯৯৯
৩৮.	জনাব আজহার আলী তালুকদার	০৩-০১-১৯৯৯	২৯-০৩-২০০১

ক্রমিক নং	নাম	হতে	পর্যন্ত
৩৯.	জনাব একেএম রফিকুল ইসলাম	২৯-০৩-২০০১	২২-০৭-২০০১
৪০.	জনাব মো. হুমায়ন কবির	২২-০৭-২০০১	০৪-০৮-২০০১
৪১.	জনাব মো. আব্দুর রাজ্জাক	২৬-০৮-২০০১	২৯-১২-২০০১
৪২.	জনাব মো. রেস্তাদুল ইসলাম	২৪-১২-২০০১	২৩-০৯-২০০৩
৪৩.	জনাব আফতাব হাসান	২৩-০৯-২০০৩	০৯-০৯-২০০৪
৪৪.	জনাব মো. মাহাবুবুর রহমান	০৬-১০-২০০৪	২৬-০৮-২০০৫
৪৫.	জনাব এটিএম মহিউদ্দিন আহমেদ	২৬-০৮-২০০৫	১৮-০২-২০০৬
৪৬.	জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন	২৪-০৪-২০০৬	২৩-১১-২০০৬
৪৭.	জনাব এসএম ফিরোজ আলম	২৩-১১-২০০৬	৩১-০৮-২০০৮
৪৮.	জনাব এনএম জিয়াউল আলম	৩১-০৮-২০০৮	২৭-০৪-২০১০
৪৯.	জনাব মো. জমসের আহাম্মদ খন্দকার	২৭-০৪-২০১০	০১-০৬-২০১২
৫০.	জনাব মেজবাহ উদ্দিন	০১-০৬-২০১২	০৫-১২-২০১৩
৫১.	জনাব আনিস মাহমুদ	০৬-১২-২০১৩	২৬-১২-২০১৪
৫২.	জনাব মো. মোস্তফা কামাল	২৬-১২-২০১৪	২৬-০১-২০১৬
৫৩.	জনাব নাজমুল আহসান	২৬-০১-২০১৬	১১-০৫-২০১৭
৫৪.	জনাব মো. আমিন উল আহসান	১১-০৫-২০১৭	বর্তমান

পরিশিষ্ট: ৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০(দশ)টি বিশেষ উদ্যোগ:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে দ্বিতীয় মেয়াদে সরকার গঠনের পর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া ও রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার অঙ্গীকার নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়। তৃতীয় মেয়াদে ২০১৪ সালে সরকার গঠনের পর দেশের সকল মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্তি, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়কে অগ্রাধিকার প্রদান করে।একইসাথে জনগণের দোরগোড়ায় ডিজিটাল সেবা পৌছানো, নারী ক্ষমতায়ন বাস্তবায়ন, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌছানো, পরিবেশ সুরক্ষা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মোট দশটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

বিশ্বব্যাপী চরম অর্থনৈতিক মন্দা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও সরকারের নিরন্তর প্রচেষ্টায় চলতি অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি সাত শতাংশের মাইলফলক স্পর্শ করেছে। মাথাপিছু আয় ১৬০২ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্যের হার নেমে দাঁড়িয়েছে শতকরা ২২ ভাগে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩৩.৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে।

বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছিলেন ‘আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে-এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন ‘। বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দারিদ্র্য বিমোচনে দশটি বিশেষ উদ্যোগ হাতে নিয়েছেন। এই উদ্যোগসমূহের শতভাগ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধামুক্ত মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ ও ২০৪১-এর মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সরকার।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) সাফল্যের পর ২০১৬ সাল থেকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে চলেছে দেশ। জাতিসংঘের ভাষ্যমতে, এমডিজির লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাংলাদেশকে বলা হয় এমডিজির ‘রোল মডেল’। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এসডিজি) সাফল্য অর্জনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দশটি উদ্যোগ কার্যকরী ভূমিকা রাখবে এবং ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধামুক্ত মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ গড়তে সহায়তা করবে।

উদ্যোগ-১: একটি বাড়ি একটি খামার ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

গ্রামের দরিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প আজ একটি বিপ্লবে পরিণত হয়েছে। আর এই বিপ্লবের মূল সুর- 'দিন বদলের স্বপ্ন আমার, একটি বাড়ি একটি খামার'। এ প্রকল্পের ভিশন হলো নিজস্ব পুজিঁ গঠন ও বিনিয়োগে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবিকায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন ও টেকসই উন্নয়ন। 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প টি ১ জুলাই ২০১৬ থেকে' পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক'- এর সাথে কাজ করছে। এ ব্যাংকের ৪৯%অংশের মালিক প্রকল্পের উপকারভোগীগণ।

অর্জন:

- সারাদেশে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় এযাবৎ ৫৫ হাজার ৭৮৬ টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গড়ে উঠেছে।
- সমিতির উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা ২৯ লাখ ৩৫ হাজার ৮৪৩।
- প্রকল্পের প্রত্যক্ষ উপকারভোগীর সংখ্যা ১ কোটি ৪৭ লক্ষ।
- বছরে প্রকল্পভুক্ত পরিবারে আয় বৃদ্ধি গড়ে ১০ হাজার ৯২১ টাকা।
- প্রকল্প এলাকায় নিম্ন আয়ের পরিবারের সংখ্যা ১৫% থেকে কমে ৩% - এ দাঁড়িয়েছে।
- প্রকল্প এলাকায় অধিক আয়ের পরিবারের সংখ্যা ২৩% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩১% -এ উন্নীত হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- দারিদ্র্যের হার ২২.৮ শতাংশ থেকে ১৮.৬ শতাংশে নামিয়ে আনা এবং ২০২০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের হার ৮ শতাংশে আনার লক্ষ্যে এ প্রকল্প কাজ করছে।
- ২০২১ সালের মধ্যে বর্তমান দারিদ্র্যসীমার নিচের ১ কোটি পরিবারকে প্রকল্পভুক্ত করে দারিদ্র্যকে শূন্যের কোঠায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- লিজকৃত মজা খাস পুকুর/ডোবা/খাল পুন:খনন করে মাছ/ হাঁস চাষের ব্যবস্থা করা।
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনার নিচু জায়গা ভরাট করে সবজি/ ফলজ /ঔষধি গাছ চাষের আওতায় আনা।
- বসত বাড়ি দুর্যোগ সহনীয় করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

উদ্যোগ-২: আশ্রয়ন প্রকল্প

ঘূর্ণিঝড় ও নদীভাঙ্গানে ছিন্নমূল আসহায় পরিবারের পুনর্বাসন এ প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘূর্ণি দুর্গত মানুষের জন্য তৎকালীন নোয়াখালীর (বর্তমানে লক্ষীপুর) রামগতিতে 'গুচ্ছগ্রাম' গড়েছিলেন। একই দৃষ্টান্ত সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭-এর ঘূর্ণিঝড়ে গৃহহীন মানুষের জন্য আশ্রয়ণ গড়ে তোলেন। স্থানীয় প্রশাসন এবং সশস্ত্রবাহিনীর যৌথ সহায়তায় গড়ে উঠেছে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ঋণ ও প্রশিক্ষণদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলাও আশ্রয়ণ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। আশ্রয়ণ কোনো সাহায্য প্রকল্প নয়, হতদরিদ্র মানুষের জীবন- জীবিকার ন্যায্য অধিকার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জনবান্ধব সরকার ছিন্নমূল মানুষের সেই অধিকার নিশ্চিত করছে।

অর্জন:

- সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত এই প্রকল্পের ৩টি পর্যায়ে ১৯৯৭ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ১ লাখ ৫৯ হাজরের বেশি পরিবার পুনর্বাসিত হয়েছে।
- আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর আওতায় ২০১০ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৫৩ হাজারের বেশি পরিবার পুনর্বাসিত হয়েছে।
- ইতিমধ্যে ৮০২ টি প্রকল্প গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে এবং প্রায় ৪ লাখ বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।
- 'নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণ' কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ৬০১ টি ভিক্ষুক পরিবারসহ ১৫,৭৭৫টি গৃহহীন পরিবারকে ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে।
- ২০১০ থেকে অদ্যাবধি ২৩,৫৭৫টি পরিবারের মাঝে ৩৭.৮৭ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং ২৬,০৩০টি পরিবারকে ১০.৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- আশ্রয়ণ প্রকল্প -২ এর আওতায় ২০১৯ সালের মধ্যে ২ লক্ষ ৫০ হাজার গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারকে পুনর্বাসন করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
- আশ্রয়ণ প্রকল্প এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- প্রকল্প এলাকার বাড়িগুলোকে দুর্যোগ সহনীয়ভাবে তৈরি করা।
- প্রকল্প এলাকায় পুকুর খনন করা এবং টেকসই সংযোগ সড়ক ও কালভার্ট নির্মাণ করা।

- দুর্যোগ সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকার বসিন্দাদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

উদ্যোগ-৩: ডিজিটাল বাংলাদেশ

শেখ হাসিনার উপহার ডিজিটার সরকার

বঙ্গাবন্ধু সুখী-স্বনির্ভর 'সোনার বাংলা' গড়তে চেয়েছিলেন। সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই সময়োপযোগী 'ডিজিটাল কর্মসূচি নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে বাংলাদেশ। 'রূপকল্প: ২০২১' বাস্তবায়নের মূল উদ্দেশ্য তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর মধ্যম আয়ের দেশ। সেই লক্ষ্য পূরণে জাতি অঙ্গীকারবদ্ধ। জনগণের দোরগোড়ায় অনলাইন রাষ্ট্রীয় সেবা পৌছানো এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য যাতে ভোগান্তিবিহীন, দুর্নীতিমুক্ত ও স্বচ্ছতার সাথে স্বল্পতম সময়ে জনগণের কাছে সেবা পৌছানো যায়। মোবাইল ও ইন্টারনেট সেবা সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে পৌছানো এবং সরকারি যাবতীয় তথ্য ও সেবাকে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনগণের কাছে তুলে ধরা- এ উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য।

অর্জন:

- ৪,৫৫৪ টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, ৩৮৮ টি উপজেলা ডিজিটাল সেন্টার, ৬১ টি জেলা ডিজিটাল সেন্টার, ৩২৫ টি পৌর ডিজিটাল সেন্টার ও ৪০৭ টি নগর ডিজিটাল সেন্টারসহ এ যাবৎ ৫,৭৩৫ টি ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল তথ্য সেবাকেন্দ্র থেকে অনলাইনে ১১৬ ধরনের সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- সারাদেশে স্থাপিত ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে রুরাল ই-কমার্স কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশের ফলে বর্তমানে দেশে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ১৩ কোটি এবং ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ৭ কোটি।
- ৪৩ হাজার অফিস ও ২৫ হাজার ওয়েবসাইট নিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম ওয়েব পোর্টাল 'জাতীয় তথ্য বাতায়ন' চালু হয়েছে।
- জীবন-জীবিকাভিত্তিক তথ্য এক জায়গা থেকে খুঁজে পেতে বাংলা ভাষায় জাতীয় ই-তথ্য কোষ চালু হয়েছে।
- ২৩,৫০০ টি মাধ্যমিক, ৫,৫০০ টি মাদ্রাসা ও ১৫,০০০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে স্থাপিত হয়েছে।
- ১ম শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত সকল পাঠ্যপুস্তক অনলাইনে প্রাপ্তির জন্য ই-বুক প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে।
- ওয়েবসাইট ও এসএমএস-এর মাধ্যমে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও ভর্তি প্রক্রিয়া চালূ হয়েছে।

- দেশের সকল ভূমি রেকর্ড (খাতিয়ান)-কে ‘ডিজিটাল ল্যান্ড রেকর্ডরুম সার্ভিস’ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- ১,৩৫৫ টি সরকারি অফিসে ই-ফাইলিং চালু হয়েছে।
- ই-পেমেন্ট ও অনলাইন ব্যাংকিং চালু করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সার্ভিস (ইএমটিএস)- এর মাধ্যমে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৭,১২৫ কোটি টাকা প্রেরণ করেছে।
- পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে টাকা জমা-উত্তোলন ও ট্রান্সফারসহ নির্দিষ্ট আউটলেট থেকে কেনাকাটা সম্ভব হচ্ছে।
- ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা, টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে একজন নাগরিক বিনামূল্যে এবং সহজে স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ নিতে পারছেন।
- বাংলাদেশ রেলওয়ে অনলাইন ও মোবাইল টিকেটিং সেবা চালু করেছে।
- ডিজিটাল কার্যক্রমের আওতায় নাগরিক পরিসেবার বিল পরিশোধ, ই-টিন গ্রহণ ও অনলাইন ট্যাক্স প্রদান সম্ভব হয়েছে।
- ডিজিটাল মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।
- হজ ব্যবস্থাপনাকে আরো কার্যকর, সহজ এবং সুশৃঙ্খল করার লক্ষ্যে অনলাইন হজ ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে।
- কৃষি সম্পর্কিত সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, সেবা ও তথ্য সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে কৃষি কল সেন্টার চালু করা হয়েছে।
- সকল সেবা ফরম এক ঠিকানায় প্রাপ্তির লক্ষ্যে ‘ফরমস বাতায়ন’ চালু করা হয়েছে।
- আইটি সেক্টরে গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৪০০ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছে।
- ২০১০ সাল থেকে প্রতিবছর সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষকে ই-সেবার সাথে পরিচিত করানোর লক্ষ্যে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
- তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিশেষ অবদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৫ আইসিটি টেকসই উন্নয়ন পুরস্কার অর্জন করেছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- আইসিটি খাতে গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে ব্যয় জিডিপির ০.৬ শতাংশ থেকে ১ শতাংশে উন্নীতকরণ।
- ২০১৮ সালের মধ্যে আইসিটি খাত থেকে বৈদেশিক আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ১ বিলিয়ন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ব্রডব্যান্ড কভারেজ ৩০ শতাংশ থেকে ৩৫ শতাংশে উন্নীতকরণ।

- ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, পৌর ও নগর পর্যায়ে আরো ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা এবং সেবার পরিধি সম্প্রসারণ করা।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আরো কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন।
- এলজিইডিসহ দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভায় ১০০% ই-জিপি বাস্তবায়ন করা।
- ২০১৯-২০ সময়ের মধ্যে ১০০% জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সম্পন্ন করা। ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ৯৫% জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে।

উদ্যোগ-৪: শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি

শিক্ষিত জাতি সমৃদ্ধ দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তাঁর উদ্যোগে যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশে ৩৬ হাজার ১৬৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়। সে সময় সরকারি শিক্ষকদের পদমর্যাদা লাভ করেন। দেশের ১ লাখ ৫৭ হাজর ৭২৪ জন শিক্ষক। এই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। যার সুফল লাভ করছে শিক্ষার্থীরা।

এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে স্কুল যাওয়ার বয়সি শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে আনয়ন, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, এবতেদায়ী, দাখিল ও এসএসসি পর্যায়ে বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ, মেয়েদের বিনা বেতনে বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ, মেয়েদের বিনা বেতনে অধ্যায়নের সুযোগ এবং শিক্ষা সহায়তা উপবৃত্তি, সকল শ্রেণির মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সহায়তা বৃত্তি প্রদান, পর্যায়ক্রমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয়করণ করা এবং আইটিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনসহ শ্রেণিকক্ষসমূহে মাল্টিমিডিয়া ও ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিতকরণ।

অর্জন:

- দেশে শিক্ষার হার গত ৮ বছরে ৪৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭২.৩০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।
- গত ৮ বছরে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, এবতেদায়ী, দাখিল ও এসএসসি পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে মোট ১৯০ কোটি বই বিতরণ করা হয়েছে।
- ১ জানুয়ারি ২০১৭ সালে ৪.২৭ কোটি শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে ৩৬ কোটি ২২ লক্ষ বই বিতরণ করা হয়েছে।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রাথমিক স্তরের ১২ কোটি ৭ লক্ষ শিক্ষার্থীর মাঝে প্রথম কিস্তিতে ২৮৭ কোটি টাকার উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পঞ্চম শ্রেণিতে সাধারণ ও ট্যালেন্টপুলে মোট ৮২,৪৫৪ জনকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।
- ২৬,১৯৩ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়েছে।
- এ পর্যন্ত ১ লাখ ২০ক হাজার শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ করা হয়েছে।
- সারাদেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৩ হাজার ১৭২ টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।
- অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধির জন্য এযাবৎ ৫,৫৪৯ টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন নিমার্ণ করা হয়েছে।
- পাঠ্যপুস্তকের অনলাইন ভার্সন তৈরি করা হয়েছে।
- ২০১৫ সাল থেকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের ব্রেইল পদ্ধতির বই বিতরণ করা হচ্ছে।
- ১৭ লক্ষ শিক্ষককে কম্পিউটার, ইংরেজি, গণিতসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- উচ্চ শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত নতুন ৮ টি সরকারি এবং ৪২ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
- ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত বেসরকারি মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসার মোট ১,১৬,৮৩৬ জন শিক্ষক ও কর্মচারীকে এম.পি.ও. ভুক্ত করা হয়েছে।
- বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক –কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড থেকে ২০০৯-১৬ পর্যন্ত ৫১,৮৭৪ টি আবেদনের বিপরীতে ২,০৬৪ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার হার শতভাগে উন্নীতকরণ ও গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।
- প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুল ফিডিং কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ঝরে পড়া রোধ, পুষ্টি সহায়তা ও শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করা।
- যে সকল উপজেলায় সরকারি স্কুল ও কলেজ নেই সে সকল উপজেলায় একটি স্কুল ও একটি কলেজ জাতীয়করণ করা।
- অটিস্টিক ও স্নায়ু বিকাশজনিত শিশুদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিকমানের ‘ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম অ্যান্ড নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডায়াবিলিটিজ’ প্রতিষ্ঠান করা হবে।

উদ্যোগ-৫: নারীর ক্ষমতায়ন

সর্বক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য নারীর ক্ষমতায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নারীর সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রনয়ন করা হয়েছে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১'। কৃষিকাজ থেকে শুরু করে এভারেস্ট পর্বতশৃঙ্গে নারীরা উড়িয়েছে বাংলাদেশের বিজয় পতাকা। নারী জনশক্তিনির্ভর তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। নারীর ক্ষমতায়নে প্রধানমন্ত্রীর গৃহীত কর্মসূচি দেশে নারীদের দৃঢ় সামাজিক অবস্থানে নিয়ে গেছে।

অর্জন:

- নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে নারী পুনর্বাসন বোর্ড, জাতীয় মহিলা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে ২০১১ সালে জয়িতা ফাউন্ডেশন গড়ে তোলা হয়েছে।
- মহিলা হোস্টেল নির্মাণ, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণসহ আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।
- নারীর প্রতি সহিসংসতা প্রতিরোধ আইন ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- পাসপোর্টে মায়ের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- দেশব্যাপী ১২ হাজার ৯৫৬টি পল্লি মাতৃস্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মা ও শিশুর যত্নসহ যাবতীয় বিষয়ে উদ্‌বুদ্ধকরণ ও সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হচ্ছে।
- বেতনসহ মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস থেকে ৬ মাসে উন্নীত করা হয়েছে এবং দরিদ্র ও গর্ভবতী মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।
- সরকারি কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ৪০টি মন্ত্রণালয়ের জেন্ডার সেনসিটিভ বাজেট তৈরি হচ্ছে।
- জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ১৩,৪৩২ জন শিক্ষিত বেকার নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- নারীর দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে এযাবৎ প্রায় ১৯ লক্ষ নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- নারীর ক্ষমতায়নে আত্মকর্মসংস্থান কার্যক্রম (IGA) –এর আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য ট্রেড ব্যাংক তৈরি করা হয়েছে।

- ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (VGD) –এর আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১০ লক্ষ উপকারভোগীকে ২৪ মাসের জন্য ৩০ কেজি চাল প্রদান করা হয়েছে।
- শহরাঞ্চলে কর্মজীবী ল্যাকটেটিং ভাতা এর আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ১,৮০,৩০০ জন উপকারভোগীর মধ্য থেকে জেলা পর্যায়ে ৭১,১৯০ জন উপকারভোগীকে মাসিক মাথাপিছু ৫০০ টাকা হারে প্রায় ২২ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ তহবিল-এর আওতায় দেশের ৬৪টি জেলার ৪৮৮টি উপজেলায় ঘূর্ণায়মান প্রক্রিয়ায় প্রায় ১০৯ কোটি টাকা অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- নারীর ক্ষমতায়নে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৮.২০ লক্ষ নারীর প্রশিক্ষণ প্রদান।
- সরকারি চাকরিতে নারী কর্মকর্তার হার ২০২০ সাল নাগাদ ২৫ শতাংশে উন্নীতকরণ।
- ২০ থেকে ২৪ বছরের নারীদের সাক্ষরতার হার শতভাগে উন্নীতকরণ।
- ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২৫.৭৫ কোটি টাকা ঘূর্ণায়মান প্রক্রিয়ায় ৫৩,৮০৩ জন অবহলিত ও সুবিধাবঞ্চিত নারীর মাঝে ৬,২৫৫ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ।
- নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)-এর আওতায় ২০২০ সালের মধ্যে ৪৫ হাজার শহর ভিত্তিক দরিদ্র, অসহায় এবং স্বল্প আয়ের নারীকে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- পরবর্তী ৫ বছরে ২০,০৭০ জন শিক্ষিত বেকার নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়নে আত্মকর্মস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- জুন-২০২০ সাল পর্যন্ত আরো ৫৬,১০০ জন নারীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- গ্রামীণ নারীদের নেতৃত্ব সৃষ্টি করে স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য উদ্‌বুদ্ধ করা।
- ট্রেড ব্যাংকের প্রশিক্ষণ ট্রেডসমূহের উপর ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর থেকে ৬৪টি জেলার ৪২৬টি উপজেলায় নির্বাচিত নারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
- ভিজিডি-এর আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আরো ১০ লক্ষ উপকারভোগীকে সুবিধা প্রদান করা হবে।

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৬ লক্ষ দরিদ্র গর্ভবতী মা-কে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা হবে।
- শহরাঞ্চলে কর্মজীবী ল্যাকটেটিং ভাতা-এর আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২ লক্ষ নতুন উপকারভোগীকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হবে।

উদ্যোগ-৬: ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকা শক্তি বিদ্যুৎ। আর্থসামাজিক ও মানব উন্নয়নে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানো এ কর্মসূচির লক্ষ্য। ২০০৯ সালে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসেই শেখ হাসিনা দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক সাধন করেন। তাঁর দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ফলে দেশের সর্বত্রই এখন বিদ্যুতের আলো পৌঁছে গেছে। প্রচলিত পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি সৌরবিদ্যুৎ, উইন্ডমিল ও বায়োগ্যাস থেকেও বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। এছাড়াও দেশে প্রথমবারের মতো শুরু হতে যাচ্ছে পরমাণু বিদ্যুতের উৎপাদন।

অর্জন:

- ২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দায়িত্ব গ্রহণকালে বিদ্যুতের প্রকৃত উৎপাদন ছিল ৩,২৬৮ মেগাওয়াট। বর্তমানে উৎপাদন ক্ষমতা ১৫,৭৫৫ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে।
- বিগত ৮ বছরে ৪৭% থেকে ৮০% লোক বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে।
- ৮১টি নতুন বিদ্যুৎ প্লান্ট স্থাপিত হয়েছে। নির্মাণাধীন রয়েছে ১৫টি এবং আরো ৪১টি প্লান্ট নির্মাণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিগত ৭ বছরে ১ কোটিরও বেশি গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে।
- ২০০৯ সালের পর সৌর বিদ্যুতের সুবিধাপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা ২০ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১৭ পর্যন্ত মোট ২ কোটিতে এসে দাঁড়িয়েছে।
- দেশের বিদ্যুৎ খাতের অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলে অবকাঠামো, কৃষি ও শিল্প খাতে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- ৭ম পঞ্চবার্ষিকী (২০১৬-২০২০) পরিকল্পনায় ২০২০ সাল নাগাদ ২৩ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং দেশের ৯৬ শতাংশ এলাকাকে বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা রয়েছে।

- রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ২৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিদ্যুৎবিহীন এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সোলার প্যানেল স্থাপন করা।

উদ্যোগ-৭: কমিটিউনিটি ক্লিনিক ও মানসিক স্বাস্থ্য

গ্রামীণ দারিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চত করাই এ কর্মসূচির লক্ষ্য। সকল জনগণের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করাই এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। এর আওতায় সন্তান সম্ভবা মায়েদের মাতৃত্বকালীন যাবতীয় সেবা নিশ্চিত করা, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার সকল ধরনের সবো প্রদান করা, জন্ম, মৃত্যু নিবন্ধন এবং নতুন বিবাহিত দম্পতি ও সন্তানসম্ভবা মায়েদের নিবন্ধিত করা, মা ও শিশুর খাদ্য ও পুষ্টির বিষয়ে সহায়তা প্রদান, বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান এবং জটিল স্বাস্থ্য সমস্যার ক্ষেত্রে উন্নততর চিকিৎসার জন্য উপজেলা ও জেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

অর্জন:

- গ্রামের মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছাতে প্রতি ৬,০০০ মানুষের জন্য একটি কমিউনিটি ক্লিনিক গড়ে তোলা হয়েছে।
- সারাদেশে ১৩,১৩৬ (জুন ২০১৬) কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে বিনামূল্যে ৩০ প্রকার ঔষধ সরবরাহের মাধ্যমে সাধারণ রোগের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- প্রতি হাজারে শিশুমৃত্যুর হার ৪১ থেকে ৩৭ -এ নামিয়ে আনা এবং প্রতি লাখে মাতৃমৃত্যুর হার ১৯৪ থেকে ১০৫-এ নামিয়ে আনা।
- ১২ মাসের নিচের শিশুদের শতভাগ টিকাদান কর্মসূচির আওতায় আনা।
- দম্পতিদের জন্মনিয়ন্ত্রণ সুবিধার আওতায় আনার হার ৭৫ শতাংশ উন্নীতকরণ।
- গার্মেন্টস কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচির আওতায় শিশুদের দিবাকালীন সেবা প্রদান কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হবে।

উদ্যোগ-৮: সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

বয়স্ক, অক্ষম জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত নারীদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি ইত্যাদি সম্পর্কে উদ্‌বুদ্ধকরণ করাই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির লক্ষ্য। অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য মাসিক ভাতার আওতায় আনা হয়েছে। ভূমিহীন, ছিন্নমূল পরিবারের জন্য সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অর্জন:

- ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় সঙ্কটকালীন সময়ে (Lean Period, মার্চ-মে ও নভেম্বর-ডিসেম্বর) ৫০ লক্ষ পরিবারকে ১০ টাকা কেজি দরে পরিবার প্রতি ৩০ কেজি করে চাল বিতরণ করা হচ্ছে।
- সমাজের অবহেলিত, অক্ষম, নিঃস্ব জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার ১৩২টি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম বাস্তাবয়নের জন্য প্রায় ৩৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা ছিল।
- প্রায় ২৫ লক্ষ অসহায় বয়স্ক মানুষের মাসে ৪০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।
- ৯ লাখের অধিক বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত নারীকে প্রতি মাসে ৪০০ টাকা করে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।
- ১ লক্ষ ২০ হাজার ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ৫৫ হাজার একর কৃষিজমি বিতরণ করা হয়েছে।
- ১,৮০,৯৯৬ জন মুক্তিযোদ্ধাকে জনপ্রতি মাসিক ১০ হাজার টাকা সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সময়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায় পর্যন্ত মোট ২ কোটি ১৫ লক্ষ শিক্ষার্থীকে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- ২০২০ সাল নাগাদ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি খাতে ব্যয় জিডিপির ২.৩ শতাংশে উন্নীতকরণ।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরেও খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় সঙ্কটকালীন সময়ে ৫০ লক্ষ পরিবারকে ১০ টাকা কেজি দরে পরিবার প্রতি ৩০ কেজি করে চাল বিতরণ করা হবে।

- মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় প্রতি অর্থবছরে ১৫০০ জন দুস্থ, অসহায়, মহিলার মাঝে ১.৫০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ।
- মাসিক সম্মানী ভাতা প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ১ লক্ষ ৮০ হাজার থেকে বৃদ্ধি করে ২ লক্ষ করা হবে।

উদ্যোগ-৯: বিনিয়োগ বিকাশ

বাংলাদেশ এক বিপুল সম্ভাবনার দেশ। অতীতে এদেশের সৌন্দর্য এবং সম্পদরে প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আরব ও ইউরোপ থেকে বণিকেরা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এদেশে আসত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দায়িত্ব নিয়েই দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য বেশ কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বিনিয়োগের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো বিদ্যুৎ। বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ ঘাটতি দূর করে উৎপাদন ক্ষমতা ১৫৭৫৫ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছে। যোগাযোগ খাতের উন্নয়ন বিনিয়োগের নতুন দ্বার উন্মোচিত করেছে। নির্মানাধীন পদ্মা সেতুর কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। মহাসড়কসমূহ চার লেনে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশের সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে দেশের অভ্যন্তরে এবং আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে পণ্য পরিবহনের ব্যবস্থা সহজ হয়েছে। চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দর অত্যাধুনিক সমুদ্রবন্দর হিসেবে গড়ে উঠেছে।

অর্জন:

- দেশের ৮টি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে ৪৬৪টি চালু শিল্পপ্রতিষ্ঠানে এ যাবৎ ৪.৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ হয়েছে।
- ২০০১-০৮ সময়ে ইপিজেডসমূহে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৯৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০৯-১৬ পর্যন্ত এই বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৬৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ১৭৯%।
- দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ প্রচার ও প্রসার এবং নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিনিয়োগ বোর্ড ও প্রাইভেটাইজেশন কমিশন একীভূত করে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) গঠন করা হয়েছে।
- পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত অঞ্চলসহ দেশের সম্ভাবনাময় এলাকাসমূহে অর্থনৈতিক অঞ্চল সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) গঠন করা হয়েছে।
- সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, আইটি পার্ক, আইটি ভিলেজ, আইটি হাব ও আইটি খাতে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে।
- বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্য সহজতর করতে গ্যাস-বিদ্যুৎ, পানি, টেলিফোন, প্লট বরাদ্দ, ওয়ার্ক পারমিট, রেসিডেন্ট ও নন-রেসিডেন্ট

ভিসাসহ ১৬ ধরনের সেবা এক ছাতার নিচে দেওয়ার জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস অ্যাক্ট ২০১৭ মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- অধিকতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে 'রূপকল্প-২০২১'-এর আওতায় বৈদেশিক বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা ৫.৪ বিলিয়ন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ২০৩০ সালের মধ্যে সারাদেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল সৃষ্ট করা হবে।

উদ্যোগ-১০: পরিবেশ সুরক্ষা

প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা, গবেষণা, উদ্ভিজ্জ জরিপ এবং বনজ সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই পরিবেশ ও বন নিশ্চিতকরণ এ উদ্যোগের লক্ষ্য। বিজ্ঞান ভিত্তিক ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের নিশ্চিতকল্পে মোট বনভুমির পরিমাণ সম্প্রসারণ, বন ও শনাক্তকরণ, দারিদ্র বিমোচন, পরিবেশ দূষণ রোধ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা এবং টেকসই পরিবেশ উন্নয়নই এ কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

অর্জন:

- ২০০৫-০৬ সালের শতকরা ৭-৮ ভাগ থেকে বনভূমির বিস্তার ডিসেম্বর ২০১৬ সালে শতকরা ১৭.৪৮ ভাগে উন্নীত হয়।
- ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে সরকারের নিজস্ব সম্পদ থেকে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (Climate Change Trust Fund) গঠন করা হয়েছে এবং এই ট্রাস্ট্রের তহবিলে ২৯০০ কোটি টাকা সরকার বরাদ্দ দিয়েছে।
- জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় ওযাবৎ আইলা দুর্গত উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় প্রতিরোধী বাড়ি নির্মাণ, দেশব্যাপী ৫৩৫ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন, ১২২ কিলোমিটার নদী বাঁধ সংরক্ষণ এবং ১৫.৪ কিলোমিটার উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণসহ উপকূলীয় এবং বন্যাপ্রবণ এলাকায় ৭৪০টি গভীর নলকূপ খনন, ৫৫০টি বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগার স্থাপন, ৪৯৭১ হেক্টর জমি বনায়ন এবং অফ-গ্রিড এলাকায় ১২,৮৭২টি সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।
- উন্নয়ন সহযোগী এবং দাতাদের সহায়তায় জলবায়ু পরিবর্তন রিজিলিয়েন্স ফান্ড গঠন করা হয়েছে।

- ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩' ০১ জুলাই ২০১৪ থেকে কার্যকর করা হয়েছে। এ আইনের পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে রূপান্তর করা হয়েছে।
- বায়ু দূষণ রোধের জন্য বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ৪৮৬.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মল বায়ু ও টেক্‌সই পরিবেশে (Clean Air & Sustainable Environment-CASE) প্রকল্পটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে।
- ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে মোট ১৮২টি শিল্পকারখানায় বর্জ্য শোধনাগার প্লান্ট (Effluent Treatment Plant- ETP) স্থাপিত হয়েছে। চামড়া শিল্প থেকে ঢাকা শহর ও বুড়গঙ্গা নদীর পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে কেন্দ্রীয়ভাবে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপনপূর্বক হাজারীবাগের ট্যানারিগুলো সাভারের হরিণধরা এলাকায় স্থানান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- পরিবেশ সংরক্ষণে গৃহীত অন্যান্য আইনগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন-২০১০, পরিবেশ আদালত আইন-২০১০, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন-২০১০, বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন-২০১০।
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষেত্রে তাঁর সুদূরপ্রসারী উদ্যোগের জন্য জাতিসংঘের পলিসি লিডারশিপ শ্রেণিতে 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ-২০১৫' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- ২০২০ সাল নাগাদ বনভূমির হার ২০ শতাংশে উন্নীতকরণ।
- ঢাকাসহ অন্যান্য শহরে বায়ুর গুণগত মান বাড়ানো এবং বায়ু দূষণ কমিয়ে আনা।
- শিল্পকারখানায় বর্জ্য নির্গমণ শূন্যতে নামিয়ে আনা।
- ১৫ শতাংশ জলাশয় শুষ্ক মৌসুমে অভয়ারণ্য হিসেবে গড়ে তোলা।
- জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

পরিশিষ্ট-৬

গত ১ দশকের খুলনা জেলার প্রকল্প সমূহের প্রতিবেদন।

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লাখ টকায়)	প্রকল্প হতে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তার বর্ণনা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।	খুলনা ১০০ শয্যাবিশিষ্ট ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ।	কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	১১৬৩.১৯	হাসপাতালটিতে ডায়াবেটিক রোগীরা চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন।	হস্তান্তরিত, প্রত্যাশী সংস্থা ব্যবহার করছে।
২।	নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ৫টি বিভাগীয় শহরে ভৌত সুবিধাদি সৃষ্টিকরণ প্রকল্পের মধ্যে খুলনায় একটি নির্মাণকাজ।	কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	৯৪৪.৮৮	নির্যাতিত মহিলাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।	হস্তান্তরিত, প্রত্যাশী সংস্থা ব্যবহার করছে।
৩।	বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় শহরে ১১টি পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ, তম্মধ্যে খুলনায় একটি	কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	৬২৫.০০	প্রকল্পটি হতে পাসপোর্ট সংক্রান্ত যাবর্তীয় সেবা দেওয়া হচ্ছে।	হস্তান্তরিত, প্রত্যাশী সংস্থা ব্যবহার করছে।
৪।	সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন ২য় পর্যায় (ডিএম অংশ) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় খুলনা বিভাগীয় শহরে অফিস কাম প্রসেসিং অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণকাজ।	কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	৫১৬.৩৯	প্রকল্পটি হতে কৃষিপণ্য ও ভোগ্য পণ্য বাজারজাত করণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।	হস্তান্তরিত, প্রত্যাশী সংস্থা ব্যবহার করছে।
৫।	খুলনা রিজিওনাল সার্ভার স্টেশন নির্মাণকাজ।	কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	৪৪৯.৩৩	ভবনটি হতে নির্বাচন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম সম্পাদন করছে।	হস্তান্তরিত, প্রত্যাশী সংস্থা ব্যবহার করছে।
৬।	খুলনা পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার (পিটিসি) ৬তলা ভিতবিশিষ্ট ব্যারাক ভবনের ২য় তলা (ফাউন্ডেশনসহ নিচতলা ও ২য় তলা) নির্মাণকাজ।	কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	৬৭৩.৩৫	ভবনটি পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের কনস্টেবলেরা আবাসন সুবিধা ভোগ করছে।	হস্তান্তরিত, প্রত্যাশী সংস্থা ব্যবহার করছে।
৭।	খুলনা পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার (পিটিসি) ৬তলা ভিতবিশিষ্ট ব্যারাক ভবনের ৩য় ও ৪র্থ তলার (ফাউন্ডেশনসহ নিচতলা ও ২য় তলা) নির্মাণকাজ।	কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	৪৬২.৪৮	ভবনটি পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের কনস্টেবলেরা আবাসন সুবিধা ভোগ করছে।	হস্তান্তরিত, প্রত্যাশী সংস্থা ব্যবহার করছে।
৮।	খুলনা আমর্ড পুলিশ ব্যাটালিয়নের ৬ তলা ভিতবিশিষ্ট ব্যারাক ভবন	কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	৪৫৪.৭৩	ভবনটি হতে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের কনস্ট্রাকশনের আবাসন	হস্তান্তরিত, প্রত্যাশী সংস্থা ব্যবহার

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লাখ টকায়)	প্রকল্প হতে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তার বর্ণনা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
	নির্মাণকাজ।			সুবিধা ভোগ করছে।	করছে।
৯।	খুলনা জেলার এলাইপুর আনসার ব্যাটালিয়নের এসএম ব্যারাক ভবন নির্মাণকাজ।	কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	২৪৫.০০	আনসার বাহিনীর সদস্যবৃন্দ আবাসনের সুবিধা ভোগ করছে।	হস্তান্তরিত, প্রত্যাশী সংস্থা ব্যবহার করছে।
১০।	দেশের গুরুত্বপূণ উপজেলা সদরে/স্থানে ৭৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের আওতায় খুলনায় ১টি খুলনাস্থ সেনহাটি এলাকায় স্থল নদী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নির্মাণকাজ।	কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	২৩৪.৯২	দৌলতপুর শিল্প এলাকায় অবস্থিত কলকারখানার অগ্নি নির্বাপনের সুবিধা পাচ্ছেন।	হস্তান্তরিত, প্রত্যাশী সংস্থা ব্যবহার করছে।
১১।	খুলনা সার্কিট হাউজ (নতুন ভবন) এর উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ কাজ।	কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	২৫০.১৪	খুলনা আগত মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় মন্ত্রীবর্গ ও সরকারের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ আবাসন সুবিধা ভোগ করছে।	হস্তান্তরিত, প্রত্যাশী সংস্থা ব্যবহার করছে।
১২।	খুলনা রেঞ্জ ডিআইজি এর জন্য ৬-তলা ভিতবিশিষ্ট ২য় অফিস ভবনের ভিত সহ নিচ তলার নির্মাণকাজ।	কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	৭২৫.৩৪	খুলনা রেঞ্জ, ডিআইজি এর আওতাধীন সকল পুলিশ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমসংক্রান্ত সুবিধা পাচ্ছে।	হস্তান্তরিত, প্রত্যাশীসংস্থা ব্যবহার করছে।
১৩।	দৌলতপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নির্মাণ।	কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	৫৫.৯৭	দৌলতপুর শিল্প এলাকার অগ্নি নির্বাপনের সুবিধা পাচ্ছেন।	হস্তান্তরিত, প্রত্যাশী সংস্থা ব্যবহার করছে।
১৪।	দেশের গুরুত্বপূণ উপজেলা সদরে/স্থানে ৭৮টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের আওতায় খুলনায় ১টি খুলনাস্থ খালিশপুর এলাকায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নির্মাণকাজ।	কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	১৬০.৩৪	খালিশপুর শিল্প এলাকার অগ্নি নির্বাপনের সুবিধা পাচ্ছে।	হস্তান্তরিত, প্রত্যাশী সংস্থা ব্যবহার করছে।
১৫।	চতুর্বাষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত দিঘলিয়া, সোনাডাঙ্গা, ফুলতলা ও রূপসা থানা স্টাফ	কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	২৮৬.৪১	চারটি থানার পুলিশ কনষ্ট্রাকশনের আবাসিক সুবিধা ভোগ করছে।	প্রত্যাশী সংস্থা ব্যবহার করছে।

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লাখ টকায়)	প্রকল্প হতে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তার বর্ণনা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
	কোয়ার্টার নির্মাণকাজ।				
১৬।	খুলনা বিভাগীয় সদরে ৫০ জন মহিলা পুলিশ সদস্যদের জন্য ডরমেটরি নির্মাণকাজ।	কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	১১৩.৩৫	মাহিলা পুলিশ সদস্যরা আবাস সুবিধা ভোগ করছে।	প্রত্যাশী সংস্থা ব্যবহার করছে।
১৭।	৪টি বিদ্যমান পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার উন্নয়ন তম্মধ্যে খুলনা ১টি নির্মাণকাজ।	কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	৬৫.৫০	পুলিশ বাহিনীর প্রশিক্ষণরত সদস্য ও অন্যান্য পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা আবাসন সুবিধাসহ অন্যান্য সুবিধা ভোগ করছে।	প্রত্যাশী সংস্থা ব্যবহার করছে।
১৮।	২৫০ শহিদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণকাজ।	কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	৪০০.০০	হাসপাতালটিতে রোগীদের চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে।	হস্তান্তরিত, প্রত্যাশী সংস্থা ব্যবহার করছে।
১৯।	খুলনা কেএমপি এর চাঁনমারী পুলিশ ফাঁড়ি নির্মাণকাজ।	কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	২৬.১৪	পুলিশ সদস্যরা উক্ত ফাঁড়িতে থেকে এলাকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছে।	প্রত্যাশী সংস্থা ব্যবহার করছে।
২০।	খুলনা মেডিকেল কলেজের ইন্টার্নি ডাক্তারদের হোস্টেল ভবন নির্মাণকাজ।	কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	৩৫০.০০	ইন্টার্নিরত ডাক্তারগণ আবাসন সুবিধা ভোগ করছে।	হস্তান্তরিত, প্রত্যাশী সংস্থা ব্যবহার করছে।
২১।	খুলনা মেডিকেল কলেজের ছাত্র হোস্টেল ভবন নির্মাণকাজ।	কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	৫২৬.৭৬	খুলনা মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্ররা আবাসন সুবিধা ভোগ করছে।	হস্তান্তরিত, প্রত্যাশী সংস্থা ব্যবহার করছে।
২২।	শিরোমনি জাহানাবাদ মুক্তিযুদ্ধকালীন সম্মুখ সমরের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণকাজ।	কাজ সমাপ্ত।	৫৪.২৫	মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিচারণ ও চিরস্মরণীয় করার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।	কাজ সমাপ্ত।
২৩।	খুলনা আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের ৪-তলা ভিতবিশিষ্ট ব্যারাক ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ কাজ।	কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	১৫০.০০	আমর্ড পুলিশ সদস্যরা আবাসন সুবিধা ভোগ করছে।	হস্তান্তরিত, প্রত্যাশী সংস্থা ব্যবহার করছে।
২৪।	খুলনা মেডিকেল কলেজের অ্যাকাডেমিক ভবনের এ ও বি ব্লকের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ কাজ।	কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	১২৩১.০০	খুলনা মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা অ্যাকাডেমিক সুবিধা ভোগ করছে।	হস্তান্তরিত, প্রত্যাশী সংস্থা ব্যবহার করছে।
২৫।	খুলনা জেলা দৌলতপুর উপজেলায় সার্ভার স্টেশন	কাজটি বাস্তবায়ন	৫৫.৯৭	ভবনটি হতে দৌলতপুর এলাকার নির্বাচন	হস্তান্তরিত, প্রত্যাশী সংস্থা

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লাখ টকায়)	প্রকল্প হতে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তার বর্ণনা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
	নির্মাণকাজ।	করা হয়েছে।		সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম সম্পাদন করছে।	ব্যবহার করছে।
২৬।	পুলিশ বিভাগের ১০১টি জরাজীর্ণ থানা ভবন টাইপ প্ল্যানে নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় খুলনা জেলার তেরখাদা থানা ভবন নির্মাণকাজ।	কাজ চলছে।	৬৩৩.৬১	ভবনটি নির্মাণকাজ শেষ হলে উক্ত থানাবাসী সুবিধা ভোগ করবেন।	কাজ চলছে।
২৭।	এক্সটেনশন অব শহিদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণকাজ।	কাজ চলছে।	৫৬২২.৪১	হাসপাতালটির নির্মাণকাজ সমাপ্ত হলে রোগীরা যথাযথ সেবা পাবেন।	কাজ চলছে।
২৮।	খুলনা মহেশ্বরপাশা শিশু পরিবারের হোস্টেল ভবন নির্মাণকাজ।	কাজ চলছে।	৬৫৯.১৮	অনাথ শিশুরা আবাসন সুবিধা ভোগ করবেন।	কাজ চলছে।
২৯।	খুলনা জেলার বিভাগীয় শিল্পকলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণকাজ।	কাজ চলছে।	২১১৩.৯৬	খুলনা জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের সাংস্কৃতিক বিষয়ক সুবিধা ভোগ করবেন।	কাজ চলছে।
৩০।	খুলনা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণকাজ।	কাজ চলছে।	৪৮৬৮.৪৮	ভবনটি হতে বিচারিক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	৫ম তলা পর্যন্ত কাজ সমাপ্ত। প্রত্যাশী সংস্থা ব্যবহার করছে। উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণের কাজ চলমান রয়েছে।
৩১।	খুলনা মেডিকেল কলেজের অডিটরিয়াম ভবন নির্মাণকাজ।	কাজ চলছে।	৯৫০.০০	ভবনটি বাস্তবায়ন হলে বিভিন্ন সভা সমাবেশ সুন্দরভাবে পরিচালনা করা যাবে।	কাজ চলছে।
৩২।	খুলনা র‌্যাব-৬ কমপেলক্স ভবন নির্মাণকাজ।	কাজ চলছে।	৫৯৪৫.২৩	খুলনা র‌্যাব-৬ কমপেলক্স ভবনটি নির্মাণকাজ সম্পূর্ণরুপে সমাপ্ত হলে র‌্যাব বাহিনীর যাবতীয় কার্যক্রমসহ আবাসন সুবিধা ভোগ করবেন।	কাজ চলছে।
৩৩।	দেশে গুরুত্বপূর্ণ ৭৮টি উপজেলা/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	ফিনিশিং কাজ চলছে।	১৯৫.৮২	রূপসা উপজেলাবাসী অগ্নি নির্বাপণের সুবিধা ভোগ করবেন।	কাজ চলছে।

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লাখ টকায়)	প্রকল্প হতে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তার বর্ণনা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
	স্টেশন ভবন নির্মাণ তন্মধ্যে রূপসায় একটি।				
৩৪।	খুলনা বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রকের অফিস ভবন নির্মাণকাজ।	৫ম তলার কাজ চলছে।	৮৪৮.৯২	সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বেতনভাতাসহ যাবতীয় অর্থ নৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।	৪র্থ তলা পর্যন্ত কাজ সমাপ্ত প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছে।
৩৫।	খুলনা মেডিকেল কলেজের আইসিইউ ও ক্যাজুয়ালিটি ভবন নির্মাণকাজ।	ফিনিশিং কাজ চলছে।	১০২৫.০০	ভবনটি নির্মাণকাজ সমাপ্ত হলে রোগীরা যথাযথ সেবা পাবেন।	কাজ চলছে।
৩৬।	এলাইপুর আনসার ব্যাটালিয়ন ভবন নির্মাণকাজ।	কাজ চলছে।	১০৩৭.০০	আনসার বাহিনীর সদস্যদের আবাসনের সুবিধা ভোগ করবেন।	কাজ চলছে।

পরিশিষ্ট-৭

সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগ, খুলনায় বিগত ১ দশকে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের তথ্যাদি:

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্প হতে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তার বর্ণনা	মন্তব্য
	২০০৬-০৭ অর্থবছর				
১	সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনা সহায়তা প্রদান প্রকল্প	প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ	৮৯৭২১০১.৮০	৪৬ হে. বনায়ন, বিবিধ অবকাঠামো নির্মাণ, ২টি সুপেয় পানির পুকুর খনন, ১টি পর্যবেক্ষণ টাওয়ার নির্মাণ, পায়ে চলার পথ নির্মাণসহ বিবিধ উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করা হয়। উক্ত কাজে স্থানীয় জনসাধারণের সম্পৃক্ততায় কয়েক হাজার লোকের সাময়িক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়।	
	২০০৭-০৮ অর্থবছর				
১	সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনা সহায়তা প্রদান প্রকল্প	প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ	৭৬০১৪৬৫.০৩	১০০ হে. বনায়ন, বিবিধ অবকাঠামো নির্মাণ, ১টি পর্যবেক্ষণ টাওয়ার নির্মাণ, পন্ড-স্যান্ড ফিল্টার স্থাপন, জেটি নির্মাণসহ বিবিধ উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করা হয়। উক্ত কাজে স্থানীয় জনসাধারণের সম্পৃক্ততায় কয়েক হাজার লোকের সাময়িক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়।	
	২০০৮-০৯ অর্থবছর				
১	সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনা সহায়তা প্রদান প্রকল্প	প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ	৪৬৫১৭৪৭.৭৪	৫০ হে. বনায়ন, বিবিধ অবকাঠামো উন্নয়ন, কাঠের জেটি, জেটি, সেতু বর্ধিতকরণসহ বিবিধ উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করা হয়। উক্ত কাজে স্থানীয় জনসাধারণের সম্পৃক্ততায় কয়েক হাজার লোকের সাময়িক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়।	
	২০০৯-১০ অর্থবছর				
১	সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনা সহায়তা প্রদান প্রকল্প	প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ	৩৪৮৭২০৭.৩৮	বাগান রক্ষণাবেক্ষণ, জলযান রক্ষণাবেক্ষণ, অবকাঠামো বর্ধিতকরণ ও উন্নয়ন, জেটি,	

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্প হতে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তার বর্ণনা	মন্তব্য
				সেতু বর্ধিতকরণ ও উন্নয়নসহ বিবিধ উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করা হয়। উক্ত কাজে স্থানীয় জনসাধারণের সম্পৃক্ততায় কয়েক হাজার লোকের সাময়িক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়।	
২	রাজস্ব বাজেটভুক্ত সুন্দরবনের অবকাঠামো পুনর্বাসন ও উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচি	প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ	৮১৩৫৩৭৮.৯৩	বিবিধ অবকাঠামো মেরামত, পুকুর খনন-২টি, পুকুর পুনর্খনন -১০টি, পন্ড স্যান্ড ফিল্টার-১টি সহ বিবিধ মেরামত কাজ সম্পাদন করা হয়। উক্ত কাজে স্থানীয় জনসাধারণের সম্পৃক্ততায় কয়েক হাজার লোকের সাময়িক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়।	
৩	রাজস্ব বাজেটভুক্ত সুন্দরবনের যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনর্বাসন ও উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচি	প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ	২৫১৯৬৭৪০.০০	সুন্দরবনের অভ্যন্তরে ওয়্যারলেস সিস্টেম স্থাপন, কাঠবডি ট্রলার এবং নৌকা তৈরি, সোলার সিস্টেম স্থাপনসহ ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করা হয়। উক্ত কাজে কয়েক হাজার লোকের সাময়িক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়।	
	২০১০-১১ অর্থবছর				
১	রাজস্ব বাজেটভুক্ত সুন্দরবনের অবকাঠামো পুনর্বাসন ও উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচি	প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ	১৩০৬৪৭০৩.৩৯	বিবিধ অবকাঠামো মেরামত, পেট্রোল পোস্ট, ক্যাম্প নির্মাণ, সেন্ট্রি ব্যারাক, কর্মচারীদের ব্যারাক নির্মাণ, পুকুরখননসহ ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করা হয়। উক্ত কাজে স্থানীয় জনসাধারণের সম্পৃক্ততায় কয়েক হাজার লোকের সাময়িক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়।	
২	রাজস্ব বাজেটভুক্ত সুন্দরবনের যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনর্বাসন ও উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচি	প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ	১৩৬৫৮৫০১.৪০	জলযান মেরামত, কাঠের ইঞ্জিনচালিত নৌকা, কাঠের নৌকা, কেবিন ক্রুজার, সোলার সিস্টেম, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রসহ বিবিধ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয়	

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্প হতে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তার বর্ণনা	মন্তব্য
				করা হয়। উক্ত কাজে কয়েক হাজার লোকের সাময়িক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়।	
৩	সুন্দরবন এনভায়নমেন্টাল অ্যান্ড লাইভলিহুডস সিকিউরিটি (সিলস) প্রকল্প	প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ	২৯৫০০০০.০০	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট সরবরাহ	
	২০১১-১২ অর্থবছর				
১	সুন্দরবন এনভায়নমেন্টাল অ্যান্ড লাইভলিহুডস সিকিউরিটি (সিলস) প্রকল্প	প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ	৮৬৫২৯৬৮.৬০	প্রচার বিজ্ঞাপন এবং পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট সরবরাহ	
২	রাজস্ব বাজেটভুক্ত সুন্দরবনের অবকাঠামো পুনর্বাসন ও উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচি	প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ	৭০০২২০৮.৬৫	বিবিধ অবকাঠামো মেরামত, পুকুর পুনর্খনন, কাঁটা তারের বেড়াসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ সহ ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করা হয়। উক্ত কাজে স্থানীয় জনসাধারণের সম্পৃক্ততায় কয়েক হাজার লোকের সাময়িক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়।	
৩	রাজস্ব বাজেটভুক্ত সুন্দরবনের যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনর্বাসন ও উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচি	প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ	৯৯৩৮১২৩.৮৫	জলযান মেরামত, ওয়াটার বার্জ ক্রয়, দেশি নৌকা, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ক্রয় করা হয়। উক্ত কাজে কয়েক হাজার লোকের সাময়িক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়।	
	২০১২-১৩ অর্থবছর				
১	সুন্দরবন এনভায়নমেন্টাল অ্যান্ড ক্ষ লাইভলিহুডস সিকিউরিটি (সিলস) প্রকল্প	প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ	১৮০০১৫৮৫.০০	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট সরবরাহ এবং সরবরাহ ও সেবা খাতে ব্যয়	
২	বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ইকোট্যুরিজম উন্নয়ন প্রকল্প	প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ	৩৯৩৬১০৬.৮০	ইঞ্জিনচালিত নৌকা তৈরি, নিরাপত্তা বেড়া তৈরিসহ বিবিধ উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করা হয়। উক্ত কাজে স্থানীয় জনসাধারণের সম্পৃক্ততায় কয়েক হাজার লোকের সাময়িক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়।	

পরিশিষ্ট-৮

গত ১ দশকের খুলনা জেলার বড়ো বড়ো প্রকল্পসমুহের তালিকা

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	প্রাক্কলিতব্যয়	প্রকল্প হতে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তার বর্ণনা	মন্তব্য
১	পাইকগাছা উপজেলাধীন দাকোপ- বটবুনিয়া - ঝালবুনিয়া - গড়ুইখালী - হাতিয়ার ডাঙ্গা-কয়রা সড়ক উন্নয়ন (চেই. ০০-৮৩৪৪মি.)।	১০০%	৪৮৫১৪৬৩৭.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষিপণ্য পরিবহণ ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন	
২	ডুমুরিয়া উপজেলাধীন বানিয়াখালী জিসি- শরাফপুর - কৈয়া জিসি সড়ক উন্নয়ন (চেই. ২৫০০-১৬৮৯৭.০০মি.)।	১০০%	১২৯৮০৯৪৩৫.০০	-ঐ-	
৩	দাকোপ উপজেলাধীন কালিনগর জিসি মোংলাপোর্ট (বানিশামন্ত বাজার) সড়ক বিসি দ্বারাউন্নয়ন (চেই. ০০-১৮৫০০মি.)।	১০০%	১৬৯০৮৭৬৩১.০০	-ঐ-	
৪	পাইকগাছা উপজেলাধীন কপিলমনি জিসি- কাঠালতলা আরঅ্যান্ডএইচ ভায়া তালতলা সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন (চেই. ০০-৫০৮০মি.)।	১০০%	৫৪১৮৮৬৫৭.০০	-ঐ-	
৫	পাইকগাছা উপজেলাধীন চাঁদখালী জিসি- গজালিয়া- আলমতলা বাজার- বাইনতলা বাজার- মিনহাজ বাজার- গড়ুইখালী সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন (চেই. ০০-৫৩৫০মি. এবং (চেই. ৭৮৫০-২৩১৯০মি.)।	১০০%	২০৭৬৫৭৪৭৪.০০	-ঐ-	
৬	ডুমুরিয়া উপজেলাধীন কাঠালতলা-মাগুরখালি - কপিলমুনি সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন (চেই. ০০-২৪৮০০মি.)।	১০০%	১৫৩২৪০৭৮২.০০	-ঐ-	
৭	দাকোপ উপজেলাধীন দাকোপ উপজেলা হেডকোয়ার্টার (আচাঁভূয়া) - বটবুনিয়া জিসি সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন (চেই. ০০-১০৯৫০মি.)।	১০০%	১০৫২১৭৪১৬.০০	-ঐ-	
৮	পাইকগাছা উপজেলাধীন কপিলমনি জিসি- শামুকপোতাবাজার কাঠামারী বাজার- জামতলা বাজার-	১০০%	৯৪১৯৫৬২৪.০০	-ঐ-	

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	প্রাক্কলিতব্যয়	প্রকল্প হতে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তার বর্ণনা	মন্তব্য
	বারোয়াড়িয়া জিসি সড়ক বিসিদ্বারা উন্নয়ন (চেই. ০০-১১৭০০মি.)।				
৯	খুলনা জেলার কয়রা উপজেলাধীন (ক) সাউথ কালিকাপুর, (খ) কয়রা মদিনাবাদ, (গ) ৩ নং কয়রা কমিউনিটি প্রাইমারি স্কুল, (ঘ) ৫ নং কয়রা কমিউনিটি প্রাইমারি স্কুল, (ঙ) কয়রা মনোরমা (চ) ৬ নং গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টারের সংযোগ সড়কনির্মাণ।	১০০%	১৩৬৬৫২০৯৩.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষিপণ্য পরিবহণ ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন	
১০	খুলনা জেলায় কয়রা উপজেলাধীন (ক) বাবুরাবাদ, (খ) ভাগবা বনফুল, (গ) পশ্চিমহড্ডা, (ঘ) হড্ডা মাঝহার চেক, (ঙ) মধ্য মশ্বেরীপুরও দাকোপ উপজেলাধীন (চ) বি কে কচা প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টারের সংযোগ সড়ক নির্মাণ।	১০০%	১৪৮১১৯৯৫১.০০	-ঐ-	
১১	খুলনা জেলায় কয়রা উপজেলাধীন (ক) হাতিয়ারডাঙ্গা সুড়িখালী,(খ) মশ্বেরীপুর ইউপি-বানিয়াখালী বাজার (গ) শাজাহানগাজী, বাড়ি এবং শিমিলার আইট দাখিল মাদরাসা, (ঘ) দেওলিয়ার হাট-কাশিরাবাদ (ঙ) নারায়নপুর লঞ্চঘাট উলাবগা, (চ) দেওয়াড়া বাজার- ঘুগরাকাটি ও দাকোপ উপজেলাধীন (ছ) ঘুনারী কালিকা বাড়ি-ঘুনারী কারণকামিত্ম (জ) নলডাংগা-লক্ষীখোলা (ঝ) উত্তর বানিশামন্ত-কালিকাপদ শীলের বাড়ি সাইক্লোন শেল্টার সংযোগ সড়ক নির্মাণ	৫৬%	১১২৯৬২২৩০.০০	-ঐ-	চলমান
১২	দাকোপ উপজেলাধীন বটবুনিয়া জিসি-লক্ষ্মীখোলা বাজার সড়ক উন্নয়ন (চেই. ০০-৪৪০৬মি.)।	১০০%	১০৪৬৫২৭০.০০	-ঐ-	
১৩	দাকোপ উপজেলাধীন বটবুনিয়া জিসি-লক্ষ্মীখোলা বাজার সড়ক	১০০%	১৪২৯৭৪৬৪.০০	-ঐ-	

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	প্রাক্কলিতব্যয়	প্রকল্প হতে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তার বর্ণনা	মন্তব্য
	উন্নয়ন (চেই. ১০৯৫০-১২৬৬৭মি.)।				
১৪	বটিয়াঘাটা উপজেলাধীন গংগারামপুর-তিতুখালী হাট সড়ক (চেই. ০০-১৪০০মি.) এবং (চেই. ৪৭৮০-৭০৫০মি.)।	১০০%	২০৯০৬৩৭৬.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষিপণ্য পরিবহণ ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন	
১৫	দিঘলিয়া উপজেলাধীন মাঝিরগাতি-বামনডাঙ্গা-কাটেংগা সড়ক (চেই. ১৮০-২৫০০মি.)।	১০০%	১২৭১৩১৬৪.০০	-ঐ-	
১৬	তেরখাদা উপজেলাধীন জয়সেনা বাজার- গাজীরহাট ইউপি অফিস সড়ক (চেই. ১২২০-৩৭২০ মি.)।	১০০%	১০৪১৮৪৯৬.০০	-ঐ-	
১৭	রূপসা উপজেলাধীন শিয়ালিরহাট-নরনিয়া সড়ক (চেই. ০.০০-১৮০০ মি.)।	১০০%	১১৬৯১৭১০.০০	-ঐ-	
১৮	ডুমুরিয়া উপজেলাধীন কুমরাইল-চেচুরি সড়ক (চেই. ১৩২০০-১৫২০০ মি.)।	১০০%	১৭১৪৩৩৬৭.০০	-ঐ-	
১৯	বটিয়াঘাটা উপজেলাধীন নিজগ্রাম-বিরাট ভায়া বালিয়াডাঙ্গা ইউপি অফিস সড়ক (চেই. ১০০০-৩০০০মি.) বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১০০%	১০৪৩৬৫৬৩.০০	-ঐ-	
২০	ডুমুরিয়া উপজেলাধীন বানিয়াখালী জিসি-বারোয়াড়িয়া জিসি সড়ক (চেই.১৪০৫০-২০৫০০মি.) মেরামত	১০০%	৭৮৪০০০০.০০	-ঐ-	
২১	পাইকগাছা উপজেলাধীন বাঁকা জিসি-কাটাখালী বাজার সড়ক (চেই. ৩৮০-৩৪৮৫মি.) পুনর্বাসন	১০০%	৫৮১০০০০.০০	-ঐ-	
২২	বটিয়াঘাটা উপজেলাধীন রাজবন্ধা-কৈয়াহাট সড়ক (চেই. ০০-৩০০০মি.) মেরামত।	১০০%	৪৭০০০০০.০০	-ঐ-	
২৩	পাইকগাছা উপজেলাধীন পাইকগাছা জিসি - গড়ুইখালী জিসি সড়ক (চেই. ১৭৬০-৮২১৫মি.) মেরামত।	১০০%	৭৪৫০০০০.০০	-ঐ-	

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	প্রাক্কলিতব্যয়	প্রকল্প হতে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তার বর্ণনা	মন্তব্য
২৪	দিঘলিয়া উপজেলাধীন দৌলতপুর - সেনহাটী - মাঝিরগাতী সড়ক (চেই. ১০৮০০-১৩১২৫মি.) পুনর্বাসন।	১০০%	১০০৪০০০০.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষিপণ্য পরিবহণ ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন	
২৫	বটিয়াঘাটা উপজেলাধীন হাটবাটিহাট-কৈয়াহাট ভায়া বগুলারডাঙ্গা সড়ক (চেই. ১০০২০-১১৪২০মি.) পুনর্বাসন	১০০%	৭৬৭০০০০.০০	-ঐ-	
২৬	রূপসা উপজেলাধীন থানা হেডকোয়ার্টার-আলাইপুর হাট - শেখপুরা জিসি (রূপসা অংশ) সড়ক (চেই. ১৯৪৮-৫৫০০মি. এবং ৯৫০০-১১৬২০মি.) মেরামত	১০০%	৯৪০০০০০.০০	-ঐ-	
২৭	দাকোপ-বটবুনিয়া-ঝালবুনিয়া গড়ুইখালী- হাতিয়ারডাঙ্গা-কয়রা সড়ক(চেই: ৪৯৭০- ৮৫২০মি:) এইচ বিবি দ্বারা উন্নয়ন এবং ১৭০০মি. চেইনেজে ১টি ইউড্রেন নির্মাণ।	১০০%	৭৪৫২৭৩৪.০০	-ঐ-	
২৮	কাঠালতলা-মাগুরখালী-কপিলমুনি জিসি সড়ক (চেই. ৮৮০০-১০২৪২মি:) বিসি দ্বারা উন্নয়ন।	১০০%	৫৯৮৭৪৪৯.০০	-ঐ-	
২৯	আলাইপুর হাট - খুলনা তেরখাদা আরঅ্যান্ডএইচ সড়কে আলাইপুর বাজারের নিকট আঠারোবেকী নদীর ওপর নির্মিত ২১০.১৫ মি. Pretressed Girder Bridge এর অ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ (চেই. ২০০- ৭৬০ মি.)।	১০০%	৫১৩৪৮৬৮.০০	-ঐ-	
৩০	দাকোপ উপজেলাধীন কৈলাশগঞ্জ বুটিমারী বাজার - কৈলাশগঞ্জ দিনেশ মন্ডলের বাড়ি ভায়া বঙ্গবন্ধু হাইস্কুলএবং দোলকোলা হাসপাতাল সড়ক (চেই. ০০-১০০০মি.) পুনর্বাসন।	১০০%	৭৬,৮১,৪৩১.০০	-ঐ-	
৩১	দাকোপ উপজেলাধীন কৈলাশগঞ্জ ভুটিমারী বাজার-কৈলাশগঞ্জ দিনেশ মন্ডলের বাড়ি ভায়া বঙ্গবন্ধূ হাইস্কুল এবং দোলখোলা হাসপাতালসড়ক	১০০%	৬৪,৫৬,০৮৭.০০	-ঐ-	

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	প্রাক্কলিতব্যয়	প্রকল্প হতে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তার বর্ণনা	মন্তব্য
	(চেই. ১০০০-২০০০মি.) পুনর্বাসন।				
৩২	ডুমুরিয়া উপজেলাধীন ঝিলেরডাঙ্গা আরএইচডি-লতাখামারবাড়ি সড়ক (চেই. ২৩৮০-৪১৫০মি.) পুনর্বাসন	১০০%	১,২১,০৯,৪২৮.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষিপণ্য পরিবহণ ও আর্থ সামাজিকঅবস্থার উন্নয়ন	
৩৩	দাকোপ উপজেলাধীন খুটাখালী (বাজুয়াজিসি)-মোংলাপোর্ট (বানিশামন্ত বাজার) ভায়া বানিশামন্ত ইউপি অফিস সড়ক(চেই. ৬৫২০-৮৫৭০মি.)	১০০%	৮৩,৮৮,২২৬.০০	-ঐ-	
৩৪	দাকোপ উপজেলাধীন বটবুনিয়া জিসি –মোজামনগর বাজার ভায়া তিলডাঙ্গা ইউপি অফিস সড়ক (চেই. ০০ - ২০১০মি.) সড়ক পুনর্বাসন	১০০%	১,১৪,৯৭,৫৯৪.০০	-ঐ-	
৩৫	ডুমুরিয়া উপজেলাধীন কৈয়া বাজার- সলুয়াবাজার সড়ক (চেই. ০০ - ২১৩২মি.) সড়ক পুনর্বাসন	১০০%	১১৫৬০৭৮৮.০০	-ঐ-	
৩৬	ডুমুরিয়া উপজেলাধীন বসয়ডাঙ্গা- মাগুরখালী সড়ক (চেই. ১০০০ - ২৪০০মি.) সড়ক পুনর্বাসন	১০০%	৬৩০৫০৮৩.০০	-ঐ-	
৩৭	ডুমুরিয়া উপজেলাধীন বালিয়াখালী বাজার শোভনা ইউপি অফিস (চেই. ৭৮০০-৯১০০মি.) সড়ক পুনর্বাসন	১০০%	৬০২৯০৫৩.০০	-ঐ-	
৩৮	ডুমুরিয়া উপজেলাধীন সাহাপুর সরদার বাড়ি সড়ক (চেই. ০০-১৫০০মি.) সড়ক পুনর্বাসন	১০০%	৫১৬০৯৭৮.০০	-ঐ-	
৩৯	কয়রা উপজেলাধীন উপজেলা হেডকোয়ার্টার – হায়াতখালী জিসি – গিলাবাড়ি জিসি সড়ক (চেই. ০০-২৪০০মি.) পুনর্বাসন	১০০%	৭৪৭৬৬২৪.০০	-ঐ-	
৪০	কয়রা উপজেলাধীন উপজেলা হেডকোয়ার্টার – হায়াতখালী জিসি – গিলাবাড়ি জিসি সড়ক (চেই. ২৪০০-৪৯০০মি.) পুনর্বাসন	১০০%	১০০১৯৪৩১.০০	-ঐ-	
৪১	কয়রা উপজেলাধীন উপজেলা	১০০%	৫০৬৯৯৭২.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থার	

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	প্রাক্কলিতব্যয়	প্রকল্প হতে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তার বর্ণনা	মন্তব্য
	হেডকোয়ার্টার – হায়াতখালী জিসি – গিলাবাড়ি জিসি সড়ক (চেই. ৪৯০০-১০৬০০মি.) পুনর্বাসন			উন্নয়ন, কৃষিপণ্য পরিবহণ ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন	
৪২	বটিয়াঘাটা উপজেলাধীন সুরখালী ইউপি অফিস সুন্দর মহল (চেই. ১৪৩০-২২৮০মি.)	১০০%	৫৭৯৫৯১১.০০	-ঐ-	
৪৩	দাকোপ উপজেলাধীন বানিশামন্ত ইউপি বানিশামন্ত বাজার সড়ক (চেই. ০০-৯০১মি.)	১০০%	৫৭৬০১৬৯.০০	-ঐ-	
৪৪	তেরখাদা উপজেলাধীন বারাসাত ইউপি বিলদরিয়াহাট সড়ক (চেই. ৬৫০-১৯১০মি.)	১০০%	৬৯৫২০৯৬.০০	-ঐ-	
৪৫	পাইকগাছা উপজেলাধীন লস্কর ইউপি চৌমহনী বাজার সড়ক (চেই. ১০০০-২১৫৫মি.)	১০০%	৬১২০৬২৬.০০		
৪৬	তেরখাদা উপজেলাধীন আব্দুলের মোড় আরঅ্যান্ডএইচ - মাঝিরগাতী জিসি ভায়া কোলা বাজার সড়ক (চেই. ২৫৫০মি. হতে ৮৭৩৪ মি.)	৯০%	৬১২৬১০০০.০০	-ঐ-	চলমান
৪৭	দিঘলিয়া উপজেলাধীন মাঝিরগাতী-বামনডাঙ্গা-কাটেংগা সড়ক(চেই. ২৪৫০-৪২১৭মি.)	৩০%	২৬৫২৫৮০০.০০	-ঐ-	চলমান
৪৮	ফুলতলা, দিঘলিয়া, তেরখাদা ও রূপসা উপজেলার আরবান সেন্টার উন্নয়ন	৬৫%	৮১৭৮৯৩৮৯.০০	-ঐ-	চলমান
৪৯	বটিয়াঘাটা, পাইকগাছা ও ডুমুরিয়া উপজেলার আরবান সেন্টার উন্নয়ন	৪৫%	৭১৭৪৩২৮৪.০০	-ঐ-	চলমান
৫০	কয়রা উপজেলাধীন গিলাবাড়ি আরবান সেন্টার উন্নয়ন	২৫%	২১৭৪৭৭৩৯৩.০০	-ঐ-	চলমান
৫১	দাকোপ উপজেলাধীন খুটাখালী আরবান সেন্টার উন্নয়ন	৩৬%	১৬৫৬৩২৮৪৬.০০	-ঐ-	চলামন
৫২	দাকোপ উপজেলাধীন পোদ্দারগঞ্জ- কৈলাশগঞ্জ সড়কে ত্রিমোহনি হাইস্কুলের নিকট চড়া নদীর ওপর ৯৩.৪৪ মি. ব্রিজ নির্মাণ।	১০০%	২২২৮৪০০০.০০	-ঐ-	

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	প্রাক্কলিতব্যয়	প্রকল্প হতে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তার বর্ণনা	মন্তব্য
৫৩	পাইকাগাছা উপজেলাধীন পাইকগাছা আরঅ্যান্ডএইচ-বাঁকা জিসি সড়কে ১৬৭০মি. চেইনেজে ৩১৫.০০মি. দীর্ঘ পিএসসি ব্রিজ নির্মাণ।	১০০%	২১৪২২০১৯০.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষিপণ্য পরিবহণ ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন	
৫৪	ডুমুরিয়া উপজেলাধীন কাঁঠালতলা-মাগুরখালী-কপিলমুনি সড়কে সালতা নদীর ওপর ৯৩ মি.ব্রিজ নির্মাণ।	৯৩%	৮৮৭৪২৯৭১.০০	-ঐ-	চলমান
৫৫	দাকোপ উপজেলা হেডকোয়ার্টার বটবুনিয়া সড়কে ৫৪৭০মি. চেইনেজে ৭৫.০০ আরসিসি গার্ডার নির্মাণ।	৮৭%	৫৪৩৬০০১৬.০০	-ঐ-	চলমান
৫৬	বটিয়াঘাটা উপজেলাধীন খুলনা সাতক্ষীরা সড়কে বুড়ো মৌলভীর দরগাহ নিকট ময়ুরী নদীর ওপর ৬৬ মি.আরসিসি ব্রিজ নির্মাণ।	১০০%	৩৭৮৭৬১৪০.০০	-ঐ-	
৫৭	দাকোপ উপজেলাধীন কালিনগর জিসি-খুটাখালী জিসি রাস্তায় ০+০০ কি.মি. চেইনেজে সাইনগিওরা গভ. প্রাইমারি স্কুলের নিকট ভদ্রা নদীর ওপর ৩০১.৪০মিটার দীর্ঘ গার্ডার ব্রিজ এবং ১৪০.১৬ মিটার ভায়োডাক্ট নির্মাণ।	১০%	৪২৩৫০০০০০.০০	-ঐ-	চলমান
৫৮	পাইকগাছা উপজেলাধীন গদাইপুর ইউপি অফিস-আন্দারমানিক বাজার রাস্তায় ৫০০০মি. চেইনেজে (হাড়িয়ানদীর ওপর) ৯৬.০০ মি. ব্রিজ নির্মাণ	২০%	৬১৫২৬২১৯.০০	-ঐ-	চলমান
৫৯	বটিয়াঘাটা উপজেলাধীন আমিরপুর ইউপি অফিস-ফুলতলা হাট সড়কে ৩১০০মি. চেইনেজে নারায়নখালী খালের ওপর ৩০.০০মি. আরসিসি ব্রিজ নির্মাণ	১০০%	১৫০৫৫৬৯২.০০	-ঐ-	
৬০	বটিয়াঘাটা উপজেলাধীন গলস্নামারী বাজার-বয়রা আন্দিরঘাট এলাকায় খালেরর ওপর ২.৫০কিঃ মি. চেইনেজে ৩০.০০মি. আরসিসি ব্রিজ নির্মাণ	১০০%	১৬৬১৫৯৩১.০০	-ঐ-	

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	প্রাক্কলিতব্যয়	প্রকল্প হতে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তার বর্ণনা	মন্তব্য
৬১	বটিয়াঘাটা উপজেলাধীন মাথাভাঙ্গা রাস্তায় ময়ূর নদীর ওপর পানি উন্নয়ন বোর্ডের রাসস্না হতে রূপসা ব্রীজের এ্যাপ্রোচ সড়ক পর্যন্ত ৬৪০মি. চেইনেজে ১৭.০০মি. আরসিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ	১০০%	১১২২৮৫৭৮.০০	যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষিপণ্য পরিবহণ ও আর্থ সামাজিকঅবস্থার উন্নয়ন	
৬২	দাকোপ হেডকোয়ার্টার (চালনা বৌমার গাছতলা)- পানখালি ফেরিঘাট ভায়া কেসি কলেজঘাট সড়কে ১০৬০মি. চেইনেজে ৪ ভেন্ট ৫.০০মি. আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ।	১০০%	৬৫২০৪৫৭.০০	-ঐ-	
৬৩	দাকোপ উপজেলাধীন বটবুনিয়াজিসি-মোজামনগর বাজার ভায়া তিলডাঙ্গা ইউপিঅফিসসড়কে ২০৪৫মি. চেইনেজে ৫ ভেন্ট ৫.০০ x ৫.০০ মি.আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ	১০০%	৬৮,৬৭,১৯৫.০০	-ঐ-	
৬৪	রূপসা উপজেলাধীন আলাইপুর-খুলনা তেরখাদা সড়কে আঠারো বেকী নদীর ওপর ২১০.১৫ মি.Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ।	১০০%	৭৩৯৮৮৪১০.০০	-ঐ-	
৬৫	কয়রা উপজেলা পরিষদ ভবন সম্প্রসারণ	১০০%	৬২৫৩৫০৫৩.০০	-ঐ-	
৬৬	বটিয়াঘাটা উপজেলা পরিষদ ভবন সম্প্রসারণ	৮০%	৪৪০৯৮৬৬০.০০	-ঐ-	চলমান
৬৭	দিঘলিয়া উপজেলা পরিষদ ভবন সম্প্রসারণ	৪৫%	৬৩৮৬৫২৯২.০০	-ঐ-	চলমান
৬৮	দিঘলিয়া উপজেলাধীন গাজীরহাট ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ।	১০০%	৫৮৬০০০০.০০	-ঐ-	
৬৯	পাইকগাছা উপজেলাধীন বাঁকা জিসি উন্নয়ন	১০০%	২৮৩০০০০.০০	-ঐ-	
৭০	দাকোপ উপজেলাধীন লাউডোব ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ।	১০০%	৮৬৩৯০০০.০০	-ঐ-	
৭১	রূপসা উপজেলাধীন আলাইপুর জিসি উন্নয়ন	১০০%	৭১৩০০০০.০০	-ঐ-	

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	প্রাক্কলিতব্যয়	প্রকল্প হতে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তার বর্ণনা	মন্তব্য
৭২	দাকোপ উপজেলাধীন কৈলাশগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ।	১০০%	১০৬০০০০০.০০	-ঐ-	
৭৩	দাকোপ উপজেলাধীন সুতারখালী ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ।	৯৫%	১১৮১৫০০০.০০	-ঐ-	চলমান
৭৪	১) দাকোপ উপজেলাধীন দক্ষিণ গুনারী উপেননগর সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ।	১০০%	৮২৫০৭৬৮৯২.০০	-ঐ-	
	২) দাকোপ উপজেলাধীন সুতারখালী পূর্বপাড়া সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ।	১০০%			
	৩) দাকোপ উপজেলাধীন পূর্ব গুনারিআদর্শ সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ।	১০০%			
	৪) দাকোপ উপজেলাধীন বাইনপাড়া মাদার নগর সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ।	১০০%			
	৫) দাকোপ উপজেলাধীন ভিটাভাঙ্গা হরিচরণ সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ।	১০০%			
	৬) দাকোপ উপজেলাধীন চান্নীর চক সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ।	১০০%			
	৭) দাকোপ উপজেলাধীন সাহারাবাদ সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ।	১০০%			
	৮) দাকোপ উপজেলাধীন পার জয়নগর সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ।	১০০%			
	৯) দাকোপ উপজেলাধীন মাছুম সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ।	১০০%			
	১০) দাকোপ উপজেলাধীন কামারাবাদ পশ্চিম মৌখালী সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ।	১০০%			
	১১) দাকোপ উপজেলাধীন পূর্ব খাজুরিয়া সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ।	১০০%			
	১২) দাকোপ উপজেলাধীন রামনগর দক্ষিণপাড়া জগনাথ সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ।	১০০%			

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	প্রাক্কলিতব্যয়	প্রকল্প হতে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তার বর্ণনা	মন্তব্য
	১৩) দাকোপ উপজেলাধীন বিকেকচা সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ।	১০০%			
	১৪) কয়রা উপজেলাধীন কয়রা মদিনাবাদ সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ।	১০০%			
	১৫) কয়রা উপজেলাধীন বনফুল সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ।	১০০%			
	১৬) কয়রা উপজেলাধীন মধ্যমহেশ্বরীপুর সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ।	১০০%			
	১৭) কয়রা উপজেলাধীন ৫নং কয়রা কমিউনিটি সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ।	১০০%			
	১৮) কয়রা উপজেলাধীন কয়রা মনোরামা সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ।	১০০%			
	১৯) কয়রা উপজেলাধীন ৩নং কয়রা গ্রামীণ সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ।	১০০%			
	২০) কয়রা উপজেলাধীন ৬নং কয়রা গ্রামীণ সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ।	১০০%			
	২১) কয়রা উপজেলাধীন হড্ডামাঝের চক সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ।	১০০%			
	২২) কয়রা উপজেলাধীন পশ্চিম হড্ডাসাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ।	১০০%			
	২৩) কয়রা উপজেলাধীন বাবুরাবাদ সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ।	১০০%			
	২৪) কয়রা উপজেলাধীন দক্ষিণ কালিকাপুর সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ।	১০০%			
৭৫	১) কয়রা উপজেলাধীন কয়রা মদিনাবাদ দারুস সালাম মহিলা মাদরাসা সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ।	১০০%	৮৮৬৩৯৬৬৩.০০	যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষিপণ্য পরিবহণ ও আর্থ সামাজিকঅবস্থার উন্নয়ন	

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	প্রাক্কলিতব্যয়	প্রকল্প হতে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তার বর্ণনা	মন্তব্য
	২) কয়রা উপজেলাধীন হরিণ খোলা সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ।	১০০%		-ঐ-	
৭৬	পাইকগাছা উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	১০০%	২৩৯০৮৩৩৭.০০	-ঐ-	
৭৭	তেরখাদা উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	১০০%	২৪১৯১৮৫১.০০	-ঐ-	
৭৮	ফুলতলা উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	৮৫%	১২৫৯৪৭৯৫.০০	-ঐ-	চলমান
৭৯	ডুমুরিয়া উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	৯২%	২৪২৭১৬৮৫.০০	-ঐ-	চলমান
৮০	রূপসা উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	৮০%	২২৯৭৫২৭৩.০০	-ঐ-	চলমান
৮১	কয়রা উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	৮৫%	২৯৯৮৭৫৩৮.০০	-ঐ-	চলমান
৮২	দিঘলিয়া উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	৮০%	২৪৪০৯২৫৫.০০	-ঐ-	
৮৩	বটিয়াঘাটা উপজেলা রিজিওনাল সার্ভার স্টেশন নির্মাণ (নির্বাচন অফিস)	১০০%	২২৭০০০০.০০	-ঐ-	
৮৪	তেরখাদা উপজেলা রিজিওনাল সার্ভার স্টেশন নির্মাণ (নির্বাচন অফিস)	১০০%	২৩২০০০০.০০	-ঐ-	
৮৫	রূপসা উপজেলা রিজিওনাল সার্ভার স্টেশন নির্মাণ (নির্বাচন অফিস)	১০০%	২২৬০০০০.০০	-ঐ-	
৮৬	ডুমুরিয়া উপজেলা রিজিওনাল সার্ভার স্টেশন নির্মাণ (নির্বাচন অফিস)	১০০%	২৩৫০০০০.০০	-ঐ-	
৮৭	ফুলতলা উপজেলা রিজিওনাল সার্ভার স্টেশন নির্মাণ (নির্বাচন অফিস)	১০০%	২২৭০০০০.০০	-ঐ-	
৮৮	পাইকগাছা রূপসা উপজেলা রিজিওনাল সার্ভার স্টেশন নির্মাণ (নির্বাচন অফিস)	১০০%	৩০১০০০০.০০	-ঐ-	
৮৯	দাকোপ উপজেলা রিজিওনাল সার্ভার স্টেশন নির্মাণ (নির্বাচন অফিস)	১০০%	২২৯০০০০.০০	-ঐ-	
৯০	দিঘলিয়া উপজেলা রিজিওনাল সার্ভার স্টেশন নির্মাণ (নির্বাচন অফিস)	১০০%	২২৪০০০০.০০	যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষিপণ্য পরিবহণ ও আর্থ সামাজিকঅবস্থার	

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	প্রাক্কলিতব্যয়	প্রকল্প হতে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তার বর্ণনা	মন্তব্য
				উন্নয়ন	
৯১	ফুলতলা উপজেলাধীন জামিরা-পায়রা সড়ক উন্নয়ন (চেই. ০০-১৬২৫মি.)	১০০%	৭৯৯৪৩৬৬.০০	-ঐ-	
৯২	কয়রা উপজেলাধীন হাতিয়ার ডাঙ্গা আরঅ্যান্ড এইচ গড়ুইখালী সড়ক (চেই. ১০০০-৩২২০মি.)।	১০০%	৫৩৩১২৯৬.০০	-ঐ-	
৯৩	পাইকগাছা উপজেলাধীন পাইকগাছা জিসি- গড়ুইখালী জিসি সড়ক।	১০০%	৩১৯২৭০৭৬.০০	-ঐ-	
৯৪	রূপসা উপজেলাধীন মোংলা হাইওয়ে কুদির বটতলা সড়ক সড়ক।	১০০%	১৩৮৬৮১৭৯.০০	-ঐ-	
৯৫	আরবান প্রাইমারি হেলথ্ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প (UPHCSDP) এর আওতায় Construction of 7- Storied CRHCC Building at 2 No. Custom Ghat in Khulna City Corporation নির্মাণ	৯০%	৫২২৪৫১২৩.০০	-ঐ-	চলমান

পরিশিষ্ট-৯

প্রকল্পের নাম: গত ১দশকের খুলনা জেলার প্রকল্পসমূহের প্রতিবেদন

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	থানা/ উপজেলা	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্প হতে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তার বর্ণনা	মন্তব্য
০১	শহিদ আবুল কাশেম কলেজে ৪তলা ভিতবিশিষ্ট ৪তলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ	বটিয়াঘাটা	৯০%	২৫৯.০৪	৪০০ শিক্ষার্থীর উন্নত পরিবেশে লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করা।	
০২	কালিনগর কলেজে ৪তলা ভিতবিশিষ্ট ৪তলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ	পাইকগাছা	৮৫%	২৬০.৫৬	-ঐ-	
০৩	খুলনা আইডিয়াল কলেজে ৪তলা ভিতবিশিষ্ট ৪তলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ	সোনাডাংগা	৯০%	৩১৪.৩৯	-ঐ-	
০৪	লায়ন্স উচ্চ বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজে ৪তলা ভিতবিশিষ্ট ৪তলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ	সোনাডাংগা	৮৫%	৪১৪.৪০	৫০০ শিক্ষার্থীর উন্নত পরিবেশে লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করা।	
০৫	দৌলতপুর (দিবা/নৈশ) কলেজে ৪তলা ভিতবিশিষ্ট ৪তলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ	দৌলতপুর	৯০%	৩১৪.৪০	৪০০ শিক্ষার্থীর উন্নত পরিবেশে লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করা।	
০৬	হাজী মোহাম্মদ মহসীন কলেজে ৪তলা ভিতবিশিষ্ট ৪তলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ	খালিশপুর	৪৫%	৩১৪.৪০	-ঐ-	
০৭	বঙ্গবন্ধু কলেজে ৪তলা ভিতবিশিষ্ট ৪তলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ	রূপসা	৯০%	২৬০.৫৬	-ঐ-	
০৮	আলহাজ্ব মোলস্না জালাল উদ্দিন কলেজে ৪তলা ভিতবিশিষ্ট ৪তলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ	দিঘলিয়া	৯০%	২৬০.৫৬	-ঐ-	
০৯	বান্দা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল ৪তলা ভিতবিশিষ্ট ৪তলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ	ডুমুরিয়া	৬৫%	২৬০.৫৬	-ঐ-	
১০	শহিদ আয়ুব অ্যান্ড মুসা মেমোরিঃ ডিগ্রী কলেজে ৪তলা ভিতবিশিষ্ট ৪তলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ	পাইকগাছা	৯০%	২৬০.০৩	-ঐ-	

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	থানা/ উপজেলা	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্প হতে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তার বর্ণনা	মন্তব্য
১১	খান সাহেব কোমর উদ্দিন কলেজে ৪তলা ভিতবিশিষ্ট ৪তলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ	কয়রা	৬০%	২৬০.৫৬	-ঐ-	
১২	মওলানা ভাষানী মেমোরিয়াল কলেজে ৪তলা ভিতবিশিষ্ট ৪তলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ	ডুমুরিয়া	৯০%	২৬০.৫৬	-ঐ-	
১৩	ফুলতলা মহিলা ডিগ্রী কলেজে ৪তলা ভিতবিশিষ্ট ৪তলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ	ফুলতলা	৮০%	২৬০.৫৬	-ঐ-	
১৪	শহিদ সোহরোওয়ার্দি কলেজে ৪তলা ভিতবিশিষ্ট ৪তলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ	সোনাডাংগা	৪৫%	২৯৭.৪২	-ঐ-	
১৫	খুলনা ইসলামিয়া ডিগ্রী কলেজে ৪তলা ভিতবিশিষ্ট ৪তলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ	সোনাডাংগা	৫০%	২৯৬.৩২	-ঐ-	
১৬	মেট্রোপলিটন কলেজে ৪তলা ভিতবিশিষ্ট ৪তলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ	সোনাডাংগা	৫০%	৩০১.১১	-ঐ-	
১৭	মুহসিন মহিলা কলেজে ৪তলা ভিতবিশিষ্ট ৪তলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ	দৌলতপুর	৪৫%	৩০৩.৫৩	-ঐ-	
১৮	শহিদ স্মৃতি মহিলা কলেজে ৪তলা ভিতবিশিষ্ট ৪তলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ	ডুমুরিয়া	৭৫%	১২৪.৩৮	-ঐ-	
১৯	গড়িয়ার ডাঙ্গা আদর্শ কলেজে ৪তলা ভিতবিশিষ্ট ৪তলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ	বটিয়াঘাটা	৭৫%	১৩৩.৪৭	-ঐ-	
২০	চালনা মোবারক মেমো: কলেজে ৪তলা ভিতবিশিষ্ট ৪তলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ	দাকোপ	৭০%	১৭১.০০	-ঐ-	
২১	মহেশ্বরপাশা শহিদ জিয়া কলেজে ৪তলা ভিতবিশিষ্ট ৪তলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ	দৌলতপুর	৭৫%	১৩৬.০৪	ঐ	

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	থানা/ উপজেলা	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্প হতে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তার বর্ণনা	মন্তব্য
২২	রায়ের মহল কলেজে ৪তলা ভিতবিশিষ্ট ৪তলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ	খালিশপুর	৬০%	১৩৬.০৪	-ঐ-	
২৩	নর্থ খুলনা কলেজে ৪তলা ভিতবিশিষ্ট ৪তলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ	তেরখাদা	৪০%	১৩৩.৪৭	-ঐ-	
২৪	পল্লিশ্রী কলেজে ৪তলা ভিতবিশিষ্ট ৪তলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ	ডুমুরিয়া	৪০%	১৩৩.৪৭	-ঐ-	
২৫	কপিলমুনি কলেজে ৪তলা ভিতবিশিষ্ট ৪তলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ	পাইকগাছা	৬০%	২৫৩.৫৩	-ঐ-	
২৬	হরিঢালী কপিলমুনি মহিলা কলেজে ৪তলা ভিতবিশিষ্ট ৪তলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ	পাইকগাছা	৫০%	২৫৩.৫৩	-ঐ-	
২৭	লক্ষীখোলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৪তলা ভিতবিশিষ্ট ৪তলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ	পাইকগাছা	২০%	১৩৩.৪৭	-ঐ-	
২৮	চিত্রা মহিলা কলেজে ৪তলা ভিতবিশিষ্ট ৪তলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ	তেরখাদা	০%	২৪৫.৬৭	-ঐ-	
২৯	এল. বি. কে মহিলা কলেজে ১ম, ২য় ও ৩য় অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ।	দাকোপ	২০%	১৪৯.৯৫	-ঐ-	
৩০	খুলনা পাবলিক কলেজে উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প	খালিশপুর	১০০%	৪৮০.৩৩	২০০ শিক্ষার্থীর উন্নত পরিবেশে লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করা।	

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	থানা/ উপজেলা	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্প হতে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তার বর্ণনা	মন্তব্য
৩১	কেডিএ খান জাহান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭(সাত) তলা ভিতবিশিষ্ট ৪তলা অ্যাকাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন নির্মাণকাজ।	খান জাহান আলী	৮০%	১০০০.০০	১৫০০ শিক্ষার্থীর উন্নত পরিবেশে লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে নতুন সরকারি স্কুল।	
৩২	লবনচরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭তলা ভিতবিশিষ্ট ৭তলা অ্যাকাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন নির্মাণকাজ।	সদর	৩০%	৯১০.৭০	-ঐ-	
৩৩	বটিয়াঘাটা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, কৃষ্ণনগর- এর ৭তলা ভিতবিশিষ্ট ৭তলা অ্যাকাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন নির্মাণকাজ।	বটিয়াঘাটা	১৫%	৯০৫.৮৮	-ঐ-	
৩৪	সরকারি বি. এল কলেজে ৪তলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ	দৌলতপুর	১০০%	৩৭৭.৮৫	উন্নত পরিবেশে ২০০ শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি।	
৩৫	সরকারি বি. এল কলেজে অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণকাজ	দৌলতপুর	১০০%	১৩৩.৩৬	-ঐ-	
৩৬	সরকারি বি. এল কলেজের ১০০ শয্যাবিশিষ্ট ছাত্রীনিবাস	দৌলতপুর	৬০%	৫০৫.৩৬	উন্নত পরিবেশে ১০০ ছাত্রীর আবাসনের সুযোগ সৃষ্টি।	
৩৭	সরকারি বি. এল কলেজের ৫তলা জেনারেল অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ।	দৌলতপুর	২০%	৩৩৫.৭১	উন্নত পরিবেশে ১০০০ শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি।	
৩৮	সরকারি বি. এল কলেজের বি◌ান ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারন।	দৌলতপুর	১০০%	১৫০.০০	উন্নত পরিবেশে ২০০ শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি।	

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	থানা/ উপজেলা	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্প হতে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তার বর্ণনা	মন্তব্য
৩৯	সরকারি বি. এল কলেজের ৪তলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ।	দৌলতপুর	১০০%	২৫০.০০	উন্নত পরিবেশে ৫০০ শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি।	
৪০	সরকারি বি. এল কলেজের ৪তলা ভিতের ওপর অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ।	দৌলতপুর	১০০%	১০০.০০	উন্নত পরিবেশে ১০০ শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি।	
৪১	খুলনা নৌবাহিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের ৫তলা ভিতবিশিষ্ট ৫তলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ	খালিশপুর	১০০%	৩০০.০০	উন্নত পরিবেশে ৫০০ শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি।	
৪২	বটিয়াঘাটা থানা হেড কোয়ার্টার মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্মাণ	বটিয়াঘাটা	১০০%	১৩৬.৭৫	উন্নত পরিবেশে ১০০ শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি।	
৪৩	দিঘলিয়া এম এ মজিদ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্মাণকাজ	দিঘলিয়া	১০০%	১৩২.০৩	উন্নত পরিবেশে ১৫০ শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি।	
৪৪	কাজদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্মাণকাজ।	রম্নপসা	১০০%	১২৯.০৮	-ঐ-	
৪৫	ইখড়ি কাটেংগা ফজলুল হক পাইলট মা.বি.	তেরখাদা	১০০%	১৩৫.৬২	-ঐ-	
৪৬	কয়রা মদিনা বাদ মা. বি.	কয়রা	১০০%	১৯০.১৩	-ঐ-	
৪৭	সেনপাড়া বাহার উলল্লা দাখিল মাদরাসা	ডুমুরিয়া	৩০%	১২৬.৭৩	-ঐ-	
৪৮	খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ছাত্র হল নির্মাণ (ব্লক-সি ও ডি)	খানজাহান আলী	১০০%	১০০০.০০	উন্নত পরিবেশে ১২০০ শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি।	
৪৯	খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ^বিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলীর অফিস ববন নির্মাণ	খানজাহান আলী	১০০%	১৫০.০০	উন্নত পরিবেশে কাজের সুযোগ সৃষ্টি।	
৫০	খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডরমেটরি ভবন নির্মাণ (৩ তলা)	খানজাহান আলী	১০০%	২০০.০০	উন্নত পরিবেশে আবাসনের ব্যবস্থা করা	

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	থানা/ উপজেলা	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্প হতে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তার বর্ণনা	মন্তব্য
৫১	মিলিটারি কলেজিয়েট খুলনা এর অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ	ফুলতলা	১০০%	৪০০.০০	উন্নত পরিবেশে ৩০০ শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি।	
৫২	মিলিটারি কলেজিয়েট স্কুল এর ৪টি হোস্টেল ভবন নির্মাণ	ফুলতলা	১০০%	১০০০.০০	৪০০ শিক্ষার্থীর আবাসনের সুযোগ সৃষ্টি	
৫৩	খুলনা মডেল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৫ তলা ভিতবিশিষ্ট ৫তলা অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ	খালিশপুর	১০০%	৬০০.০০	উন্নত পরিবেশে ২০০০ শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি।	
৫৪	খুলনা জিলা স্কুলের ৫তলা ভিতবিশিষ্ট ৫তলা ভবন নির্মাণ	সদর	১০০%	৫০০.০০	উন্নত পরিবেশে ১০০০ শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি।	
৫৫	খুলনা পাবলিক কলেজে ৫তলা ভিতবিশিষ্ট ৪ তলা ভবন নির্মাণ	খালিশপুর	১০০%	৫০০.০০	উন্নত পরিবেশে ১০০০ শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি।	
৫৬	খুলনা পাবলিক কলেজে ১০০ বেডের হোস্টেল ভবন নির্মাণ	খালিশপুর	১০০%	২৫০.০০	উন্নত পরিবেশে ১০০ শিক্ষার্থীর আবাসনের ব্যবস্থা ।	

পরিশিষ্ট-১০

গত ১ দশকে গণপূর্ত বিভাগ-২ খুলনার প্রকল্পসমূহের প্রতিবদন ছক

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রকল্প হতে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তার বর্ণনা	মন্তব্য
১	চতুর্বার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানায় ৬০০ব.ফু. স্টাফ কোয়ার্টার (২ ইউনিট নিচ তলা) নির্মাণকাজ	কাজটি হস্তান্তর হয়েছে।	৩২.৩০	থানাসমূহের পুলিশ সদস্যদের আবাসন সমস্যার সমাধান হবে। ফলে সুষ্ঠুভাবে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা সহজ হবে।	
২	চতুর্বার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানায় ৮০০ব.ফু. স্টাফ কোয়ার্টার (২ ইউনিট নিচ তলা) নির্মাণকাজ	কাজটি হস্তান্তর হয়েছে।	৪১.৩২	থানাসমূহের পুলিশ সদস্যদের আবাসন সমস্যার সমাধান হবে। ফলে সুষ্ঠুভাবে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা সহজ হবে।	
৩	চতুর্বার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা থানায় ৬০০ব.ফু. স্টাফ কোয়ার্টার (২ ইউনিট নিচ তলা) নির্মাণকাজ	কাজটি হস্তান্তর হয়েছে।	৪০.৫৯	থানাসমূহের পুলিশ সদস্যদের আবাসন সমস্যার সমাধান হবে। ফলে সুষ্ঠুভাবে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা সহজ হবে।	
৪	চতুর্বার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় খুলনা জেলার দাকোপ থানায় ৬০০ব.ফু. স্টাফ কোয়ার্টার (২ ইউনিট নিচ তলা) নির্মাণকাজ	কাজটি হস্তান্তর হয়েছে।	৩৭.৪৩	থানাসমূহের পুলিশ সদস্যদের আবাসন সমস্যার সমাধান হবে। ফলে সুষ্ঠুভাবে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা সহজ হবে।	
৫	চতুর্বার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় খুলনা জেলার পাইকগাছা থানায় ৬০০ব.ফু. স্টাফ কোয়ার্টার (২ ইউনিট নিচ তলা) নির্মাণকাজ	কাজটি হস্তান্তর হয়েছে।	৩৬.০৩	থানাসমূহের পুলিশ সদস্যদের আবাসন সমস্যার সমাধান হবে। ফলে সুষ্ঠুভাবে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা সহজ হবে।	
৬	চতুর্বার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় খুলনা জেলার পাইকগাছা থানায় ৮০০ব.ফু. স্টাফ কোয়ার্টার (২ ইউনিট নিচ তলা) নির্মাণকাজ	কাজটি হস্তান্তর হয়েছে।	৩৬.৩৭	থানাসমূহের পুলিশ সদস্যদের আবাসন সমস্যার সমাধান হবে। ফলে সুষ্ঠুভাবে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা সহজ হবে।	
৭	‘দেশের ৪৭টি গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নির্মাণ শীষক প্রকল্পের আওতায় খুলনায় খানজাহান আলী ফায়ার স্টেশন নির্মাণকাজ	কাজটি হস্তান্তর হয়েছে।	১৪৮.০৭	আগুন সহ অন্যান্য দূর্ঘটনা নিবারনে ও জনগনের জান মাল রক্ষায় সহায়ক হবে।	

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রকল্প হতে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তার বর্ণনা	মন্তব্য
৮	খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানাধীন রঘুনাথপুর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ১ম তলার ওপর ২য় তলা নির্মাণকাজ।	কাজটি হস্তান্তর হয়েছে।	২৬.৭৭	উক্ত এলাকার আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়ক হবে।	
৯	খুলনা টুটপাড়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নির্মাণকাজ	কাজটি হস্তান্তর হয়েছে।	১০৫.০০	আগুন সহ অন্যান্য দূর্ঘটনা নিবারনে ও জনগনের জান মাল রক্ষায় সহায়ক হবে।	
১০	উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৫ম পর্ব) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ডুমুরিয়া উপজেলার সাহস ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণকাজ	কাজটি হস্তান্তর হয়েছে।	৩০.৫৭	ভূমি ব্যবস্থাপনা সহজ হবে। উক্ত এলাকার জনগন সহজে ভূমি সেবা পাবে।	
১১	উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৫ম পর্ব) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কয়রা উপজেলার মহারাজপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণকাজ	কাজটি হস্তান্তর হয়েছে।	৩৭.৭৬	ভূমি ব্যবস্থাপনা সহজ হবে। উক্ত এলাকার জনগন সহজে ভূমি সেবা পাবে।	
১২	পুলিশের জন্য ১০টি ব্যারাক ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প কাজের আওতায় খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ লাইনে একটি ব্যারাক ভবন নির্মাণকাজ	কাজটি হস্তান্তর হয়েছে।	১০২৮.৩০	ব্যারাক সমূহের পুলিশ সদস্যদের আবাসন সমস্যার সমাধান হবে। ফলে সুষ্ঠুভাবে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা সহজ হবে।	
১৩	পুলিশের জন্য ১০টি ব্যারাক ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প কাজের আওতায় খুলনা জেলা পুলিশ লাইনে একটি ব্যারাক ভবন নির্মাণকাজ	কাজটি হস্তান্তর হয়েছে।	৯৮৩.৭৭	ব্যারাক সমূহের পুলিশ সদস্যদের আবাসন সমস্যার সমাধান হবে। ফলে সুষ্ঠুভাবে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা সহজ হবে।	
১৪	পলিশ বিভাগের ৫০টি জরাজীর্ণ থানা ভবন টাইপ প্ল্যানে নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় খালিশপুর থানা ভবন নির্মাণকাজ	কাজটি হস্তান্তর হয়েছে।	৫২৩.০০	উক্ত এলাকার আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়ক হবে।	
১৫	আর আর এফ খুলনা পুলিশ লাইনে ০৬ (ছয়) তলা ভিতবিশিষ্ট ০২ (দুই) তলা ব্যারাক ভবন নির্মাণকাজ	কাজটি হস্তান্তর হয়েছে।	৪৫৫.৬৮	ব্যারাক সমূহের পুলিশ সদস্যদের আবাসন সমস্যার সমাধান হবে। ফলে সুষ্ঠুভাবে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা সহজ হবে।	
১৬	আর আর এফ খুলনা পুলিশ লাইনের ৩য় ও ৪র্থ তলা উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ কাজ	কাজটি হস্তান্তর হয়েছে।	৩৪৯.০০	ব্যারাক সমূহের পুলিশ সদস্যদের আবাসন সমস্যার সমাধান হবে। ফলে সুষ্ঠুভাবে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা সহজ হবে।	

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রকল্প হতে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তার বর্ণনা	মন্তব্য
১৭	রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন মঠবাড়ি পুলিশ ফাড়ি নির্মাণকাজ	কাজ শেষ হয়েছে।	১২১.০০	উক্ত এলাকার আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়ক হবে।	
১৮	ডুমুরিয়া থানাধীন রঘুনাথপুর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ৩য় ও ৪র্থ তলা উদ্ধমূখী কাজ (সিভিল, স্যানিটারি ও বৈদ্যুতিক)	কাজটি শেষ হয়েছে।	১৫৯.৯৯	উক্ত এলাকার আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়ক হবে।	
১৯	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের কাজের আওতায় গোয়ালখালী হাইস্কুল নির্মাণকাজ।	কাজটি শেষ হয়েছে।	১৫৪.০০	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের আবাসন সমস্যার সমাধান হবে। রাষ্ট্রের সমাজ সেবা মূলক কাজ ত্বরান্বিত হবে।	
২০	সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপে-- ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প কাজের আওতায় খুলনা জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণকাজ	ফিনিশিং কাজ চলছে	১৯৮.০০	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অফিস ও দোকানের ব্যবস্থা রাখায় মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আয়ের উৎস ও সংসদের সাংগঠনিক ব্যবস্থপনায় সহায়ক হবে।	
২১	১০১টি জরাজীর্ণ থানা ভবন নির্মাণ কাজের আওতায় দাকোপ থানা ভবন নির্মাণকাজ	ফিনিশিং কাজ চলছে	৭৫৯.০০	উক্ত এলাকার আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়ক হবে।	
২২	১০১টি জরাজীর্ণ থানা ভবন নির্মাণ কাজের আওতায় কয়রা থানা ভবন নির্মাণকাজ	কাজটি শেষ হয়েছে।	৬৫৬.০০	উক্ত এলাকার আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়ক হবে।	
২৩	খুলনা জেলা পুলিশ লাইনে মহিলা পুলিশ ব্যারাক ভবন নির্মাণকাজ	১ম তলার কাজ চলছে।	৪০৩.০০	ব্যারাক সমূহের নারী পুলিশ সদস্যদের আবাসন সমস্যার সমাধান হবে। ফলে সুষ্ঠুভাবে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা সহজ হবে।	
২৪	১২টি ব্যারাক ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প কাজের আওতায় খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ লাইনে ০১টি ব্যারাক ভবন নির্মাণকাজ	পাইল লোড টেষ্ট চলছে।	১৭৯৬.৯৮	ব্যারাক সমূহের পুলিশ সদস্যদের আবাসন সমস্যার সমাধান হবে। ফলে সুষ্ঠুভাবে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা সহজ হবে।	
২৫	১৯টি অস্ত্রাগার নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প কাজের আওতায় আরআরএফ পুলিশ লাইন খুলনায় ০১টি অস্ত্রাগার নির্মাণকাজ	পাইল লোড টেষ্ট চলছে।	২৯২.৭৩	পুলিশের অস্ত্রের ব্যবস্থাপনা উন্নত হবে। ফলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা সহজ হবে।	
২৬	বাংলাদেশ বেতার খুলনা কেন্দ্রের চত্বরে নির্মিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি ভাস্কর্য সংস্কার	ভাস্কর্য পূর্নগঠনের কাজ চলছে।	৮৫৯.১৬	জনগন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বর্ণিল সংগ্রামী জীবন ও দেশের স্বাধীনতা অর্জনে তাঁর অবদানের	

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রকল্প হতে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তার বর্ণনা	মন্তব্য
	ও সম্প্রসারণ কাজ			বিষয়ে অধিক অবগত হবে। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বৃদ্ধি পাবে।	
২৭	উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) শীর্ষক প্রকল্প কাজের আওতায় ০৯টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণকাজ।	শরাফপুর ভূমি অফিস নির্মাণকাজ বাদে বাকি ভূমি অফিসের কাজ চলমান	৬৮৮.০০	ভূমি ব্যবস্থাপনা সহজ হবে। সংশিলষ্ঠ এলাকার জনগন সহজে ভূমি সেবা পাবে।	
২৮	০৪টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প কাজের আওতায় খুলনা টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউট স্থাপন কাজ	বিভিন্ন স্থাপনার কাজ চলছে	৫১২২.০০	বস্ত্র খাতে কারিগরি জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। টেক্সটাইলের ওপর ছাত্রছাত্রীরা উচ্চতর ডিগ্রি নিতে পারবে। বেকার সমস্যার সমাধান হবে উন্নত বস্ত্র উৎপাদনসহ বৈদেশিক মূদ্রা অর্জনে সহায়ক হবে।	
২৯	খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প কাজ	বিভিন্ন স্থাপনার কাজ চলছে।	২৫৩০৪.৬০	বন্দি ব্যবস্থাপনা আধুনিক হবে। কয়েদিদের সংশোধনাগার হিসাবে কাজ করবে বিধায় পরবর্তী সময়ে তারা অন্য কোনো অপরাধে জড়াবে না ফলে রাষ্ট্রের শান্তি শৃখলা বজায় থাকবে।	

পরিশিষ্ট-১১

গত ১ দশকের খুলনা জেলার প্রকল্প সমূহের প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত:

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লাখ টাকা)	প্রকল্প হতে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তার বর্ণনা	মন্তব্য
১।	উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আইলা'র আঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবো'র অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসন (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)।	প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। বাস্তবায়নকাল: জুলাই/২০১০ইং - জুন/২০১৫ইং।	৩৭৭৫৪.৬১	ক) ২০০৯-এ সাইক্লোন আইলায় দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৪৩টি পোল্ডার/উপ-প্রকল্পসমূহের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন/ মেরামত করা হয়েছে; খ) পোল্ডার/উপ-প্রকল্পসমূহের কাঙ্খিত সুফল নিশ্চিতকল্পে ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামোসমূহ কার্যক্ষম অবস্থায় আনয়ন করা হয়েছে।	প্রকল্পটি খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে।
২।	ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম।	প্রকল্পটি চলমান আছে। বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি/২০১৩ইং - ডিসেম্বর/২০১৮ইং।	৫৬৩৪৯.০০	ক) এলাকাবাসীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পোল্ডারসমূহের টেকসই উন্নয়ন হবে; খ) বন্যা প্রতিরোধ এবং পানিসম্পদ-এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হবে; গ) উন্নত উৎপাদনশীলতার মাধ্যমে কৃষকগণের আয় ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জীবিকার উপায় সৃষ্টি হবে; ঘ) পরিবেশগত উন্নয়ন এবং শতকরা ১০০ ভাগ বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা ও স্যানিটেশন, জেন্ডার সমতা ও ক্ষমতায়ন, প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার ব্যবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।	প্রকল্পটি খুলনা, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।
৩।	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ''খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার অন্তর্গত রামনগর-রহিমনগর এলাকায় বাঁধ পুনর্নির্মাণ ও নদী তীর সংরক্ষণ''।	প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। বাস্তবায়নকাল ডিসেম্বর/২০১২ইং - জুন/২০১৬ইং।	১৮১১.০৪	ক) নদী ভাঙন ও লবণাক্ততার হাত হতে প্রকল্প এলাকা রক্ষা করা হয়েছে; খ) কৃষি উৎপাদন নির্বিঘ্ন করার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে।	

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লাখ টাকা)	প্রকল্প হতে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তার বর্ণনা	মন্তব্য
৪।	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ‘‘খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলাধীন পোল্ডার নং-৩১ এর অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসন’’।	প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১৩ইং - ডিসেম্বর/২০১৬ইং।	৩০০.০০	ক) লবণাক্ততার হাত থেকে পোল্ডার এলাকাকে রক্ষা করা হয়েছে; খ) পোল্ডারিং ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন নির্বিঘ্ন করা হয়েছে।	
৫।	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ‘‘জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে রূপসা নদীর ভাঙন হতে রূপসা বাজার ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ রক্ষা প্রকল্প’’।	প্রকল্পটি চলমান আছে। বাস্তবায়নকাল নভেম্বর/২০১৩ইং - জুন/২০১৮ইং। (প্রস্তাবিত)	২০০.০০	ক) নদীভাঙন হতে চর রূপসা বাজার ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ রক্ষা পাবে; খ) বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ রুহুল আমিন এবং বীরবিক্রম শহিদ মহিবুলস্নাহের সমাধিস্থান রক্ষা পাবে।	

পরিশিষ্ট-১২

গত ১ দশকের খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের প্রতিবেদন:

ক্র. নং	প্রকল্পে নাম	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লাখ টাকা)	প্রকল্প হতে যে সুযোগ পাওয়া যাবে তার বর্ণনা।	মন্তব্য
সরকারি অর্থে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহঃ					
০১।	রায়ের মহল হতে কৈয়াবাজার পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ।	প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।	১১৩৩.৩২	নগর সম্প্রাসারণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয়েছে।	
০২।	বাস্তুহারা প্রধান সড়ক হতে সিটি বাইপাস পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ।	প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।	১৪০৩.৮০	নগর সম্প্রাসারণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয়েছে।	
০৩।	খুলনা মাস্টার প্ল্যান এলাকাকে মোংলা বর্ধিত করে স্ট্রাকচার প্ল্যান, মাস্টার প্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন।	প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।	৫৭১.১৫	খুলনা শহরের পাশাপাশি মোংলা এলাকা পর্যন্ত পরিকল্পিত নগরায়নের ধারা সূচিত হয়েছে।	
০৪।	খুলনা-যশোর রোড এবং সিটি বাইপাস রোডের মধ্যে দুটি সংযোগ সড়ক নির্মাণ।	প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।	৪৫৬৭.৪৩	নগর সম্প্রাসারণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয়েছে।	
স্ব-অর্থে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ:					
০১।	মুজগুন্নী আবাসিক এলাকায় পার্ক স্থাপন	প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।	৩৬৬.২৫	নগরবাসীর চিত্তবিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।	
০২।	ফুলবাড়িগেট আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকা উন্নয়ন।	প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।	৬২২.২১	আবাসন ও বাণিজ্যিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেয়েছে।	
০৩।	শিরোমণি কাঁচাবাজার নির্মাণ।	প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।	১৮৪.১৩	বাণিজ্যিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেয়েছে।	
০৪।	ঢাকায় লিয়াজোঁ অফিস-কাম রেঁস্ট হাউজ নির্মাণ	প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।	৭৬৬.৬৪	প্রশাসনিক কাঠামো সুসংগঠিত হয়েছে।	
০৫।	কেডিএ নিউ মার্কেট পূনর্নির্মাণ প্রকল্পের সার্ভে, প্ল্যান ও ডিজাইন।	প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।	১১৭.০০	বাণিজ্যিক কর্মকান্ড বৃদ্ধির পথ প্রসারিত হয়েছে।	
০৬।	ডিজিটাল আর্কাইভ অ্যান্ড ম্যানেজম্যান্ট সফটওয়্যার নির্মাণ উন্নয়ন	প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।	৫৩৯.৪৭	তথ্য সংরক্ষণ ও তথ্যপ্রাপ্তির সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।	

সরকারি অর্থে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহঃ					
০১।	খুলনা শিপইয়ার্ড রোড প্রস্তকরণ ও উন্নয়ন	চলতি প্রকল্প	৯৮৯০.৪৮	নগর সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয়েছে।	
০২।	শিরোমণি শিল্প এলাকার প্রধান সড়কসমূহ পূনর্নির্মাণ	চলতি প্রকল্প	২২০৯.১৭৬	নগর সম্প্রসরণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার সৃষ্টি হবে এবং নতুন শিল্প কারখানা গড়ে উঠবে।	
স্ব-অর্থে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ:					
০১।	আহসানাবাদ আবাসিক এলাকা উন্নয়ন	চলতি প্রকল্প	২৩৪৮২.১১	আবাসন সমস্যার সমাধান হবে। পরিকল্পিত আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে।	
০২।	রেস্ট হাউজ নির্মাণ।	চলতি প্রকল্প	৪০১.৫৭	আবাসন সুবিধার সৃষ্টি হবে।	

পরিশিষ্ট-১৩

গত ১ দশকের খুলনা জেলার জেলা পরিষদের মাধ্যমে যে সমস্ত বড়ো বড়ো প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে সেসব প্রকল্পের প্রতিবেদন।

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্প হতে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তার বর্ণনা	মন্তব্য
১।	গল্লামারী স্বাধীনতা স্মৃতি সৌধ নির্মাণ।	প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে।	২,১৬,৩১,০৫৯.৩৯	শহিদের স্মৃতি রক্ষার্থে এটা নির্মাণ করা হয়েছে এবং মহান স্বাধীনতা দিবস ও মহান বিজয় দিবসে জনসাধারণ এখানে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে।	
২।	খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা সদরে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের অনুরুপ নিচ তলা খোলা রেখে ০১টি দৃষ্টিনন্দন ৫ম তলা আধুনিক ডাকবাংলো ভবনের ৫ম তলাসহ অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।	৪র্থ তলা পর্যন্ত কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ৫ম তলার নির্মাণকাজ চলমান।	২,৬৯,৪৬,১৩৪.০০	ঘূর্ণিঝড়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে এখানে নিচ তলায় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণসহ সুন্দরবন দেখতে আসা পর্যটকদের থাকার সুবিধা আছে।	
৩।	ফুলতলা উপজেলা খুলনা জেলার প্রবেশপথে স্বাগত তোরণ।	প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে।	৫১,৫৮,৫০০.০০	খুলনায় ঘুরতে আসা পর্যটক ও জনসাধারণ এই স্বাগত তোরণ দেখে বুঝতে পারে যে তারা খুলনায় প্রবেশ করল।	
৪।	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে খুলনা জেলা পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “খুলনা জেলার উপকূলীয় অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহহীনদের পুনর্বাসনে আশ্রয়স্থল হিসাবে গৃহনির্মাণ	প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে।	৪,০০,০০,০০০.০০	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় দাকোপ ও কয়রা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে ১২৫টি পাকা ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। এতে ১২৫টি পরিবারের লোকজন সুবিধা পাচ্ছে।	

পরিশিষ্ট-১৪

গত ০১ দশকের জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা জেলা প্রকল্পসমূহ।

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্প হতে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তার বর্ণনা
০১।	ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক (IDB) প্রকল্প	সমাপ্ত	১,৫২,৮৮,৮৫২/-	খুলনা জেলার আওতায় উপজেলাসমূহের বিশুদ্ধ পানির উৎস স্থাপন।
০২।	সমগ্রদেশে গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প (৫ম পর্যায়)	সমাপ্ত	৬৬,১৮,৫৫৭/-	খুলনা জেলার আওতায় উপজেলাসমূহের বিশুদ্ধ পানির উৎস স্থাপন।
০৩।	বাংলাদেশ ওয়াটার সাপ্লাই প্রোগ্রাম প্রজেক্ট	সমাপ্ত	৭,৮০,২৮,৯২৮/-	খুলনা জেলার আওতায় উপজেলাসমূহের বিশুদ্ধ পানির উৎস স্থাপন।
০৪।	দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সুপেয় পানি সরবরাহ প্রকল্প	সমাপ্ত	৪,৮১,৩৬,৮৮৪/-	খুলনা জেলার আওতায় উপজেলাসমূহের বিশুদ্ধ পানির উৎস স্থাপন।
০৫।	জাতীয় স্যানিটেশন (২য় পর্যায়)		৭৬,৫৪,৪৫২/-	খুলনা জেলার আওতায় উপজেলা সমূহে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন সরবরাহ ও কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে।
০৬।	জাতীয় স্যানিটেশন (৩য় পর্যায়)	চলমান	৬৯,১৪,২৩৯/-	খুলনা জেলার আইলাদূর্গত উপজেলা সমূহে জরুরি নিরাপদ পানি সরবরাহ।
০৭।	আইলা প্রকল্প	সমাপ্ত	২,৭৬,২০০/-	খুলনা জেলার আওতায়উপজেলা সমূহে বিশুদ্ধ পানির উৎস স্থাপন।
০৮।	বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ	সমাপ্ত	৬,৮৫,১৯,২৯৬/-	খুলনা জেলার আওতায় উপজেলা সমূহে বিশুদ্ধ উৎস স্থাপন।
০৯।	আইডিবি সাহায্য পুষ্ট বাংলাদেশের ঘুর্নিঝড় উপদ্রুত এবং সিডর আক্রান্ত উপকূলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	সমাপ্ত	৩৩,৯৪,৬৬,৬৬০/-	খুলনা জেলার আওতায় উপজেলা সমূহে বিশুদ্ধ পানির উৎস স্থাপন।
১০।	প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প-৩	চলমান	৯,৭৮,১৩,২৬৩/-	খুলনা জেলার আওতাধীন সকল উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানির উৎস ও ওয়াশব্লক নির্মাণকাজ চলমান।
১১।	সেকেন্ডারী এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহেসমেন্ট (SEQAGP) প্রকল্প	সমাপ্ত	৫,৯৮,৯২৫/-	খুলনা জেলার আওতায় বিভিন্ন মাধ্যমিকপর্যায়ের বিদ্যালয়ে ল্যাট্রিন স্থাপন।

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্প হতে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তার বর্ণনা
১২।	বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন (BRWSSP) প্রকল্প	চলমান	২,১৫,১৪,৪০৬/-	খুলনা জেলার আওতায় রূপসা, দাকোপ, পাইকগাছা, কয়রা উপজেলায় নিরাপদ পানির উৎস ও স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন করা চলমান।
১৩।	জিওবি ইউনিসেফ (GOB) প্রকল্প	চলমান		দাকোপ উপজেলায় বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের জন্য ওয়াশব্লক নির্মাণ।

ছবি

খুলনা বেতার অফিসের সামনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-

খুলনা মহানগরীর নতুন রাস্তার মোড়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ভাস্কর্য ‘বীর

দৌলতপুর বিএল কলেজ চত্বরে মহান মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য

শহীদ হাদিস পার্ক, খুলনা

অদম্য বাংলা, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে দুর্বার বাংলা এর ভাস্কর্য

সুন্দরবনের হিরণ পয়েন্টের কাছে সারি সারি সুন্দরী গাছ

খানজাহান আলী সেতু, রুপসা, খুলনা

খুলনার পুরাতন সার্কিট হাউজ

খুলনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

খুলনার বিভাগীয় কমিশনারের বাস ভবন

খুলনার বিভাগীয় বন কার্যালয় (সুন্দরবন)

খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড, খুলনা

নগর ভবন, খুলনা

দৌলতপুর দধিবামনদেব মন্দির (১৯০৭)

খুলনার ইস্পাহানি হাউজ

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন একাডেমিক ভবন

খুলনা জেলা স্কুলের পুরাতন ভবন

বিশ্ব ঐতিহ্য ফলক

সুন্দরবনের হাড়বাড়িয়া ইকোট্যুরিজম কেন্দ্র

খুলনা খালিশপুর ওয়ান্ডারল্যান্ড শিশু পার্কের গেটের দৃশ্য

খুলনার খালিশপুরে বানৌজা তিতুমিরে মসজিদ

ফুলের উপর কোন প্রজাপতি নয়, এটা দূর্লভ প্রজাতির একটি ফুল

সুন্দরবনে পানিতে বাঘ

Some value added seafood presently exporting from Bangladesh

Handling practices in landing centers:

Activities in processing plants:

সুন্দরবনের মৌচাক

খুলনার সুন্দরবনের নদীর ধারে সারি সারি সুন্দরী ও কেওড়া গাছ

সুন্দরবনের কাঁকড়া

সুন্দরবনের কুমির

বাংলার ঐতিহ্য ঢেঁকি

সুন্দরবনের গোলপাতার ফল

সুন্দবনের ভিতরে খালের পাড়ে সুন্দরী গাছের দৃশ্য